সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

বিংশ বর্ষ

১৩১৬

কলিকাতা :

২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত ;
২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন্ প্রেসে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

—— ঃ০ঃ ——

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

সাহিত্য

মাসিকপত্র ও সমালোচন

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

বিংশ বর্ষ

১৩১৬

কলিকাতা:

২।১ নং রামধন মিত্রের লেন, সাহিত্য-কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত;
২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন্ প্রেসে
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রবন্ধের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

—— ঃ০ঃ ——

লেখকগণের নামানুক্রমিক সূচী।

বিদেশে বঙ্কিমচন্দ্র।

—:০:—

াগ্রবুদ্ধি চাণক্য বলিয়াছেন :—

'বিদ্বত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥'

রতবাসীর বিশ্বাস, চরাচর-রক্ষার্থ অষ্ট দিক্‌পালের সারাংশ গ্রহণ করিয়া তা রাজার সৃষ্টি করেন। মনু বলিয়াছেন :—

'অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্ব্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্ব্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ॥
ইন্দ্রানিলযমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নির্হৃত্য শাশ্বতীঃ॥'

ঃ দেবতার অবতার রাজার অপেক্ষাও বিদ্বান্‌কে উচ্চ-আসন-প্রদান দ্যা-বিলাস ভারতবর্ষেই সম্ভবে। আর নীতিশাস্ত্রকার চাণক্যের এই থার যাথার্থ্য বর্ত্তমানকালে যেরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে, বোধ হয়, তাঁহার ীবিতকালে সেরূপ হয় নাই। জেতার—নৃপতির নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় থাকে াত্র, বিদ্বানের নাম সর্ব্বত্র সমাদৃত। সঞ্জীবচন্দ্র সত্যই বলিয়াছেন,— বক্রমাদিত্যের এক্ষণে সিংহদ্বারের ভগ্নাংশমাত্র আছে, কিন্তু গরিব ালিদাসের "শকুন্তলা" অদ্যাপি নবপ্রস্ফুটিত কাননকুসুমের ন্যায় সদ্যস্ক; র্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর ও দিগন্তব্যাপী।'

হাঙ্গেরীর প্রসিদ্ধ উপন্যাসিক জোকাই এক স্থলে চিত্রকরের কথায় লিয়াছেন,—'শিল্পীই যথার্থ সুখী, নির্ব্বাসনে তাঁহার ভয় নাই, সর্ব্ব দেশই াহার গৃহ। বিদেশী ভাষায় তাঁহার অসুবিধা নাই, তাঁহার চিন্তা যে রূপে আত্মপ্রকাশ করে, সে রূপ সর্ব্বজনবোধ্য।' জোকাই চিত্রকলাবিদের কীর্ত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে সকল শিল্পকীর্ত্তি সম্বন্ধেই তাহা বলা যাইতে পারে; সাহিত্যিক কীর্ত্তি সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার ও সভ্যতার ফলে বিজ্ঞান প্রাকৃতিক শক্তিকে মানবের কার্য্যোপযোগী করিয়াছে; দূরত্বের ব্যবধান দূর করিয়াছে; সমগ্র মানব াতির উদ্রিক্ত জ্ঞানপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য সকল শিল্পীর—সকল

1243

সাহিত্যিকের সৌন্দর্য্যসৃষ্টি সর্ব্বজনের গোচর করিতে প্রয়াস পাইতেছে তাই আজ বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজিত। মধুপ যেমন সকল ফুলের মধু আহ করিয়া আপনার মধুচক্র পরিপূর্ণ করে, যুরোপীয়গণ তেমনই সং সাহিত্যের সুন্দর সৃষ্টি আনিয়া আপনাদের সাহিত্যের সমৃদ্ধিবর্দ্ধনের চে করেন। সেই চেষ্টার ফলে সংস্কৃত সাহিত্য আজ জগতে সমাদৃত,—ে চেষ্টার ফলে সংস্কৃত সাহিত্যের পুনরুদ্ধার হইয়াছে বলিলেও বোধ অত্যুক্তি হইবে না।

বর্ত্তমান ভারত ইংরাজের অমর কীর্ত্তি। নবীনচন্দ্রের ভাষায় আম ইংরাজকে বলিতে পারি,—ভারতে—

'তোমার ইঙ্গিতে দেশদেশান্তরে
আপনি বিদ্যুৎ বহে সমাচার;
তব পরশনে চলে রোষভরে
বাষ্পীয় বাহন ছাড়িয়া হুঙ্কার।'

কিন্তু ভারতে ইংরাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি দেশে শান্তি-সংস্থাপন করিয়া ধন প্র নিরাপদ করা। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইংরাজের আবির্ভাবকা মুসলমান সাম্রাজ্যের চিতানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে—সেই শ্মশানালোে দিক্‌চক্রবাল অমঙ্গলরক্তাভারঞ্জিত; চারি দিকে অত্যাচার, অনাচা অবিচার, হাহাকার। আর আজ—

'শুভ্র গঙ্গা বহি যায় রক্তবিন্দু নাহি তা'য়
শ্যামল যমুনা—নিরমল;
দেখিলে জুড়ায় নেত্র স্বর্ণকান্তি শস্য-ক্ষেত্র
আগে যেথা ছিল রণস্থল।'

এই দেশব্যাপিনী শান্তি ইংরাজের বিরাট কীর্ত্তি; কিন্তু এই শান্তিজ্যোৎস্ন লোকে যে বহু প্রাদেশিক সাহিত্য বিকশিত হইয়াছে, সে সকলকে আম ভারতে ইংরাজের বিরাটতর কীর্ত্তি বলিয়া মনে করি। এই সকল সাহিত্যে ও বিজ্ঞানের সাহায্যে দেশে জ্ঞানের বিস্তার হইয়াছে ও হইতেছে, নূতন সত্য ও নূতন ভাব প্রচারিত হইতেছে, উন্নতির পথ মুক্ত হইতেছে। বর্ত্তমান বহুসম্পদসম্পন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য এই শান্তিজ্যোৎস্নালোকেই বিকশিত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বের শেষদশায় দেশব্যাপিনী অশান্তির প্রলয়মূ অন্ধকারে তাহার বিকাশ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর বাঙ্গা গদ্যের যে দ্রুত পরিণতি হইয়াছে, তাহা একান্তই বিস্ময়কর।

এই বাঙ্গালা সাহিত্যে যাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই, কেবল যাঁহাকেই সকল বাঙ্গালী সাহিত্যিক সাহিত্য-সম্রাট বলিয়া ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, সেই অক্ষয়সাহিত্যকীর্ত্তি বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশে যেরূপ সমাদৃত হইয়াছেন, তাহাতে চাণক্যের কথাই আমাদের মনে পড়ে।

কেহ কেহ বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে অনুকরণের চিহ্ন দেখিয়া তাহাকে অবহেলাযোগ্য বিবেচনা করেন। এই অনুকরণের আভাসে বিস্মিত বা লজ্জিত হইবার কারণ নাই। সমালোচক গস্ সত্যই বলিয়াছেন, যখনই কোনও ভাষা আপনাকে কোনও প্রাচীন ভাষার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-বন্ধন হইতে বিচ্যুত করিয়া নূতন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করে, তখনই প্রথমে তাহাতে অনুকরণের ছায়াপাত অনিবার্য্য; পুরাতনকে পরিহার করিয়া নূতনকে গ্রহণ করিতে গিয়াই ইহার মৌলিকতা স্বপ্রকাশ হয়; বিশেষতঃ পরকীয় আদর্শকে নিজস্ব করিয়া লওয়াতেই ইহার শক্তির পরিচয়।

যে উপন্যাসকে অবলম্বন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষাকে সর্ব্বভাব-প্রকাশক্ষম ও সর্ব্বজনসমাদৃত করিয়াছিলেন, সে উপন্যাসের আদর্শ যে তিনি ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী প্যারীচাঁদ মিত্র ইংরাজী হইতে পাইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংলণ্ডে নাটকের যেরূপ উন্নতি ও আদর হইয়াছিল, রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংলণ্ডে উপন্যাসের সেইরূপ উন্নতি ও আদর হইয়াছিল। প্যারীচাঁদ ও বঙ্কিমচন্দ্র উভয়েই ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ছিলেন;—উভয়েই ইংরাজী রচনায় বিশেষ দক্ষ ছিলেন। উভয়েই "কলিকাতা রিভিউ" পত্রের লেখক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস ইংরাজীতে লিখিত। বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—বাঙ্গালা অপেক্ষা ইংরাজী লেখা ও বলা তাঁহার পক্ষে অধিক সহজসাধ্য। তাঁহার প্রথম তিনখানি উপন্যাসের জন্য তিনি যে ইংরাজী সাহিত্যের নিকট ঋণী, সে কথাও বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন।

১২৭৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গদর্শনে'র 'পত্র-সূচনা'য় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন :—

"যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ বা সাময়িকপত্রপ্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বিশেষ দুরদৃষ্ট। তাঁহারা যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাদিগের রচনা-পাঠে বিমুখ। ইংরাজিপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান আছে যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা ভাষায় লেখক-মাত্রেই হয় ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপি-কৌশল-শূন্য; নয় ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদের

বিশ্বাস যে, যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় ত অপাঠ্য, নয় ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়ামাত্র ; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি ? * * * * * লেখাপড়ার কথা দূরে থাক্, এখন নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কাজই বাঙ্গালায় হয় না। বিদ্যালোচনা ইংরাজিতে। সাধারণের কাজ, মিটিং, লেক্‌চর, এড্রেস, প্রোসিডিংস, সমুদায় ইংরাজিতে। যদি উভয় পক্ষ ইংরাজি জানেন, তবে কথোপকথনও ইংরাজিতেই হয়, কখন ষোল আনা, কখন বার আনা ইংরাজি। কথোপকথন যাহাই হউক, পত্র লেখা কখনই বাঙ্গালায় হয় না। আমরা কখন দেখি নাই যে, যেখানে উভয় পক্ষ ইংরাজির কিছু জানেন, সেখানে বাঙ্গালায় পত্র লেখা হইয়াছে। আমাদিগের এমনও ভরসা আছে যে, অগৌণে দুর্গোৎসবের মন্ত্রাদি ইংরাজিতে পঠিত হইবে।'

এই অবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—'ইহাতে কিছুই বিস্ময়ের বিষয় নাই। ইংরাজি একে রাজভাষা, অর্থোপার্জ্জনের ভাষা, তাহাতে আবার বহুবিদ্যার আধার। এক্ষণে আমাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের একমাত্র সোপান ; এবং বাঙ্গালীরা তাহার আশৈশব অনুশীলন করিয়া দ্বিতীয় মাতৃভাষার স্থলভুক্ত করিয়াছেন। বিশেষ ইংরাজিতে না বলিলে ইংরাজে বুঝে না ; ইংরাজে না বুঝিলে ইংরাজের নিকট মান মর্য্যাদা হয় না ; ইংরাজের কাছে মানমর্য্যাদা না থাকিলে কোথাও থাকে না, অথবা থাকা না থাকা সমান। ইংরাজ যাহা না শুনিল, সে অরণ্যে রোদন ; ইংরাজ যাহা না দেখিল, তাহা ভস্মে ঘৃত। আমরা ইংরাজি বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এদেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজি শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্ত-রত্নপ্রসূতি ইংরাজি ভাষার যত অনুশীলন হয়, ততই ভাল। আরও বলি, সমাজের মঙ্গল জন্য কতকগুলি সামাজিক কার্য্য রাজপুরুষদিগের ভাষাতেই সম্পন্ন হওয়াও আবশ্যক। আমাদিগের এমন অনেকগুলি কথা আছে, যাহা রাজপুরুষদিগকে বুঝাইতে হইবে। সে সকল কথা ইংরাজিতেই বক্তব্য। এমন অনেক কথা আছে, যে তাহা কেবল বাঙ্গালীর জন্য নহে ; সমস্ত ভারতবর্ষ তাহার শ্রোতা হওয়া উচিত। সে সকল কথা ইংরাজিতে না বলিলে, সমগ্র ভারতবর্ষ বুঝিবে কেন ? ভারতবর্ষীয় নানা জাতি একমত, একপরামর্শী, একোদ্যোগী না হইলে, ভারতবর্ষের উন্নতি নাই। এই মতৈক্য, এক-পরামর্শিত্ব, একোদ্যম, কেবল ইংরাজির দ্বারা সাধনীয় ; কেন না, এখন সংস্কৃত লুপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পঞ্জাবী, ইহাদিগের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজি ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব যত দূর ইংরাজি চলা আবশ্যক, তত দূর চলুক। কিন্তু একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান, এবং অনেক সুখে সুখী ; যদি এই তিন কোটী বাঙ্গালী হঠাৎ তিন কোটী ইংরাজ হইতে পারিত, তবে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই ; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরা[illegible] কহি, বা যত ইংরাজি লিখি না কেন, ইংরাজি কেবল আমাদিগের মৃত সিংহের চর্ম্মস্বরূপ হই[illegible] মাত্র। ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব। পাঁচ সাত হাজার নকল ইংরাজ ভিন্ন তিন কো[illegible] সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্টী পিতল হইতে খাঁটি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী সুন্[illegible]

মূর্ত্তি অপেক্ষা কুৎসিতা বঙ্গনারী জীবনযাত্রার সুসহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটী বাঙ্গালী স্পৃহনীয়। ইংরাজি লেখক, ইংরাজি বাচক সম্প্রদায় হইতে নকল ইংরাজ ভিন্ন কখন খাঁটী বাঙ্গালীর সমুদ্ভবের সম্ভাবনা নাই। যতদিন না সুশিক্ষিত জ্ঞানবন্ত বাঙ্গালীরা বাঙ্গালা ভাষায় আপন উক্তি সকল বিন্যস্ত করিবেন, ততদিন বাঙ্গালীর উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই।"

কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাবলে বঙ্কিমচন্দ্র অল্পকালমধ্যেই বাঙ্গালা ভাষাকে এরূপ সমাদৃত করিয়াছিলেন যে, 'বঙ্গদর্শন'-প্রচারের চতুর্দ্দশ বৎসর পরে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিত্বের সমালোচনা করিতে যাইয়া, বাঙ্গালাকে যে সকল বাঙ্গালী ঘৃণা করে, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন ঃ—

'আজিও না কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে, যে তাহার অনুশীলন করে, তাহাকেও ঘৃণা করে, এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজীনবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া, আপনার গৌরববৃদ্ধির চেষ্টা পায়।'

অল্পকাল মধ্যে যে বঙ্কিমচন্দ্রের এরূপ বলিতে পারিবার সাহসের কারণ ঘটিয়াছিল, তাহা আমাদিগের গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু আরও গৌরবের বিষয় এই যে, যে ইংরাজের সাহিত্যে মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালী সম্প্রদায় বাঙ্গালা সাহিত্যকে অবজ্ঞা করিতেন, অত্যল্পকালমধ্যে সেই ইংরাজের নিকট বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থ বিশেষ আদৃত হয়। যে বৎসর 'বঙ্গদর্শনে' উদ্ধৃত উক্তি প্রকাশিত হয়, সেই বৎসরের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'বিষবৃক্ষ' একাদশ বৎসরের মধ্যে এক জন ইংরাজ-মহিলা কর্ত্তৃক ইংরাজীতে অনূদিত হইয়া ইংরাজী-পাঠক-সমাজের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনেকগুলি উপন্যাস ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে। 'কপালকুণ্ডলা' ইংরাজীতে অনূদিত হইবার এক বৎসর পরেই ক্লেম (Klemm) কর্ত্তৃক জর্ম্মান ভাষায় অনূদিত হয়। ইংরাজী-পাঠক-সমাজে যে এই সকল পুস্তক সমাদৃত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই যে, ইংরাজ কর্ত্তৃক অনূদিত গ্রন্থগুলি ইহার মধ্যেই দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে; এমন কি, বাঙ্গালীর কৃত অনুবাদগ্রন্থগুলিও—ভাষার ত্রুটী সত্ত্বেও - ইংরাজী-পাঠক-সমাজে প্রচারিত হইয়াছে।

এই স্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। 'বিষবৃক্ষ' ইংরাজীতে অনূদিত হইবার ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ব্বে, 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইবার নয় বৎসরের মধ্যে, তাহার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া অধ্যাপক কাওয়েল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'ম্যাকমিলান্স্ ম্যাগাজিন' পত্রে তাহার সুদীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশ করেন। এই সমালোচনা-পাঠে ইংরাজ পাঠক-সমাজ প্রথম জানিতে পারেন, ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাঙ্গালায় এক জন প্রতিভাশালী ঔপন্যাসিকের

আবির্ভাব হইয়াছে। সেই সময় হইতেই তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার রসাস্বাদনে উৎসুক হইয়াছিলেন।

এই সমালোচনায় অধ্যাপক কাওয়েল বলিয়াছিলেন,—ভারতবর্ষ উপন্যাসের জন্মভূমি। মধ্যযুগের য়ুরোপীয় গল্পের অর্দ্ধাংশ ভারতে উৎপন্ন হইয়া শত অদৃশ্য পথে আসিয়া প্রতীচ্য সাহিত্যে উপনীত হইয়াছিল। য়ুরোপে প্রতিভাশালী আধুনিক লেখকগণের রচনার প্রদীপ্ত জ্যোতিঃতে প্রাচীন রচনা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানকালে কখনও কখনও সেই সকল প্রাচীন 'কথা' দেখা যায় বটে, কিন্তু পরিবর্ত্তন-প্রাবল্যে তাহাদের স্বরূপ আর থাকিতে পারে না। ভারতে এরূপ ঘটে নাই। ভারতে জনসাধারণের নিকট আজও পুরাতন গল্প সমাদৃত। তাই ভারতে উপন্যাস রচনা করিতে হইলে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। ভারতবর্ষে গল্প বলিতে হইলেই ব্রতপালনফলে নিঃসন্তান নৃপতির অতুলনীয় পুত্রলাভের কথা বলিতে হয়; রাজকুমারীমাত্রকেই স্বয়ংবর-সভায় পতিনির্ব্বাচন করিতে হয়; আর সকল গল্পেই জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস হইতে সহজে সমুদ্ভূত ঐন্দ্রজালিক পরিবর্ত্তন থাকা অত্যাবশ্যক। অল্প দিন হইতে ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বাঙ্গালায়, হিন্দু লেখকগণ বিষয়-নির্ব্বাচনে এই সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করিয়া উপকথার ও অবাস্তবের পরিবর্ত্তে বাস্তব জীবনেরও ইতিহাসের ঘটনা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কয় বৎসর পূর্ব্বে এক জন কবি রাজপুতের শৌর্য্য-কথা লইয়া কাব্যরচনা করিয়াছিলেন। আর আলোচ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসে বাঙ্গালী গ্রন্থকার পৌরাণিক যুগ পরিহার করিয়া সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের ঘটনা লইয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। ইহাতে ইন্দ্রজালাদির ছায়ামাত্র নাই; পরন্তু মানবের মনোবৃত্তি ও প্রতিকূল ঘটনার সহিত সংগ্রাম লইয়াই এ গ্রন্থ রচিত। ইহার মধ্যে পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণের প্রকাশ আবশ্যক হইয়াছে; ইহাতেই বুঝা যায়, এ পুস্তক পাঠকসমাজে সমাদৃত হইয়াছে; এই পুস্তক বাঙ্গালায় এক অভিনব সাহিত্যের পূর্ব্বগামী হইবে, এ আশা করা যাইতে পারে। এই পুস্তক ভারতে ইংরাজী শিক্ষার ফল। এক দল লোক বলিয়া থাকেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষায় কেবল নিপুণ অনুকরণ-যন্ত্রমাত্র নির্ম্মিত হয়; ছাত্রগণ পরীক্ষায় অপরিপক্ক সংস্কারের পুনরাবৃত্তিমাত্র করিতে পারে, তাহাদের মৌলিকতা নাই। তাহাদিগকে উত্তরীয়ধারী পুস্তকমাত্র বলা যায়। বর্ত্তমান গ্রন্থে সে ধারণা উন্মূলিত হইবে। যে দুই জন ছাত্র প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, গ্রন্থকার তাঁহাদের এক জন। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। তিনি কয়খানি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন; তাহার মধ্যে আলোচ্য পুস্তকখানি বিশেষ সমাদৃত। ইংলণ্ডেও ইহা আলোচনার যোগ্য; কারণ, ইহা ইংরাজী ঐতিহাসিক উপন্যাস ভারতে রোপণ করিবার চেষ্টার প্রথম ফল। পুস্তকের বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিশেষত্বব্যঞ্জক। স্থানে স্থানে প্রতীচ্য প্রভাব লক্ষ্য করা যায়; গ্রন্থকার নিশ্চয় কুপারের ও স্কটের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নকলনবীশমাত্র নহেন। উপন্যাস-বর্ণিত দৃশ্য ও ব্যক্তি—সবই ভারতীয়। আর সেই জন্যই পুস্তকখানি এরূপ সমাদৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার গ্রন্থে আকবরের শাসনকালের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন; হিন্দুস্থানে আর কোনও সম্রাট আকবরের মত সুপরিচিত নহেন। * * * বঙ্গ ও ও উড়িষ্যা বহু দিন পাঠানের অধীন ছিল—আকবর তাহাদিগকে জয় করেন। এই ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া 'দুর্গেশনন্দিনী' রচিত।

ইংরাজ পাঠক-সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম পরিচয়।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী মিরিয়ম নাইট্ 'বিষবৃক্ষে'র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহার পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সার উইলিয়ম হার্সেল 'বিষবৃক্ষে'র অনুবাদ করিবেন, ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু মিসেস নাইট্ সে কার্য্যে প্রবৃত্তা হইবেন জানিতে পারিয়া তিনি সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। এই অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় ইংরাজী সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ 'লাইট্ অফ্ এসিয়া'র গ্রন্থকার, কবি সার এড্উইন আর্ণল্ড বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার বিশেষ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, তিনি কর্ত্তব্যবোধে 'বিষবৃক্ষে'র ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু লেখকের বর্ণনাগুণে, চরিত্র-বিশ্লেষণনৈপুণ্যে ও ভারতীয় পরিবারের যথাযথ চিত্রাঙ্কনক্ষমতায়—সে কার্য্য সত্য সত্যই সানন্দে সম্পন্ন হইয়াছিল। সার এড্উইন আর্ণল্ড্ বলিয়াছেন,—'বিষবৃক্ষে'র গ্রন্থকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অসাধারণ মনীষা-সম্পন্ন বাঙ্গালী, তিনি বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁহার যথাযথ বর্ণনাগুণে মুগ্ধ বাঙ্গালী পাঠকসমাজে তাঁহার 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'মৃণালিনী' ও 'বিষবৃক্ষ' বিশেষ আদৃত। * * * * বঙ্কিমচন্দ্র সমাদরের যোগ্য। তিনি প্রকৃত প্রতিভাশালী। তাঁহার সৃষ্টিশক্তি ও পূত উদ্দেশ্য সাহিত্যের নবযুগে উন্নতির সূচনা করিতেছে। * * * এই পুস্তকে হিন্দু রমণীর কোমলতার ও পতিভক্তির যে যথাযথ চিত্র চিত্রিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ-

ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতীচ্যখণ্ডে লোকে মনে করে, ভারতে বরবধূর সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া বাল্যেই তাহাদিগের পরিণয় সম্পন্ন হওয়ায় দাম্পত্য-প্রেম বা দাম্পত্য-সুখ অসম্ভব। কিন্তু সচরাচর ইহার বিপরীত দৃষ্টান্তই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিকাংশ হিন্দু পরিবারে শান্ত সুখ, অবিচলিত প্রেম ও সীমাহীন পতিভক্তি ও বাৎসল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রতীচ্য মহিলার পক্ষে সূর্য্যমুখীর মত স্বার্থত্যাগ অসম্ভব; কিন্তু প্রাচ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত আদৌ অসম্ভব নহে।

'বিষবৃক্ষে'র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইবার এক বৎসর পরে 'কপালকুণ্ডলা'র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। মিষ্টার ফিলিপ্স্ এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের ভূমিকায় তিনি বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকদিগের সম্বন্ধে একটি অনতিদীর্ঘ প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন,—সাহিত্যের হিসাবে ভারতের প্রাদেশিক ভাষায় পাঠ্যযোগ্য বিশেষ কিছু নাই; এই সকলের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষাই সাহিত্যিক হিসাবে শ্রেষ্ঠ। ইংরাজশাসনে বাঙ্গালার বহুবিধ উন্নতির উল্লেখ করিয়া লেখক বলিয়াছেন, দুই বিপরীতমুখগামিনী সভ্যতার সংঘাতে যে সাহিত্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে 'বর্ণশঙ্কর' বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালা উপন্যাস বিদেশের আমদানী। কিন্তু অপদার্থ মৌলিক রচনার অপেক্ষা অপূর্ণতাপ্রাপ্ত অনুকরণ শ্রেয়ঃ। এ সব সাধারণ কথা। প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত ও তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্বন্ধে এ কথা প্রয়োজ্য নহে। তাঁহারা এ নিয়মের ব্যতিক্রম। * * * * 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। তিনি ইংরাজী উপন্যাস হইতে যথেষ্টপরিমাণে গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার প্রচুর মৌলিকতা থাকায়, তিনি কেবল অনুকরণকারিমাত্র হয়েন নাই। তাঁহার কোনও কোনও উপন্যাসে পারিবারিক জীবনের যথাযথ চিত্র চিত্রিত হইয়াছে। * * বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য ইঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। তিনি বঙ্গভাষাকে বহুভাবপ্রকাশক্ষম করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাপ্রণালী সত্বশালী, সুতীক্ষ্ণ ও প্রাঞ্জল। তিনি এক দিকে যেমন পূর্ব্বপ্রচলিত বাগাড়ম্বরবহুল রচনাপ্রণালী পরিহার করিয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনই প্যারীচাঁদ মিত্রের সরল কিন্তু নিরাভরণ রচনাপ্রণালীকেও সংস্কৃত ও সুন্দর করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, 'কপালকুণ্ডলা'র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইবার এক বৎসর পরেই তাহার জর্ম্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

তাহার পর ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী মিরিয়ম নাইট্ 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ-গ্রন্থের ভূমিকায় অধ্যাপক ব্লুমহার্ট বলিয়াছিলেন,—বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। আর কোনও লেখক তাঁহার মত রচনাপ্রণালীর উন্নতিসংসাধন ও বাঙ্গালা সাহিত্যের সমৃদ্ধিসাধন করিতে পারেন নাই। তাঁহার কৃত অপরের অসার রচনার তীব্র সমালোচনা, হিন্দু সমাজের ক্রটীপ্রদর্শন, দুষ্ট হিন্দুধর্ম্মোদ্ভূত অমঙ্গলের বর্ণন—এই সকলের ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার রচনা শক্তিশালিনী। তাঁহার পুস্তকে বিস্ময়কর বর্ণনাশক্তি ও মানবজীবনের ও চরিত্রের বিশ্লেষণক্ষমতা দৃষ্ট হয়। * * * * জীবনের সায়াহ্নে বঙ্কিমচন্দ্র সংস্কৃত হিন্দু ধর্ম্মের ও 'ভগবদ্গীতা'র সমুচ্চ দার্শনিক তত্ত্বের প্রচারক হইয়াছিলেন। * * * 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র উদ্দেশ্য,—হিন্দু সমাজের উন্নতিসংসাধন ও জীবনের সর্ব্বকার্য্যে ধর্ম্মে নির্ভর করিবার শিক্ষাপ্রদান।

যুরোপীয় জাতি সকলের জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যুরোপীয় পণ্ডিতগণের চেষ্টায় সংস্কৃত সাহিত্য আজ সর্ব্বত্র সমাদৃত। 'ঋগ্বেদ' হইতে 'চৌরপঞ্চাশিকা' পর্য্যন্ত কত সংস্কৃত পুস্তক যে যুরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, তাহা সহজে নির্ণয় করাই কঠিন। ফরাসী দার্শনিক টেন যেমন ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, অধ্যাপক ম্যাকডনেল তেমনই সংস্কৃত সাহিত্যের ও মিষ্টার হরোউইজ ও মিষ্টার ফ্রেজার ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন।

মিষ্টার ফ্রেজার তাঁহার পুস্তকে মুক্তকণ্ঠে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস প্রতীচ্যপ্রভাবে উৎপন্ন হইলেও, সর্ব্বতোভাবে প্রাচ্য। * * বঙ্কিমচন্দ্র নবাবঙ্গের প্রথম ও প্রধান সৃষ্টিকরী প্রতিভার অধীশ্বর। সৃষ্টি শিল্পে তিনি তুলসীদাসের অপেক্ষাও উচ্চ আসনের অধিকারী। তাঁহাকে কেবল প্রতীচ্য প্রভাবে উদ্ভূত বলিলে, তিনি তাঁহার দেশের কাব্যসাহিত্যে পূর্ব্বপুরুষদিগের অর্জ্জিত ও সম্ভূত যে ধনভাণ্ডার লাভ করিয়াছিলেন, তাহাকে অবহেলা করা হয়—কিন্তু তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলনে কি সুফল ফলিতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার দৃষ্টান্ত। যদি ভারতে প্রতীচ্য সভ্যতার সকল পার্থিব চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়, তথাপি রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তরু দত্ত ও তেলাং—ইহাদিগের নাম ভারতে ইংরাজের কালবিজয়িনী কীর্ত্তিরূপে কালবক্ষ উজ্জ্বল করিয়া বর্ত্তমান থাকিবে।

'কপালকুণ্ডলা'র কথায় মিষ্টার ফ্রেজার বলিয়াছেন, ইহাতে কোথাও বাহুল্য নাই, কোথাও চেষ্টার চিহ্ন লক্ষিত হয় না; যেন নিপুণ শিল্পী অকম্পিত করে অস্ত্রধারণ করিয়া অনিন্দ্যসুন্দর মূর্ত্তি ক্ষোদিত করিতেছেন। 'Mariage de Loti' ব্যতীত সমগ্র পাশ্চাত্য সাহিত্যে 'কপালকুণ্ডলা'র সহিত আর কোনও পুস্তকের তুলনা হয় না।

মিষ্টার ফ্রেজার বলেন, যাঁহারা ভারতবাসীর জীবন, চিন্তা, অনুভূতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু জানিতে চাহেন, তাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের মত শিক্ষক আর পাইবেন না। তাঁহার সুদীর্ঘ আলোচনা হইতে আমরা কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

'The whole course of England's mission is calmly to note the power of the old, mark its failing strength, and graft any of its lasting principles of vitality on to new ideals. Nowhere better than in the novels of Bankim Chandra Chatterji can the full force of this strife between old and new be traced. * * * * The English reader must not be surprised if in the novels of the greatest novelist India has seen, there is much of Eastern form, much of poetic fancy and spiritual mysticism alien to a Western craving for objective realism. Bankim Chandra Chatterji, with all the insight of Eastern poetic genius, with all the artistic delicacy of touch so easily attained by the subtle detness of a high-caste native of India, or a Pierre Loti, weaves a fine-spun drama of life, fashioning his characters and painting their surroundings with the same gentle touch, as though his fingers worked amid the frail petals of some flower, or moved along the lines of fine silk, to frame therewith a texture as unsubstantial as the dreamy fancies with which all life is woven, as warp and woof.'

মিষ্টার ফ্রেজার সত্যই বলিয়াছেন, ভারতে প্রতীচ্য সভ্যতার সকল পার্থিব নিদর্শন যদি বিলুপ্ত হইয়া যায়, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির নামই ভারতে ইংরাজের অক্ষয়কীর্ত্তি রূপে বর্ত্তমান থাকিবে। এই সকল প্রতিভাশালী ভারতবাসীর প্রতিভা ইংরাজাধিকৃত ভারতে শান্তির স্নিগ্ধ ছায়ায়, ইংরাজী শিক্ষার ফলে, ইংরাজী সাহিত্যের সহিত পরিচয়বশতঃ বিকশিত হইয়

সৌন্দর্য্য ও সৌরভ বিস্তার করিয়াছে। আবার ইংরাজ সাহিত্যিকগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতার ঋণের পরিমাণ হয় না। এক সময় শ্রীরামপুরে ইংরাজ কর্তৃক বাঙ্গালা গদ্যের লালন ও পালন সম্পন্ন হইয়াছে; বাঙ্গালা পুস্তক "লণ্ডন নগরে চাপা" হইয়াছে। তাহার পর সেই সাহিত্যের বহু গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া গুণগ্রাহী ইংরাজ সাহিত্য-প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সাহিত্যকে উৎসাহিত করিয়াছেন; চাণক্যের সেই কথাই বুঝাইয়াছেন :—

'বিদ্বত্বং চ নৃপত্বং চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥'

আজ কেবল বাঙ্গালীই বাঙ্গালা গ্রন্থের পাঠক নহেন, পরন্তু প্রতিভাবান গ্রন্থকারের গ্রন্থের পাঠক দুস্তর সাগরের পারে ও দুরারোহ গিরির অপর পার্শ্বে—জগতে সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ইহা বাঙ্গালী লেখকের পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে—এই সৌভাগ্য যে তাঁহাকে নিত্য নূতন অনিন্দ্য-সুন্দর সৌন্দর্য্যের রচনায় প্রবৃত্ত করিবে, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

'কপালকুণ্ডলা'র ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধে মিষ্টার ফিলিপ্স বলিয়াছেন, ইতিহাসের ও কবিতার অপেক্ষা উপন্যাসের অনেক সুবিধা আছে। উপন্যাসে বর্ণিত যুগের আচার ব্যবহার, বেশভূষা জানিতে পারা যায়। এ বিষয়ে বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকের অনেক কার্য্য অবশিষ্ট আছে। তাঁহারা যদি বাঙ্গালার গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনের বর্ণনা করেন; বাসগৃহ, দেবমন্দির, বেশ ভূষা, তৈজসপত্র চিত্রিত করেন; ভূস্বামীর সহিত প্রজার সম্বন্ধ, মোকর্দ্দমা, ঋণদায়, ব্যাধি, হিন্দুবিধবার আত্মত্যাগ প্রভৃতি উপন্যাসের বিষয় করেন—তবে তাঁহাদিগের উপন্যাস বিশেষ সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। মিষ্টার ফ্রেজারও বলিয়াছেন, বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিকের ব্যবহারোপযোগী স্তূপীকৃত উপাদান এখনও অব্যবহৃতই রহিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাদের পথপ্রদর্শক;—তিনি সে সকল উপাদানের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রের কথা বলিতে যাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন :—'তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,--তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা

চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।”—প্যারীচাঁদ মিত্রই প্রথম ইহা দেখাইয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু তাঁহার প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল ও অপর অংশ ম্লান থাকায় সকলে তাহা দেখে নাই—সকলে তাহা বুঝে নাই। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম স্বীয় কৃত কর্ম্ম দ্বারা বাঙ্গালীকে ও সভ্য জগতকে বুঝাইলেন, বাঙ্গালীর ঘরে সাহিত্যের যে উপাদান বিদ্যমান, তাহা লইয়া প্রকৃত প্রতিভা অলৌকিক সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে পারে ; সে সৌন্দর্য্য বিশ্ববাসীর আনন্দদায়ক হইতে পারে। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিককে ব্যবহারোপযোগী প্রচুর উপাদানের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালী ইংরাজী উপন্যাসের সহিত ও ইংরাজীর সহায়তায়, —যে ফরাসী উপন্যাস সূক্ষ্ম শিল্পে, বিশ্লেষণ-নৈপুণ্যে ও বর্ণ বৈচিত্র্য ইংরাজী উপন্যাসকে নিষ্প্রভ করিয়াছে,—তাহার সহিত পরিচিত হইয়াছে। ইহার মধ্যেই সে পরিচয়ের সুফল ফলিতেছে। বাঙ্গালায় ছোট গল্প এই পরিচয়ের ফল। ছোট গল্পের রচনায় অতি অল্পসংখ্যক ইংরাজ লেখক সফল হইয়াছেন ; কিন্তু মোঁপাসা, ডোডে, বলজাক প্রভৃতি বহু ফরাসী লেখকের ছোট গল্প হীরকের ন্যায় সুন্দর ও সমুজ্জ্বল। ইংরাজী শিক্ষার ফলে এই সকল লেখকের রচনার সহিত বাঙ্গালী লেখকের পরিচয় হইয়াছে।

আশা করি, বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদর্শিত উপাদানের সদ্ব্যবহার করিয়া বিদেশের লেখকদিগের অসাধারণ সাফল্যের কারণসন্ধানে সফল হইয়া আমাদের ঘরের সামগ্রী লইয়া যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিবেন, তাহার সৌন্দর্য্য কেবল আমাদেরই ঘর সুন্দর করিবে না ; পরন্তু পরকেও আকৃষ্ট ও বিস্মিত করিবে—পরেরও প্রশংসা লাভ করিবে।

বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্য এখনও সবল, সক্রিয়, উন্নতিপথারূঢ়। সুতরাং এখন তাহার ভবিষ্যৎ গতি ও প্রকৃতির নির্ণয় অসম্ভব। তবে আমাদের আশা আছে, বাঙ্গালার যে ভবিষ্যৎ ঔপন্যাসিক বাঙ্গালীর সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সুখ, দুঃখ, আনন্দ, আশা,—চিত্রিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ললাটে গৌরবের সমুজ্জ্বল টীকা অঙ্কিত করিয়া দিবেন—তিনি মনে রাখিবেন, বাঙ্গালার প্রথম ঔপন্যাসিক প্যারীচাঁদ ও প্রধান ঔপন্যাসিক

বঙ্কিমচন্দ্র কেবল পাঠকদিগের চিত্তরঞ্জনের জন্য, কেবল তাঁহাদিগের আনন্দবিধানের জন্য উপন্যাস রচনা করেন নাই, পরন্তু তাঁহারা উপন্যাসের উচ্চ আদর্শ ও মহান উদ্দেশ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন! মনে রাখিবেন, ব্রিমুলি বলিয়াছেন,—আমাদের জ্ঞানের ও উদারতার প্রসারসংসাধনই উপন্যাসের উদ্দেশ্য। এই কথা মনে রাখিলে, তাঁহারা বঙ্গবাসীর ও জগৎবাসীর চিত্তরঞ্জনে ও অবকাশযাপনে সহায়তার সঙ্গে সঙ্গে—পাঠক সাধারণের শিক্ষাবিধানও করিতে পারিবেন; আর চূতমুকুলগন্ধাকৃষ্ট ভ্রমরের মত সাহিত্য-সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট পাঠক-সম্প্রদায় চারি দিক হইতে আসিয়া তাঁহাদের সৃষ্ট সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া আপনাদের সৌন্দর্য্যপিপাসা পরিতৃপ্ত করিয়া ধন্য হইবেন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

বোধোদয়ের ব্যাখ্যা।

বহুকাল পূর্ব্বে স্বনামধন্য শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পঞ্চানন্দ অবতারে বোধোদয়ের সমালোচনা করিয়াছিলেন। উকীলের জেরার মুখে সাহিত্য-সমালোচনা একটা ঘোর বিড়ম্বনায় পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক। শাস্ত্রে—সংস্কৃত শ্লোকমাত্রই যে শাস্ত্র, ইহা বোধ হয় সকল হিন্দুসন্তানই জানেন—শাস্ত্রে এই জন্যই 'অরসিকে রসস্য নিবেদন' নিষিদ্ধ আছে, যাহাকে 'অস্যার্থঃ' করিয়া বলা হয়,—'রাখালের হাতে শালগ্রামের মরণ'। এইখানে তর্ক উঠিতে পারে, শালগ্রামের রস আছে কি না? এ কথার আর আমি কি উত্তর দিব? শীতকালে কলিকাতায় সকলেই ইহা হৃদয়ঙ্গম—শ্রীবিষ্ণুঃ রসনাঙ্গম করিয়াছেন। সংস্কৃত 'শালগ্রাম'ই যে পালি ভাষার ভিতর দিয়া আসাতে 'শালগম' আকার ধারণ করিয়াছে, বৌদ্ধ সুত্তনিকায়ে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে; আপনাদের বিশ্বাস না হয়, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ পি. এইচ্. ডি. মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানুন। ফলতঃ উকীল বাবু আইনের কূটতর্কে বোধোদয়ের অনেক গলদ বাহির করিয়াছেন। অদ্য আমি ছানির বিচারের প্রার্থী হইয়া আপনাদের নিকট উপস্থিত। কাব্য শাস্ত্রে আমার দখল ষোল আনা, কাব্যালোচনাই আমার জাত-ব্যবসা, শেক্ষপীয়র মিল্‌টন্ গুলিয়া খাইয়াছি। ব্রাহ্মণের

ছেলে হইয়া Bacon, Lambএর নাম ত রসনাগ্রে লইতে পারিব না। শেলী, ব্রাউনিং দুষ্ট সরস্বতীর স্থায় আমার স্কন্ধে নৃত্য করিতেছেন (নরীনৃত্যাতি), বায়রণ, টেনিসন আমার জপমালা। আমি যদি কাব্য না বুঝিব, তবে বুঝিবে কে? যাক্, আর অধিক বাগাড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। এক্ষণে প্রকৃত অনুসরণ করি।

বোধোদয় বস্তুপরিচয় শিখাইবার একখানি নীরস গ্রন্থ নহে; তাহার জন্য ত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের বস্তুবিচারই রহিয়াছে। যে লেখনী হইতে 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'সীতার বনবাস', 'প্রভাবতী-সম্ভাষণ' প্রসূত, যে লেখনী 'শকুন্তলা', 'উত্তররামচরিত' প্রভৃতি নাটকের সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণতৎপর, যে লেখনী 'বিধবাবিবাহ', 'বহুবিবাহ' প্রভৃতি রসাল-বিষয়-নির্ব্বাচনপটু, সে লেখনী কি কখনও কুলিশকঠোর শুষ্ক নীরস বিজ্ঞান-স্ত্রীডার-প্রণয়নে অগ্রসর হইতে পারে? (ইহাকেই বলে ব্যতিরেকমুখী প্রমাণ!) বাস্তবিক পক্ষে 'বোধোদয়' একখানি কাব্য, পরন্তু একখানি খণ্ডকাব্য। যে সকল শ্রোতা খণ্ডকাব্য কাহাকে বলে, জানেন না, তাঁহাদিগকে মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মেঘদূত-সমালোচনা একখণ্ড সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করি। যাঁহারা খাঁড়গুড় খাইয়াছেন, 'খণ্ডকাব্য' বুঝিতে তাঁহাদিগের বাধিবে না। অন্যান্য কাব্যে নব রস থাকে; 'বোধোদয়' খণ্ডকাব্য, পূর্ণ কাব্য নহে, কাজেই ইহাতে ছয় রস আছে। বিশ্বাস না হয়, পুস্তকের ৩৪ পৃষ্ঠা খুলিয়া 'জিহ্বা' বাহির করিয়া দেখুন। ইহাই হইল অন্বয়মুখী প্রমাণ!

অতএব সপ্রমাণ হইল যে, 'বোধোদয়' একখানি কাব্য। সংস্কৃত সাহিত্যে 'প্রবোধচন্দ্রোদয়', 'বীরমিত্রোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। মিলের খাতিরে মিল্‌টনের 'Tale of Troy, ডিকেন্‌সের Nicholas Knuckle-boy ও রুসীয় গ্রন্থকার Tolstoiএর নাম গ্রহণ করা যাইতে পারে। এক্ষণে প্রশ্ন—কাব্যখানির কেন এরূপ নামকরণ হইল;—স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, নায়ক নায়িকার নামে ইহার নামকরণ হইয়াছে;—নায়িকা 'বোধা' ও নায়ক 'উদয়'। রমণী জাতিকে সম্মান দেখাইবার জন্য নায়িকার নাম পূর্ব্বে যায়; যাহাকে সংস্কৃত ব্যাকরণে পূর্ব্বনিপাত বলে। এই নিয়ম সকল ভাষাতেই দেখা যায়; যেমন ইংরাজীতে

'মালতীমাধব', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', বাঙ্গালায় যুগলী-অঙ্গুরীয়ক, সম্ভা-বশতক। অনেকে সদ্ভাব-শতক ইত্যাকার অশুদ্ধ উচ্চারণ করেন। প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়া রাখি, এই সম্ভা প্রভা, বিভা, প্রতিভা প্রভৃতি সুন্দরীগণের কনিষ্ঠা, রম্ভার গর্ভজাতা। নায়ক 'বশতক' করটক দমনকের সাক্ষাৎ জ্যেঠতুত ভ্রাতা,— বন্ধুবর রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বহু অনুসন্ধানে স্থিরীকৃত করিয়াছেন। শেক্ষপীয়র সব সময়ে তাল ঠিক রাখিতে পারেন নাই, তাই লিখিয়া ফেলিয়াছেন, 'Romeo & Juliet', 'Antony and Cleopatra' ইত্যাদি; এই জন্যই ব্রাউনিং আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—'Did Shakespeare? If so, the less Shakespeare he!' (দেখিলেন আমার ইংরাজী সাহিত্যে অধিকার!)

সমালোচ্য গ্রন্থের নায়িকা 'বোধা' সম্ভবতঃ বৌদ্ধভিক্ষুণী, শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিষয়ক গ্রন্থ অনুসন্ধেয়। নায়ক শিলাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য (অস্তাদিত্যের জ্যেষ্ঠ), কি উদয়পুরের রাণা উদয় সিংহ, কি সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত রাজা উদয়ন, ('টের্লোপো ডিতি' এই সূত্রে নকারলোপ) কি প্রসিদ্ধ কুসুমাঞ্জলি নামধেয় অন্বর্থনামা কাব্যখানির প্রণেতা উদয়নাচার্য্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, তাহা সঠিক জানি না; সমস্যাপূরণের জন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই; তাম্রশাসন, উৎকীর্ণ লিপি, অথবা প্রাচীন পুঁথি দৃষ্টে তিনি অবশ্যই ইহার একটা কিনারা করিয়া দিতে পারিবেন। শেষোক্ত সিদ্ধান্তটি সমীচীন বলিয়া প্রমাণিত হইলে, এই 'আচার্য্য' উপাধিটির বেমালুম লোপে আপনারা উৎকণ্ঠিত হইবেন না। কোটপ্যান্টধারী সভ্য ইংরেজ যেমন হস্তদ্বয় কোথায় রাখিবেন ঠিক পান না, পশুরা যেমন লাঙ্গূল লইয়া শশব্যস্ত (ডার্ব্বিণতত্ত্বে উভয় দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ঐক্যসূত্র আছে), সেইরূপ এই আচার্য্য উপাধি লইয়া সময়ে সময়ে অনেক হাঙ্গামা ঘটে। ইহার কখনও পূর্ব্বনিপাত (যথা সুপণ্ডিত শ্রীযুত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের 'মায়াবাদ' পুস্তকে আচার্য্য-শঙ্কর), কখনও পরনিপাত (উদাহরণ অনাবশ্যক), এবং কখনও লোপ বা অত্যন্তাভাব ঘটে (আধুনিক দৃষ্টান্ত বিরল নহে)। এই ত গেল কাব্যের নামতত্ত্ব। মল্লিনাথ অভিজ্ঞানশকুন্তলের নাম লইয়া কত ঘনঘটা করিয়াছেন, আর দেখুন, আমি কত সহজে, কত অল্প কথায়, বোধোদয় নামের ব্যাখ্যা ও

বিশ্লেষণ করিলাম। এই মৌলিক গবেষণাত্মক প্রবন্ধটি পরিষৎ-পত্রিকার অতিরিক্ত সংখ্যায় মুদ্রিত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি করা অবশ্য-কর্ত্তব্য নহে কি?

গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদটি লইয়া শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেক রঙ্গরস করিয়াছেন। পাঠকেরাও ইহার একটা ভাসা ভাসা অর্থ বুঝেন। অথচ ইঁহারাই আবার বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের প্রথম পরিচ্ছেদ পড়িয়া ভাবে বিভোর হইয়া পড়েন। হায় রে পক্ষপাত! সে যে বামুন পণ্ডিত বিদ্যাসাগর, মাথা কামান, পায়ে তালতলার চটি; আর এ যে বঙ্কিম চট্টো, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট! কিন্তু সেই পাকা কলমের পাকা লেখা একবার প্রণিধান করিয়া পড়ুন দেখি। 'পদার্থ তিন প্রকার, চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্।' এই 'পদার্থ' জিনিসটা কি, একবার ভাবিয়া দেখিয়াছেন? এই পদার্থ, এই 'কিমপি বস্তু,' এই 'মহাদ্রব্যং,' কবি ও কাব্যের প্রধান উপজীব্য প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নহে। অপদার্থ বঙ্গীয় পাঠক ইহা বুঝিল না। এখন দেখুন দেখি—প্রেম তিনপ্রকার নহে কি? (১) চেতন, যে প্রেম ইচ্ছামত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমনাগমন করিতে পারে; 'যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে; যথা বসন্তসেনার প্রেম, শূর্পনখার প্রেম, বিষবৃক্ষের হীরার (ফুলের) প্রেম, আয়েষার নিশীথে বন্দিসহবাস, বিমলার 'নাথ! আমি অভিসারিণী, অভিসারে যাইতেছি'। আর কত দৃষ্টান্ত দিব? পূর্ণিমা-সম্মিলনে সম্মিলিত ভদ্রমণ্ডলীর প্রেম এই জাতীয়, উচিত কথা বলিব, ভয় ডর কি? তাঁহারা যখন ইচ্ছা সভামণ্ডপে আসিতে ও তথা হইতে প্রস্থান করিতে পারেন; ইহা স্বাধীনভর্ত্তৃকার প্রেম। (২) অচেতন, যাহার সংজ্ঞা নাই, সাড়া নাই, ডাকিলে উত্তর পাওয়া যায় না, 'নাড়িলে না নড়ে রামা, এ কেমন প্রেম?' যথা, বঙ্গগৃহে বালবধূর প্রেম (সভায় এই মধুমাসে নববিবাহিত যুবক কি কেহ নাই যে, আমার এই কথায় সায় দিবেন?) এ স্থলে একটি উদাহরণই যথেষ্ট, কারণ ভারতচন্দ্র বলিয়া গিয়াছেন, 'বরমেকাহুতিঃ কালে'; আসুরীভাষায় Brevity is the soul of wit। (৩) উদ্ভিদ্, যে প্রেম মাটীতে শিকড় গাড়িয়া আছে, ঠাঁইনাড়া হইতে চাহে না, যেখানে অঙ্কুরিত হয়, সেখানেই পল্লবিত পুষ্পিত ফলিত হয়, 'দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'। এই প্রেম

আদর্শ হিন্দু গৃহিণীতে প্রত্যক্ষ করেন নাই কি? 'লতায়ে লতায়ে যায়, ভ্রমর তুষি সুধায়, লাজে অবনতমুখী তনুখানি আবরি'; 'থাকে পতিমুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে।'

অনেক হিন্দু পুরুষেও ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়; যাঁহারা গৃহকোণ ছাড়িয়া অন্যকার সভাক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহারাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এই উদ্ভিদ্-জাতীয় প্রেম পোড়া বাঙ্গালী জীবনের সাররত্ন, ইহারই গুণে বাঙ্গালীর ঘরের লক্ষ্মী এখনও ঘরের লক্ষ্মী আছেন, সভ্যসমাজের রমণীকুলের ন্যায় জঙ্গমতীর্থে * পরিণত হয়েন নাই। যেমন উদ্ভিজ্জ আহার (vegetable diet) শ্রেষ্ঠ আহার, তেমনই এই উদ্ভিদ্-জাতীয় প্রেমেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, উভয়ই সাত্ত্বিক প্রকৃতির। আসুন, আমরা সকলে এই প্রেমের জয়ঘোষণা করিয়া আজিকার মত প্রবন্ধ শেষ করি। †

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাল-বৈশাখ।

১

ইঁচেখালী নদীয়া জেলার একখানি ভদ্রপল্লী। কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, আট দশ ঘর গন্ধবণিক্ ও ৬০।৭০ ঘর তন্তুবায় এই গ্রামের অধিবাসী; তদ্ভিন্ন গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে কয়েক ঘর ধীবর ও পশ্চিম প্রান্তে কয়েক ঘর চাষী মুসলমানের বাস। পূর্ব্বপ্রান্তে বক্রগামিনী স্বচ্ছতোয়া ইচ্ছামতী, পশ্চিম-প্রান্তে ক্রোশের পর ক্রোশ বহুদূরবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র।

ইচ্ছামতীর তীরে একটি উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপর বলাই দাস বাবাজীর আখড়া। বাবাজী যখন গৃহস্থ ছিলেন, তখন তাঁহার নাম ছিল কালীচরণ তাঁতি; এখন তিনি মুণ্ডিতমস্তক, কৌপীনবহির্ব্বাসধারী, সংসার-বিরাগী বলাই দাস বাবাজী। বাবাজী উদ্যোগী পুরুষ। তাঁতিকুল হইতে বৈষ্ণবকুলে পদার্পণ করিবার পর হইতেই তাঁহার অবস্থার দ্রুত উন্নতি হইয়াছিল। কত দিন তিনি বৈষ্ণব হইয়াছেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন, নির্ব্বিকার,

* এই 'তীর্থ' শব্দেরও গোশব্দের ন্যায় নানা অর্থ অভিধানে ভণে। 'তীর্থং শাস্ত্রেঽধ্বরে …জলাবতারেষু; ইতি বিশ্বঃ।

সুগোল মুখখানি ও ছানা ক্ষীর-ঘৃত-দুগ্ধ-পুষ্ট বর্ত্তুল উদরটি দেখিয়া তাঁহার বয়স কত, তাহাও নিরূপণ করা সুকঠিন; তবে দেখিয়াছি, তাঁহার সুদীর্ঘ স্থূল শিখাটিতে অনেকগুলি কেশ পক্ক হইয়াছে, মুখমণ্ডলে কয়েকটি দন্তও স্থানভ্রষ্ট হইয়াছে। বাবাজীর আখড়ায় রাধাগোবিন্দজীউর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে; তাঁহার কৃষিক্ষেত্র ও মহাজনী কারবারও সুবিস্তৃত।

বাবাজীর আখড়াটির দৃশ্য বড় সুন্দর। কতকগুলি আম, কাঁঠাল, লিচু, তেঁতুল ও নারিকেল গাছে আখড়াটি পরিবেষ্টিত। আখড়ার নীচেই নদী। রাধাগোবিন্দজীউর ক্ষুদ্র মন্দিরটি নদীর এত নিকটে যে, নদীজলে মন্দিরের ছায়া প্রতিফলিত হইতে দেখা যায়। এই মন্দিরে নিশীশেষে শঙ্খ-ঘণ্টার সুমধুর বাদ্যে দেবদেবীর মঙ্গল-আরতি আরম্ভ হইলে পল্লীবাসীরা সুখ-সুপ্তির অবসানে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্যে প্রবৃত্ত হয়; আবার সন্ধ্যাকালে সন্ধ্যারতির বাদ্য তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিলে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া রাধাগোবিন্দজীউর শ্রীচরণে প্রণাম ও তাঁহাদের চরণামৃত সংগ্রহ করিতে যায়। এক এক দিন সন্ধ্যার পর মন্দিরপ্রাঙ্গনে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়;—'বুজতা বুজাং বুজাং বুজাং' শব্দে মৃদঙ্গধ্বনি আরম্ভ হইবামাত্র তন্তুবায়েরা মাকু ফেলিয়া কারখানার মৃৎপ্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া, দোকানদারেরা দোকান বন্ধ করিয়া, জ্যোৎস্নালোকিত বনপথ দিয়া আখড়ার অভিমুখে ধাবিত হয়। কাহারও কাঁধে ময়লা চাদর, কাহারও পায়ে খড়ম, কাহারও হাতে একগাছা বাঁশের লাঠী। তাহার পরই "গোবিন্দ গোপীনাথ মদন-মোহন দয়া কর হে!"—সঙ্কীর্ত্তনের এই ধুয়ায় বনচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন নদীপ্রান্ত-বর্ত্তী ক্ষুদ্র গ্রামখানি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে।

কিন্তু এই গ্রামের মুষ্টিমেয় ভক্ত-সম্প্রদায়ের মধ্যে পতিতপাবন দত্তের মত নিষ্ঠাবান্ সাধু ভক্ত আর এক জনও ছিল কি না সন্দেহ। পতিতপাবন জাতিতে গন্ধবণিক্। ক্ষুদ্র একখানি মশলার দোকান তাহার একমাত্র অবলম্বন। পল্লীগ্রাম—গ্রামে অধিক মশলা বিক্রয় হয় না, কিন্তু পতিতপাবন সাধুপ্রকৃতির লোক বলিয়া গ্রামস্থ ইতর ভদ্র সকলেই তাহার দোকান হইতে মশলা ক্রয় করিত, এবং ইহাতেই তাহার সংসার একরকমে চলিয়া যাইত। বিশেষতঃ, সংসারে তাহার পরিবার অধিক ছিল না; সে স্বয়ং, গৃহিণী ও একটিমাত্র কন্যা—মহামায়া। পল্লীগ্রামে এরূপ একটি ক্ষুদ্র গৃহস্থের সাংসারিক

পতিতপাবন অনেক অধিক বয়সে কন্যারত্নটিকে লাভ করিয়াছিল, এবং এই কন্যাটির জন্মের পর সে প্রকৃত সংসারসুখের মাধুর্য্য উপভোগে সমর্থ হইয়াছিল। মেয়েটিকে সে এক দণ্ডের জন্যও চক্ষুর আড়াল করিতে পারিত না। তিন বৎসর বয়সের সময় হইতে মহামায়া তাহার পিতার দোকানের সঙ্গিনী। পতিতপাবন অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহপ্রাচীর-বিলম্বিত খোলখানি পাড়িত, এবং তাহা বাজাইয়া কিছুকাল ভজন গাহিত; তাহার পর মঙ্গল আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে সঙ্গীতালাপ বন্ধ করিয়া রাধাগোবিন্দজীউকে প্রণাম করিতে যাইত। সে দেখিত, মন্দিরে ঘৃতের দীপ জ্বলিতেছে। তাহার অস্ফুট আলোকে গোবিন্দজীউর অলকাতিলকাচর্চ্চিত শান্তোজ্জ্বল মুখখানিতে সুবঙ্কিম পদ্মপলাশনেত্র দুটি যেন হাসিতেছে, অধরে মুরলী, শিরে শিখিপাখা। তাঁহার সেই মধুর হাস্যের সহিত বৃন্দাবনবিলাসিনী, বৃকভানুনন্দিনী রাধারাণীর প্রসন্ন বদনের ঢলঢল হাসি মিশিয়াছে—যেন মেঘের কোলে বিজলীছটা। পতিতপাবন সেই যুগলমূর্ত্তি চাহিয়া চাহিয়া দেখিত, দেখিতে দেখিতে তাহার চক্ষুতে পলক পড়িত না, তাহার সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইত, নয়নকোণে এক বিন্দু প্রেমাশ্রু সঞ্চিত হইত; সে মন্দিরপ্রাঙ্গণে সাষ্টাঙ্গে লুণ্ঠিত হইত, মন্দিরের রজ তাহার কণ্ঠে, ওষ্ঠে, মস্তকে ধারণ করিত, এবং উঠিয়া গললগ্নীকৃতবাসে পুনর্ব্বার নির্নিমেষদৃষ্টিতে যুগল-মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিত।

ক্রমে আরতি শেষ হইত, মন্দিরের দীপ নির্ব্বাপিত হইত, আখড়ার প্রান্তবর্ত্তী বৃক্ষশাখায় শ্যামা ও দহিয়াল সুস্বরে প্রাভাতিক সঙ্গীত আরম্ভ করিত, পতিতপাবন গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে অস্ফুট ঊষালোকে গ্রাম্য পথে গৃহে ফিরিত, এবং সর্ব্বাঙ্গ তৈলচর্চ্চিত করিয়া প্রাতঃস্নান করিতে যাইত। স্নানান্তে সে মহামায়াকে কোলে লইয়া দোকান খুলিতে যাইত। ইহা তাহার প্রাত্যহিক কার্য্য। দোকানে বসিয়াই মহামায়ার প্রাভাতিক জলযোগ শেষ হইত, কোনও দিন মুড়ি, কোনও দিন চালভাজা, কোনও দিন বা গুড়-চিঁড়া মহামায়ার জন্য সংগৃহীত হইত। পতিতপাবনের দোকানের সম্মুখে একটা চারা বকুলগাছ ছিল, বৈশাখ মাসে রাশি রাশি বকুলফুল বৃক্ষমূল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত—সে সময় মহামায়ার বড় আনন্দ, সে পিতার নিকট একগাছি সূতা লইয়া ফুল কুড়াইয়া মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিত, পাথরের

লুটাইত—তাহার কুন্তলরাশি প্রভাত-বায়ুতে আন্দোলিত হইত,—তাহার নবনীতকোমল মুখখানিতে ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিত। পতিতপাবন সস্নেহ-দৃষ্টিতে কন্যার মাল্যরচনা নিরীক্ষণ করিত, কোনও দিন বা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিত, "মা মহামায়া, বকুলফুলের মালা কি কর্‌বে?"—মহামায়া বলিত, "আদা আনী পল্‌বে!"—বালিকা-হস্তরচিত মাল্য যে দিন রাধারাণী কণ্ঠে ধারণ করিতেন, সে দিন পিতা ও কন্যা কাহারও আনন্দ রাখিবার স্থান থাকিত না। মহামায়া আনন্দবিহ্বলচিত্তে করতালি দিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে নৃত্য করিত, পতিতপাবন মুগ্ধদৃষ্টিতে একবার রাধারাণীর, একবার কন্যার মুখের দিকে চাহিত; দেবপ্রতিমার মুখে সে তাহার কন্যার মুখচ্ছবি প্রতিফলিত দেখিত।

এই ভাবে আট বৎসর অতীত হইল। পতিতপাবনকে তাহার মুরুব্বী ও বিপদ্‌সম্পদের বন্ধু বলাইদাস মোহান্ত (এই কয় বৎসরের মধ্যে বলাই দাস 'মোহান্ত' নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন) পরামর্শ দিল, "শ্রীরাধা-গোবিন্দজীউর ইচ্ছায় তোমার পাঁচ নয় সাত নয়—ঐ একটিমাত্র মেয়ে; গৌরীদান তুল্য ফল সংসারীর অদৃষ্টে সর্ব্বদা ঘটিতে দেখা যায় না, তোমার সেই শুভ সুযোগ উপস্থিত, মেয়েটিকে এই বৎসরেই পাত্রস্থ কর।"

পতিতপাবন বলিল, "প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য, কিন্তু আমরা মায়ামুগ্ধ জীব—মায়ার বন্ধন বড় কঠিন বন্ধন, ঐ একটিমাত্র মেয়ে, বিবাহ দিয়া উহাকে পরের ঘরে পাঠাইব, তাহার পর কি লইয়া ঘরে বাস করিব?"

বলাই দাস বলিলেন, "হরি হে, তোমার ইচ্ছা! তা, মোহে মুগ্ধ হওয়া ত জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়। আমাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রেই ত বলিয়াছে—

'কৃষ্ণ ভজিবারে ভাই সংসারে আইনু,
মিছা মায়ায় বদ্ধ হৈয়া বৃক্ষ সম রৈনু।'

মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মপথ ভুলিয়া থাকা মূঢ়ের কর্ম্ম।"

পতিতপাবন বলিলেন, "প্রভু, আমি জ্ঞানহীন মূঢ় ছাড়া আর কি? পূর্ব্বজন্মে কিঞ্চিৎ সুকৃতি ছিল, তাই আপনার মত মহাপুরুষের আশ্রয় পাইয়াছি। তা, আপনি যখন অনুমতি করিতেছেন, তখন আমি শীঘ্রই মহামায়ার বিবাহ দিব।"

মোহান্ত হরিনামের ঝুলির ভিতর হাত পুরিয়া মালা ফিরাইতেছিলেন,

"রাধাগোবিন্দজী তোমার মঙ্গল করুন, আশীর্ব্বাদ করি, সুপাত্রে কন্যা সম্প্রদান কর।"

কিন্তু তন্তুবায় মোহান্ত মহারাজের আশীর্ব্বাদ এই ঘোর কলিতে ফলপ্রদ হইল না। বিস্তর সন্ধানেও সুপাত্র মিলিল না।

২

সুপাত্র না থাক, গন্ধবণিকের ঘরে কুপাত্র ও অপাত্রের অভাব নাই। অনেক অনুসন্ধানে শোলমারী গ্রামে একটি পাত্র মিলিল। পাত্রের নাম বংশীবদন পাল। বংশীবদন ত্রৈলোক্যনাথ পালের একমাত্র বংশধর; ছেলেটি ভারতচন্দ্রের ভাষায় "রূপে লক্ষী গুণে সরস্বতী"। শোলমারীর পাঠশালার পণ্ডিত হলধর কর্ম্মকার বংশীবদনের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন "বলদ পঞ্চানন"।

কিন্তু যাহার পৈতৃক অবস্থা ভাল, বলদ পঞ্চানন হইলেও বরের বাজারে সে চড়া দরে বিক্রীত হইতে পারে। বংশীবদনের বাপ বড় সাধারণ লোক নহে। সে মুকসুদপুর পরগণার রকম দেড় আনা মালেকান সত্বের জমীদার মহামহিমান্বিত শ্রীযুত গৌরবিলাস রায় চৌধুরীর ডিহি নারায়ণপুর কাছারীর গোমস্তা; মাসিক বেতন চারি টাকা।

মাসিক বেতন নগদ চারি তঙ্কা হইলেও ত্রৈলোক্যনাথ মানে ও প্রতাপে এক জন প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের সমকক্ষ ছিল। ডিহি নারায়ণপুর অঞ্চলের নিঃস্ব নির্ব্বোধ প্রজারা ত্রৈলোক্যনাথকে 'ডিক্রী ডিস্‌মিসে'র কর্ত্তা মনে করিত। ত্রৈলোক্যের প্রাপ্তি জমীদারী সেরেস্তার মাসিক চারি টাকা হইলেও প্রজাদের রক্ত শোষণ করিয়া তলবানা, পার্ব্বণী প্রভৃতি নানা 'বাবে' যে টাকা সে বাজে আদায় করিত, তাহাতে সুখে স্বচ্ছন্দে গৃহস্থালীর সকল ব্যয় বহন করিয়া বৎসরান্তে পূজায় মহামায়াকে গৃহে আনিতে পারিত। পার্ব্বণীর টাকাতেই প্রতি বৎসর তাহার গৃহে সমারোহে দুর্গোৎসব সুসম্পন্ন হইত। নায়েব তারিণীচরণ বসু জমীদারী কার্য্য ভাল বুঝিতেন না বলিয়া ত্রৈলোক্যনাথকেই তিনি দক্ষিণ হস্ত মনে করিতেন; এই জন্যই ত্রৈলোক্যনাথের এত প্রতাপ।

এ হেন সর্ব্বশক্তিমান্ ত্রৈলোক্যনাথ পালের বংশধর বংশীবদন যখন পতিতপাবনের জামাই-পদে নির্ব্বাচিত হইল, তখন ইঁচেখালী পল্লীতে ব্রাহ্মণ হইতে জেলে পর্য্যন্ত সকল সমাজে কোলাহল-ধ্বনি উত্থিত হইল। মোহান্ত

বলাই দাস সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "সকলই শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর ইচ্ছা, আমার আশীর্ব্বাদ কি বৃথা হইবে?"

পতিতপাবন দাঁড়ি ধরিয়া মশলা বিক্রয় করে; কিন্তু বংশীবদন হয় ত একদিন একটা পরগণার 'নায়েবি' কর্ম্মের ভার পাইতে পারে, সুতরাং তাহার মনে ঈষৎ গর্ব্বের আবির্ভাব হওয়া অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ, পতিতপাবনের পতিতপাবনী শ্রীমতী পদ্মাবতী যখন কুটুম্বিনীসমাজে বসিয়া উভয় চরণ প্রসারিত করিয়া ভাবী বৈবাহিকের ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপের বর্ণনা করিত, তখন অনেক সুকন্যাবতীর মনে ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইত, কিন্তু প্রকাশ্যে সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিত। ভেলুর মা বলিল, "আহা, হোক হোক, তোমার যেমন সোনার চাঁদ মেয়ে, তেমনই হীরের টুক্‌রো জামাই পাবে!" নিমাই হালদারের গিন্নী বলিলেন, "আমাদের মহামায়ার মত মেয়ে নদে শান্তিপুর খুঁজে এলেও মিল্‌বে না।"

আট বৎসরের মধ্যে কন্যাকে সম্প্রদান করিতে না পারিলে পুণ্যসঞ্চয়ে ব্যাঘাত হয়, গৌরীদান হয় না, ভাবিয়া পতিতপাবন বিবাহের জন্য বড় তাড়াতাড়ি করিতে লাগিল; ত্রৈলোক্যনাথও পুত্রবধূলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল; সুতরাং বিবাহে বিলম্ব হইল না। ফাল্গুন মাসেই শুভ বিবাহ শেষ হইল।

ত্রৈলোক্যনাথ জমীদার সরকারের হাতী, ঘোড়া, পাইক, বরকন্দাজ, কলিকাতা হইতে এসেটিলিন গ্যাসের ঝাড় ও রংমশাল, ব্যাণ্ড, ব্যাগপাইপ্‌ ও রোশনচৌকী প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া যে রাত্রে মহাসমারোহে ইঁচেখালী গ্রামে পুত্রের বিবাহ দিতে আসিল, সে রাত্রে ইঁচেখালীর পল্লীবাসিগণের উৎসাহ, উদ্দীপনা ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না; অশীতিপর বৃদ্ধ রামচরণ বসাক ইঁচেখালী গ্রামে ষাট বৎসরের অধিক কাল তাঁত বুনিতেছে; সে বলিল, তাহার জ্ঞান হইবার পর এমন ধূমধামের বিবাহ আর সে কখনও দেখে নাই। ইঁচেখালী হইতে শোলমারীর দূরত্ব তিন ক্রোশের অধিক নহে; সুতরাং শোলমারীর ইতর ভদ্র সকলেই বরযাত্রী সাজিয়া সেই রাত্রে ইঁচেখালীতে উপস্থিত হইয়াছিল।

পতিতপাবন এই সমারোহ দেখিয়া প্রমাদ গণিল। বাজারে তাহার ক্ষুদ্র একখানি মশলার দোকান, বাড়ীতে তিনখানি মেটে ঘর, একখানি বসিবার ঘর, একখানি শয়নের ঘর, আর একখানি রান্নাঘর। ইঁচেখালীর

মত পল্লীতে প্রায় কোনও মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরই তিনখানির অধিক ঘর থাকে না। কিন্তু এই অল্প-পরিমিত স্থানের মধ্যে এত বরযাত্রী ও অভ্যাগত লোকদিগকে কিরূপে স্থান দান করিবে, তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না। সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ত্রৈলোক্যনাথ বলিয়াছিল, "আমি অলঙ্কারপত্রের প্রত্যাশী নহি, মেয়ে জামাইকে আপনি কিছু দিতে পারুন বা না পারুন, তাহাতে আমার কোনও আপত্তি নাই, কিন্তু আমি বিবাহে যে সকল লোক-জন লইয়া যাইব, তাহাদের আদর অভ্যর্থনার যেন ত্রুটী না হয়।" আজকাল বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তার নিকট অলঙ্কার ও দানসামগ্রীর যেরূপ সুদীর্ঘ ফর্দ্দ দিয়া থাকেন, পতিতপাবনের তাহা অজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং ত্রৈলোক্যনাথের এই উদারতায় সে এতই মুগ্ধ হইল যে, বৈবাহিক কত লোক সঙ্গে আনিবেন, সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাও সে শিষ্টাচারবহির্ভূত মনে করিয়াছিল। কিন্তু পাছে অপ্রতিভ হইতে হয়, এই ভয়ে সে দুই শত লোকের উপযুক্ত কাঁচা ফলারের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিল। কাঁচা ফলারের অর্থ চিঁড়া, দই, গুড়, মুড়কী; যদি কেহ ইহার উপর একটি গোল্লা সন্দেশ দিতে পারে, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হয়। পতিতপাবন এক মণ কাঁচাগোল্লার আয়োজন করিয়াছিল।

কিন্তু আহূত, রবাহূত, অনাহূত প্রভৃতি বরযাত্রীদের ফলার দিতেই হইবে; লোকসংখ্যা চারি শত হইতে পারে, অথচ আয়োজন দুই শত লোকের অধিক হয় নাই। কোথায় বা তাহারা বসে, আর তাহারা কি-ই বা খায়? পতিতপাবন পাগলের মত হইল; সে মোহান্ত বলাই দাসের নিকট গিয়া বলিল, "আপনি রক্ষা না করিলে আর আমার জাতিরক্ষা হয় না, আমার মান-সম্ভ্রম বজায় থাকে না।"

বলাই দাস তাহার আখড়ার প্রান্তবর্ত্তী মন্দিরে বসিয়া মৃৎপ্রদীপের আলোকে ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। পতিতপাবনের বিপদের কথা শুনিয়া খড়ম পায়ে দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে চলিলেন, এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে বরযাত্রীদের অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। ফাল্গুন মাসের শেষে আর শীত ছিল না; বলাই দাস তাঁহার মন্দিরপ্রাঙ্গণে টাঙ্গাইবার প্রকাণ্ড নীলের চাদরটি বরযাত্রীদের জন্য আখড়ার আঙ্গিনায় পাতিয়া দিলেন। আখড়াতেই ফলাহারের স্থান হইল।

দোলের আর অধিক বিলম্ব ছিল না। দোলের সময় বলাই দাসের আখড়ায়

অনেক বৈরাগী বৈষ্ণবের সমাগম হয়। সেই-জন্য প্রতিবৎসর দোলের দিন তিনি চিঁড়া-মচ্ছব দিয়া থাকেন; বলাই দাসের ভাঁড়ারঘরে প্রচুর চিঁড়া, মুড়কী ও গুড় সঞ্চিত ছিল। বিপন্ন পতিতপাবনকে এই দায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য বলাই দাস ভাণ্ডার হইতে সেই সকল সামগ্রী বাহির করিয়া দিলেন। বলাই দাসের অনুগ্রহেই পতিতপাবন কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইল।

কোনও রকমে বিবাহ শেষ হইল বটে, কিন্তু এই বিবাহেই দরিদ্র পতিতপাবন সর্ব্বস্বান্ত হইল। সে অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইল।

বিবাহের পরদিন প্রভাতে বরকন্যা বিদায় হইল। বসন্তের সুমধুর প্রভাতে শানাই করুণস্বরে পল্লী-প্রকৃতি প্লাবিত করিয়া যে বিরহগাথা গাহিতে লাগিল, তাহা শুনিয়া পতিতপাবনের স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। গৃহে তাহার পত্নী পদ্মাবতী একমাত্র কন্যাকে বিদায় দিয়া ঘরের মেঝেতে পড়িয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতেছিল। কন্যাকে বিদায়-দানের সময় পতিতপাবন হরিদ্রা-মিশ্রিত দধিতে কন্যার পদদ্বয় ডুবাইয়া দেয়ালে তাহার ক্ষুদ্র পাদুখানির ছাপ রাখিয়াছিল; ঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া সেই পদচিহ্ন দুইখানির দিকে চাহিতে চাহিতে তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। রাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরে আসিয়া বেদীর অদূরে বসিয়া পড়িল, এবং রাধারাণীর মুখখানির দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিল। দেবীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার কন্যার অদর্শন-জনিত বেদনা অনেকপরিমাণে লঘু হইল। সে দিন পতিতপাবনকে কেহ জল গ্রহণ করাইতে পারে নাই; বলাই দাসের অনুরোধে অবশেষে সে রাধাগোবিন্দজীউর চরণামৃত ও কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিল।

৩

ফাল্গুন মাসে মহামায়ার বিবাহ হইল। চৈত্র মাসের শেষে হাইকোর্টে একটা মামলা উপস্থিত হওয়ায় পতিতপাবনের বৈবাহিক ত্রৈলোক্যনাথ উকীল-দের কাগজপত্র বুঝাইয়া দিবার জন্য নায়েব বাবুর সহিত কলিকাতায় চলিল। বংশীবদন কলিকাতা দর্শনের এমন সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিল না; পিতার সহিত সেও কলিকাতা যাত্রা করিল। কলিকাতার ঝেনেটোলায় ত্রৈলোক্য-নাথের কয়েক জন কুটুম্বের বাস, পিতাপুত্রে তিন চারি দিনের জন্য সেইখানেই আশ্রয় লইল।

কলিকাতায় সেবার ঘরে ঘরে বসন্ত হইতেছিল। তিন চারি দিনের

মধ্যেই বংশীবদনের জ্বর ও সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইল। তাহার পিতা ভীত হইয়া চিকিৎসক ডাকিল। ডাক্তার রোগীর অবস্থা সাবধানে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বোধ হয় বসন্ত হইবে।" ত্রৈলোক্যনাথ আর কলিকাতায় মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিল না, রাত্রের মেলট্রেণে পুত্রকে লইয়া বাড়ী আসিল। তিন দিনের মধ্যে বংশীবদনের সর্ব্বাঙ্গে লাল গুটী বাহির হইল; শয্যায় পড়িয়া সে ছট্‌ ফট করিতে লাগিল।

যথাকালে ইঁচেখালীতে পতিতপাবনের নিকট এ সংবাদ প্রেরিত হইল। পতিতপাবন বসন্তের কবিরাজ সনাতন দাসকে সঙ্গে লইয়া বৈবাহিক-গৃহে উপস্থিত হইল।

সনাতন দাস জাতিতে চণ্ডাল; পুরুষানুক্রমে সে বসন্তের চিকিৎসক। ইঁচেখালী অঞ্চলে বসন্তের চিকিৎসায় তাহার ধন্বন্তরীর ন্যায় খ্যাতি ছিল; তাহার গৃহে মা শীতলার নিত্য পূজা হইত; মা শীতলার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি তাহার গৃহে বিরাজিত ছিল। মৃণ্ময়ী দেবী গর্দ্দভারূঢ়া, উলঙ্গিনী, তাঁহার বাম কক্ষে কলস, দক্ষিণ হস্তে সম্মার্জ্জনী, মস্তকে শূর্প।

সনাতন দাস শীতলা পূজা করিয়া দেবীর প্রসাদী ফুল লইয়া গিয়াছিল, তাহা রোগীর কর্ণমূলে গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে ঝাড়িতে লাগিল; হরিদ্রা বাটিয়া রোগীর গাত্রে প্রলেপ দিল; প্রতিদিন কত মুষ্টিযোগ, তন্ত্রমন্ত্র, তুকতাক চলিল, তাহার সংখ্যা নাই; আরও তিন দিন তিন রাত্রি এই ভাবে গেল।

চতুর্থ দিন সনাতন গম্ভীরমুখে বলিল, "দেখিতেছি, ইহা চর্ম্মদল বসন্ত, ইহা অতি কঠিন ব্যাধি, কিন্তু ভয় নাই, আরোগ্য হইবে।"

আবার চিকিৎসা চলিল। দুই দিন পরে পতিতপাবন পুনর্ব্বার বৈবাহিক-গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিল, "কিরূপ বুঝিতেছ সনাতন? আহা, আমার মহামায়া যে দুধের মেয়ে! বড় সাধ করিয়া আট বৎসর বয়সে তাহার বিবাহ দিয়াছি। তাহার সুখের মুখ চাহিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছি।"—পতিতপাবনের চক্ষুর জলে গণ্ড ভাসিয়া গেল, সে চারি দিক্‌ ঝাপ্‌সা দেখিতে লাগিল।

সনাতন বলিল, "ব্যস্ত হইবেন না দত্ত মহাশয়, এ ব্যস্ত হইবার ব্যারাম নয়। এখনও নাভিকুণ্ডে ও কণ্ঠায় ঠাকুর বাহির হন নাই; যদি ঐ দুই স্থানে ঠাকুর বাহির না হন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বাঁচাইতে পারিব, কিন্তু ঐ দুই স্থানে বাহির হইলে তাহা ঈশ্বরের অসাধ্য জানিবেন।"

অষ্টম দিনে কণ্ঠদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিজি বিজি বসন্ত দেখা গেল। সেই দিন সনাতন সভয়ে দেখিল, নাভিকুণ্ড ঘামাচির মত বসন্তে লেপিয়া গিয়াছে। সনাতনের মুখ অন্ধকার হইয়া উঠিল, কিন্তু তথাপি সে দিবারাত্রি রোগীর পাশে বসিয়া প্রাণপণে তাহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় রোগী অহর্নিশি চীৎকার করিতে লাগিল, তাহার কোনও খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণ করিবার শক্তি রহিল না। দ্বাদশ দিনে সর্ব্বাঙ্গ ফাটিয়া অল্প অল্প রস বাহির হইল। সকলেই বুঝিতে পারিল—ভিতরে পূয হইয়া চর্ম্ম পচিতে আরম্ভ করিয়াছে। পঞ্চদশ দিবসে মধ্যাহ্নকালে বংশীবদনের সকল যন্ত্রণার অবসান হইল; পঞ্চদশবর্ষীয় বালক জননীর ক্রোড়ে চক্ষু চিরমুদিত করিয়া জগজ্জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে পিতামাতার শোক ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে,—পতিতপাবন শোকে দুঃখে পাগলের মত হইল; শ্মশানের কাজ শেষ করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। শোলমারী গ্রামের নদীপ্রান্তবর্ত্তী শ্মশান হইতে উন্মত্ত পতিতপাবন ইঁচেখালীর দিকে ছুটিয়া চলিল।

সে দিন বৈশাখ মাসের শুক্লা একাদশী। ক্ষুদ্র মনুষ্যের সুখ-দুঃখে প্রকৃতি জননীর বিন্দুমাত্র ভাবান্তর হয় না। পল্লীপ্রান্তর স্নিগ্ধ চন্দ্র-কিরণে যেন হাসিতেছিল; গগনবধূ তাহার সুনীল ললাটে চাঁদের টিপ পরিয়া নগ্ন সৌন্দর্য্যে বসুন্ধরাকে মুগ্ধ করিতেছিল; নৈশ সমীরণ-প্রবাহ থাকিয়া থাকিয়া প্রান্তরের বক্ষ দিয়া হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছিল; এবং পথিপ্রান্তস্থ সহকারকুঞ্জে নিবিড় পত্রের অন্তরালে বসিয়া একটা পাখী বোধ হয় চন্দ্রকিরণ অসহ্য মনে করিয়া 'চোখ গেল, চোখ গেল' শব্দে চীৎকার করিতেছিল; আর আম-কাঁঠালের বাগানে রাখালদের হাস্য-কৌতুকে বাগান প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। কিন্তু এ সকল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পতিতপাবনের দৃষ্টি ছিল না, তাহার হৃদয়ে তখন ঝটিকা বহিতেছিল, ঝটিকার ন্যায় বেগে সে ছুটিয়া চলিল।

ইঁচেখালী গ্রামে প্রবেশ করিয়া পতিতপাবন তাহার বাড়ীতে গেল না, গতি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে বলাই দাসের আখড়ার দিকে চলিল। সে দিন আখড়ায় হরিবাসর। ভক্তবৃন্দ চন্দ্রালোকিত আখড়ার প্রশস্ত প্রাঙ্গনে মাদুরে বসিয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুমধুর লীলার আলোচনা শেষ করিয়া মৃদঙ্গ সহযোগে গাহিতেছিল,—

"সঙ্কীর্ত্তন মাঝে আমার গৌর নাচে,
রাঙ্গা পায়ে সোনার নূপুর রুনুঝুনু বাজে।"

আকাশের পশ্চিম প্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র কালো মেঘ উঠিয়াছিল, কেহ তাহা লক্ষ্য করে নাই। মেঘখণ্ড ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল; ক্রমে বায়ুর বেগ প্রবল হইয়া উঠিল; একাদশীর চন্দ্র দেখিতে দেখিতে সেই গাঢ় কৃষ্ণ মেঘে আচ্ছন্ন হইল; অর্দ্ধ দণ্ড পূর্ব্বে যে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে সমগ্র প্রকৃতি হাসিতেছিল, সেই মধুর হাস্য প্রলয়ের মেঘান্ধকারে বিলুপ্ত হইল; কিন্তু তখনও এক জন জেলে ইচ্ছামতীতে একখানি ক্ষুদ্র জেলে-ডিঙ্গীতে বসিয়া মৎস্যসন্ধানে নিবিষ্টচিত্তে 'বৈঠা' ঠেলিতেছিল। সহসা একটা দমকা বাতাস উঠিল; নৌকা বায়ুবেগে দশ হাত পশ্চাতে সরিয়া গেল। মাঝি 'বৈঠা' ছাড়িয়া 'নগি' ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে নিস্তব্ধ নদীকূল প্রতিধ্বনিত করিয়া গাহিল,—

"মন-মাঝি, তোর বৈঠা রৈল রে,
আমি আর বাইতে পার্‌লাম না।
আমি জনম ভ'রে বাইলাম 'বৈঠা' রে,
এ লা পাউছায় ছাড়া আউগায় না।"

কড় কড় শব্দে মেঘ গর্জ্জিয়া উঠিল; আকাশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে বিদ্যুতের লেলিহান জিহ্বা চক্‌মক্ করিয়া উঠিল; শন্ শন্ করিয়া ঝটিকা বহিতে লাগিল; এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ পতিতপাবনের শোকমথিত হৃদয়ের ন্যায় আছড়াইয়া আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার পর ঝটিকার বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। নব বৈশাখের স্থূল বারিধারা ঝম্‌ঝম্ শব্দে ঝরিতে লাগিল।

ঝটিকারম্ভে ভক্তবৃন্দ সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করিয়া মৃদঙ্গ লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। দেবমন্দিরপ্রাঙ্গন তখন সম্পূর্ণ জনহীন; চতুর্দ্দিকে কেবল বৃষ্টিপতনের শব্দ। আকাশে মুহুর্মুহু মেঘগর্জ্জন। সেই বৃষ্টিধারায় সিক্তদেহ, জামাতৃশোকবিহ্বল, বাহ্যজ্ঞানহীন পতিতপাবন শ্রীরাধাগোবিন্দজীউর মন্দিরের দ্বার ঠেলিয়া নির্জ্জন মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবপদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল, এবং এতক্ষণ পরে অশ্রুর উৎসদ্বার মুক্ত করিয়া কাতর-কণ্ঠে বলিল, "রাধাগোবিন্দজী, মহামায়া আমার দুধের মেয়ে, তাহার এ সর্ব্বনাশ কেন করিলে?"

কড়-কড় শব্দে আবার বজ্রনাদ হইল, জীমূতমন্দ্রে দেবমন্দির কম্পিত হইল; মৃদু দীপালোকে পতিতপাবন মোহাবিষ্টের ন্যায় দেবমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল।

সন্ধ্যাবেলা।

১

শিশু আজ সন্ধ্যাবেলা দিবে না পড়িতে ;
তবে এই বইখানা,
কিছুতে মানে না মানা,
কোন মতে পাতাগুলা হইবে ছিঁড়িতে।
ছেঁড়া বই, ছেঁড়া পাঁজি—
কিছুতে সে নহে রাজি,
হাঁড়ি সরা, হাতী ঘোড়া, চাই না তাহার ;
ছবি, তাস, বাঁশী, ঢোল—
তবু সেই গণ্ডগোল !
অবশেষে ঘা-কতক দিলাম প্রহার।

২

কাঁদিতে কাঁদিতে দুষ্ট ঘুমাল এখন।
এবার নিশ্চিন্ত বেশ,
বইখানা করি শেষ—
দিনে দিনে হইতেছে আদুরে কেমন !
প্রতিদিন মনে হয়,
এত স্নেহ ভাল নয়,
অনিত্য মায়ায় মজি ভুলি নিত্য কাজ।—
"ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে"
অক্ষর পড়িছে নেত্রে,
বুঝিতে পারি না অর্থ, থাক তবে আজ।

৩

নীরবে চুমিয়া দিনু মুছিয়া নয়ান ;
জোছনা মুখেতে লোটে,
ঈষৎ বিভিন্ন ঠোঁটে
এখনো কাঁপিছে যেন ক্ষুদ্র অভিমান !

ভিজা ভিজা আঁখিপাতা,
নেতিয়ে পড়েছে মাথা,
শ্বসিছে নিশ্বাসে কত অব্যক্ত বেদনা !
তুলিলাম বুকে করি,
নয়নে রয়েছে ভরি—
তার মৃত জননীর বিস্মৃত প্রার্থনা !

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

সহযোগী সাহিত্য।

টলষ্টয়ের বিদায়বাণী।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে পৃথিবীতে যে নূতন যুগের অবতারণা হইয়াছে, এই যুগের যুগধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে রুশিয়ার সুবিখ্যাত দার্শনিক, ঔপন্যাসিক ও মানব জাতির বন্ধু ঋষিপ্রতিম কাউণ্ট টলষ্টয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দেবী বীণাপাণির এই অশীতিপর সেবক জীবনোপান্তে উপনীত হইয়া 'প্রেমের ধর্ম্ম' ও 'শক্তির ধর্ম্ম' সম্বন্ধে যে দৈববাণী প্রচার করিয়াছিলেন, বিলাতের সুবিখ্যাত 'ফর্টনাইটলি রিভিউ' নামক মাসিকপত্রিকায় সম্প্রতি তৎসম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। কাউণ্ট টলষ্টয়ের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শক্তির ধর্ম্ম ও প্রেমের ধর্ম্ম।

কাউণ্ট টলষ্টয় বলিয়াছেন, গোয়েন্দা ও ঘাতকগণের অধঃপতন কিরূপ শোচনীয়, জনসাধারণ এখন তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে ; কেবল উহাদের অধঃপতন কেন, শান্তিরক্ষকগণের, সৈন্য-দলের, এমন কি, কোনও কোনও স্থলে সেনা-নায়কগণের অধঃপতনের কথাও তাহারা বুঝিতে পারিতেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত বিচারক, মন্ত্রী, সমাজের পরিচালক, বিদ্রোহী দলের নেতা ও রাজার অবনতি সম্বন্ধে তাহারা ধারণা করিতে পারিতেছে না। প্রকৃতপক্ষে এই সকল ব্যক্তির কার্য্য মনুষ্য-প্রকৃতির বিরুদ্ধ-গুণসম্পন্ন ও ইতরতা-পূর্ণ ; এমন কি, ঘাতক ও গোয়েন্দাদের কার্য্য অপেক্ষাও তাহা অধিকতর নিন্দনীয়। কারণ, ঘাতক বা গোয়েন্দার কার্য্যে কিছুমাত্র কপটতা বা ভণ্ডামি নাই ; কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য ঘোর কপটতাজালে সমাচ্ছন্ন।

নূতন পথ।

নূতন পথ অপরিহার্য্য। এই পথে প্রবেশ করিতে হইলে, খৃষ্টধর্ম্মের নামে যে সকল কুসংস্কার চলিয়া আসিতেছে, তাহা আমাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে ; উৎপীড়নের যে সকল প্রণালী আছে, তাহারও পরিবর্জ্জন আবশ্যক।

মনুষ্যের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য।

অপরের জীবন কি ভাবে গঠন করা আবশ্যক, তাহা অন্যে কেন দেখিতে যায় ? প্রত্যেকেই

প্রত্যেকেরই জানা উচিত, আত্মাটিকে বাদ দিলে এই ভৌতিক দেহমাত্রই মানবের সর্ব্বস্ব নহে। দেহের দাসত্ব হইতে আত্মাকে মুক্তিদান করিয়া প্রেমের পরিপূর্ণতা সাধন পূর্ব্বক জীবনধারণ বাঞ্ছনীয়; তাহাতেই স্বাধীনতা, তাহাতেই সুখ। এরূপ করিতে পারিলে বাহ্যিক অবস্থারও উন্নতি সাধিত হয়। মনুষ্যজাতির যুগযুগান্তর-সঞ্চিত জ্ঞান হইতে এই উপদেশই লাভ করা যায়, এবং ইহাই পরম সুখের সোপান।

আর একটি কথাও আমার বলিবার অভিপ্রায় ছিল। বর্ত্তমান কালে আমরা এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছি যে, সে অবস্থায় আমাদের আর অধিক কাল অতিবাহিত করা অসম্ভব। আমাদের ইচ্ছায় হউক, আর অনিচ্ছায় হউক, আমাদিগকে জীবনের একটি নূতন পথে পদার্পণ করিতেই হইবে। সেই পথে প্রবেশ করিবার জন্য অভিনব ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রবর্ত্তন অনাবশ্যক; সেই পথে জীবনকে পরিচালিত করিবার জন্য বা জীবনরহস্যবিবৃতির নিমিত্ত কোনও নূতন বৈজ্ঞানিক মতেরও প্রয়োজন নাই; সে জন্য কেবল একটিমাত্র কাজ করিতে হইবে; খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রচলিত কুসংস্কার ও রাজশাসনব্যবস্থার চক্রজাল (Goverament organisation) হইতে আমাদিগকে মুক্তিলাভ করিতে হইবে।

যদি প্রত্যেক লোক বুঝিতে পারে, অন্যের জীবন-পরিচালনের ব্যবস্থা করিবার তাহার কোনও অধিকার নাই; কেবল অধিকার নহে, তাহার সে শক্তিও নাই; প্রত্যেক মনুষ্যের স্ব স্ব ধর্ম্ম-নীতি অনুসারে জীবনের গতি পরিচালিত করা অবশ্যকর্ত্তব্য; তাহা হইলে জীবন-পরিচালনের কষ্টকর, কঠোর ব্যবস্থাসমূহ দিন দিন কঠোর হইতে কঠোরতর না হইয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

অতএব তুমি জার হও, বিচারপতি হও, ভূম্যধিকারী হও, শ্রমজীবী হও, আর ভিক্ষুক হও, আমি যাহা বলিলাম, তাহা ভাবিয়া দেখিও। তোমার নিজের প্রতি করুণাপরবশ হও, তোমার আত্মার যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহা কর।

স্পেনদেশীয় কবি রাজনীতিক।

জোস জোরিলা স্পেন দেশের এক জন কবি রাজনীতিক। কাউণ্টেস অফ্ পার্ডোবাজান এই কবির জীবন-বৃত্তান্ত 'লা-লেক-টুরা' নামক পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত করিতেছেন। কবি জোরিলার পিতা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। জোরিলা বাল্যকাল হইতেই কাব্যানুরাগী ছিলেন, এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন; চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থে রাজকীয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এই বিদ্যালয়ে অভিজাত-সম্প্রদায়ের বালকেরা বিদ্যাভ্যাস করিত। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে আইন-শিক্ষার জন্য কবি টোলেডো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। কিন্তু আইন-অধ্যয়নে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না; তিনি গল্প ও উপকথা পড়িতেই ভালবাসিতেন। তাঁহার পিতা সংবাদ পাইলেন, জোরিলা আইন-পাঠে অত্যন্ত অবহেলা করিতেছেন, এবং অপব্যয়ী হইয়া উঠিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহার পিতা টোলেডো হইতে তাঁহাকে ভালাডালিতে স্থানান্তরিত করেন; সেখানে

তাঁহার পিতা ক্রমাগত শুনিতে লাগিলেন, পুত্রের লেখাপড়া কিছুই হইতেছে না ; জোরিলা কিছুই করেন না, কেবল বাজে কেতাব পড়িয়া সময় নষ্ট করেন। জোরিলার পিতা এই সংবাদে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক লিখিলেন, 'যদি তুমি এই বৎসরেই আইন পাশ করিতে না পার, তাহা হইলে তোমাকে কলেজ হইতে ছাড়াইয়া আনিয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিব।'

জোরিলা পিতার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই স্বেচ্ছায় কলেজ পরিত্যাগ করিলেন, এবং মাদ্রিদ নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে সকল রাজনৈতিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তৎপ্রতি পুলিসের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিস তাঁহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তিনি পলায়নপূর্ব্বক এক জন ঝুড়ী-প্রস্তুত-কারকের আবাসে লুক্কায়িত হন। গোপনভাবে কিছুকাল বাসের পর তিনি যে সকল কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়। উনিশ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার এক অদ্ভুত শক্তি জন্মে ; নিদ্রিত অবস্থায় তিনি গল্প করিতেন, গান করিতেন, এবং কবিতা রচনা করিতেন। এমন কি, স্বপ্নাবস্থায় তিনি নিজের দাড়ী পর্য্যন্ত কামাইতে পারিতেন, নানারূপ গৃহকার্য্যও করিতেন।

এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা।

নূতন মত।

গুগ্‌লেল্‌মু ফেরেরো এক জন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সকল কাহিনী ঐতিহাসিক সত্যরূপে সাধারণের নিকট সমাদৃত, তাহার উপর দণ্ডাঘাত করিয়া তাহা তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। তিনি সুপবিত্র ইতিহাস-মন্দিরের কালাপাহাড়। সংপ্রতি 'ফর্টনাইটলি রিভিউ' পত্রে তিনি এক প্রবন্ধ লিখিয়া এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার সুবিখ্যাত প্রণয়কাহিনীটিকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, এণ্টনি এক জন উচ্চ অঙ্গের রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন বটে, কিন্তু প্রেমিক ছিলেন না।

মিঃ ফেরেরো বলেন, ক্লিওপেট্রা সুন্দরী ছিলেন না ; সৌন্দর্য্যের অনুরোধেও এণ্টনি তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। নানা মুদ্রায় রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার যে মূর্ত্তি দেখা যায়, সে মূর্ত্তির সহিত সৌন্দর্য্যের রাণী ভিনসের চির-হাস্যময় লাবণ্যমণ্ডিত সুকুমার মুখভাবের কোনও সাদৃশ্য নাই ; এমন কি, পম্পাডারের মার্কুইস-বধূর যে লালসাময় রূপ ছিল, ক্লিওপেট্রা সে রূপেরও অধিকারিণী ছিলেন না ; তাঁহার মুখখানি মাংসল ও ভারী ছিল ; তাহাতে বাঁশীর মত লম্বা নাক ; সে মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইত, তিনি যেমন উচ্চাভিলাষিণী, সেইরূপ দৃপ্তা ; তাঁহার মুখ দেখিলে মেরীয়া থেরেসার মুখ মনে পড়ে।

এণ্টনির প্রেমের অভাব।

মিঃ ফেরেরো এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার সমসাময়িক ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, ৩৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এণ্টনি এণ্টিয়ক নামক স্থানে মিশরের অধীশ্বরী ক্লিওপেট্রার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন ; তাহার কারণ প্রেমাকর্ষণ নহে, গুপ্ত

করাই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, ক্লিওপেট্রাকে বিবাহ করিয়া মিশর-রাজ্যে তিনি রোমান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবেন; এবং পারস্য-জয়ের জন্য যে বিপুল অর্থ আবশ্যক, টলেমিবংশীয় রাজগণের ধনভাণ্ডার হইতে তাহা সংগ্রহ করিবেন।

এণ্টনি অগষ্টসের ভগিনী অক্টেভিয়াকে বিবাহ করিবার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ক্লিওপেট্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই উভয় বিবাহেরই রাজনীতিক উদ্দেশ্য অভিন্ন। মিশরের রাজস্ব হস্তগত করিবার জন্য ও রাজনীতিক্ষেত্রে অপ্রতিহত ক্ষমতালাভের নিমিত্ত তিনি এই উভয় বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। পারস্য-জয়ই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

চতুরে চতুরে।

এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রার প্রেমবন্ধন অন্ততঃ প্রথমে রাজনীতিক সন্ধি-বন্ধন ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। ক্লিওপেট্রা তাঁহার রাজশক্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপিত করিবার জন্য এণ্টনিকে বিবাহ করিয়াছিলেন; এণ্টনি নীল নদের সুবিস্তীর্ণ অববাহিকা-প্রদেশকে রোমান রাজতন্ত্রের বৈজয়ন্তী-ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ক্লিওপেট্রাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

এই বিবাহের পর এণ্টনি তাঁহার সরল কর্ম্মময় জীবন বিলাস-তরঙ্গে ভাসাইয়াছিলেন; যেন কি এক নেশায় তিনি উন্মত্ত হইয়াছিলেন। প্রাচীন জগতের সভ্যতার প্রভাবে তিনি তাঁহার স্বদেশ, স্বজাতি ও বাল্য-জীবনের কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন; মিশর তাঁহার হৃদয়ের সমগ্র শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিল।

জীবনের 'ট্র্যাজিডি'।

কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহাদের জীবন-নাটকের শোচনীয় অধ্যায়ের অভিনয় আরব্ধ হইল। ক্লিওপেট্রা ক্রমাগত চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এণ্টনি যেন পারস্য-জয়ে প্রবৃত্ত না হন; ক্লিওপেট্রার সংকল্প ছিল, তিনি মিশর সাম্রাজ্যের সিংহাসনে এণ্টনিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার বংশধরগণের দ্বারা একটি নূতন রাজবংশের সংস্থাপন করিবেন, মিশর-সাম্রাজ্যকে নূতন ছাঁচে ঢালিবেন, এবং রোম কর্তৃক আফ্রিকা ও আসিয়ার যে সকল স্থান অধিকৃত হইয়াছিল, তাহা মিশর-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবেন।

ক্লিওপেট্রার কল্পনা ছিল, এণ্টনির বাহুবলে রোমের অধিকৃত প্রাচ্য ভূখণ্ডের অংশগুলি হস্তগত করিয়া তিনি মিশর-সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না, টলেমি-রাজবংশের বিপুল অর্থ-সাহায্যে রোমান সৈন্যদল গঠন পূর্ব্বক সেই সাম্রাজ্য সুরক্ষিত করিবেন, এবং সমগ্র এসিয়া ও আফ্রিকা খণ্ডে মিশরের আধিপত্য বিস্তৃত করিবেন। সুপ্রসিদ্ধ আলেকজান্দ্রিয়া নগরকে ভূমধ্যসাগরতীরবর্ত্তী সমুদয় স্থানের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আসন প্রদান করিবারও তাঁহার সঙ্কল্প ছিল।

প্রায়শ্চিত্ত।

কিন্তু অবশেষে এণ্টনির পতন হইল। তিনি স্বদেশীয় সৈন্যবলের সহায়তায় স্বদেশের অর্থ-ব্যয়ে ক্লিওপেট্রাকে উন্নতির অভ্রভেদী শিখরে স্থাপন করিতে উদ্যত হইয়া স্বদেশের নিকট যে অপরাধী হইয়াছিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল। অগষ্টসের দল এণ্টনিকে পরাজিত করিয়া এণ্টনি ও ক্লিওপেট্রা-ঘটিত যে প্রেমকাহিনীর সৃষ্টি করিল, তাহাই আবহমানকাল হইতে ইতিহাসে স্থান অধিকার করিয়াছে।

হলণ্ডের নবীনা রাজ্ঞী।

বিলাতে 'গারল্‌স্‌ ওন পেপার' নামক একখানি রমণী-পাঠ্য পত্রিকা আছে। সম্প্রতি এই পত্রিকায় হলণ্ডের বর্ত্তমান রাজ্ঞী উইল্‌হেলমিনা সম্বন্ধে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। এই প্রবন্ধের লেখিকার নাম মিস্‌ উইণ্টার। মিস্‌ উইণ্টার ইংরাজ-মহিলা; তিনি দশ বৎসর কাল নবীনা রাজ্ঞীর শিক্ষয়িত্রী ছিলেন।

রাজ্ঞীর ভূগোল-শিক্ষা।

মিস্‌ উইণ্টার লিখিয়াছেন, বালিকা রাজ্ঞীর ভূগোল-শিক্ষা কিছু বিচিত্র ধরণের। প্রথমে তাঁহাকে তাঁহার বাসগৃহ সম্বন্ধে—তাঁহার কক্ষ কত বড়, কতখানি দীর্ঘ, কতখানি প্রশস্ত, সেই কক্ষে যে সকল সামগ্রী আছে, তাহাদের অবস্থানের আপেক্ষিক দূরত্ব ইত্যাদি—শিক্ষা দেওয়া হয়; তাহার পর সমগ্র প্রাসাদ সম্বন্ধে সেইরূপ শিক্ষা প্রদান করা হয়; প্রাসাদ সম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞান আয়ত্ত হইলে, প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যান ও উদ্যানভবনাদি সম্বন্ধে প্রত্যেক জ্ঞাতব্য বিষয়ে তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই ভাবে ক্রমে রাজধানী, তাহার পর রাজধানী যে প্রদেশে অবস্থিত, সেই প্রদেশ, অনন্তর হলণ্ড রাজ্য, এইরূপ সমস্ত ইউরোপ, এবং অবশেষে সমস্ত পৃথিবী সম্বন্ধে তাঁহার ভৌগোলিক অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

রাজ্ঞীর প্রকৃতি।

'উওম্যান অ্যাট হোম' নামক আর একখানি পত্রিকায় রাজ্ঞী উইলহেল্‌মিনার চরিত্রের বিশেষত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। এই বিবরণটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। হীরক-জহরতাদির প্রতি অনুরাগ রাজ্ঞীর চরিত্রের একটি দুর্ব্বলতা। সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোনও নগরে বাস করিবার সময় এমন দিন ছিল না, যে দিন তিনি কোনও না কোনও জহুরীর দোকানে উপস্থিত হইয়া বহুমূল্য জহরতাদি না কিনিতেন। তাঁহার জননী এ জন্য তাঁহাকে পুনঃপুনঃ তিরস্কার করিলেও তিনি এই অভ্যাস ত্যাগ করিতে পারেন নাই। নূতন নূতন পোষাক-পরিচ্ছদ ক্রয়ে তাঁহার এতাদৃশ অনুরাগ নাই; কোনও পরিচ্ছদনির্ম্মাতা কোনও ফ্যাশানের পরিচ্ছদ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারে না। তিনি বলেন, 'আমি কখনই ফ্যাশানের ক্রীতদাসী হইব না; ফ্যাশানকেই আমার ক্রীতদাস হইতে হইবে। কোন্‌ বর্ণের পরিচ্ছদ ভাল, তাহা আমি কিছু কিছু বুঝিতে পারি; শ্বেতবর্ণ ও হরিতবর্ণের পরিচ্ছদ আমি অধিক পছন্দ করি; অন্য বর্ণের পরিচ্ছদ আমি পরিব না।' সত্যই তিনি এই দুই বর্ণের পরিচ্ছদ ভিন্ন অন্য বর্ণের পরিচ্ছদ প্রায় পরিধান করেন না; তবে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে নীল পরিচ্ছদেও সজ্জিত হইতে দেখা যায়। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ও জর্ম্মান-সম্রাজ্ঞীর ন্যায় প্যারিস হইতে পরিচ্ছদ সরবরাহ করা তিনি পছন্দ করেন না; স্বদেশী পোষাকেই তাঁহার অনুরাগ। রাজপরিবারের জন্যও তিনি স্বদেশী পোষাকের ফরমাস দিয়া থাকেন। জরির কারুকার্য্যখচিত সাটিনের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া যখন তিনি তাঁহার মূল্যবান্‌ হীরক-জহরতাদির অলঙ্কারগুলি পরিধান করেন, তখন তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখায়। কিন্তু যাহাকে প্রকৃত সুন্দরী বলে, তিনি সেরূপ সুন্দরী নহেন, তবে তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব বড় চমৎকার; বিশেষতঃ যখন তাঁহার মন প্রফুল্ল থাকে, তখন

দীর্ঘজীবী হইবার উপায়।

বিলাতে 'লণ্ডন' নামক পত্রিকায় সালিবি নামক এক জন চিকিৎসক দীর্ঘজীবনলাভের উপায় সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, তাঁহার মতানুসারে চলিলে পরমায়ু শত বর্ষ হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহার উপদেশানুসারে চলা সকলের পক্ষে সহজ নহে। তাঁহার প্রথম উপদেশ এই যে, স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া প্রত্যহ ছয় আনা উপার্জ্জন কর, এবং সেই অর্থের সাহায্যে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর। তিনি দৈনিক ছয় আনা উপার্জ্জনের উপর এত ঝোঁক দিয়াছেন কেন, তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এরূপ দরিদ্র ভিন্ন সকলেই যে পরিমাণে আহার করে, জীবনধারণের পক্ষে তাহা অতিরিক্ত; কেবল তাহাই নহে, অধিক উপার্জ্জনে অতিরিক্ত পানদোষ ঘটিতে দেখা যায়। তাঁহার মতে 'স্ফূর্ত্তিতে থাক, মাদক দ্রব্যের সম্বন্ধ ত্যাগ কর, উপযুক্ত বিশ্রাম কর, তাহা হইলেই তুমি ডাক্তারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইতে পারিবে।'

তিন জন প্রধান ডাক্তার।

ডাক্তার সালিবি নিশ্চিন্ত ভাব, পথ্য ও মানসিক স্ফূর্ত্তিকেই ডাক্তারদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে কেহই মরে না। দুশ্চিন্তাতেই মানুষের পরমায়ুর হ্রাস হয়। আনন্দে যেমন পরমায়ুর বৃদ্ধি হয়, শোক-দুঃখে সেইরূপ তাহার হ্রাস হইয়া থাকে। সর্ব্বদা কর্ম্মে ব্যস্ত থাকাই যৌবনরক্ষার প্রধান উপায়; অলস লোকেরাই দ্রুত বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়। আমাদের দেহ যে ভাবে গঠিত, তাহাতে জীবন-সংগ্রামে আমাদের অভ্যস্ত হওয়া উচিত। সর্ব্বদা যুবকগণের সহিত সহবাসে উপকার আছে। প্রায়ই দেখা যায়, যাহাদের সন্তান-সন্ততি আছে, তাহারা নিঃসন্তান লোকের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী; যাহারা যুবকদের দলে সর্ব্বদা মিশিয়া থাকে, তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে, এমন কি, সময়ে সময়ে যুবজনসুলভ ক্রীড়ায় রত হয়, তাহাদের যৌবন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া থাকে। ডাক্তার বলিতেছেন, অতীতের চিন্তায় মনকে কখনও ভারাক্রান্ত করিও না। যদি ক্রমাগত মনে কর, বুড়া হইয়া পড়িলাম, তাহা হইলে সত্য সত্যই বার্দ্ধক্য তোমাকে আক্রমণ করিবে; মনে বার্দ্ধক্যের ভাব আসিলে দেহেও বার্দ্ধক্য প্রকাশ পায়; অতএব যত দিন পার, বালকের মত থাকিও।

ভারত-মহিলার উন্নতি।

ইতিপূর্ব্বে মান্দ্রাজে যে কনফারেন্স বসিয়াছিল, তাহাতে অনেকগুলি শিক্ষিতা ভারত-মহিলা যোগদান করিয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে মার্চ্চ মাসের 'ইণ্ডিয়ান ম্যাগাজিন' নামক বিলাতী মাসিকে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা অনূদিত হইল।

এই সর্ব্বপ্রথম মান্দ্রাজে ভারত-মহিলাবৃন্দ সাধারণের সম্মুখে বক্তৃতা করিতে উঠিয়াছিলেন। দেশীয়া রমণীকে সুন্দর বক্তৃতা করিতে দেখিয়া ভারতের লোক বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছিলেন।

... ভিন্ন স্ত্রীলোকের আয়ত্ত, সেই সকল বিষয়ে তাঁহারা বেশ গুছাইয়া অনেক কথা

সর্ব্বদেশেই বর্দ্ধিত হইতেছে। ভারতও সে গণ্ডীর বাহিরে পড়িয়া নাই। রমণী-সমাজের এই জোটবন্ধন পুরুষ-সমাজের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের প্রতিকূল নহে, বরং অনুকূল। রমণীর শক্তি পুরুষের শক্তির সহিত সম্মিলিত হইয়া অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলে, তাহার ফল কল্যাণদায়ক হইবারই কথা।

ভারত-রমণীর বক্তৃতা।

মান্দ্রাজের সামাজিক কন্‌ফারেন্সে পুরুষ রমণী উভয়েই উপস্থিত ছিলেন; এই সভায় রমণীগণ বাল্য-বিবাহের ও বিধবাগণের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সভ্যতায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে, কেবল ভারতেই তাঁহারা নানা সামাজিক সমস্যা লইয়া তর্ক-বিতর্ক করিতেছেন; এ সকল ব্যাপার অনেক পূর্ব্বেই শেষ হওয়া উচিত ছিল।

বিদুষীদের পরিচয়।

পণ্ডিতা অচিলাম্বিকা এক জন উচ্চ শ্রেণীর মহিলা-কবি। তিনি তামিল ভাষায় যে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন, তাহা কৌতূহলোদ্দীপক, শিক্ষাপ্রদ ও প্রশংসনীয় হইয়াছিল। এই বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ ঘন ঘন আনন্দধ্বনি করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যবতী শ্রীভঙ্গমা বি. এ. ভারত-মহিলার শিক্ষাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—বালিকাগণের হৃদয়ে যখন জ্ঞানের উন্মেষ আরম্ভ হয়, যখন তাহারা শিক্ষার সাফল্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, ঠিক সেই সময়টিতে তাহাদিগকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লইয়া যাওয়া মহাভ্রম। কুমারী সুন্দরী লাজেরস বলেন, প্রত্যেক সভ্য দেশেই রমণীসমাজ সকল কার্য্যেই পুরুষের সহযোগিতা করিতেছেন;—'যে হস্ত শিশুর দোলা আন্দোলিত করে, সেই হস্তই পৃথিবীর শাসনে নিয়োজিত হয়,' এই পুরাতন মহাবাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিয়া আসিতেছেন। পুণার বিধবাশ্রমের শ্রীমতী কাশীবাঈ দেবধর বলেন, সমাজ-সংস্কারের আরম্ভকাল হইতে সংস্কারকগণ বাল্যবিবাহের কুফল সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া আসিতেছেন।

মহিলা ডেলিগেটগণ যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বুঝিয়াছিলেন, এই সকল বক্তৃতা যথেষ্ট মনস্বিতার পরিচায়ক। এই কনফারেন্সে বিবিধ সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। শিক্ষিতা ভারতমহিলাগণ এই সভায় যোগদান করিয়া যে নানা গুরুতর সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে অতি দক্ষতার সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছে।

মহিলা চিকিৎসক।

শ্রীমতী দেবার্কবাঈ কমলাকর এডিনবরা, গ্লাসগো ও ডবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তারী পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ায়, তাঁহাকে অস্ত্র-চিকিৎসার উপযোগী অস্ত্র-পূর্ণ একটি বাক্স উপহার প্রদান করা হইয়াছে। এই উপহার-প্রদান-কালে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছিলেন, ভারত-মহিলাগণ সংসারধর্ম্মে স্বামীর সহযোগিনী, গৃহধর্ম্মে পারদর্শিনী ও সন্তানের জননী হইয়াও চিকিৎসা-বিদ্যায় কিরূপ সাফল্য লাভ করিতে পারেন, শ্রীমতী কমলাকর তাহার উজ্জ্বল

সভাপতির এই কথার উত্তরে শ্রীমতী কমলাকর বলেন, 'আমি আমার জীবনে যে সাফল্য সঞ্চয় করিয়াছি, আমার স্বামীই তাহার মূল; আমি এ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার যে সহায়তা লাভ করিয়াছি, সে কথার উল্লেখ না করিলে আমার কর্ত্তব্যহানি হইবে। ভারতে ও ইউরোপে আমাকে যে কঠোর জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, তাহাতে আমি কখনও তাঁহার সহায়তায় বঞ্চিত হই নাই।'

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রমণীর মিলন।

উক্ত পত্রিকা আরও লিখিয়াছেন, গত দুই বৎসর হইতে লাহোর পরদা-ক্লাবের কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইতেছে। এই ক্লাবে হিন্দু, মুসলমান, দেশীয় খৃষ্টান, পারসী ও ইংরাজ রমণী 'সভ্য' আছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মহিলাগণ এখানে বন্ধুভাবে সম্মিলিত হইয়া পরস্পর চিন্তার আদান প্রদান করেন। মুসলমান ও হিন্দু মহিলারা ইংরাজী শিখিবার ও ইংরাজ মহিলারা উর্দ্দু শিখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। এক বৎসরে এই মজলিসের দশটি অধিবেশন হইয়াছে; এই মজলিস হিন্দু, মুসলমান, পারসী, দেশীয় খৃষ্টান ও ইংরাজ মহিলাগণের গৃহে আহূত হইয়াছিল। লাহোর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ব্যবধান দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে।

শিল্প ও স্বদেশী।

'ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ।' বারানসীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ হইতে হিন্দু যুবকদিগের হিতার্থ প্রকাশিত ক্ষুদ্রকায় পত্রে ডাক্তার কুমারস্বামী শিল্প ও স্বদেশী শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা এই 'স্বদেশী' যুগে ভারতবাসীর আলোচ্য। এই সিংহলী লেখক যেরূপ সাগ্রহে ও শ্রদ্ধাসহকারে ভারতীয় শিল্পের আলোচনা করিতেছেন, তাহাতে আমাদের বিস্ময় উৎপাদিত হয়। শিল্পসম্পদসম্পন্ন ভারতবর্ষ একদিন আপনার আদর্শে সিংহলের শিল্প অনুপ্রাণিত করিয়াছিল; আর আজ সেই সিংহলবাসী কুমারস্বামী শিল্পের সমুন্নত ও সুন্দর আদর্শ হইতে বিচ্যুত ভারতবাসীকে তাহার অনাদৃত শিল্পরত্ন-ভাণ্ডারের সন্ধান দিতেছেন। বিদেশীয় আদর্শে—কেবল অর্থলাভলালসায় আমরা কিরূপে আদর্শভ্রষ্ট হইতেছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে কুমারস্বামী তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। অর্থকরী না হইলে কোনও বিদ্যাই স্থায়িভাবে আলোচিত হইতে পারে না, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু আপাততঃ অর্থলাভের আশায় শিল্প যদি স্বকীয়-স্বাতন্ত্র্য-বর্জ্জিত হয়, তবে তাহার দুর্দ্দশা ও বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। মধ্যযুগে এই বিশেষত্ব হেতুই পারস্যের, মিশরের ও সিরিয়ার মুসলমান শিল্পীদিগের রচিত দ্রব্য প্রতীচ্যে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। তাহার পর বিশেষত্ববশতঃই চীনের পোর্সিলেন প্রভৃতি সমাদর লাভ করে। আজও যে জাপানের দ্রব্যসম্ভার সর্ব্বত্র সমাদৃত, এইরূপ বিশেষত্বই তাহার প্রধান কারণ। এই সকল দেশেই শিল্পজ—জাতীয় শিল্প—বিশেষত্ব-ব্যঞ্জক। ভারতের শিল্পও এই বিশেষত্ব হেতু জগতে সমাদৃত হইয়াছিল। এখন আমরা সেই বিশেষত্ব হারাইয়া অনুকরণেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। শিল্প যখন অনুকরণে পর্য্যবসিত

তত দিন সে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে; বিজাতীয় আদর্শকেও আত্মসাৎ করিয়া আপনার কার্য্যোপযোগী করিয়া লয়। ভারতীয় শিল্পও উন্নত দশায় এইরূপ করিয়াছে—করিতে পারিয়াছে। কিন্তু এখন বিশেষত্ববর্জ্জিত হইয়া সেই সমাদৃত শিল্প অনুকরণমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ইহাতে যে কেবল ভারতের ও ভারতীয় শিল্পীদিগেরই ক্ষতি হইয়াছে, এমন নহে; পরন্তু জগতেরও শিল্প সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে; তাহাতে জগতের শিল্পসৌন্দর্য্যের এক দিক মলিন হইয়া গিয়াছে।

কুমারস্বামী বলিয়াছেন, ভারতের যে সকল প্রধান নগরে বিদেশী পর্য্যটকগণ আগমন করিয়া থাকেন, সেই সকল নগরের যে কোনও দোকানে প্রবেশ করিলে খেলো কাঠের ও পিত্তলের ক্ষোদাই কায, সস্তা মিনার কায ও আতিশয্যহেতু শ্রীহীন জরীর কাযের মধ্যে পুরাতন সুন্দর শিল্পের দুই চারিটি নিদর্শন পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এইরূপ দ্রব্যই ভারতে প্রচুরপরিমাণে উৎপন্ন হইত এবং গত তিন শতাব্দী ধরিয়া বিদেশে রপ্তানী হইত। এখন সেরূপ কায দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমেরিকা ও জার্ম্মেনী সেরূপ দ্রব্য কিনিয়া শিল্পাগারে রক্ষা করে—তাহাতে য়ুরোপীয় শিল্পীরা শিক্ষালাভ করে, য়ুরোপীয় কারিগরদিগের সুবিধা হয়। এই সকল দ্রব্যের চিত্র য়ুরোপের শিল্পসম্বন্ধীয় পত্রে প্রকাশিত হয়, শিল্পশিক্ষাগারে প্রদর্শিত হয়। প্রতীচ্যে শিল্পীর সৃষ্টিশক্তি লোপ পাইয়াছে, প্রাচ্যে সে শক্তি অল্পদিন পূর্ব্বেও অক্ষুণ্ণ ছিল—স্থানে স্থানে আজও আছে। এই সকল আলেখ্য সৃষ্টিশক্তির অপূর্ব্ব নিদর্শন। কিন্তু এ সকলই প্রাচীন কীর্ত্তি। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, ইংরাজী দীক্ষায় দীক্ষিত ভারতবর্ষ এরূপ কোনও সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। মহিলাকুলের বরবপুর বেষ্টনে মনোরম মসলিন বা কুসুমিত পট্টবাস, চারুচিত্রাঙ্কিত নিত্য ব্যবহার্য্য পিত্তলপাত্র, হর্ম্মতলাস্তরণ কোমল গালিচা—সে সব আর নাই। এখন ভারতের দোকানে বিদেশী দ্রব্যের অনুকরণবাহুল্য—বিদেশী বর্ণে রঞ্জিত বস্ত্র, নানাবর্ণের তোরঙ্গ, জুতার কালী, সাবান—এই সবই প্রচুর। এ সকলে সৌন্দর্য্যের শোচনীয় অভাব।

ভারতবর্ষ যদি বিদেশী ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, তবে তাহার বাণিজ্যগত বা রাজনীতিক স্বাধীনতাও যে সাধনার যোগ্য মনে হইবে না। ভারতের শিল্পসম্পদ যদি হৃত হয়, তবে কিছুতেই সে ক্ষতির পূরণ হইবে না। এখনও কোনও কোনও য়ুরোপীয় শিল্পীর বিশ্বাস, প্রাচ্য-খণ্ডাগত সঞ্জীবনী শক্তিতেই অধঃপতিত প্রতীচ্য শিল্পের সংস্কার ও উন্নতি সংসাধিত হইবে। ভারতবর্ষ যখন রাজনীতিক্ষেত্রে অগ্রগামী—যখন ভারতবাসীরা জাভায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে, এবং চীনে নবভাব জাগাইয়াছে—তখনই ভারতীয় শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। সৌন্দর্য্য ও সুনীতি পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ—উভয়েরই অনুশীলন অত্যাবশ্যক। ভারতে শিল্পের অবনতি—বিদেশী দ্রব্যের অনুকরণে দ্রব্যাদির গঠন, ঘটের পরিবর্ত্তে কেরসিন-টিনের ও টালির পরিবর্ত্তে দস্তার চাদরের ব্যবহার, বিদেশী বেশের ব্যবহার, গৃহসজ্জায় নানা দেশের নানা দ্রব্যের সৌন্দর্য্যহীন সমাবেশ, হারমোনিয়মের ও গ্রামোফোনের বহুল প্রচলন-এ সবই অন্তরস্থ বিষম ব্যাধির বাহ্যিক বিকাশ।

বা বাণিজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতের পুনরুত্থান হইবে না; শিল্পের পুনরুত্থানও আবশ্যক। কেবল পার্থিব আদর্শে জাতিগঠন সম্ভব নহে—সে জন্য ভিন্ন আদর্শ—স্বপ্ন—আবশ্যক। জীবনে এই সৌন্দর্য্যহানি আমাদের দেশপ্রেমের অভাবের পরিচায়ক। কারণ, ভারতবর্ষ সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি। আমরা ভারতবর্ষকে ভালবাসি না, ইহা আমাদের জাতীয় অনুষ্ঠানের দৌর্ব্বল্য। সৌন্দর্য্য বিস্মৃতির অতলতলে বিসর্জ্জন দিয়া য়ুরোপের অর্থলালসাময়ী শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে আমাদের যেরূপ অবস্থা হইবে, আমরা সেইরূপ অবস্থাই ভাল বাসিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহাতে জাতিগঠন অসম্ভব। তাই মিষ্টার হ্যাভেলের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কুমার স্বামী বলিয়াছেনঃ—গবর্মেণ্টকে ভারতীয় শিল্প ও কলা পুনর্জ্জীবিত করিতে অনুরোধ করিও না। যাহা করিবার যোগ্য, তাহা আপনারাই করিতে পার—আপনারাই কর। তাহার পর তোমাদের কর্ত্তব্য শেষ হইলে কোনও গভর্মেণ্টই তোমাদিগকে রাজনীতিক অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। শিল্প-জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইলে ভারতে সৃষ্টিশক্তির পুনরাবির্ভাব হইবে। তখন বর্ত্তমানের দুর্ব্বলতা ও দৈন্য দূর হইয়া যাইবে।

সৌন্দর্য্যজ্ঞানের অভাবেই ভারতের শিল্প বিলুপ্ত হইতেছে—উদ্ধারের উপায়ও উদ্ভাবিত হইতেছে না। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি ভারতবাসী বীতরাগ বলিয়াই বংশপরম্পরাক্রমে সুশিক্ষিত শত শত শিল্পীর অন্ন জুটিতেছে না। সঙ্গীতসাধক ও যন্ত্রনির্ম্মাতৃবর্গ অন্নহীন—আর বর্ষে বর্ষে বিদেশ হইতে পঞ্চদশ লক্ষ টাকার যন্ত্র ভারতে আমদানী হয়! একে ত দেশের অর্থনাশ হইতেছে। তাহাতে আবার শিক্ষিত লোকের সংখ্যার হ্রাস হইতেছে। এই ক্ষতি অর্থে পূরিত হইবার নহে।

তন্তুবায়দিগের সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যায়। ভারতীয় বর্ণবিন্যাস ও নমুনা অনাদৃত। ফলে, তন্তুবায় 'জাত-ব্যবসায়ে' অন্নসংস্থান করিতে না পারিয়া চাকরী অবলম্বন করিতেছে,—সমগ্র সমাজের সুদৃঢ় বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িতেছে। আবার কেবল অর্থের জন্য সৌন্দর্য্য পদদলিত করিয়া আমরা পল্লীগ্রামে শ্রমশিল্পের উন্নতিবিধানে সচেষ্ট না হইয়া ম্যানচেষ্টারের অনুকরণে কলকারখানায় নৈপুণ্যহীন শ্রমজীবী সংগ্রহ করিয়া সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্য উভয়ই অবহেলা করিতেছি। ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে সমগ্র ইংলণ্ডের ও ওয়েল্‌সের যে জনসংখ্যা ছিল, বর্ত্তমানে ইংলণ্ডের বড় বড় সহরের জনসংখ্যা তাহার সমতুল্য। কিন্তু মধ্যযুগের দাসদিগের অবস্থাও এই সকল নগরবাসী শ্রমজীবীর অবস্থার তুলনায় স্পৃহনীয় ছিল। ইহারা দারিদ্র্যপিষ্ট; ইহাদের গৃহ অপরিচ্ছন্ন; ইহাদের অবস্থা শোচনীয়। ইংলণ্ডের এক-দশমাংশ লোক জেলে, বা শ্রমাগারে, বা পাগলাগারদে জীবলীলা শেষ করে। তাহাদের অবস্থা কি স্পৃহনীয়? তথাপি আমরা তাহাদেরই অনুকরণ করিতে ব্যস্ত! রাজনীতিক দ্বন্দ্বে শক্তির অপচয় অনাবশ্যক। শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধন করিতে পারিলে দেশের উন্নতির গতি কেহই রোধ করিতে পারিবে না।

আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাউক। স্থায়ী ও উজ্জ্বল বর্ণের জন্য মীরজাপুরের গালিচা বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল। এখন বিদেশী বর্ণের ব্যবহার হেতু আর সে গালিচার আদর নাই। এ ক্ষেত্রে রুচির দোষে বর্ণ-প্রস্তুত-কারকদিগের ও গালিচা-প্রস্তুত-কারীদিগের সর্ব্বনাশ হইয়াছে; সঙ্গে সঙ্গে দেশে ধনাগমের একটি পথ রুদ্ধ হইয়াছে।

শিল্পকবি ব্যতীত ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থান অসম্ভব। কেবল সস্তা করিয়া বিদেশের সহিত প্রতিযোগিতা না করিয়া উৎকর্ষে প্রতিযোগিতা করাই সঙ্গত। 'স্বদেশী'কে রাজনীতিক অস্ত্রমাত্রে পর্য্যবসিত করিলে অন্যায় করা হয়। ইহা ধর্ম্ম ও শিল্প, উভয়ের আদর্শ হইবে। কেহ কেহ 'স্বদেশী'র জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু 'স্বদেশী'র জন্য স্বার্থত্যাগ আবশ্যক নাই। কেবল অর্থের হিসাবে সব জিনিস দেখা মূঢ়ের কার্য্য; উৎকর্ষও বিবেচ্য বিষয়। ভারতীয় শিল্পের স্বত্তা অনুভব করিতে শিখিলে আমরা বুঝিতে পারিব, এখনও ভারতীয় শিল্পী যেরূপ সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে, যেরূপ সুন্দর বস্ত্র বয়ন করিতে পারে, য়ুরোপীয় শিল্পী তাহা পারে না। আমরা মূঢ়তাবশে সেই সৌন্দর্য্য পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী শ্রীহীন আদর্শের অনুকরণ করি। ধনবান যেন এই কথা বুঝেন যে, বিদেশী বর্ণে রঞ্জিত যেরূপ শাটী দুই শত টাকায় পাওয়া যায়, দেশীয় বর্ণে রঞ্জিত সেইরূপ 'বারাণসী শাটী' দুই শত পঞ্চাশ টাকায় ক্রয় করা—নিজেরা কাপড়ের কারখানায় লাভের আশায় টাকা খাটাইয়া লাভ করার অপেক্ষা ভাল। দরিদ্রও সাধ্যানুসারে স্বদেশী শিল্পের পোষণে সহায়তা করুন; 'অগ্নি-পুরাণে'র সেই কথা যেন দরিদ্র বিস্মৃত না হয়েন,—ধনী বৃহৎ দেউল রচনা করিয়া যেরূপ পুণ্য সঞ্চয় করেন, দরিদ্র ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত করিয়া সেইরূপ পুণ্যই সঞ্চয় করেন। জাতীয় সম্পদের হিসাবেও ক্ষণবিধ্বংসী বহুবস্তুর অপেক্ষা স্থায়ী অল্পসংখ্যক দ্রব্য বাঞ্ছনীয়। যে স্থপতির শিল্পকীর্ত্তি পাঁচ শত বৎসর স্থায়ী হইবে, তাহার গৌরবের তুলনায়, যাহার শিল্পকীর্ত্তি পঞ্চাশ বৎসরের অধিক থাকিবে না, তাহার গৌরব তুচ্ছ, হেয়। তেমনই যে তন্তুবায়ের বস্ত্র অল্পকাল স্থায়ী, তাহার গৌরব অপেক্ষা যাহার বস্ত্র বংশপরম্পরাক্রমে ব্যবহৃত হইবে, তাহার গৌরব অনেক অধিক। সভ্যতা বাসনার বৃদ্ধি করে না—পরন্তু বাসনাকে সংস্কৃত করে।

শেষ কথা,—পার্থিব সম্পদেই শিল্পের আদর নহে। শিল্প সুন্দরের মহিমা বিস্তৃত করে,—বুঝায়।

কুমার স্বামী ভারতীয় শিল্পের স্বত্ব অনুভব করিয়াছেন—ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার স্বরূপ বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বেও দুই এক জন ভারতবাসী এইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু বিদেশী বিলাসে আসক্তিহেতু ভারতবাসী তাহা বুঝে নাই;—প্রতীচ্য আদর্শের অনুকরণে আগ্রহাতিশয় বশতঃ ভারতবাসী সে কথা শুনে নাই। এখন ভারতে নবযুগের আরম্ভ। আর কুমার স্বামী যে ছাত্রসমাজকে এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাদের হৃদয় নির্ম্মল—তাহাদের হৃদয়ে বিদেশী আদর্শ বহুদিন স্থায়ী হয় নাই;—আবার তাহারাই ভারতের ভবিষ্যতের আশা, ভারতের ভাগ্যবিধাতা। তাহারা কুমার স্বামীর এই কথা বুঝিয়া ভারতের নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার সাধন করিবে, এ আশা—এ সুখস্বপ্ন সফল হইবে কি?

জ্যোতিষিক সমস্যা।

প্রকৃতির নিয়মগুলি তাহাদের অমোঘতা ও কঠোরতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। সত্যই উহাদের ব্যতিক্রম নাই। সুতরাং হঠাৎ একটা নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপার চোখে পড়িলে সেটাকে নিয়মের মধ্যে ফেলিবার প্রবৃত্তি আমাদের মনে আপনিই জাগিয়া উঠে। পূর্ব্বে যে সকল ব্যাপারকে অতিপ্রাকৃত বলিয়া মনে হইত, প্রকৃতির কতকগুলি নিয়মের সুস্পষ্ট সন্ধান পাইয়া, আজ তাহার অনেকগুলিকেই আমরা নিয়মের পর্য্যায়ে ফেলিতে পারিতেছি। বলা বাহুল্য, প্রকৃতির সকল নিয়মের সহিত আজও আমাদের পরিচয় হয় নাই। যে বিরাট শিল্পশালায় বসিয়া প্রকৃতি দেবী ব্রহ্মাণ্ডের গঠন করিতেছেন, তাহার প্রায় সকল দ্বারই রহস্য-যবনিকায় আবৃত রহিয়াছে। কোন্ নিয়মে ও কোন্ কৌশলে একই জড় পদার্থ বিচিত্র আকার ও বিচিত্র ধর্ম্ম পাইয়া শিল্পশালা হইতে বহির্গত হইতেছে, তাহার সন্ধান মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধি অদ্যাপি জানিতে পারে নাই। কাজেই যাহাদিগকে পরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী করা যায় না, এ প্রকার অনেক ব্যাপার অব্যাখ্যাত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে কয়েকটি জ্যোতিষিক অব্যাখ্যাত ঘটনার উল্লেখ করিব।

অতি প্রাচীন কালের বিখ্যাত ঘটনাগুলির সময়-নিরূপণ বড়ই কঠিন কার্য্য। গ্রন্থোক্ত ঘটনার সময় ও গ্রন্থসমাপ্তির কাল, আধুনিক পুস্তক-মাত্রেই স্পষ্ট লিপিবদ্ধ থাকে। প্রাচীন গ্রন্থকারগণ এই দিক্‌টায় আদৌ দৃষ্টি দিতেন না। বিশেষ ঘটনার সময়—প্রধান প্রধান গ্রহনক্ষত্রগুলি আকাশের কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছিল, কেবল তাহারই উল্লেখ কালনির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া ইঁহারা বিশ্বাস করিতেন। প্রাচীন গ্রন্থের এই প্রকার জ্যোতিষিক বিবরণ দেখিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ অনেক ঘটনার কাল-নির্ণয় করিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের কাল এই প্রথায় আবিষ্কার করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, এবং মহাত্মা বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ও ঐ উপাদেয় বৈদিক যুগের অনেক তত্ত্ব সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

খৃষ্টের জন্মকাল সম্বন্ধে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। তাঁহার জন্ম-বৎসর হইতেই খৃষ্টাব্দের গণনা হইতেছে। তথাপি বাইবেলে যে

বেথেল্‌হাম নক্ষত্রের (star of Bethleham) উল্লেখ আছে, সেটি আমাদের পরিজ্ঞাত জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে কোন্‌টি, এবং ১৯০৯ বৎসর পূর্ব্বে তাহার বাস্তবিকই উদয় হইয়াছিল কি না, তাহা স্থির করিবার জন্য কয়েক জন জ্যোতিষী চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শুক্র গ্রহের কথা পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন। এই গ্রহটি পর্য্যায়-ক্রমে সান্ধ্যতারা ও শুকতারা হইয়া পশ্চিম ও পূর্ব্বগগনে উদিত হয়। উজ্জ্বলতায় কোনও গ্রহনক্ষত্রই ইহার সমকক্ষ নয়। গত ১৮৮৭ এবং ১৮৮৯ সালের খ্রীষ্টমাসের সময় শুক্রকে (Venus) পূর্ব্বগগনে উদিত হইতে দেখিয়া, পূর্ব্বোক্ত জ্যোতিষিগণ উহাকেই বেথেল্‌হামের নক্ষত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ষ্টক্‌ওয়েল (stock well) এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাস করেন নাই। ইনি গণনায় বসিয়া দেখিয়াছিলেন, খৃষ্ট-জন্মের ছয় বৎসর পূর্ব্বে ৮ই মে তারিখে বৃহস্পতি (Jupiter) ও শুক্র পৃথিবীর সহিত সমসূত্রে দাঁড়াইয়া একত্রযোগে একটি বৃহৎ জ্যোতিষ্কের আকার ধারণ করিয়াছিল। ইনি এই যুগ্ম শুক্র-বৃহস্পতিকেই বেথেল্‌-হামের নক্ষত্র বলিতে চাহিতেছেন। সুতরাং এই হিসাবে খৃষ্টের মৃত্যুদিন খৃষ্টাব্দের ৩৩ সালের ৩রা এপ্রেল হইয়া পড়ে।

পাদরীরা ষ্টক্‌ওয়েলের এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাসস্থাপন করিতে চাহিতেছেন না। ইঁহারা বলিতেছেন, খৃষ্টের জন্মকালে জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব ছিল না। সুতরাং তাঁহারা যে শুক্র-বৃহস্পতির সংযোগের (conjunction) ন্যায় সুলভ ঘটনাকে একটা নূতন নক্ষত্রের উদয় বলিয়া ভ্রম করিবেন, এ কথা কখনই স্বীকার করা যায় না।

পাদরীদের কথাটি নিতান্ত অযৌক্তিক নয়। কাজেই বেথেল্‌হামের নক্ষত্রের ব্যাপারটি যে আজও রহস্যাবৃত রহিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শুক্র গ্রহটি আমাদের এত নিকটে থাকিয়াও অদ্যাপি আত্মপরিচয় দেয় নাই। পৃথিবী যেমন এক দিনে নিজের অক্ষরেখার (Axis) চারি দিকে ঘোরে, শুক্রেরও সেই প্রকার এক আবর্ত্তন-গতি আছে, জানা গিয়াছে। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও উহার আবর্ত্তনকাল স্থির করা যায় নাই। ক্যাসিনি (Cassini) ও ফ্লামেরিয়ন্‌ (Flammarion) প্রভৃতি জ্যোতিষীরা বলেন,

সিয়াপেরেলি (Schiaparelli) ও লয়েল (Lowell) প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়া বলেন, শুক্র এত মন্থরগতিতে আবর্ত্তন করে যে, সে কখনই ২২৫ দিনের কমে এক পূর্ণাবর্ত্তন শেষ করিতে পারে না। প্রত্যেক দলই এক এক দিক্ ধরিয়া নিজের সিদ্ধান্তের পোষক যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন। সুতরাং বৈজ্ঞানিকদিগের শত চেষ্টা সত্ত্বেও, শুক্রের আবর্ত্তনকাল স্থির হয় নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হইতেছে।

আমাদের চন্দ্রের যেমন হ্রাসবৃদ্ধি আছে, দূরবীণ দিয়া শুক্রগ্রহ পর্য্যবেক্ষণ করিলে তাহারও সেই প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যায়। শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, বা চতুর্থীর খণ্ড-চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহার উজ্জ্বল কলার সঙ্গে সঙ্গে অনুজ্জ্বল অংশটিকে যেমন ক্ষীণ আলোকে আলোকিত দেখা যায়, শুক্রের অনুজ্জ্বল অংশকেও সেইপ্রকার এক ক্ষীণালোকে আলোকিত হইতে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিকটে অপর আর একটি জ্যোতিষ্ক না থাকিলে, অনুজ্জ্বল অংশে এই প্রকার ক্ষীণা-লোকে দেখা দেয় না। চন্দ্রের নিকটে পৃথিবী রহিয়াছে, তাই সূর্য্যের আলোক পৃথিবী হইতে প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশের উপরে পড়ে, এবং তাহাতেই চন্দ্রের যে অংশ প্রত্যক্ষ সূর্য্যালোক হইতে বঞ্চিত, তাহা অস্পষ্ট আলোকিত হয়। বহু পর্য্যবেক্ষণেও শুক্রের নিকটে কোনও জ্যোতিষ্ক দেখা যায় নাই। ইহার একটিও উপগ্রহ নাই। কাজেই শুক্রের দেহ যখন সূর্য্যালোকের অন্তরালে থাকে, তখন শুক্র কোন্ আলোকে উজ্জ্বল হয়, তাহা স্থির করিবার জন্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণকে গবেষণা করিতে হইয়াছিল। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও অদ্যাপি তাঁহারা কোনও স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

কয়েক জন পণ্ডিত স্থির করিয়াছিলেন, আলোকটি শুক্রের সমুদ্র বা আকাশ হইতে বহির্গত হইয়া শুক্রমণ্ডলকে উজ্জ্বল করে। আর এক জন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন, শুক্র সূর্য্যের ন্যায় জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক। শুক্র যে জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক নয়, তাহার প্রচুর প্রমাণ আছে; এবং উহার উপরে সমুদ্র বা আকাশ (Atmosphere) আছে কি না, তাহার কোনওই প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। সুতরাং শুক্রের আলোক সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির উপর বিশ্বাসস্থাপন করা চলিতেছে না।

একটি বৃহৎ উল্কাপাত লক্ষ্য করিয়াছিলেন। উল্কাটি আকারে প্রায় চন্দ্রের ন্যায় বৃহৎ দেখাইয়াছিল, এবং প্রায় পাঁচ মিনিট কাল আকাশে থাকিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী ফুলার এই উল্কাটিকেই দুই ঘণ্টা পরে আকাশে বিচরণ করিতে দেখিয়াছিলেন। গিল্ ও ফুলার, উভয়েই বিজ্ঞ জ্যোতিষী। তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণে অবিশ্বাস্য কিছুই থাকিতে পারে না। কাজেই উল্কাপাত ব্যাপারটি জ্যোতির্ব্বিদ্‌দিগের নিকট অদ্যাপি একটি বৃহৎ প্রহেলিকা হইয়া রহিয়াছে।

উল্কামাত্রই পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট হইলে আকাশের উচ্চ স্থান হইতে নীচে নামিতে আরম্ভ করে, এবং তার পর বায়ুর সংঘর্ষণে জ্বলিয়া উজ্জ্বল হইয়া থাকে। নীচের আকাশ হইতে কোনও উল্কাই উপরের আকাশে ছুটিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু অধ্যাপক ভন্ নিসল্ (Von Niessl) ইটালিতে অবস্থানকালে এই প্রকার একটি ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই তারিখে একটি বৃহৎ উল্কাপিণ্ডের আবির্ভাব ও তিরোভাবকাল পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নিরূপণ করিয়া অধ্যাপক নিসল্ গণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। গণনায় জ্যোতিষ্কটির আবির্ভাব ও তিরোভাব-কালের উচ্চতা ৪২ ও ৯৮ মাইল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাজেই উল্কাটি নীচের দিক্ হইতে উপরের দিকে চলিয়াছিল, বলিতে হয়।

নিসল্ তাঁহার এই পর্য্যাক্ষেণ ও গণনার ফল প্রধান জ্যোতিষীদিগকে জানাইয়াছিলেন; কিন্তু কেহই এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

আমেরিকার আরিজোনা অঞ্চলে (Central Arizona U. S. A) কুন পর্ব্বত (Coon mountain) নামক একটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। পাহাড়টি সমতল ক্ষেত্রের উপরে অবস্থিত, এবং উচ্চতায় পঞ্চাশ গজের অধিক নয়। ইহারি শিখরদেশে ৫৬০ ফুট গভীর এক বৃত্তাকার গহ্বর আছে। পার্শ্বস্থ ভূমির তুলনায় গহ্বরের তলদেশ প্রায় চারি শত ফিট নিম্নে অবস্থিত। পর্ব্বত-হীন প্রদেশে এই প্রকার একটি বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপ কি প্রকারে সঞ্চিত হইয়া-ছিল, এবং (তাহার চূড়ার গহ্বরটিই বা কি প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছিল, এই সকল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য মার্কিন বৈজ্ঞানিকগণ বহুকাল হইতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ্ বারিংগার (Barringer) স্তূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিতেছেন, খুব সম্ভবতঃ একটি বৃহৎ উল্কা বা ক্ষোদিষ্টগ্রহ

(Asteroid) পৃথিবীর টানে সবেগে ভূপতিত হইয়া গহ্বর ও স্তূপ উভয়েরই রচনা করিয়াছে। রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণও স্তূপের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া তাহাতে উল্কাপিণ্ডের অনেক উপাদান দেখিতে পাইয়াছেন। সুতরাং কোনও প্রকার জ্যোতিষ্কের পতনেই যে উহার উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন্ সময়ে কি প্রকার জ্যোতিষ্কের পতন হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি স্থিরীকৃত হয় নাই। সাত শত বৎসরের বৃদ্ধ সিডার বৃক্ষ দ্বারা গহ্বরের মুখ এখন আচ্ছন্ন দেখা যায়। ইহা দেখিয়া জনৈক বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, সম্ভবতঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে জ্যোতিষ্কটি পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই হিসাবটি সম্পূর্ণ আনুমানিক, সুতরাং উহার উপর বিশ্বাসস্থাপন করা যায় না।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে প্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতিষী লাল্যাণ্ড (Lalande) যাম্যোত্তর রেখার নিকটে একটি ষষ্ঠ শ্রেণীর ক্ষুদ্র নক্ষত্রকে দেখিয়া তাহার অবস্থাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। সম্প্রতি সেই পর্য্যবেক্ষণ-লিপিগুলি লইয়া আলোচনা করিতে গিয়া আধুনিক জ্যোতির্বিদ্গণ লাল্যাণ্ড সাহেবের স্বহস্তলিখিত একটি মন্তব্য আবিষ্কার করিয়াছেন। মন্তব্যে ঐ নক্ষত্রটির কার্য্য বড়ই আশ্চর্য্যজনক বলিয়া লিখিত আছে। নক্ষত্রটির কোন্ কার্য্যে লাল্যাণ্ড বিস্মিত হইয়াছিলেন মন্তব্য-পাঠে তাহা বুঝা যায় না। অধ্যাপক গোর এই সূত্র অবলম্বন করিয়া নক্ষত্রটিকে বহুদিন ধরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহাতে মূল নক্ষত্রের বিম্বে আরও দুইটি ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রকে সংলগ্ন দেখা গিয়াছিল।

দুই তিনটি নক্ষত্রের একত্র অবস্থান আধুনিক জ্যোতিঃশাস্ত্রে নূতন ব্যাপার নয়। নানা উপায়ে এখন সহস্র সহস্র যুগল-নক্ষত্রের অবস্থানাদি জানা গিয়াছে। লাল্যাণ্ডও অনেক যুগল-নক্ষত্রের সহিত পরিচিত ছিলেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ক্ষুদ্র নক্ষত্রটির যে কার্য্যে জ্যোতিষী লাল্যাণ্ড বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহাঅদ্যাপি অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে।

লয়েল (Lowell) মানমন্দিরের বৃহৎ দূরবীণের-সাহায্যে আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়া ডাক্তার সি (Dr. See) মেঘনির্ম্মুক্ত আকাশের স্থানে স্থানে ঈষৎ উজ্জ্বল মেঘখণ্ডের ন্যায় কতকগুলি পদার্থ ভাসিতে দেখিয়াছিলেন। অপর বৈজ্ঞানিকদিগের নিকট এই আবিষ্কারসমাচার

প্রচারিত হইলে, তাঁহারা সেগুলিকে অতি সূক্ষ্ম জ্যোতিষ্কের সমষ্টি (Cosmic cloud) বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। ডাক্তার সির পর্য্যবেক্ষণের পর অপর অনেক জ্যোতিষী ঐ মেঘাকার পদার্থগুলিকে দেখিয়াছেন; কিন্তু তাহারা বাস্তবিকই ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্কের সমষ্টি কি না, তাহা নিঃসংশয়ে জানা যায় নাই।

চীন দেশের অতি প্রাচীন পুরাতত্ত্বে একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬৮৭ অব্দে একদিন চীন জ্যোতিষিগণ আকাশে একটিও নক্ষত্র দেখিতে পান নাই। বলা বাহুল্য, সে দিন আকাশে মেঘের লেশমাত্র ছিল না। পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের সময় যখন পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন দুইটি বৃহৎ নক্ষত্র ব্যতীত অপর জ্যোতিষ্কগুলিকে প্রায়ই দেখা যায় না। নক্ষত্রহীন পরিচ্ছন্ন রজনীর কথা শুনিয়া কয়েক জন আধুনিক বৈজ্ঞানিক তাহাকে কোনও পূর্ণ সূর্য্যগ্রহণের বিবরণ বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। চীন দেশের প্রাচীন ইতিহাসে বহুকালের সূর্য্যগ্রহণেরও তালিকা সন্নিবিষ্ট আছে। তালিকায় খৃঃ-পূঃ ৬৮৭ অব্দের কোনও সূর্য্যগ্রহণের উল্লেখ নাই। কাজেই সূর্য্যগ্রহণের কথাটাকে অযৌক্তিক বলিয়া বর্জ্জন করিতে হয়। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্‌গণ এই ঘটনাটি লইয়া অনেক আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি তাহার কোনও মীমাংসা করিতে পারেন নাই।

এতদ্ব্যতীত চীনের পুরাবৃত্তে আরও একটি আশ্চর্য্য জ্যোতিষিক ঘটনার উল্লেখ আছে। খৃঃ পূঃ ১৪১ সালের কোনও সময়ে প্রায় পাঁচ দিন ধরিয়া চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ই গাঢ় রক্তবর্ণ ধারণ করিয়া প্রাচীন চীন জ্যোতিষীদিগকে চমকিত করিয়াছিল। আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত আরম্ভ হইলে আকাশ প্রায়ই অতিসূক্ষ্ম ভস্মকণায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এই প্রকার ভস্মাচ্ছাদিত আকাশ কখনও কখনও চন্দ্র-সূর্য্যের বর্ণকে রক্তাভ করিয়া থাকে। চীনদেশের নিকটে আগ্নেয় গিরির অভাব নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়া আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতকে পূর্ব্বোক্ত ঘটনার কারণ বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু সেই সময়ের চীনের ইতিহাসে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাতের কোনও উল্লেখই দেখা যায় না। কাজেই ঘটনাটি আজও রহস্যময় রহিয়াছে, বলিতে হয়।

অব্যাখ্যাত থাকিয়া যায়, তাহা হইলে জ্যোতিঃশাস্ত্রের কোনও ক্ষতিরই সম্ভাবনা নাই। তথাপি যে সকল আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্যোতিষ্কতত্ত্বের সকলই জানা গিয়াছে ভাবিয়া স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, এইসকল ক্ষুদ্র ঘটনার তত্ত্বাবিষ্কারে তাঁহাদেরই চেষ্টা ব্যর্থ হইতে দেখিলে বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। এগুলির সদ্ব্যাখ্যানের জন্য আরও যে কতকাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে, তাহা কে বলিবে?

শ্রীজগদানন্দ রায়।

নির্ব্বাণ।

ভগবান বুদ্ধদেব যখন নির্ব্বাণমুক্তির প্রচার করিয়াছিলেন, তখন অসংখ্য নরনারী তাঁহার সেই মুক্তিমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছিল। সুশিক্ষিত হউক, অশিক্ষিত হউক, কাহারও পক্ষে নির্ব্বাণ কথাটার অর্থ দুরূহ, প্রচ্ছন্ন, বা জটিল মনে হয় নাই; সকলেই উহার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাণ-লাভের জন্য তথা গতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কালপ্রভাবে আমরা ভগবান বুদ্ধদেবের প্রদত্ত সুশিক্ষা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি; এখন বিলাতী Annihilation শব্দের সাহায্যে নির্ব্বাণের অর্থ ধ্বংস বুঝিয়া লইয়াছি।

কোনও কোনও সম্প্রদায় ভারতীয় শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া যতটা অনিষ্ট করিয়াছেন, এতটা কোনও কালে কেহ করিয়াছে কি না জানি না। ইঁহারা সকল শাস্ত্রের কথাতেই একটা নিগূঢ় ও প্রচ্ছন্ন দিক দেখিতে পান; তাই অতি সরল সহজ বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও জটিল ব্যাখ্যা করিয়া Esotoric Buddhism নামে একটা উদ্ভট মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। একালের অজ্ঞতা এই সূক্ষ্মতত্ত্ববাদীদের গবেষণায় গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে।

তথাগত করুণাময় ছিলেন তিনি এমন সুবোধ্য করিয়া মুক্তির কথা কহিতেন যে, আনন্দ হইতে সোমা, কস্সপ হইতে ধনিয়াগোপ,—সকলেই সে অমৃততত্ত্ব বুঝিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিত। আর যেখানে যাহা থাকুক, ভগবানের স্বয়ং-প্রচারিত ধর্ম্মে প্রচ্ছন্নতা বা জটিলতা ছিল না। যাঁহারা প্রাচীন বৌদ্ধমত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন কদাচ এ কথা বিস্মৃত না হয়েন।

অর্ব্বাচীন যুগের সংস্কৃতের নির্ব্বাণ অর্থই এখন আমাদের সকল

লক্ষ্য করিয়াই ইউরোপে Annihilation ব্যাখ্যা চলিয়াছিল। বায়ুশূন্যতা অর্থে যে প্রাচীন কালের ভাষায় নির্বাত ও নির্ব্বাণ কথার ব্যবহার ছিল, সেটার প্রতি লক্ষ্য করিবার অবসর হয় নাই। কোন্ গ্রন্থ কোন যুগের লেখা, ইহা জানিয়া লওয়া কত আবশ্যক, তাহা অনেক ব্যাখ্যাকার হৃদয়ঙ্গম করেন না। সময়ের নিরূপণ না করিয়া শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কত যে মনগড়া আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কোনও একখানি গীতা খুলিলেই দেখিতে পাই।

প্রাচীনকালে যে কেবল বায়ুশূন্যতা অর্থেই নির্ব্বাণ শব্দের ব্যবহার ছিল, নিবে যাওয়া অর্থ একেবারেই ছিল না, তাহা পাণিনির ব্যাকরণে সুস্পষ্ট রহিয়াছে। বুদ্ধদেবকে তাঁহার সময়ের অন্ততঃ তিন শত বৎসর পরবর্ত্তী না করিলে, নির্ব্বাণ অর্থে নিবে যাওয়া করা যাইতে পারে না। মানুষের মনের মধ্যে প্রবৃত্তির প্রবল ঝড় বহিতেছে; সেই ঝড়ে আপনাকে অচপল ও প্রশান্ত রাখিবার তত্ত্বই নির্ব্বাণ-তত্ত্ব। যে উপায়ে এই নির্ব্বাণ লাভ করিয়া দুঃখ-মুক্ত হওয়া যায়, ভগবানের সকল উপদেশে তাহাই ব্যাখ্যাত। মহাপুরুষ সিদ্ধার্থ ২৯ বৎসর বয়সে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু বা মহাপরিনির্ব্বাণ আরও অর্দ্ধশতাব্দীর পরে হইয়াছিল। তথাগতের তিরোধান মহাপরিনির্ব্বাণ নাম পাইয়াছিল কেন, তাহা নির্ব্বাণ-তত্ত্ব না বুঝিয়া লইলে বুঝিতে পারা যায় না।

যে তণ্হার (তৃষ্ণা) বিনাশ নির্ব্বাণ-লাভের সোপান, তাহার ইংরাজি অনুবাদ desire নহে; উহার যথার্থ অনুবাদ Greed। 'সংখার' প্রভৃতি প্রাচীনকালের শব্দগুলির উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের জটিলতা বাড়াইব না; যাঁহারা মূল ত্রিপিটক পড়িতে যাইবেন, তাঁহারা বুদ্ধ ঘোষের টীকায় ঐ সকল শব্দের বিশদ অর্থ পাইবেন। সহজ কথা এই যে, হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ প্রভৃতি হইতেই আমাদের দুঃখের উৎপত্তি; এবং ঐ প্রবৃত্তিগুলি আমাদের আত্মাদরের ফল। এই আত্মাদর নষ্ট করিয়া হিংসা, দ্বেষ, লোভ প্রভৃতি কাটাইয়া প্রশান্ততা লাভ করাই নির্ব্বাণ-মুক্তি।

সিদ্ধার্থের সময়ে এ দেশের ধর্ম্মমত কি ছিল, ধর্ম্মসাধনা কিরূপ ছিল, তাহার একটু আভাস পাইলে, এই নির্ব্বাণ-তত্ত্বের নূতনত্ব ও মাহাত্ম্য-কিছু বুঝিতে পারা যায়। দু চারিটি কথায় তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। তত্ত্বের নাম শুনিয়া কাহারও চমকিয়া উঠিবার কারণ নাই; কেন না,

লোকে বৈদিক যাগযজ্ঞে স্বর্গফলের কামনা করিত। দেবতাদিগকে যজ্ঞে তৃপ্ত করিয়া শারীরিক অমঙ্গল ও সাংসারিক অভাব মোচন করিবার চেষ্টা হইত; এবং মৃত্যুর পর ইন্দ্রের মত সম্পদ লাভ করিয়া স্বর্গভোগ প্রার্থিত হইত। সুখভোগ অর্থই দুঃখভোগ; কেন না, দুঃখ ছাড়া সুখ নাই। এই জন্য ভগবান ঐ যাগযজ্ঞে মানুষের মুক্তি হয় না বলিয়া বুঝাইয়াছিলেন। তথাগতের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রমণেরা শরীরের মাংসপিণ্ডকে পিষিয়া চরিত্র-সংযমের পথ দেখাইয়াছিলেন; ভগবান সে প্রথাকেও পরিহার করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

অনেকের এই ভ্রান্ত বিশ্বাস আছে যে, বৌদ্ধধর্ম্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, গৃহত্যাগীর ধর্ম্ম। ভগবান তথাগত যখন লোকহিতের জন্য ক্ষুদ্র সংসার পরিহার করিয়াছিলেন, তখন অনেক থের-থেরি তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কিংবা তাঁহার শিষ্যেরা গৃহধর্ম্ম-পরিত্যাগের শিক্ষা দেন নাই। গীতায় যে নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা পাই, ব্রাহ্মণ্যগ্রন্থে অবিচলিতচিত্তে যে কর্ত্তব্যসেবার শিক্ষা পাই, তাহা তথাগত প্রদত্ত শিক্ষার অনুবৃত্তিমাত্র। বিনয় এবং সুত্তপিটকে যাহার পূর্ণাবয়ব দেখিতে পাই, তাহারই অতিক্ষুদ্র অংশ ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থের গৌরব বাড়াইয়াছে।

লোকে ঈশ্বরতত্ত্ব ও পরলোকতত্ত্ব লইয়া কত ঝগড়াই করে। যাহার কোনও সিদ্ধান্ত নাই, তাহারই মীমাংসায় শান্তিময় মোক্ষের নামে হিংসাময় কলহের সৃষ্টি করে। করুণাময় বুদ্ধদেব ঐ সকল তত্ত্ব উপেক্ষা করিয়া লোক-চরিত্রের এমন একটা দিক দেখাইয়া দিয়াছিলেন, যেখানে কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ নাই। ঈশ্বর ও পরলোক সম্বন্ধে তোমার যে বিশ্বাসই থাকুক, যে মনুষ্যত্ব সকলেরই কাম্য, তাহা লাভ করিবার পথে যাহাতে বাধা বা বিরোধ উপস্থিত না হয়, ভগবান সেই পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। মনুষ্য জাতিকে মনুষ্যত্বের সাধারণ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নির্ব্বাণ-মুক্তির পথে অগ্রসর করিয়াছিলেন। যাহা প্রমাণ করা যায় না, যাহা দেখা যায় না, সে কথা তিনি কদাচ প্রচার করেন নাই। তিনি দেখাইয়া দিয়াছিলেন যে, সাধনাবলে এমন মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়, যাহাতে দুঃখ বিপদের ঝড়ে অবিচলিত থাকিয়া প্রফুল্ল মনে কর্ত্তব্য পালন করা যায়। অর্থাৎ, ইহজীবনেই জরা মৃত্যুর অতীত হইয়া নির্ব্বাণলাভ করা যায়।

কবে আবার ভারতবাসী তাহাদের দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র ত্রিপিটকের পরিচয় পাইয়া পরমমঙ্গলময় উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বানপ্রস্থ।

১

বিবাহের পর সরলা তিন বৎসর বাপের বাড়ী ছিল। শ্বাশুড়ী দিগম্বরী ঠাকুরাণী বলিয়াছিলেন, "বউমা রাঁধিতে বাড়িতে, খাজা গজা তৈরি করিতে, শেলাই প্রভৃতিতে কিছু অপটু। আজকালকার ছেলেরা হোটেলে খাইতে ভালবাসে। বিশেষতঃ আমার খুদীরাম, বামুনের হাতে খাইতে ঘেন্না করে।"

সরলা তিন বৎসর ধরিয়া রান্না শিখিতেছিল। সপ্তাহ পরে একখানি করিয়া স্বামীর পত্র পাইত। তাহা সাত দিন ধরিয়া পড়িত। চিঠিতে কিছুই থাকিত না। "আমি ভাল আছি, তুমি কেমন আছ, এবং মাতাঠাকুরাণীকে আমার প্রণাম জানাইও। ইতি খুদীরাম।"

তাহার পর একখানি পত্র আসিল,—"মার অনুমতিক্রমে তোমাকে আনিতে মামা যাইতেছেন। বাবার 'মার্চ্যাণ্ট হাউসে'র চাকুরী আমার হইয়াছে। অধিক লিখিবার ফুরসৎ নাই।"

খুদীরামের পিতা সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন। প্রায় সাত বৎসর আগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার বিধবা রমণী দিগম্বরীই বিষয় আশয় দেখিতেন।

এক সপ্তাহ হইল, সরলা আসিয়াছে। সরলার রন্ধনপটুতা দেখিয়া শ্বাশুড়ী মনে মনে পুলকিত হইলেন। সকাল বেলার রান্নার ভার ও বৈকালের জলখাবারের ভার সরলার ঘাড়ে পড়িল।

খুদীরাম সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাগানের দিকে ঘুরিত। ফুলগাছে জল দিত, এবং কখনও কখনও আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত। কিন্তু দিগম্বরী ঠাকুরাণীর ভয়ে সরলা যাইত না।

দিগম্বরী ঠাকুরাণী বলিলেন, "বাবা, বউমার একটু ইংরাজী পড়া উচিত, এবং একটু হারমোনিয়মের সঙ্গে গান শেখাও উচিত। সন্ধ্যাকালে মিস্ মিত্রকে আসিতে বলিয়াছি। সে রাত্রি ন'টা পর্য্যন্ত পড়াইবে।"

খুদীরাম নিতান্ত মাতৃভক্ত। সে ধীরভাবে কথাগুলি শুনিয়া বলিল, "মিস্ মিত্র সকাল বেলা আসিতে পারে না?"

মাতা। না; সকালে বউমা রাঁধে।

খুদীরাম কেবলমাত্র 'বেশ' বলিয়া চলিয়া গেল।

আজ রবিবার। বসুজাদিগের বৃহৎ ভবনে খুদীরামের মাধ্যাহ্নিক-নাসিকাধ্বনি চলিতেছিল। শাশুড়ীকে অন্য ঘরে নিদ্রিতা দেখিয়া সরলা লুকাইয়া স্বামীর নিকট আসিল। কিন্তু সেই কথা। খুদীরাম রাত্রিকালে যত ঘুমায়, দিনেও ততোধিক। দুঃখিনী সরলার সাধ হইয়াছিল, দুটো লুকানো ও পুরাণো কথা স্বামীকে বলিবে। কিন্তু তাহা হইল না। সরলা কৃত্তিবাসের রামায়ণ খুলিল। মহাবীর কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের ভাগটা পড়িয়া দেখিল। ডাক্তার সরকারের গৃহচিকিৎসা পাঠ করিয়া দেখিল। নিদ্রাভঙ্গের ব্যবস্থা কোথাও পাইল না। নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টার সহিত নাসিকার ডাক বাড়িতে লাগিল।

সরলার মনে হইল, এ সব চালাকী। "নলিনীর স্বামী নীলকণ্ঠ ত এমন করে না। বোধ হয়, স্বামীর ভালবাসা সে পায় নাই। কিংবা হয় ত অন্য ———। সরলা সে কথা ভাবিতে পারিল না। হারমোনিয়ম লইয়া সুর দিতে গেল।—এমন সময় দিগম্বরী ঠাকুরাণী ডাকিলেন "বউমা, জলখাবার তৈরি করিবে, এস।"

২

নীলকণ্ঠ ডাক্তার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। তিনি জানিতেন যে, স্ত্রীলোক-মাত্রই সংসাররূপ যাত্রার দলের অধিকারী, এবং তন্মধ্যে স্বামী হনুমান-পদস্থ।

বিশেষতঃ, রাঙ্গা টুক্‌টুকে বউ হইলে দর্শন শাস্ত্র অনেকটা স্তম্ভিত হইয়া যায়।

নলিনীবালা একখানি চেয়ারের উপর উঠিয়া আর্সিতে মুখ দেখিতে-ছিলেন। হঠাৎ চেয়ারখানি দুলিয়া উঠিল।

"ও গো! আমি প'ড়ে যাব যে!"

নীল্। এই যে আমি আছি।

নীলকণ্ঠ ধীরে ধীরে চেয়ারখানি ধরিলেন, এবং ধরিতে গিয়া আরও দোলাইয়া দিলেন।

নলিনী মুখ রাঙ্গা করিয়া বলিলেন, "এ সব তোমার চালাকী।"

নীল্। ও গো, তা নয়, মনে করিয়াছিলাম, তোমার মুখ পর্য্যন্ত পহুঁছিব। কিন্তু সেটা অসম্ভব দেখিয়া তোমাকেই নামাইতে বাধ্য হইতেছি।" ক্রমে

সুন্দরী নলিনী বলিলেন, "ন্যাকামি রেখে দাও।"—কিন্তু ক্রমে বেগতিক দেখিয়া চেয়ার হইতে লাফ দিলেন—"যদি আমার পা ভেঙ্গে যেত ?"

নীলু। একটু আর্ণিকা লোশন দিতাম, কিন্তু আপাততঃ তোমার ঘাড় ভাঙ্গিব।

"ও গো, আমাকে লাঞ্ছনা ক'রো না—তোমরা কি নিষ্ঠুর! আমার সেফ্‌টী-পিন্ কই ?

নীলু। সেফ্‌টী-পিন্ কেন ?

নলিনী। আজ সরলাদের বাড়ী যাব। তার কি হয়েছে, ক' দিন ধ'রে কাঁদ্‌ছে।

প্রতিবাসীদিগের সংবাদ শুনিতে উৎসুক হইয়া নীলকণ্ঠ নলিনীর গলা ছাড়িয়া দিলেন।

নীলকণ্ঠ। কথাটা কি ?

নলিনী। কানে কানে বলিব।

তাহার পর নীলকণ্ঠের কান্ টানিয়া লইয়া নলিনী দেবী চুপি চুপি কি বলিলেন।

নীলকণ্ঠ ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "এটা ত একটা 'হার্ট ফেলিওরে'র কেস্—হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।"

নলিনী। ভাঙ্গিলেও শরীরের মধ্যেই থাকিবে ত ? তুমি যদি ডাক্তার হও, এবং আমি যদি সতী হই, তবে সরলার স্বামীকে নিশ্চয় সারাইয়া দিতে হইবে। হৃদয় জোড়া দিতে হইবে।

নীলু। আমিও ডাক্তার, তুমিও সতী; ইহার ফলাফল ভালর দিকেই যাইবে, সন্দেহ নাই। তোমার গুণে আমি শীঘ্রই সুখ্যাতি লাভ করিব। তুমি আগে যাও, আমি সন্ধ্যাবেলা যাইব।

নলিনী ঈষৎ রুষ্ট ও কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তোমার কথার মানে বুঝিতে পারিলাম না।"

নীলু। অর্থাৎ—ওঁরা বড়লোক। বড়লোকের হৃদয় জোড়া দিতে গেলে পয়সা চাই। দিগম্বরী ঠাকুরাণীর অনেক টাকা আছে, ছেলের অসুখে হাত দরাজ ক'রবেন্, তা নিশ্চয়। কেবল তোমার হাতযশের অপেক্ষা।

নলিনী দেবী ঈষৎ কটাক্ষের সহিত বুঝাইয়া দিলেন, "আচ্ছা।"

৩

বলা বাহুল্য, খুদীরামের নিদ্রাভঙ্গের পরই জ্বর আসিয়াছিল। বিলক্ষণ কাতরোক্তি ও ঘন ঘন প্রলাপ। গা তত গরম নয়।

মাতা দিগম্বরী বলিলেন, "বাবার সর্দ্দিগর্ম্মি হয়েছে।" সরলা কাঁদিয়া সই নলিনীকে চিঠি লিখিয়াছিল,—"ওঁকে পাঠাইয়া দিও।"

নীলু ডাক্তার সন্ধ্যাকালে আসিয়াই বলিলেন, "ঘরের দোর জানালা সব খুলিয়া দাও।" ক্রমে হৃদয়, নাড়ী, তাপমান প্রভৃতি পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

ক্রমেই দিগম্বরী ঠাকুরাণীর উৎকণ্ঠা বাড়িয়া উঠিল। "এটা কি কোনও সংঘাতিক ব্যামো? হয় ত আরও ডাক্তার ডাকাই।"

নীলু। কোনও দরকার নাই। আপনি প্রথমে লক্ষণগুলি বলুন।

দিগম্বরী। কেবল ঘুমটা বড় বেশী।

নীলু। এবং জিহ্বা রক্তবর্ণ। বোধ হয়—কেন—নিশ্চিত—'সেপ্‌টিক্ পয়জনিং' হইয়াছে। অর্থাৎ খাবার সঙ্গে বিষ ঢুকিয়াছে।

দিগম্বরী। তা ত সম্ভব নয়। বউ মা যে নিজে রাঁধেন।

নীলু। কিন্তু হয় ত রাঁধিতে রাঁধিতে কাঁদেন। স্ত্রীলোকের চক্ষে ভয়ঙ্কর 'ব্যাসিলি' থাকে। চক্ষের জলের সহিত খাবারে গিয়া পড়ে। তাহা খাইয়া পুরুষগুলো হীনবল, নিস্তেজ ও বিষাক্ত হয়।

দিগম্বরী। আমি পূর্ব্বে ত এরূপ শুনি নাই।

নীলু। পূর্ব্বে ইহার তদন্তই হয় নাই। বাঙ্গালী যে বীর্য্যহীন, তাহার অর্দ্ধেক কারণ বউমাদের অবিরত ক্রন্দন, বৃথা ক্রন্দন, অকারণ সন্দেহ ও ক্রন্দন, অনিবার্য্য দুঃখ ও ক্রন্দন। কান্নার সহিত 'ইউরিক অ্যাসিড্' থাকে। উহাও বিষ। তদুপরি 'ব্যাসিলি'।

দিগম্বরী সত্রাসে বলিলেন, "বাবা, আমিও ত অনেক সময় কাঁদি।"

নীলু। সেটাও খারাপ। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ এই জন্য বিধবাদিগকে হরিনামের মালা জপিতে দিতেন, এবং সধবাগণ কজ্জল পরিতেন। উদাহরণ, মহাভারতে অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ।

দিগম্বরী ঠাকুরাণীর অত্যন্ত ভয় হইল। কিন্তু যাহা শুনিলেন, তাহার উপর আর কাঁদিতে সাহস করিলেন না।

"তবে কি ইহার ঔষধ নাই?"

নীলু। এখন কেবল ব্রাণ্ডি এবং ষ্ট্রীক্‌নিয়া। বুঝিলেন? নচেৎ হয় ত নিউমোনিয়া কিংবা 'হার্টফেলিওর' হইতে পারে। অর্থাৎ, হৃদয় বন্ধ হইয়া যাইবে। ভালবাসিবার উপায় থাকিবে না।

দিগম্বরী ঠাকুরাণী সভয়ে জগদীশ্বরকে ডাকিলেন। নীলু ডাক্তার বলিলেন, "আপনার কোনও ভয় নাই, আপনি একটু বাড়ীর মধ্যে গিয়া বউকে সান্ত্বনা করুন, সেখানে আমার বাড়ীর মধ্যের লোকও আছে।"

৪

নীলকণ্ঠ রোগীর নিকট গিয়া বসিলেন। খুদীরাম সভয়ে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া বলিল, "মা—এখানে নাই ত?"

নীলু। না; থাকিলেও হানি কি? 'বিপদে ধৈর্য্য, এবং অভ্যুদয়ে ক্ষমা।' এখন তোমার মতলব কি বল ত?

খুদী। আমার সংসারে বৈরাগ্য হইয়াছে।

নীলু। সেটা ত সকলেরই হয়।

খুদী। ঘুম বাড়িয়াছে।

নীলু। সে কেবল আকণ্ঠ খাইয়া। পূর্ব্বে যখন হোটেলে খাইতে, তখন স্ফূর্ত্তি ছিল।

খুদী। নীলু! সংসারে সব দিন সমান যায় না। ক্রমে জীবের প্রসারণ হয়। যে পথে যাইতেছে, সে পথে আলোক আসিয়া পড়ে।

নীলু। কাজেই মায়া মমতা ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু বোধ হয় জান যে, সাড়ে তিন হাতের অধিক প্রসারণ এ যুগে অসম্ভব। তাল গাছের মত উঁচু হইতে গেলে মনুষ্যত্ব বর্জ্জন করিতে হয়। তোমার এখন ইচ্ছা কি?

খুদীরাম। বানপ্রস্থ অবলম্বন করিব। আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, আমার সংসারধর্ম্মে ইচ্ছা নাই।

নীলু। এ ত গেল মানসিক। শারীরিক লক্ষণটা কিরূপ?

খুদীরামের মতে তাহার বুকের বামভাগে ধড়ফড় করে, সংসারের কথা ভাবিলেই ঘুম আসে, ঘুম না আসিলে পাগলের মত হইয়া যায়। যদি ঘুমও না আসে ও পাগলের মত না হয়, তবে তীব্র যাতনা বোধ হয়।

নীলু। প্রলাপটা কি স্বাভাবিক?

খুদীরাম। দুই চারি দিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। ছুটী না লইলে চলিবে না।

নীলু। আমি তোমার বানপ্রস্থের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। তুমি এখন একটু ঔষধ খাও। রাত্রিকালে আজ বাগানবাটীর ঘরে শুইয়া থাকিও।

ঔষধ দুই একবার খাইয়া, এবং বাগানবাটীর আবাসে শুইবার প্রস্তাবনা ভাল মনে করিয়া, খুদীরাম অনেক সুস্থ বোধ করিল। ক্রমে মন খুলিয়া গেল, এবং ঘুমাইয়া পড়িল। নীলু ডাক্তার দিগম্বরী ঠাকুরাণীকে বানপ্রস্থের কথাটা বুঝাইয়া বলিলেন।

দিগম্বরী। বাবা, বানপ্রস্থ কোথায়?

নীলু। ইন্দ্রপ্রস্থের কাছে। কিন্তু আপাততঃ আপনি বাগানবাটীতে একবার বউমাকে পাঠাইয়া দিন—কেন না, রোগের সময় একলা ফেলিয়া রাখা ভাল নয়।

৫

রাত্রি গভীর। বাগানটা নীরব, কিন্তু লতাপাতার মধ্যে ঝিল্লীরব প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। খুদীরামের স্বহস্ত-সিক্ত জলের গুণে বৈশাখ মাসেই বেলী, চামেলী প্রভৃতি ফুটিয়া উদ্যানবাটী আমোদিত করিতেছিল।

চাঁদ উঠে নাই, কিন্তু উঠিবার সময় হইয়াছিল। না উঠিলেও ক্ষতি ছিল না; কেন না, আঁধারই হতাশের আশ্রয়।

মলয় বহে নাই, বোধ হয় বহিবে; কারণ, দক্ষিণ দিকের কামিনী বৃক্ষের শীর্ষ ঈষৎ দুলিতেছিল।

খুদীরামের লক্ষণ একটু ভাল। ছয় আউন্স ব্রাণ্ডি ও এক গ্রেণ ষ্ট্রীকৃনিয়ার পর হৃদয় ক্রমে সংসারের দিকে প্রসারিত হইতেছিল।

খুদীরামের একাকী শুইয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। একাকী থাকা নীতিবিরুদ্ধ। আশ্চর্য্য! জগতে ইহা কেহ বুঝে না। অথচ অদ্বৈতবাদ চাহে! স্বয়ং ঈশ্বরই যখন জগৎ লইয়া আছেন, তখন মানুষের বাবার সাধ্য কি যে, জগৎ ছাড়িয়া যায়?

অতএব, একাকী থাকা অন্যায় ভাবিয়া খুদীরাম পুকুরের পাড়ে গেল। চাঁদ তখন উঠিতেছে। সেই চন্দ্রালোকে খুদীরাম দেখিল, সোপানের উপর একটি রমণী নিদ্রিতা।

খুদীরাম বুঝিতে পারিল। নিকটে গিয়া দেখিল, একগাছি দড়ি ও একটা কলসী।

খুদীরাম বুঝিল, বাড়াবাড়ি হইয়াছে। পদাঘাতে কলসী জলে ফেলিয়া দিল, এবং ঘুমন্ত সরলাকে উঠাইয়া লইয়া উদ্যান-আবাসে আসিল।

খুদীরাম ডাকিল, "সরলা!"

সরলা চক্ষু উন্মীলন করিয়া আবার মুদ্রিত করিল।

খুদীরাম বলিল, "সরলা, আমার অপরাধ হইয়াছে। কিন্তু তুমি এ পর্য্যন্ত কথাটা বুঝ নাই। আমার ভালবাসিবার অবকাশ ছিল না।"

"কিন্তু ঘুমাইবার ছিল"—ইহা বলিয়া সরলা কাঁদিতে লাগিল।

খুদীরাম বলিল, "সরলা! এখনও বুঝিতে পার নাই। আমি চালাকী করিয়াছিলাম। নচেৎ তোমাকে পাইতাম না। বানপ্রস্থের ব্যবস্থা না হইলে তোমায় চিরকাল রাঁধিতে ও কাঁদিতে হইত। এখন আর হইবে না।

সরলা বোকা মেয়ে। প্রথমে বুঝে নাই। যখন নলিনী দেবী তাহাকে দড়ি ও কলসী লইয়া যাইতে শিখাইয়া দিয়াছিল, তখনও বুঝে নাই। এখন বুঝিতে পারিয়া লজ্জিতা হইল।

"ছি! মাকে এমন করিয়া ফাঁকি দেওয়া তোমার উচিত হয় নাই।"

খুদীরাম বুঝাইয়া দিল যে, ফাঁকি দেওয়াই বানপ্রস্থের উদ্দেশ্য, এবং যখন সরলার ছেলে পুলে হইবে, তখন তাহারাও ফাঁকি দিবে।

খুদীরামের অভাবনীয় রোগমুক্তির পরিচয় পাইয়া দিগম্বরী ঠাকুরাণী নীলু ডাক্তারকে পাঁচ শত টাকা পুরস্কার দিলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "অদ্যাবধি হরিনামের মালাই জপ করিব।"

নবীনচন্দ্র।

গত ১০ই মাঘ শনিবার সায়াহ্নে শৈলকাননকুন্তলা চট্টলভূমির বরপুত্র, বঙ্গের শেষ মহাকবি, বঙ্গবিশ্রুতকীর্ত্তি নবীনচন্দ্র অস্তমিত হইয়াছেন।

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ তিনি একখানি পত্রে এই প্রবন্ধের লেখককে লিখিয়াছিলেন,—"পূর্ব্ব রোগের উপর ম্যালেরিয়ায় কঙ্কালসার হইয়াছি। বোধ হয়, দীপ-নির্ব্বাণের আর বিলম্ব নাই।" তখন কল্পনা করিতে পারি নাই,—কবি সত্যই মৃত্যুর স্পর্শ অনুভব করিয়াছেন। কবির সেই ভবিষ্যদ্বাণী কঠোর সত্যে পরিণত হইল। মহাকালের একটি ফুৎকারে কবিবরের জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

জীবন-স্রোতে জীব ভাসিয়া যায়।

"চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন-নদে ?"

কবির জীবন-নদেও নীর চিরস্থির নহে। কবিও সেই অনন্ত পথের পথিক। মরজগতের কোনও বন্ধন অনন্তের যাত্রীকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। দু' দিনের পান্থশালা পড়িয়া থাকে,—মানব অনন্তের প্রবাহে ভাসিয়া যায়। ভাগ্যবান সুকৃতিশালী নবীনচন্দ্র সেই পথের পথিক হইয়াছেন। তিনি গিয়াছেন ; স্মৃতি আছে। কবি গিয়াছেন, কাব্য আছে। নবীনচন্দ্র নাই ; তাঁহার কীর্ত্তি আছে। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" নবীনচন্দ্রের মর-জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে ; কিন্তু তাঁহার অমর কবি-জীবন-দীপ কালের ফুৎকারে নির্ব্বপিত হইবার নহে। তাঁহার অবিনশ্বর স্মৃতি, তাঁহার অপূর্ব্ব প্রতিভার দেদীপ্যমান কীর্ত্তি, তাঁহার কাব্য, তাঁহার উপদেশ বাঙ্গলা দেশে চিরদিন জাজ্বল্যমান থাকিবে। বাঙ্গালীর আনন্দমঠে নবীনচন্দ্রের কাব্য-প্রদীপ চিরদিন পবিত্র স্নিগ্ধ রশ্মি বিতরণ করিবে।

বাঙ্গালা দেশে পুরাতনের সাক্ষী প্রায় লুপ্ত হইল। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বন্ধন-গ্রন্থি প্রায় ছিন্ন হইয়া গেল। হায় বাঙ্গলাদেশ, তোমার

"একে একে
শুকাইছে ফুল এবে নিবিছে দেউটী ;
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী !"

তোমার দুর্ভাগ্য শোচনীয়। বাঙ্গলার পুরাতন বাঁশী নীরব হইল। নবযুগের নূতন সুরে পুরাতন বাঙ্গলার স্মৃতি নাই। নবীনের মধুর বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাঙ্গালার, বাঙ্গালীর প্রাণের সুর বাজিয়া উঠিত। সে 'অতি অনুপাম' বাঁশী আর বাজিবে না। কিন্তু বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ও উত্তরপুরুষ মর্ম্মে মর্ম্মে সেই 'মোহনিয়া' দিব্য সুরের রেশ অনুভব করিবে।

বাঙ্গালার বাঁশী নবীনচন্দ্রের চিতায় নবীনচন্দ্রের প্রতিভার সহিত দগ্ধ হইয়াছে। মাধবীকুঞ্জের বাঁশী গেল ; 'কক্‌নী'-কবিদের কম-করে অর্কিড-কুঞ্জের 'ক্লারিয়ণেট' রহিল। তাহাই বাজুক।—পুরাতনের সুর মথিত করিয়া নবীনের ঝঙ্কার বাঙ্গলার বক্ষে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠুক।

বর্ত্তমানের তুলনায় অতীতের গৌরব। অতীতের আদর্শে ভবিষ্যতের সৃষ্টি। অতীত কল্পনার তপোবনে কাব্যলক্ষ্মীর পুণ্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক। সেই মন্দিরের শঙ্খ-রবে আবার মধুসূদন, হেম ও নবীনের বাঁশীর সুর বাজিয়া উঠিবে।

নবীনচন্দ্র প্রতিভাশালী মহাকবি। তিনি মহাকাব্যের সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালীকে বিশ্বজনীন প্রেমের ও সার্ব্বভৌমিক মানবতার আদর্শ দান করিয়া গিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের সহিত মহাকাব্যের মেঘমন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে অন্তর্হিত ও শব্দব্রহ্মে বিলীন হইল কি?

নবীনচন্দ্র সহৃদয় কবি, অনুরক্ত বন্ধু, কৃতজ্ঞ ভক্ত, বিহ্বল ভাবুক, মাতৃভাষার একনিষ্ঠ উপাসক ও বহু সদনুষ্ঠানের সহায় ছিলেন। নবীনচন্দ্রের বিয়োগে বাঙ্গালার যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। নবীনচন্দ্রের লোকান্তরে সেকালের বাঙ্গালীর শেষ ছবি মুছিয়া গেল।

নবীনচন্দ্র কেবল 'কাব্যে'র কবি ছিলেন না। নবীনচন্দ্র সংসার-রঙ্গমঞ্চে কবির ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অকাল-পক্ক ভক্ত-সম্প্রদায়ের চিত্তরঞ্জনের জন্য কখনও 'কবি'র অভিনয় করিয়া কবিতার অপমান করেন নাই। তাঁহার মধুর প্রকৃতি কবিতায় গঠিত হইয়াছিল। তিনি 'রচনার কবি' বা 'রচিত' কবি ছিলেন না। যে জীবনে একবার সেই সরল, সদানন্দ, সহৃদয়, সুমধুর কবি-প্রকৃতির পরিচয় লাভ করিয়াছে, সেই সদ্ভাবসুন্দর হৃদয়ের গভীর স্নিগ্ধ প্রেমে ধন্য হইয়াছে, সে কি কখনও তাহা ভুলিতে পারিবে?

নবীনচন্দ্রের আদর্শ,—খণ্ড-ভারতে মহাভারতের প্রতিষ্ঠা। তাঁহার "রৈবতকে" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

"এক মহারাজ্য, প্রভু, হয় না স্থাপিত—
এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন?"

ইহাই নবীনচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র, তাঁহার কবি-জীবনের ধ্রুব-তারা।

এই উচ্চ আদর্শ দেশবিশেষ বা জাতিবিশেষের ক্ষুদ্রতায় সঙ্কীর্ণ নহে। সে আদর্শে বিপুল জগতের বিশাল মানব-পরিবারের অক্ষুণ্ণ অধিকার। "রৈবতকে"র শ্রীকৃষ্ণ পথভ্রান্ত পথিককে সেই বিরাট 'মানবতা'র পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—

"সংসার সমুদ্র, পার্থ; আমরা মানব
অনন্ত সমুদ্রযাত্রী; জ্ঞান ধ্রুবতারা;
গম্য স্থান সুখধাম,
বৈকুণ্ঠ যাহার নাম;
অনন্ত তাহার পথ; জ্ঞান ধ্রুবালোকে

আপন নিয়তিপথ,
আপনার কর্ম্ম-ব্রত,
যে পায় দেখিতে, সখে, সেই পুণ্যবান,
সে পায় বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণু-পদে-নিরবাণ।"

তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

"—মানব-হৃদয়
কার সাধ্য অসি-ধারে করিবে বিজয়?
যে রাজ্যের ভিত্তি ধর্ম্ম,
শাসন নিষ্কাম কর্ম্ম,
কালের তরঙ্গে তাহা মৈনাক অচল।
শক্তি ধর্ম্ম, ধনঞ্জয়, নহে পশুবল।"

রুসিয়ার ঋষি, স্বাধীনতার বরপুত্র, স্বাতন্ত্র্যের একাগ্র সাধক, মানব-সাধারণের উদার বন্ধু, মনস্বী কাউণ্ট টলষ্টয়ও জীবনের সায়াহ্নে ভিন্ন পথে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন।

নবীনচন্দ্র জাতীয় গৌরবে অনুপ্রাণিত, ভবিষ্যতের আশায় উদ্দীপ্ত; কিন্তু তাঁহার উদার কল্পনা জাতীয়তার ক্ষুদ্রতায় সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হয় নাই। তাঁহার আদর্শ,—মানবতা। তাঁহার স্বপ্ন,—

"বাঁধি' ধর্ম্ম-নীতি-পাশে
মিলাইব অনায়াসে
জননীর খণ্ড দেহ; করিয়া চালিত
জ্ঞানাঙ্কুশে, ভেদ-জ্ঞান করিব রহিত।
শিখাব একত্ব-মর্ম্ম;—
এক জাতি, এক ধর্ম্ম;
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য-স্থাপন,
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ!"

যে বিপুল সাম্রাজ্যের রাজা নারায়ণ, সে পুণ্য-রাজ্যের কল্পনাও ভারত ভিন্ন আর কোথাও সম্ভব কি? বাঙ্গালার মহাকবি বাঙ্গালীর জন্য এই বিশাল বিরাট 'মানবতা'র আদর্শ গঠন করিয়া স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন, বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

'বিশ্বমৈত্রী' ইউরোপের নূতন আবিষ্কার, ক্ষুদ্রবাদী প্রতীচ্যে মৌখিক

জল্পনা। কিন্তু 'জগৎসুখ' হিন্দুর নিজস্ব, হিন্দুর মর্ম্মগত;—হিন্দুর ধর্ম্মে অনুস্যূত। সার্ব্বভৌমিক ভাব, বিশ্বজনীন প্রেমের মূলমন্ত্র "রৈবতকে"র কৃষ্ণের কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছে,—

"সোঽহং সঙ্গীতে পূর্ণ বিশ্ব সমুদয়।
জগতের সুখ যাহা,
আমাদের সুখ তাহা;
সকলে জগৎ-সুখে সমর্পিলে প্রাণ,
হয় ধরাতলে কিবা স্বর্গ অধিষ্ঠান!"

এই 'মানবতা'র মহামন্ত্র নবীনচন্দ্রের প্রাণ-বীণায় ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। তাই তাঁহার দেশভক্তি ও স্বজাতিপ্রীতি দেশ ও জাতির সঙ্কীর্ণ কারাপিঞ্জর চূর্ণ করিয়া বিশ্বে ও মানবে বিস্তৃত হইয়াছিল। তাই তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য 'মহাভারতে' জাতি ও দেশের ক্ষুদ্রতা সর্ব্বভৌমিক ভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে। "রৈবতকে" সেই মহাভাবের অভিব্যক্তি এইরূপ,—

"এই কর্ত্তব্যের স্রোতে যাইব ভাসিয়া
ফলাফল নারায়ণ-পদে সমর্পিয়া।
এক ধর্ম্ম, এক জাতি,
এক রাজ্য, এক নীতি,
সকলের এক ভিত্তি-সর্ব্বভূত-হিত;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম,
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম,—
একমেবাদ্বিতীয়ম্! করিব নিশ্চিত
ওই ধর্ম্মরাজ্য মহাভারত স্থাপিত।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার পদরেণুপূত পুণ্যভারতে সফল হউক।

যাও কবি, অমরায় কবি-কুঞ্জের পথে বঙ্কিম ও হেম তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। জীবনে তাঁহাদের সহিত বাঙ্গালার সাহিত্য-সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছিলে,—মরণে আবার মিলিত হও। বঙ্কিম, হেম, নবীনের প্রতিভার ত্রিধারায় নন্দনেও পুণ্যসঙ্গম প্রতিষ্ঠিত হউক। স্বর্গ হইতে তোমরা বাঙ্গালীকে আশীর্ব্বাদ কর,—তোমাদের জীবনের স্বপ্ন সফল হউক,—তোমাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালী আবার মনুষ্যত্ব লাভ করুক। *

শ্রীসুরেশ সমাজপতি।

---

* গত ১৫ই মাঘ কলিকাতার 'ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট হলে', নবীনচন্দ্রের শোক-সভায় পঠিত; এবং ১৭ই মাঘের 'বসুমতী' হইতে পুনর্মুদ্রিত।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

পূর্ণিমা। বৈশাখ। শ্রীযুত পশুপতিনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভূ-প্রদক্ষিণ' প্রবন্ধের সূচনা—'যাত্রা' পড়িয়া মনে হইতেছে, লেখক দেখিতে জানেন, এবং লিখিতে পারেন। আভাসে আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীযুত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য 'কেরোসিন তৈল' প্রবন্ধে বৈদেশিক স্নেহের সহিত কেরোসিনের তুলনা করিয়াছেন। লেখক টানিয়া বুনিয়াছেন। একে কেরোসিন, তাহার উপর কষ্ট-কল্পনার ধূম;—সুতরাং রচনাটির সৌন্দর্য্য কেরোসিনের কালিমায় ম্লান হইয়া গিয়াছে। 'সেতুবন্ধ রামেশ্বর' ভ্রমণবৃত্তান্ত। শ্রীযুত বিষ্ণুপদ চট্টোপাধ্যায় এই প্রবন্ধে পারিপার্শ্বিক বিবিধ বিষয়ের—বর্ষার উৎপাত হইতে কংগ্রেস-যাত্রীর নক্সা পর্য্যন্ত বিবিধ খণ্ড চিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, এবং সেই সকল বর্ণনার ছায়ালোকে 'সেতুবন্ধে'র সুদীর্ঘ পথের চিত্র মনোরম হইয়াছে। লেখক বর্ণনায় যেমন কামচারী, তেমনই রচনায় স্বেচ্ছাচারী। তাঁহার মুন্সিয়ানায় রচনার যথেচ্ছাচার ডুবিয়া গিয়াছে। কিন্তু অনুকরণকারী নূতন লেখকের পক্ষে তাহা সাংঘাতিক হইতে পারে। শ্রীযুত যোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'কাব্যে ইতিহাস' উল্লেখযোগ্য। লেখক বোধ হয় নূতন ব্রতী। কাব্যে ইতিহাস থাকে, কিন্তু অতিরঞ্জন ও কল্পনার অতিরিক্ত লীলাও কাব্যে বিরল নহে। লেখক বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে পঞ্চদশ—ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর 'আভ্যন্তরিক ইতিহাস' সংগ্রহ করিয়াছেন। কাব্যই তাঁহার একমাত্র প্রমাণ। আর সে প্রমাণ অন্য ঐতিহাসিক প্রমাণে সমর্থিত নহে। এই জন্য লেখকের সকল সিদ্ধান্ত ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে শঙ্কা হয়। 'নেশা'র প্রসঙ্গে লেখক লিখিয়াছেন,—'মদ্যপান প্রায় সকলেই করিত;—এমন কি, অনেক সাধু সন্ন্যাসীও মদ্যপান করিতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, এ সকল ব্যবহারকে যেন লোকে দোষাবহ জ্ঞান করিত না।' চৈতন্য-ভাগবতের 'মদ্যপ সন্ন্যাসী হেন জানিলেন মনে'—এই শ্লোকার্দ্ধই লেখকের এই ভীষণ সিদ্ধান্তের একমাত্র প্রমাণ। বলা বাহুল্য, চৈতন্য-ভাগবতের এই উক্তি হইতে লেখকের প্রতিপাদ্য কোনও মতে প্রতিপন্ন হয় না। শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতে শিষ্টাচার' উল্লেখযোগ্য। শ্রীচুনীলাল সেনের 'নির্ব্বাসিতা' কবিতা বটে, কিন্তু লেখক কবিত্বকেও বিশেষ যত্নে রচনা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের 'অন্বেষণ' নামক কবিতাটি জটিল ও দুর্ব্বোধ হইয়াছে। সাগর ছেঁচিয়া যেমন সকলে মাণিক সংগ্রহ করিতে পারে না, তেমনই দুরূহ দুর্ব্বোধ কবিতা মথন করিয়া রস-সংগ্রহ সকলের পক্ষে সহজ নহে। কিন্তু 'অন্বেষণে' কাব্যশিল্পীর স্বভাবসিদ্ধ শক্তির পরিচয় আছে।—কিন্তু তাহাও অন্বেষণ করিয়া উপভোগ করিতে হয়। প্রিয় কবি একটু সহজ ও সরল হউন। এই সংখ্যায় শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের কোনও রচনা না দেখিয়া আমরা নিরাশ হইয়াছি। তাঁহার রচনার অভাবে 'পূর্ণিমা'র বত্রিশ ব্যঞ্জনও যেন 'আলুনি' বলিয়া মনে হইতেছে।

বঙ্গদর্শন। বৈশাখ। শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য 'বিস্মৃত জনপদ' নামক প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদের শেষভাগে 'বিজয়নগরে'র উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয়, দাক্ষিণাত্যের

আতিশয্য 'হঠাৎ বাবু'র বাবুয়ানার মত। ক্ষমতাশালী নূতন ব্রতীর পক্ষে শব্দাড়ম্বরের প্রলোভন স্বাভাবিক। কালে এই আতিশয্য বর্জ্জন করিলে তাঁহার রচনাভঙ্গী স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত হইবে। শ্রীমান সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের 'ব্যাক্‌টিরিয়া' নামক সুরচিত প্রবন্ধটি পড়িয়া আমরা আশান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছি। সন্তোষ প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, মিষ্ট ভাষার ঐন্দ্রজালিক, সৌন্দর্য্য-রসিক স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পুত্রের রচনায় পিতার রচনার প্রসাদ গুণ দেখিতে পাইতেছি। ইহাও কি 'উত্তরাধিকার'? 'পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্য-লক্ষণম্।' শ্রীশ বাবুর পুত্র পিতৃ-পদবীর অনুসরণ করিয়া সারস্বত-মন্দিরে বিজ্ঞানের অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত। উত্তরচরিতের বাসন্তী বলিয়াছিলেন,—'হন্ত মাতঃ, কুমারলক্ষ্মণস্যাপি পুত্রঃ!' সন্তোষের রচনা দেখিয়া আমাদের মনেও সেই ভাবের উদয় হইতেছে। আমরা সস্নেহে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, নবীন সাধকের সাহিত্য-সাধনা সফল হউক। শ্রীযুত বিধুশেখর শাস্ত্রী 'ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের ইতিহাস' লিখিতেছেন। দার্শনিকের উপভোগ্য, সাধারণ পাঠকের পক্ষে দর্শন ও প্রত্ন-তত্ত্বের সমাহার—গভীর গবেষণা একটু গুরুপাক। শ্রীলোকনাথ চক্রবর্ত্তীর 'ভ্রমরে'র সমালোচনা এখনও শেষ হয় নাই। সমালোচনায় গোঁড়ামি আছে, বিশেষত্ব নাই। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' 'আদর্শ' চরিত্রের সৃষ্টি বঙ্কিম বাবুর উদ্দেশ্য ছিল কি? বর্ত্তমান সমালোচক এখনও তাহা সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। মানব-হৃদয়ের বিশ্লেষণও উপন্যাসের উদ্দিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসকে ইতিহাস ধরিয়া লইয়া তাঁহার উদ্দেশে গালি-বর্ষণ, এবং তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রে 'আদর্শে'র আরোপ করিয়া চাটুপুষ্প প্রলি-দান এ যুগের 'ফ্যাশান'। নিরক্ষর নারীর অভিমান ভ্রমর-চরিত্রের প্রাণ। তাহা 'আদর্শ' হইতে পারে না। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নাম-করণ-রহস্যে' চিত্রকর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত 'লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন' নামক চিত্রের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই, সত্য হউক, মিথ্যা হউক, কাব্যে ও চিত্রপটে সবই শোভা পায়! অপিচ, 'শিল্পী আর কবির লক্ষণই হচ্ছে কটু হইতে মধু, হীনতা হইতেও মিষ্টতা বাহির করা; সেটাকে পরিবর্ত্তন করা নয়, বাস্তবের অনুরোধে পরিত্যাগ করাও নয়।' কি সর্ব্বনাশ! যে শিল্পী কটু হইতে মধু, হীনতা হইতে মিষ্টতা বাহির করিতে পারেন, ঘোড়ার ডিমে তা দিয়া আরবী ঘোড়া 'ফুটাইয়া তোলাও' তাঁহার পক্ষে দুরূহ নহে। অবনীন্দ্রনাথ ভুলিয়া গিয়াছেন,—এই কল্পিত হীনতার সহিত জাতীয়তার সংস্রব আছে। যাহা সত্য নহে, জগতে তাহার স্থান নাই। কাব্যে বা চিত্রে মিথ্যা জাতীয়-কলঙ্ক ফলাইয়া জাতির অপমান করিবার কাহারও অধিকার নাই। বিশেষতঃ, জাতীয় কলঙ্ক লইয়া যে প্রতিভা 'কটু হইতে মধু' ও 'হীনতা হইতে মিষ্টতা বাহির' করে, ভদ্রলোকে দূর হইতে তাহাকে নমস্কার করিয়া থাকেন। লক্ষ্মণ সেনের তথাকথিত পলায়ন মুসল-মানের পক্ষে 'মধু' হইতে পারে, আমাদের পক্ষে তাহা বিষ। এই হীনতায় যে 'মিষ্টতা' আছে, নব-যুগের নূতন-চিত্রকর-পিপীলিকারাই তাহার স্বাদ পাইয়াছেন;—পলায়নের সৌন্দর্য্য দেখিয়া-ছেন, এবং ইংরেজ-মিত্র-সমাজে তাহা দেখাইয়া ধন্য হইয়াছেন! 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ!' কিন্তু

শত বৎসরের জুতার স্মৃতি বাঙ্গলার নানা সত্য ঘটনায় মুদ্রিত আছে ; নব্য চিত্র-প্রতিভার পক্ষে জাতীয়-কলঙ্ককাহিনীই যদি মৃতসঞ্জীবনী হয়, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় তাহাই আঁকিতে থাকুন,—সে জন্য আর নূতন কলঙ্কের সৃষ্টি করিবেন না ; মিথ্যাকে সত্যের আবরণ দিয়া স্বজাতির মনে বেদনা দিবেন না ; দো-আঁশলা ভাব ও ভাষার চটকে কুরুচি ও মিথ্যা কল্পনার ওকালতী করিয়া বাঙ্গালীর 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে' দিবেন না। যে সুকুমার কলা জাতীয় মর্য্যাদায় উদাসীন, যে শিল্পী জাতীয় গৌরবে ও জাতীয়তার মহিমায় অন্ধ, বাঙ্গালা দেশেই প্রকাশ্যে তাহার সমর্থন চলে। হায় বাঙ্গলা, হায় বাঙ্গালী ! শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার 'গ্রাম্য সাহিত্য' প্রবন্ধে সংক্ষেপে লালন ফকীরের পরিচয় দিয়াছেন। সে পরিচয়ে বিশেষ কোনও নূতন তথ্য নাই। বহু দিন পূর্ব্বে 'ভারতী' পত্রে শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্র লালনের পরিচয় দিয়াছিলেন। সুবোধ বাবুর রচনায় 'গুরুবাদ পোষণ করিতেন', 'অশ্বারোহণ করিতে দক্ষ ছিলেন', প্রভৃতি ইঙ্গ-বাঙ্গালার প্রাচুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি। 'জীবনী' জীবনচরিত নহে। প্রবন্ধের প্রারম্ভে লেখক যে গানটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ভদ্রসমাজের অযোগ্য।

দেবালয়। মাসিকপত্র ও সমালোচন ; প্রথম ভাগ ; প্রথম সংখ্যা ; বৈশাখ। এই নূতন মাসিক 'দেবালয়' নামক ধর্ম্মসমাজের 'মুখপত্র' ; কিন্তু ধর্ম্মই ইহার একমাত্র প্রতিপাদ্য নহে। প্রথম সংখ্যার প্রথমে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'নববর্ষ-মঙ্গল' নামক একটি কবিতা লিখিয়াছেন। ইহা আধ্যাত্মিক বটে, কিন্তু রবি-করে সমুজ্জ্বল নহে। 'যে মহা একের পানে বিশ্ব-পদ্ম উঠিছে বিকশি' রবীন্দ্রনাথের রচনায় বোধ হয় বহুবার পড়িয়াছি। চর্ব্বিতচর্ব্বণে দন্ত-বেদনা ভিন্ন অন্য কোনও লাভ নাই। 'প্রবাসী'র সম্পাদক শ্রীযুত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'সূচনা'য় লিখিয়াছেন, 'ইহা দেবালয়ের সভ্যগণের মধ্যে অন্যতম বন্ধন-রজ্জু-স্বরূপ হইবে।' সভ্যগণের যদি আপত্তি না থাকে, তাঁহাদের 'বন্ধন-রজ্জুতে' আমাদের আপত্তি নাই। শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ 'প্রেমের উপাদান' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দুই পৃষ্ঠার প্রবন্ধে বিশেষ কোনও বৈচিত্র্য নাই। শ্রীরজনীকান্ত সেনের 'সৃষ্টির বিশালতা' নামক গানটি চলনসই। 'তীক্ষ্ণ-উগ্র-অনল-পিণ্ড-তারা' কি ? অনল 'উগ্র' হইতে পারে, 'তীক্ষ্ণ' হয় কি ? আর লেখক 'সর্ব্বশক্তিমানে'র যে 'বিশাল দৃশ্য'কে তাঁহার 'শক্তিবিন্দু' বলিয়াছেন, তাহা 'চারুপাঠে'র যোগ্য, তানপুরার সুরে সে 'দৃপ্তনাদ' ঝঙ্কৃত হয় কি ? শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন 'কলাশিল্প সম্বন্ধে দু একটি কথা' দুই পৃষ্ঠায় শেষ করিয়াছেন। দীনেশ বাবু বলিয়াছেন,—'কাব্যকলার অতিরঞ্জনের ন্যায় কলাশিল্পের অতিরঞ্জনও শ্রীহারক নহে।' ইহা দীনেশ বাবুর mandet ! আর তাঁহার আদেশ সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বেদবাক্য। কেন না, 'তিনি' লিখিয়াছেন, এবং ছাপাইয়াছেন ! কালীঘাটের পটও মহাচিত্র ; কেন না, তাহা 'দেশীয় চিরন্তন সংস্কার এবং রুচির অভিব্যক্তি'। আর র‍্যাফেলের ম্যাডোনা ? তাহা এ দেশের 'চিরন্তন সংস্কার ও রুচির অভিব্যক্তি' নহে, অতএব, বাতিল ও নামঞ্জুর ! চিত্র ও সাহিত্য সত্যমূলক, সার্ব্বভৌমিক। তাহা দেশ কালের ক্রীতদাস হইতে পারে না। অতিরঞ্জন সকল Art-এর কলঙ্ক। এ সকল মৌলিক সত্যও

নিস্তব্ধ! অতএব, অজন্তার ছবির নকল কর; যদি নূতনের উদ্ভাবন বা পৃথিবীর পরিপুষ্ট চিত্রশিল্পের অনুধাবন কর, তাহা হইলে কালীঘাটের পট নষ্ট হইয়া যাইবে! বিবর্ত্তে পৃথিবীর পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু ভারতের চিত্র সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া থাকুক। গোঁড়ামীর পরাকাষ্ঠা বটে! শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্তের 'অন্নদান' নামক পদ্যটির গল্পটি মনোরম, কিন্তু রচনা সেরূপ নহে। শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসুর 'শিশুর শিক্ষা' উল্লেখযোগ্য।

ভারতী। বৈশাখ। নব বর্ষে 'ভারতী' সচিত্র হইয়াছে। বৈশাখের সর্ব্বপ্রথম চিত্র,—'হরপার্ব্বতী-সংবাদ' শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত 'মূল চিত্রে'র অনুলিপি। শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'চিত্র-ব্যাখ্যা'য় লিখিয়াছেন,—'এই চিত্রখানি ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি অনুসারে অঙ্কিত। মহাদেবের ধ্যানস্তিমিত অথচ জ্ঞানগরিষ্ঠ ভাব এবং পার্ব্বতীর শ্রবণতন্ময়তা এবং উভয়ের মুখেই দেবভাব শিল্পী চমৎকার প্রকাশ করিয়াছেন। পার্ব্বতীর স্বল্পবেশ তাঁহার ত্যাগ ও আত্মসুখস্পৃহাশূন্যতা জ্ঞাপন করিতেছে।' লেখক স্বীয় কল্পনার চিত্র ভাষায় অঙ্কিত করিয়াছেন; মূল চিত্রে তাঁহার ব্যাখ্যার অবকাশ নাই। ত্রিনয়নের পরিবর্ত্তে খোদ মহাদেব স্বয়ং 'ধ্যানস্তিমিত' হউন, তাহাতেও আমাদের আপত্তি নাই! কিন্তু 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি' মাথায় থাকুক,—এ মহাদেব 'ধ্যানস্তিমিত' নহেন, ভাং-স্তিমিত! মুদিতনেত্র ছোকরা মহাদেবের মুখে 'জ্ঞান-গরিষ্ঠ ভাবে'র কোনও লক্ষণ বা পরিচয় নাই। চারুবাবু সে 'ভাব' কল্পনায় প্রত্যক্ষ করিয়া সুরেন্দ্র-সৃষ্ট মহাদেবের মুখে আরোপ করিয়াছেন। পার্ব্বতীর মুখেও 'শ্রবণ-তন্ময়তা'র অত্যন্ত অভাব। পার্ব্বতীর চক্ষু কোরিয়া-কামিনীর মত 'ট্যারচা', অত্যন্ত অস্বাভাবিক। তাঁহার ভ্রূ চীন-সুন্দরীর মত; সে ভ্রূ চিত্রের মুখে 'প্রক্ষিপ্ত' বলিয়া মনে হয়। এই কৃত্রিমতাপূর্ণ অস্বাভাবিক নেত্রে 'শ্রবণতন্ময়তা'র লেশমাত্র নাই,—তাহাতে কুৎসিত লালসাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। মহাদেবের উপবেশনের ভঙ্গী অত্যন্ত অদ্ভুত! শিল্পী যে ভাবে হর-পার্ব্বতীকে জগতের দরবারে নরসমাজে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে লজ্জা হয়! হর-পার্ব্বতীর এই রূপ-কল্পনা অমার্জ্জনীয়। চিত্রকর হিন্দুর দেবতাকে অশ্লীলতার পূতিগন্ধময় কলঙ্ক-কালিমায় লিপ্ত করিয়া হিন্দুর হৃদয়ে আঘাত করিয়াছেন। 'ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি' জয়যুক্ত হউক,—কিন্তু 'ভারতীয় চিত্রকলা'র পুরোহিতগণ হিন্দুর দেবতা লইয়া এমনতর বেয়াদবী করিবেন না, ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। পার্ব্বতীর বেশ স্বল্প নহে, শ্মশানচারী ভিখারীর বনিতার পক্ষে তাহা প্রচুর। পার্ব্বতীর কেশপাশে মৌক্তিক মালার প্রাচুর্য্য 'ত্যাগ' বা 'আত্মসুখস্পৃহাশূন্যতা'র পরিচায়ক হইতে পারে না। পার্ব্বতীর পরিধান ত্রিপুরার বনচারিণী লাইছাবীর মত রঙ্গীন লুঙ্গী! অদ্ভুত কল্পনার উদ্ভট উদ্ভাবনা, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সে দিন শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে এক জন প্রয়াগবাসী হিন্দু ভাস্করের গল্প বলিয়াছিলেন। অবনীন্দ্র-বাবুর আদেশে ভাস্কর একটি 'অর্দ্ধনারীশ্বর' মূর্ত্তি গড়িয়াছিল। অবনীন্দ্রবাবু মূর্ত্তি দেখিয়া প্রশংসা করেন, এবং ভাস্করকে বলেন,—'পার্ব্বতীর কানে একটি গহনা দাও, নতুবা মানাইবে না।' শিল্পী বলে,—ভিখারীর স্ত্রী, গহনা কোথায় পাইবে? আমি পার্ব্বতীর কানে গহনা দিতে পারিব না। অবনীন্দ্র বাবু বলেন,—'কিন্তু দেবীর খালি কান বেমানান হইবে না?' শিল্পী বহুক্ষণ ভাবিয়া বলিল,—'আমি পার্ব্বতীর কানে বনের ফুল

পরাইয়া দিব।' সেই পুষ্পকর্ণাভরণা পার্ব্বতীর পাষাণমূর্ত্তি এখনও অবনীন্দ্রবাবুর শিল্প-ভাণ্ডারে বিরাজ করিতেছে। এই হিন্দু ভাস্কর প্রাচীন 'ভারতীয়' কলাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিল। অজন্তাগুহা-চিত্রের অনুকরণে চিত্র করিলেই দেবতার চিত্র দেবতা হইতে পারে না। এই জন্য হিন্দুর শিল্পশাস্ত্রে ধ্যান করিয়া দেবদেবীর মূর্ত্তি রচনা করিবার বিধান আছে। এখনও হিন্দুস্থানের শিল্পী ও কারিগরেরা ধ্যানের সাহায্যেই শিল্পের চর্চ্চা করে।—সে যাহা হউক,—উপাস্য দেবতার চিত্রে যদি দেবভাবের অভাব ও পাশবভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে, ললিত কলার অনুরোধে, হিন্দু কখনও তাহা সহ্য করিবে না। জগন্নাথের মন্দিরগাত্রেও অশ্লীল চিত্র আছে বটে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে 'ভারতী'র মহিলা-রক্ষিত সারস্বত আয়তনে দেবতার চিত্রে অশ্লীলতার আরোপ কোনও মতে শোভা পায় না। 'ভারতী'র আর একখানি চিত্র,—শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত 'কচ ও দেবযানী' নামক 'ফ্রেস্কো' চিত্রের প্রতিলিপি। চারুবাবু লিখিয়াছেন, —'যিনি রবি বাবুর 'বিদায়-অভিশাপ' পড়িয়াছেন, তিনি এই চিত্রের মাধুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন।' আমরা বহুবার 'বিদায়অভিশাপ' পড়িয়াছি, এবং কাব্য-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু কচ ও দেবযানী চিত্রের 'মাধুর্য্যে' মুগ্ধ হইতে পারিলাম না। হয় ত আমরা চাষা,—এ চিত্রের মাধুর্য্য উপভোগ করিতে অক্ষম। কিন্তু পৌরাণিক কচ ও দেবযানীর চিরপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যের যে ছবি কল্পনাপটে মুদ্রিত হইয়া আছে, আলোচ্য চিত্রে তাহার লেশমাত্র নাই। কচ ও দেবযানীর মূর্ত্তি-অঙ্কনে চিত্রকর স্বাভাবিক 'পরিমাণ'ও লঙ্ঘন করিয়াছেন। 'ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি' অনুসারে চিত্রিত, চিত্রগুলির হস্ত, পদ প্রভৃতি অবয়ব, বিশেষতঃ অঙ্গুলিগুলি 'স্বভাবের' এত বিরুদ্ধ ও 'লম্বানে' হয় কেন, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না। স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রখানি সুন্দর হইয়াছে। স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের মৃত্যুশয্যার চিত্রখানি উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আইনে চীনই' নামক গল্পে বিশেষত্ব নাই। অবনীন্দ্র বাবু ইতিপূর্ব্বে শব্দ-চিত্রে যে নিপুণতার পরিচয় দিয়াছেন, 'আইনে চীনই' সে সৌন্দর্য্য-বৈভবে বঞ্চিত হইয়াছে। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নিষ্ঠা' নামক প্রহেলিকার সমস্যা-পূরণ সহজ বুদ্ধির সাধ্য নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মড়া-দাঙের প্রাচুর্য্য দেখিয়া কষ্ট হয়,—এই সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ সংস্কৃত শব্দের ঘটা, তাহার পরই চলিত ভাষার—অপশব্দের বৃষ্টি! বাঙ্গলা ভাষা যে বেওয়ারিশ ময়দা, এবং কবিরা যে নিরঙ্কুশ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 'বলেন্দ্রনাথ' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ভাষায় লেখকের দৃষ্টি নাই। এক জন নৈয়ায়িক বলিয়াছিলেন,—'অস্মাকুণাং নৈয়ায়িকেষাং অর্থনি তাৎপর্য্যাং শব্দনি কোশ্চিন্তা?'—এখনকার লোকদের ভাবও এইরূপ;—কিন্তু ভাষায় তাঁহাদের 'কোশ্চিন্তা' দেখিয়া আমরা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়াছি।

প্রত্যাবর্ত্তন ।

—:০:—

১

পুরাতন তাড়াগুলি খুলিয়া কমলিনী চিঠি পড়িতেছিল ।

অপরাহ্নের ছায়াস্নিগ্ধ পবন সম্মুখের খোলা ছাদের উপরিস্থিত টবের ফুলগাছগুলি দোলাইয়া চলিয়া গেল। পার্শ্বের ত্রিতল অট্টালিকার ছাদে প্রতিবেশীর কন্যা ও বধূরা বায়ুসেবন করিতেছেন। তাঁহাদের উৎফুল্ল হৃদয়ের সরল হাস্য, আনন্দের কলোচ্ছ্বাস বীণাগুঞ্জনের ন্যায় সান্ধ্যপবনে ঝঙ্কৃত ও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

তাহারও অতীত জীবনের মধুর দিনগুলি কি এমনই অখণ্ড শান্তি, অপূর্ব্ব আনন্দ ও সুখস্বপ্নে পূর্ণ ছিল না? বাল্যের স্নিগ্ধ উষায়; কৈশোরের উজ্জ্বল প্রভাতে ও যৌবনের দীপ্ত মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে তাহার প্রণয়-কমল ও সহস্র- দলে বিকশিত হইয়াছিল। মলিন, ছিন্নপ্রায় পত্রের অঙ্গে তাহার মৃদু সৌরভ এখনও যেন লাগিয়া রহিয়াছে।

চিঠি পড়িতে পড়িতে কমলিনীর মানসদৃষ্টির সম্মুখে অতীতের ছায়াচিত্র উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কলেজে বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে অধ্যাপকের অজ্ঞাতসারে স্বামীর পলায়ন, অতর্কিতভাবে শ্বশুরালয়ে আবির্ভাব, অসুস্থতার ভাণ করিয়া কলেজ কামাই—এ সব ত সর্ব্বদাই ঘটিত। অবকাশ উপলক্ষে স্থানান্তরে গেলে মহেশচন্দ্রের আবেগপূর্ণ প্রণয়লিপি প্রত্যহ দুইবার করিয়া ডাকঘরে প্রেরিত হইত। আদর, সোহাগ, ভালবাসা, মুহূর্ত্তের অদর্শনে গভীর উৎকণ্ঠা, ব্যাকুলতা ও আক্ষেপ, এ সকলের মধ্যে এক দিনের জন্যও ত এতটুকু কৃত্রিমতা লক্ষিত হয় নাই!

তখন প্রণয়ের কি তীব্র আকর্ষণই ছিল! তিলমাত্র ব্যবধান—তাহাও সহ্য হইত না। অর্দ্ধহস্তপরিমিত অপ্রশস্ত স্থানেও উভয়ের শয়ন ও নিদ্রার কোনও ব্যাঘাতই ঘটে নাই! বাতায়নবিহীন কক্ষে মহেশচন্দ্র তখন

মলয়হিল্লোলের সুখস্পর্শ অনুভব করিতেন। মেঘময়ী, ঘোরা বর্ষার রজনীতে ট্রামগাড়ী অথবা অশ্বযানের অভাবে দুই ক্রোশ পথ হাঁটিয়া শ্বশুরালয়ে আসিতেও তাঁহার কখনও উৎসাহভঙ্গের লক্ষণ দেখা যায় নাই।

কিন্তু এখন এত বড় অট্টালিকার মধ্যেও উভয়ের স্থান সংকুলান হয় না! বাতাসের দৌরাত্ম্যে গৃহের আলোক পুনঃপুনঃ প্রজ্বলিত করিতে হইলেও, অবাধ বায়ুসঞ্চালনের নিতান্ত অভাব বলিয়া মহেশ বাহির বাড়ীতে নিশা-যাপন করিতেন। আকাশে মেঘের চিহ্ন অথবা বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকিলেও, আসন্ন ঝটিকা ও বারিপাতের আশঙ্কায় তিনি বহুদিন গৃহে ফিরিতে পারিতেন না।

তা এমন হয়। তখন মহেশ দরিদ্র ছিলেন; শ্বশুরের অর্থে কলেজে পড়িতেন। তখন শ্বশুরনন্দিনীর রূপ যৌবনেও ভাঁটার টান ধরে নাই। সুতরাং সুন্দরী যুবতী পত্নীর প্রতি কর্ত্তব্যপালনে তাঁহার কোনও ত্রুটী হয় নাই। কিন্তু এখন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, ত্রিতল অট্টালিকার মালিক, এবং ব্যবসায়ে তাঁহার লক্ষ মুদ্রা খাটিতেছে। এখন কি আর একটা নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে থাকা সম্ভব? হাল সভ্যতা-বিধানের কোনও অধ্যায়ে সে কথাটা লেখা আছে কি? অতএব, বৈচিত্র্যহীন, পুরাতন দাম্পত্য জীবনে যে তাঁহার একটু অবসাদ আসিয়াছিল, সেটা এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। মহেশচন্দ্রকে তজ্জন্য কি কিছু দোষ দেওয়া যায়?

কিন্তু নারীর মন, স্ত্রীর হৃদয় এ সকল গভীর যুক্তি ও ন্যায়ের তর্কে কি সান্ত্বনা পায়? তাই ব্যথিতা, উপেক্ষিতা কমলিনী অন্য দিনের ন্যায় আজও পত্রগুলি পড়িয়া অশ্রুজলে হৃদয়ের ব্যথা লঘু করিতেছিল।

কাঁদো, হতভাগিনী নারী, কাঁদো! যে কাঁদিতে পারে, সে ত বাঁচিয়া যায়! অশ্রুবর্ষণে যাহার হৃদয়াকাশের জলদজাল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, যন্ত্রণার তীব্রদহনে সে পলে পলে মৃত্যুযন্ত্রণা অনুভব করে। চিঠিগুলি শতবার চক্ষু ও বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিয়া কমলিনী সিক্ত নয়নপল্লব বস্ত্রাঞ্চলে মার্জ্জনা করিল। কিন্তু অশ্রুর উৎস কি তাহাতে রুদ্ধ করা যায়? স্বামীর অতীত স্নেহ, ভালবাসা, প্রথম যৌবনের সহস্র সুখস্মৃতি তাহার হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছিল।

পাঁচ বৎসরের পুত্র হাবু মাতার অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল। কমলিনী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিল। পুত্র ত তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই? ভগবান্! শিশুর সরল কোমল হৃদয়ে পৃথিবীর দুঃখ, শোকের কঠোর ছায়া কখনও যেন না পড়ে!

অতি সন্তর্পণে, কৃপণের ন্যায় সতর্কভাবে ও সযত্নে কমলিনী প্রত্যেক চিঠি ভাঁজ করিল। এক একখানি পত্র তাহার নিকট এক একখানি কোম্পানীর কাগজ অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান্, তাহা কে জানিত? যথাস্থানে চিঠির তাড়া রাখিয়া দিয়া বিষাদিনী উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাহিরে জুতার শব্দ শ্রুত হইল। হাবু দরজার কাছে ছুটিয়া গেল। আনন্দপূর্ণকণ্ঠে, সোৎসাহে বালক বলিল, "মা, বাবা এসেছে।"

বিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় কার্ত্তিকের ন্যায় সুবেশ, সুকেশ ও সুরভিচর্ব্বিত মহেশচন্দ্র কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিয়াল্লিশ বৎসর বয়স হইলেও তাঁহার প্রসাধন ও ভূষণপরিপাট্য দেখিয়া বিংশবর্ষীয় নবযুবকের হৃদয়েও ঈর্ষ্যার সঞ্চার হইত।

সিগারের ধূমরাশি মণ্ডলাকারে উড়াইয়া দিয়া মহেশ বলিলেন, "কি হচ্ছে সব?"

কমলিনী নীরবে মুখ নত করিয়া রহিল।

হাবু পিতার কোলে চড়িয়া বলিল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ বাবা? আমি যাব।"

মহেশের অন্য সন্তান ছিল না। হাবুই তাঁহার কুলপ্রদীপ। সুতরাং শিশুর প্রতি তাঁহার স্নেহের অভাব ছিল না।

সস্নেহে পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া মহেশ বলিলেন, "দূর পাগল, তুই কোথায় যাবি?"

"হাঁ বাবা, আমি যাব। তোমার কোলে চড়ে যাব।"

"ছিঃ বাবা, ও কথা বলে না। আমি তোকে খুব সুন্দর খেলনা কিনে দেব।" মুখ ভার করিয়া হাবু বলিল, "আমি খেল্‌না নেব না। আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

মহেশ প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় যে! বহুকষ্টে পুত্রকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া তিনি দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন।

কাঁদিতে লাগিল। কমলিনী পুত্রকে বুকের উপর তুলিয়া লইল; বালকের স্ফীত অধর, অশ্রুসিক্ত গণ্ড সহস্রবার চুম্বন করিল। দুই বিভিন্ন দিক হইতে দুইটি অশ্রুর উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

২

দিবানিদ্রার পর শ্রীযুত মহেশচন্দ্র বাহিরের বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। আজ সমস্ত দিনটাই বৃথা কাটিয়া গেল! চারুবালার এ অত্যন্ত অন্যায়। মার সঙ্গে দেখা করিতে গেলে কি আর ফিরিয়া আসিতে নাই? এমন সুন্দর মধ্যাহ্নটি সে মাটী করিয়া দিয়াছে।

প্রমোদকাননের মধ্যস্থ পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া গোপাল, রাধিকা ও যতীন্দ্র মাছ ধরিতেছিল। মহেশচন্দ্র অলসমন্থরগমনে সেই দিকে চলিলেন। বাবু আসিতেছেন দেখিয়া প্রধান পার্শ্বচর রাধিকা মোড়াটা ছাড়িয়া দিল।

মহেশ বলিলেন, "কি হে রাধু, মাছ টাছ কিছু হ'লো নাকি?"

"আর ম'শায়, আপনি ছিলেন না, মাছে কি টোপ গিল্‌তে চায়? এখন্ এসেছেন, মাছও চারে এসে জমেছে। এইবার ঠিক গাঁথ্‌বো।"

সত্যই, মাছ দুইবার টোপে ঠোকর মারিল। মহেশের মুখ-চন্দ্রমা প্রসন্ন হইল। সগর্ব্বে তিনি বলিলেন, "দেখ্‌লে একবার বরাতটা!"

"তা হবে না? লোক্‌টা কে? হুজুরের যখন শুভাগমন হয়েছে, তখন কি আর মাছ না উঠে পারে?"

পুষ্করিণীর অপর পারে দরিদ্রা পল্লীবধূ ও গৃহস্থকন্যারা জল তুলিতেছিল; বাসন মাজিতেছিল। প্রমোদকাননের অভ্যন্তরে বিচিত্র উৎসবস্রোতঃ সর্ব্বদাই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, তাহা সকলেই জানিত, এবং বাবু ও পারিষদ-বর্গের যে তেমন সুনাম নাই, তাহাও পল্লীর কাহারও অবিদিত ছিল না। কিন্তু রাজপথের কলের জলে তাহাদের সকল অভাব পরিপূর্ণ হইত না। অগত্যা পল্লীনারীদিগকে পুষ্করিণীর জল ব্যবহার করিতে হইত।

বহু যুবতীর সমাবেশ লক্ষ্য করিয়া মহেশচন্দ্র সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। সোনার চসমা ভাল করিয়া নাকের উপর রক্ষা করিলেন। পঞ্জাবী আস্তীনটা গুটাইয়া লইয়া মহেশ কদমে কদমে পাদাচারণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফে চাড়া দিতেও ভুলিলেন না।

করুন।" ছিপের 'কাত্‌লা'র অপেক্ষা ও পারে অনেক অধিক দ্রষ্টব্য জিনিস ছিল।

"আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, ওপারের ঐ সব সুন্দরী যুবতীরা ঘোমটার ভিতর দিয়া একবারও আমায় দেখ্‌ছে না?"

"আলবৎ দেখ্‌ছে। না দেখে থাকবার যো কি? কি বল্‌ব,—"

গোপালের পৃষ্ঠে মৃদু করাঘাত করিয়া মহেশ নলটি তাহার হাতে দিলেন।

যতীন্দ্র ছিপে টান মারিয়া বলিল, "আপনার এত বয়স হয়েছে, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, একটি চুল পর্য্যন্ত শাদা হয়নি, মুখের কোথাও একটু টোল খায় নাই। আপনি কেমন করে এমন চেহারা রাখ্‌লেন?"

"কি জানো যতীন্‌! অনেক তোয়াজ্‌ চাই। চেহারা কি আর অমনই থাকে? বিস্তর মেহনৎ করতে হয়েছে, তবে রাখ্‌তে পেরেছি।"

অপরাহ্লের বাতাসটা বড় মিঠা লাগিতেছিল। সরসীর কালো জলে ঈষৎ তরঙ্গহিল্লোল, পরপারস্থ যুবতীদিগের চুড়ীর ও অলঙ্কারের মৃদু রণরণি। আবেশে মহেশের নয়নপল্লব নিমীলিত হইয়া আসিল। পত্রবহুল বকুলের ডালে বসিয়া একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল।

মহেশচন্দ্র সহসা ব্যগ্রভাবে বলিলেন, "কই হে রাধু, এখনও এলো না কেন?"

বঁড়শিতে টোপ্‌ লাগাইয়া রাধিকা বলিল, "এই আসে আর কি? পাঁচটার মধ্যে ঠিক হাজির হবে। অনেক দিন পরে ছাড়া পেয়েছে কি না?"

ফটকের দরজায় একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল। গোপাল ছিপ ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ঐ এসেছে, বাঁচ্‌বে অনেক দিন।"

মহেশচন্দ্র শিষ্‌ দিতে দিতে টেড়িটায় একবার হাত দিয়া ঠিক করিয়া লইলেন। গুম্ফের প্রান্তদ্বয় স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, ঠিক খাড়া আছে বটে।

শিঞ্জিতচরণে উদ্যানপথ মুখরিত করিতে করিতে মরকত রঙ্গমঞ্চের ভূতপূর্ব্বা অভিনেত্রী চারুবালা আসিতেছিল। সপারিষদ মহেশচন্দ্র অনুচ্চ জয়ধ্বনি করিলেন!

করিয়া সুন্দরী অলসচরণক্ষেপে প্রমোদকক্ষে প্রবেশ করিল। মহেশচন্দ্রও তাহার অনুসর করিতে যাইতেছেন, এমন সময় কাহার পরিচিত কণ্ঠস্বর তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল।

তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, এক ব্যক্তি রুদ্ধনিশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে।

বিস্মিতভাবে তিনি বলিলেন, "কি !রামলোচন দা', তুমি কোথা থেকে ? ব্যাপার কি ?"

রামলোচন হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "মুই এহানে আজ সকালে আইছি। এহনি ঘরে চল। হাবু আবল্ তাবল্ কত কি বক্‌বার লাগ্‌ছে। বেঁহুস জ্বর। ঠাইরেন ত হাপুস্ কাঁদ্‌তেছে।"

রামলোচন সর্দ্দার শিশুকাল হইতে মহেশকে লালন পালন করিয়াছিল। দুনিয়ায় তাহার আপনার বলিবার কেহ ছিল না। মহেশের পিতা অতি শৈশবে রামলোচনকে আপনার গৃহে আনিয়াছিলেন। তখন হইতে মহেশচন্দ্রও তাঁহার পরিবারবর্গের সুখ দুঃখে একেবারে জড়িত হইয়া গিয়াছিল। সে যে মহেশচন্দ্রের সংসারের এক জন, তাহাকে পরিবারের মধ্য হইতে যে কোনও মতেই বাদ দেওয়া চলে না, সকলেই তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিল। মহেশচন্দ্রও এই ষাট বৎসরের বলিষ্ঠ বৃদ্ধকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভয় করিতেন, সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিতেন। ইদানীং মহেশের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়াতে রামলোচন মহেশের দেশস্থ পৈত্রিক ভিটাবাড়ী ও অন্যান্য সম্পত্তি আগুলিয়া থাকিত। কিন্তু সেখানে সে এক ক্রমে কিছু কাল কোনও মতেই থাকিতে পারিত না। মাসের মধ্যে অন্ততঃ একবার করিয়া তাহাকে কলিকাতায় আসিতেই হইবে! মহেশ ও তাহার পুত্র হাবুকে না দেখিলে তাহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া পড়িত। রামলোচনের দেহ দেশে পড়িয়া থাকিলেও তাহার প্রাণ কলিকাতার বাড়ীতে ঘুরিয়া বেড়াইত।

মহেশ বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি যাও। আমি পরে যাইব। কাউকে দিয়ে চারু ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে যাও। ও রকম জ্বর খোকার প্রায় হয়। সেরে যাবে।"

রামলোচন উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল, "হাবু ক্যাবল্ তোমার নাম করবার লাগছে। তোমার এহনই যাতি হবে। যদি পোলাপানে কিছু হয়!"

রাধিকা ডাকিল, "এ দিকে শীঘ্র আসুন মহেশ বাবু, চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

মহেশ ব্যস্তভাবে বলিলেন, "তুমি এখন যাও রামলোচন দা, আমি পরে যাচ্ছি।"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই মহেশচন্দ্র দ্রুতপদে বিলাসকক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ভগ্নহৃদয়ে, ক্ষুণ্নমনে বৃদ্ধ রামলোচন ফিরিয়া গেল।

তখন আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে একখানা প্রকাণ্ড মেঘ দুলিতেছিল।

৩

সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গেই কাল-বৈশাখীর ঝড় আরম্ভ হইয়াছিল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। ছিদ্রশূন্য মেঘের উপর নিবিড় নীরদজাল দূর দিগন্ত হইতে ছুটিয়া আসিতেছিল। দীপ্ত দামিনীর নিষ্ঠুর হাস্যে প্রকৃতি শিহরিয়া উঠিতেছিল। বজ্রের অশ্রান্ত ভীমগর্জ্জনে মেদিনী আতঙ্কে কাঁপিতেছিল।

ডাক্তার তখনও আসিল না দেখিয়া রামলোচন স্বয়ং চিকিৎসকের সন্ধানে বহির্গত হইল। হাবুর জ্বরের অবস্থা ভাল নহে। এক জন ডাক্তার যে চাই!

রাজপথ জনহীন। সেই ঘোর দুর্য্যোগে গৃহস্থ বহুপূর্ব্বে দ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। দোকানদার দোকানপাট তুলিয়াছে। মিউনিসিপালিটীর আলোগুলি নির্ব্বাপিত। ক্ষুব্ধ পবন শ্বসিয়া শ্বসিয়া রুদ্ধ বাতায়ন ও দ্বারে আঘাত করিয়া ফিরিতেছিল।

অন্ধকারমগ্ন, জনশূন্য রাজপথে ভিজিতে ভিজিতে বৃদ্ধ রামলোচন গৃহ-চিকিৎসক চারু বাবুর বাড়ী পঁহুছিল। বহু চেষ্টার পর সে অবগত হইল, চারু ডাক্তার সে দিনের মত একটা 'কলে' গিয়াছেন। আজ আর এ দুর্য্যোগে তাঁহারা ফিরিবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ভগ্নহৃদয়ে অবসন্নদেহে রামলোচন সেইখানে মুহূর্ত্তের জন্য বসিয়া পড়িল। বিনা চিকিৎসায় তাহার নয়নের পুত্তলী হাবু কি শেষে মারা পড়িবে? এত টাকা, এত সম্পত্তি থাকিতে কোনও প্রতীকারের সম্ভাবনা নাই? মহেশ কি এতক্ষণে বাড়ী ফিরে নাই? তাহার পুত্রের সঙ্কটাপন্ন পীড়া,—সে কি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবে?

জানিত ; তাঁহাদের সন্ধান লইল। কিন্তু কোথাও তাহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না। এক জন দার্জ্জিলিঙ্গে বায়ুপরিবর্ত্তনে গিয়াছেন। অপর ডাক্তারের নিজের শরীর অসুস্থ। তৃতীয় চিকিৎসক গৃহে আছেন বটে, কিন্তু এই দুর্য্যোগে গৃহের সুখশয়ন ত্যাগ করিয়া স্বর্গে যাইতেও সম্মত নহেন। অর্থের খাতিরেও নহে।

বৃদ্ধ বহু অনুনয় বিনয় করিল ; অনেক টাকা কবুল করিল। কিন্তু ডাক্তার বাবু কোনও মতেই এই দুর্য্যোগে ঘরের বাহির হইতে সম্মত হইলেন না। প্রভাতে তিনি যাইতে পারেন, তৎপূর্ব্বে নহে। বৃদ্ধ রোগীর অবস্থা বর্ণনা করিল। ডাক্তার বাবু শুনিয়া বলিলেন, "এখন দেখিবার তেমন কোনও প্রয়োজন নাই। সকালে কেমন থাকে, আসিয়া বলিও ; তখন যাইব।"

ডাক্তার দুয়ার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। রামলোচনের দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। হায়, বৃদ্ধ ! দুনিয়ার কেহ কি অপরের হৃদয়বেদনার পরিমাণ করিয়া কাজ করে !

রামলোচন কুণ্ঠিতভাবে রোগীর গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার সিক্ত বস্ত্র হইতে তখনও জল ঝরিতেছিল। কমলিনী মুমূর্ষুপ্রায় পুত্রের পার্শ্বে পাষাণপ্রতিমার ন্যায় বসিয়া ছিল। ভূমিতলে বসিয়া পরিচারিকা নিদ্রাবেশে ঢুলিতেছিল। কিন্তু মহেশচন্দ্র কোথায় ?

দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দে কমলিনী চমকিয়া উঠিল। রামলোচনকে একাকী আসিতে দেখিয়া তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখমণ্ডল আরও বিবর্ণ হইয়া গেল।

"ডাক্তার এসেছেন ?"

রামলোচন মুখ নত করিল। বহু আয়াসে আত্মসংবরণ করিয়া সংক্ষেপে জানাইল, সকাল না হইলে ডাক্তার পাওয়া যাইবে না। এ দুর্য্যোগে কেহই আসিতে চাহিল না।

ততক্ষণ খোকা বাঁচিবে কি ? যেরূপ প্রলাপ বকিতেছে, লক্ষণ ত ভাল নয় !

বালক চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাবা, বাবা ! কোলে যাব। যাঃ— চলে গেল !"

উদ্‌ভ্রান্তদৃষ্টি বালক শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। রামলোচন সযত্নে ও সন্তর্পণে বালককে শয্যায় শোয়াইয়া দিল। উঃ কি উত্তাপ !

কমলিনী আর সহ্য করিতে পারিল না। পুত্রের অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কটাপন্ন

হইতেছে দেখিয়া সে ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। নীরবে নিঃশব্দে ক্রন্দন! পাছে এতটুকু শব্দে বালক ভয় পাইয়া উঠে, রোগ যদি বাড়িয়া যায়!

হায় মাতৃহৃদয়! শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কত স্নেহ, কত আশঙ্কা! বালকের জীবনস্রোতঃ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল, কিন্তু জননী-হৃদয় তখনও তাহা অনুমান করিতে পারে নাই।

রামলোচন সমস্তই বুঝিয়াছিল। সে বহু রোগীর সেবা করিয়াছে। বহু মৃত্যু স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

"মা, মা, আমি যাব।"

আলুলায়িতকেশা কমলিনী উঠিয়া বসিল, "কোথায় যাবি বাবা, এই যে আমি।"

সে শব্দ বালকের কর্ণে পঁহুছিল না। অনন্ত যাত্রার পথপ্রান্তে সে কাহার উজ্জ্বল, নিত্যসুন্দর মূর্ত্তি দেখিতেছিল। বুঝি কোনও সুরবীণার ধ্বনি তাহার কর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছিল। পৃথিবীর শব্দ সে শুনিতে পাইবে কেন?

রামলোচন নয়নের অশ্রুপ্রবাহ রুদ্ধ করিয়া বলিল, "চুপ্ দেন্ ঠাইরেন্, পোলাপান্ ভয় পাবে।"

ঘড়ীতে দুইটা বাজিয়া গেল।

কমলিনী পুত্রের গায়ে হাত দিল; এত শীতল কেন? নাসিকা স্পর্শ করিল, এ কি, নিশ্বাস পড়িতেছে না কেন?

"রামলোচন, এ দিকে এস। কি সর্ব্বনাশ হলো দেখ; খোকা এমন করে কেন?"

বৃদ্ধ আর সহ্য করিতে পারিল না। সে শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিল। সব যে শেষ হইয়া গিয়াছে!

মত্ত ঝটিকা প্রবলবেগে আর একবার রুদ্ধ বাতায়নে বলপরীক্ষা করিয়া গেল। আকাশে বজ্র গর্জ্জিয়া উঠিল।

কমলিনীর সংজ্ঞাশূন্য দেহ বিগতপ্রাণ পুত্রের পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িল।

* * * * *

তখন আলোকোজ্জ্বল প্রমোদকক্ষে বিলাসের স্রোতঃ প্রবল উচ্ছ্বাসে বহিতেছিল! শূন্যগর্ভ, ছিপি খোলা বোতলগুলি কার্পেটমণ্ডিত কক্ষে গড়াগড়ি যাইতেছিল। গৃহের এক পার্শ্বে নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী—চপ্,

কাট্‌লেট, মাংস, আলুর দম প্রভৃতি রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যদ্রব্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। কেহ তখনও তাহাদের সদ্ব্যবহার করে নাই! দুই একটি মার্জ্জার লোলুপ-দৃষ্টিতে ভোজ্যগুলির প্রতি চাহিয়া অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল।

অর্দ্ধজড়িত কণ্ঠে চারুবালা গাহিতেছিল,

"আয়ে রে বরষণকো বাদরওয়া!"

তাহার পানোন্মত্ত লোচনযুগল, হাস্যচঞ্চল আরক্ত ওষ্ঠাধরে কি সুধা-স্রোতঃ উছলিয়া উঠিতেছিল! কণ্ঠস্বরে কি রাগিণীর ঝঙ্কার!

৪

সংবাদটা প্রভাতেই মহেশচন্দ্রের নিকট পঁহুছিল। নেশার ঝোঁক একেবারে না গেলেও ব্যাপারটা মহেশের হৃদয়ঙ্গম হইল। বীণার একটা তার সহসা কেহ যেন জোর করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। পুত্রের স্বাস্থ্য কখনও ভাল ছিল না বটে, কিন্তু এত শীঘ্র যে সে চলিয়া যাইবে, এ আশঙ্কা ত তিনি কখনও করেন নাই!

নেশার মাত্রাটা ক্রমশঃ যতই তরল হইয়া আসিতে লাগিল, মহেশের হৃদয়ে বেদনাটা ততই প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল।

বাবুর মলিন মুখ ও মানসিক চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া পারিষদবর্গ উৎকণ্ঠিত হইল। কেহ কেহ প্রস্তাব করিল, আজ কালীঘাটে যাওয়া যাক্। স্থান-পরিবর্ত্তনে ও নূতন রকম আমোদে বাবুর চিত্তচাঞ্চল্য, শোক প্রশমিত হইবে। মহেশচন্দ্র আপত্তি করিলেন না। যে কোনও উপায়ে হউক, বিস্মৃতি আবশ্যক। তিনি আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতে চাহেন।

যথাসময়ে মহেশচন্দ্র সদলবলে কালীঘাটে পঁহুছিলেন। গঙ্গাস্নানে পুণ্য-সঞ্চয় করিয়া সকলে দেবীদর্শনে গেলেন। মহামায়ার তৃপ্তির জন্য জোড়া পাঁঠা মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিল।

দর্শনান্তে মহেশচন্দ্র নাটমন্দির হইতে নামিতেছেন, এমন সময় কেহ তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে ডাকিল।

মহেশ ফিরিয়া চাহিলেন। কি বিভ্রাট! এ উপসর্গ এ সময়ে কোথা হইতে আসিল?

উপসর্গটি আর কেহই নহে—তাঁহারই শ্যালক, শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ!

"মা ও ছোট দিদি আপনাকে দেখ্‌তে পেয়েছেন। আপনাকে ডাকছেন।"

এখানে আসিয়াছে ? না, তাহা সম্ভব নহে। চারুবালা যে তাঁহার সঙ্গিনী, তাহাও ত কেহ বুঝিতে পারে নাই ?

পারিষদবর্গ সহ চারুবালা অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল। তাহারা মহেশের নূতন বিপদের কথা জানিতে পারিল না। মহেশের পক্ষে সেটা শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে।

নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে মহেশচন্দ্র শ্বাশুড়ী-সম্ভাষণে চলিলেন। নাটমন্দিরের অপর প্রান্তে তাঁহারা দাঁড়াইয়া ছিলেন।

শ্বশ্রূমাতা বলিলেন, "তুমি এখানে এসেছ, আর আমাদের ওখানে যাও নাই ?"

মহেশচন্দ্র নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। হাবুর মৃত্যুসংবাদ তাহা হইলে এখনও এখানে পঁহুছে নাই। চারুবালাকেও বোধ হয় কেহ লক্ষ্য করে নাই!

শ্যালিকা বিনোদিনী বলিল, "আপনি এবেলা আমাদের ওখানে থেকে যাবেন, চলুন।"

মহেশ বলিলেন, "সঙ্গে লোকজন আছেন, তাঁদের ফেলে যাওয়াটা—"

নরেন্দ্র বলিল, "তা বেশ ত, তাঁদেরও নিয়ে চলুন। তাঁরা কোথায় বলুন, আমি ডেকে আনছি।"

মহেশ ব্যগ্রভাবে বাধা দিয়া বলিলেন, "তাঁরা আজই বৈকালের গাড়ীতে দেশে চলে যাবেন। কেমন করে হয় ?"

এ দিকে মহেশচন্দ্রকে না দেখিতে পাইয়া সকলে তাঁহার অনুসন্ধানে আসিতেছিল। রাধিকা বলিল, "এই যে এখানে!"

মহেশচন্দ্র চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কি দুর্দ্দৈব! সব প্রকাশ হইয়া পড়ে বুঝি!

বিনোদিনী অস্ফুটস্বরে বলিল, "ইঁহারাই আপনার সঙ্গে এসেছেন বুঝি ? ওটি কে ?"

চারুবালা মন্থরগতিতে আসিতেছিল। চিক্কণ পট্টবাসে তাহার গঙ্গাজল-স্নাত মার্জ্জিত রূপ উছলিয়া উঠিতেছিল।

মহেশচন্দ্রের মুখমণ্ডল সহসা আরক্ত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ করিয়া তিনি সাহসে ভর করিয়া বলিলেন, "ও—সম্পর্কে আমার বোন্ হয়। সম্প্রতি দেশ থেকে এসেছে।

নরেন্দ্র বলিল, "আর ঐ সাম্‌নের বাবুটি ? উনি বুঝি আপনার বোনাই ?"

মহেশচন্দ্র ইঙ্গিতে তাহাই স্বীকার করিলেন। উপস্থিত বিপদ হইতে কোনরূপে রক্ষা পাইলেই তিনি বাঁচেন।

বিনোদিনী বলিল, "আপনার ভগিনী ত বড় সুন্দরী ? এমন রূপ দেখিনি, ওঁকে নিয়ে চলুন ; যেতেই হবে।"

শ্যালক অভিনিবেশসহকারে চারুবালাকে দেখিতেছিল। সামাজিক রীতি ও রুচির বিরুদ্ধ হইলেও সে কৌতূহল দমন করিতে পারে নাই। সে সবিস্ময়ে অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি আশ্চর্য্য ! থিয়েটারে ঠিক এইরূপ একটা অভিনেত্রীকে দেখিয়াছি ! উভয়ের মধ্যে কি অদ্ভুত সাদৃশ্য !"

রাধিকা বলিল, "বেশ, আপনি এখানে, আর আমরা সারামুল্লুক আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

বিপন্ন মহেশ তাড়াতাড়ি বলিলেন, "তোমরা গাড়ীতে ওঠগে, আমি এখনই যাচ্ছি।"

চতুর রাধিকা ব্যাপারটা কতক অনুমান করিয়া লইল। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিল না।

বিনোদিনী বলিল, "তা হবে না বোন্‌ মশায় ; এবেলা আমাদের ওখানে যেতেই হবে।"

"না না, আজ আমায় মাপ কর। আর একদিন আস্‌বো। আজ কাজ আছে।"

ক্ষুণ্ণস্বরে বিনোদিনী বলিল, "আপনি গেলেন না, মা বড় কষ্ট পাবেন। ভাল কথা, দিদিকে বল্‌বেন, হাবুর জন্য একজোড়া পশমের জুতো বুনে রেখেছি। আর দিদি তার জন্য যে একটা টুপি তৈরি করতে দিয়েছিল, সেটাও হয়ে গেছে। আমি যে দিন আপনাদের ওখানে যাব, সঙ্গে নিয়ে যাব। বুঝেছেন ?"

মহেশ শিহরিয়া উঠিলেন। সংক্ষেপে বলিলেন, "আচ্ছা।"

"আরও বল্‌বেন,—দিদি আমায় পত্র লেখে না কেন ? আমি চারখানা চিঠি লিখ্‌লুম, কিন্তু একখানারও উত্তর পেলেম না। দিদির মাথার অসুখটা সেরেছে ত ? হাবুর শরীর আগের চেয়ে ভাল হয়েছে ?"

দ্রুতপদে চলিতে চলিতে মহেশ বলিলেন, "হু।"

এক নিশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া তিনি গাড়ীতে উঠিলেন। এত বড় প্রকাণ্ড

৫

রামলোচনের আর দেশে যাওয়া হইল না। যাহাদের জন্য এত কষ্ট করিয়াও সে দেশের জমী জমা আগুলিয়া থাকিত, তাহাদের অর্দ্ধেক ত বৃদ্ধকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে! শোকে দুঃখে রামলোচনের বুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই তাহার মনে হইত, হাবু কোথাও বুঝি দুষ্টামি করিয়া লুকাইয়া আছে, অকস্মাৎ তাহার স্কন্ধে লাফাইয়া পড়িবে! বৃদ্ধ অনেক সময় ভ্রান্ত আশামরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত; তার পর ধীরে ধীরে নিঃশব্দচরণে কক্ষত্যাগ করিত।

মহেশচন্দ্রের ব্যবহারে রামলোচন মর্ম্মান্তিক ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়াছিল। আজ চারি দিন হাবু চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু শোকার্ত্তা পত্নীকে সান্ত্বনা দেওয়া দূরে থাকুক, একবার তাহার সহিত দেখা করিতেও আসিল না! তাহার এত দূর অধঃপতন হইয়াছে?

বৃদ্ধ মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করিল।

সন্ধ্যার পরেই মহেশচন্দ্রের বৈঠক বসিয়াছিল। হারমোনিয়ম ও বেহালার সুরের সঙ্গে চারুবালার বীণানিন্দিত কণ্ঠ অতি মধুর লাগিতেছিল। কিন্তু মহেশচন্দ্রের নেশাটা আজ ভাল জমিতেছিল না। নেশার একটা ঝোঁক কাটিয়া গেলেই তাহার প্রাণটা যেন হা হা করিয়া উঠিতেছিল। ইহা বোধ হয় প্রকৃতির ধর্ম্ম।

বোতলবাহিনীর ঘন ঘন আবির্ভাব ও তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে মহেশচন্দ্রের সে অবস্থা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল। বেহালা বড় মধুর বাজিতেছে! চারুবালার কণ্ঠে এত সুধাও সঞ্চিত ছিল?

ঘন ঘন জয়ধ্বনি ও উৎকট চীৎকারে সমস্ত উদ্যানটি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এতক্ষণে আমোদ একটু জমিয়া আসিয়াছে।

সহসা দ্বারপথে একটি মূর্ত্তি দেখা দিল। আগন্তুকের ভীমমূর্ত্তি দেখিয়া গায়িকার ওষ্ঠপ্রান্তে গানের দ্বিতীয় চরণ স্তব্ধ হইয়া গেল। অকস্মাৎ রসভঙ্গ হওয়ায় মহেশচন্দ্র মুখ তুলিয়া চাহিলেন। পারিষদবর্গও চঞ্চল হইয়া উঠিল।

গম্ভীরস্বরে আগন্তুক ডাকিল, "দামু!"

বহুকাল মহেশচন্দ্রকে এ নামে কেহ ডাকে নাই। পরলোকগত পিতা ও রামলোচন ব্যতীত শৈশবের বহু আদরের এ নামে কেহ তাঁহাকে কখনও সম্বোধন করে নাই। মহেশচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন।

রাধিকা জড়িতকণ্ঠে বলিল, "কে বাবা তুমি, অসময়ে রসভঙ্গ করতে এলে? যাও না চাঁদ, নিজের পথ দেখ না বাবা!"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া রামলোচন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার বলিষ্ঠ বাহুযুগল ও বিস্তৃত বক্ষঃস্থল অনাবৃত। তাহার হস্তে একগাছি বাঁশের লাঠী। নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

বৃদ্ধ গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "এহনি আইস।"

মহেশচন্দ্রের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। বৃদ্ধের শোকার্ত্ত মূর্ত্তির উপর দৃঢ়তার ছায়া পড়িয়াছিল। সে আদেশবাণী পালন অথবা অগ্রাহ্য করিবার সামর্থ্য কিছুই তাহার ছিল না।

গোপাল ও রাধিকা সমস্বরে বলিল, "তুই কোথাকার কে যে, না বলে কয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকিস্? কে তোকে এখানে আস্তে বলেছে?"

রামলোচনের নয়নদ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। তাহার শরীরের মাংসপেশী-সমূহ স্ফীত হইয়া উঠিল। গর্জ্জন করিয়া বৃদ্ধ বলিল, "চোপ্, কুত্তার বাচ্চা! একটুহানি ভদ্দর লোকের রক্ত, চামড়া যদি গায়ে তাহে। ঐহানে চুপ্‌টি করিয়া বইসা থাহ।"

বৃদ্ধের লাঠীর বহর ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া রাধিকা বুঝিল, গতিক ভাল নয়। এ ক্ষেত্রে চুপ করিয়া থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া রামলোচন মহেশচন্দ্রকে শিশুর ন্যায় কোলে করিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

* * * *

একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া মহেশচন্দ্র অপরাধীর ন্যায় কুণ্ঠিতভাবে, নিঃশব্দ-চরণে পত্নীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। এক কোণে খোকার লেপ, বালিশ, তোষক প্রভৃতি গোছান রহিয়াছে। আলনায় বালকের নিত্যব্যবহার্য্য ফ্রক, জুতা, মোজা ঝুলিতেছে। তাহার জুতা লাঠী প্রভৃতি অতি সযত্নে আল্‌নার পার্শ্বে রক্ষিত। টেবিলের উপর হাবুর ব্যাট, বল, রেলেরগাড়ী, পুতুল প্রভৃতি নানাবিধ প্রিয় খেলানা পরিপাটীরূপে সাজান রহিয়াছে। আর কমলিনী—তাঁহার ভার্য্যার ছায়ামূর্ত্তি, সেই খেলানাগুলি একটির পর আর একটি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছে।

গৃহের প্রত্যেক সামগ্রী মহেশচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে যেন এক একটা তীব্র কশাঘাত করিল। দেওয়ালে বালকের একখানি ফটোগ্রাফ্, তাহার এক পার্শ্বে তাঁহার ও ...

মহেশচন্দ্র নয়ন ফিরাইয়া লইলেন। যন্ত্রণার আতিশয্যে তাঁহার হৃদয় মথিত হইতে লাগিল। ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া মহেশচন্দ্র তেমনই নিঃশব্দে কক্ষত্যাগ করিলেন। ছায়ার ন্যায় রামলোচনও তাঁহার অনুসরণ করিল।

৬

বর্ষাবারিবিধৌত নীল আকাশে পূর্ণিমার চন্দ্র হাসিয়া উঠিল। মস্তিষ্কের পীড়াবশতঃ মহেশচন্দ্র সাত দিন শয্যাত্যাগ করিতে পারেন নাই। আজ প্রকৃতির অনবদ্য মঙ্গলমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ধারাস্নাত বৃক্ষরাজি স্নিগ্ধ চন্দ্রকরলেখায় কি বিচিত্রই দেখাইতেছিল! গাছের ডালে বসিয়া পাপিয়া অবিশ্রান্ত ডাকিতেছিল।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার বাসনায় মহেশচন্দ্র কক্ষত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন। বাহিরের মুক্তবায়ু সাত দিন তিনি সেবন করেন নাই। স্নিগ্ধ পবন ও দীপ্ত চন্দ্রমার কিরণে বাসনার সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। উদ্যানবাটিকায় তিনি যেন কত যুগ অনুপস্থিত! সুন্দরী চারুবালা তাঁহার বিহনে এখন কি করিতেছে? সমস্ত গীতবাদ্য বোধ হয় নীরব! তাঁহার অসুস্থতায় সকলেই ম্রিয়মাণ। চারুবালার মুখে সে হাসিটি বোধ হয় আর নাই! তাঁহার অভাবে সমস্তই শ্রীহীন—আনন্দ-উৎসব নীরব।

মহেশচন্দ্রের হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভোগের প্রবল কামনা তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। মুগ্ধের ন্যায়, স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় মহেশচন্দ্র রাজপথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

পাখীর কণ্ঠস্বরে কি মধুর গীতলহরী কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! ঝিল্লীর অশ্রান্ত রাগিণীতে প্রেমসঙ্গীতের কি বিচিত্র তান! মহেশচন্দ্র দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন। চারুবালার সুন্দর মুখখানি কেবলই তাঁহার মনে পড়িতেছিল।

জ্যোৎস্নাস্নাত পল্লীকুটীরগুলি ছবির মত দাঁড়াইয়া ছিল। কোথাও গৃহস্থ দীপ নিবাইয়া শয়ন করিয়াছে। কোনও কুটীর হইতে মৃদু দীপালোক-শিখা বহির্গত হইতেছিল। দরিদ্র শ্রমজীবীরা কি সুখী! সহস্র অভাব সত্ত্বেও তাহাদের ক্ষুদ্র সংসারে কত শান্তি, কত পবিত্রতা! ধনবান বিলাসীর

"বাবা!"

মহেশচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন। পথিপার্শ্বস্থ কোনও কুটীরমধ্য হইতে একটি বালক তাহার পিতার ক্রোড়ে যাইবার জন্য মাতার নিকট আবদার করিতেছিল।

মহেশ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। শিশু-কণ্ঠের সাদৃশ্য তাঁহাকে অভিভূত করিল। পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে তিনি সেইখানে দাঁড়াইলেন। দূর দিগন্ত হইতে একটা স্নেহব্যাকুল পিতৃ-সম্বোধন যেন বাতাসে ভাসিয়া আসিতে লাগিল।

হৃদয়ের রুদ্ধ কপাটে কে আঘাত করিতেছিল। সশব্দে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। পুষ্পপেলব হস্তে শতদলমালা ধারণ করিয়া চন্দ্রালোকিত স্বপ্নরাজ্য হইতে কাহার দীপ্ত মূর্ত্তি নামিয়া আসিতেছে?

অন্ধকার দূরে পলাইয়া গেল। হৃদয়গগন স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এস, এস শিশু! এস পবিত্র শুভ বন্ধন! বন্দী কর, মুক্তি দাও! কামনার কারাগার চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া যাক্!

দ্রুততরবেগে মহেশচন্দ্র ফিরিলেন। পথিমধ্যে কোথাও থামিলেন না। গৃহে পঁহুছিয়া একেবারে পত্নীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ।

রামায়ণের সমসাময়িক সমাজ।

রামায়ণের সময়ে আসিয়া আর্য্য সমাজ প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছে। এই সমাজে বিশেষ কোনও প্রকারের আবিলতা নাই। পরবর্ত্তী কালে মহাভারতে যে সমাজের ছায়া দৃষ্ট হয়, রামায়ণের সমাজে সে মহাভারতীয় সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা লক্ষিত হয় না! কি চতুর্ব্বর্ণের শৃঙ্খলা, কি আচার ব্যবহার, কি বিবাহপদ্ধতি, কি রীতিনীতি, সমস্ত বিষয়েই সে সমাজ তখন সুশৃঙ্খলার উপর প্রতিষ্ঠিত।

রামায়ণের সময় চতুর্ব্বর্ণের বিভাগ ও ব্রাহ্মণ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সত্যযুগে কেবল ব্রাহ্মণেরাই তপের অনুষ্ঠান করিতেন। ত্রেতাযুগে তপোবল-

বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়াও তপঃপ্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। (১) ইহা রামায়ণের সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কালের সামাজিক অবস্থা। এই সময় ক্ষত্রিয়-প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব উপেক্ষিত হইতেছে দেখিয়া সমাজের নেতৃগণ চাতুর্ব্বর্ণ্যসম্মত বর্ণাচারের ভেদ-স্থাপক-স্মৃতি-শাস্ত্র প্রণয়ন করিলেন। (২) ইহার পর রামায়ণের সমাজের আরম্ভ হইল।

রামায়ণের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করেন না। বৃহদারণ্যকোপনিষদের রাজর্ষি জনক (৩) ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু রামায়ণের জনক ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিবার অধিকারী নহেন।

শূদ্র তখন তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা দূরে থাকুক, তপস্যা করিতে উদ্যত হইলেই রাজধর্ম্মানুসারে বধ্য বলিয়া গণ্য হইতেন। শম্বুক শূদ্র তপস্যাপরায়ণ হইয়াছিলেন; এই জন্য রাম কর্ত্তৃক হত হইলেন। (৪)

রামায়ণে ব্রাহ্মণের পৃথক যান বাহন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ রামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে "ব্রাহ্মং রথ বরং যুক্তমাস্থায় সুধৃতব্রতঃ।" (৫) ব্রাহ্মণের আরোহণযোগ্য অশ্বযুক্ত শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার গৃহে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়,—

ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখং চাসীৎ বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ।
শূদ্রাঃ স্বকর্ম্মনিরতাঃ ত্রীন্ বর্ণানুপচারিণঃ॥ (৬)

"ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অনুজ্ঞাবহ, বৈশ্যগণ ক্ষত্রিয়ের আজ্ঞাবহ, শূদ্রগণ ত্রিবর্ণসেবারূপ স্বকর্ম্মে নিরত ছিল।"

রামায়ণের ব্রাহ্মণ শূদ্রকে মন্ত্র প্রদান করিতেন না। (৭) বিবাহ বিষয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা রামায়ণে অধিক দেখিতে পাওয়া না। সীতার বিবাহ অনেক স্থলে স্বয়ংবর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা আর্য্য ভারতের প্রচলিত স্বয়ংবরের অনুরূপ নহে। সীতাকে জনক "বীর্য্যশুল্কা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

---

(১) আদি; ৬৫ সর্গ। (২) উত্তর; ৭৪ সর্গ।

(৩) জনক নাম নহে। ইহা কুলোপাধি। বৃহদারণ্যকের ব্রহ্মজ্ঞানী জনক ও রামায়ণের জনক অভিন্ন কি না, তাহা বলা যায় না। রামায়ণের জনক বিংশতিতম জনক।

(৪) উত্তর; ৮৯ সর্গ। (৫) অযোধ্যা; ৫৪। (৬) আদি—৬—১৯। (৭) ঐঃ—২৮—৫।

বীর্য্যশুল্কেতি মে কন্যা স্থাপিতেয়মযোনিজা। (১)

রামায়ণে স্বয়ংবরের উল্লেখ থাকিলেও, রামায়ণের সমাজ স্বয়ংবরের পক্ষপাতী ছিল, এরূপ বোধ হয় না।

বায়ু কুশনাভের কন্যাগণের পাণিপ্রার্থনা করিলে, কুশনাভের কন্যারা বায়ুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন,—

"রে দুর্ব্বুদ্ধে, জনকই আমাদিগের প্রভু ও পরম দেবতা, তিনি যাহার হস্তে আমাদিগকে সম্প্রদান করিবেন, তিনিই আমাদিগের পতি হইবেন। কামবশতঃ সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া আমাদিগের স্বয়ংবর হইবার প্রবৃত্তি যেন কখনও উপস্থিত না হয়।"

মাভূৎ স কালো দুর্ম্মেধঃ পিতরং সত্যবাদিনম্।
অবমন্য স্বধর্ম্মেণ স্বয়ংবরমুপাস্মহে॥ (২)

ইহাতে স্বয়ংবরের নিন্দাই সূচিত হইতেছে।

রামায়ণে বহুবিবাহের উল্লেখ আছে। রাজা দশরথ বহুবিবাহ করিয়াছিলেন। রামায়ণের সমাজে অনুলোম বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। দ্বিজপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ ক্ষত্রিয় লোমপাদের কন্যা শান্তকে, এবং ক্ষত্রিয় রাজা দশরথ বৈশ্যা ও শূদ্রা স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন ক্ষত্রিয়া স্ত্রী মহিষী, বৈশ্যা স্ত্রী বাবাতা ও শূদ্রা স্ত্রী পরিবৃত্তি বলিয়া কথিত হইত। (৩)

অনার্য্য সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। রাবণ ও বালী বহুবিবাহ করিয়াছিলেন।

রামায়ণে বাল্যবিবাহের উল্লেখ আছে। কন্যার ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রমই বিবাহের উপযুক্ত সময় বলিয়া কথিত হইয়াছে। (৪) সীতার ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে বিবাহ হয়; রাম তখন ঊনষোড়শবর্ষবয়স্ক। বাল্যবিবাহ দোষাবহ হইলে পঞ্চদশ ও ষষ্ঠ বর্ষ কখনই বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম বলিয়া কথিত হইত না।

সীতার সম্বন্ধে জনক রাজা বিশ্বামিত্রকে বলিতেছেন,—"সীতা বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অনেকানেক রাজা আসিয়া তাহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু বীর্য্যশুল্কা বলিয়া আমি বিবাহ দিই নাই।" (৫)

স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনভাবে বিচরণপ্রথা রামায়ণের সমাজে দেখিতে

(১) আদি; ৬৬—১৫। (২) আদি—৩২—২১ শ্লোক। (৩) আদি—১৪—৩৫। (৪) আদি ৬৬—১৪ (৫) আদি; ৬৬।

পাওয়া যায় না। হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান "অবরোধপ্রথা" রামায়ণের সমাজের অবরোধপ্রথার অনুরূপ। তখন পুরুষের পক্ষে স্ত্রীজনসমাজে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল। (১) অযোধ্যার অন্তঃপুরে পরপুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। রাজা দশরথের অতি বিশ্বস্ত পারিষদ বলিয়া রাজ-অন্তঃপুরে একমাত্র সুমন্ত্রের প্রবেশাধিকার ছিল। (২) লক্ষ্মণ কিষ্কিন্ধ্যার অন্তঃপুরেও সহসা প্রবেশ করেন নাই।

সীতা যখন বনগমনে উদ্যতা হইয়া রামের সহিত পদব্রজে রাজপথে বাহির হইয়া রাজভবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন নাগরিকগণ বলিতেছিলেন,—

যা ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং ভূতৈরাকাশগৈরপি।
তামদ্য সীতাং পশ্যন্তি রাজমার্গগতা জনাঃ॥ (৩)

"হায়! পূর্ব্বে আকাশগামী প্রাণীরা ভয়ে সীতাদেবীকে দেখিতে পাইত না, অদ্য রাজপথস্থিত মানবেরাও তাঁহাকে দেখিতেছে।"

রাবণ-বধের পর বিভীষণ সীতাকে রামসমক্ষে শিবিকা-সংযোগে আনয়ন করিলে রাম বলিলেন, "সীতাকে আমার নিকটে (পদব্রজে) আসিতে বল।" বিভীষণ রামের কথা শুনিয়া সত্বর সকলকে অপসারিত করিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তখন বেত্রধারী কঞ্চুকিগণ চারি দিক হইতে পুরুষগণকে অপসারিত করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া রাম বিভীষণকে বলিলেন, "বিপদ, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ংবর, যজ্ঞ ও বিবাহকালে স্ত্রীলোককে দেখিতে পাওয়া দূষণীয় নহে। জানকীর এখন বিপদ উপস্থিত" ইত্যাদি।—(৪)

ইহার পর লঙ্কার অনার্য্য সমাজের কথা। লঙ্কাতেও অবরোধপ্রথা প্রচলিত ছিল। রাবণ-বধের পর রাবণের মৃতদেহের উপর পতিত হইয়া রাজ্ঞী মন্দোদরী বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন, "আমি অবগুণ্ঠিতা না হইয়া নগরদ্বার হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি, এবং পদব্রজে এই স্থানে আসিয়াছি, ইহা দেখিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ না? চাহিয়া দেখ, তোমার অপরা পত্নীগণের লজ্জা-অবগুণ্ঠন স্খলিত। ইহারা অন্তঃপুর পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানে উপস্থিত, ইহা দেখিয়া তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ না কেন?" (৫)

---

(১) কিষ্কিন্ধ্যা; ৩১। (২) অযোধ্যা; ১৪। (৩) অযোধ্যা; ৩৩—৮। (৪) লঙ্কা;

তৎকালে স্ত্রীলোকদিগের শিবিকা প্রভৃতি বহনের নিমিত্ত পৃথক লোক ছিল। বিভীষণ স্ত্রীলোকদিগকে বহিবার যোগ্য বাহকের দ্বারা সীতাকে রামের নিকট আনিয়াছিলেন। (১) সম্ভবতঃ এই বাহকগণ অতিবৃদ্ধ; নতুবা নপুংসক। এই সকল আচার ব্যবহার দেখিয়া মনে হয়, তৎকালে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত ছিল। তখন কুমারী কন্যাগণ ভৃত্যের সহিত উদ্যানে ভ্রমণ করিতেন। (২)

রামায়ণের সময়ে আর্য্যসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল না। দাক্ষিণাত্যে অনার্য্য সমাজে বিধবা ভ্রাতৃ-জায়াকে গ্রহণ করিবার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে।

বালী মায়াবী দৈত্যের সহিত যুদ্ধে গমন করিয়া প্রত্যাগমন না করায়, সুগ্রীব বালীর নিধন হইয়াছে অনুমান করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। বালীর স্ত্রী তারাও তাঁহার হইল। সুগ্রীব নিজেই বলিতেছেন,—

রাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুময়া সহ। (৩)

অন্যত্র, সুগ্রীব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে স্ত্রীহরণের অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া রামের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেছেন। সুগ্রীব বলিতেছেন, "বালী ফিরিয়া আসিয়া আমাকে উত্তরীয় পর্য্যন্ত লইতে সময় না দিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছে, এবং আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে।" (৪)

বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব তারাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সমাজ যাহার প্রশ্রয় দিতে পারে না, সমাজে এমন অনেক ঘটনা ঘটিতে পারে। ঐরূপ ঘটনাকে সমাজের প্রচলিত আচার বলিয়া অভিহিত করা যায় না, এবং করাও সঙ্গত নহে।

বালী ও সুগ্রীবের পরস্পরের স্ত্রীকে লইয়া পরস্পরের বিহার সমাজের অনুমত ও ধর্ম্মসঙ্গত কি না, তাহার বিচার আবশ্যক।

প্রথম ঘটনা সম্বন্ধে অঙ্গদ বলিতেছেন,—

ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য যো ভার্য্যাং জীবতো মহিষীং প্রিয়াম্।
ধর্ম্মেণ মাতরং যস্তু স্বীকরোতি জুগুপ্সিতঃ॥
কথং স ধর্ম্মং জানীতে যেন ভ্রাত্রা দুরাত্মনা।
যুদ্ধায়াভিনিযুক্তেন বিলস্য পিহিতং মুখম্॥ (৫)

---

(৩) কিষ্কিন্ধ্যা। (৪) কিষ্কিন্ধ্যা।

"জ্যেষ্ঠভ্রাতৃজায়া ধর্ম্মতঃ মাতৃবৎ, সুতরাং যে ব্যক্তি সেই জীবিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে গ্রহণ করে, সেই জুগুপ্সিত ব্যক্তির ধর্ম্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইবে? (এইরূপ করিয়া) সুগ্রীব স্মৃতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন।"

অঙ্গদের এই উক্তি হইতে দেখা যায়, বালীর জীবিতকালে তাঁহার স্ত্রীর সহিত সুগ্রীবের ব্যবহার ধর্ম্মশাস্ত্রবিগর্হিত ব্যভিচার বলিয়া বানর-সমাজ কর্তৃকই উক্ত হইতেছে; সুতরাং ইহাকে অনার্য্য সমাজের প্রচলিত প্রথা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয় ঘটনা,—সুগ্রীবের স্ত্রীর সহিত বালীর ব্যবহার। ইহার সম্বন্ধে রাম বালীকে বলিতেছেন,—

ভ্রাতুর্ব্বর্ত্তসি ভার্য্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্॥
অস্য ত্বং ধরমাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ।
রুমায়াং বর্ত্তসে কামাৎ স্নুষায়াং পাপকর্ম্মকৃৎ॥ (১)

"তুমি সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীতে অনুগমন করিতেছ। সুগ্রীব তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; সুতরাং ইঁহার পত্নী রুমা তোমার পুত্রবধূতুল্যা। অতএব,

* * * কামার্ত্তস্য দণ্ডো বধঃ স্মৃতঃ।
"স্মৃতিশাস্ত্র অনুসারে তুমি বধের যোগ্য।"

এই স্থানে বক্তা রাম। রাম যাহাকে সনাতন ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহা অনার্য্য সমাজের স্বীকার্য্য নাও হইতে পারে; বিশেষতঃ, রাম এ স্থলে বালি-বধের ছল খুঁজিতেছিলেন; সুতরাং এ স্থলে বালীর কার্য্য অনার্য্যদিগের সমাজবিরুদ্ধ হইয়াছিল কি না, স্পষ্ট বুঝা গেল না। সুগ্রীবের আচরণকে অঙ্গদ যেরূপ অন্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেইরূপ (অঙ্গদের ন্যায়) বানর-সমাজের যদি কেহ বালীর এই কার্য্যকেও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বা সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিত, তাহা হইলে, তাহা দ্বারা এই কার্য্যের দোষ গুণ বিচার করা যাইত।

তৃতীয়,—বালীর মৃত্যুর পর বিধবা তারাকে সুগ্রীবের স্ত্রীরূপে গ্রহণ। রামায়ণে এই আচরণ নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া কথিত হয় নাই। ইহাকে "বিধবা-বিবাহ" নামে অভিহিত করা যায় কি না, তাহার আলোচনা আবশ্যক। বিধবা তারার সহিত সুগ্রীবের বিবাহের কোনও কথা রামায়ণে দেখিতে

পাওয়া যায় না। লঙ্কাকাণ্ডের ২৮ অধ্যায়ে শুক রাবণের নিকট সুগ্রীবের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন,—

এতাং মালাঞ্চ তারাঞ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্।
সুগ্রীবো বালিনং হত্বা রামেণ প্রতিপাদিতঃ॥ ৩২

"সুগ্রীব রামের সাহায্যে বালীকে বধ করিয়া মালা, তারা ও শাশ্বত কপিরাজ্য লাভ করিয়াছেন।" এ স্থলে "তারা-লাভ" সমাজ ও ধর্ম্মসঙ্গত বিধানের অনুমত কি না, তাহা অপ্রকাশ।

বালী মৃত্যুকালে সুগ্রীবকে বলিতেছেন,—"যাই হউক, তুমি অদ্যই এই কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য গ্রহণ কর। প্রাণ, রাজ্য, প্রিয় দ্রব্য, বিপুল রাজলক্ষ্মী এবং নির্ম্মল যশ ত্যাগ করিয়া আমি চলিলাম। * * আমার অবর্ত্তমানে আমার প্রিয়তম পুত্র অঙ্গদকে তুমি তোমার ঔরস পুত্রের ন্যায় দেখিও। * * এই তারা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বিপদসূচক বিবিধ কার্য্যবিজ্ঞানে সম্যক নিপুণা, ইনি যাহা বলিবেন, যথার্থ ভাবিয়া নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে তাহা করিবে। তারার মত যেন কিছুমাত্র অন্যথা না হয়।"

বালীর এই অন্তিম উক্তি হইতেও কিষ্কিন্ধ্যা-সমাজে জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়ায় বিধিসঙ্গত অধিকারের কোনও আভাস পাওয়া যায় না। কিন্তু রামের নিকট সুগ্রীবের "রাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুময়া সহ—" এই নিঃসঙ্কোচ উক্তি ও অঙ্গদের "যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জীবিতকালে তাহার পত্নীকে গ্রহণ করে, তাহার ধর্ম্মজ্ঞান কোথায়?"—এই দুটি উক্তির প্রমাণে, জ্যেষ্ঠের মৃত্যুর পর তাহার পত্নীতে কনিষ্ঠের অধিকার অনেকটা কিষ্কিন্ধ্যা-সমাজের অনুমোদিত বলিয়া মনে হয়।

সুগ্রীবের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলে, সুগ্রীবকে স্মৃতিশাস্ত্রের অবমাননাকারী বলিয়া মনে হয় না। কারণ, সুগ্রীব বুঝিয়াছিলেন, এবং বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, বালি দৈত্য-যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছেন। তিনি সংবৎসরকালমধ্যে তাঁহাকে আগমন করিতে না দেখিয়াই তাঁহার মৃত্যু অনুমান করিয়া বালীর পরিত্যক্ত রাজ্য ও তারাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। মৃত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে গ্রহণ করা তাঁহাদের সমাজ ও ধর্ম্মের বহির্ভূত হইলে, সুগ্রীব রাম-সম্ভাষণের প্রথমেই আপনার উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের

ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই ভাবিয়াছিলেন, তাই নিঃসঙ্কোচে রামের নিকট বলিয়াছিলেন,—

রাজ্যঞ্চ সুমহৎ প্রাপ্য তারাঞ্চ রুময়া সহ।

কিন্তু বালী ও অঙ্গদের মনে অন্যরূপ ধারণা ছিল, তাই তাঁহারা সুগ্রীবের আচরণ স্মৃতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন, এবং বালী প্রতিশোধ-গ্রহণের মানসে সুগ্রীবকে একবস্ত্রে নির্ব্বাসিত করিয়া কনিষ্ঠের পত্নীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুগ্রীবের তারা-গ্রহণ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য বলিয়া উক্ত হয় নাই। পরন্তু সুগ্রীব যখন রামপ্রসাদে কপিরাজ্য লাভ করিয়া স্ত্রীগণসম্ভোগে উন্মত্ত হইয়া কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন, যখন লক্ষ্মণ সুগ্রীবের এই আচরণে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সুগ্রীবের সেই কামিনী-কল-কণ্ঠ-নিনাদিত অন্তঃপুরের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন বুদ্ধিমতী তারা লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন,—"আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না; সুগ্রীব অকৃতজ্ঞ নহেন; বিশেষতঃ,—

রামপ্রসাদাৎ কীর্ত্তিঞ্চ কপিরাজ্যঞ্চ শাশ্বতম্।
প্রাপ্তবানিহ সুগ্রীবো রুমাং মাঞ্চ পরন্তপ।

"রামের প্রসাদেই সুগ্রীব কীর্ত্তি, শাশ্বত বানর-রাজ্য, নিজের পত্নী রুমা ও আমায় পাইয়াছেন।"

অন্যত্র লক্ষ্মণ তারাকে সুগ্রীব-পত্নী বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তারা লক্ষ্মণকে প্রবোধবাক্য বলিলে লক্ষ্মণ তারাকে বলিতেছেন,—

কিময়ং কামবৃত্তস্তে লুপ্তধর্ম্মার্থসংগ্রহঃ।
ভর্ত্তা ভর্তৃহিতে যুক্তে নঃ চৈবমববুধ্যসে॥

"ভর্তৃহিতকারিণী, তোমার পতি সুগ্রীব কামবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যে ধর্ম্ম ও অর্থ লোপ করিতে বসিয়াছেন, তাহা কি বুঝিতেছ না?"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীব সমাজপ্রচলিত নিয়মানুসারেই তারাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন; পরন্তু ভ্রাতার জীবিতকালে ভ্রাতৃজায়ার গ্রহণ অনার্য্যসমাজেরও রীতিবিরুদ্ধ ছিল।

লঙ্কার রাক্ষসসমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল, এমন প্রমাণ মহর্ষি-কৃত রামায়ণে নাই। কেহ কেহ বলেন, মন্দোদরী বিভীষণের পত্নীরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন, ইহা বঙ্গীয় কবির কল্পনামাত্র। বিধবা সুর্পণখা দ্বিতীয় পতি

গ্রহণ করে নাই, কিন্তু ব্যভিচারিণী ছিল। স্ত্রীলোকের ব্যভিচারও রাক্ষস-দিগের সমাজপ্রচলিত সাধারণ প্রথা বলিয়া অনুমিত হয় না।

কিষ্কিন্ধ্যার বানরসমাজে ক্ষেত্রজ-পুত্র-উৎপাদনের প্রথা লক্ষিত হয়। হনুমান কেশরীর ক্ষেত্রজ পুত্র ও বায়ুর ঔরস পুত্র; (১) জাম্ববান গদগদের ক্ষেত্রজপুত্র; (২) নল বিশ্বকর্ম্মার ঔরস পুত্র ও অনুবালীর ক্ষেত্রজপুত্র, । (৩) এই প্রথা মহাভারতীয় যুগে আর্য্যসমাজেও প্রচলিত ছিল।

মৃতদেহের অগ্নিসংকার অতি প্রাচীন কাল হইতে আর্য্য ও অনার্য্য উভয় সমাজেই প্রচলিত দেখা যায়। রাজা দশরথ "বাসি মড়া" হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার দেহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত, এবং ভরতের আগমনের পর সরযূতীরে নীত ও শাস্ত্রসঙ্গত প্রথায় দগ্ধ হইয়াছিল (৪)।

রাম স্বজনবৎ জটায়ুকে জলন্ত চিতায় দাহ করিয়াছিলেন, পিণ্ড দিয়াছিলেন, এবং তাহার তর্পণও করিয়াছিলেন। (৫) জটায়ুর শবদাহকে অনার্য্যসমাজের প্রথা বলা যায় না। রাম পিতৃবন্ধু ও উপকারকের এই পারলৌকিক কার্য্য কর্ত্তব্যজ্ঞানেই করিয়াছিলেন। এইগুলি রামের কার্য্য; অনার্য্য সমাজের নহে।

কিষ্কিন্ধ্যা সমাজে অগ্নিসংস্কারের প্রথা দেখা যায় না। বানররাজ বালীর মৃত্যু হইলে, বানরগণ বালীকে বসন ভূষণে ও মাল্যে সজ্জিত করিয়া শিবিকায় তুলিয়া নদীতীরে লইয়া চলিল; অগ্রে অগ্রে বানরেরা রত্ন ছড়াইয়া যাইতে লাগিল। নদীতীরে চিতা প্রস্তুত হইলে অঙ্গদ সুগ্রীবের সহিত সজলনয়নে পিতাকে চিতার উপর শয়ন করাইলেন, এবং শাস্ত্রানুসারে অগ্নিপ্রদান করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মৃতদেহ দাহ করিয়া বানরগণ নদীতে তর্পণ করিতে গমন করিল। (৬)

রামের সহবাসে ও তাঁহার উপদেশে কিষ্কিন্ধ্যার অনার্য্যসমাজে দাহ-প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল, ইহাও অনুমিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহা নহে। কিষ্কিন্ধ্যার শব-শিবিকা পূর্ব্বেই প্রস্তুত ছিল। সেই শিবিকার বর্ণনা কিষ্কিন্ধ্যার অনার্য্য সভ্যতার উচ্চ নিদর্শন। আমরা রামায়ণ হইতে তাহার বর্ণনা প্রদান করিলাম। "তার শিবিকার জন্য পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিয়া দিব্য শিবিকা আনয়ন করিল। সেই শিবিকা পক্ষী ও বৃক্ষলতাদি

---

(১) লঙ্কা · ৩০। (২) লঙ্কা ; ২৭। (৩) লঙ্কা ; ৩০। (৪) অযোধ্যা ৭৬।

বিচিত্র চিত্রে চিত্রিত। সিদ্ধগণের বিমানের ন্যায় জালসদৃশ বাতায়ন সমন্বিত। নিপুণ শিল্পিগণ কর্ত্তৃক রচিত। কাষ্ঠনির্ম্মিত ক্রীড়াপর্ব্বত শোভিত, এবং বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত। উহা স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট হার আভরণ এবং বিচিত্র মাল্যে শোভিত। অভ্যন্তরভাগ রাজযোগ্য বিস্তৃত মহামূল্য আসনে সংযুক্ত, রক্তচন্দনভূষিত। সে শিবিকা অতি বিশাল।" (১)

তাহার পর লঙ্কার রাক্ষস-সমাজের কথা। বিরাধ রাক্ষস রামকে বলিয়াছিলেন,—

অবটে চাপি মাং রাম নিক্ষেপ্য কুশলী ব্রজ। ২১
রাক্ষসাং গতসত্ত্বানামেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ। ২২

"তুমি আমাকে গর্ত্তে নিক্ষেপ করিয়া যাও; মৃত রাক্ষসদিগের সমাধিই সনাতন ধর্ম্ম।" ইহা দণ্ডকারণ্যের অসভ্য রাক্ষসদিগের কথা। লঙ্কার রাক্ষস-সমাজে সমাধিপ্রথা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা সভ্যতার ক্রমবিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। নিম্নে রাবণের অগ্নিসংকারের রাক্ষসী ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইল।—

"রাক্ষস ব্রাহ্মণেরা রাবণের মৃতদেহকে পট্ট বসন পরাইয়া শিবিকায় আরোহণ করাইল। সকলে মাল্যসজ্জিত বিচিত্র পাতাকা শোভিত শিবিকা উত্তোলন করিয়া কাষ্ঠভার গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল। বিভীষণ অগ্রে অগ্রে চলিলেন। অধ্বর্য্যুগণ পাত্রস্থ প্রদীপ্ত অগ্নি গ্রহণপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। অনন্তর বেদবিধি অনুসারে রক্ত ও শ্বেত চন্দন পদ্মক ও উশীর দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রাঙ্কব (লোমজ কম্বল) আস্তীর্ণ করিয়া দিলে শাস্ত্রোক্ত বিধানমতে রাবণের পিতৃমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইল। ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে বেদী রচনা করিয়া যথাস্থানে বহ্নিস্থাপন করিলেন। অতঃপর রাবণের স্কন্ধে দধি ও ঘৃতপূর্ণ স্রুব নিক্ষেপপূর্ব্বক পদদ্বয়ে শতক ও উরুযুগলে উদূখল এবং অরণি, উত্তরারণি ও অন্যান্য দারুপত্র সকল যথাস্থানে রাখিয়া পিতৃমেধ কার্য্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর শাস্ত্র ও মহর্ষিগণের বিধানানুসারে পবিত্র পশু হনন করিয়া তাহার ঘৃত সংযুক্ত মেদ দ্বারা এক আবরণী প্রস্তুত করিয়া রাবণের মুখে স্থাপিত করিলেন। বিভীষণ প্রভৃতি সুহৃদগণ গন্ধমাল্য ও বিবিধ বস্ত্রাদি দ্বারা উঁহার দেহ অলঙ্কৃত করিয়া তদুপরি লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর বিভীষণ যথাবিধি অগ্নিকার্য্য করিলেন।

রাবণের দেহ ভস্মীভূত হইলে তিনি কৃতস্নান হইয়া আর্দ্রবসনে বিধি অনুযায়ী সদর্ভ তিলোদকে রাবণের তর্পণ করিলেন। (১)

লঙ্কার অগ্নিসংকারের ব্যবস্থা ও রীতি নীতি অযোধ্যার অনুরূপ নহে। সুতরাং তাহাও রামের উপদেশের ফল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে স্বামীর শবদেহের সহিত স্ত্রীর সহমরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে বেদবতীর মুখে শুনা যায়, তাঁহার পিতা শুম্ভ নামক দৈত্যরাজ কর্ত্তৃক হত হইলে, তাঁহার মাতা স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন। (২) রামায়ণেও সহমরণ পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু রামায়ণের সময়ে এই প্রথা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছিল। রামায়ণে অনেক সতীর মুখেই সহমরণের কথা শুনা যায়, কিন্তু কাহাকেও সহমৃতা হইয়া এই ধর্ম্ম রক্ষা করিতে বড় দেখা যায় নাই। কৌশল্যা পতি ও পুত্রশোকে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন,

সাহমদ্যৈব দিষ্টান্তং গমিষ্যামি পতিব্রতা।
ইদং শরীরমালিঙ্গ্য প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ॥—অযো—৬৬

"আমি এখনই পাতিব্রত্য ব্রতপালনার্থ স্বামীর শরীর আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিব।"

কৌশল্যা সহমৃতা হন নাই; এমন কি, দশরথের এই অসংখ্য স্ত্রীর মধ্যে এক জনও অনুমৃতা হন নাই। সীতার মুখেও সহমরণের কথা শুনা গিয়াছিল। সীতা অশোক বনে রামের মায়ামুণ্ড দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমাকে স্বামীর শরীরের সহিত সংযোজিত করিয়া দেও, আমি স্বামীর অনুগমন করিব।" (৩)

কিষ্কিন্ধ্যার অনার্য্য সমাজেও এইরূপ ইচ্ছার ক্ষীণ প্রবর্ত্তনা লক্ষিত হয়। বালীর মৃত্যুর পর তারা শোকাভিভূত হইয়া বলিয়াছিলেন,—

হতস্যাপাস্য বীরস্য গাত্রসংশ্লেষণং বরম্।—কি—২১—১৩।

কিন্তু লঙ্কার রাক্ষস সমাজে সহমরণের উল্লেখ নাই। মাইকেল স্বীয় কাব্যে প্রমীলার চিতারোহণের যে বর্ণনা করিইয়াছেন, তাহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত, ইহা বলাই বাহুল্য।

(১) লঙ্কা : ১২৩। (২) উত্তর : ১৭। (৩) লঙ্কা : ৩২—৩২

রামায়ণের আর্য্য সমাজে স্ত্রীত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ভরতের মাতামহ কেকয়রাজ তাঁহার স্বার্থপর ও অবাধ্য মহিষীকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (১) রাজা দশরথও রাম-বনবাসের পূর্ব্বে কৈকেয়ীকে বলিয়াছিলেন,—"আমি অগ্নিসমক্ষে মন্ত্র পাঠ করিয়া তোর যে পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহা পরিত্যাগ করিলাম। তোর গর্ভে আমার যে পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকেও তোর সহিত পরিত্যাগ করিলাম। (২) আর্য্য সমাজের আদর্শ রাজা রাম দুইবার সীতাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা ইহাকে সমাজের অনুমোদনীয় বলিয়া মনে করিতে পারি।

লঙ্কার রাক্ষস সমাজে পরস্ত্রীগমন ও পরস্ত্রীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে। (৩)

রামায়ণের আর্য্য সমাজে ব্যভিচারীর গুরুতর দণ্ডের ব্যবস্থা আছে। অযোধ্যাকাণ্ডে কথিত হইয়াছে,—পরস্ত্রীহরণ অপেক্ষা গুরুতর পাপ আর নাই। (৪) যে পরস্ত্রী ও পরধনের অপহারী, সেই দুরাত্মাকে প্রজ্বলিত গৃহের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। (৫) নিরপরাধের ক্ষতি করা ও পরস্ত্রীগমনে নির্ব্বাসন দণ্ড বিহিত ছিল। (৬) ভরত মাতুলালয় হইতে আসিয়া জননীর মুখে যখন শুনিলেন, "রাম নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তখন তিনি সন্দিহানচিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'রাম কি পরদারে আসক্ত হইয়াছিলেন—এই নির্ব্বাসন দণ্ড কেন হইল ?"

সমাজে যাহা অহরহ ঘটিয়া থাকে, সামাজিক জনগণের চিন্তা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। ভরতের এই চিন্তা হইতেও ব্যভিচার অপরাধে তৎকালে গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে।

পঞ্চবটীতে মায়ামৃগের অনুসরণে লক্ষ্মণের অনভিপ্রায় দেখিয়া পতিগতপ্রাণা আদর্শ লক্ষ্মী সীতার মনে লক্ষ্মণের প্রতি যে সন্দেহ জাগিয়াছিল, পতির বিপদের ভাবনায় বিগতবুদ্ধি হইয়া তিনি লক্ষ্মণকে কঠোর ভর্ৎসনার সহিত যাহা বলিয়াছিলেন, এবং লঙ্কা-শিবিরে লঙ্কার ভীষণযুদ্ধের অবসানে সীতার অগ্নিপ্রবেশের পূর্ব্বে পরগৃহে রক্ষিতা সীতার চরিত্র চিন্তা করিয়া

---

(১) অযোধ্যা ; ৩২। (২) অযোধ্যা ১৪—১৪। (৩) সুন্দর। ২০। (৪) অযোধ্যা ; ৩৮

আদর্শ রাজা রাম সতীর প্রতি যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে, এগুলি তৎকালীন সমাজের চিন্তনীয় বিষয় ছিল বলিয়া বোধ হয়।

রামায়ণে ইন্দ্রের ও অহল্যার ব্যভিচারের কথা লিখিত হইয়াছে। ইহাও তৎকালীন সামাজিক চিত্র। এইরূপ ব্যভিচার বর্ত্তমান অধঃপতিত সমাজেও সম্ভবে না।

রামায়ণে অতিথিসৎকার, সত্যরক্ষা, ক্ষমা প্রভৃতি ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং আমরা সামাজিক আলোচনায় তাহা পরিত্যাগ করিলাম।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

তৈল-দর্শন।

[আয়ুর্ব্বেদ।]

তৈল একটি আশ্চর্য্য পদার্থ। অনেক দিন ধরিয়া ভাবিতেছি, ইহার উদ্ভব কোথায়? কিন্তু ভাবিয়া কোনও কুল কিনারা পাইলাম না। চরক-সংহিতার মতে, তৈল বায়ুনাশক, ঘৃত পিত্তনাশক, এবং মধু কফ-নাশক। কফপ্রধান লোক হৃষ্টপুষ্ট, শান্ত, নম্র ও ধীর হইয়া থাকে। যেমন সত্যযুগের লোক। বোধ হয়? সে সময় কফের এত প্রাদুর্ভাব ছিল যে, মধুর বিলক্ষণ প্রয়োজন হইত। এই হেতু বৈদিক মন্ত্রাদির মধ্যে, হোম যাগ যজ্ঞে, প্রথমতঃ মধুরই আধিপত্য অধিক। বোধ হয়, মধুযুগের অবসান হইলে ঘৃতযুগ আসিয়াছিল।

পিত্তপ্রধান লোকের পক্ষে ঘৃত বিহিত। ঘৃত দুই প্রকার; মাহিষ্য ও গব্য। শক্তুর (ছাতু) সহিত মাহিষ্য ঘৃত ব্যবহার্য্য। যেমন পশ্চিম প্রদেশে অন্নের সহিত গব্য ঘৃত প্রযোজ্য। বোধ হয়, তিন যুগ ধরিয়া পিত্ত এত প্রবাহিত হইয়াছিল যে, অবশেষে ঘৃত মহার্ঘ হইয়া পড়িল। ক্রমে পিত্ত চুঁইয়া গেল। বায়ু প্রবল হইল। অলক্ষ্যে এইরূপ হইয়া আসিতেছিল, কেহ দেখে নাই। সুতরাং ঘৃতের পরিবর্ত্তে তৈল যে প্রথমে কোন কালে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা অসাধ্য।

তবে এটা ঠিক যে, তৈল ক্রমশঃ স্বীয় পথ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছে। ইহা দুই প্রকারে ব্যবহৃত হয়। "মর্দ্দনে সেবনে চ।" মস্তক ও কেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পদতল পর্য্যন্ত তৈল নির্ব্বিবাদে লেপন করা যাইতে পারে। কেবল নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি রন্ধ্র স্থানে ইহার "প্রয়োগ"মাত্র হয়। সেবনে তৈল পাচক ও বিরেচক উভয় ফল প্রদান করে।

লেপন ও মর্দ্দন।

বায়ুপ্রশমনই তৈলের গুণ। মস্তকে বায়ু প্রবল হইলে সুগন্ধি তৈলের ব্যবস্থা। বায়ুপ্রকোপে চুল উঠিয়া যায়, পাকিতে থাকে, জটা পড়ে। কেশরাজি বর্দ্ধিত করিতে তৈলের মত অন্য কিছুই নাই। আমার একটি বন্ধুর শ্যালিকা নাসিকায় "কুন্তলীন" তৈল প্রয়োগ করিতেন। তিন বৎসর পরে তাঁহার গোঁফের রেখা দিতে লাগিল। তাঁহার স্বামী সভয়ে আমাদিগের পরামর্শ লইতে আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে মুখামৃতপ্রয়োগের ব্যবস্থা দিয়াছিলাম! তাই রক্ষা, নচেৎ খুব সম্ভবতঃ শাজেহান বাদশাহের মত তাহার লম্বা গোঁফ উঠিয়া পড়িত। সুগন্ধি তৈলের মূল্য বড় কম নয়! হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এক টাকায় গড়পড়তায় পাঁচটি করিয়া চুল বাহির হয়। সুকেশিনী রমণীর একটা মস্তকের দাম কত, হিসাব করিয়া দেখুন!

দেশ যে যথেষ্ট বায়ুপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রমাণের অভাব নাই। এমত স্থলে তৈলই ভরসা।

লাঙ্গুল নামক প্রত্যঙ্গে তৈলপ্রয়োগের ব্যবস্থা ঐতিহাসিক কথা। বায়ুনন্দন হনুমানের বায়ুপ্রশমনার্থ ত্রেতাযুগে রাক্ষস-বৃন্দ তৈল দ্বারা তাঁহার লাঙ্গুল সিক্ত করিয়াছিল। ইহাতে অগ্নিসংযোগ না করিলে অত্যন্ত প্রীতিসঞ্চার হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ একটু বাড়াবাড়ি হওয়াতে লঙ্কাদাহ হইয়া গেল। তাহা দেখিয়া আমরা অধুনা কেবল তৈলই প্রদান করি।

ইহার তত্ত্ব কিছু গূঢ়। শাস্ত্রোক্ত কয়টা রিপু বায়ু,—পিত্ত ও কফ বিভাগে এই রকম দাঁড়ায়,—

কাম—পিত্তপ্রধান	নিম্ব পত্রের সহিত গব্যঘৃত ব্যবস্থা।
পরশ্রীকাতরতা ঐ	

লোভ—কফপ্রধান } পিপ্পলীর সহিত মধু ব্যবস্থা।
মোহ—ঐ }

ক্রোধ—বায়ুপ্রধান } তৈল ব্যবস্থা।
অহঙ্কার—ঐ }

তরঙ্গায়িত সমুদ্রবক্ষে কিংবা ভাতের হাঁড়ির ফেন উথলিয়া উঠিলে সামান্য-মাত্র তৈলপ্রদানে স্থির হইয়া পড়ে। তদ্রূপ লাঙ্গুলে তৈলপ্রদানে ক্রোধ ও অহঙ্কার শান্তভাব ধারণ করে। যদিও মানবসন্তানের বহির্লাঙ্গুল খসিয়া গিয়াছে, কিন্তু অন্তর্লাঙ্গুল সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নাই।

ইহা হইতে কোন্ বাক্য তৈলাক্ত, কোন্ কথা ঘৃতপূর্ণ, এবং কোন্ শব্দ মধুব্যঞ্জক, তাহা একটু চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সভ্যতার অনুরোধে, কিংবা স্বার্থের খাতিরে যত কথা অন্তর হইতে বাহিরে আইসে, তাহা তৈলাক্ত। "মহাশয়, আসুন! আমার পরম সৌভাগ্য!" "হুজুরের ন্যায় ন্যায়বান্ জগতে দুর্লভ!" "ইচ্ছা করিলে মারিতে পারেন, রাখিতে পারেন!" এ সব কথা টাট্‌কা কলুর ঘানি হইতে আসিয়া সর্ব্ব শরীর অভিষিক্ত করে।

"প্রিয়ে, তোমা বই আর জানি নে", "তোমায় দিব ভালবাসা", "তোর জন্যে ভেবে ভেবে বাঁচিনে", এ সব সম্পূর্ণ গব্যঘৃত-সুগন্ধ-যুক্ত। তবে কতকগুলি পুরাতন গং পুরাতন ঘৃতের ন্যায়, এবং নূতনগুলি সদ্য চন্দ্রকোণার মটকীর ন্যায়। এইরূপে সাহিত্য, কবিতা, বক্তৃতা প্রভৃতির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, ঘৃত, তৈল ও মধুর ভাগ সহজে বুঝা যায়। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা পূজা, পাঠ, ধ্যান ধারণায় কোন্‌টি কোন স্থলে ব্যবহার্য্য, তাহা ভাবিয়া দেখি না। যদি ঠাকুর বায়ুপ্রধান হন, তবেই তৈল সার্থক। যদি পিত্তপ্রধান হন, তবে ঘৃতের দরকার। এটা যে না জানে, তাহার গন্ধপুষ্প বৃথা।

এই সকল নিগূঢ় তত্ত্বের অনেকবার বিচার হইয়া গিয়া স্থির হইয়াছে যে, "বেগুন পোড়া", "আলুভাতে", "ঝিঙ্গে ভাজা" ও মৎস্যাদিতে তৈলই প্রশস্ত। তেলে ভাজা মিষ্টান্ন কিংবা "পোলাও" অতি জঘন্য।

মর্দ্দন ও লেপনোপযোগী তৈল তিন প্রকার;—সর্ষপ, তিল, এবং

পক্ষে। যাহাদিগের চুল কোঁকড়া, যাহারা পল্লীগ্রামবাসী, দাকাটা তামাকু সেবন করে, এবং দরিদ্রা, তাহারা অনেক সময়ে পিত্তনাশার্থ ঘৃতের অভাবে সর্ষপ তৈল ব্যবহার করে। ভদ্রলোকদিগের পক্ষে ইহা অনুমোদনীয় নহে। কিন্তু নাসিকা ও কর্ণগহ্বরে সর্ষপ ছাড়া অন্য উপায় নাই। তাহার কারণ,—

"গহন কানন কিংবা পর্ব্বতকন্দরে,
ভয়াল ভল্লুক সিংহ ব্যাঘ্র বাস করে।"

এরূপ স্থলে তীব্র তৈল ভিন্ন তাহাদিগকে দূর করিবার উপায় নাই। বক্রী স্থানে, মস্তকে তিল ও নারিকেলই উত্তম। তিলে চুল একটু শীঘ্র পাকে; কিন্তু নারিকেলে তত শীঘ্র পাকে না। যাহার স্কন্ধ প্রদেশে ভূতের উপদ্রব আছে, তাহার পক্ষে নারিকেল উপযোগী। পেত্নীর উপদ্রবে তিল ব্যবস্থা। এই কারণেই বোধ হয় স্ত্রীলোকের পক্ষে নারিকেল এবং পুরুষের পক্ষে তিলের ব্যবস্থা হইয়াছিল। উপদ্রব না থাকিলে উভয়ই সমান।

অন্যান্য স্থানে সর্ষপই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বক্ষে, পৃষ্ঠে, গলদেশে, পদতলে, ইহার মত আর কিছুই নাই। কি পরিতাপের বিষয় যে, অনেকে গাত্রে সুগন্ধি তৈলও ব্যবহার করিয়া থাকেন! ঈশ্বর যে মানবকে তৈল মাখিবার জন্যই লোম হইতে পরিত্রাণ দান করিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এমত অবস্থায় সর্ষপ ছাড়া অন্য কোনও তৈল মাখিলে লোম গজাইবার সম্ভাবনা।

গাত্রে তৈল না মাখিয়া সাবান মাখা বিদেশী প্রথা। অনেকে বলেন, তৈল দ্বারা রোমকূপে ময়লার সৃষ্টি হয়। অতএব সাবানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বায়ুপ্রশমনই তৈলের উদ্দেশ্য। সাবান মাখিলে বায়ুবৃদ্ধি হয়। অতএব শীতপ্রধান দেশের লোকে থাকে ভাল। বায়ুবৃদ্ধি হইলেই অহঙ্কার ও ক্রোধের প্রাবল্য হয়। এটা যদি মনে থাকে, তবে বোধ হয় তৈলের উপযোগিতা সম্বন্ধে অধিক আর বলিতে হইবে না।

সেবা ও বিরেচন।

রন্ধনাদিতে সর্ষপ তৈলই ব্যবহৃত হয়। কেবল ঘৃত খাইলে পিত্ত একবারে দমন হইয়া লোম উঠিতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বকালে লোমশ ঋষিগণ ঘৃত ভোজন করিয়া বহু উপকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদিগের তৈলেরও ব্যবস্থা চাহি। টাকপ্রধান লোকের পক্ষে কেবল ঘৃতই

ব্যবস্থা। অধিক ঘৃত ব্যবহার করিলে মস্তক ক্রমশঃ টাকময় ও চাকচিক্যশালী হইয়া সুপক্ক শ্রীফলের ন্যায় আকার ধারণ করে।

আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বিধবাদিগের টাক পড়ে না কেন? তাহার কারণ, তাঁহারা ঘৃতের সহিত আতপ তণ্ডুল খান, এবং মৎস্য খান না। বিপরীতগুণসম্পন্ন দুইটি পদার্থ, যেমন মৎস্য ও ঘৃত, উদরে প্রবেশ করিলে গোলযোগ বাধে, ফলে চুল উঠিয়া যায়। যদি পিত্তপ্রধান হন; তবে ঘৃত ব্যবহার করুন। বায়ুপ্রধান হইলে কদাচ করিবেন না।

উদরে বায়ু বদ্ধ হইলে ভ্যারণ্ডোর তৈলপ্রয়োগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত। বায়ু জীবগণের ন্যায় কথনও মুক্ত, কথনও বদ্ধ। বদ্ধবায়ু দক্ষিণ হইতে মুক্ত হইয়া উত্তরে আসিলে তাহাকে মলয় পবন কহে।

সিদ্ধান্ত।

যত দূর দেখা গেল, তাহা হইতে বোধ হয়, তৈল অতি পুরাতন, এবং আবশ্যক পদার্থ। সমুদ্রমন্থনে বোধ হয় ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ঠিক খবর পাওয়া যায় না। ত্রেতাযুগে বানরগণ খাদ্যাদির সহিত তৈল ব্যবহার করিত কি না, তাহা জানি না। কিন্তু বোধ হয়, শেষ যুগে তাহারা ঘৃতই ব্যবহার করিত, নচেৎ চুল উঠিয়া যাইবে কেন? এখন যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদিগের তৈল সর্ব্বতোভাবে ব্যবহার করা উচিত। জীবন একটা অগ্নিময় সামগ্রী। বায়ু প্রবল হইলে শীঘ্র পুড়িয়া শেষ হইয়া যায়। অতএব আয়ুর্ব্বেদ উপদেশ দিতেছেন যে, যথেষ্টপরিমাণে তৈল থাকিলে জ্বলন্ত শিখা স্থির হয়, মনোহর হয়, স্নেহময় হয়। তৈল না থাকিলে স্নেহ জ্বলিয়া যায়, জীবন মসৃণ ও মনোহর হয় না।

যদি তাহাই হয়, তবে তৈলের উৎপত্তি হৃদয় হইতে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তৈলই হৃষীকেশ। জ্বলন্ত ঈশ্বর ও স্নিগ্ধ ঈশ্বরের মধ্যে একটা সনাতন সখ্য আছে। শৈশব ও বার্দ্ধক্যের নাট্যশালা একটা তৈলাধারের মধ্যে। এক জন তৈল লইয়া আসে; অন্য জন ফেলিয়া যায়। রূক্ষ, শুষ্ক, জীবন, জ্ঞানময় হইলেও, অশান্তি-তরঙ্গাপ্লুত। একটু তৈল দাও। একটু সিঁথায় দাও; সুবর্ণ সিন্দূর ভালে দাও। লাঙ্গুলে দাও, জঠরে দাও, কানে, নাকে ও গোঁফে দাও।

কতিপয় প্রাচীন মূর্ত্তি।

সম্প্রতি বরেন্দ্রভূমিতে এক স্থানে ভূগর্ভে কতকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। স্থানীয় উকীল শ্রীযুত নীলমণি ঘটক মহাশয় এই মূর্ত্তিগুলি বিখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়কে প্রদান করেন। সেই মূর্ত্তিগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিবৃত করিতেছি।

(১) পাষাণময়ী চতুর্ভুজা মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি যে প্রস্তরফলকোপরি অবস্থিত, তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে নয় ও পাঁচ অঙ্গুলি। এই মূর্ত্তির দক্ষিণোর্দ্ধ করে অঙ্কুশ, দক্ষিণাধঃ করে বরমুদ্রা, বামোর্দ্ধ করে পদ্ম বা পুষ্পকোরক। বামাধঃ কর বামজানুতে বিন্যস্ত। পদদ্বয় যোগাসনে অবস্থিত। বামপাদোপরি দক্ষিণ পদ স্থাপিত। মূর্ত্তিখানি বস্ত্রালঙ্কার-মুকুট-শোভিত। ত্রিনেত্রা। কুম্ভীরোপরি আসনোপবিষ্টা। পাদপীঠে কিছু লিখিত নাই। বোধ হয় বারুণী মূর্ত্তি।

(২) পাষাণময়ী অষ্টভুজা রমণী মূর্ত্তি। প্রস্তরফলকের দৈর্ঘ্য পাঁচ অঙ্গুলি, বিস্তার তিন অঙ্গুলি। বিবিধায়ুধধারিণী। দক্ষিণ পদ সিংহোপরি স্থাপিত, বামপদ মহিষাসুরস্কন্ধে অবস্থিত। বাম হস্ত অসুর-মস্তকের কেশ ধরিয়া আছে। দক্ষিণ হস্ত দীর্ঘ শূলে অসুর-বক্ষঃ বিদ্ধ করিতেছে। বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিতা। মুখমণ্ডল অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে; কেবল আভাসমাত্র রহিয়াছে। মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। পাঠকগণ ধ্যানের সহিত মিলাইয়া দেখিবেন। তন্ত্রসারোক্ত ধ্যান,—

গারুড়োপলসন্নিভাং মণিময়-কুণ্ডল-মণ্ডিতাং।
নৌমি ভালবিলোচনাং মহিষোত্তমাঙ্গনিষেদুষীম্॥
শঙ্খ-চক্র-কৃপাণ-খেটক-বাণ-কার্ম্মুক-শূলকান্।
তর্জ্জনীমপি বিভ্রতীং নিজবাহুভিঃ শশিশেখরাম্॥

(৩) পিত্তলময়ী দ্বিভুজা রমণী মূর্ত্তি। ফলকের দৈর্ঘ্য পাঁচ হইতে ছয় অঙ্গুল, এবং বিস্তার দুই হইতে তিন অঙ্গুল পর্য্যন্ত। বহুকাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকায় নীলাভ কলঙ্কে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। মূর্ত্তি আসনোপবিষ্টা। দক্ষিণ পদ আসন-পাদপীঠ পর্য্যন্ত লম্বিত, বামপদ আসনোপরি বিন্যস্ত। দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ হাঁটুর উপর স্থাপিত। একটি শিশুমূর্ত্তি রমণীর বাম জানুর

উপর পদদ্বয় ও বাম হস্তে মস্তক রাখিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে বিন্যস্ত। রমণীর মস্তকোপরি সাতটি সর্প ফণা বিস্তার করিয়া আছে। মধ্যস্থলের সর্পের ফণা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। তাহা যেন উভয় মূর্ত্তিকে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। অনুমিত হয়, ইহা বুদ্ধের মাতৃস্বসা মহাপ্রজাবতীর মূর্ত্তি। ক্রোড়ে বুদ্ধদেব শয়ান। লুম্বিনী উদ্যানে মায়াদেবী শিশুকুমারকে প্রসব করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। বুদ্ধের মাতৃস্বসা ও বিমাতা শিশুকে পালন করেন। সর্পগণ ভবরোগবৈদ্য বুদ্ধ ও তাঁহার মাতৃস্বসাকে আতপতাপ হইতে রক্ষা করিতেছে। মূর্ত্তিগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিস্কৃত না হইলে এখন কিছু বেশী বলা চলে না।

(৪) পিত্তল মূর্ত্তি। তিন নম্বরের মূর্ত্তির অনুরূপ, কিন্তু আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। তিন নম্বরের মূর্ত্তির সহিত পার্থক্য এই যে, নাগফণার পরিবর্ত্তে একটি ছত্র আতপ নিবারণ করিতেছে। সম্ভবতঃ, মহা প্রজাবতী শিশু বুদ্ধকে ক্রোড়ে করিয়া কপিলাবস্তুতে আগমন করিতেছেন।

(৫) ধাতুময়ী দ্বিভুজা নারী মূর্ত্তি। বস্ত্রালঙ্কার-ভূষিতা। দক্ষিণ পদ পাদপীঠ পর্য্যন্ত লম্বিত। বাম পদ আসনোপরি বিন্যস্ত। বামহস্ত বাম জানুর উপর স্থাপিত। দক্ষিণ হস্ত বরমুদ্রায় চিহ্নিতের ন্যায় প্রসারিত। মূর্ত্তির পশ্চাদ্‌ভাগে ছটা।

(৬) দ্বিভুজা নারী মূর্ত্তি। পাঁচ নম্বর মূর্ত্তির অনুরূপ, কিন্তু আয়তনে পার্থক্য আছে।

(৭) পিত্তলময়ী নারী মূর্ত্তি। ৫ম ও ৬ষ্ঠ মূর্ত্তির সহিত আকারে মিল আছে, কিন্তু আয়তনে ক্ষুদ্র।

(৮) পিত্তলময়ী যুগল স্ত্রীমূর্ত্তি। একটি দ্বিভুজা, একটি চতুর্ভুজা। উভয় মূর্ত্তিই যোগাসনস্থ। উভয় মূর্ত্তির মস্তকে কিরীট ও তাহাকে আবেষ্টন করিয়া ছটা। দ্বিভুজা মূর্ত্তি ধ্যানস্থা। তাঁহার বাম হস্তের পাণিপদ্মের উপর দক্ষিণ হস্তের পাণিপদ্ম বিন্যস্ত। চতুর্ভুজা মূর্ত্তির নীচের বাম হস্ত বামজানুবিন্যস্ত; নীচের দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণজানুবিন্যস্ত। উপরের দক্ষিণ হস্তে গদা ও উপরের বাম হস্ত ভগ্ন। উভয় মূর্ত্তির মধ্যস্থল দিয়া পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে একটি বৃক্ষ-কাণ্ডবৎ ধাতুখণ্ড কিয়দ্দূর ঊর্দ্ধে উঠিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আসনের নীচে চারি দিকে চারিটি খুরা আছে। সম্মুখের বাম দিকে একটি খুরার উপর একটি

(৯) পিত্তলময়ী পুরুষমূর্ত্তি। আসনোপরি তির্য্যগ্‌ভাবে উপবিষ্ট। বাম পদ যোগাসনবিন্যস্ত। দক্ষিণ পদ উন্নত; তদুপরি দক্ষিণ হস্ত বিন্যস্ত। বাম হস্ত বাম জানুর পশ্চাদ্‌ভাগে আসনোপরি স্থাপিত,—যেন তাহারই উপর সমস্ত দেহভার বিন্যস্ত রহিয়াছে। গলায় যজ্ঞোপবীত, মস্তকে কিরীট, উভয় পার্শ্বে ছটার কিয়দংশ। দেখিলে বোধ হয়, যোগী পুরুষের এইমাত্র ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে, এখনও নয়নদ্বয় ঈষৎ নিমীলিত আছে।

(১০) ধাতুমূর্ত্তির ভগ্নাবশেষ। চারিটি খুরার উপর একখানি আসন। আসনের উভয় পার্শ্বে তিনটি করিয়া অগ্র-পশ্চাৎদণ্ডায়মান পশুমূর্ত্তি। সম্মুখেও ঐরূপ দণ্ডায়মান একটি পশুমূর্ত্তি। তাহার পশ্চাদ্‌ভাগে আসনপীঠের উপর মটর-পরিমাণ একটি ছিদ্র; দেখিলে বোধ হয়, ঐ স্থানে কীলকসংযোগে যে মূর্ত্তি আবদ্ধ ছিল, ইহা তাহার আসন বা পাদপীঠ। পরিস্কৃত না হইলে পশুমূর্ত্তিগুলি চিনিতে পারা যাইতেছে না।

মূর্ত্তিগুলি সযত্নে উপযুক্ত রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিস্কৃত করিয়া ছবি তুলিবার ভার শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ধাতুমূর্ত্তিগুলি ঢালাই করা। সুতরাং এরূপ মূর্ত্তি যে বহুসংখ্যক প্রস্তুত হইত, ইহা অনুমিত হইতেছে।

এখন কথা হইতেছে, এক স্থানে এরূপ হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্ত্তি কিরূপে আসিল? ইহার কোনও সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে পারা গেল না।

কোনও সময়ে বরেন্দ্রভূমিতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিলক্ষণ লব্ধপ্রসর হইয়াছিল। তৎকালে বৌদ্ধ যোগী ও বৌদ্ধ যোগিনীদিগের পূজা হইত। তাঁহাদের বিস্তর মন্দির ছিল। বুদ্ধদেব, আনন্দ, রাহুল ও যশোধরার মূর্ত্তি বরেন্দ্রভূমির অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। নবম-সংখ্যক মূর্ত্তি আনন্দ বা রাহুলের হওয়া অসম্ভব নয়। বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমাবনতি হইতে থাকিলে, লোকে আনন্দ, রাহুল, বা যশোধরার নাম ভুলিয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ পুরুষমূর্ত্তিগুলিকে কোনও হিন্দু যোগীর ও বৌদ্ধযোগিনীমূর্ত্তিগুলিকে ভগবতীর কোনও আবির্ভাব-মূর্ত্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিল। মঞ্জুঘোষ এক জন বৌদ্ধ যোগী ছিলেন, ইহা অনেকেই জানেন। আগমবাগীশের তন্ত্রসারে তাঁহার ধ্যান-কবচাদি আছে। ভগবতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"মঞ্জুঘোষ কে?" মহাদেব বলিতেছেন,—"আমিই মঞ্জুঘোষ"। কত স্থানের কত বৌদ্ধ যোগী যে ভৈরব হইয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। এই জন্য একই মন্দিরে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজিত হইত।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

সপ্তপদী।

১

সপ্তমবর্ষীয়া বালিকা বনে খেলিতে খেলিতে পথহারা হইয়াছিল।

প্রায় সন্ধ্যা। সূর্য্য যমুনার নীলজলের উপর মুক্তা প্রবাল ছড়াইয়া পাটে বসিতেছিলেন। রাখাল বালকগণ ঘন্টাধ্বনির সহিত শেষ গাভীশ্রেণী লইয়া গ্রামে চলিয়া গিয়াছিল। শিখিনী ডালে উড়িয়া গিয়াছিল।

গ্রাম হইতে ধূম্ররেখা বনস্থলী ভেদ করিয়া যমুনার তট ছাইয়া ফেলিল। তটনিম্নে কৃষ্ণরেখার মধ্যে ক্ষুদ্র জলপক্ষী নীড়ের সন্ধান করিতেছিল।

বালিকা বৃন্দাবনের রাধা।

রাধিকার সখী ললিতা বড় চতুরা। খেলিতে খেলিতে সে বর সাজিয়াছিল। বিশাখা 'কনে' সাজিয়াছিল। বিশাখা ললিতার চারি দিক বেড়িয়া সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। রাধিকা বালিকা-বয়সেই স্বপ্নময়ী। সে জিজ্ঞাসা করিল, "সই, বিয়ে করতে গেলে সাত পাক কেন দিতে হয়?"

সকলে হাসিল, টিটকারী দিল। কি বোকা মেয়ে!

বালিকা লজ্জিতা হইয়া দূরে গেল। কিন্তু "সপ্তপদী"র সমস্যা দূর হইল না। সে চিন্তা করিল, চিন্তা স্বপ্ন হইল, স্বপ্ন তাহাকে পথ দেখাইয়া বনের মাঝে লইয়া গেল।

বহুদূরব্যাপ্ত শ্যামল ক্ষেত্রের শেষ সীমা আকাশের সহিত মিশিয়া গেল। গগন অন্ধকার হইয়া আসিল।

বালিকার ভয় হইল। নির্জ্জন যমুনাতটে রাধিকা সঙ্গিহীনা।

কে আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "তুমি পথ ভুলে গেছ, চল, সঙ্গে লইয়া যাই।" রাধা চাহিয়া দেখিল, একটি রাখাল-বালক। হাতে বাঁশী, মাথায় ময়ূরপুচ্ছের চূড়া, গলায় সাত-নর বনমালা।

"তোমার ভয় নাই। আমার নাম শ্যাম, আমি যমুনার ও পারে থাকি। পথ ভুলে গেলে পথভ্রান্তকে সঙ্গে লইয়া যাই।"

বালিকা লজ্জিতা হইয়া বলিল, "আমি পথ ভুলি নাই, কিন্তু একলা বনের মাঝে যেতে ভয় ক'চ্ছে।"

বালক বলিল, "তোমায় বনের মধ্যে যেতে হবে না। যমুনার ধার দিয়ে নিয়ে যাব। তুমি হাঁটতে পারবে ত?"

২

খানিক দূর হাঁটিয়া বালিকা বলিল, "তুমি জান, বিয়ে হ'লে সাত পাক কেন হয়? ললিতা, বিশাখা, সকলেই জানে, কিন্তু আমি জানি না।" রাখাল-বালক বলিল, "আমি জানি, কিন্তু বল্‌তে নেই।"

বালিকা। বল না, ওরা কেউ বলিতে চাহে না।

রাখাল। কি দেবে?

বালিকা। আমার কিছুই নাই। কেবল গলায় সোনার মালা আছে। তুমি কি গরীব?

রাখাল। আমি তোমার ভালবাসা চাই।

বালিকা। আমি সকলকে ভালবাসি।

রাখাল। তুমি বোধ হয় আঁধারে দেখ নাই, আমার গায়ে কুষ্ঠ আছে। আমি অনাথ। আমাকে কেউ ভালবাসে না। তাই আমি বনে লুকাইয়া থাকি।

বালিকার হৃদয় গলিয়া গেল। "আমাদের পাড়ায় সুদামের কুষ্ঠ হয়েছিল, তার মা তাকে কোলে নিয়ে থাক্‌ত। তাতেই কুষ্ঠ সেরে গেল। তুমি মস্ত বড়, তোমাকে কোলে নিতে পারব না—দেখি!"

কই রাখাল-বালক ত কোলে আসিল না! সে কোথায় গেল!

বালিকা ফিরিয়া দেখিল, রাখাল অনেক দূরে গিয়া বাঁশী বাজাইতেছে!

বালিকা রাগ করিল। "ছি! আমার সঙ্গে ছলনা?"

রাখাল ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল।

"তোমার কথায় আমার কুষ্ঠ সারিয়া গিয়াছে।"

রাধিকা। না, তোমার চাতুরী।

শ্যাম। সত্য, সত্য, চাতুরী নয়। সংসারের ব্যাধি ও তাপে যে সেবা করে, সে মাতা। উহাই এক পাক। তুমি রাগিও না।

রাধিকা। আমি রাগি নাই। কিন্তু তোমার কখনও কুষ্ঠ ছিল না।

শ্যাম। তুমি একবার যমুনার জলে চেয়ে দেখ।

বালিকা চাহিয়া দেখিল। তাপদগ্ধ, রুগ্ন, কদাকার, কুষ্ঠাক্রান্ত রাখাল-বালকের তীব্র আর্ত্তনাদ শুনিল। পিতৃহীন, মাতৃহীন, অনাথ ও আতুর!

বালিকা কাঁদিতে লাগিল।

"তুমি জল হইতে এস, আমি দেখব।"

৩

রাখাল-বালক আবার বাঁশী হাতে করিয়া হাসিতে হাসিতে আসিল। "দেখ রাই, একটা কাল মেঘ উঠেছে। তোমার হৃদয়ে যে ঝড় উঠেছিল, তাহার প্রতিচ্ছবি ঐ।"

ক্রমে মেঘ ভীষণ হইয়া উঠিল। সঘনে আকাশ হইতে বারিধারা বর্ষিতে লাগিল।

বালিকা চাহিয়া দেখিল, নিকটে রাখাল নাই।

কি নিষ্ঠুর, কি প্রতারক! রাধিকা দেখিল, বনস্থলী শূন্য! যমুনা উন্মাদিনীর ন্যায় তরঙ্গ তুলিয়া অট্টহাসি হাসিতেছে। কূলে নিবিড় অন্ধকার!

"শ্যাম! শ্যাম! কোথায় গেলে?"

আবার পশ্চাৎ হইতে বংশীধ্বনি। আবার বালিকা চাহিয়া দেখিল।

"শ্যাম, আমাকে ছেড়ে যেও না!"

শ্যাম। তবে আমার দিকে এস।

অধীরা বালিকা দৌড়িয়া গেল। এবার শ্যামের হাত ধরিল। ভয় দূরে গেল।

রাখাল বলিল, "তোমার এত ভয় কেন?"

রাধিকা। তুমি ছাড়িয়া গিয়াছিলে কেন?

রাখাল। আমি ত সঙ্গে সঙ্গে থাকি, কিন্তু তুমি দেখিতে পাও না। সংসারের ত্রাস আর এক পাক। তুমি বিচ্ছেদ কাহাকে বলে, জান?

রাধিকা। না।

রাখাল। বিচ্ছেদ হইলেই চোখে জল আসে। ঐ দেখ, অনেক বর্ষিয়া আবার শরতের রৌদ্র আসিয়াছে।

রাধিকা। আমরা ত সন্ধ্যাবেলা এক সঙ্গে যাচ্ছিলাম। ভোর কখন হ'ল? এ যে দুপুর!

রাখাল। তোমার যাতনা ও ক্রন্দনে সময় কাটিয়া গিয়াছে। যারা বিয়ে করে, তাদের অনেক সময় মায়াভ্রমে রাত্রির অবসান হয়। তারা কাঁদে, অভিমান করে। পুত্রশোকে হাহাকার করে। স্বামিবিয়োগে অধীরা হয়, এবং আবার কাঁদে।

রাধিকা। তবে আমি কখনও বিয়ে করব না।

রাখাল। তাতেও নিস্তার নাই। গ্রীষ্ম ও বর্ষার পাক্ গেলে আবার শরতের পাক্ আসে।

রাধিকা। তবুও বেঁচে থাকে ?

রাখাল। এবং হাসে। তুমি যে এত ভয় পেয়েছিলে; আবার এখনই হাস্‌বে।

রাধিকা। না, কখনই হাসবো না।

রাখাল-বালক মধুর হাসি হাসিল। রাই তাহা দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

৪

বালিকা বলিল, "তুমি কি সুন্দর!"

শ্যাম। তুমি হাসিলে কেন ?

রাধিকা। তুমি হাসিয়াছিলে বলিয়া।

শ্যাম। যদি আমি কাঁদিতাম ?

রাধিকা। তবে আমিও কাঁদিতাম।

শ্যাম। আমি ইচ্ছা করিলে আরও হাসাইতে পারি।

রাধিকা। কখনও না।

তখন রাখাল-বালক ত্রিভঙ্গ হইল, এবং হেলিয়া দুলিয়া বাঁশী বাজাইতে লাগিল। রাই তাহা দেখিয়া বড় হাসিল। হাসিতে হাসিতে অধীর হইয়া পড়িল।

শ্যাম। দেখ্‌লে ত ?

রাধিকা। তোমার বাঁশীর মধ্যে কিছু আছে।

শ্যাম। বেশী কিছু না, কেবল একটা মহাশূন্য। যেমন জগতের মায়া মমতা। একটু মেহনৎ করিলেই তার মধ্যে হাসি, কান্না, মান, অভিমান, শোক, দুঃখ,—নানা প্রকার সুর বাজে।

রাধিকা। আমি বাজাব!

শ্যাম। বাঁশী বাজালে বিয়ে হয় না। ঐ যে দেখ্‌ছ—যমুনার ও পারে সকলে ধান্ কাটতে আস্‌ছে, ওরা বাঁশীর তৃতীয় সুর ও সাত পাকের তৃতীয় পাক। অনেক যত্ন ক'রে ধান কেটে ওরা ঘরে নিয়ে যাবে। খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হবে। ছেলে পুলে হবে, গরুর বাছুর হবে। সেই দুগ্ধ ছেলেতে বাছুরে খাবে। কেমন সদ্ভাব, কেমন সুন্দর দৃশ্য। আর তোমার যদি একটা ছেলে হয় ?

রাধিকা। তাকে নিয়ে খেলা কর্‌ব, বাছুর চরাতে দেব।

শ্যাম। এই না বলছিলে—তুমি বিয়ে কর্‌বে না?

রাধিকা। (সলজ্জে) তুমি তখন ভয় দেখাচ্ছিলে।

শ্যাম। এখনও ত ভরসা দিই নাই।

রাধিকা। কেন?

৫

শ্যাম বলিল, "রাই! এই সংসারের চতুর্থ পাকে লোক হিম্ শিম্ খেয়ে যায়, সেটা হেমন্ত ঋতুতে। এবং বুড়ো হয়ে গেলে সেটা শীত ঋতুতে দাঁড়ায়। তাহা পঞ্চম পাক। পাঁচ পাকে মরিয়া যায়।

বালিকা চিন্তা করিতে লাগিল।

"বোধ হয় আমার শীত ক'চ্ছে।"

শ্যাম। তুমি আমার কোলে এস।

রাখাল-বালক সযত্নে বালিকাকে কোলে লইল। দেখিতে দেখিতে রাখাল বৃদ্ধ হইয়া গেল। চূড়া খসিয়া পড়িল। বাঁশী পড়িয়া গেল। চর্ম্ম লোল হইল, কেশ ধূসর হইল। বর্ণ মলিন ও হরিদ্রাভ হইয়া গেল। চক্ষু নিমীলিত হইল।

বালিকার চিন্তা ক্রমে গাঢ়তর হইয়া পড়িল। সুন্দর কপোলে ঘর্ম্মরেখা দেখা দিল। কোল হইতে নামিয়া দেখিল, বৃদ্ধের জীবনের অবসান হইয়াছে।

বালিকা বৃদ্ধকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার মস্তক কোলে তুলিয়া লইল।

আবার যেন সন্ধ্যা আসিল। আবার যেন সেই বনপথ দেখা দিল। নেপথ্যে ললিতা ডাকিল, "রাই, রাই, তুই কোথায়? আমরা যে তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

৬

বালিকা গম্ভীরভাবে বলিল, "আমি যাব না, তোরা চলিয়া যা।"

বালিকা বৃদ্ধের কপোল চুম্বন করিল। কোথা হইতে মুখে কথা আসিল। "তুমি বাঁচো, আমার প্রাণের সাধ, তোমাকে আর একবার দেখি। বৃদ্ধ হও, পঙ্গু হও, কুষ্ঠগ্রস্ত হও, বালক হও, তুমিই আমার স্বামী, তুমিই আমার ঈশ্বর।"

"ওলো, বিশাখা, চিত্রা, তোরা এ দিকে আয়, আমাদের রাই একটা মড়া নিয়ে ব'সে আছে। কি ভয়ানক!"

রাধিকা। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে।

ললিতা। ওলো, তোরা এ দিকে আয় না! এ কি ব্যাপার! রাই পাগল হ'ল নাকি?"

সকলে দৌড়িয়া আসিল। কিন্তু সে সব কোথায়? আবার সেই ভুবন-মোহন কুমার ভুবনমোহিনী কুমারীকে বেষ্টন করিয়া,—বংশী অধরে! সকলে বলিল, "ছি! ছি! শ্যামের একটু লজ্জা নাই। যমুনার এ পারে এসেও দৌরাত্ম্য। চল আমরা যাই।"

বালিকা চাহিয়া দেখিল, সকলে চলিয়া গিয়াছে। বসন্তসৌরভে বন পরিপূর্ণ হইয়াছে। ষট্‌পদ ভ্রমরা গুন্ গুন্ করিতেছে।

৭

রাখাল-বালক বলিল, "রাই, তোমার জ্ঞান হইয়াছে, আমি এখন যাই।"

বালিকা চুপ করিয়া রহিল।

রাখাল। রাই! তুমি চিরবসন্তময়ী। আমি সন্ন্যাসী ছিলাম। একাকী বনে বেড়াইতাম। তুমি আমাকে ভুলাইয়াছ। আমি সন্ন্যাস ছাড়িয়া নূতন ধর্ম্মে ব্রতী হইয়াছি।

বালিকা। আমাকে সব কথা ত এখনও বল নাই। শেষ কথা লুকাইয়া রাখিলে কেন?

রাখাল। শেষ কথা শুনিতে নাই। সপ্তপদে তুমি তোমাকেই দেখিতে পাইবে। তুমি আমার হৃদয়ে, রক্তে, প্রত্যেক কণায়, প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসে। বৃন্দাবনে বসন্ত আসিয়াছে। জগৎ তোমার প্রেম লাভ করিবে। আমি জগতের দুঃখ-শোণিত লইয়া, তাহাদিগের হৃদয়ে সুখ-শোণিত সঞ্চারিত করিব। আমার রক্তে যদি সংসারের শান্তি হয়, ধর্ম্ম থাকে, তবে তাহার মূলে তুমিই প্রেমময়ী!

আর একবার চাও। তোমার অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত কর। সপ্তপদীর ইহাই শেষ। রাখালগণকে ডাকিয়া আন, সাততালে তাহারা নৃত্য করুক, আমি সপ্তস্বরে তাহাদিগকে ডাকি। আমি ত চিরকালই ডাকিতেছি, কিন্তু তোমার সহিত মিলনের পূর্ব্বে তাহারা শুনিতে পায় নাই।

রাখাল-বালক চলিয়া গেল। সেই সন্ধ্যা মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বপ্নের সহিত মিশিয়া গেল। বালিকা সব কথা ভুলিয়া গিয়াছে।

ললিতা আবার ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "রাই, শ্যাম তোকে কি বল্‌ছিল?"

রাধিকা। শ্যাম কে?

ললিতা। সেই যে, যার হাতে বাঁশী ছিল।

রাই। আমার ত সব মনে নাই, তবে সাত পাক বুঝেছি।

ললিতা। হাতে হাতে নাকি?

রাই। তোরা কেউ বল্লিনে, সে ব'লে গেল। কিন্তু কি বলিয়াছিল, মনে নাই। সে আবার আসবে। বোধ হয়, আবার বল্‌বে। এ কথা কাকেও বলিস্‌নে।

সহযোগী সাহিত্য।

ইংরাজী উপন্যাসে বিদেশী চরিত্র।

আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে বহু বিখ্যাত ও অখ্যাত লেখকের রচিত এত অধিকসংখ্যক উপন্যাস প্রতিমাসে প্রকাশিত হইতেছে যে, তাহার ঠিক তালিকা সংগ্রহ করা দুরূহ ব্যাপার। বর্ত্তমান ইংরাজ উপন্যাস-লেখকেরা যে সকল বিষয়ে উপন্যাস রচনা করেন, তন্মধ্যে ইংরাজের সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের চিত্রই অধিক। হল্ কেন, মেরি করেলী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ইংরাজ ঔপন্যাসিকেরা রাজনীতিক ও ধর্ম্মনীতিক উপন্যাসের রচনা করিয়া যথেষ্ট জনাদর লাভ করিয়াছেন। ইংরাজীতে 'রিয়ালিষ্টিক' ও 'আইডিয়ালিষ্টিক' অর্থাৎ বাস্তব-ঘটনা-মূলক ও আদর্শ-মূলক উপন্যাসের সংখ্যা নিতান্ত পরিমিত নহে। ইংরাজী সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর উপন্যাসের আজ কাল বড় আদর। এই সকল উপন্যাস উক্ত উভয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নহে; এই সকল উপন্যাসে উপন্যাসের নায়ক নায়িকাকে আরব্যোপন্যাসের একাধিক-সহস্র-রজনীর গল্পের ন্যায় নানা বিদেশের বহুবিধ বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়া আখ্যান-ভাগের উপসংহারের অভিমুখে লইয়া যাওয়া হয়; সেই সকল কাহিনী উজ্জ্বল কল্পনালোকে আলোকিত, অতিরঞ্জনের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় অত্যন্ত রঙ্গিন, গল্পের স্রোতের ভিতর দিয়া পাঠককে রুদ্ধনিশ্বাসে ভাসিয়া যাইতে হয়। এই শ্রেণীর উপন্যাস অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক; শেষ না করিয়া পুস্তক বন্ধ করিতে প্রবৃত্তি হয় না; কিন্তু উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিশ্লেষণ করিলে তাহাতে মনুষ্যের প্রকৃতি-গত কোনও সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় না; যে সত্যের উপর সাহিত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত, সেই সরল ও সুমহান সত্যের সহিত এই সকল উপন্যাসের কোনও সম্বন্ধ নাই; এগুলি বিলাতী

এই শ্রেণীর উপন্যাসের লেখকেরা তাঁহাদের রচিত উপন্যাসের কার্য্যক্ষেত্রকে স্বদেশের সীমায় রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না; তাঁহাদের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাগণ চীন হইতে পেরু পর্য্যন্ত ভূমণ্ডলের সর্ব্ব স্থানেই নানা বাধা বিঘ্নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে বিভিন্ন দেশের নরনারীগণের সংস্রবে আসিতে হয়। আমরা বহু ইংরাজী উপন্যাস পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, ইংরাজ ঔপন্যাসিকেরা যেখানেই ভিন্নদেশীয় নর-নারীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেইখানেই তাঁহারা শিব গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া ফেলিয়াছেন; ভিন্ন-দেশীয় চরিত্র-চিত্রে তাঁহারা যে অনুদারতার পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহাদের জাতীয় দম্ভই পরিস্ফুট হয়। তাঁহাদের উপন্যাসে স্বদেশীয় চরিত্রগুলি শৌর্য্য, বীর্য্য ও মনুষ্যত্বের আধারস্বরূপ; কিন্তু তাহার পার্শ্বেই বিদেশীয় চরিত্রগুলি পশুর অধমরূপে চিত্রিত। স্বদেশের বাহিরে ইংরাজ মানুষকে মানুষ জ্ঞান করেন না। তাঁহাদের উপন্যাসেও এই ভাবটি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত। উপন্যাসের সজাতীয় নায়ক-নায়িকাগণকে দেবদুর্ল্লভ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাদের বিদেশীয় পার্শ্বচরগণকে কূপমণ্ডুকের সহিত উপমিত করিলে আত্মগরিমা চরিতার্থ হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহাতে বিশ্বজনীন মানব-প্রকৃতির ও সাহিত্য-গত সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়।

গাই বুথবীর উপন্যাস।

ইংরাজী ভাষায় উপন্যাস রচনা করিয়া যে সকল আধুনিক ইংরাজ লেখক লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন, যে সকল ঔপন্যাসিকের নাম আজ কাল ইংলণ্ড, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারত, এই সকল দেশের লঘুসাহিত্যানুরাগী উপন্যাসপ্রিয় পাঠকপাঠিকাগণের মুখে নিরন্তর উচ্চারিত হইতেছে, তাঁহাদিগের মধ্যে গাই বুথবীর নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। অল্প দিন পূর্ব্বে মিঃ বুথবীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি লেখনীকে বিরাম দেন নাই। মিঃ বুথবী ধনাঢ্যের সন্তান ছিলেন না, কিন্তু কয়েকখানিমাত্র উপন্যাস রচনা করিয়া কুবেরের সম্পদ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এক একখানি উপন্যাস দেশ বিদেশে লক্ষ লক্ষ খণ্ড বিক্রীত হইয়াছে। এই সকল উপন্যাসে মিঃ বুথবি স্বদেশীয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু বিভিন্ন-দেশবাসীর চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অনেক স্থলেই তিনি বিদেশীয় চিত্র গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে লাঞ্ছিত করিয়াছেন।

'মাই ইণ্ডিয়ান কুইন।'

মিঃ বুথবির দুই তিনখানি উপন্যাসে আমাদের স্বদেশীয় নর-নারীর চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত দেখা যায়। এই সকল পুস্তকের মধ্যে 'মাই ইণ্ডিয়ান কুইন' নামক উপন্যাসখানির প্রসঙ্গ আমরা দুই একটি কথার আলোচনা করিব।

মিঃ বুথবীর এই উপন্যাসের নায়কগণের কার্য্যক্ষেত্র ভারতবর্ষ। ইংরাজ পাঠকপাঠিকাগণ উপন্যাসে নানা দিগ্দেশের কথা পাঠ করিতে ভালবাসেন; বিশেষতঃ ভারতবর্ষ—যে ভারতবর্ষে ইংরাজের সৌভাগ্য-রবি সর্ব্বপ্রথম সুপ্রকাশিত হইয়াছিল, যে ভারতবর্ষের ধনে ও ধান্যে

বিমণ্ডিতা, যে ভারতে প্রবেশ করিয়া পিতৃ-মাতৃ-পরিত্যক্ত, আত্মজীবনের প্রতি মমতাহীন কেরাণী ক্লাইব 'রাজা সহ রাজ্য সিংহাসন' বিক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ওয়ারেণ হেষ্টিংস যে ভারতে মাসিক ছয় টাকা বেতনের 'রাইটারী' চাকরী লইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন, যে ভারতের ঐশ্বর্য্যের কথা ইংলণ্ডের অমর কবি মিল্টন তাঁহার অবিনশ্বর কাব্যে বিঘোষিত করিয়াছেন—সেই ভারতবর্ষের কথা ইংরাজ পাঠক-মণ্ডলীর চিত্তবিনোদন করিবে, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। হয় ত এই সকল কথা মনে করিয়াই মিঃ বুথবী তাঁহার প্রণীত 'মাই ইণ্ডিয়ান কুইন' নামক উপন্যাসের কার্য্যক্ষেত্র ভারতের বীরধাত্রী রণ-দামামা-মুখরিত রাজস্থানে উন্মুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে রাজপুতের যে চরিত্র-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আদর্শ 'ফটো' বলিয়া রাজপুতবালার যে চিত্র তাঁহার ভক্ত পাঠকপাঠিকাগণের মানসনেত্রের সম্মুখে প্রসারিত করিয়াছেন, তাহা, চিত্রকর সিংহ হইলে তাহার প্রতিযোগীর অবস্থা চিত্রে যেরূপ দেখায়, সেইরূপ হইয়াছে। আমরা নিম্নে এই উপন্যাসের গল্পাংশ বিবৃত করিলাম।

আখ্যায়িকার সার-সংগ্রহ।

এই উপন্যাসের নায়ক এক জন ইংরাজ যুবক। তাঁহার নাম সার চার্লস্ ভেরিওার। তিনি সার রবার্ট ওয়ালপোলের আমলের লোক। তখন ভারতে ইংরাজ বণিকমাত্র; পলাশীর যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তুলাদণ্ড হাতে লইয়াই ইংরাজ তখন রাজদণ্ডধারণের জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন। সেই আমলের সার চার্লস্ ভেরিওার—নামসর্ব্বস্ব 'নাইট' ছিলেন; তাঁহার গৃহাভ্যন্তরে 'ছুঁচোর কীর্ত্তন' চলিলেও বাহিরে 'কোঁচার পত্তনের' অভাব ছিল না; ঘরে এক পয়সা সম্বল না থাকিলেও তিনি যে সকল মজলিসে যোগদান করিতেন, সে সকল মজলিসে স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বর, লর্ড চেষ্টারফিল্ড, সার রবার্ট ওয়ালপোল, অলিং ব্রোক প্রভৃতি মহারথিগণের সমাগম হইত; সুতরাং সার চার্লস্ ভেরিওার লেডি সিসিলি হেল্ ডারষ্টন্ নাম্নী পরমরূপলাবণ্যবতী ইংরাজ যক্ষ-দুহিতার প্রেম-সরোবরে ভাসমান হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কথা আর কি আছে?

লেডী সিসিলির পিতা আর্ল ডারলফিল্ড বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেও, দুর্ভাগ্যক্রমে ঋণ-সমুদ্রে আকণ্ঠ নিমগ্ন; সেই সমুদ্রে পড়িয়া তিনি হাবুডুবু খাইতেছিলেন, এমন সময় হ্যালিডে নামক একটি হঠাৎ-নবাব আসিয়া তাঁহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিল; প্রত্যুপকার-স্বরূপ আর্ল বাহাদুর তাঁহার কন্যা সার চার্লসের প্রণয়িণী সিসিলি সুন্দরীকে তাহার হস্তে সমর্পণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। সিসিলি সার চার্লস্‌কে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত, সিসিলি ভিন্ন সার চার্লসের হৃদয়েও অন্যের স্থান ছিল না। সিসিলি-রত্ন-লাভের জন্য সার চার্লস্ উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। সিসিলি পিতার অনভিপ্রায়ে তাঁহাকে গোপনে বিবাহ করিতে বা কুলত্যাগ করিয়া তাঁহার সহিত বিদেশে পলায়ন করিতে সম্মত হইল না। সিসিলি ভিন্ন তাঁহার জীবনে সুখ নাই বুঝিয়া তিনি আর্ল বাহাদুরের গৃহে তাঁহার কন্যার পাণি-প্রার্থনায় গমন করিলেন, কিন্তু আর্লের নিকট অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিলেন। সেখানে হেলিডে

চার্লস হেলিডের মুখে এক গ্লাস মদ্য নিক্ষেপ করিয়া ও বাতগ্রস্ত বৃদ্ধ আর্লকে স্তম্ভিত করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর একদিন দেনার দায়ে সার চার্লসকে জেল খাটিতে হইল; জেলে এক জন আইরিষ কাপ্তেনের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হয়। এই কাপ্তেনের নাম কাপ্তেন ও'রুরকি; ইনি এক জন যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ভারত-ফেরত কাপ্তেন। ভারতে কিছু কাল মজা লুটিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। এবং হাতে যাহা কিছু ছিল, তাহা উড়াইয়া দেনার দায়ে শ্রীঘরে গিয়াছিলেন।

কাপ্তেন ও'রুরকি শারীরিক বলে গুণ্ডোর দ্বিতীয় সংস্করণ। দেহটিও অত্যন্ত বিশাল; দেওয়ানী জেলে সার চার্লসের সহিত তাঁহার 'দোস্তি' হইলে, তিনি সার চার্লসের অনুগ্রহেই কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন। সার চার্লসের এক জন আত্মীয় হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সার চার্লসের অধিকার জন্মে; সেই সম্পত্তি-বিক্রয়লব্ধ অর্থে দুই বন্ধুতে মুক্তিলাভ করিয়া 'প্রাইড্ অফ্ লণ্ডন' নামক জাহাজে ভারতযাত্রা করিলেন।

ভারতে আসিয়া কাপ্তেন ও সার চার্লস কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কাপ্তেন সার চার্লসকে আশা দিয়াছিলেন, একবার ভারতে উপস্থিত হইতে পারিলে তাঁহারা নবাব বাদশা মারিয়া এক একটি রাজ্যের রাজা হইয়া বসিবেন। কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া তাঁহারা অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে একটি সুযোগও ঘটিল। এই ঘটনার কিছু দিন পূর্ব্বে যহলমীর (যশল্মীর কি ?) রাজ্যের রাজা বিজয়সিংহ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার ভ্রাতা প্রতাপ সিংহ সেই রাজ্যের সিংহাসন অধিকার করেন; কিন্তু বিজয় সিংহের সাত বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র ছিল; সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিবার জন্য নূতন রাজা প্রতাপ সিংহ পাছে এই শিশুর প্রাণসংহারের চেষ্টা করেন, এই ভয়ে, বিজয় সিংহের পক্ষীয় লোকেরা বালকটিকে গোপনে রাজধানী হইতে স্থানান্তরিত করে। প্রতাপ সিংহ আট বৎসর পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে সিংহাসন ভোগ করেন; এই আট বৎসর কাল তিনি প্রজাবর্গকে জ্বালাতন করিয়া মারিয়াছিলেন। গ্রন্থকার রাজা প্রতাপ সিংহের চরিত্রটি যে ভাবে আঁকিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মনে হয়, রাজা প্রতাপ সিংহ অরণ্যচর হিংস্র জন্তু ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাঁহার রাজ্যের প্রজারা লুণ্ঠিত ও মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইবার জন্যই যেন বাঁচিয়া থাকিত! কাপ্তেন স্থির করিলেন, এই রাজার রাজ্যে উপস্থিত হইয়া সাহস ও যোগ্যতাবলে তাঁহার বিশ্বাসভাজন হইবেন, এবং ক্রমে সৈন্য-বিভাগ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিবেন; তাহার পর সেই সিংহাসনে রাজপুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিবেন। পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, এই কাপ্তেনটি ক্লাইবের দ্বিতীয় সংস্করণ।

পরামর্শ আঁটিয়া উভয় বন্ধুতে যহলমীর রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। দুই জন ইংরাজ অতিথি রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছেন শুনিয়া, রাজা প্রতাপ সিংহ পরমসমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন। রাজার প্রসাদপুষ্ট ভিক্ষুক 'নাইট' কি ভাষায় রাজার পরিচয় দিতেছেন, দেখুন;—

But it was not his dress, his throne, his wealth of jewels, or his beard that

indolence mixed with a cunning cruelty ; an apathy that defied description ; yet which carried with it a look of debauchery that was almost inhuman. * * * No tiger that roamed his hills could have been more dangerous or more cruel. Now that I had seen him in flesh I could easily credit the tales I had heard concerning him. They were storie's that made the cheek blanch the breath come in heavy gasps ; tales that made one long for the vengeance of the sword."

অর্থাৎ, রাজার বেশভূষা, সিংহাসন, রত্নালঙ্কার ও তাঁহার দাড়ী তাঁহাকে যেরূপ বিহ্বল করিয়াছিল, রাজার চক্ষু দুটি তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা অধিক বিহ্বল করিয়াছিল ; আলস্যের সহিত কপটতাপূর্ণ হৃদয়হীনতা তিনি সেই চক্ষে প্রতিফলিত দেখিলেন। লাম্পট্যের পূর্ণ ছবিও সেই নেত্রে প্রতিফলিত। পার্ব্বত্য ব্যাঘ্র তাঁহার অপেক্ষা অধিক ভীষণ বা অধিক হিংস্র হইতে পারে না ; ইত্যাদি।

যাহা হউক, রাজার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া কাপ্তেন ও তাঁহার বন্ধু সার চাল্স রাজার বিশ্বাসভাজন হইবার ফিকির খুঁজিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। রাজা একদিন সহচরবর্গে পরিবৃত হইয়া হাতী ও বাঘের লড়াই দেখিতেছিলেন, হাতী একটা বাঘের পেটে পা দিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিল, আর একটা বাঘ নখরদন্তাঘাতে হাতীকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া এক কোণে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া রহিল। রাজা মজা দেখিবার জন্য বলিলেন, 'আমার পারিষদবর্গের মধ্যে এমন সাহসী কে আছে, যে তরবারিহস্তে এই ব্যাঘ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে তাহার প্রাণবধ করিতে পারে?' রাজার এই কথা শুনিয়া বড় বড় রাজপুত বীর অধোবদনে বসিয়া রহিলেন, কিন্তু সার চার্ল্স তরবারিহস্তে রঙ্গভূমিতে লাফাইয়া পড়িলেন, এবং ব্যাঘ্রকে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণবধ করিলেন।

এই ঘটনার পর উভয় বন্ধুই রাজার প্রিয়পাত্র হইলেন। যুদ্ধবিদ্যায় কাপ্তেনের অভিজ্ঞতা আছে জানিয়া রাজা তাঁহার হস্তে সৈন্য-দলের ভার প্রদান করিলেন। কাপ্তেন রাজাকে বুঝাইলেন,—সৈন্য দলের উপযুক্ত সংস্কার করিতে পারিলে সেই সৈন্যগণের সহায়তায় বিভিন্ন রাজ্য জয় করা অত্যন্ত সহজ হইবে। নানা রাজ্য-জয়ের আশায় সৈন্য-সংস্কারের জন্য রাজা কাপ্তেনকে বহু অর্থদানের ব্যবস্থা করিলেন।

রাজা দুই জন বিদেশীকে এত বিশ্বাস করিতেছেন দেখিয়া রাজ্যের অমাত্যগণ ইংরেজদ্বয়ের সর্ব্বনাশসাধনের জন্য ষড়যন্ত্র আঁটিতে লাগিলেন। রাজার নাম করিয়া তাঁহার মন্ত্রী একটি পিঞ্জরাবদ্ধ মর্কট তাঁহাদিগকে উপহার পাঠাইলেন। এই মর্কট পিঞ্জরমুক্ত হইবামাত্র এক জন পাচককে দংশন করিল। পাচক তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। এই ঘটনায় তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, উক্ত মর্কটের দন্তে অতি তীব্র বিষ লেপন করিয়া দেওয়া হইয়াছিল! কাপ্তেন অমাত্য-সমাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সক্রোধে রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু রাজা সুবিচার করিলেন না ; অপরাধীরও সন্ধান লইলেন না।

কাপ্তেন যতদমীর রাজ্যের যে দুই এক জন রাজকর্মচারীকে বিশ্বাসী মনে করিয়া তাঁহাদের

নিকট তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারা বিশ্বাসঘাতক হইয়া উঠিল। ইংরেজ-দ্বয়ের গুপ্ত মতলবের কথা রাজার কানে উঠিল।

ইতিমধ্যে এক দিন রাজা প্রতাপ সিংহের প্রধানা মহিষী রাজ্ঞী পদ্মিনী প্রাসাদ-বাতায়ন হইতে সার চার্লসকে দেখিতে পাইয়া মন্মথ-শরাঘাতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজ্ঞীর সুন্দর মুখখানি দেখিয়া সার চার্লসেরও মুণ্ড ঘুরিয়া গিয়াছিল। একদিন গভীর রাত্রে সার চার্লস অতিসংগোপনে রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে প্রবেশ করিলেন। রাজপুতমহিষীর সহিত তাঁহার প্রেমালাপ হইল। এই স্থানে গ্রন্থকার পদ্মিনীর যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, আমাদের দেশের বটতলার কোনও উপন্যাসে অঙ্কিত বারনারীর চরিত্রও সেরূপ জঘন্য নহে।

যে রাজস্থানের রাজপুতমহিলাগণ ধর্ম্মরক্ষার জন্য অনায়াসে অগ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক জীবন্ত দগ্ধ হইতেন, যে রাজস্থানের মহিলাবৃন্দ জন্মভূমির বিপদ দেখিলে পতি, পিতা, পুত্রকে রণসাজে সজ্জিত করিয়া সুকঠোর 'জহর' ব্রতের আয়োজন করিতেন, সেই রাজস্থানের এক জন স্বাধীন রাজার প্রধানা মহিষী অজ্ঞাতকুলশীল অপরিচিত ইংরাজ যুবকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, রাজা ও তাঁহার পারিষদবৃন্দ 'পয়োমুখ বিষকুম্ভ' ইংরাজ অতিথিদ্বয়ের বিরুদ্ধে কিরূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাও বিবৃত করিলেন। যথেচ্ছাচারী, দুর্দ্দান্ত, স্নেহমমতাবিহীন রাজার মহিষী হইয়া পদ্মিনী প্রাসাদে কিরূপ ভীষণ যন্ত্রণায় দিবারাত্রি অতিবাহিত করেন, হিন্দুর অন্তঃপুর সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, কুসংস্কারান্ধ ইংরাজ ঔপন্যাসিক তাহারও একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিয়া ইংরেজ পাঠকপাঠিকাগণের প্রচুর প্রশংসার অধিকারী হইয়াছেন। হিন্দুর শুদ্ধান্তঃপুরিকাগণ ইউরোপীয় মহিলাগণের ন্যায় মুখে 'রুজ' মাখিয়া পীনোন্নত পয়োধরের অর্দ্ধাংশ উদ্ঘাটিত করিয়া ও কটাক্ষ-শরে পরপুরুষের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া, তাহার বক্ষে বক্ষে বাহুতে কণ্ঠে মিলাইয়া উদ্দাম নৃত্যের সুখে বঞ্চিত, ইউরোপীয় লেখকগণের নিকট হিন্দু নারীর পক্ষে ইহা পরম দুর্ভাগ্যের বিষয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুর অন্তঃপুর সম্বন্ধে তাঁহাদের বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা থাকিলে, উপন্যাস লিখিতে বসিয়া তাঁহারা নরকের সহিত তাহার তুলনা করিতেন না। যাহা হউক, রাজ্ঞী পদ্মিনী তাঁহার নবীন বিদেশী নাগরের কণ্ঠলগ্ন হইয়া প্রণয়ের চুম্বনে তাঁহার চিত্তবিভ্রমের উৎপাদন করিয়া যে সকল কথা বলিলেন, উপন্যাসের ভাষায় তাহার সার মর্ম্ম এইরূপ ;—'হে নাথ, হে প্রাণনাথ, পদ্মিনী তোমার, তোমার চরণে আমার পরাণে যখন প্রেমের ফাঁসী লাগিয়াছে, যখন সকল ত্যাগ করিয়া প্রাণ মন দিয়া তোমার দাসী হইয়াছি, তখন আর আমাকে এই পূতিগন্ধময় অন্ধকার নরকে ফেলিয়া রাখিও না, এই লোহার পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া এখান হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া, নদী, গিরি অতিক্রম করিয়া দূরতর রাজ্যে লইয়া যাও।'—এইখানে উপন্যাস বেশ জমিয়া আসিয়াছে বটে, কিন্তু সুলেখকের কল্পনায় এরূপ ব্যভিচার আখ্যায়িকার ইতিহাসেও নিতান্ত বিরল।

একদিন রাত্রে কাপ্তেন অশ্বারোহণে গুপ্ত পথে দূরবর্ত্তী দুর্গে উপস্থিত হইয়া রাজার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার সকল ষড়যন্ত্র স্থির করিয়া

কারণেই হউক, কাপ্তেন ও সার চার্লস্‌কে মারোয়াঠে—বোধ হয় মাড়োয়ার-রাজা—আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। মারোয়াঠের রাজা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিলেন। ইংরেজ সেনাপতির হস্তে প্রথমে তিনি পরাজিত হইলেও, দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি কাপ্তেন সাহেবকে সসৈন্যে সমরক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। কাপ্তেনের কতক সৈন্য মরিল, কতক পলায়ন করিল। কাপ্তেন ও সার চার্লস যহলমীরের রাজধানীতে পলাইয়া আসিয়া রাজাকে এই দুঃসংবাদ প্রদান করিলেন।

রাজা ও রাজমন্ত্রী, এমন কি, রাজদরবারের সকলেই ইংরেজদ্বয়ের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু এই দুঃসময়েও প্রেমের প্রতিরোধ হইল না। রাজালিপ্সু সার চার্লস রাত্রিকালে গোপনে পদ্মিনীর সহিত মিলনের প্রত্যাশায় দুর্গম প্রাসাদান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেখানে গিয়া দেখিলেন, অন্দরের একটি অন্ধকারপূর্ণ কক্ষে একটি জীর্ণ শয্যায় পদ্মিনী শায়িতা আছেন; কিন্তু পদ্মিনীর আর সে রূপ নাই, লাবণ্য নাই; দেহ অস্থিচর্ম্ম সার, পদ্মপত্রতুল্য নেত্রযুগল অক্ষিকোটর হইতে উৎপাটিত; প্রহারের আঘাতে সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত।—রাজা প্রতাপ সিংহ অবিশ্বাসিনী মহিষীর গুপ্ত প্রণয়ের কথা অবগত হইয়া তাঁহার প্রতি এই দণ্ডের বিধান করিয়াছিলেন। পদ্মিনী তাঁহার ইংরাজ উপপতির বাহুতে মাথা রাখিয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, ‘সব শেষ হইয়াছে; স্বদেশে গিয়া আমাকে ভুলিও না; আমার আর অধিক বিলম্ব নাই, এখন শীঘ্র মরিলেই বাঁচি, মৃত্যুকালে দেবতারা দয়া করিয়া তোমার সহিত আমার মিলন ঘটাইলেন।’—প্রেমিকবর পদ্মিনীর মৃত্যুশয্যায় বসিয়া শপথ করিলেন, তিনি অত্যাচারের প্রতিশোধ দিবেন; তিনি পদ্মিনীর সঙ্গেই আত্মহত্যা দ্বারা পরলোকে যাত্রা করিতেন, কিন্তু প্রতিহিংসা চরিতার্থ না করিয়া মরিতে পারিবেন না, পদ্মিনীকে এ কথাও জানাইলেন। ক্রোধান্ধ সার চার্লস্ মাতালের মত টলিতে টলিতে রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়া, অমাত্য, প্রহরী প্রভৃতি কর্তৃক পরিবেষ্টিত রাজাকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, ‘ওরে নারীহন্তা! আমি স্বচক্ষে তোর কুকর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়াছি।’ অনন্তর তিনি এক জন অমাত্যের কোষ হইতে হীরকখচিত তরবারি টানিয়া লইয়া তদ্দ্বারা প্রতাপ সিংহকে আক্রমণ করিলেন, এবং কেহ বাধা দিবার পূর্ব্বেই তরবারির এক আঘাতে রাজার মস্তক দেহচ্যুত করিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া রাজ-দরবারের অমাত্য প্রহরী সকলেই অসি নিষ্কোষিত করিল। সার চার্লসের প্রাণসংশয় উপস্থিত দেখিয়া কাপ্তেন এক লম্ফে তাঁহার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার দীর্ঘ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া রাজপারিষদগণকে ‘কচু কাটা’ করিতে লাগিলেন! নানা অস্ত্রাঘাতে সার চার্লস সংজ্ঞাহীন হইয়া রক্তাক্তদেহে ও ভূপতিত হইলেন। কাপ্তেন একাকী রাজার রক্ষী সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়া সার চার্লসের সংজ্ঞাহীন দেহ কাঁধে লইয়া ছুটিলেন, এবং নির্ব্বিঘ্নে দেউড়ী পার হইয়া সার চার্লসের অচেতন দেহ ক্রোড়ে লইয়াই অশ্বারোহণ করিলেন। বলবান তেজস্বী অশ্ব বীরদ্বয়কে পৃষ্ঠে লইয়া সবেগে পলায়ন করিল।

অশ্ব এই ভাবে ক্রোশের পর ক্রোশ অতিক্রম করিয়া যহলমীর হইতে বহু দূরে অবস্থিত আর একটি রাজ্যে উপস্থিত হইল। কাপ্তেন সেই দেশের রাজার অতিথি হইয়া কয়েক দিন

হইয়াছিল; তাহার উপর পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া তিনি যে শয্যা গ্রহণ করিলেন, তাহা হইতে আর উঠিলেন না; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে সার চার্লসের চেতনাসঞ্চার হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তিনি সার চার্লসকে তাঁহার ওভারকোটটি উপহার দিলেন; এই ওভারকোটের অস্তরের মধ্যে অনেকগুলি হীরক শেলাই করা ছিল। এই সকল হীরক লইয়া সার চার্লস্ স্বদেশে যাত্রা করিলেন।

উপন্যাসের শেষ পৃষ্ঠায় দেখিলাম, সার চার্লস্ স্বদেশে ফিরিয়া তাঁহার সেই পূর্ব্বপ্রণয়িনী বিলাতী কুবের-দুহিতাটিকে বিবাহ করিয়া সংসার-যাত্রার পথ সুগম করিবার চেষ্টায় আছেন; তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হেলিডেকে কন্যের পিতা পূর্ব্বেই অর্দ্ধচন্দ্রদানে নিঃসারিত করিয়াছিলেন; নতুবা গল্প জমে না!

'মাই ইণ্ডিয়ান কুইন' নামক উপন্যাসে জনপ্রিয় লেখক গাই বুথবি এই ভাবে ভারতীয় চরিত্রের আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। অন্যান্য ইংরাজ লেখকেরা চীন ও জাপান সম্বন্ধীয় উপন্যাস লিখিতে গিয়া সেই সকল দেশের লোকের চরিত্র কি ভাবে আঁকিয়াছেন, প্রবন্ধান্তরে তাহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সন্ধ্যা-সঙ্গীত।

বুঝি শেষ হয়ে যায় খেলা!
হাসি বাঁশীরব মিলায়েছে সব,
ফুরায়ে এসেছে বেলা!

শ্রান্ত গগন, পথ জনহীন,
কানন কুঞ্জ ক্লান্ত মলিন,
ধূলায় লুকায় প্রভাতের ফুল,
ভেঙ্গেছে মধুপ-মেলা!

দূরে দীপ জ্বলে ভবনে ভবনে,
নিখিল আকুল কি মহা স্বপনে,
ফুকারি' থামিল সাঁঝের শঙ্খ,
ফুটিল বকুল বেলা!

কেঁদে বহে যায় উদাস বাতাস,

গরজে গভীর অধীর সিন্ধু,
ধূ ধূ ধূ ধবল বেলা !

সাধ নাহি আর, আছে শুধু স্মৃতি,
সখা পলাতক, জাগে শুধু প্রীতি ;
আশার শ্মশানে বসিয়া এখন
শুধু আঁখি জল ফেলা !

কাছে যারা ছিল, গেছে তারা দূরে ;
একাকী চলেছি কোন মায়া-পুরে !
সুখ দুঃখ ব্যথা হয়ে এল শেষ
অপমান অবহেলা !

শূন্য ভুবন কার মুখ চাই,
থাকিতে পারি না, কোন পথে যাই ?
"পারে যেতে হবে"— কে যেন ডাকিছে
বাহিয়া আনিছে ভেলা !

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

কাব্যে নীতি।

দুর্নীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। যাঁহারা ধর্ম্ম ও নীতির দিকে, তাঁহারা আমার সহায় হউন।

কবিতা লিখিতে বসিলেই নব্য কবিগণ প্রেম লইয়া বসেন। নভেল নাটকও প্রায় তাই। যেন পৃথিবীতে মাতা নাই, ভ্রাতা নাই, বন্ধু নাই। সব নায়ক, আর নায়িকা। বঙ্কিম বাবুর অনুকরণে একটি নায়ক আর দুইটি নায়িকা হইলেই ভালো হয়। নায়িকা ততোধিক হইলেও ক্ষতি নাই।

আর তাও যদি কবিরা দাম্পত্য প্রেম লইয়া কাব্য লেখেন, তাহাও সহ্য হয়! ইঁহাদের চাই—হয় বিলাতী কোর্টশিপ্, নয় ত টপ্পার প্রেম। নহিলে প্রেম হয় না। অবিবাহিত পুরুষ ও নারী চাই-ই। এখন, আমাদের দেশে অবিবাহিত পুরুষ ও নারীর প্রেম অবৈধ প্রেম। কারণ, সমাজে ১২ বৎসর বয়সের অধিকবয়স্ক ভদ্র-ঘরের অনূঢ়া কন্যা একরূপ পাওয়াই যায় না। আর

১২ বৎসরের পূর্ব্বে প্রেম হয় না। ফল দাঁড়ায় এই যে, এইরূপ প্রেম হয় ইংরাজি (অতএব আমাদের দেশে অস্বাভাবিক), না হয়—দুর্নীতিমূলক। সাহিত্যক্ষেত্র হইতে উভয়েরই উচ্ছেদ আবশ্যক।

ইংরাজিতেও কোর্টশিপ অবস্থার গান অনেক আছে বটে, কিন্তু "দাম্পত্য প্রেমে"র গানেরও অভাব নাই। কিন্তু আমাদের দেশে যেখানে "দাম্পত্য প্রেম" ভিন্ন অন্যরূপ বিশুদ্ধ প্রেম নাই, সেখানে "দাম্পত্য প্রেমে"র গান নাই বলিলেই হয়! হা অদৃষ্ট!

উদাহরণ দিতে হইবে? রবীন্দ্র বাবুর প্রেমের গানগুলি নিন। "সে আসে ধীরে", "সে কেন চুরী করে চায়", "দু' জনে দেখা হ'লে" ইত্যাদি বহুতর খ্যাত গান—সবই ইংরাজি কোর্টশিপের গান। তাঁহার "তুমি যেও না এখনই", "কেন যামিনী না যেতে জাগালে না", ইত্যাদি গান লম্পট বা অভিসারিকার গান। তাঁহার যে কয়টি গানকে "দাম্পত্য প্রেমের গান" নামে অভিহিত করা যাইতে পারে,—তাহারা সেরূপ খ্যাতি লাভ করে নাই।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ গানে মৌলিকতাও নাই। শয়ন রচনা করা, মালা গাঁথা, দীপ জ্বালা, এ সকল ব্যাপার বৈষ্ণব কবিদিগের কবিতা হইতে অপহরণ! স্থানে স্থানে পংক্তিকে পংক্তি উক্তরূপে গৃহীত। তবে রবি বাবুর সঙ্গে এই বৈষ্ণব কবিদিগের এই প্রভেদ যে, রবি বাবুর কবিতায় বৈষ্ণব কবিদিগের ভক্তিটুকু নাই, লালসাটুকু বেশ আছে।

রবি বাবুর খণ্ডকবিতায়ও ঐ একইরূপ পদ্ধতি দেখিতে পাই। নায়িকা হিসাবে ছাড়া রমণী জাতির অন্যরূপ কল্পনা তিনি করেন নাই বলিলেই হয়। নারীজাতিকে দেখিয়া এই কবির মাতৃত্বের স্বস্থত্বের কথা মনে পড়ে না। নারী জাতিকে দেখিয়া কেবল তাঁহার "মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।"

দোষ পাঠক ও শ্রোতারই অধিক, স্বীকার করি। তাহাদের, বিশেষতঃ রবীন্দ্র বাবুর এই ভক্তদের এই লালসা, সম্ভোগটুকু যেমন মধুর লাগে, নারীর সেবা, করুণা, সহিষ্ণুতা তেমন মধুর লাগে না। কিন্তু বড় কবিদের উচিত নয়—পাঠক যাহা চায়, তাহাই দেওয়া। তাঁহাদের উচিত—পাঠক তৈরি করা।

এই সম্বন্ধে একটি বড় রকমের উদাহরণ না দিলে চলে না।

রবীন্দ্র বাবুর "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যটি লউন। এটি রবীন্দ্র বাবুর ভক্তদের বড় প্রিয় কি না?—তাই চিত্রাঙ্গদাই লইলাম।

মহাভারতে বর্ণিত চিত্রাঙ্গদার গল্পটি সংক্ষেপে এই ;—

অর্জ্জুন মণিপুর রাজ্যে ভ্রাম্যমানা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং চিত্রাঙ্গদার পিতার সম্মতি লইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।

এ গল্পটি রবীন্দ্র বাবুর বড়ই গদ্যময় বোধ হইল; কন্যার পিতার সম্মতি লইয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করা—এ ত সকলেই করে। রবীন্দ্র বাবু যদি তাহা করেন, তাহা হইলে যে ব্যাসদেবের ধাপে তাঁহাকে নামিয়া যাইতে হইবে। রবীন্দ্র বাবু কোর্টশিপের অবতারণা করিলেন। হউক না অস্বাভাবিক, নূতন রকম ত হইল। "ডুববে না হায় ডুব্‌বে—একটা নতুন হবে খুব।" কোর্টশিপ নহিলে কখনও প্রেম হয়!

রবীন্দ্র বাবুর "কাব্যে"র গল্পাংশ এই ;—বনমধ্যে অর্জ্জুনকে দেখিয়া উপযাচিকা হইয়া কুরূপা চিত্রাঙ্গদা তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করেন। অর্জ্জুন অস্বীকৃত হন। তাহার পরে চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের কাছে রূপ ধার করেন। অর্জ্জুন তখন সম্মত হয়েন। অর্জ্জুন সেই অনূঢ়া কন্যাকে বর্ষকাল ভোগ করেন। তাহার পরে তাঁহাদের (বোধ হয়) বিবাহ হয়।

অদ্ভুত কোর্টশিপ! এ কোর্টশিপে এক জন সামান্যা ইংরাজ নারী সম্মত হইত না। কিন্তু তাহা এক জন হিন্দু রাজকন্যা যাচিয়া লইলেন! চমৎকার!

রবীন্দ্র বাবু অর্জ্জুনকে কিরূপ জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, দেখুন। এক জন যে কোনও ভদ্রসন্তান এরূপ করিলে তাহাকে আমরা একাসনে বসিতে দিতে চাহিতাম না। অর্জ্জুন এক জন কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট করিলেন। একটু ইতস্ততঃ করিলেন না, মনে একটুমাত্র দ্বিধা হইল না। বর্ষকাল ধরিয়া একটি ভদ্রমহিলাকে সম্ভোগ করিলেন। আর তিনি যে-সে ব্যক্তি নহেন, তিনি অর্জ্জুন—রাজপুত্র, পঞ্চ পাণ্ডবের এক জন, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথ্য করিতেন, যিনি এত জিতেন্দ্রিয় যে, উর্ব্বশীর প্রেমও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন! যিনি বেশ্যাসক্তিও অনুচিত বিবেচনা করেন, তিনি রবীন্দ্র বাবুর হাতে পড়িয়া অনায়াসে একটি রাজকন্যার ধর্ম্মনাশ করিলেন!

আর চিত্রাঙ্গদা! বেচারী, মা আমার! বঙ্গের কবিবরের হাতে পড়িয়া তোমার যে এ হেন দুর্গতি হইবে, তাহা বোধ হয় তুমি স্বপ্নেও ভাবো নাই। এক জন যে-সে হিন্দু কুল-বধূ যে অবস্থায় প্রাণ দিত, কিন্তু ধর্ম্ম দিত

বর্ষকাল—দ্বিধা নাই, সঙ্কোচ নাই, ধর্ম্ম নাই—কেবল নিত্য ভোগ, ভোগ; আর নির্লজ্জভাবে তাহার বর্ণনা, আর কেবল রূপটি নিজের নহে বলিয়া আত্ম-গ্লানি! দুঃখ তাহা নহে যে, "কল্য রাত্রিকালে কি করিলাম।" দুঃখ এইমাত্র—"হায় আমি স্বয়ং যদি সুরূপা হইতাম, তাহা হইলে আরও উপভোগ করিতাম।" বর্ষকালের ভিতর, কি তাহার পরেও ব্যভিচারিণীর এক দিনের জন্যও অনুতাপ হইল না!

তাহাই বুঝি যে, এই কাব্য দুর্নীতমূলক হউক, ইহা মনুষ্য-স্বভাবের একখানি ছবি। তাহাও নহে। এ চিত্র অস্বাভাবিক। লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম, সব দেশেই নারীজাতির সম্পত্তি; এক জন কুলাঙ্গনাকে এরূপ নির্লজ্জা কুলটা করিতে হইলে একটা আয়োজন চাই! অর্থাৎ, কেন সে কুলটা হইল, তাহা দেখানো চাই! যদি এক জন নাসিকাহীনা নারী আঁকে, তাহা হইলে কেন সে নাসিকাহীনা হইল, এ কথা অন্ততঃ ইঙ্গিতেও কাব্যে বোঝানো চাই। নহিলে এরূপ চিত্র কাব্যে অস্বাভাবিক। রবি বাবু এরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের কোনও আয়োজন দেখান নাই।

রবীন্দ্র বাবুর গ্রহ-উপগ্রহগণ ভারতচন্দ্রকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত অশ্লীল কবি বলেন, আর রবি বাবুকে 'chaste' কবি বলেন। কিন্তু, ভারতচন্দ্র যাহাই করুন, তিনি বিদ্যার যে ভোগবর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দাম্পত্য প্রেমের সম্ভোগ—indecent, কিন্তু immoral নয়! রবীন্দ্র বাবুর চিত্রাঙ্গদার সম্ভোগ অভিসারিকার সম্ভোগ। হিন্দুসমাজে কেন, পৃথিবীর কোনও সভ্যসমাজে এ চিত্রাঙ্গদা মুখ দেখাইতে পারিত না।

"অশ্লীলতা" ঘৃণার্হ বটে। কিন্তু "অধর্ম্ম" ভয়ানক। ঘরে ঘরে "বিদ্যা" হইলে সংসার আঁস্তাকুড় হয়; কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিত্রাঙ্গদা হইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ন যায়। সুরুচি বাঞ্ছনীয়, কিন্তু সুনীতি অপরিহার্য্য। আর রবীন্দ্র বাবু এই পাপকে যেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, তেমন বঙ্গদেশে আর কোনও কবি অদ্যাবধি পারেন নাই। সেই জন্য এ কুনীতি আরও ভয়ানক।

আমি "চিত্রাঙ্গদা"র সমালোচনা করিতে বসি নাই। ইহার সুন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবন্ধ, ইহার উপমা-ছটা অতুলনীয়। মাইকেলের পর এত মধুর অমিত্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই। তথাপি এ পুস্তকখানি দগ্ধ করা উচিত।

কোনও কোনও "ভক্ত" বলিবেন (এক জন সে দিন বলিয়াছিলেন) যে, এ দুর্নীতি হউক, কিন্তু এ চমৎকার কাব্য। তাঁহারা যেন রস্কিনের বাণী মনে রাখেন যে, যাহার মূলে দুর্নীতি, তাহা কাব্য হয় না। আর, যে কাব্য পড়িয়া কোনও উচ্চ প্রবৃত্তির উত্তেজনা না হয়, যাহা পড়িয়া কেহ নিজেকে মহত্তর ও পবিত্রতর বিবেচনা না করে, তাহা উচ্চ কাব্য নয়। দুর্নীতি সত্ত্বেও কাব্য চমৎকার হয় না। সূর্য্য না হইলে দিবা হয় না।

এই দুর্নীতি বঙ্গসাহিত্যে ব্যাপিয়া পড়িতেছে। বাঙ্গালা কাব্য খুলিলেই "দু জনে দেখা হোল", "প্রতি অঙ্গ কাঁদে", "সে চারু বদন", "রচেছি শয়ন"—এই-ই পাওয়া যায়। বাঙ্গালা কাব্যে এক দিকে যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনার অভাব, অন্য দিকে তেমনই মানুষের মনঃপ্রকৃতির বর্ণনার অভাব। বাইরণ, শেলি, কীট্‌, ইত্যাদি কবিগণ প্রকৃতির নামে উন্মাদ। তাঁহাদের প্রাণ ফাটিয়া স্বভাবের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা বাহির হইতেছে। আর আমাদের দেশের কবিরা রমণীর পীন পয়োধর ও সরস অধর ছাড়া আর কিছুই জানিলেন না, বুঝিলেন না। যে দেশের প্রকৃতি নীলিমায়, শ্যামলতায়, পর্ব্বতে, উপত্যকায়, ক্ষেত্রে, নির্ঝরে, সৌরভে, ঝঙ্কারে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশকে পরাস্ত করিয়াছে, তাহার সন্তানগণ সে দিকে একবার চাহিয়াও দেখিলেন না; আর, ধূমাচ্ছন্ন, মেঘাচ্ছন্ন ইংলণ্ডের কবিগণ তাঁহাদের সেইটুকু সৌন্দর্য্য লইয়াই উন্মত্ত। এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে?

তাহার উপরে মানুষের অন্তর্জগৎ। জননীর স্নেহ, স্ত্রীর তন্ময়তা, কন্যার সেবা, বন্ধুর সৌহার্দ্দ্য, ভক্তের ভক্তি, ত্যাগীর ত্যাগ, কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা,— এই সকল মহিমময়ী কাহিনী ছাড়িয়া দিয়া, "সে কেন চুরী করে চায়" আর "জাগি পোহাল বিভাবরী", এই কি চিরদিন শুনিতে হইবে? রবীন্দ্র বাবু ত সহস্রাধিক খণ্ড কবিতা ও গান লিখিয়াছেন। পতিপত্নীর পবিত্র প্রেম,—যাহার মূলে সম্ভোগ নহে, যাহার মূলে স্বার্থত্যাগ—সে প্রেম কি তাঁহার তিনটি কবিতায়ও আছে?

কেহ কেহ আমায় মনে মনে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, আমি রবীন্দ্র বাবুকেই এত আক্রমণ করি কেন? আমি উত্তরে জিজ্ঞাসা করি, "তাহা না করিয়া কি হরি ঘোষকে আক্রমণ করিব!" তাহার দোষ কি? সে বেচারী অন্ধ অনুকারকমাত্র। সে রবিবাবু minus প্রতিভা।

অর্দ্ধেক তাহারা, অর্দ্ধেক দোষী তাহাদের আদর্শ কবি রবীন্দ্র বাবু। শুদ্ধ পাপে বড় যায় আসে না; কিন্তু, দুর্নীতি plus শক্তি বড় ভয়ঙ্কর! তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে হইবে। বাজীরাও পেশোয়াই বোধ হয় বলিয়াছিলেন,—"বৃক্ষকাণ্ড কর্ত্তন কর, শাখাগুলি আপনিই শুকাইয়া যাইবে।"

রবি বাবুর কবিতার প্রাণহীন, ভাবহীন অনুকরণের জ্বালায় মাসিক-পত্রের সম্পাদক ও পাঠক উভয়েই জ্বালাতন। সে দিন "প্রবাসী"র সম্পাদক এই প্রেমের পদ্য-রচয়িতাদের সম্বোধন করিয়া ব্যঙ্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি বলি, সে বেচারীদের দোষ কি? তাঁহারা ভাবেন যে, যেই "জলভরে"র সঙ্গে "ছলভরে" মিলাইতে শিখিলেন, অমনই কবি হইলেন! তাঁহাদের যেমন শেখাও, তেমনই ত তাঁহারা শিখিবেন! রবি বাবুর গুণগুলি আয়ত্ত করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত; কিন্তু দোষগুলি হুবহু নকল করিয়াছেন! এমন কি, অনেক সময়ে they have out-Heroded Herod!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

প্রতিভার উদ্বোধন।

বিধাতার নিষ্কাম হৃদয়ে
  চমকিল প্রথম কামনা!
চমকিল নব আশা ভয়ে
  আনন্দের পরমাণু-কণা!

অসহ্য এ নব জাগরণ—
  আকুল ব্যাকুল চিদাকাশ!
স্পন্দন—কম্পন—আলোড়ন—
  এ কি আশা, না এ অবিশ্বাস?

কাঁপিতেছে ক্ষুব্ধ অন্ধকার,
  অপেক্ষায় হৃদয় অস্থির;
গড়িছে—ভাঙ্গিছে বার বার,—
  এ কি খেলা মুগ্ধা প্রকৃতির!

বার বার মুছেন নয়ান,
ক্রমে ছায়া—ক্রমশঃ আভাস।
নাহি জ্ঞান, নহেন অজ্ঞান—
সহসা জগত পরকাশ!

পড়িল গভীর দীর্ঘশ্বাস,
এ কি দুখ—না এ সুখ অতি!
বাস্তব—না কল্পনা-বিকাশ?—
কামনা বাসনা মূর্ত্তিমতী!

বিস্ময়-বিহ্বল মহাকবি
চাহিয়া আছেন অনিমিকে!
সম্মুখে ফুটিছে নব রবি,
তারকা ফুটিছে দশ দিকে!

মহাশূন্য পরিপূর্ণ আজি
সুকোমল তরল কিরণে!
ঘুরে গ্রহ-উপগ্রহরাজি
দূরে—দূরে বিচিত্র বরণে!

গ্রহ হ'তে গ্রহান্তরে ছুটে
ওঙ্কার-ঝঙ্কার অনাহত!
পঞ্চভূত উঠে ফুটে ফুটে
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে কত!

ছন্দে বন্ধে যতি-গরিমায়
চলে কাল ললিত-চরণে!
অন্ধশক্তি পূর্ণ সুষমায়
চেতনার প্রথম চুম্বনে!

নীলবাসে ঢাকি শ্যামদেহ
শশি-কক্ষে ভ্রমে ধরা ধীরে;
কত শোভা—কত প্রেম স্নেহ,
জলে স্থলে প্রাসাদে কুটীরে!

চাহে ঊষা—চকিত নয়ন,
ফুলবাসে বায়ু সুবাসিত ;
উঠে ধীর বিহগ-কূজন—
সৃষ্টি পরে স্রষ্টা বিভাসিত !

∴

সমাপ্ত বিধির সৃষ্টি-ক্রিয়া,
অসমাপ্ত সৃজন-কল্পনা।
এস তবে, এস বাহিরিয়া
চিত্ত হ'তে, চিন্ময়ী-চেতনা !

এস, নিত্য-স্বরগ-স্বপন,
রূপ-রস-শব্দ-অসীমায় !
মরজন্ম করিয়া লুণ্ঠন
অমর সৌন্দর্য্যে মহিমায় !

লয়ে এস—সে আদি-কল্পনা,
শোকে দুখে মরণে নির্ভয়,
সে অব্যক্ত আনন্দ-বেদনা,
সেই প্রেম অনাদি অক্ষয়।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

———:০:———

ভারতী।—জ্যৈষ্ঠ। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত 'শুকসারিকার কলহ' নামক একখানি চিত্রের প্রতিলিপি,—নানা বর্ণে মুদ্রিত। 'শুকশারিকার কলহে' অস্বাভাবিকতা অপেক্ষাকৃত অল্প। 'চিত্র-ব্যাখ্যা'য় শ্রীযুত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—'রাজা ও রাণীর মুখে-চোকে বিস্ময় কৌতুহলের ভাবটুকু এবং তাহার সহিত পক্ষী দুটির প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ এমন ফুটিয়াছে যে, তাহা আর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না।' কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, চিত্র হইতে রাজা ও রাণীর 'মুখে-চোকে বিস্ময় কৌতুহলের ভাবটুকু এবং তাহার সহিত পক্ষী দুটির প্রতি প্রগাঢ় স্নেহে'র কোনও অভিব্যক্তি আমরা চেষ্টা করিয়াও আবিষ্কার করিতে পারি নাই। এক জন বৈষ্ণব বাবাজী

'অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য' শ্লোকটি দুই তিনবার আবৃত্তি করিয়া শেষে শিক্ষার্থী শিষ্যকে বলিয়াছিলেন,—'এ যে না বুঝিবে, তার কণ্ঠী ছিঁড়িব।' সৌরীন্দ্র বাবু যে ব্যাখ্যা অনাবশ্যক বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, তাহাও আমাদের সৌভাগ্য। তিনিও অনায়াসে আমাদের কণ্ঠী ছিঁড়িতে পারিতেন। 'পক্ষী দুটীর প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ' চিত্রে না ফুটুক, ছবিখানির প্রতি তাঁহার 'প্রগাঢ় স্নেহ' 'চিত্র-ব্যাখ্যা'য় বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না।—এই সংখ্যায় শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নামক আর একখানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। নবীন সমালোচক সৌরীন্দ্রমোহন এই চিত্রখানির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন! চিত্রের সমালোচনায় কল্পনার চিত্র প্রতিফলিত করিয়া কোনও লাভ নাই। চিত্রে যাহা নাই, কল্পনায় তাহার আরোপ করা চলে; কিন্তু সমালোচকের বর্ণনা চিত্রের সে অভাব পূর্ণ করিতে পারে না। হাফটোন চিত্রে অতিকষ্টে সমুদ্রের কল্পনা করা যায়, কিন্তু 'চারি দিকে গম্ভীর ভাব—সমুদ্রের উচ্ছল বারিরাশিও আজ নীরবে বেলাভূমিতে আসিয়া প্রতিহত হইতেছে'—সৌরীন্দ্র বাবুর মত মুগ্ধ দিব্য-দৃষ্টির অধিকারী না হইলে কেহ তাহা চিত্রে দেখিতে পাইবেন না! সৌরীন্দ্র বাবু যদি ছবির সহিত এক যোড়া 'দিব্যদৃষ্টি' পাঠাইয়া দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ব্যাখ্যার সহিত চিত্র-বস্তুর সামঞ্জস্য নর-দৃষ্টির গোচর হইতে পারিত। চিত্র-সৌন্দর্য্যে সৌরীন্দ্র বাবু এমন তন্ময় হইয়াছেন যে, তাঁহার লেখনীর ইন্দ্রজালে সমুদ্রের 'উচ্ছল' বারিরাশিও 'নীরব' হইয়া গিয়াছে!—চিত্রকর কোল ও ভীলের আদর্শে রাম লক্ষ্মণকে আঁকিয়া থাকিবেন। রাম লক্ষ্মণের এই অক্ষম ও উদ্ভট কল্পনা মৌলিক হইতে পারে, কিন্তু মনোরম নয়। শ্রীযুত সত্যপ্রসন্ন সিংহ ও শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁহার পত্নীর চিত্র প্রশংসনীয়। 'দিদিমা' নামক ক্ষুদ্র নক্সাটি উপভোগ্য। এক জন বেনামী লেখক 'মেঘনাদবধ ও চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা'য় মাইকেলকে আক্রমণ করিয়াছেন। লেখক প্রথমে অনেক ইংরেজ সমালোচক ও কবির রচনা উদ্ধৃত করিয়া পল্লবগ্রাহী পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। লেখক বলেন,—'মধুসূদন যখন রাত্রিবর্ণনা করেন, তখন শুধু রাত্রিই বর্ণনা করেন, রাত্রিকালের আকাশের মূর্ত্তি বর্ণনা করেন না।' আশ্চর্য্য! শুধু রাত্রিকালের আকাশ নয়, মাইকেলের রাত্রি-বর্ণনায় ভুনী-খিচুড়ীও বাদ পড়িয়াছে! ইহা কি সামান্য অপরাধ? কিন্তু লেখক উদারভাবে স্বীকার করিয়াছেন,—'যতটুকু বর্ণনা করেন, ততটুকু মন্দ হয় না।'—তাহার পর মাইকেলের 'আইলা সুচারু তারা' ইত্যাদি বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া লেখক বলিয়াছেন,—'কিন্তু ইহা নিশাক্রান্তা প্রকৃতির খণ্ড চিত্র মাত্র। ইহাতে রজনীর মূর্ত্তি বর্ণনা নাই, আকাশের মূর্ত্তি বর্ণনা নাই, চন্দ্রালোকে প্রকৃতির কি রূপান্তর হয়, তাহারও কোনও ইঙ্গিত নাই, কোন ফুলেরও বর্ণনা নাই।' লেখক আরও বলিতে পারিতেন,—ইহাতে চানাচুর নাই, গোলাপী গাওেরী নাই, সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা নাই, উত্তর মেরু ও মেরীর 'মূর্ত্তি বর্ণনা' নাই! সমালোচকের এমনতর অদ্ভুত আবদার প্রায় দেখা যায় না। 'হাঁড়ির একটা ভাত টিপিলেই সমস্ত ভাতের অবস্থা বুঝা যায়।' তাই আমরা সমালোচকের সমস্ত মন্তব্য-'পাঁক ঘাঁটিবার' কর্ম্মভোগ হইতে পাঠককে অব্যাহতি দিলাম। 'মেঘনাদবধে'র প্রকৃতি-চিত্রই কি মাইকেলের সর্ব্বস্ব? মাইকেল বর্ত্তমান সমালোচকের জন্য

নাদ-বধের বিরাট সৌন্দর্য্য খণ্ড-চিত্রের বিশ্লেষণ রূপ ক্ষুদ্র তুলাদণ্ডে তুলিত হইতে পারে না। কোনও কবির একখানি কাব্য হইতে প্রকৃতি-চিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার 'চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা'র পরিমাণ করা যায় না, এই অন্ধ সমালোচক তাহাও বিস্মৃত হইয়াছেন। শ্রীযুত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুদিত 'ভারতবর্ষে' উল্লেখযোগ্য। 'পাওয়া ও হওয়া' নামক প্রবন্ধে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষাকে, ভাবকে, বক্তব্যকে নির্দ্দয়ভাবে পাক দিয়া, জড়াইয়া, মোচড়াইয়া যে জটিল প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়াছেন,—তাহা অত্যন্ত অদ্ভুত। বিবাহ-সভায় যদি প্রশ্ন করা যায়,—'সে আমার কাছে প্রাপ্ত অথচ অপ্রাপ্ত' কি? তাহা হইলে বোধ করি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকেও মৌনব্রত ধারণ করিয়া পরাজয় স্বীকার করিতে হয়! কতখানি ন্যায়ের ফাঁকি, কতখানি সত্য, কতখানি কবিত্ব, কতখানি কথার প্যাঁচ, কতখানি ঢেঁকির কচ্‌কচি মিশাইয়া রবীন্দ্র বাবু এই 'পাওয়া ও হওয়া'র জগা-খিচুড়ী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা কে নির্ণয় করিবে? রবীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন,—'একটু রস, একটু ভাব, একটু চিন্তাই ব্রহ্ম নয়।' সে কথা সত্য। 'একটু চিন্তা' ব্রহ্ম হইলে আমরা তাঁহাকে দূর হইতে নমস্কার করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ করিতাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এ ক্ষেত্রে 'একটু চিন্তা' ব্রহ্ম-রূপে অবতীর্ণ না হইয়া বিষম প্রবন্ধে পরিণত হইয়াছে; অগত্যা আমাদের মত দুর্ভাগ্য পাঠককে 'বিপত্তৌ' মধুসূদনকে স্মরণ করিতে হইতেছে। রবীন্দ্র বাবু আজ কাল ধর্ম্মোপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু তাঁহার উপদেশগুলি মানব-বুদ্ধির অতীত হইয়া উঠিতেছে। যতদিন রবীন্দ্র-সূত্রের ভাষ্য প্রকাশিত না হয়, তত দিন পাঠকের পক্ষে 'গোলোক-ধাঁধাঁ'য় 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা' অনিবার্য্য।

জাহ্নবী।—প্রথম বর্ষ; প্রথম সংখ্যা; বৈশাখ। আমরা জাহ্নবীর ক্রমোন্নতি দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীযুত মুনীন্দ্রনাথ ঘোষের 'পদ্ম-করবী' নামক কবিতাটি উল্লেখ যোগ্য। কবি এই কবিতায় ভারতের গৌরব 'সতী'র যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা সুন্দর। আমরা উদ্ধৃত করিলাম,—

'মনে হয়, অতীতের কবে কোন্ বিস্মৃত দিবায়
আম্রের পল্লব হাতে—বল্লভের চিতামাঝে 'সতী'
ধ্রুবতারা সম দীপ্তা মৃত্যুঞ্জয় প্রেমের বিভায়,
শত কুলবধূ মিলি' ভক্তিভরে করিছে আরতি।
সীমন্তে সিন্দূরশোভা, স্মিতাধরে শুভ শুভ্র হাসি,
প্রকম্পিত-চেলাঞ্চলা, চারু করে শঙ্খের কঙ্কণ,
কণ্ঠে নব বরমালা—তরঙ্গিত মুক্ত কেশরাশি,
রঞ্জিত অলক্তরাগে দু'টি রাঙ্গা কমল চরণ।
জ্বলিয়া উঠিল চিতা—পতিপদে নমি' ভক্তিভরে
সহর্ষে শুইল সাধ্বী অগ্নিময় বাসর-শয্যায়,
চন্দন-নন্দন-গন্ধ বহি' গেল দিক্‌দিগন্তরে,
পড়িল অজস্র অর্ঘ্য অগ্নিব্যাপ্ত দু'টি রাঙ্গা পায়।'

কবি বলিয়াছেন,—'সেই রাঙ্গা চরণের সমুৎফুল্ল স্নিগ্ধ রক্তরাগ' ধরায় 'পুঞ্জ পুঞ্জ পদ্ম করবী' হইয়া ফুটিয়াছে। আর 'স্মরণ-সিন্দূরবিন্দু ওই হাসে রক্তবিম্ব রবি!' কষ্টকল্পনায় কাব্য-কলা একটু ক্ষুণ্ণ হয় বটে, কিন্তু 'সতী'র স্মৃতিগৌরবে তাহাও পূত ও সার্থক বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের 'পতঞ্জলির কালনির্ণয়' উল্লেখযোগ্য। অমূল্য বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—পতঞ্জলি খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪০ অব্দের বৈয়াকরণ ছিলেন। শ্রীযুত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শিশুসাহিত্যের রত্নগুলি মাতৃভাষার ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতেছেন। তিনি বাঙ্গালীর ধন্যবাদ-

দেবেন্দ্রনাথ সেনের 'খোকার উপমা' নামক কবিতাটি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। আমরা সমগ্র কবিতাটি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না।—

১

'মুখখানি চাঁদপারা মধুসম স্বাদু,
কেমনে আদর করি বল্, বল্ যাদু ?
চারি ধারে শুধু মরু, ধূ ধূ ধূ-ধূ সবি ;
তুই খোকা, তারি মাঝে একখানি ছবি !
চারিধারে অন্ধকার, ক্লান্ত হয় আঁখি ;—
তারি মাঝে তুই যাদু উজ্জ্বল জোনাকি !

২

শ্রীমুখে মাখানো আহা আবিরের রাগ,
মোহন ! কেমনে করি যতন সোহাগ ?
মালঞ্চে ঝরিয়া গেছে যত পুষ্পলতা ;
তারি মাঝে তুই যাদু ক্রোটোনের পাতা !
টোকো আমে—টোকো আমে বিশ্ব ভরপুর ;
তারি মাঝে তুই যাদু কাবুলী আঙ্গুর।'

'তারি মাঝে তুই যাদু কাবুলী আঙ্গুর' কেন ? আমরা বলি,—'বোম্বাই মধুর !' কারণ সমতলবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে আঙ্গুর চিরকালই টক্ ! শ্রীযুত শশধর রায়ের "উদ্ভিদের দুষ্টামি' নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। শশধর বাবু উপান্যাসের মধুরসে মিষ্ট করিয়া বাঙ্গালী পাঠককে বৈজ্ঞানিক সত্য উপহার দিতেছেন। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় নীরব ;—এখন শশধর ও জগদানন্দই বাঙ্গালীর সাহিত্য-বৈঠকে বিজ্ঞানের আসর রাখিয়াছেন।

বঙ্গদর্শন।—জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায়ের 'বরপণ ও বিবাহ' উল্লেখযোগ্য, চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। সামাজিকগণের আলোচনার যোগ্য। 'ইহুদীধর্ম্ম' নামক অনূদিত প্রবন্ধটি উপাদেয়। 'ইহুদীয় উপাসনার বিশেষত্ব এই কয়েকটি পংক্তিতে পরিস্ফুট হইতেছে ; —'হে পরমেশ্বর ! আমাদের আশা এই যে, এক দিন অসত্য ও বিরোধের বিনাশ হইবে, এবং সমগ্র মানব জাতি এই বিশাল ধরণীর একমাত্র অধীশ্বর তোমাকে একটিমাত্র নামে ডাকিবে।' 'ভগবান এই বিশ্বের রাজা, প্রত্যেক মানব তাঁহার মন্দিরের পুরোহিত, প্রত্যেক দেশ তাঁহার উপাসনার বেদী, এবং প্রত্যেক ভোজনগ্রাস তাঁহার যজ্ঞ।' শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'শ্রীগৌরাঙ্গ নামক' কীর্ত্তনটি অত্যন্ত চিত্তহারী।

নব্যভারত।—বৈশাখ। শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র দাসের 'ভাওয়ালে' নামক কবিতাটি স্বদেশপ্রেমে সুরভি। শ্রীযুত শশধর রায়ের 'মানব-সমাজ' নামক নিবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সিংহ 'ফরিদপুরের ধন্বন্তরী' নামক প্রবন্ধে স্বর্গীয় কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের অত্যন্ত সঙ্ক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুত দেবনারায়ণ ঘোষের 'লিলিপুটিয়ান' প্রবন্ধ 'মণিপুর ও মিথি' তথ্যপূর্ণ। সুদূর ইম্‌ফাল উপত্যকায় নর্ত্তকী বালিকাদিগের মুখেও গীতগোবিন্দ গীত হইয়া থাকে। কবি যে দেশ কালের অতীত !

অলৌকিক-রহস্য।—প্রথম ভাগ ; প্রথম সংখ্যা। সুপ্রসিদ্ধ নাটক-কার শ্রীযুত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এই নূতন মাসিকের সম্পাদক। প্রেততত্ত্ব প্রভৃতি অলৌকিক বিষয়ের আলোচনা এই নূতন মাসিকের উদ্দিষ্ট। 'ভৌতিক-কাহিনী', 'প্রেতিনীর সহিত বিবাহ' প্রভৃতি কৌতূহলের উদ্দীপক। কিন্তু কেবল এইরূপ বিদেশী ভূতের গল্পে 'অলৌকিক-রহস্য' পূর্ণ করিলে সম্পাদকের উদ্দেশ্য বিফল হইবে। ভৌতিক ও পারলৌকিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ প্রভৃতির অবতারণা করিলে, 'অলৌকিক-রহস্য' দেশের একটি অভাব পূর্ণ করিতে পারিবে।—প্রথম সংখ্যার পরে আর কোনও সংখ্যা আমাদের হস্তগত হয় নাই। ইহা অলৌকিক না হউক, রহস্য বটে।

পর্টুগীজ প্রাধান্যের ধ্বংস।

—:০:—

যুগযুগান্তর হইতে সোনার বাঙ্গালার নাম দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। জগতের আদিম সভ্যতার ইতিহাসের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। গ্রীক, রোম ও চীন প্রভৃতি প্রাচীন সাম্রাজ্যের বিবরণে বাঙ্গালার কথা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই সমস্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, স্বর্ণপ্রসবিনী বঙ্গভূমি হইতে অঞ্চল পুরিয়া স্বর্ণ কুড়াইবার জন্য তত্তৎ দেশের বাণিজ্যলক্ষ্মী অনুকূল বায়ুভরে বাদাম উড়াইয়া নীল সমুদ্রের তরঙ্গ-লহরীর সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে প্রতিনিয়ত গতায়াত করিতেন। তাহার অপর্য্যাপ্ত শস্যরাশি জগতের অনেক স্থানের অধিবাসীর ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য জাহাজ বোঝাই হইয়া চলিয়া যাইত। তাহার শিল্পজাত দ্রব্য অনেক সভ্য জাতির আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার প্রসিদ্ধ বন্দর সপ্তগ্রামের বিবরণ আজিও রোমক ইতিহাসে দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচীন বঙ্গের শিল্পজাত দ্রব্যের কাহিনী অনেক দেশের ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে।

ইহা সে কালের কথা। বর্ত্তমান যুগেও তাহার শ্যামল ক্ষেত্রে যাহারা সমাগত হইয়াছে, তাহারা আজিও তাহার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কোনও কোনও জাতি এদেশে নামশেষ হইলেও, তাহাদের চিহ্ন আজিও তাহাদের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কলম্বস কর্ত্তৃক আমেরিকা-আবিষ্কারের পর ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে পর্টুগালের অধিপতি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন। তিনি ভাস্কোডিগামাকে একটি নূতন জলপথের আবিষ্কারের জন্য প্রেরণ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে গামা অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রমের পর ভারতবর্ষের মালাবার উপকূলস্থ কালিকট নগরে উপস্থিত হন। মালাক্কা প্রভৃতি স্থানে পর্টুগীজগণ বাণিজ্যবিস্তারে সচেষ্ট হয়। মালাবার উপকূলবর্ত্তী গোয়া তাহাদের প্রধান স্থান হইয়া উঠে। অদ্যাপি গোয়া পর্টুগীজদিগেরই অধীন আছে। দক্ষিণ প্রদেশে বাণিজ্য করিতে করিতে ক্রমে

যখন সোনার বাঙ্গালার কথা তাহাদের কর্ণগোচর হইল, তখন তাহারা তথায় উপস্থিত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্টুগীজগণ বাঙ্গালায় বাণিজ্য-ব্যপদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়ে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার দুইটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল। চট্টগ্রামে সকল প্রকার জাহাজের গতায়াতের সুবিধা ছিল, তাই পর্টুগীজেরা তাহার 'পোর্টো গ্রাণ্ডী' বা 'বৃহৎ স্বর্গ' ও সপ্তগ্রামের নাম 'পোর্টো পেকিনো' বা 'ক্ষুদ্র স্বর্গ' আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। চট্টগ্রাম প্রদেশেই সাধারণতঃ ইহারা উপনিবেশ সংস্থাপন করে। ক্রমে তাহারা আরাকান পর্য্যন্ত ধাবিত হয়। বঙ্গোপসাগরে ইহাদের একরূপ একাধিপত্য ছিল। পর্টুগীজদিগের অনুসরণ করিয়া ক্রমে ওলন্দাজ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিও বঙ্গদেশে বাণিজ্যের জন্য সমাগত হয়; এবং ইহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পর্টুগীজগণ বাণিজ্য ব্যাপারে অক্ষম হইয়া পড়ে। ক্রমে তাহারা বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া দেশীয় রাজা জমীদারদিগের অধীনে সৈনিকের কার্য্যে ব্রতী হয়। কিন্তু তাহাতেও সুচারুরূপে জীবিকা-নির্ব্বাহ না হওয়ায়, ক্রমে তাহারা জলদস্যুর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমগ্র বঙ্গোপসাগর বিক্ষুব্ধ করিতে থাকে। সনদ্বীপ তাহাদের প্রধান স্থান হইয়া উঠে। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গঞ্জালেস নামক এক জন দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি তাহাদের সর্দ্দার হইয়া বঙ্গোপসাগরতীরস্থ কোনও কোনও স্থান অধিকার করিয়া, শেষে আরাকান অধিকার করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। কিন্তু আরাকান-রাজ তাহাকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করিয়া দেন। পর্টুগীজগণ চট্টগ্রামে আশ্রয় লইয়া কিছুকাল শান্তভাবে অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ক্রমে তাহারা আবার দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিলে, সুবেদারগণ তাহাদিগকে দমন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে শান্তিস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যে সময়ে পর্টুগীজেরা বঙ্গদেশে উপস্থিত হয়, সে সময়ে চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রাম প্রধান বন্দর রূপে প্রসিদ্ধ ছিল; তন্মধ্যে চট্টগ্রামেই জাহাজাদির গতায়াতের বিশেষরূপ সুবিধা থাকায়, তথায় পর্টুগীজেরা আপনাদের প্রধান উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু সপ্তগ্রামেও তাহারা বাণিজ্যার্থ উপস্থিত হইত, এবং ক্রমে তাহার নিকটেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। সপ্তগ্রামের নিম্নস্থ নদী ক্রমে ক্ষুদ্রায়তন হইয়া উঠায়,

সন্নিহিত ভাগীরথীর তীরে আপনাদের একটি উপনিবেশ স্থাপিত করে। বর্ত্তমান ব্যাণ্ডেল ও হুগলী তাহাদের উপনিবেশ-স্থান। ব্যাণ্ডেল বন্দর শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া কথিত হয়, এবং পর্টুগীজেরা যাহাকে 'গলিন' বলিয়া অভিহিত করিত, তাহাই হুগলী নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ব্যাণ্ডেলের গির্জ্জা আজিও সেই উপনিবেশের চিহ্নস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে।

গঞ্জালেসের পতনের পর পর্টুগীজগণ সনদ্বীপ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি তাহাদের পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান স্থান পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে হুগলীর অভিমুখে অগ্রসর হয়, এবং তথায় কিছু কাল শান্তভাবে অবস্থিতি করিয়া বাণিজ্য কার্য্যে মনোনিবেশ করে। পূর্ব্ব হইতে হুগলীর প্রাধান্য বর্দ্ধিত হওয়ায় সপ্তগ্রামের প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। হুগলীর এক দিকে নদী ও অন্য তিন দিকে বিল থাকায় জাহাজাদির গতায়াতের বিলক্ষণ সুবিধা ছিল। পর্টুগীজেরা অল্প রাজস্বে নদীর উপকূলবর্ত্তী ভূভাগের অধিকারী হইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়া দক্ষিণ-বঙ্গের বাণিজ্য একরূপ একচেটিয়া করিয়া লয়। যে সমস্ত জাহাজ বা নৌকা হুগলী বন্দরের নিকট দিয়া যাইত, পর্টুগীজেরা তাহাদের নিকট কর আদায় করিয়া লইত। ক্রমে তাহাতে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইতে আরম্ভ হয়। বাণিজ্যে এইরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া তাহারা অবশেষে অধিবাসিগণের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা বালক-বালিকাগণকে প্রলোভনে ও বলপ্রয়োগে বশীভূত করিয়া দাস্যবৃত্তির জন্য ইউরোপে প্রেরণ করিত। এই কুৎসিত ব্যবসায় অবলম্বন করায় বঙ্গবাসিগণ পর্টুগীজদিগকে ভীতির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে। ইহাতে তাহাদের অন্যান্য দ্রব্যের বাণিজ্যেরও ক্ষতি হইতে থাকে। তাহার পর তাহারা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জলপথে ও স্থলপথে লোকের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া দেশমধ্যে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়। কি পূর্ব্ব-বঙ্গ, কি দক্ষিণ-বঙ্গ, কি পশ্চিম-বঙ্গ, ক্রমে সর্ব্বত্রই তাহাদের দাস-ব্যবসায় ও দস্যুবৃত্তি বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব-বঙ্গে মগদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহারা নানা প্রকারে দস্যুবৃত্তি করিতে আরম্ভ করে। তথায় দস্যুবৃত্তি কিছু অধিকপরিমাণে সম্পাদিত হইত। পশ্চিম-বঙ্গে দাস ব্যবসায়ই কিছু

ব্যবসায় করিত, তথাপি বাঙ্গালার সর্ব্বত্র এই দুই ভীষণ ব্যাপারের জন্য আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীর বাদশাহের রাজত্বকালেই গঞ্জালেস ফিরিঙ্গী অত্যন্ত দুর্দ্ধর্য হইয়া উঠে। যদিও আরাকান-রাজের সহিত বিবাদের ফলে তাহাকে সনদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল, তথাপি তাহার অনুচরগণ কিছুকাল বঙ্গোপসাগরে অবস্থিতি করিয়া, অবশেষে হুগলীর অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই সময়ে শাজাহান বঙ্গদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি স্বীয় পিতা জাহাঙ্গীর বাদশাহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া বাঙ্গালার তদানীন্তন সুবেদার ইব্রাহিম খাঁকে নিহত করিয়া বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। তাহার পর বাদশাহী সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া বাদশাহের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বঙ্গরাজ্যের বর্দ্ধমান প্রদেশ অধিকারের সময় পর্টুগীজ-দিগের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিনি সেই সময়ে পর্টুগীজদিগের প্রভুত্ব ও অত্যাচারের বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গে অনেক দিন অবস্থিতি করায়, তাহাদের প্রাধান্যের কথা সর্ব্বদাই তাঁহার কর্ণগোচর হইত। কিন্তু সে সময়ে তিনি তাহাদিগকে দমন করিবার কোনরূপ চেষ্টা করেন নাই। বরং বাদশাহের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য তিনি তাহাদের সাহায্যগ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তাহাদের কামান, বন্দুক ও গোলন্দাজ সৈন্যের সাহায্যে তিনি বাদশাহী সৈন্যকে পরাজিত করিবার অভিলাষী হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সে মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই। তিনি যৎকালে বর্দ্ধমান প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে হুগলীর পর্টুগীজ শাসনকর্ত্তা রোডরিগেজ হুগলী আক্রমণের আশঙ্কায় শাজাহানকে সম্মান-প্রদর্শনের জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। শাজাহান সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু রোডরিগেজ পরিণামে বাদশাহী সৈন্যের জয় হইবে বুঝিতে পারিয়া শাজাহানের প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই। তজ্জন্য শাজাহান আপনাকে অপমানিত মনে করিয়াছিলেন। এই অপ-মানের প্রতিশোধগ্রহণ ও পর্টুগীজদিগের অত্যাচারনিবারণের ইচ্ছা সর্ব্বদাই তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। জাহাঙ্গীরের দেহত্যাগের পর যখন তিনি ভারত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন তিনি ইহার

বিতাড়িত হইয়া একেবারে হীনবল হইয়া পড়িল। তাহার পরেও তাহাদের কিছু কিছু চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সেই সময় হইতেই বঙ্গে পর্টুগীজ প্রাধান্যের ধ্বংস হয়।

বাদশাহী মসনদে উপবিষ্ট হইয়া শাজাহান কাশীম খাঁ জবানীকে বাঙ্গালার সুবেদার নিযুক্ত করিয়া পাঠান। কাশীম খাঁর নিয়োগের সময় তিনি তাঁহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন যে, পর্টুগীজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে উৎখাত করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে জলে ও স্থলে, উভয় পথেই সৈন্য প্রেরণ করিবে। *

কাশীম খাঁ রাজধানী ঢাকায় উপস্থিত হইয়া পর্টুগীজদিগকে দলন করিবার জন্য আয়োজন আরম্ভ করিলেন। তিনি স্বীয় পুত্র এনায়েৎ উল্লা ও আল্লাইয়ার খাঁকে হুগলী অধিকারের জন্য প্রেরণ করিলেন। বাহাদুর কুম্বু নামক আর এক জন সেনাপতি মুকসুদাবাদের (মুর্শিদাবাদ) খালসা ভূমি অধিকারের ছলে এনায়েৎ উল্লার সহিত যোগদানের জন্য প্রেরিত হইলেন। পাছে পর্টুগীজগণ এই আক্রমণের সন্ধান পায়, এই আশঙ্কায় বাদশাহী সৈন্যগণ হিজলী অধিকারের জন্য যাইতেছে, এই কথা প্রচারিত হইল। আল্লাইয়ার খাঁ হিজলীর পথিমধ্যস্থ বর্দ্ধমান নগরে অবস্থিতি করিয়া খাজা শের প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষগণের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। খাজা শের শ্রীপুর † হইতে রণতরীসমূহ লইয়া পর্টুগীজদিগের পলায়নপথ রুদ্ধ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার রণতরীর বহর মোহানাতে উপস্থিত হইলে, আল্লাইয়ার খাঁ হুগলীতে উপস্থিত হইয়া

---

* ষ্টুয়ার্ট বলেন যে, কাশীম খাঁ বাদশাহ শাজাহান কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে আগমন করিলে পর, তিনি পর্টুগীজদিগের অত্যাচারের বিষয় জ্ঞাত হন; এবং বাদশাহকে অবগত করাইলে বাদশাহ তাঁহার সহিত পর্টগীজদিগের অসদ্ব্যবহার স্মরণ করিয়া কাশীম খাঁকে তাহাদের ধ্বংস করিবার আদেশ দেন। কিন্তু আবদুল হামিদ লাহোরীর বাদশাহ-নামাতে লিখিত আছে যে, বাদশাহই তাঁহাকে উপদেশ দিয়া পাঠান।

† শ্রীপুরকে ষ্টুয়ার্ট ও ইলিয়ট শ্রীরামপুর বলিতে চাহেন। কিন্তু তাহা যুক্তিযুক্ত নহে; শ্রীরামপুরে বাদশাহী রণতরী থাকার উল্লেখ কোথাও নাই, এবং থাকার প্রয়োজনও ছিল না। রাজধানী ঢাকার নিকটেই রণতরী থাকিত। সেই জন্য শ্রীপুর, যাহা পদ্মার তীরবর্ত্তী ও সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী ছিল, [illegible]

পর্টুগীজদিগকে আক্রমণ করিবেন, এইরূপ স্থির হয়। খাজা শের মোহানাতে উপস্থিত হইলে আল্লাইয়ার খাঁ বর্দ্ধমান হইতে যাত্রা করিয়া সপ্তগ্রাম ও হুগলীর মধ্যস্থ হলদীপুর নামক গ্রামে উপস্থিত হন। খাজা শেরও মোহানা হইতে হুগলীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সময়ে বাহাদুর কুম্বু মুকসুদাবাদ হইতে পাঁচ শত অশ্বারোহী ও বহুসংখ্যক পদাতিক লইয়া আল্লাইয়ার খাঁর সহিত যোগদান করেন। তাঁহারা খাজা শের যথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তথায় গমন করিলে, হুগলী ও সমুদ্রের মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ স্থান * সেতু দ্বারা বদ্ধ করিয়া পর্টুগীজদিগের পলায়নপথ রুদ্ধ করা হইল। সুতরাং পর্টুগীজেরা আর কোনরূপে জাহাজে আরোহণ করিয়া সমুদ্রাভিমুখে পলায়ন করিতে পারিল না।

যদিও পর্টুগীজগণের গতিরোধ করিয়া বাদশাহী সৈন্য হুগলী অধিকারের জন্য বিশেষরূপ সচেষ্ট হইয়াছিল, তথাপি তাহারা সহজে পর্টুগীজদিগকে দমন করিতে সক্ষম হয় নাই। হুগলী বন্দরের প্রতিষ্ঠা করিয়া পর্টুগীজেরা তাহাকে এরূপ দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিয়াছিল যে, সহসা তাহার মধ্যে প্রবেশ করা সহজ ছিল না। সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ নদী, ঝিল ও পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ও পর্টুগীজদিগের বুরুজে সুরক্ষিত ও অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। বাদশাহী সৈন্য জলে ও স্থলে হুগলী দুর্গ অবরোধ করিয়া প্রায় সাড়ে তিন মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বাধ্য হয়। এই সময়ের মধ্যে বাদশাহী সেনাপতিগণ দুর্গের বহির্ভাগস্থ নদীর উভয়তীরবর্ত্তী স্থানে এক দল সৈন্য পাঠাইয়া খৃষ্টানদিগকে নিহত ও বন্দী করিয়া আনিতে আরম্ভ করিলেন, এবং পর্টুগীজদিগের নিযুক্ত বহুসংখ্যক বাঙ্গালী নাবিককে ধৃত করিয়া আপনাদের পক্ষভুক্ত করিয়া লইলেন।

ঢাকা হইতে বাদশাহী সৈন্যকে যাত্রা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, তেমনই জলপথে শ্রীপুর হইতে রণতরী-যাত্রার আদেশ দেন। খাজা শের তাঁহার রণতরীসমূহ লইয়া ভাগীরথীর মোহনায় উপস্থিত হন। শ্রীরামপুরে রণতরী থাকিলে পর্টুগীজদিগের পথরোধের জন্য মোহানাতে যাইবার কোনও প্রয়োজন হইত না, এবং তজ্জন্য আল্লাইয়ার খাঁকে অধিক দিন বর্দ্ধমানে অবস্থিতি করিতে হইত না। ফলতঃ, শ্রীপুর ঢাকার নিকটস্থ শ্রীপুর, হুগলীর নিকটস্থ শ্রীরামপুর নহে।

* ষ্টুয়ার্ট এই সঙ্কীর্ণ স্থানটিকে Seerpore লিখিয়া তাহাকে শ্রীরামপুর বলিতে চাহেন। কিন্তু বাদশাহ-নামায় তাহাকে হুগলী ও সমুদ্রের মধ্যস্থ একটি সঙ্কীর্ণ স্থান বলা হইয়াছে।

বাদশাহী সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া পর্টুগীজেরা সময়ে সময়ে আত্মরক্ষার জন্য সামান্য যুদ্ধ করিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে তাহারা সন্ধির প্রস্তাবও করিয়া পাঠায়। তাহারা লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু পর্টুগাল ও গোয়া হইতে সাহায্য পাইবে, এই আশায় তাহারা একেবারে আত্মসমর্পণ করে নাই। তাহাদের প্রায় সাত হাজার বন্দুকধারী সৈন্য মধ্যে মধ্যে গুলি বর্ষণ করিয়া বাদশাহী সৈন্যকে বিচলিত করিয়া তুলিতেছিল। এইরূপে প্রায় সাড়ে তিন মাস অতীত হইয়া গেল।

তাহার পর ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বাদশাহী সেনাপতিগণ দুর্গ অধিকারের জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা সুড়ঙ্গে বারুদ পূর্ণ করিয়া হুগলী দুর্গ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পর্টুগীজদিগের গির্জ্জার নিকট পরিখাটি সঙ্কীর্ণ ছিল। তাঁহারা তথায় সুড়ঙ্গ খনন করিয়া তাহার জল বাহির করিয়া দিলেন, এবং তাহা বারুদে পূর্ণ করিলেন। পর্টুগীজেরা জানিতে পারিয়া দুইটি সুড়ঙ্গ অকর্ম্মণ্য করিয়া দিল। * মধ্যস্থলে যে সুড়ঙ্গটি নিখাত হইয়াছিল, তাহার উপরিস্থ একটি বৃহৎ অট্টালিকায় বহুসংখ্যক পর্টুগীজ অবস্থিতি করিত। বাদশাহী সৈন্যগণ সেই অট্টালিকার সম্মুখে সমবেত হইয়া পর্টুগীজদিগকে তথায় উপস্থিত হইবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে লাগিল। যেই পর্টুগীজেরা তথায় উপস্থিত হইল, অমনই বাদশাহী সৈন্য সুড়ঙ্গে অগ্নিপ্রদান করিল;—অট্টালিকা শূন্যমার্গে উত্থিত হইল, এবং তাহার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বহুসংখ্যক পর্টুগীজ ভূমিসাৎ ও বিধ্বস্ত হইয়া গেল। বাদশাহী সৈন্য অমনই সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ আরম্ভ করিল। কতকগুলি পর্টুগীজ পলায়নের সময় নদীগর্ভে সমাহিত হইল। অনেকে জাহাজে আরোহণ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু খাজাম কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহারাও নিহত হইল।

অনেকগুলি পর্টুগীজ একখানি জাহাজে আরোহণ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু পলায়ন অসম্ভব বুঝিয়া, মুসলমানদিগের হস্তে পতিত হইবার আশঙ্কায় তাহারা জাহাজের বারুদাগারে আগুন লাগাইয়া দিল। জাহাজখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, এবং পর্টুগীজগণও নিহত হইল। আরও

কতকগুলি ক্ষুদ্র নৌকা অগ্নিসংযোগে দগ্ধ হইয়া যায়। ৬০ খানি বড় ডিঙ্গা, ৫৭ খানি ঘেরাব বা মাঝারি নৌকা ও ৩০০ খানি জেলিয়া ডিঙ্গির মধ্যে একখানি ঘেরাব ও দুইখানি জেলিয়া ডিঙ্গি পলাইয়া যায়। নৌসেতুর মধ্যস্থ দুই একখানি নৌকা পর্টুগীজদিগের নৌকার আগুনে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেই রন্ধ্রপথে তাহাদের পলায়নের পথ হইয়াছিল। জলে স্থলে যাহারা পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিল, সকলেই বন্দী হইয়াছিল। অবরোধের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত পর্টুগীজদিগের প্রায় দশ সহস্র লোক নিহত হয়। * বাদশাহী সেনার প্রায় সহস্র সৈন্য জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিল। বাদশাহী সৈন্য ৪৪০০ শত পর্টুগীজ পুরুষ ও রমণীকে বন্দী করিয়াছিল। পর্টুগীজদিগের কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দীকৃত প্রায় ১০০০০ হাজার লোক মুক্তিলাভ করিয়াছিল। পর্টুগীজ বন্দীদিগের মধ্যে প্রায় ৫০০ শত সুন্দর পুরুষ আগ্রায় প্রেরিত হয়। সুন্দরী বালিকারা বাদশাহ ও আমীর ওমরার অন্তঃপুরে স্থানলাভ করে। বালকেরা মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। জেসুইট ও অন্যান্য পাদরীদিগকে মুসলমান হইবার জন্য ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছিল। কিন্তু কয়েক মাস কারাবাসের পর তাহারা মুক্তিলাভ করিয়া গোয়ার অভিমুখে পলায়ন করে। দুর্গে ও নৌকায় যে সমস্ত সম্পত্তি ছিল, বাদশাহী সৈন্যেরা সে সকল অধিকার করিয়া লয়। গির্জ্জার অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর চিত্র ছিন্ন ভিন্ন ও নষ্ট হইয়াছিল।

পর্টুগীজগণ বিতাড়িত হইলে, হুগলী বাদশাহী বন্দরে পরিণত হয়; তথায় এক জন ফৌজদার নিযুক্ত হন। সপ্তগ্রাম হইতে সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারী অতঃপর হুগলীতে আসিয়া বাস করিতে আদিষ্ট হন। তদবধি সপ্তগ্রামের গৌরব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপে বাঙ্গলার পর্টুগীজ প্রাধান্যের ধ্বংস হয়। পূর্ব্ব-বঙ্গে তাহারা আরও কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিল বটে, কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গে তাহাদের আর কোনও নিদর্শন ছিল না। পূর্ব্ব-বঙ্গের চট্টগ্রাম প্রদেশে যাহারা অবস্থিতি করিত, নবাব শায়েস্তা খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করিলে, তাহারাও তথা হইতে বিতাড়িত হয়। এক্ষণে বাঙ্গলায় তাহাদের বিশেষ কোনও নিদর্শন না থাকিলেও, চট্টগ্রাম প্রদেশে তাহাদের কিছু কিছু চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

গৌড়ের ইতিহাস।

অঙ্গ, বঙ্গ, রাঢ় ও সুহ্ম গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। কখনও কখনও মগধ ও মিথিলা বা বিদেহ গৌড়ের অন্তর্গত হইত। অতএব গৌড়ের ইতিহাস জানিতে হইলে এ সকল দেশেরও কিছু কিছু বিবরণ জানা আবশ্যক। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর, কলিঙ্গ, ত্রিপুরা ও উড়িষ্যা গৌড়ের নিকটবর্ত্তী। এই সকল দেশের ইতিহাসের সহিত গৌড়রাজ্যের ইতিহাসের সংস্রব আছে; অতএব ইহাদের কিছু কিছু বিবরণ লিখিয়া গৌড়ের ইতিহাস আরম্ভ করা যাইতেছে।

পূর্ব্বে পুণ্ড্রবঙ্গাদি রাজ্যে আর্য্যজাতির বাস ছিল না। বেদের সংহিতাভাগে বঙ্গাদি দেশের নাম নাই। অথর্ব্ব বেদে মগধের বগধ এবং ঋক্-সংহিতায় কীকট নাম আছে। ইহাতে বুঝা যায়, বৈদিক কালের পর অঙ্গাদি দেশে আর্য্যজাতির বসতি হয়। অঙ্গদেশ হইতে আর্য্যসভ্যতা পুণ্ড্র-বঙ্গ-সুহ্মাদি দেশে বিস্তৃত হয়। সে কত কালের কথা, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। পুরাণে অঙ্গরাজগণের পরিচয় আছে। কিন্তু পুণ্ড্রবঙ্গাদি দেশের রাজবংশ ও রাজগণের কোনও বিশেষ কথা নাই।

অঙ্গরাজ্য।

অথর্ব্ব-সংহিতায় অঙ্গের নাম আছে। (১) পুরাণে দৃষ্ট হয়, আর্য্যাবর্ত্তে গঙ্গাতীরে বলি নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। ইনি যযাতি-তনয় পুরুর দ্বাবিংশতম অধস্তন পুরুষ। বৈদিক ঋষি দীর্ঘতমা বলির সমসাময়িক। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যালের মতে, দীর্ঘতমা খৃঃ পূঃ ১৬৯০ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। বলির অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও কলিঙ্গ নামে পাঁচটি পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নামানুসারে তাঁহাদের স্থাপিত রাজ্যগুলিরও অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম ও কলিঙ্গ নাম হয়। (২) রামায়ণে আছে, হরকোপানলে মদন ভস্মীভূত হইয়া যে স্থানে অঙ্গত্যাগ করেন, সে স্থানের অঙ্গ নাম হয়। মহাভারতের আদিপর্ব্বে আছে, রাজা উপরিচরবসুর পুত্র বৃহদ্রথের অধীন থাকিয়া বৃহদ্রথের কনিষ্ঠ অঙ্গ যে স্থান শাসন করিতেন, তাহার অঙ্গ নাম হয়। অতএব, বলি

---

(১) অথর্ব্ব বেদ; ৫।২২।১৪।

(২) অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ। তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনাম

রাজার পুত্র অঙ্গের নামানুসারে যে অঙ্গদেশের নাম হইয়াছে, এই মত প্রাচীন-কালেও সর্ব্ববাদিসম্মত ছিল না। তবে ইহা সম্ভব যে, বালেয় ক্ষত্রিয়গণ বর্ত্তমান বালিয়া জেলা হইতে আসিয়া অঙ্গদেশে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার করেন। রামায়ণ পাঠ করিলে বোধ হয়, পূর্ব্বে অঙ্গদেশ যেন কিছু পশ্চিম দিকে বিস্তৃত ছিল। মহাভারত-যুগে যেন কিছু পূর্ব্ব দিকে সরিয়া আসিয়াছিল। রামায়ণে অঙ্গরাজ লোমপাদ-দশরথের নাম আছে। ইনি অযোধ্যাপতি দশরথের সখা ছিলেন। লোমপাদ বলি রাজো অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ। লোমপাদ অযোধ্যা-পতি দশরথের কন্যা শান্তাকে পালন করেন। বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ শান্তার পাণিগ্রহণ করেন।

মালিনী ও চম্পা অঙ্গরাজ্যের দুটি প্রধান নগর ছিল। কেহ কেহ মালিনী ও চম্পাকে এক নগর বলিয়া গিয়াছেন (ত্রিকাণ্ডশেষ)। লোমপাদের প্রপৌত্র চম্পের নামানুসারে অঙ্গদেশের রাজধানীর চম্পা নাম হয়। ভাগবতের-মতে, ইক্ষ্বাকুবংশীয় হরিতের পুত্র চম্প, চম্পা নগরী স্থাপিত করেন। বনপর্ব্বে তীর্থবর্ণনপ্রসঙ্গে পুলস্ত্য ঋষি ভীষ্মদেবকে চম্পা নগরীর নিকটবর্ত্তী ভাগীরথী ও চম্পা নদীর সঙ্গমস্থলে প্লক্ষ নামক তীর্থে স্নান করিতে বলিয়াছেন। ইহার পর চম্পা জৈনতীর্থ হয়। উপবাইসূত্র নামক জৈন উপাঙ্গে অঙ্গের রাজা শ্রেণিক ও তৎপুত্র কোণিতের নাম আছে। কোনও কোনও জৈন গ্রন্থে এই কোণিককে চম্পা নগরীর স্থাপনকর্ত্তা বা সংস্কারকর্ত্তা বলা হইয়াছে। ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানের মতে, চম্পার অপর নাম পুষ্পবতী।

হরিবংশে অঙ্গদেশের অঙ্গ, দধিবাহন, দিবিরথ, ধর্ম্মরথ, চিত্ররথ, দশরথ-লোমপাদ, চতুরঙ্গ, পৃথুলাক্ষ, চম্প, হর্য্যাক্ষ, ভদ্ররথ, বৃহৎকর্ম্মা, বৃহদ্দর্ভ, বৃহন্নলা, জয়দ্রথ, দৃঢ়রথ, বিশ্বজিৎ ও কর্ণ, এই অষ্টাদশ রাজার নাম আছে।

পূর্ব্বকালে পৌরব নামক রাজা অঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন। লিখিত আছে, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়া লক্ষ অশ্ব, সহস্র গজ, সহস্র গো ও লক্ষ স্বর্ণমালা দান করেন। সমুদায় আর্য্যভূমিতে তিনি দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

জৈন গ্রন্থে চম্পার দধিবাহন ও শ্রীপাল নামক জৈন-রাজার উল্লেখ আছে।

চম্পের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র বৃহন্নলার বিজয় নামক পুত্র জন্মে। তিনি ব্রহ্ম-ক্ষত্রোত্তর বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। ইনি অতি প্রসিদ্ধ রাজা

সমাজে নিন্দিত হন। অধিরথ কর্ণকে পালন করেন বলিয়া লোকে কর্ণকে সূতপুত্র বলিত।

অঙ্গরাজ্য কৌরব-সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। দুর্য্যোধন হস্তিনানগরবাসী কর্ণকে অঙ্গরাজ্য প্রদান করেন। কর্ণ অঙ্গরাজ্যে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন না। তিনি হস্তিনায় থাকিয়া পাণ্ডবদের বিপক্ষে কৌরবগণের সহায়তা করিতেন। মগধেশ্বর জরাসন্ধ কর্ণের সহিত দ্বৈরথ-যুদ্ধে সন্তোষলাভ করিয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হন। এক জন ম্লেচ্ছ-রাজা কর্ণের অধীন ছিলেন। মহাভারতে কর্ণের বসুসেন ও বৃষ নামে দুই পুত্র দেখা যায়। কুরু-ক্ষেত্র যুদ্ধে কর্ণ ও তাঁহার বৃষসেন ও বৃষকেতু নামক পুত্রদ্বয় নিহত হন। কর্ণের আরও কয়েকটি পুত্র ছিলেন। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধাবসানে তাঁহারা পাণ্ডবদিগের স্নেহভাজন হইয়া অঙ্গরাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। কর্ণবংশীয়েরা দানশক্তির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রাঢ়দেশ ও মধ্যবাঙ্গালার উত্তরাংশ কর্ণবংশীয়দিগের অধীন ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে ষ্টেশনের সুল্‌তানগঞ্জের অদূরে পশ্চিম দিকে কর্ণগড় নামক দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

কর্ণের সময় অঙ্গরাজ্যের আচার-ব্যবহার আর্য্যগণের নিকট প্রশংসনীয় ছিল না। মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে শল্যের সহিত কর্ণের বচসাকালে উভয়ে উভয়ের রাজ্যের লোকের আচার ব্যবহারের নিন্দা করিয়াছেন। অথর্ব্ব-সংহিতায় নিন্দাচ্ছলে অঙ্গের নাম আছে।

বুদ্ধদেবের সময়ে আর্য্যাবর্ত্তে অঙ্গ, মগধ, কাশী, কোশল, বজ্জি, মল্ল, চেদি, বৎস, কুরু, পঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, অশ্বক, অবন্তী, গান্ধার ও কাম্বোজ নামে ষোলটি রাজ্য ছিল। বুদ্ধদেবের সময় ব্রহ্মদত্ত অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। বুদ্ধদেব পরিভ্রমণ করিতে করিতে চম্পার নিকটবর্ত্তী ভোদ্দিও নামক নগরের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। অঙ্গের রাজধানী গকুরা সরোবরতীরে পরিব্রাজকগণের অবস্থিতির জন্য এক আশ্রম নির্ম্মিত হইয়াছিল। পরি-ব্রাজকেরা বর্ষাকালে তথায় অবস্থান করিয়া চাতুর্ম্মাস্য করিতেন। এই আশ্রম বহুকাল প্রসিদ্ধ ছিল। কাদম্বরী ও দশকুমারচরিতে এই পরিব্রাজকাশ্রমের উল্লেখ আছে। চম্পানগরে দ্বাদশতীর্থঙ্কর বাসুপূজ্যের জন্ম হয়। অশোকের মাতা সুভদ্রাঙ্গী চম্পার এক ব্রাহ্মণকন্যা। চম্পাবাসী জিন নামক বৌদ্ধ পণ্ডিত "লঙ্কাবতারসূত্র" নামক এক দর্শন-গ্রন্থের রচনা করেন। ইনি

চম্পার বণিকগণ চম্পা হইতে গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রপথে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন। বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে।

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্ব হইতে মগধ ও অঙ্গরাজ্যে বিবাদ চলিতেছিল। অবশেষে অঙ্গরাজ্য মহাপ্রতাপশালী অজাতশত্রুর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া যায়।

পৌরাণিক যুগের শেষভাগে অঙ্গরাজ্যের সীমা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের সপ্তম পটলে অঙ্গরাজ্যের এইরূপ সীমা আছে,—

বৈদ্যনাথং সমাসাদ্য ভুবনেশান্তগঃ শিবে।
তাবদঙ্গাভিধো দেশো যাত্রায়াং ন হি দুষ্যতি ॥

মহারাজ স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে চম্পানগরে কর্ণসেন নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। স্কন্দগুপ্ত ৪৫০ খৃঃ হইতে ৪৬৮ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কর্ণসেন স্কন্দগুপ্তের সখা ছিলেন। ৩৮০ খৃষ্টাব্দে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদেবের পুত্র সত্যসেন বা সূর্য্যসেন অঙ্গদেশের রাজা ছিলেন। হূনদিগের কর্ত্তৃক গুপ্ত সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইলে, হূনেরা উত্তর-ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। বামন পুরাণে আছে, নয় জন নাগ চম্পাপুরী ভোগ করিলেন। এখানে খুব সম্ভব হূনদিগকে নাগ বলা হইয়াছে। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর আর অঙ্গরাজ্যের বিশেষ কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না।

বিদেহ, বা মিথিলা।

বিদেহ প্রাচীন রাজ্য। আর্য্যগণ সরস্বতীতীর হইতে আসিয়া এখানে উপনিবিষ্ট হন। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, বিদেহমাধব পুরোহিত রহুগণ ঋষির সহিত সদানীরা অতিক্রম করিয়া যে দেশে আসিয়া বাস করেন, তাহার বিদেহ নাম হয়। এই সদানীরা কোশল রাজ্যের পূর্ব্বসীমাস্থ কান নদী। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয়বৃত্তান্ত-পাঠে বোধ হয়, এই নদী সরযূ ও গণ্ডকীর মধ্যবর্ত্তিনী। জর্ম্মন্ পণ্ডিত ওয়েবরের মতে, গণ্ডকীর নাম সদানীরা। ওয়েবরের মত ঠিক নহে। “গণ্ডকীঞ্চ মহাশোণং সদানীরাং তথৈব চ। একপর্ব্বতকে নদ্যঃ ক্রমেণেব তরন্তি তে” ॥ (সভাপর্ব্ব ; ১৯৭ অধ্যায়)। এখানে স্পষ্টই গণ্ডকী ও সদানীরাকে পৃথক্ নদী বলা হইয়াছে। অমরকোষ ও হেমকোষের মতে, করতোয়ার নাম সদানীরা। রামায়ণ ও মহাভারতে বিদেহ রাজ্যের নানা বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। এখানকার প্রাচীন রাজ-

ছিলেন। এই রাজ্যের নামান্তর মিথিলা। এখান হইতে আর্য্যগণ কামরূপ অঞ্চলে গিয়া উপনিবিষ্ট হন। বোধ হয়, সমুদায় উত্তরবঙ্গে বিদেহ হইতে আর্য্যোপনিবেশ বিস্তৃত হয়। ভবিষ্যপুরাণে বিদেহের তীরভুক্তি নাম দৃষ্ট হয়। অন্য কোনও প্রাচীন পুরাণে ঐ নাম নাই। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে, গণ্ডকীতীর হইতে চম্পকারণ্য পর্য্যন্ত স্থানকে তৈরভুক্ত ও তাহার পূর্ব্বভাগকে বিদেহ বলিত।

জনকবংশীয় শেষ রাজার নাম সুমিত্র। জনক-বংশের অনেক রাজার নাম মহাভারতে পাওয়া যায়। ন্যায়দর্শনকার গৌতম বা গোতম মুনি মিথিলা দেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। জনক-বংশের পর কোন্ কোন্ বংশ কত দিন বিদেহে রাজত্ব করেন, পুরাণে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। বিদেহ প্রাচীনকাল হইতে উত্তরাঞ্চলবাসী পর্ব্বতীয় জাতি কর্ত্তৃক মধ্যে মধ্যে আক্রান্ত হইত। মহারাজ অজাতশত্রুর পূর্ব্বেই এ দেশে লিচ্ছবি বা লিচ্ছিবিদের রাজ্য স্থাপিত হয়। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের অনুমান, লিচ্ছিবিগণ ভারতের বহির্ভাগ হইতে বিদেহে আগমন করে। লিচ্ছবিরা মধ্যপথে কোনও চিহ্ন না রাখিয়া কিরূপে এত দূর পূর্ব্বে আসিয়া পড়িল, ইহার কোনও সদুত্তর না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা এ মত গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। লিচ্ছিবিদের রাজ্য কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক অংশ এক প্রকার সাধারণতন্ত্রপ্রণালী মতে শাসিত হইত। বহিঃশত্রুর আক্রমণকালে সকলে মিলিয়া প্রবলপরাক্রম প্রকাশ করিত। লিচ্ছিবিগণ ব্রাহ্মণদের মতাবলম্বী ছিল না। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ-রচিত গ্রন্থমাত্রে লিচ্ছিবিগণের নিন্দাবাদ দৃষ্ট হয়। লিচ্ছিবিগণ বুদ্ধদেবের অত্যন্ত ভক্ত ছিল। অজাতশত্রু তাহাদের দেশ অধিকার করিবার জন্য ছল ও বলপ্রয়োগের ক্রটী করেন নাই। তিনি পরিশেষে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

বহুদিন পরে এই রাজ্য হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া যায়। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তদীয় অমাত্য, চীনরাজদূত ওয়াং হিউএনসীর সঙ্গীদিগের প্রাণবধ করিলে, ওয়াং নেপালে পলায়ন করেন। তিব্বতরাজ চীনসম্রাটের জামাতা ছিলেন। তাঁহার সেনাগণ প্রতিহিংসাসাধনের জন্য ত্রিহুত নগর আক্রমণ করিয়া প্রায় দুই সহস্র লোকের শিরচ্ছেদ করে, এবং দশ সহস্র লোককে নদীতে ডুবাইয়া মারে। পাঁচ শত আশীটি নগরের লোক হীনতা স্বীকার করিলে, এই দৌরাত্ম্য নিবারিত হয়। ইহার পর বিদেহ কখনও কখনও নেপালের অধীন হইত, কখনও কখনও স্বাধীনতা ভোগ করিত।

ক্রমশঃ।

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

বৈজ্ঞানিক সার-সংগ্রহ।

১। হ্যালির ধূমকেতু।

এই বৎসর শীতের শেষে জ্যোতিষী হ্যালির আবিষ্কৃত বৃহৎ ধূমকেতুটি পৃথিবীর আকাশে দেখা দিবে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মনে করিতেছেন, অন্ততঃ দুই মাস ধরিয়া আমরা উহাকে দেখিতে পাইব। এখন এটি প্রচণ্ডবেগে সূর্য্যের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে।

খালি চোখে দেখিবার অনেক পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ধূমকেতুটিকে দূরবীণে দেখিতে পাইবেন, এবং দূরবীণে দেখা দিবার অনেক পূর্ব্বে সেটি ফটোগ্রাফের ছবিতে আত্মপরিচয় দিবে।

জ্যোতিষিক ব্যাপারে ফটোগ্রাফের ব্যবহার প্রচলন হওয়ায় একটা খুব সুবিধা হইয়া গিয়াছে। যে সকল দূরবর্ত্তী জ্যোতিষ্ককে দূরবীণেও দেখা যায় না, তাহাদের ক্ষীণ আলোক দূরবীণের সহিত সংলগ্ন ফটোগ্রাফের কলে আসিয়া পড়িলে, জ্যোতিষ্কগুলির ছবি আপনা হইতেই অঙ্কিত হইয়া যায়। এই উপায়ে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ধূমকেতু ব্যতীত আরও যে কত গ্রহ, উপগ্রহ, নীহারিকা ও নূতন নক্ষত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

যাহা হউক, আজকাল দেশবিদেশের জ্যোতিষিগণ হ্যালির ধূমকেতুটিকে দেখিবার জন্য ফটোগ্রাফের যন্ত্র ও দূরবীণ খাটাইয়া রাত্রির পর রাত্রি আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। শীঘ্রই এক দিন ফটোগ্রাফের চিত্রে উহা ধরা দিবে।

কেবল আকারে বৃহৎ বলিয়া হ্যালির ধূমকেতু প্রসিদ্ধ নয়। ধূমকেতু সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব এই জ্যোতিষ্কটির পর্য্যবেক্ষণে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার এত খ্যাতি। প্রাচীন বৈজ্ঞানিকগণ মনে করিতেন, ধূমকেতুমাত্রই হঠাৎ সূর্য্যের আকর্ষণের সীমার মধ্যে আসিয়া পড়িলে, কেবল একমাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়াই বুঝি তাহারা সৌরজগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। এই কথাটির উপর প্রসিদ্ধ ইংরাজ জ্যোতিষী হ্যালি সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন নাই। গণিতের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তিনি দেখাইয়াছিলেন, মহাকাশের কোনও ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক সূর্য্যের আকর্ষণে ধরা দিয়া, যদি বৃহস্পতি ও শনি প্রভৃতি বড় বড় গ্রহের টানে অগ্রবেগসম্পন্ন হইয়া পড়ে,

তবে তাহার আর সৌরজগৎ হইতে পলায়ন করিবার উপায় থাকে না। তখন সেই বন্দী জ্যোতিষ্কটিকে আমাদের পৃথিবীরই মত এক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

হ্যালি এই তত্ত্বটি জানিতে পারিয়া ১৫৩১, ১৬০৭, এবং ১৬৮২ অব্দের তিনটি ধূমকেতুকে একই জ্যোতিষ্ক বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, পৃথিবী যেমন এক বৎসরে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আসে, এই ধূমকেতুটি সেই প্রকার প্রায় ৭৬ বৎসরে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে। হ্যালির গণনা যে সম্পূর্ণ সত্য, ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে সেই ধূমকেতুরই পুনরাগমন দেখিয়া বৈজ্ঞানিকগণ তাহা স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন। ইহার পর ১৮৩৫ অব্দে তাহাকে আর একবার দেখা গিয়াছিল। আবার তাহার প্রদক্ষিণকাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং ১৯১০ সালের প্রথমে হ্যালির ধূমকেতুটিকে নিশ্চয়ই দেখা যাইবে।

ধূমকেতুগুলি যখন সূর্য্য হইতে অনেক দূরে থাকে, তখন তাহাদিগকে ধূমকেতু বলিয়া চিনিয়া লওয়া বড়ই কঠিন হয়। সে সময় দূরবীণে বা ফটোগ্রাফের চিত্রে এগুলিকে কেবল অনুজ্জ্বল মেঘখণ্ডের ন্যায়ই দেখায়। তাহার পর যতই সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করে, ততই সূর্য্যের আকর্ষণে ও তাপে উহারা বৃহৎ-আকার-বিশিষ্ট হইয়া দাঁড়ায়, এবং তাহাদের খণ্ডদেহ বাষ্পীভূত হইয়া যায়। এই বাষ্পাবৃত দেহ লইয়া সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলেই ইহাদের পুচ্ছ দেখা দেয়। সূর্য্যের আকাশের বিদ্যুৎ যখন ধূমকেতুর লঘু বাষ্পরাশিকে তাড়াইতে আরম্ভ করে, তখন সেই বাষ্পই পুচ্ছের রচনা করে।

সুতরাং বর্ত্তমান বৎসরে আমরা যখন দূরবীণে বা ফটোগ্রাফের চিত্রে হ্যালির ধূমকেতুর সন্ধান পাইব, তখন তাহাকে সপুচ্ছ দেখিব না। কালক্রমে সূর্য্যের নিকটে আসিয়া যখন সেটি আমাদের খালি চোখে ধরা দিবে, তখনই উহার বৃহৎ পুচ্ছ দেখা যাইবে।

২। ব্যাধির প্রতিকার।

ব্যাধিস্পর্শরহিত প্রাণী দুর্ল্লভ। সুদীর্ঘ জীবনে কখনও পীড়াভোগ করেন নাই, এইরূপ সৌভাগ্যশালী দুই একজন লোকের কথা শুনা গিয়াছে বটে,

পারেন নাই। সুতরাং পীড়াকে প্রাণীর একটা প্রকৃতিগত জিনিস বলা যাইতে পারে।

সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্র-চিকিৎসক সার ফ্রেডরিক্ ট্রেভস্‌ও ব্যাধিমাত্রকেই প্রাণি-দেহের একটা স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছেন, এবং ব্যাধিপ্রশমনের সহস্র সুব্যবস্থা দেহেই আছে, তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছে।

প্রকৃতির কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে শৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খলাকে পাশা-পাশি দেখিতে পাওয়া যায়। বায়ু-মেঘ-বিদ্যুতের তাণ্ডব-নৃত্যের মধ্যে আমরা প্রকৃতির যে মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহাই পরক্ষণে শান্ত ও প্রসন্নমুখে ঘরের লোকের ন্যায় আমাদের সুখশান্তির বিধান করিতে থাকে। প্রকৃতির এই যুগল মূর্ত্তি ছোট বড় সকল কাজে আমাদিগকে নিত্যই দেখা দিতেছে। প্রকৃতির ভাণ্ডারে শক্তিসম্পদের অভাব নাই। সেই স্তূপীকৃত শক্তিকে বন্ধনমুক্ত করিলে নিমেষেই প্রলয় উপস্থিত হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি তাহা করেন না। উদ্দামশক্তিকে শৃঙ্খলিত রাখিয়াই তিনি নিজের প্রদত্ত বেদনাকে নিজেই সস্নেহে মুছিয়া দেন।

এই সকল দেখিয়াই সার ফ্রেডরিক্ বলিতেছেন, মানুষ যে পীড়াগ্রস্ত হইয়া তাহার প্রতীকারের জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, তাহা নিতান্ত অনা-বশ্যক ব্যাপার। যে প্রকৃতি প্রাণীকে ব্যাধিগ্রস্ত করে, সেই প্রকৃতিই ব্যাধিশান্তির জন্য শরীরে নানাপ্রকার অত্যাশ্চর্য্য সুব্যবস্থা করিয়া রাখে।

একটা উদাহরণ লওয়া যাউক। মনে করা যাউক, যেন কোনও ব্যক্তির হাত ছুরিকার আঘাতে ক্ষতযুক্ত হইয়াছে, এবং পরে হাতখানি ফুলিয়া উঠিয়াছে। বায়ুতে সর্ব্বদাই নানাপ্রকার ব্যাধির জীবাণু ভাসিয়া বেড়ায়। কোনও সুযোগে যদি ইহারা প্রাণিশরীরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, তবে শীঘ্রই দেহে ব্যাধির লক্ষণ দেখা দেয়। আধুনিক শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে আহত স্থান ফুলিয়া উঠাও একপ্রকার জীবাণুর কাজ। প্রথমে দুই চারিটি জীবাণু ক্ষতস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে; তাহার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে বংশবৃদ্ধি দ্বারা তাহারাই সংখ্যায় কোটী কোটী হইয়া দেহের আহত অংশকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। জীবাণুগণ প্রত্যক্ষভাবে শরীরের কোনও অনিষ্ট করে না। উহাদের অতিসূক্ষ্ম শরীর হইতে যে একপ্রকার বিষময় রস (Toxin) নির্গত হয়, তাহাই ব্যাধির মূল কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

এখন তাহা দেখা যাউক। শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, জীবাণুরা বিষ উৎপন্ন করিতে আরম্ভ করিলেই শরীরের নানা অংশ হইতে রক্তস্রোত আসিয়া ক্ষতস্থানে সঞ্চিত হইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আহত অংশ স্ফীত ও বেদনাযুক্ত হইয়া দাঁড়ায়। আমরা তখন বেদনাকেই পীড়া বলি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, বেদনাটা ব্যাধির প্রতীকারের আয়োজন-মাত্র।

ইহার পর উক্ত সঞ্চিত রক্ত যে সকল কার্য্য করে, তাহা বড়ই আশ্চর্য্য-জনক। শত্রুসৈন্য কর্তৃক দেশ আক্রান্ত হইলে, দেশের সৈন্যগণ যেমন প্রাণপাত করিয়া শত্রুদিগকে বিনষ্ট করে, আহত স্থানের রক্তও শত্রু জীবাণু-গুলিকে ঠিক সেইপ্রকারে নাশ করে। বিজ্ঞানজ্ঞ পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন, অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দ্বারা জীবদেহের রক্ত পরীক্ষা করিলে তাহাতে সর্ব্বদাই সহস্র সহস্র শ্বেতকণা এবং রক্তকণা ভাসমান দেখা যায়। রক্তের এই শ্বেতকণাগুলি জীবাণুর পরম শত্রু। কাজেই জীবাণু সকল ক্ষতস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, শ্বেতকণিকাগুলির সহিত তাহাদের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া যায়। উভয় পক্ষ হইতে কোটী কোটী সৈন্য একত্রিত হইয়া ক্ষতস্থানকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়া তুলে। যুদ্ধক্ষেত্রে রক্তপাত অনিবার্য্য। এখানেও শত্রু মিত্র উভয় দলের বহু সৈন্য হতাহত হইয়া থাকে, এবং এই সকল হত সৈন্যদিগের দেহই পূযের আকারে ক্ষতস্থান হইতে নির্গত হয়।

যুদ্ধে সন্ধি না হইলে কোনও এক পক্ষ জয়ী হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে। দেহশত্রু ও দেহরক্ষকদিগের পূর্ব্বোক্ত সংগ্রামে সন্ধি অসম্ভব। বিজয়লক্ষ্মীকে কাজেই কোনও এক দিকে গিয়া দাঁড়াইতে হয়। দেহরক্ষক শ্বেতকণিকাগুলি জয়যুক্ত হইলেই দেহীর পরম সৌভাগ্য; নচেৎ জীবাণু সকল সেই ক্ষুদ্র ক্ষতটিকে বাড়াইয়া দেহের সুস্থ অংশকেও আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। তখন যে সকল স্থান দিয়া সাধারণতঃ বিশুদ্ধ রক্ত যাতায়াত করে, জীবাণুগুলি সেই সকল স্থানে পাহারায় বসিয়া যায়। ক্ষতের বৃদ্ধি হইলে বাহুমূল, গণ্ডস্থল প্রভৃতি এই কারণে ফুলিয়া উঠে।

আমরা কেবল একটিমাত্র উদাহরণ দিলাম। অনুসন্ধান করিলে ব্যাধি-মাত্রেরই প্রতীকারের জন্য আমাদের শরীরে এই প্রকার নানা ব্যবস্থা দেখা যায়। সার্ ফ্রেডরিক্ এই সকল দেখিয়াই ব্যাধির ঔষধ আবিষ্কারের জন্য

যখন দুর্ব্বল রোগীর রক্তে সেই দেহরক্ষক শ্বেতকণার অভাব হয়, তখন ঔষধ-প্রয়োগে রোগজীবাণুগুলিকে নষ্ট করা ব্যতীত আর অন্য উপায় থাকে না। তদ্ব্যতীত ব্যাধির ভোগকালের হ্রাস ও যন্ত্রণানিবারণেও ঔষধের উপযোগিতা বড় অল্প নয়। সুতরাং ঔষধ-প্রয়োগ-পদ্ধতিকে যে কেহ হঠাৎ নির্ম্মূল করিতে পারিবেন, আপাততঃ তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

৩। স্বপ্নতত্ত্ব।

আমরা "বোধোদয়ে" পড়িয়াছিলাম, "স্বপ্ন অমূলক চিন্তামাত্র"। ভূতুড়েদিগের হাতে পড়িয়া সেই স্বপ্নই কতকটা সমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন আবার বৈজ্ঞানিকগণ তাহাকে সম্পূর্ণ সমূলক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

প্রতি রাত্রিতে আমরা যে সকল অদ্ভুত স্বপ্ন দেখি, তাহাদের এক তালিকা রাখিয়া দিলে, বন্য পশু কর্ত্তৃক তাড়িত হওয়া এবং দৌড়াইতে গিয়া পড়িয়া যাওয়ার স্বপ্নই বোধ হয় সংখ্যায় বারো আনা হইয়া দাঁড়ায়। বিড্‌নেল্ (Beadnell) নামক জনৈক বৈজ্ঞানিক ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদের সাহায্যে এই সকল অদ্ভুত স্বপ্নের কারণ নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন,—আমরা সৌভাগ্যক্রমে জ্ঞানবুদ্ধিতে উন্নত ও সুসভ্য হইয়াছি সত্য, কিন্তু তথাপি অতি প্রাচীন বন্য পূর্ব্বপুরুষগণের শোণিত এখনও আমাদের দেহে প্রবাহিত হইতেছে, এবং তাহাদের দুঃখ, ক্ষোভ, ভয়, ক্রোধ প্রভৃতি সংস্কারগুলি আমাদের মস্তিষ্কের অতি সূক্ষ্ম কোষগুলিতে সঞ্চিত রহিয়াছে। আমরা দিবসে নানা কাজে মস্তিষ্ককে নিযুক্ত রাখি, তখন কোষগুলির ঐ সকল স্বাভাবিক সংস্কার সুপ্তাবস্থায় থাকিয়া যায়। নিদ্রাকালে দৈনিক কাজকর্ম্মের চিন্তা মস্তিষ্কে থাকে না। কাজেই তখন সেই পুরুষপরম্পরাগত সুপ্ত সংস্কারগুলি জাগিয়া উঠিয়া আমাদিগকে স্বপ্ন দেখাইতে আরম্ভ করে। আমাদের অতি প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণকে আত্মরক্ষার জন্য প্রায়ই বন্যপশুদিগের সহিত সংগ্রাম করিতে হইত, এবং কখনও কখনও তাহাদের আকস্মিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পলাইতেও হইত। সুতরাং সেই সকল মজ্জাগত সংস্কার যে আমাদিগকে এইরূপ বিভীষিকা দেখাইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

উচ্চস্থান হইতে নীচে পড়িয়া যাওয়ার স্বপ্নও আমরা বড় কম দেখি না। বিড্‌নেল্ সাহেব অভিব্যক্তিবাদের সাহায্যে ইহারও এক ব্যাখ্যান দিবার

কারণে বানুরে বুদ্ধি ও বানুরে অভিজ্ঞতার একটা স্থায়ী রকমের ছাপ মানুষের মস্তিষ্কে রহিয়া গিয়াছে, ইঁহার এইরূপ বিশ্বাস হইয়াছে। শাখী পূর্ব্ব-পুরুষগণ গৃহনির্ম্মাণের কৌশল জানিত না। বৃক্ষই তাহাদের আবাস ছিল; এবং বৃক্ষ বা অপর কোনও উচ্চস্থান হইতে আকস্মিক পতনের আশঙ্কাটাই সর্ব্বদা তাহাদের মনে জাগিত। বৈজ্ঞানিক বিড্‌নেল্ বলিতেছেন, উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যাইবার এই আশঙ্কাটাই পুরুষানুক্রমে সংক্রমিত হইয়া অদ্যাপি আমাদিগকে নিদ্রাকালে বিভীষিকা দেখাইতেছে।

৪। দুগ্ধাধার।

খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ জিনিসটা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। বিশুদ্ধ দুগ্ধ যেমন স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী, অবিশুদ্ধ দুগ্ধ সেই প্রকার স্বাস্থ্যনাশক। ডিপ্‌থিরিয়া, যক্ষ্মা, টাইফয়েড্ ও বিসূচিকা প্রভৃতি অনেক পীড়ার জীবাণু দুগ্ধের সহিত মিশিয়া আমাদের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, আমরা এখানে পল্লীগ্রামের দুগ্ধের কথা বলিতেছি না। সেখানকার গো-শালাগুলি আজও দুই বেলা সযত্নে পরিষ্কৃত হয়, এবং ঘুঁটের ধোঁয়ায় তাহাদের ভিতরকার বায়ুও বিশুদ্ধ থাকে। কাজেই গোশালার বিশুদ্ধ বায়ুতে বা পীড়াবীজবর্জ্জিত মুক্ত আঙ্গিনায় গো-দোহন করিলে, দুগ্ধ বিষাক্ত হইবার কোনও আশঙ্কা থাকে না। আধুনিক বড় বড় সহরের অন্ধকারাচ্ছন্ন গো-শালার রুদ্ধ বায়ুতে যে সকল পীড়াবীজ থাকে, তাহাই সহরের দুগ্ধকে বিষাক্ত করিয়া তোলে। যাহা হউক, সহরের দুগ্ধকে বিশুদ্ধ রাখা আজকাল প্রকাণ্ড সমস্যায় পরিণত হইয়াছে।

সম্প্রতি কয়েক জন ফরাসী বৈজ্ঞানিক দুগ্ধের নানা পরীক্ষা করিয়া বলিতেছেন,—এই জিনিসটিকে বিশুদ্ধ রাখা এক প্রকার অসম্ভব। প্রকৃতি স্বহস্তে প্রস্তুত এই খাদ্যটিকে স্তনে সঞ্চিত রাখিয়া, শিশু স্তনে মুখ দিয়া দুগ্ধপান করিবে, এই প্রকার বিধান করিয়াছেন। সুতরাং বলপূর্ব্বক আধারচ্যুত করিয়া অপরিচ্ছন্ন বায়ুতে উন্মুক্ত রাখিলে যদি জিনিসটা খারাপ হইয়া যায়, তাহা হইলে সে জন্য প্রকৃতিকে দোষ দেওয়া যায় না।

দুগ্ধ যখন স্তনে সঞ্চিত থাকে, তখন তাহাতে আলোক লাগে না। ইহা দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত বৈজ্ঞানিকদিগের সন্দেহ হইয়াছিল, আলোকই দুগ্ধকে বিকৃত করে। একই দুগ্ধকে অন্ধকার ঘরে ও আলোকে রাখিয়া পরীক্ষা করায়, তাঁহারা অন্ধকারের দুগ্ধকেই বিশুদ্ধ দেখিয়াছিলেন। এই পরীক্ষার ফলে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া পরীক্ষকগণ শিশুদিগের পেয় দুগ্ধ কোনও প্রকার রঙ্গিন কাচপাত্রে রাখিবার পরামর্শ দিতেছেন।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

জীব-বস্তু। *

এই বস্তু কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু ইহাকে বিশ্লেষণ করিলে অঙ্গার, উদযান, অম্লযান, যবক্ষারযান ইত্যাদি পরিচিত জড়-বস্তুই পাওয়া যায়। আর, কোনও জীবদেহ পচিলে, তাহাও ঐ সকল, অথবা অন্যান্য জড়-বস্তুতে পরিণত হয়। এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, যাহা বিশ্লেষণ করিলে (অথবা বিশ্লিষ্ট হইলে) কতিপয় জড়বস্তুমাত্র পাওয়া যায়, তাহা ঐ সকল জড়-বস্তু দ্বারাই গঠিত কি না? অর্থাৎ, জড়-বস্তুর একত্র মিলন হইতেই জীব-বস্তু জাত হইয়াছে কি না? জড়-জগতে দেখা যায় যে, যাহা বিশ্লিষ্ট হইলে অন্যান্য বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল বস্তুকে পুনর্মিলিত করিতে পারিলে ঐ মূল-বস্তুই গঠিত হয়। জলের বিশ্লেষণ করিয়া উদযান ও অম্লযান পাওয়া যায়; আবার উদযান ও অম্লযানের রাসায়নিক সংযোগে জল প্রস্তুত করা যায়। এ নিয়ম জড়-জগতে সত্য, তাহা বলিবার অধিকার আছে। কিন্তু জীব-জগতেও কি এই নিয়ম সত্য নহে? জীব-বস্তু যখন বিশ্লিষ্ট হইয়া জড়-বস্তুতে পরিণত হয়, তখন জড়ের সংযোগে জীব-বস্তু গঠিত হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করা যায় কি না? বিশ্বাস করিবার বাধা কিছুই নাই। তবে এ পর্য্যন্ত কেহই জড়ের মিশ্রণ হইতে জীব-বস্তু প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। জীব-বস্তু হইতেই জীব-বস্তু জাত হইয়া থাকে; জড় হইতে বর্ত্তমানভাবাপন্ন জীব-বস্তু উৎপন্ন হওয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে।

জড় হইতে জীব-বস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকিলেও, বুঝি বা বর্ত্তমান আকারের জীব-বস্তু জাত হয় নাই। ইহা অপেক্ষা সরল ও সহজ অন্য কোনও ভাবের জীব-বস্তুই প্রথমে জাত হওয়া সম্ভব। পরে তাহাই বিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকারের জীব-বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে। বিবর্ত্তনবাদ কেবল যে জীব-দেহেই প্রযোজ্য, তাহা নহে; জীব-বস্তুতেও প্রযোজ্য। যদি এই কথাই সত্য হয়, তবে জীব-বস্তুও প্রথমে অন্য প্রকারের ছিল, পরে কালক্রমে বিবর্ত্তিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু জীব-বস্তু বুঝিতে হইলে, বস্তু কি, তাহা বুঝা আবশ্যক। পণ্ডিতগণ এক সর্ব্বব্যাপী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহার নাম ইথার। এই ইথার-সমুদ্রের মধ্যেই আমরা ডুবিয়া আছি।

ইথার-সমুদ্রের স্থানে স্থানে আবর্ত্তিত হইয়া পৃথক্‌ভাবাপন্ন হইলে তাহাকে পরমাণু (১) বলা যায়। এই পরমাণু বিবিধ-তড়িৎ-যুক্ত। এইরূপ তড়িৎযুক্ত পরমাণু সকল একত্রিত হইয়া অণু গঠিত হয়। কতিপয়সংখ্যক পরমাণু একটি কেন্দ্রস্থানকে আশ্রয় করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হইতেছে। এই অবস্থায় ইহার নাম অণু। পরমাণুগত দ্বিবিধ তড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে; আর পরমাণুদিগের স্বাভাবিক গতিবশতঃ উহারা পরস্পর হইতে বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এই দুই শক্তি, অর্থাৎ কেন্দ্রাভিগ আকর্ষণ এবং কেন্দ্রাতিগ বিকর্ষণ, এতদুভয়ের ফলে, পরমাণু সকল একটি কেন্দ্রস্থানের চতুর্দ্দিকে চক্রাবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইতেছে। এইরূপ চক্রাবর্ত্তে ঘূর্ণিত ইথার-পরমাণু সকলের যুক্ত-নাম অণু। আর এই অণু-সমষ্টি দ্বারাই সর্ব্বপ্রকার জড়-বস্তু গঠিত হইয়াছে। জড়-বস্তু দ্বিবিধ,—মিশ্র ও অমিশ্র। এক এক প্রকার মিশ্র-জড়ের পরমাণু-সংখ্যা ও পরমাণু সকলের অবস্থান এক এক প্রকার। আর ঐ পরমাণু সকলের আবর্ত্তন-বেগও পৃথক্ পৃথক্। যদি পরমাণু সকল এক নির্দ্দিষ্ট ভাবে সজ্জিত হইয়া এক নির্দ্দিষ্ট বেগেই আবর্ত্তিত হইত, তবে জগতে একটিমাত্র জড়-বস্তুই উৎপন্ন হইত। কিন্তু তাহা না হওয়ায় বস্তুও পৃথক্ পৃথক্ হইয়াছে। বিভিন্নসংখ্যক পরমাণু বিভিন্নরূপে সজ্জিত হইয়া, বিভিন্ন বেগে ঘূর্ণিত হওয়াতেই, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে। কিন্তু কোনও নির্দ্দিষ্ট বস্তুর অণু যে সকল পরমাণু দ্বারা গঠিত, তাহাদিগের সংখ্যাও এক, ঘূর্ণিত গতির গতির বেগও এক; এবং তাহারা এক ভাবেই সজ্জিত। যদি তাপাদি কোনও শক্তির প্রয়োগ করিয়া পরমাণু সকলের গতির বেগ, অথবা উহাদিগের অবস্থান পরিবর্ত্তিত করা যায়, তাহা হইলে, অণুর প্রকারও পরিবর্ত্তিত হইবে; অর্থাৎ, এক প্রকার অণু অন্য প্রকার অণুতে পরিবর্ত্তিত হইবে। পণ্ডিতগণ বর্ত্তমান সময়ে অণুকে আর চিরস্থির মনে করিতে পারিতেছেন না। ইথার-সমুদ্রের স্থানবিশেষ আবর্ত্তিত হইয়া পরমাণু ও পরমাণুসমষ্টিতে অণু, আর অণু-সমষ্টিতে জগতের সমস্ত পদার্থই গঠিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত পদার্থই সর্ব্বদা ইতস্ততঃ অণু সকল বিকীর্ণ করিতেছে। মৃগনাভি, কর্পূর প্রভৃতি কিছু দিন রাখিয়া দিলে উড়িয়া যায়; অর্থাৎ, তাহার অণু সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

হইয়া যায়। আমরা যে সকল দ্রব্যের গন্ধ পাইয়া থাকি, তাহারা যে সর্ব্বদাই অণু বিক্ষিপ্ত করিতেছে, ইহা সকলেই জানেন। কিন্তু পণ্ডিত গুস্তেভ লিবোঁ দেখাইয়াছেন যে, সকল পদার্থই (এমন কি, ধাতু প্রভৃতি কঠিন পদার্থও) সর্ব্বদাই অণু ত্যাগ করিতেছে। তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, স্বতঃ-বিশ্লেষণ (১) বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। বস্তু সর্ব্বদাই অণু পরমাণু বিক্ষিপ্ত করিতেছে; আর সেই অণু পরমাণু সকল পুনরায় ইথারে পরিণত হইতেছে। যে ইথার হইতে বস্তুর উদ্ভব, বস্তু আবার তাহাতেই লীন হইতেছে।

জড় অণু এইরূপে গঠিত ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু জীব-অণু কি? তাহাই এ স্থলে বুঝা আবশ্যক। অধ্যাপক Ehrlict জীব-বস্তু সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এক্ষণে পণ্ডিত-সমাজে তাহা স্বীকৃত হইতেছে। তাঁহার সিদ্ধান্ত বিশদ করিবার নিমিত্ত পণ্ডিত ম্যাক্‌নামারা স্বীয় Human speech নামক গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠায় একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক এর্লিকের মতে, জীব-বস্তুর প্রত্যেক অণুর মধ্যস্থলে কতকগুলি জড়-পরমাণুর সমষ্টি আছে। উহারা পরস্পরের আকর্ষণে পুঞ্জীকৃত অবস্থায় থাকে। উহাদিগের চতুষ্পার্শ্বে পরিধির ন্যায় বেষ্টন করিয়া আর কতকগুলি জড় পরমাণু থাকে। পরিধি-স্থলের এই সকল জড়-পরমাণুর পরস্পরের আকর্ষণ তত প্রবল নহে; তাই ইহারা কতক পরিমাণে মুক্ত। অর্থাৎ, মধ্যস্থলের জড়-পরমাণু গুলির ন্যায় দৃঢ়ভাবে পুঞ্জীকৃত নহে। এই দ্বিবিধ জড়-পরমাণুর, অর্থাৎ মধ্যস্থলের ও পরিধি-স্থলের জড়পরমাণুগুলির সমষ্টি-নাম জীবাণু। ইহাই জীব-বস্তুর একটি অণু। কোনও খাদ্যবস্তুর অণু জীবদেহের এইরূপ একটি জীবাণুর সহিত মিশ্রিত হইলে, তাহার পরিধিস্থানীয় পরমাণু সকল ঐ জীবাণুর পরিধিস্থানীয় পরমাণু সকলের সহিত মিলিত হয়, এবং পরিধিস্থানীয় অণুগুলির পরস্পর আকর্ষণ তত অধিক না থাকিলে, খাদ্যবস্তুর অণু সকলের পরিধিস্থানীয় কোনও কোনও পরমাণু ঐ জীবাণুর পরিধিস্থানীয় কোনও কোনও পরমাণুর স্থান অধিকার করে। এইরূপে জীবাণু হইতে কতিপয় পরিধিস্থানীয় পরমাণু ত্যক্ত হয়, এবং খাদ্যবস্তুর পরমাণু তাহার স্থান অধিকার করে। তন্নিমিত্তই জীবদেহের পরমাণু সকল পরিত্যক্ত হইতেছে, এবং আহার্য্য বস্তুর দ্বারা সেই

পরমাণুর স্থান পূর্ণ হইতেছে। জীব-ধর্ম্ম এইরূপে প্রথম উৎপন্ন হইল। জড়াণু জীবাণুরূপে পরিবর্ত্তিত হইবার এই প্রথম উপায়। (১) বোধ হয়, প্রথমে স্থানাধিকারই জীবাণুর একমাত্র লক্ষণ ছিল। ইহা হইতেই পুষ্টি; পুষ্টি হইতেই খণ্ডিত হওয়া, অর্থাৎ বিভাগক্রিয়ার উৎপত্তি। প্রাথমিক এক-কৌষিক জীবের বংশবৃদ্ধির উপায়,—বিভাগ। উহাদিগের স্ত্রীপুংভেদ নাই; তাই একটি কোষ দ্বিখণ্ডিত, উহারও প্রত্যেকটি আবার দ্বিখণ্ডিত, (২) এইরূপ হইতে হইতে ক্রমে এক হইতে বহুর উৎপত্তি হয়। জড়াণুও অপর জড়াণুর সহিত মিলিত হইয়া পরস্পরের স্থানবিনিময় করিয়া মিশ্রপদার্থ গঠিত করে। কিন্তু তাহাতে পুষ্টি; অথবা বৃদ্ধি নাই, অন্ততঃ জীবাণুর ন্যায় নাই। আর জীবাণু অন্য জীবাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া পরমাণু সকলের মধ্যে যে স্থানবিনিময় করে, তাহার ফলে পুষ্টি অর্থাৎ বৃদ্ধি সাধিত হয়। অণুর এই বৃদ্ধিই নির্দ্দিষ্ট সীমা অথবা অনুপাত অতিক্রম করিলে, উহা ফাটিয়া খণ্ডিত হইয়া যায়। এই বিভাগকার্য্যই বংশবৃদ্ধির মূল। পুষ্টি ও বিভাগ, এই দুই ক্রিয়াই প্রাথমিক জীব-ধর্ম্ম। এতদুভয় অদ্যাপিও জীবকে জড় হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত প্রভেদ না হইলেও, বাহ্যতঃ পৃথক্ করিয়াছে। অন্যান্য জীবধর্ম্ম পরে কালসহকারে এই ক্ষুদ্র দুই কর্ম্ম হইতেই সমুদ্ভূত। মানবের প্রধান গৌরব,—বুদ্ধি; তাহাও এই ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মূলে যাহা নাই, তাহা পরে কখনও আসিতে পারে না। এই নিমিত্তই বৈজ্ঞানিকগণ প্রত্যেক অণুপরমাণুকেও জ্ঞানময় বিবেচনা করিতে বাধ্য হইতেছেন। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি।

ক্রমশঃ।

শ্রীশশধর রায়।

(১) Human speech; p. 10.

দেশের জন্য। *

জানুয়ারী মাস। ধূসর মেঘে সমস্ত আকাশ ভরিয়া গিয়াছিল; কণ্ কণে দমকা বাতাসে হাড় অবধি ঝন্ ঝন্ করিতেছিল। অতিরিক্ত বরফ পড়ার দরুণ শীতটাও খুব বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

পাড়াগাঁ। মেটে রাস্তা দিয়া কতকগুলি লোক মৃতদেহ বহিয়া আনিতেছিল। দু' জন বেহারার স্কন্ধে ঝোলা; তাহারই মধ্যে মৃতের দেহ; ঝোলার চারিধার ধব্ধবে শাদা কাপড়ে ঢাকা।

ঝোলার পিছনেই একটি লোক, বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর হইবে, সে একখানি 'রিক্‌শ' গাড়ী টানিয়া আনিতেছিল। গাড়ীতে দুটি ছোট ছেলে—তাদের মুখ ফ্যাকাশে; একখানি লাল কম্বল দু' জনেরই গায়ে জড়ানো, তবু তাদের শীত ভাঙ্গিতেছিল না।

ঝোলার মধ্যে তাদের মা'র মৃতদেহ। যে রিক্‌শ টানিতেছিল, সে তাহাদের বাপ। রাত্রে তাহাদের যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তাহারা চাহিয়া দেখে, তাহাদের ছোট ঘরখানি লোকে ভরিয়া গিয়াছে, তাহাদের মার মুখে কথা নাই—আর মার হাতখানি ধরিয়া মার বিছানায় বসিয়া তাদের বাপ কাঁদিতেছিল।

তার পর তাদের বাপ যখন একটিও কথা না কহিয়া তাদের মুখে চুম দিয়া 'রিক্‌শ'তে বসাইয়া দিল, তখন তাহারা মনে করিয়াছিল, বুঝি অন্য দিনেরই মত বেড়াইতে চলিয়াছে। কিন্তু অন্য দিনের মত বাপের মুখে আজ হাসি ছিল না—সে মাটীর দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে 'রিক্‌শ' টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, মুখে কথাটিও ছিল না। এই সব দেখিয়া ছেলে দুটির মন কি যেন দুঃখে আচ্ছন্ন হইতেছিল!

অনেকক্ষণ পথ চলিয়া সকলে সহরের সীমানায় আসিয়া পঁহুছিল। তখন চারি ধারে অন্ধকার নামিতেছিল, এবং ছেলে দুটির চোখও ঘুমে ভরিয়া আসিয়াছিল!

ঘুম ভাঙ্গিয়া তাহারা দেখে, মন্দিরের মেঝেয় মাদুরের উপর তাহারা শুইয়া রহিয়াছে। উঠিয়া দুটি ছোট থালায় দু' জনে ভাত খাইল, আর ছোট পেয়ালা ভরিয়া দু' পেয়ালা চা।

আবার রিকস্—আমার ঘুম—তার পর বাড়ী, সুখের বাড়ী! কিন্তু, মা কোথায়? মার বিছানা খালি পড়িয়া রহিয়াছে যে; মা কোথায় লুকাইল? ছোট খোকাও মাকে না পাইয়া কাঁদে। সূর্য্যের আলোয় গৃহ তখন পূর্ণ; জানালার ধারে তাদের বাপ দাঁড়াইয়াছিল, চোখে তাঁর জল!

* * * *

ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ। আকাশে বাতাসে বসন্তের একটা ঢেউ লাগিয়াছিল। সকলেরই বারাণ্ডায় ছোট গাছগুলিতে নীল ও সাদা রঙ্গের ফুলগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহারই মিষ্ট গন্ধে আজ গ্রামখানি ভরপূর!

রিক্‌স গাড়ীর আড্ডায় 'তক্‌তকে' সাজানো গাড়ীগুলি;—তারি পাশে বেহারাগুলা 'পাইপ' টানিতেছিল—কেহ বা গল্প করিতেছিল। দূরে ঘণ্টার শব্দ শুনা গেল,—তাহার পরেই একটি লোক 'খবর!' 'খবর!' বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিল।

সকলে যেন বিদ্যুতের মত কাঁপিয়া উঠিল! যে যেখানে ছিল, সকলে খবর কিনিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। দুটি করিয়া 'সেনে'র বিনিময়ে এক এক খণ্ড কাগজ কিনিয়া ফেলিল! পথে রীতিমত লোকের ভিড় জমিয়া গেল।

যুদ্ধ! যুদ্ধ! সকলের প্রাণে যেন জোয়ার বহিয়া গেল! স্ত্রীলোক, বালক, যোদ্ধা,—সকলের প্রাণে যেন বাজনা বাজিয়া উঠিল! উত্তেজনায় রক্ত নাচিয়া উঠিল! আজ দেশের জন্য কাজ করিবার সময় আসিয়াছে!

সকলেরই ডাক পড়িয়াছে! সকলকেই যাইতে হইবে। বিধবা মার একমাত্র পুত্র, আতুর ও স্ত্রীলোক ভিন্ন সকলকেই যুদ্ধে যাইতে হইবে। টোকিচিকে ত বটেই! এখন তার ছেলেগুলির ভার কে লয়! তার ছোট খোকাটি! ইহাদের ভার কাহারও হাতে দিতে পারিলেই নিশ্চিন্তমনে যুদ্ধে যাওয়া যায়! যুদ্ধে সময়ও বেশী লাগিবে না!

সমস্ত দিন এ-বাড়ী ও-বাড়ী, এ-পাড়া ও-পাড়া ঘুরিয়া বেড়ানোই সার হইল,—কেহই ছেলেগুলির ভার লইতে চাহিল না! কেহই সম্মত হইল না!

পরদিন খোকাকে থলির মধ্যে লইয়া পৃষ্ঠে বাঁধিয়া, বড় দুটি ছেলেকে রিক্‌সতে বসাইয়া সে পথে পথে ঘুরিল; আজ সে চিরদিনের জন্য ছেলেগুলিকে বিলাইয়া দিবে! কিন্তু লইবে কে? সকলেরই নিজেদের ঝঞ্ঝাট

কাল তাহাকে সৈন্যদলে যোগ দিতেই হইবে। নহিলে? নহিলে তাহাকে কয়েদ করা হইবে, এবং বিচারে সকলের সম্মুখে কুকুর-বিড়ালের মত তাহাকে গুলি করা হইবে! কি সে লজ্জা, কি সে অপমান! কথাটা ভাবিয়া তার বুক হু হু করিয়া উঠিল! মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল!

ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়িয়া সে উঠিল। ছেলে তিনটি নিদ্রা যাইতেছিল। ঘরের আলো নিবু-নিবু হইয়া আসিতেছিল—ছেলেদের মুখগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু বড় ছুরিখানা কোথায় থাকিত, টোকিচি তাহা বেশ জানে!

হাঁ—এই সেই ছুরি! বাঁট দেওয়া বড় ছুরি, তার শৈশবের সঙ্গী! ইহারই সাহায্যে সে কত জঙ্গল সাফ্ করিয়াছে, কত চোরের প্রাণ নিয়াছে! আঙ্গুল বুলাইয়া টোকিচি দেখিল, এখনও বেশ ধার আছে! তবে এক-আধ জায়গায় একটু মরিচা ধরিয়াছে। শাণ দিলে ভালোই হয়। ধীরে ধীরে শাণপাথরখানি সে খুঁজিয়া বাহির করিল।

'শ্যাঁষ!' 'শ্যাঁষ!' 'শ্যাঁষ!' পাথরে ছুরি ঘসা হইল। ছুরিখানা জীয়ন্ত মানুষের মতই শব্দ করিল, 'শ্যাঁষ!' 'শ্যাঁষ!' 'শ্যাঁষ!' সেই নিবু-নিবু আলোতে একবার সে ছেলেদের মুখের পানে চাহিল। আহা, কি নিশ্চিন্ত ঘুম! নিশ্বাসের শব্দটুকুই শুধু শুনা যাইতেছিল। আর কিছু না, এমনই নিস্তব্ধ!

দূরে মন্দিরের ঘণ্টায় বারোটার ঘা পড়িল। কি ভীষণ শব্দ! একটি ছেলে ধীরে পাশ ফিরিল। হাতখানা লেপের বাহিরে পড়িল। টোকিচি তাহাদের মাথার শিয়রে স্থির হইয়া বসিল! ঘরের আলোটুকুও দপ্ করিয়া নিভিয়া গেল।

কি অন্ধকার! চোখে কিছু দেখা যায় না। আগে খোকা! কি জানি, যদি তার হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়! যদি সে চীৎকার করিয়া উঠে! সে শব্দে যদি আর দুটির ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়!

আহা, ছোট্ট গলাটুকু! কি নরম! ঠিক জায়গাটি! জাপানীরা জানে, কোথায় ছুরি বসাইলে ব্যথা অল্প লাগে।

তার পর মেজোটি! শীঘ্র—এখনও হাতে বল আছে, হাত দৃঢ় আছে! বড়টির ঘুম ভাঙ্গিল, না? না,—সে আরামে ঘুমাইতেছে! এইবার সে! এইটি না প্রথম? এইটিই না এখন শেষ চিহ্নটুকু! এই ত সে দিনের

গিয়াছিল। তাহার হাতে তখন কবচ বাঁধিয়া দেওয়া হয়—কবচের বলে তার হৃদয় সকল গুণে ভূষিত হইবে,—হৃদয় সাহসে পূর্ণ হইবে। সে ত সেদিনের কথা! কিন্তু আজ,—হায়!

হাত একবার কাঁপিয়া উঠিল। কপাল হইতে এক বিন্দু ঘাম বহিয়া ছুরির বাঁটে পড়িল। ছুরিখানা হাতে পিছলাইয়া যায়! সে কি পারিবে না? এতই দুর্ব্বল তার হাত! কখনও না!

সব শেষ! বলি শেষ! ছোট দেহগুলি কম্বলে জড়াইয়া সে রিক্সতে তুলিল—পরে রিক্স ঠেলিয়া পথে বাহির হইল!

আর কিছু দিন পূর্ব্বে এই পথেই সে বাহির হইয়াছিল। সে দিন তার চোখে জল ছিল, কিন্তু আজ আর তাহা নাই! সে দিন আপনার বলিতে কিছু যেন ছিল, আজ আর কেহ নাই—আছে শুধু নিজের জন্মভূমি! দেশ! সোনার সে দেশ!

তখন শেষরাত্রি। পাহাড়ের পিছনে চাঁদ উঠিতেছিল! তাহারই আলোকে কবরের স্থানটুকু খুঁজিয়া লওয়া যায়।

শীঘ্র! শীঘ্র! কাজ শেষ হইল। ছেলে তিনটিকে তাদের মায়ের পায়ের কাছে শোয়াইয়া সে কবরে মাটী চাপা দিল। তাহার উপর ছোট ছোট তালের চারা রোপণ করিল। আঃ! কি আরামেই ছেলেগুলি এখন ঘুমাইবে? আহা, সে-ও যদি আজ তাদের পাশে একটু স্থান করিয়া লইতে পারিত! কিন্তু, না! তার জন্য বিদেশের সমরক্ষেত্র যে আজ বক্ষ পাতিয়া রাখিয়াছে, সে সেইখানে বিরাম লাভ করিবে! এখানে তার স্থান নাই; এখানে নয়!

টৌকিচি একবার হাঁটু গাড়িয়া ভগবানকে ডাকিল।

ভোরের আলো অল্পে অল্পে ফুটিতেছিল। ধীরে ধীরে টৌকিচি মন্দিরে আসিয়া দাঁড়াইল। মন্দিরের সোপানের নিম্নে পাথরের চৌবাচ্ছায় জল ছিল। দেবদর্শনে আসিলে পাপীরা এই জলে হাতের কলঙ্ক ধুইয়া ফেলে। এই জলে সে ভালো করিয়া হাত ধুইল।

হাত ধুইয়া আচার্য্যের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল,—একে একে সব কথা তাঁহাকে বলিল। শেষে বলিল, "এখানকার কাজ আমার এখন শেষ। এখন রাজার জন্য নিশ্চিন্তে মরিতে পারিব। এখানি নিন—এই শেষ!

রাখিবেন! এখন আমি রিক্ত, এখন আমি সর্ব্বস্বান্ত"—বলিয়া লাল কম্বলখানি আচার্য্যের হাতে তুলিয়া দিল; তাহার পর সে চলিয়া গেল।

* * * * *

মার্চ্চ মাস। প্রভাত। সমস্ত সহর সজাগ হইয়া উঠিয়াছে। দশ হাজার পতাকার উপর সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া ঝলমল করিতেছে। পথে আবার লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছে। সৈন্য-বারিকের ফটকের সম্মুখে ভিড় আরও বেশী! এখনই সৈন্যদল বাহির হইবে।

ভেরী বাজিয়া উঠিল। সৈন্যদের নাম-ডাক আরম্ভ হইল। স্বদেশে বুঝি তাদের এই শেষ নামডাক।

"টৌকিচি মৎসুসিমা!"

"হাজির!"

দশ মিনিট মাত্র! উৎসাহে আনন্দে গর্ব্বে সৈন্যদল বাহির হইয়া গেল। কিন্তু সবার অপেক্ষা অধিক আনন্দ, অধিক উৎসাহ, অধিক গর্ব্ব আজ টৌকিচির!

খুনী? হাঁ, অপরের চক্ষে খুনী হইতে পারে। কিন্তু জাপানীর চক্ষে মহাপুরুষ! স্বদেশপ্রেমের বেদীর সম্মুখে সে কি আজ তার অস্থিচর্ম্ম অবধি বলি দেয় নাই? দেশের জন্য আজ কি সে তাহার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে নাই? আজ আর আপনার বলিতে সে কিছু রাখে নাই! সে ত তার দেশের জন্য আজ প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়াছে!

* * * *

দূরে পাহাড়ের ধারে ছোট গ্রামে এক জন আচার্য্য কবচ বিতরণ করেন। এ কবচ ধারণ করিলে নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেমে হৃদয় পূর্ণ হয়।

কবচগুলি তিনি স্বহস্তেই রচনা করেন; কবচগুলিও এমন কিছু নয়—শুধু ছোট রেশমী বেটুয়ার মধ্যে রূপালী সুতায় জড়ানো রক্ত-মাখা কম্বলের এক একটি টুকরামাত্র!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মুণ্ডারি গান ও কবিতা।

নৃত্য-নিমন্ত্রণ।

আয় গো ক'নে! সবাই মোরা নাচ্‌তে যাই,
পাথর ত' নই, থাক্‌ব প'ড়ে একটি ঠাঁই!
আয় গো ক'নে! নিমন্ত্রণে যাই সবাই,
গাছের মত শিকড় গেড়ে থাক্‌তে নাই;
জীবন গেলে কর্‌বে দেহ পুড়িয়ে ছাই,
বাঁচার মতন বাঁচ্‌তে চাই,—নাচ্‌তে যাই!

বিবাহান্তে বিদায়।

ভাই বোনেতে ছিলাম যে এক মায়ের জঠরেই,
মায়ের যে দুধ খেয়েছি, ভাই! আমরা দু' জনেই;
তোমার ভাগ্যে ভাই রে! তুমি পেলে বাপের ঘর,
আমার ভাগ্যে ভাই রে! আমি হ'লাম দেশান্তর।
মাসেক দু' মাস কাঁদ্‌বে বাপ, সারাজীবন মায়,
দিনেক দু' দিন হয় ত' রে ভাই! কাঁদ্‌বে তুমি, হায়!
ভাইয়ের বধূ কাঁদ্‌বে শুধু বিদায়ের কালেই,
পোষা পাখী মুছ্‌বে আঁখি আঁখির আড়ালেই।

অনাথ।

ও পাড়াটা ঘুরে এলাম—কেউ ত নেই,
ও পাড়াটা মরুভূমির মতন;
মা গো! আমার নেই গো তুমি নেই গো নেই,
নেই ক বাবা, কর্‌বে কে আর যতন?
আজ্‌কে যদি বাবা আমার থাক্‌ত গো,
মা যদি মোর আজ্‌কে বেঁচে থাক্‌ত,
পথে পথে খুঁজ্‌তো কত ডাক্‌ত গো,
কোলে পিঠে ক'রে সদাই রাখ্‌ত।
মা হারিয়ে হারিয়েছি হায়! সকলকেই,

বাপ গেছে যার, জগতে তার কেউ ত নেই,
একলা পথে ঘুরে বেড়াই রোজ।
মা-হারাণ বড় দুখের, তুলনা তার নেইক,
বাপ-হারাণ জগৎ অন্ধকার,
মা গো! আমার সত্যি তুমি নেই কি, তুমি নেই গো,
বাবা আমার সত্যিই নেই আর!
পরের দ্বারে দাঁড়াই, স্নেহ পাইনে,
চাক্‌রী স্বীকার এই বয়সেই কর্‌বো,
ভয়ে কারো মুখের পানে চাইনে
হয় ত' মা গো! কেঁদে কেঁদেই মর্‌বো।*

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

সহযোগী সাহিত্য।

তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান।

বাল্যজীবন।

জুন মাসের 'নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরী এণ্ড আফ্‌টার' নামক সাময়িক পত্রে মসিয়ে আরমিনিয়স্ ভ্যাম্বেরী তুরস্কের ভূতপূর্ব্ব সুলতান আবদুল হামিদের পূর্ব্ববৃত্তান্ত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সুলতানের সহিত তাঁহার বহুদিনের পরিচয়।

প্রথম আলাপ।

মসিয়ে ভ্যামবেরী বলেন,—'হামিদ ইফেন্দির সহিত কিরূপে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে, 'Story of my struggles' গ্রন্থের পাঠকেরা বোধ হয় তাহা বিদিত আছেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ মাত্র। তাঁহার ভগিনী ফতেমা সুলতানাকে আমি ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিতাম। হামিদ ইফেন্দী তাঁহার ভগিনীর বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। আমি যখন ফতেমাকে পাঠ বলিয়া দিতাম, যুবরাজ একাগ্রমনে তাহা শ্রবণ করিতেন। রেসিদ পাশার পুত্র গালিব পাশার সহিত ফতেমার পরিণয় হইয়াছিল। তাঁহারই প্রাসাদে যুবরাজ হামিদের সহিত আমার সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হইত। অধ্যাপনা-কালের সমস্ত কথা এখনও আমার মানসপটে অত্যুজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। যুবরাজ হামিদ তাঁহার একখানি হাত

---

* ছোটনাগপুর অঞ্চলে মুণ্ডা জাতির বাসভূমি। [illegible]

আমার জানুর উপর রাখিতেন। তাঁহার বর্ণলেশশূন্য মুখখানি তুলিয়া, কৃষ্ণতার নয়নযুগল আমার নয়নে স্থাপিত করিয়া যুবরাজ ঈষৎ বঙ্কিমভাবে বসিয়া থাকিতেন। আমি পাঠ বলিয়া দিতাম, তিনি যেন প্রত্যেক শব্দ আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এরূপ একাগ্রতার হেতু আমি পরে অবগত হইয়াছিলাম। আমি শুনিয়াছিলাম, যুবরাজ হামিদ রাজান্তঃপুরে গুপ্তচরের কার্য্য করিতেন।

গুপ্তচর।

হামিদ ইফেন্দির বাল্যজীবন সুখময় ছিল না। তিনি কাহাকেও কখনও ভালবাসেন নাই। কেহ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ছিল না। তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষায় বিশেষ অযত্ন ঘটিয়াছিল। কেহ তাঁহার বিদ্যাভ্যাসের জন্য বিশেষ চেষ্টা করে নাই। সুতরাং পাঠে সময়াতিপাত না করিয়া তিনি শুদ্ধান্তঃপুরচারিণীদিগের কক্ষে কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। রাজ-প্রাসাদের যাবতীয় কুৎসা, নিন্দা ও কলঙ্ককাহিনী সংগ্রহ করিতেন। সুলতানের অন্তঃপুরে তাহার অভাবও ছিল না। হামিদ ইফেন্দী এইরূপে অন্তঃপুরের যাবতীয় কুৎসা ও কলঙ্ককাহিনী সংগ্রহ করিয়া কিছুকাল পরে তাহার প্রচারের প্রধান উৎস-স্বরূপ হইয়া উঠিলেন। ক্রমশঃ তিনি আবদুল আজিজের বেগম পার্টিভেলা কাদিন নাম্নী এক জন অশিক্ষিতা মহিলার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাদু-বিদ্যায় দৃঢ় বিশ্বাস ও ধর্ম্মোন্মত্ততার জন্য ইনি লোকসমাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই রমণীর সংস্রবে আসিয়া হামিদ ইফেন্দীও সর্ব্বনাশকর যাদুবিদ্যা ও যাবতীয় অনৈসর্গিক ব্যাপারে বিশ্বাসবান ও অনুরক্ত হইয়াছিলেন। শৈশবের এই অভ্যাসবশতঃ পরিণামে তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রের এক জন বিশিষ্ট ভক্ত হইয়াছিলেন। জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে তিনি বড় ভালবাসিতেন। সাম্রাজ্য-পরিচালন বিষয়েও অনেক সময় তিনি জ্যোতিষের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। যে সকল শ্বেতাঙ্গ রাজকার্য্য সম্বন্ধে সুলতানের সংস্রবে আসিতেন, অনেক সময়ে তাঁহারা সুলতানের এইরূপ রহস্যজনক ব্যাপারের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিতেন না।

শিক্ষা।

আবদুল হামিদ তদীয় পরিচারকবর্গের মতই অশিক্ষিত ও মূর্খ ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষা বা গ্রন্থপাঠে তিনি সর্ব্বদাই প্রকাশ্যে ও অকুণ্ঠিতভাবে তাঁহার অনিচ্ছা ও বিরাগ প্রকাশ করিতেন। তিনি এমন মূর্খ ছিলেন যে, স্বীয় মাতৃভাষাও—তুর্কী, আরবী ও ফরাসী মিশ্রিত ভাষা—আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার সহিত বাক্যালাপকালে যদি আমি কোনও উচ্চ অঙ্গের মনোহর শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করিতাম, তিনি অমনই বলিতেন, 'আমি সমৃদ্ধ তুর্কী সাহিত্য ভাল বুঝিতে পারি না। অনুগ্রহপূর্ব্বক সহজ, প্রচলিত ভাষায় কথা কহিবেন।'

ইতিহাস, ভূগোল ও কাব্য সাহিত্যে সুলতানের জ্ঞান আদৌ ছিল না, এ কথা বলাই বাহুল্য। অশ্বারোহণ বিদ্যা ব্যতীত তাঁহার অন্য কোনও বিশেষ গুণ ছিল না। এই বিদ্যায় তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। অতি সহজে তিনি তেজস্বী, দুর্দ্দমনীয় অশ্বকে বশে আনিতে পারিতেন। শারীরিক স্বাস্থ্যভঙ্গের পরও তিনি এই কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন।

হামিদ ইফেন্দি অশ্বারোহণ, মৃগয়া, উদ্যানকর্ষণ, অন্তঃপুর-কলঙ্কের আলোচনা, পরনিন্দা,

পরচর্চ্চা প্রভৃতি কার্য্যে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিতেন। তিনি তাঁহার পিতার বিশেষ দৃষ্টি কখনও আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। যুবরাজ অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন। ভরণপোষণের জন্য তিনি বার্ষিক পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা বৃত্তি পাইতেন। রাজোচিত পদমর্য্যাদার উপযুক্ত অর্থ ব্যয় করিয়াও তিনি উহা হইতে কিছু অর্থের সংস্থান করিয়াছিলেন। সিংহাসনারোহণকালে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকট প্রায় সাড়ে দশ লক্ষ টাকা মজুত আছে।

সুলতানের ভীরুতা ও অবিশ্বাস।

শৈশব হইতে মাতৃস্নেহহীন অন্তঃপুরে হামিদ একান্ত নিঃসঙ্গ ছিলেন; সর্ব্বদা ষড়যন্ত্র-জালের মধ্যে বাস করিতেন; তাই যুবরাজ হামিদ ইফেন্দি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। শত্রুদল, ষড়যন্ত্রকারীরা সর্ব্বদা তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব ঘিরিয়া রহিয়াছে, এই আশঙ্কায় তিনি সর্ব্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তিনি শত্রু বলিয়া ভাবিতেন; সর্ব্বদাই রাজদ্রোহের বিভীষিকা দেখিতেন। দিবারাত্রির মধ্যে কখনও তিনি একবারের জন্যও নিশ্চিন্তভাবে মানসিক শান্তি উপভোগ করিতে পান নাই। কোনও অভ্যাগত তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে যদি সহসা উঠিয়া দাঁড়াইতেন, বা কোনও অঙ্গচালনা অথবা শব্দ করিতেন, সুলতান অমনই আতঙ্কে চমকিয়া উঠিতেন। উদ্যানে বিচরণকালে সহসা যদি কেহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইত, তাহা হইলে ভয়ে তিনি এমন অস্থির হইয়া উঠিতেন যে, সে দৃশ্য-দর্শনে অনেক সময় আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইত। রাত্রিকালে তিনি কোন প্রাসাদে অবস্থান করিতেন, তাহা কেহই জানিতে পারিত না। বিভীষিকার ছায়া তাঁহা অন্তরকে এমন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিত যে, রাত্রিতে তাঁহার কখনও সুনিদ্রা ঘটিত না। সুতরাং তিনি প্রভাতে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে শয্যা ত্যাগ করিতেন। প্রাতঃস্নানের পর তিনি কতকটা সুস্থ থাকিতেন।

ভ্যাম্বেরীর সহিত বন্ধুত্ব।

সুলতানের নিকট মসিয়ে ভ্যাম্বেরীর অবারিত দ্বার ছিল। ভ্যাম্বেরী ব্যতীত আর কোনও শ্বেতাঙ্গই আবদুল হামিদের নিকট দ্বিভাষীর সাহায্য ব্যতীত সাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ করিতে পাইতেন না। তিনি লিখিয়াছেন, সুলতান অন্যান্য পার্শ্বচরদিগের অপেক্ষা আমাকে বহু বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যেরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত, তাহাতে তাঁহার প্রসাদলাভ সকল সময়ে আমি নিরাপদ মনে করিতাম না। আমি যদি স্থায়িভাবে বসফরসে বাস করি, তাহা হইলে তিনি আমাকে উচ্চপদ ও প্রভূত সম্মানের অধিকারী করিবেন, পূর্ব্ব হইতেই প্রতিশ্রুত ছিলেন। মধ্যে মধ্যে তিনি আভাষে সেই সব সম্মান ও উচ্চপদের উল্লেখ করিতেন। আমি ইচ্ছা করিলে রাজদূত অথবা কোনও শ্রেষ্ঠ অমাত্যের পদ লাভ করিতে পারিতাম; কিন্তু সুলতানের প্রকৃতি আমি সম্যক্ অবগত ছিলাম বলিয়া তদীয় রাজকার্য্যে প্রবেশ করিবার আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

ফরাসী উপন্যাসে ইংরাজ-চরিত্র।

বিগত ২৫শে মে তারিখের 'Revue pourles Francais' নামক সংবাদপত্রে কুমারী কন্‌স্টান্স [illegible] ফরাসী উপন্যাসে বর্ণিত ইংরাজ-চরিত্র সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ

প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। লেখিকা উক্ত প্রবন্ধে ফরাসী ঔপন্যাসিকদিগের চিত্রিত প্রধান প্রধান ইংরাজ নর-নারীর চরিত্র লইয়াই প্রধানতঃ আলোচনা করিয়াছেন।

ইংরাজ-চরিত্রের ভ্রমাত্মক বর্ণনা।

লেখিকা বলেন, অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে থ্যাকারে ফরাসী ঔপন্যাসিকদিগের অলীক বর্ণরাগে রঞ্জিত ইংরাজ-চরিত্র-বর্ণনার গুরুতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ফরাসী লেখকগণ অধিকাংশ স্থলে অতিরঞ্জনের আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহার ফলে মূল ইংরাজ-চরিত্রগুলি যথাযথ না হইয়া শুধু ব্যঙ্গ-চরিত্রে পরিণত হইয়াছিল। ব্যালজাকের অঙ্কিত 'লেডী ডড্‌লে'র চিত্রটি ইংরাজ জাতির দোষসমষ্টির প্রতিকৃতি। ঔপন্যাসিক জিপ্‌ তদীয় গ্রন্থনিচয়ে ইংরাজ জাতি ও ইংলণ্ডের প্রতি ঘোরতর অসূয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। দুই বৎসর পূর্ব্বে 'L'ele Incomue' নামক উপন্যাসের প্রস্তাবনায় জনৈক ফরাসী লেখক স্বদেশবাসীর ইংরাজ জাতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণায় অতীব বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু থ্যাকারে ও মিস্‌ বেথাম্‌ এডওয়ার্ডের ন্যায় ম্যাডাম্‌ ডি কলভিন্‌ও মনে করেন যে, ইংরেজ লেখকগণ ফরাসী ঔপন্যাসিকদিগের এই ভ্রান্ত ধারণার যথেষ্ট প্রতিশোধ দিয়াছেন। ম্যাডাম ডি কলেভিন্‌ বলেন,—'ইংরাজ-চিত্রিত ফরাসী-চরিত্রে তাহার জাতিগত গুণ রক্ষিত হয় নাই।' সে যাহা হউক, মোটের উপর সমগ্র ফরাসী সাহিত্যে কতিপয় ইংরাজকে অতি রমণীয় বর্ণরাগে রঞ্জিত করা হইয়াছে। তন্মধ্যে এনাটোল্‌ ফ্রান্সিসের 'L' Lys Rong' নামক গ্রন্থের ভিভিয়ান্‌ বেল্‌, পল বুর্জ্জে প্রণীত 'L' Irreparable' নামক উপন্যাসের স্যার রিচার্ড ওয়াড্‌হাম ও জে. এইচ্‌. রস্‌নির রচিত Nell Horn de l' Armee du Salut' গ্রন্থের নেল্‌ চরিত্র উল্লেখযোগ্য।

অভিজাত সম্প্রদায়ের নর-নারী।

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের ফরাসী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গ্রন্থনিচয় সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিলে রচয়িতার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের রাজনীতিক সম্বন্ধের প্রভাব অনুসারে ফরাসী উপন্যাসে বর্ণিত ইংরাজ-চরিত্রের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। এখন উভয় জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব-বন্ধন যেরূপ দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে ফরাসী উপন্যাসে মধ্য শ্রেণীর ইংরাজ-চরিত্র চিত্রিত হইতে থাকিবে। এত কাল ফরাসী উপন্যাসের ইংরাজ নায়ক নায়িকা হয় অভিজাত-সম্প্রদায়-ভুক্ত, নয় ত কেনও ভূপর্য্যটক, অভাব পক্ষে কোনও চিরকুমারী। কিছু কাল ধরিয়া ফরাসী লেখকগণ পদবীশূন্য অথবা অভিজাত-সম্প্রদায়-ভুক্ত না হইলে, কোনও ইংরাজকে তাঁহাদের গ্রন্থে স্থান দান করিতেন না। এ জন্য সকল ইংরাজ যে ধনকুবের, ফ্রান্সে এই জনপ্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল। এখনও এই সংস্কার জনসাধারণের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।

ফরাসী উপন্যাসে মধ্যশ্রেণীর ইংরাজ।

প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক মোপাসাঁই তাঁহার 'মিস্‌ হ্যারিয়েট' চরিত্রে সর্ব্বপ্রথম প্রতিপন্ন করেন যে, ইংরাজ হইলেই ঐশ্বর্য্যবান্‌ হয় না। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে রোজ্‌নি ভ্রাতৃযুগল তাঁহাদের গ্রন্থে লণ্ডন পুলিসের জনৈক সার্জ্জেণ্টের কন্যা নেল্‌ ...

করিয়া ফরাসী উপন্যাস-জগতে পূর্ব্ব ধারণার প্রকৃত পরিবর্ত্তন সাধন করেন। পুলিসের এই কর্ম্মচারীটিকে গ্রন্থকার নিতান্ত পশুপ্রকৃতি ও জড়বুদ্ধি জীবরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন; কিন্তু তাহার সুন্দরী কোমলমতি কন্যাটিকে প্রতিকূল অবস্থায় নিক্ষেপ করিয়া অতি সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছেন। এখন নেল হরণ চরিত্রের আদর্শে অন্যান্য ফরাসী ঔপন্যাসিক মধ্যশ্রেণীর ইংরাজ-চরিত্র লইয়া গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। পল্ বুর্জ্জে, মার্গারেট, আনাটোল্ ফ্রান্স প্রভৃতি ঔপন্যাসিকগণ যে সকল ইংরাজ নর-নারীর চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকদিগের নায়ক নায়িকার চিত্র অপেক্ষা সেগুলি স্বাভাবিক, সহানুভূতির উদ্দীপক, এবং মধুর ও সুন্দর। তবে ফ্রান্স-প্রবাসী মার্কিনদিগের চরিত্রপ্রভাব এই সকল চিত্রে কিছু কিছু থাকা সম্ভব। ফরাসীরা ইংরাজ ও মার্কিণের মধ্যে যে বিশেষ কোনও প্রভেদ আছে, ইহা অনুভব করিতে পারেন না।

ফরাসী গ্রন্থকারমাত্রেই মধ্যশ্রেণীর ইংরাজ-মহিলার চিত্র আঁকিতে গেলেই তাহাকে সৌন্দর্য্যশালিনী করিয়া তুলেন; কিন্তু পুরুষ-চরিত্রগুলি তাঁহাদের সহানুভূতির বর্ণরাগে রঞ্জিত করিয়া চিত্রিত করেন। নারী-চরিত্র অপেক্ষা পুরুষ-চরিত্রে বুদ্ধি, বিবেচনাও যে অধিক, সে দিকেও তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। সকল ফরাসী ঔপন্যাসিকের মতে, ইংরাজ পুরুষের সঙ্গ প্রীতিদায়ক। তাঁহাদের বর্ণিত ইংরাজমাত্রেই সুবেশ ও সুঠাম।

ইংরাজ-চরিত্রের বিশেষত্ব।

ফরাসী ঔপন্যাসিকের, মতে ইংরাজ-চরিত্রের বিশেষত্ব পর্য্যটনপ্রিয়তা। এ জন্য তাঁহাদের গ্রন্থে বর্ণিত ইংরাজমাত্রেই ভূপর্য্যটক। অবিবাহিতা ইংরাজ যুবতীর চরিত্র বিশ্লেষণের বিশেষ উপযোগী। কুমারী-চরিত্রে ভাবিয়া দেখিবার যথেষ্ট বিষয় আছে। ইংরাজের রসিকতাগুণের একান্ত অভাব, এ বিষয়ে ফরাসী ঔপন্যাসিকেরা একমত। তাঁহাদের গ্রন্থে কদাচিৎ কোনও ইংরাজকে পরিহাসরসিক-রূপে চিত্রিত হইতে দেখা যায়। ইংরাজের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধেও ফরাসী গ্রন্থকারদিগের অনুরূপ ধারণা। বুর্জ্জে দুই শ্রেণীর ইংরাজ-চরিত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। এক শ্রেণীর ইংরাজ শারীরিকশক্তিশালী ও নাস্তিক; অপর শ্রেণী ঘোরতর অধ্যাত্মবাদী। ফরাসী ঔপন্যাসিকের মতে, ইংরাজগণ 'খামখেয়ালী',—মাথা-পাগলা। তাঁহারা বলেন, ইংরাজ-চরিত্রের এই দোষ গুরুতর ও মারাত্মক। 'লা ফসটিন' গ্রন্থের শেষ দৃশ্যে ইহার একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

ফরাসী গ্রন্থে বর্ণিত ইংরাজনারীর প্রেম পুরুষের পাশবিক প্রণয়ের ন্যায় উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল। সে ভালবাসায় নারীপ্রেমের বিন্দুমাত্র কোমলতা বা মাধুর্য্য নাই। কিন্তু ইংরাজ পুরুষের প্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় গভীর, স্থির, অচঞ্চল। এডমণ্ড ডি গণ্কো বলেন যে, ইংরাজ প্রেমিকের প্রণয়ে বাক্যচ্ছটা বা শব্দাড়ম্বর কিছুই নাই, সে প্রেম নির্ব্বাক্। পিউরিটান ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী ভাষা হইতে রোমিও জুলিয়েটের ভাষা নির্ব্বাসিত হইয়াছে! ফরাসী প্রেমিকের প্রণয়সম্ভাষণ ইংরাজের মতে দূষণীয়, এবং নিতান্ত স্ত্রীজনোচিত

উপন্যাস-পরীক্ষার উপায়।

লণ্ডন নগরের কোনও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ-প্রকাশ-সমিতির অধ্যক্ষ উপন্যাস-পরীক্ষা সম্বন্ধে একটি মূল্যবান উপদেশ দিয়াছেন। মে মাসের 'বুক মন্থলি' নামক সাময়িক পত্রে তিনি লিখিয়াছেন, রচিত গ্রন্থখানি কোনও মহিলা টাইপিষ্টকে দিয়া নকল করাইয়া লইতে হইবে। গ্রন্থকার পড়িয়া যাইবেন, 'নকল-কারিণী' নকল করিতে থাকিবেন। সেই সময় 'নকল-কারিণী'র ভাবভঙ্গীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যদি দেখা যায় যে, রমণী বিরক্ত ও অধীর হইয়া উঠিতেছে, অথবা তাহার মুখাবয়বে কোনও প্রকার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইতেছে না, তাহা হইলে গ্রন্থকার বুঝিবেন, তাঁহার গ্রন্থ উর্দ্ধসংখ্যায় তিন শত খণ্ড বিক্রীত হইতে পারে। কিন্তু যদি দেখা যায়,—নকল-কারিণীর মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কখনও স্মিতহাস্যে তাঁহার গণ্ডদেশ আরক্তিম হইয়া উঠিতেছে, কখনও মুখ ম্লান হইয়া যাইতেছে, গ্রন্থের মজার অংশটুকু শুনিতে শুনিতে উচ্চহাস্যে কক্ষতল মুখরিত করিতে করিতে লিখিবার জন্য সময় প্রার্থনা করিতেছে, অথবা করুণ অংশগুলি শুনিতে শুনিতে তাহার নয়নযুগল আর্দ্র হইয়া আসিতেছে, এবং শেষ পরিচ্ছেদে ঘটনাবলীর অভাবনীয়তায় মুগ্ধ হইয়া সে যদি আত্মবিস্মৃতভাবে লিখিবার কথা ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে গ্রন্থকার নিশ্চয় জানিবেন, তাঁহার গ্রন্থ অন্ততঃ দশ সহস্র খণ্ডও বিক্রীত হইবে।

স্বায়ত্ত-শাসনে চীনের শিক্ষানবীশি।

'নর্থ আমেরিকান্ রিভিউ' নামক সাময়িক পত্রে ক্যাণ্টন খ্রীষ্টান কলেজের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ডাক্তার ও. এফ্. উইসনার নিয়মতন্ত্র-প্রণালী মতে শাসন কার্য্য পরিচালন বিষয়ে চীনের কিরূপ উদ্যম, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে চীন রাজ্যের জনৈক দৃঢ়চেতা তেজস্বী রাজপুরুষের সৎসাহস সম্বন্ধে একটি গল্পের উল্লেখ আছে। এই রাজপুরুষের নাম ইউয়ান সি-কাই। তিনসিন নগর তাঁহার রাজধানী।

একটি ঘটনাতে তাঁহার দৃঢ়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে (মুষ্টিযোদ্ধা) বক্সারদিগকে দমন করিবার জন্য তিনি সানটং নগরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। মুষ্টিযোদ্ধারা তাঁহার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। 'বিদেশী দানব'দিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য বক্সারগণ কি কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহারা শাসনকর্ত্তাকে তাহা বুঝাইয়া দিল। ইউয়ান সি-কাই ধীরতা-সহকারে তাহাদের সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন। বকসার দলের প্রতিনিধিরা অবশেষে জানাইল যে, তাহাদের গুপ্ত-সমিতির ঐন্দ্রজালিক শক্তিপ্রভাবে তাহারা অপরাজেয়; তাহাদের সংকল্প কখনও ব্যর্থ হইবার নয়। বিদেশীয়দিগকে তাহারা নিশ্চয়ই বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইবে।

শাসনকর্ত্তা প্রতিনিধিদিগকে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত নেতৃবর্গের সহিত একত্র পান-ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজের পর তিনি মুষ্টিযোদ্ধাদিগের প্রতিনিধিগণকে সমবেত অতিথিদিগকে তাহারা কি প্রণালীতে কার্য্য করিবে, তাহা বুঝাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তাহাদের

আপনাদের উদ্ভাবিত প্রণালী কার্য্যোপযোগী হইবে কি না, তাহার পরীক্ষা করা যাক।' মুষ্টিযোদ্ধাদিগের প্রতিনিধিগণ সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাহাদের পথ রুদ্ধ। সম্মুখে এক দল সৈন্য আগ্নেয়াস্ত্র উদ্যত করিয়া দণ্ডায়মান। তাহারা তখন অনুনয় বিনয় করিল। কিন্তু শাসনকর্ত্তার সংকল্প টলিল না। আদেশ দিবামাত্র উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্রসমূহ অগ্নিবাণ বর্ষণ করিল। একবার অগ্নিবৃষ্টির পর বিদ্রোহের দমন হইল। সেই দিন সেই মুহূর্ত্ত হইতে সেই প্রদেশের বক্‌সার বিদ্রোহ অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া গেল।

নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তনের জন্য চীন-সম্রাটের ঘোষণাবাণী প্রচারিত হইবার পরেই রাজপ্রতিনিধি ইউয়ান, তিনসিন নগরের অধিবাসীদিগকে স্বায়ত্বশাসন-প্রণালী মতে কার্য্য করিবার উপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। নূতন শাসন-সংস্কারের বীজ বপন করিবার পূর্ব্বে তিনি ক্ষেত্রটি বিশেষরূপে কর্ষণ করিয়াছিলেন।

তিনসিন নগরের জনসাধারণকে স্বায়ত্বশাসন-প্রণালী বুঝাইবার জন্য তিনি প্রথমতঃ নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন স্থল হইতে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্ব্বাচিত করিয়া তিনি নিয়মতন্ত্র শাসনপ্রণালীর মূলতত্ত্ব তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর তাহাদিগকে নিজ নিজ গ্রামস্থ জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। নবপ্রচারিত শাসনপ্রণালীর উপকারিতা, উদ্দেশ্য প্রভৃতি সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য বক্তা নির্ব্বাচিত হইতেন। তাঁহারা স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। অতঃপর সেই সমুদয় বক্তৃতা মাসে মাসে সহজ গ্রাম্য মান্দারিণ ভাষায় মুদ্রিত করিয়া বিনামূল্যে সাধারণেও বিতরিত হইত। বড় বড় প্লাকার্ডে বিষয়গুলির সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম সহজ ভাষায় মুদ্রিত করিয়া সাধারণের অবগতির জন্য রাজপথের প্রকাশ্য স্থলে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইত, এবং গ্রামে প্রেরিত হইত। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন অর্থে শক্তিলাভ, এবং জনসাধারণের হিতকর কার্য্যে বুদ্ধিমত্তা ও কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করা, জনসাধারণকে এই কথাটি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইত।

গত ১৯৭৮ সালের ১০ই অগষ্ট তারিখে তিনসিন নগরে প্রথম মিউনিসিপাল স্বায়ত্বশাসনের প্রতিষ্ঠা হয়। তত্রত্য অবলম্বিত কার্য্যপ্রণালী দর্শনে চীনসম্রাট ক্যাণ্টন নগরে ও চীন সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ঐরূপ প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। অতঃপর চীন রাজ্যের যাবতীয় প্রদেশে প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইবে। চীনবাসিগণ এতকাল পরে তাঁহাদের অভীষ্ট অধিকার লাভ করিতে পারিবেন।

হীরার জাঙ্গাল।

১

আষাঢ়ের শেষে রথ। আষাঢ়ের প্রথম হইতেই বর্ষা নামিয়াছে—পথ কর্দ্দমদুর্গম। পুরী-যাত্রীদিগের কষ্টের অন্ত নাই। অবিরামজলবর্ষী, গম্ভীরশব্দকারী, নীলোৎপলদলশ্যাম, গতিহীন মেঘমালা দশ দিক শ্যামীকৃত করিয়া রাখিয়াছে। মেঘমালা বিক্ষিপ্ত থাকায় নভোমণ্ডল কোথাও প্রকাশ ও কোথাও বা অপ্রকাশ হইয়া, স্থানে স্থানে পর্ব্বতসন্নিবদ্ধ শান্ত সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়াছে। মেঘাসক্ত বলাকাপংক্তি সহর্ষে গগনে বিচরণ করিয়া আকাশে বায়ুবেগবিকম্পিত, লম্বমান পুণ্ডরীকমাল্যের মত শোভা পাইতেছে। জলচরসঞ্চারসুন্দর জলাশয় সকল পূর্ণ। বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে যাত্রী দল জলপথে ও স্থলপথে জগন্নাথদর্শনে যাইতেছে। কেবল ভক্তির আবেগে, কেবল মুক্তির আশায়—তাহারা পথশ্রম সহিতে পারিতেছে। যাত্রীদিগের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা রমণীর সংখ্যাই অধিক। আজও যেমন, সার্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও তেমনই ভক্তির প্রবাহ বাঙ্গালীর অন্তঃপুরেই প্রবল ছিল।

গ্রামে গ্রামে—চটিতে চটিতে বিশ্রাম করিয়া যাত্রী দল অগ্রসর হইতেছিল। কেহ কেহ পথেই পীড়িত অবস্থায় পরিত্যক্ত হইতেছিল, বা প্রাণত্যাগ করিতেছিল। পথে বিলম্ব করিবার প্রবৃত্তি বা অবসর কাহারও নাই। মধ্যবাঙ্গালার এক দল যাত্রীর সঙ্গে হীরা নাম্নী এক জন নর্ত্তকী যাইতেছিল। হীরার নাম তখন মধ্যবাঙ্গালা হইতে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত পরিচিত ছিল। তখনও দারিদ্র্যদুঃখে বাঙ্গালীর হৃদয় রসলেশশূন্য হইয়া পড়ে নাই; তখনও বাঙ্গালীর গৃহে বিগ্রহ, গোলায় ধান, গোশালায় গাভী। তখনও বাঙ্গালীর অতিথিসৎকার লোকপ্রসিদ্ধ। বাঙ্গালায় তখনও অবকাশযাপনে সঙ্গীতের চর্চ্চা হয়; গুণীর আদর আছে। তাই হীরার নাম তখন পরিচিত। তাহার মত গায়িকা বাঙ্গালায় বিরল। ধনীদিগের কৃপায় হীরা প্রচুর পুরস্কার লাভ করিত। সুতরাং তাহার অর্থের অভাব ছিল না। হীরা জলপথে জগন্নাথ-দর্শনে যাইতেছিল। হীরার বজরা বৃহৎ, সুসজ্জিত; বজরায় লোকও অনেক। কিন্তু বজরায় বন্দীর মত অবস্থান হীরার ভাল লাগিত না,

বজরা ত্যাগ করিয়া যাত্রীদের দলে আসিয়া মিশিত। আজ হীরা তাহাই করিয়াছিল। তাহার এরূপ করিবার আরও কারণ ছিল;—স্থলপথে বহু যাত্রীর মধ্যে অনেকের অভাব ও কষ্ট দূর করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়—জলপথে তাহার একান্ত অভাব। আজ হীরা স্থলপথগামী যাত্রীদিগের সহিত যাইতেছিল।

২

সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় যাত্রী দল যে গ্রামে উপস্থিত হইল, সে গ্রামে বহু যাত্রী সমাগত। সকলেই বিমর্ষ ও বিপন্ন। গ্রামের পূর্ব্ব দিকে বিস্তৃত বিল ও পশ্চিমে নদী। বর্ষায় বিল ছাপাইয়া জল মাঠের উপর দিয়া আসিয়া নদীতে পড়িত—শস্যক্ষেত্র ডুবিয়া যাইত; শস্য নষ্ট হইত; তাই গ্রামবাসীরা বিল হইতে নদী পর্য্যন্ত একটি খাল কাটাইয়াছিল। তখন সরকারের পূর্ত্ত বিভাগ বা পূর্ত্তকর ছিল না; কিন্তু বাঙ্গালায় এরূপ আবশ্যক কার্য্যও বাধিয়া থাকিত না—কেহ অর্থ, কেহ শ্রম দিয়া এ সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিত। এবার অতিবর্ষণে বিল ভাসিয়া খালে প্রবল জলস্রোত বহিতেছিল; স্রোতের বেগে খালের সেতু ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গিয়াছে—খালও ছাপাইয়া গিয়াছে। যাত্রীদিগের আর অগ্রসর হইবার উপায় নাই। তাই সকলেই বিমর্ষ—সকলেই বিপন্ন।

গ্রামে বাজারে যে কয়খানি শূন্য গৃহ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কয় জন ধনীর আত্মীয় পাল্কীতে যাইতেছিলেন; সঙ্গে ভৃত্যাদিও ছিল। তাঁহারা এক এক জন এক একখানি ঘর অধিকার করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট কয়খানি ঘরে যাত্রী দল কোনও রূপে আশ্রয় পাইয়াছিল। হীরা নর্ত্তকী যে দলে ছিল, সে দল যখন আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আর স্থান নাই। এ দিকে সন্ধ্যা সমাপন্ন। বর্ষার সন্ধ্যা; দেখিতে দেখিতে চারি দিকে অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল। সেই অন্ধকারে পথশ্রমশ্রান্ত নিরাশ্রয় যাত্রীরা বৃক্ষতলে বর্ষণ ভোগ করিতে লাগিল। কাহারও আহার হইল না। হীরা ইচ্ছা করিলে নৌকায় যাইতে পারিত; বাজারের ঘাটেই তাহার বজরা ভিড়িয়াছিল। কিন্তু বিপন্ন সহযাত্রীদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী আশ্রয় ও আরাম ভোগ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে সমস্ত রাত্রি তাহাদের সঙ্গে কষ্টভোগ করিল। সমস্ত রাত্রি সে ভাবিতে

করিতে পারে না? কর্দ্দমাক্ত ভূমিতে বসিয়া বর্ষার বারিধারায় ভিজিতে ভিজিতে হীরা ভাবিল, পুণ্যকামী নরনারীর এই ক্লেশ দূর করিলে,—তাহাদের পথ সুগম করিলে কি পুণ্যলাভ হয় না? তাহাতে কি পুণ্যবিধাতার প্রীতি সংসাধিত হইতে পারে না? বিপন্ন নর-নারীর মধ্যে বসিয়া হীরা এইরূপ ভাবিতে লাগিল।

নিশাশেষে বর্ষণের বিরাম হইল—আকাশে ক্রমে মেঘের মধ্যে দুই একটি তারকা দৃষ্ট হইতে লাগিল; মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের আলোকে পশ্চিম গগনে মেঘমালার স্বচ্ছ অন্ধকার দেখা যাইতে লাগিল। তাহার পর রোগীর শীর্ণ অধরে হাসির মত পূর্ব্বমেঘে দিবালোক দেখা দিল। তখনও বাজারে ঘরের তৃণাচ্ছাদন হইতে বিন্দু বিন্দু বারি ঝরিতেছে। হীরা দেখিল, পথশ্রম-শ্রান্ত যাত্রীরা কেহ কেহ সেই কর্দ্দমকলুষিত ভূমিতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। দুই এক জন যাত্রী শিশুসন্তান সঙ্গে আনিয়াছিল। গত রাত্রিতে তাহারা দুগ্ধ পায় নাই। তাহাদের করুণ ক্রন্দন হীরার রমণী-হৃদয়ে ছুরিকার মত বিদ্ধ হইতে লাগিল। সে বজরা হইতে হইতে অর্থ আনাইয়া অত্যধিক মূল্য দিয়া দুগ্ধ কিনিয়া শিশুদিগের পানের ব্যবস্থা করিল। যে সকল ধনীর আত্মীয়া বাধ্য হইয়া গ্রামেই আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাঁহারা অপরিচিতার এই ধৃষ্টতায় বিরক্ত হইলেন। ধনী কবে দরিদ্রের দুঃখ বুঝিয়া থাকে?

৩

পথে কেহই বিলম্ব করিতে চাহে না। এক জন ধনীর গৃহিণীর ব্যগ্রতায় তাঁহার ভৃত্যবর্গ বাহকদিগকে বলিল, "যাইতেই হইবে।" বাহকগণ অস্বীকার করিল। শেষে প্রহারের ভয়ে ভীত হইয়া তাহারা বলিল, "ভাল; আগে যে স্থানে পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, সে স্থানে নামিয়া দেখি।" তাহাই স্থির হইল। তাহাদের সঙ্গে যাত্রী দলও সেই স্থানে গেল। এক জন বাহক সাবধানে জলে নামিল। জল কর্দ্দমাক্ত; জলমধ্যে কিছু দৃষ্ট হয় না। সহসা পদস্খলিত বাহক গভীর জলে পড়িল। প্রবল স্রোত তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। তীর হইতে সকলে দেখিতে লাগিল, সে প্রবল স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কূলে আসিবার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করিতেছে। কেহ তাহার সাহায্য করিতে সাহস করিল না। অল্পক্ষণ পরেই তাহাকে আর দেখা গেল না।

এই দুর্ঘটনায় যাত্রীদিগের হৃদয়ে নিরাশার অন্ধকার আরও ঘনীভূত হইয়া আসিল। যাত্রী দল বিষণ্নহৃদয়ে আবার গ্রামে ফিরিয়া আসিল।

বাজারে ফিরিয়া হীরা গ্রামের সকল সংবাদ লইল; জানিল—জমীদার গ্রামবাসী; তিনি ঢাকায় মোক্তারী করিতেন; অর্থসঞ্চয় করিয়া দেশে ফিরিয়া বাসগ্রামের জমিদারী স্বত্ব ক্রয় করিয়াছেন। তিনি অত্যাচারী জমীদার। সে কালে যাহারা পরিজনবর্গের নিকট হইতে দূরে যাইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিত, তাহাদের অনেকে নানা দোষে দুষ্ট হইত—রায় মহাশয়ও অব্যাহতি পান নাই। গ্রামের অন্য সকলের সন্ধান লইয়া হীরা শুনিল, গ্রামে এক জন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করেন;—তর্কালঙ্কার মহাশয় পরম পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ; তাঁহার টোলে নানা স্থান হইতে সমাগত ছাত্রগণ শিক্ষালাভ করে। সব শুনিয়া হীরা তাঁহার নিকট মনোভাব ব্যক্ত করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিল।

৪

মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই হীরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইল। গৃহের সম্মুখে উদ্যান; সেই উদ্যান হইতে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পূজার পুষ্পচয়ন হইয়া থাকে। ফুল প্রকৃতির ভাণ্ডারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন; তাহা দেবতার প্রাপ্য। তাহার পর কয়খানি গৃহ। চণ্ডীমণ্ডপে কয়খানি তক্ত-পোষ, সেগুলির উপর মাদুর পাতা; তাহাতে বসিয়া ছাত্রগণ কেহ ব্যাকরণ, কেহ কাব্য, কেহ স্মৃতি, কেহ বা ন্যায় অধ্যয়ন করিতেছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় ধূমপান করিতে করিতে সকলকে দুর্বোধ পাঠ সরল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন। এমন সময় হীরা যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় মুখ তুলিয়া সম্মুখে অপরিচিতাকে দেখিয়া মনে করিলেন, কোন ব্যবস্থা লইবার জন্য রমণী তাঁহার নিকট আসিয়া থাকিবে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?"

হীরা বলিল, "আমি রথের যাত্রী। আমার নাম হীরা।"

"তুমি কি একা যাইতেছ? সঙ্গে কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই?"

"আমি নর্ত্তকী।"

তর্কালঙ্কার কিছু বিস্মিত হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার নিকট কি প্রয়োজনে আসিয়াছ?"

হীরা বলিল, "আমি আপনার নাম শুনিয়া আপনার নিকট সাহায্য ও উপদেশ প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।"

"কি বিষয়ে সাহায্য ?"

"আমি যাত্রীদিগের কষ্ট দেখিয়া বড় ব্যথা পাইয়াছি; বিশেষতঃ শিশুদিগের কষ্ট সহ্য করা যায় না।"

"তাই ত জগন্নাথের পথের কথা প্রবাদে পরিণত হইয়াছে।"

"এবার এই গ্রামে খালের সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আজ প্রাতে তথায় এক জন বাহক ডুবিয়া মরিয়াছে।"

"সে কথা শুনিয়াছি। সে দারিদ্র্যের উপর ধনের অত্যাচারের কাহিনী।"

তাহার পর তর্কালঙ্কার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করিতে চাও ?"

হীরা বলিল, "আমার কিছু অর্থ আছে; সে অর্থ ভোগ করিবার কেহ নাই। আমি বৃন্দাবনবাসিনী হইব। তথায় আমার সামান্য অভাব সামান্য অর্থেই পূর্ণ হইবে। আমার সঞ্চিত অর্থে আমি এই গ্রামের পথ ও সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিতে চাহি; সেই বিষয়ে আপনার উপদেশ ও সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি।"

তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শিষ্যগণ বিস্মিত হইয়া হীরার কথা শুনিতেছিল; এখন অধ্যাপকের মুখের দিকে চাহিল।

তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, "বৎসে, তোমার এ সঙ্কল্প উত্তম। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। কিন্তু আমি একক এ বিষয়ে কিছু বলিতে পারি না। আমি আজই গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদিগকে ডাকিয়া এ কথা বলিব।"

হীরা জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কখন আবার চরণে উপস্থিত হইব ?"

"আজ রাত্রিতেই আমরা মত স্থির করিব।"

"আমি আগামী কল্য প্রাতে আবার আসিব।"

তর্কালঙ্কার মহাশয়কে প্রণাম করিয়া হীরা প্রস্থান করিল।

তর্কালঙ্কার ছাত্রদিগকে বলিলেন, "দেখ, সবই ভগবানের লীলা। তিনি কাহাকে দিয়া কোন কায করান, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। এই রমণী চিরদিন বিলাসে সুখে অভ্যস্তা, আজ ইহার পাষাণ-হৃদয় হইতে করুণার

তর্কালঙ্কার মহাশয় সেই দিনই গ্রামের প্রধান ব্যক্তিদিগকে সংবাদ দিলেন। স্থির হইল, সন্ধ্যার পর সকলে গ্রামের জমীদার নবীনচন্দ্র রায়ের গৃহে সমবেত হইবেন।

৫

তর্কালঙ্কার মহাশয় সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করিয়া রায় মহাশয়ের গৃহে আসিলেন। তখন গ্রামের প্রধান ও প্রবীণ ব্যক্তিরা অনেকেই তথায় সমাগত হইয়াছেন। রায় মহাশয়ের অনতিবৃহৎ বৈঠকখানা ঘরে ঘর-জোড়া গালিচা— তাহার উপর সেজে 'গেলাস' জ্বলিতেছে। তর্কলঙ্কার মহাশয়কে উপস্থিত দেখিয়া রায় মহাশয় বলিলেন, "এই যে,—ঠাকুর মহাশয় আসিয়াছেন।" তিনি উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তর্কালঙ্কার মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিলেন।

নবীনচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি উপলক্ষে আমার গৃহে আপনার পদধূলি পড়িল?"

তর্কালঙ্কার মহাশয় হীরার প্রস্তাবের বিষয় বলিলেন। তাহা শুনিয়া গ্রামের অনেকেই বিশেষ আনন্দ ও আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা যতক্ষণ সম্মতি প্রকাশ করিতেছিলেন, নবীনচন্দ্র ততক্ষণ একটি কথাও বলেন নাই। তাঁহাকে নীরব দেখিয়া তাঁহার আশ্রিত ও অনুগত কয় জন লোকও নীরব ছিলেন। তাঁহাদের কথা শেষ হইলে নবীনচন্দ্র বলিলেন, "তর্কালঙ্কার মহাশয় যাহাই বলুন, আমি এ প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না।"

তর্কালঙ্কার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "প্রথমতঃ মানিয়া লওয়া হয়, আমরা আপনারা গ্রামের রাস্তা বাঁধাইতে পারি না।—"

তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, "সত্য কথা।"

নবীনচন্দ্র বলিলেন, "কে বলিল? আমরা চেষ্টা করি নাই। দ্বিতীয়তঃ, আমরা কি নর্ত্তকীর দান লইব?"

"নর্ত্তকীর দান তুমি বা আমি লইব না।"

"এ ত আমাদের সকলেরই লওয়া হইবে।"

"এরূপ দান সাধারণে লইয়া থাকে। তীর্থস্থানে নর্ত্তকীর অর্থে নির্ম্মিত মন্দিরে ব্রাহ্মণও দেবপূজা করিয়া থাকেন।"

"ব্রাহ্মণগণ যাহা করেন, করুন; আমি করিব না। নর্ত্তকীর রাস্তায়

নবীনচন্দ্রের উদ্ধত ব্যবহারে ও অন্যায় কথায় ব্রাহ্মণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তর্কালঙ্কার উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন, "তোমার মত অধর্ম্মাচারীর দানগ্রহণে যদি পাপ না থাকে, তবে নর্ত্তকীর দানগ্রহণেও পাপ নাই।"

তর্কালঙ্কার সে গৃহ ত্যাগ করিলেন। সভাস্থ সকলে স্তম্ভিত হইয়া কোন আসন্ন অজ্ঞাত দুর্ঘটনার আশঙ্কা করিতে লাগিল। অপমানিত নবীনচন্দ্র ক্রোধে বাতাহত অশ্বত্থপত্রের মত কাঁপিতে লাগিলেন।

৬

তর্কালঙ্কার মহাশয় গৃহে ফিরিয়া গৃহিণীকে ও ছাত্রদিগকে বলিলেন; "এত দিনে এ গ্রামের বাস উঠিল।" তিনি সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়া, তাঁহাদিগকে আপনার গ্রাম-ত্যাগের সঙ্কল্প জানাইলেন। সে রাত্রিতে তর্কালঙ্কারের গৃহে কাহারও নিদ্রা হইল না।

হীরা প্রভাতে আসিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয়কে প্রণাম করিল। তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিলেন, "বৎসে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না।" হীরা বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল। এই কথায় তাহার মুখ ম্লান হইয়া গেল। তর্কালঙ্কার মহাশয় তাহা লক্ষ্য করিলেন; বলিলেন, "তুমি নিরাশ হইও না; পুণ্য সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিও না। এ গ্রামের চরিত্রহীন ভূস্বামী নর্ত্তকীর দান লইতে কুণ্ঠিত। কিন্তু তোমার এ সাধু সঙ্কল্প ভগবান কার্য্যে পরিণত করাইবেন। অসাফল্যে নিরুৎসাহ হইও না।"

হীরার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িল। সে তর্কালঙ্কার মহাশকে পুনরায় প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল; ভাবিতে ভাবিতে গেল, কি দোষে সে লাঞ্ছিত? তাহার অনাথা জননী শিশু কন্যাকে লইয়া যত দিন পারিয়াছিলেন, দারিদ্র্যের ও প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন; শেষে শুধু জীবনরক্ষার জন্য নর্ত্তকীর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। তখন গ্রামের সম্পদসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহেন নাই। তাহার পর সে—সমাজচ্যুতা আশ্রয়হীনা অবস্থায় সেই ব্যবসায়ই অবলম্বন করিয়াছে; পাপের পঙ্কিল প্রবাহে ভাসে নাই। সে অধিক ঘৃণার্হ, না, যে সকল কুলনারী সন্তান, সম্মান ও সম্পদ—তিনেরই অধিকারিণী হইয়াও স্বেচ্ছায় পাপপ্রবাহে অঙ্গ ঢালিয়া দেয়—যে সকল পুরুষ রমণীর

পারিল না। কিন্তু সে জানিত না, সে পাপের প্রবাহে অবগাহন করিতে চাহে নাই, ঢাকার মোক্তার নবীনচন্দ্র রায়ের ঘৃণার্হ প্রস্তাব ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তাই আজ সে লাঞ্ছিতা—তাই আজ তাহার পুণ্যপথে এই বাধা।

৭

হীরা ভাবিতে ভাবিতে বাজার ছাড়াইয়া নদীতীরে গেল,—বজরায় উঠিল। তখন আবার বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃতি যেন তাহারই মত বিষাদকাতরা। ধরণী স্বচ্ছান্ধকারে আচ্ছন্না ও নববারিপরিপ্লুতা—বিষণ্ণা। সুবর্ণময়ী-কশাতুল্য-বিদ্যুত্তাড়িত নভোমণ্ডল যেন অন্তঃস্তনিত নির্ঘোষে আপনার ব্যথা জানাইতেছে। বজরায় ক্ষুদ্র কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া সে আপনার নিঃসঙ্গ শয়নে লুটাইয়া কাঁদিল—কি দোষে—কোন পাপে তাহার এ লাঞ্ছনা?

মধ্যাহ্নে মাঝীদিগের আহার শেষ হইলে সে বজরা ছাড়িতে বলিল। তখনও বর্ষণ চলিতেছে; তাহার উপর আবার প্রবল প্রতিকূল বাতাস বহিতেছে। বৃহৎ বজরার গতি অত্যন্ত মন্দ হইয়া আসিল। মাঝীরা গুণ টানিতে তীরে নামিল। গুণের পথ ডুবিয়া গিয়াছে—জল ভাঙ্গিয়া মাঝীরা বহুকষ্টে গুণ টানিয়া চলিল। কিন্তু তাহারা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। যে স্থানে খাল আসিয়া নদীতে পড়িয়াছিল, সেই স্থানে খালের প্রবল প্রবাহে নদীতে ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃষ্ট হইয়াছিল—দুই পারে পথ ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। আরও কতকগুলি নৌকা সেই স্থানে আসিয়া আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। যে পারের গ্রামে হীরা লাঞ্ছিতা হইয়াছিল, তাহার পর পারে কতকগুলি লোক দূরে দাঁড়াইয়া নদীর প্রবাহ দেখিতেছিল। তাহাদের বেশ দেখিয়া হীরা বুঝিল, তাহারা উচ্চবর্ণসম্ভূত নহে। সন্ধান লইয়া সে জানিল, সে গ্রামে 'ভদ্রলোকে'র বাস নাই—কৈবর্ত্ত, ধীবর ও নমঃশূদ্র—এই তিন জাতীর লোকের বাস। অগ্রসর হইতে না পারিয়া হীরার বজরা কূলে ভিড়িতে হইল। হীরা গ্রামবাসিগণের নিকট নদীর কূলে রাস্তা বাঁধাইয়া দিবার প্রস্তাব করিল। ভদ্রলোকেরা তাহার যে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, এই গ্রামের অধিবাসীরা সে প্রস্তাবে সাগ্রহে সম্মতিদান করিল। তাহাদের পঞ্চায়তে সে দান গ্রহণ করা স্থির হইল।

যেমন চন্দ্র শোভা পায়, তাহার মনে তেমনই আনন্দ প্রদীপ্ত হইল। তখন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সেই কথা হীরার মনে পড়িল, "তোমার এ সাধু সঙ্কল্প ভগবান কার্য্যে পরিণত করাইবেন।" ব্রাহ্মণের বাণীতে সে যেন দেবতার আশ্বাস শুনিয়াছিল, মনে হইল।

৯

সে বৎসর আর হীরার পুরী যাওয়া হইল না। সে গ্রামের দুই জন মণ্ডলকে সঙ্গে লইয়া গৃহে ফিরিয়া গেল, এবং তাহাদিগের নিকট রাস্তা-নির্ম্মাণের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ আবশ্যক অর্থ দিল।

পর বৎসর পুরী যাইবার পথে হীরার বজরা পূর্ব্ববারের মত বাজারের ঘাটে ভিড়িল। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া হীরা জানিল, তিনি সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন;—তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্য ব্রাহ্মণগণও সে গ্রাম ত্যাগ করিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জমীদার সাদরে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন। সেই গ্রামে যাইয়া হীরা তর্কালঙ্কার মহাশয়ের চরণবন্দনা করিয়া আসিল। তিনি তাহার কার্য্যে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

হীরার বজরা তাহার অর্থে নির্ম্মিত পথের নিকটবর্ত্তী হইলে সে মাঝীদিগকে উঠিয়া নৌকা বাহিয়া যাইতে বলিল। সে পথ দেবতার নামে উৎসৃষ্ট; তাহা সে তাহার প্রয়োজনে ব্যবহার করিবে না। যাইবার ও ফিরিবার সময়ে সে এত গোপনে গতায়াত করিয়াছিল যে, গ্রামবাসীরা তাহার গমনাগমনের বিষয় জানিতেও পারে নাই।

* * * * *

দেড় শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার আর সে রূপ নাই। নূতন সভ্যতার সহচর রেল-পথের ও রাজপথের বাহুল্যে দেশের জলধারার পথ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিল শুকাইয়া উঠিয়াছে। খালের গর্ভে ধান্য জন্মিতেছে। নদীর স্রোত শীর্ণ, শৈবালদলজড়িত, রোগাশ্রয়। এখন আর বর্ষায় নদী কূল ছাপাইয়া যায় না। সবই এখন পরিবর্ত্তিত। কিন্তু আজও লাঞ্ছিতা নর্ত্তকীর সেই পথ বর্ত্তমান। পথ বহুদিন অসংস্কৃত,—জীর্ণ। কিন্তু আজও যখন বর্ষার ধারাপাতে মাঠ ভাসিয়া যায়, তখন 'হীরা নটীর জাঙ্গাল'ই গ্রামবাসীদিগের যাতায়াতের একমাত্র উপায়।

বিদ্যাসাগর।

সঙ্গীত

(১)

তারকা নিবিয়া যায়; তথাপি অসীম ব্যোমে
অযুত বরষ বাহি' তাহার কিরণ ভ্রমে!
সঙ্গীত থামিয়া যায়; তথাপি স্মৃতির মাঝে
মানব-জীবন ব্যাপি' তাহার ঝঙ্কার বাজে!
কুসুম শুকায়ে যায়; তাহার সৌরভরাশি
প্রভাত-পবন সনে কাননে বেড়ায় ভাসি'!
প্রতিভা চলিয়া যায়; তাহার মহিমা জাগে—
ভকতি করুণা স্নেহে ক্ষমায় সেবায় ত্যাগে!

(২)

বিদ্যাসাগর করুণাসাগর
শৌর্য্যসাগর তুমি,
তোমারে পাইয়া আমরা ধন্য,
ধন্য ভারতভুমি।
জলধির মত গভীর উদার,
শ্যামল কোমল সম বসুধার,
পর্ব্বতসম দৃঢ় ও সমুচ্চ,
নীল অম্বর চুমি।
প্রচার করেছ জীবনে যে কাজ,
সাধিয়াছ সেই কাজে,
করেছ তুচ্ছ অরির ভ্রুকুটী,
জীবন-সমর মাঝে।
কাঁদিয়াছ তুমি পরের জন্য,
মাথায় করিয়া নিয়েছ দৈন্য,
তোমারে পাইয়া আমরা ধন্য,
ধন্য ভারতভুমি।

আদালতের অবমাননা।

লাউসেন ডিপুটী সেকালের। বাষট্টি বৎসর বয়ঃক্রমে পেন্সন লইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। গেজেটভুক্ত কর্ম্মচারিগণের ইতিহাসে তাঁহার বয়স বাহান্ন। পুত্র নসীরামের মতে তাঁহার পিতার বয়স পঞ্চাশ বৎসর মাত্র। পুত্রের মাতার বিবেচনায় চল্লিশ। গোবিন্দ উকীলের মতে বাহাত্তর বৎসর। হরে দরে পঞ্চান্ন।

আমরা বলিতেছি ১৮৮১ সালের কথা। মুলতানপুরের বিখ্যাত ম্যাজিষ্ট্রেট ক্রোটন সাহেব গবর্মেণ্টকে লিখিলেন,—"এখানে দাঙ্গার মোকদ্দমা ক্রমেই বাড়িতেছে। আমার কর্ম্মচারী ডিপুটীগণ প্রায়ই অল্পবয়স্ক। এক জন বিচক্ষণ পাকা ডিপুটী চাহি।"

ইহারই উত্তরের সহিত লাউসেন্ ডিপুটী আসিয়া পড়িলেন। রমানাথ উকীলের এক জন বন্ধু লিখিয়াছিলেন,—"ডিপুটীবাবুর জন্য ২০৲ টাকা ভাড়ায় (কিংবা কমে যদি হয়, তবে বেশী উপকৃত হইব) একটা দোতলা বাড়ী চাহি। সম্মুখে উদ্যান, পশ্চাতে পুকুর থাকিবে। পাইখানা চারিটী চাহি, একটি গৃহিণীর জন্য, একটি পুত্র নসীরামের জন্য, একটি ছোট ছেলেপিলেদের জন্য, এবং একটি ঝির জন্য। কর্ত্তা যখন যেটাতে খুসী যাইবেন। তাঁহার ও বিষয়ে বড় মন নাই। অগ্নিমান্দ্যগ্রস্ত, এবং আফিং খান। ভৃত্যগণ মাঠে যাইবেক। বাসাটি যেন নির্জ্জন স্থানে হয়।"

আমার পিতৃব্য 'মধু খুড়ো' রমানাথ বাবুর পৃষ্ঠপোষক। চিঠি পাইয়াই ইতস্ততঃ বাসার অনুসন্ধানে ছুটিলেন। প্রথমে কোথাও উক্ত প্রকারের বাসা প্রশংসিত ডিপুটীর জন্য পাওয়া গেল না। কিন্তু খুড়ো আমার বহুদর্শী লোক। রামসহায় দারোগার সাহায্যে তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর বাটী আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন। সেটা স্থানীয় এক জন হিন্দুস্থানী জমীদারের বাগানবাটী। আম্র, লিচু, কাঁটালে পরিপূর্ণ বাগান, পুষ্করিণী ভরা মাছ, পুষ্পোদ্যানে লতাকুঞ্জে শোভিত।

মধু খুড়ো ষ্টেশনে গিয়া ডিপুটীর সম্ভাষণার্থ পাইচারী করিতে লাগিলেন। 'সিনিয়র' ডিপুটীবাবু পূর্ব্ববঙ্গস্থ, কিন্তু অনেক দিন এ দেশে থাকিয়া 'শুদ্ধ' ভাষাতেও কথা কহিতে পারেন, এমত শুনা গিয়াছে।

হুস্ হুস্ করিয়া ট্রেণ আসিল। হঠাৎ এক জন লোক গাড়ী হইতে লাফাইয়া চেঁচাইল, "রমানাথ বাবু আসছ্যান্ কি ?"

মধু খুড়ো অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "তোমার নাম কি ?"

উত্তর,—"হলধর। আমি ডিপুটী সাহেবের ভৃত্য, কর্ত্তা দ্যাড়া মাশুলে।"

তৎক্ষণাৎ কোর্ট কন্‌ষ্টেবলের সাহায্যে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী হইতে কর্ত্তা অবরোহণ করিয়াই চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

"কই, রমানাথ বাবু আসছ্যান না ?"

মধু। হুজুর ! আমি মধু মোক্তার, আমি তাঁহার অনুমতিক্রমে আসিয়াছি।

কর্ত্তা। ব্যাশ। পোলাপানেরে দেখ্যা লও। বাসা ঠিক ?

মধু। আজ্ঞা হাঁ।

২

একালের ডিপুটীগণের বাদা চিংড়ীর মত ততটা আদর নাই। কিন্তু পূর্ব্বে ছিল। সং-এর মত হইলেও লোকে ভয় করিয়া চলিত ; কেন না, তখন নিম্ন আদালতের একটা আত্মগরিমা ছিল। এখন দুই তরফ হইতে ধাক্কা খাইয়া তাহা উঠিয়া গিয়াছে। ভালই হইয়াছে ; কেন না, ধাক্কা খাইলে মানুষ অপদস্থ হয় বটে, কিন্তু আত্মা পদস্থ হয়।

ডেপুটী বাবু সাহেবকে সেলাম দিয়া ১০টার সময় বাটীতে ফিরিয়াছেন। ভৃত্য হলধর হুক্কা বোঝাই করিয়া বসিয়া আছে। পুত্র নসীরাম রেলে রাত্রি-জাগরণ বশতঃ গাছে উঠিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গৃহিণী 'ঝাল কাসন্দী' বোতল হইতে বাহির করিতেছেন, এবং পাচক রন্ধনশালায় চুনাপুঁটী ভাজিতেছে। দুইটি ক্ষুদ্র উলঙ্গ বালক রামসহায় দারোগার উর্দী ধরিয়া টানিতেছে। দারোগা সাহেব তাহাদিগকে ডিপুটী সাহেবের পুত্র ভাবিয়া 'চুমকুড়ি' প্রদানপূর্ব্বক খাতির করিতেছেন। ঝি বামাসুন্দরী পার্শ্বের ঘর হইতে স্বীয় পুত্রগণের আদর দেখিয়া সগর্ব্বে দারোগা সাহেবের দিকে কটাক্ষপাত করিতেছে। হরিচরণ পেশ্‌কার হস্তযোড় পূর্ব্বক সিড়ির নীচে দাঁড়াইয়া আছে।

লাউসেন ডিপুটী বাহিরে আসিবামাত্র বালকগণ পলাইয়া গেল, এবং ভৃত্য হুক্কা যোগাইল।

দারোগা সসম্ভ্রমে সেলামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুরের কোনও অসুখ

ভৃত্য হলধর বলিয়া উঠিল, "কর্ত্তার বহুমূত্র রোগ আছে।"

ইহাতে কর্ত্তা চটিয়া বলিলেন,—"শা—, তুই যা! বেআদব—।"

দারোগা। অত্যন্ত বেয়াদব।

লাউসেন। কিন্তু পুরাতন ভৃত্য। ইহার সাত পুরুষ আমার পিতার অন্নে প্রতিপালিত।

দারোগা। তবে গোস্তাকি মাফ করা যাইতে পারে।

লাউসেন। ও লোকটি কে?

দারোগা। পেশকার সাহেব। আমরা উভয়েই লালা কায়স্থ। ছাপরা জেলায় বাড়ী।

লাউসেন। ব্যাশ্। আমি হিন্দুস্থানী দ্যাশে লালা কর্ম্মচারীই পছন্দ করি। প্যাশকার! এ দিকে আইস।

পেশকার বিনীতভাবে আসিয়া হুজুরের শুভাগমন সম্বন্ধে গাহিলেন, এবং হুজুরের পূর্ব্বপুরুষ (অর্থাৎ, পূর্ব্বে যিনি ডিপুটী ছিলেন) সম্বন্ধে অনেক নিন্দাবাদ করিয়া ডিপুটী বাবুর মন যোগাইলেন।

লাউসেন। বোধ হয় তিনি ডালি লইত্যান্।

পেশকার। বহুত, এবং তজ্জন্য সকলে চটিয়া ডালি বন্ধ করিয়াছে। এখন কোনও—দেয় না।

লাউসেন। সেটাও অবমাননা। তবে সামান্য ডালির তরে ধর্ম্মভ্রষ্ট—কি কও দারোগা সাহেব?

দারোগা। অবশ্য। এইরূপ অন্ততঃ অনেকের মত।

পেশকার। সেই আসল কথা। ধর্ম্ম রক্ষা করা উচিত।

তাহার পর সকলে সকলের দিকে তাকাইলেন, এবং উভয়ে ডিপুটী বাবুকে সেলাম করিলেন, এবং ডিপুটী বাবু গম্ভীরবদনে বসিয়া রহিলেন।

৩

লাউসেন ডিপুটী এজলাসে বিরাজ করতঃ অপ্রতিহত প্রভাবে শাসন, তর্জ্জন ও গর্জ্জন দ্বারা অল্প দিবসের মধ্যেই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

মধু মোক্তার ও রমানাথ উকীলের পসার বাড়িতে লাগিল। উকীল-মহলে একটা কমিটী হইল। গোবিন্দ বাবু তাহার সভাপতি।

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, "বিচারক তিন প্রকার,—'স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিদ'। এটা মনুসংহিতার মত। উদ্ভিদ বিচারক ভুঁইফোড়। তিনি

নিজের গুণে শাসন করেন, এবং লোকরঞ্জক হন। স্বেদজ হাকিম মাথার ঘাম মাটীতে ফেলিয়া অন্নসংস্থান করে মাত্র। স্বেদজের অনেক 'ব্রাঞ্চ' (শাখা) আছে। অণ্ডজ হাকিম পর্দ্দানসীন।"

গোলক বাবু বলিলেন, "ইনি কি প্রকার?"

গোবিন্দ। ঠিক বুঝা যাইতেছে না।

গোলক। আসল কথাটা কি?

যদুনাথ মোক্তার নম্রস্বরে বলিল, "বুঝা বড় শক্ত। সদ্বিচার না হয়, ক্ষতি নাই; কিন্তু এক দলের প্রতিপালনার্থ অন্য সকলের অন্ন মারাটা কি রকম,— বুঝিতে পারা যায় না।"

গোলক। বিনয় বাবু! কি বল?

বিনয় বাবু ব্রাহ্ম। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমি কিছু বুঝি না। ঈশ্বরের বিধান শীঘ্রই শান্তি আনয়ন করিবে।

গোলক। আইনের ত কোনও ধার ধারেন না।

গোবিন্দ। সেটা আপীলের পক্ষে ভাল।

গোলক। শীঘ্র চটিয়া যান।

গোবিন্দ। সেটা আরও ভাল। চটিলে আর জ্ঞান থাকে না। জ্ঞান না থাকিলে মাথা ঠিক রাখা যায় না। যত ভুল হয়, ততই ভাল।

যদু মোক্তার। সে দিন আমার মক্কেল ধনুর্ধারী সিংহের বিরুদ্ধে ৩০৪ দফায় মোকদ্দমা চলিয়াছিল।

গোবিন্দ। খুন?

যদু। না; সিং মহাশয়ের গরু হঠাৎ দড়ি খোলা পাইয়া বলদেবের ছেলেকে গুঁতাইয়া মারে। ইহাতে রামচন্দ্র খুনের দাবীতে অভিযুক্ত হয়। দায়রাতে সোপর্দ্দ হইয়াছিল। জ্যাকসন আসিয়া খালাস করিয়া লইয়াছে।

গোলক। ছলিম খাঁ তাহার পত্নীকে আবদুল্লার নিকট রাখিয়া মক্কায় গিয়াছিল। তীর্থ হইতে আসিয়া তাহাকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় পাইয়া নালিস ঠুকিয়া দেয়।

গোবিন্দ। ৪৯৭ ধারায়? আমার ত বিশ্বাস হয় না। আবদুল্লা নিজে হাজি, বৃদ্ধ, এবং ধর্ম্মপরায়ণ।

গোলক। অতএব বিশ্বাসঘাতকতার 'চার্জ্জে' ৪০৮ ধারায় তাহার

সকলে হাসিল। গোবিন্দ বলিলেন, "দেখ দাদা, এ স্থলে সোজা উপায়, চটান। ঘোরতর চটিলেই উনি প্রস্থান করিবেন। আমি একবার দেখিব।"

৪

একটা সঙ্গীন মোকদ্দমার বিচারে প্রায় সপ্তাহ কাটিয়া গিয়াছিল। লাউসেন-চন্দ্র আদালত হইতে আসিয়া শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া চেয়ারে লম্বমান। হলধর গাড়ু ও হুক্কা জলপূর্ণ করিয়া উপস্থিত।

লাউসেন। নসীরামকে দেখছি না? সে ইস্কুল হ'তে আস্ছে?

হলধর। হঃ।

লাউসেন। ডাকিয়া ল'।

নসীরাম অনেকটা সজলনয়নে ও অনেকটা গম্ভীরমুখে বলিল যে, তাহার স্কুল কামাই হওয়াতে জরিমানা হইয়াছে।

লাউসেনচন্দ্র শুনিয়া অত্যন্ত চটিলেন। "তুমি ব্যাআড়া বান্দর, আমি পূর্ব্ব হইতেই জান্‌ছি, তোমার ল্যাখাপড়া হবা না।"

নসীরাম বলিল, তাহার ঘুসাচিংড়ী খাইয়া পেট কামড়াইয়াছিল।

লাউসেন। ঝি! এ দিক আস'। তুমি বাজার হত্যা ঘুস্যা চিংড়ী আন' কার লাগ্যা?

কথা শুনিয়া গৃহিণী আসিলেন। বাজার-খরচের মোটে কুড়ি টাকাতে সঙ্কুলান হয় না; এবং এত কম পয়সায় কালিয়া কোর্ম্মা হওয়া অসম্ভব।

"তোমার তামাকুতেই দিনে ছয় পয়সা লাগে।"

লাউসেন আরও চটিলেন।—"আমার তামাকুর উপর তোমার ব্যাআড়া দৃষ্টি ভাল ঠ্যাকে না। তোমার পাতার গুঁড্যার (দোক্তা) খরচ কত, তা আগে হিস্যাব কর।

হলধর বলিল। "হঃ।"

গৃহিণী সরোষে হলধরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তুই বাড়ী হত্যা এখনি বারায়া যা।"

তৎপরে ভয়ানক ক্রন্দনধ্বনি আরম্ভ হইল।

কর্ত্তা ক্ষীণভাবে বলিলেন, "আরে, আমি যা বলছিলাম, সেডা তা না। বৃদ্ধ বয়সে কাতর হইয়া পড়ছি। তোমরা সকলে মিল্যা আমাকে মারবা। কি বিপর্য্যয় সংসার।"

ঝি আসিয়া গৃহিণীকে লইয়া গেল। হলধর আবার তামাকু বোঝাই করিল।

হলধর। মাছের অভাব কি? কর্ত্তার হুকুম পালি' আমি এই পুষ্করিণী হইতেই মাছের কিনারা করিয়া লইত্যাম।

কর্ত্তা। যাও, এ সংবাদ বাটীর মধ্যা দাওগা। আমি ত্যক্ত হইছি। নশীরাম! তোর ইস্কুলের হেডম্যাষ্টর কেডা?

নশীরাম। হেডমাষ্টার জগদীশ বাবু, কিন্তু গোবিন্দ উকীল সেক্রেটরী। হেডমাষ্টার জরিমানা মাফ কর্ত্তি চাইছিল্যান, কিন্তু গোবিন্দ বাবু মঞ্জুর করেন নাই।

কর্ত্তা। আচ্ছা, তুই যা; আমি গোবিন্দকে কাল দেখে লব'নে।

৫

আদালতে লোকারণ্য। দাঙ্গার মোকদ্দমা। প্রায় ১২০ জন সাক্ষী। আসামীর পক্ষে গোবিন্দ উকীল, এবং পৃষ্ঠপোষক আরও ছয় জন। বাদীর তরফে মধু মোক্তার ও কোর্ট বাবু।

কনষ্টেবল লছমন সিংহ পয়সা আদায়ের ফিকিরে চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছিল। রামসহায় দারোগা ও ফাঁড়ির হেডকনষ্টেবল বৃক্ষতলায় সাক্ষীর নিকট মোতায়েন ছিল।

প্রথম সাক্ষীর জেরা আরম্ভ হইল। গোবিন্দ বাবুর সঙ্গীন জেরা। সাক্ষীর কালঘাম ছুটিতেছিল।

গোবিন্দ। যখন ৩নং আসামী তোমাকে মারে, তোমার মুখ কোন দিকে ছিল?

সাক্ষী। পশ্চাৎভাগে।

গোবিন্দ। (আদালতের প্রতি) এটা রেকর্ড করিতে আজ্ঞা হউক।

ডিপুটী। আরে রও। (সাক্ষীর প্রতি) এডা ক্যাম্‌নে? তুমি সম্মুখে, তোমার মুখ পশ্চাৎভাগে? তা হলি দাঙ্গাকারীকে দেখ্‌তে পাইলা কিরূপে? বোধ হয় সে পশ্চাৎ হতি মার্‌ছিল।

গোবিন্দ। হুজুরের এরূপ সঙ্কেত করা অন্যায়। সাক্ষীর পূর্ব্ব জবানবন্দীতে বেশ জাহির হইয়াছে যে, দাঙ্গাকারী সম্মুখ হইতে মারিয়াছিল। আমার আপত্তি রেকর্ড করিতে আজ্ঞা হউক।

ডিপুটী। আমার বোধ হয় সাক্ষী 'উইন ওভর' হইছে। নচেৎ পশ্চাৎ-

গোবিন্দ। এটা স্বাভাবিক। হুজুরেরও যাইয়া থাকে।

ডিপুটী। (সরোষে) আমি সাক্ষীকে হাজতে পাঠাইতে চাই।

গোবিন্দ। অকারণে।

ডিপুটী। এভার নজীর আছে। সাক্ষীর মুখ পশ্চাৎভাগে যাইলে সে আসামীর তুল্য। সাক্ষী সম্বন্ধীয় আইন দেখিয়া লন।

গোবিন্দ। আমি ঢের দেখেছি। আপনার দেখা উচিত। ১৮৭২ সনে 'এভিডেন্স অ্যাক্টে'র সৃষ্টি।

ডিপুটী। তোমার বাবাকে আইন পড়াইতি পারি।

গোবিন্দ। ডিম্ব পড়াইতে পারেন।

ডিপুটী। তুমি ডিম্ব তুলিয়া আমার অবমাননা করছ?

গোবিন্দ। আপনি বাপ তুলিয়াছেন।

ডিপুটী। গোবিন্দা! আদালতের অবমাননা হইছে। প্যাশকার! আইনের দফা বাহির কর।

পেশকার। কোন দফা?

ডিপুটী। দফাটা মনে নাই, সূচীপত্র দ্যাখ।

সৌভাগ্যক্রমে কার্যবিধি আইনের সূচীপত্রে দফা বাহির করিতে সময় লাগিল। ক্রোধের আতিশয্যে লাউসেনচন্দ্রের সম্পূর্ণ আইন-বিস্মৃতি ঘটিল। ইত্যবসরে গোবিন্দ উকীল একবার হো হো করিয়া হাসিলেন।

ডিপুটী উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "কনষ্টেবল্! ইহারে ধর।"

কন্‌ষ্টেবল্ ডিপুটীবাবুর চাকর হলধরকে দেখিতেছিল। সে হলধরকে জানিত না। হলধর বাদীর নিকট তামাকুর পয়সা আদায়ে ব্যস্ত ছিল। কন্‌ষ্টেবল তাহাকে গ্রেপ্তার করিবামাত্র সে চীৎকার করিয়া বলিল,

"কর্ত্তা! আমার তামাকুর পয়সাতি পাহারাওয়ালা বাগ্ চায়!"

ইহা বলিয়াই সে কন্‌ষ্টেবল্‌কে চপেটাঘাত করিল, এবং উভয়ে মল্লযুদ্ধ করিতে করিতে পড়িয়া গেল।

ইত্যবসরে উকীলবর্গ সরিয়া পড়িলেন। রৈ রৈ ব্যাপার! পেশ্‌কার তখনও আদালত অবজ্ঞা সম্বন্ধে দফা বাহির করিতে পারে নাই।

ডিপুটী বাবু বলিলেন, "তুমি মেচী! প্যাশ্‌কার! তুমি অপদার্থ। এক ঘণ্টায় দফাটা বাহির করবার পার্‌লা না!"

গোবিন্দ উকীল চম্পট দিয়া বার্-লাইব্রেরীতে গেলেন।

তৎপরে আর কোনও গোলযোগ হয় নাই।

এক সপ্তাহ পরে ডিপুটী বাবু "এ আর বড় সুবিধার না" ইহা ভাবিয়া

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী।—আষাঢ়। এই সংখ্যার প্রথমেই প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের অঙ্কিত 'বিরহী যক্ষ' নামক চিত্রের ত্রি-বর্ণে মুদ্রিত প্রতিলিপি। মেঘদূতের যক্ষ 'কনক-বলয়-ভ্রংশ-রিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।' যামিনী বাবুর যক্ষের উদ্যত করের প্রকোষ্ঠে কনক-বলয় বিদ্যমান ; অন্য প্রকোষ্ঠ উত্তরীয়ে আবৃত। অতএব, যক্ষের হস্তে দৃশ্যমান কনকবলয় কালিদাসের কল্পনা-কল্পিত যক্ষ-চিত্রের প্রতিবাদ বলিয়াই মনে হয়। প্রতিভাশালী চিত্রকর যামিনী বাবুর যক্ষ-কল্পনায় কোনও বিশেষত্ব নাই। যামিনী বাবু যে তুলিকায় কাদম্বরীর রাজসভা আঁকিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন, যক্ষের চিত্রে সে তুলিকা ব্যবহার করেন নাই, সে পদ্ধতির অনুসরণ করেন নাই। যক্ষের ইন্দ্রধ্বজতুল্য সুদীর্ঘ অঙ্গুলি দেখিয়া সহজেই বুঝা যায়, হাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের প্রবর্ত্তিত 'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র নমুনায় যামিনী বাবু তাঁহার যক্ষের কল্পনা করিয়াছেন। এ যক্ষও যেন 'যক্ষে'র মত যামিনী বাবুর কল্পনাকে কারারুদ্ধ করিয়া সাবধানে পাহারা দিতেছে। শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় 'অর্থার্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে' নামক চিত্রে যে উদ্ভট কল্পনার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা হাস্যাস্পদ। তাঁহার তুলিকা-পুত্র কুশকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়,—'তুমি কে বট হে? তোমায় চিনি চিনি করি, চিনিতে না পারি,—তুমি কে বট হে?' গিরীশ বাবুর গানের ভাষায় বলা যায়,—'সখী! নাহি জানিনু সোহি পুরুষ কি নারী!' অবশেষে মনে পড়ে,—এইরূপ চেহারা অজন্তার গুহাচিত্রে দেখিয়াছি। কিন্তু অজন্তার গুহা হইতে নির্গত হইয়া, মুক্তার মালা পরিয়া, চারপাই-শায়ী হইলেই রামবিজয়ী কুশ হওয়া যায় না। সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, চিত্রকর কালিদাসের কল্পনায় মসীলেপন করিয়া সহৃদয়-সমাজের মনোবেদনার হেতু হইয়াছেন। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিল্পের ত্রিধারা' নামক সন্দর্ভ উল্লেখযোগ্য ; তথ্যপূর্ণ। অবনীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—

'আমাদের শিল্পকারগণ প্রতিমা সকলের তিন লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন, 'সাত্বিকী রাজসী দেবপ্রতিমা তামসী ত্রিধা।' সাত্বিকী প্রতিমা হচ্চেন, 'যোগমুদ্রান্বিতা' ; রাজসী 'নানাভরণ-ভূষিতা' ; আর উগ্ররূপধরা হচ্চেন তামসপ্রতিমা। ['সত্বিকী' নয়, সাত্বিকী। সাহিত্য-সম্পাদক।]

'এই তিন গুণ যেমন পৃথক পৃথক প্রতিমায় দেখা যায়, তেমনি দেখি জগতের প্রাচীনতম তিনটা শিল্প,—ইজিপ্ত, ভারত, আর গ্রীক এই তিন গুণের সুস্পষ্ট তিনটা মুদ্রা প্রকাশ করিয়া আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে।

'প্রাচীন ইজিপ্তের যে সভ্যতা সর্ব্বগ্রাসী কালের সম্মুখে দম্ভভরে রাজদণ্ড উত্তোলন করিয়া মৃতদেহকে অবিনশ্বরতা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া, কালের প্রতাপকে রাজপ্রতাপের কবলে আনিয়া মর্ত্ত্যকে অমরত্ব দিবার প্রস্তাব করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই প্রভুত্ব-তামস প্রাচীন সভ্যতার শিল্পনিদর্শন নীলনদীতীরে নির্ব্বাপিত ইজিপ্ত রাজশ্রীর মরুশ্মশানে কালবিজয়িনী বিভীষণা বিস্ময়করী নারীসিংহের তামসী মূর্ত্তি!

'আর যে গ্রীক সভ্যতা কুস্তিগিরের খেলাকে (olympic games) অমর লোকের ক্রীড়া নাম দিত ; ভোগানন্দে যে গ্রীক্ জাতি নরদেহে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছে, তাহাদের শিল্প

'আর যে ভারত বৌদ্ধ বা প্রাচ্য সভ্যতা মায়ার মূল, দুঃখের মূল, আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরমানন্দ সাগরে নির্ব্বাণ-লাভ করিতে ব্যস্ত; যে যুদ্ধ করিয়া ইতিহাস লিখিবার বেলায় তারিখ, সৈন্যসংখ্যা, হতাহতের তালিকা ঠিক না রাখিয়া অভিরাম দেবচরিত্র বর্ণন করিয়া যায়; যে একচ্ছত্রী সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তি না রাখিয়া, করুণার অনুশাসন ধর্ম্মের অসংখ্য কীর্ত্তিস্তম্ভে জগতের বৃহত্তর সাম্রাজ্যখণ্ডকে নিরবচ্ছিন্ন মণ্ডিত করিয়া তোলে তাহার আর্য্য শিল্পের সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত ভাবঘন ধ্যানস্তিমিত সাত্ত্বিক মূর্ত্তি পার্থিব সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের পদ্মাসনে চরণ স্থাপন করিয়া প্রকাশিত আছেন। তিন প্রাচীন শিল্পের ঐ ত্রিধারা যে আবহমানকাল আপনার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে এমন নয়; দেশকালভেদে সেটাতে অল্পবিস্তর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে দেখা যায়,—যেমন রাজসিক গ্রীক্ শিল্পে প্রথমে তামসিক রোমান, পরে সাত্ত্বিক খৃষ্টীয়, শেষে জড়প্রধান ইউরোপীয় শিল্প; সত্ত্বগুণপ্রধান আর্য্যশিল্পে তামসী তান্ত্রিক ও রাজসিক মোগল শিল্প আসিয়া মিলিয়াছে।'

অবনীন্দ্র বাবু উপসংহারে ভারতীয় বৌদ্ধ শিল্পের মন্দির প্রভৃতির সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অবনীন্দ্র বাবু এই প্রবন্ধের ভাষায় শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুকরণ করিয়াছেন। অনুকরণ কখনও সফল হয় না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও তাহা বিফল হইয়াছে। অতিবিস্তৃতি দোষের পরিহার করিলে, প্রবন্ধটি আরও সংহত ও মনোজ্ঞ হইতে পারিত। ঠাকুর-বাড়ীর সকলেই যদি এই ভাবে ভাষার সংস্কারে ও নব-কলেবর-বিধানে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে 'সাত নকলে আসল খাস্ত' হইয়া যাইবে, বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'কবির নৈরাশ্য' নামক বালখিল্য কবিতায় কবির নাম নাই। কবি বলিয়াছেন,—'শব্দকল্পতরু' হইতে—'শব্দকল্পদ্রুমে' অরুচি হইল কেন?—চারুতর কথাগুলি চয়ন করিয়া

'জানাই তোমায় এ মোর হৃদয়াবেগ
বড় ইচ্ছা হায়!'

কিন্তু পারিলেন না, কেন না,

'শব্দগুলি ভেঙ্গে পড়ে শতচূর্ণ ধার!'

শব্দ শতচূর্ণ হইয়া যায়, তাহাও বুঝিলাম, কিন্তু শব্দের 'ধার' কি? কবির নিরাশ হইবার কারণ নাই; কেন না, 'ধার'ই ক্ষণভঙ্গুর। ছুরীর ধার, ক্ষুরের ধার—চূর্ণ না হউক,—পড়িয়া যায়। এমন কি, মহাজনের 'ধার'ও তামাদী হইয়া থাকে। আর ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন,—

'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার!'

অতএব, স্থানবিশেষে শব্দগুলির ধার ভাঙ্গিবে, তাহা বিচিত্র নয়। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'প্রতিঘাত' নামক চলনসই গল্পটি মন্দ নহে। শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'জন্মভূমি' নামক কবিতার দুই একটি চরণ মন্দ নয়। কিন্তু শব্দ-চয়নে লেখক অত্যন্ত উদ্দাম,—একেবারে 'নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ!' আর, ভাষা ও ছন্দের প্রসাধন ও পারিপাট্য যে কবিতার পক্ষে অপরিহার্য্য, অনেক অনুকারী কবি তাহা ভুলিয়া যান। অবশ্য, 'ঘষিয়া মাজিয়া রূপ' ও 'ধরিয়া বাঁধিয়া প্রেম' হয় না,—তবু যতটুকু বিধিদত্ত, ঘষিলে মাজিলে তাহা একটু উজ্জ্বল ও সুন্দর হইতে

ঘষিয়া, মাজিয়া লইতে হয়। 'পরলোকগত সেনাপতি সুরেশ বিশ্বাস' উল্লেখযোগ্য। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ফেলিসিয়ঁ। শ্যালের ফরাসী হইতে 'পাদশা' নামক একটি মনোরম নিবন্ধ চয়ন করিয়াছেন। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'যক্ষের নিবেদনে' সৌন্দর্য্য আছে; কিন্তু তাহা স্থানে স্থানে কষ্ট-কল্পনায় কলুষিত হইয়াছে।

'সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ! দাও হে কজ্জল, পাড়াও ঘুম,'

পড়িয়া একটু হতবুদ্ধি হইতে হয়। 'সূর্য্যের রক্তিম নয়ন' কি? রক্তিম সূর্য্য-বিম্ব বরং নয়নের সহিত উপমিত হইতে পারে,—কিন্তু তাহার 'রক্তিম নয়ন' কি? 'বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও' বলিলে মেঘ কি বুঝিবে? 'বৃষ্টির চুম্বন', না চুম্বনের বৃষ্টি? অথবা বৃষ্টি-রূপ চুম্বন? 'বৃন্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন' কালিদাসের—'আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং * * * সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি'—এই অতুলনীয় কবিতার প্রতিধ্বনি;—কিন্তু উদ্ধৃত অংশে মূল ভাব পরিস্ফুট হয় নাই, বরং সঙ্কুচিত ও অঙ্গহীন হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের শক্তি আছে; সাধনা করুন। ঔদাস্য ও অনবধানতায় শক্তির অপচয় হয়; আর 'স্নেহঃ পাপমাশঙ্কতে'—তাই সাবধান করিলাম। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ 'কারাগৃহ ও স্বাধীনতা' প্রবন্ধে আর এক পথে, আর এক ভাবে তাঁহার কারা-বাস-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অরবিন্দের ইংরাজী রচনাপদ্ধতি ও লিপিকৌশল অতুলনীয়। বাঙ্গালা রচনায় তিনি অভ্যস্ত নহেন। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে ও 'সুপ্রভাতে'র কারা-কাহিনীতে তিনি প্রতিপন্ন করিয়াছেন,—প্রতিভা অসাধ্য-সাধন করিতে পারে। তিনি বাঙ্গালা রচনায় যে মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন, অনেক নিপুণ লেখকের পক্ষেও তাহাও স্পৃহনীয়। অরবিন্দের রচনা হীরকের ন্যায় দীপ্তিশালী চিন্তা-স্তবকে সমুজ্জ্বল। প্রবন্ধের উপসংহার হইতে আমরা একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রবাসী।—বৈশাখ। রবীন্দ্র বাবুর 'গোরা' 'চলিতেছে'—বলিলে অন্যায় হয়,—ছুটিতেছে। শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের 'জ্যোতিষের রহস্য' মনোরম। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'প্রত্যাবর্ত্তন' নামক গল্পটি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। বহুকাল এমন সুন্দর গল্প পড়ি নাই। একটু সঙ্ক্ষিপ্ত হইলে গল্পটি আরও মানানসই হইত। শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজশোভন এবং কষ্টকল্পিত জাতীয় ভাব' নামক ক্ষুদ্র নিবন্ধটি বাঙ্গালীর ধ্যানযোগ্য। 'বিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি ও দর্শনীয় স্থানসমূহ' উল্লেখযোগ্য। বৈশাখে শ্রীযুত নন্দলাল বসুর অঙ্কিত 'মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য' নামক একখানি সুরঞ্জিত চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। মহাদেব তাণ্ডব-নৃত্য করিতেছেন, অথবা হাড়গিলের মত এক পায়ে দাঁড়াইয়া আছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। 'ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি'র অমোঘ নিয়মে মহাদেবের আলতা-মাখা পদতল একটু দীর্ঘ বলিয়াই মনে হয়। আর লতানে অঙ্গুলি—চম্পক নয়—লাউ-ডগাগুলি ত্রিশূলদণ্ডে জড়াইয়া আছে। মহাদেবের শ্মশ্রু নাই, গুম্ফ নাই;—'ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'র অনুরোধে চিত্রকর বহুজা নরসুন্দর হইয়া মহাদেবের সেই মান্ধাতার আমলের দাঁড়ী গোঁফ কামাইয়া দিয়াছেন। সৌভাগ্যক্রমে মাথার কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ মুণ্ডন করিয়া দেন নাই। এই স্বর্ণবর্ণ, কোমল, কুঞ্চিত চিকুর বোধ করি জটার কলা-কল্পনা। কালানলশিখা ও ভগ্নস্তূপের কল্পনা মনোজ্ঞ হইয়াছে। পৌরাণিক বর্ণনার অনুশীলন ও ধ্যান না করিয়া নন্দ বাবু যে মহাদেবের কল্পনা করিয়াছেন, তাঁহাকে অত্যন্ত 'নব্য' বলিয়া মনে হয়। মহাদেবকে 'নবীন' রূপে কল্পনা করিবার উদ্দেশ্য কি, বলিতে পারি না। এই সংখ্যায় প্রকাশিত, প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহের অঙ্কিত 'যম ও নচিকেতা' নামক চিত্রখানি প্রশংসনীয়। ইহাও 'ভারতীয় চিত্র'; কিন্তু 'ভারতীয় চিত্র-কলাপদ্ধতি'র অনুযায়ী অর্থাৎ স্বভাবের বিদ্রোহী বা উদ্ভট নহে। এই চিত্রে প্রিয় বাবুর কল্পনা, শাস্ত্রীয় গবেষণা ও চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি, তাঁহার কলা-সাধনা সফল হউক।

স্নানযাত্রার মেলা।

[পল্লী-চিত্র।]

এবার জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা উপলক্ষে অনেক যাত্রী বেঙ্গল নাগপুর রেলপথে পুরীধামে যাত্রা করিয়াছিল। আমি তীর্থযাত্রী নহি; তীর্থদর্শন পূর্ব্বক পুণ্যসঞ্চয়ের দুরাশাও আমার নাই; কিন্তু দীর্ঘকাল এই জনবিরল পল্লীপ্রান্তে বঙ্গজননীর স্নেহশীতল শ্যামাঞ্চলচ্ছায়ায় বসিয়া মাতৃভাষার সেবা করিতে করিতে মনে হইল, এরূপ একঘেয়েত্ব দুঃসহ, কোথাও একটু ঘুরিয়া আসা যাক্।

পূর্ণিমার পূর্ব্বদিন—চতুর্দ্দশীর রাত্রে প্রতিবেশী বন্ধুর গৃহে বসিয়াছিলাম; শুভ্র জ্যোৎস্নালোকে দ্বিতলের বারান্দায় বসিয়া কয়েক বন্ধুতে গ্রামোফোনের গান শুনিতেছিলাম; কিন্তু সেই একঘেয়ে খন্‌খনে আওয়াজ কিছু কালের মধ্যেই অসহ্য হইয়া উঠিল; কলের গান বন্ধ করিয়া সজীব কণ্ঠে বন্ধুবর অমল বাবু যখন ধরিলেন,—

"যশোদা নাচাতো তোমায় ব'লে নীলমণি,
এখন সেরূপ লুকালে কোথা, ওমা, করালবদনী?
—(শ্যামা!"

তখন রাত্রিটা বেশ উপভোগ্য ও বন্ধুসমাগম প্রীতিকর মনে হইতে লাগিল। চতুর্দ্দশীর চাঁদ আকাশে হাসিতেছিল; চাঁদের চাঁদমুখ পুষ্করিণীর জলে প্রতিফলিত হইতেছিল; সম্মুখস্থ বাগানে অযত্নরোপিত রজনীগন্ধার ঝাড়,—তাহার দীর্ঘ কাণ্ডে থোকা থোকা ফুল ফুটিয়া কৌমুদীরাশি-পরিপ্লাবিত নিশীথিনীকে মৃদু সৌরভে আমোদিত করিয়া তুলিয়াছিল। সমগ্র গ্রামখানি মৌন, সুপ্তবৎ স্থির; গ্রাম্যপথে জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। সংকীর্ণ পথগুলি আঁকিয়া বাঁকিয়া নদীর ধারে, মাঠে, ভিন্ন পাড়ায় গৃহস্থের কুটীরদ্বারে প্রসারিত। পথের দুই ধারে কলা-বাগান, আম কাঁঠালের বাগান, তরিতরকারীর ক্ষেত, বাঁশের ঝাড়। বাঁশের মাথাগুলি পথের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্নালোক নিম্নস্থ আশ্যাওড়া বা ভাঁট গাছের শীর্ষদেশ চুম্বন করিতেছে। বাঁশের নীচে একটা শিয়াল শুষ্ক পাতার

উপর থস্ থস্ করিয়া নড়িতেছে। এমন সময় চম্পক বৃক্ষের ঘন পত্রান্তরাল হইতে একটা পাখী ডাকিয়া উঠিল, "বৌ—কথা কও!"

রাত্রি অধিক হইয়াছে বুঝিয়া আমাদের মজলিস ভঙ্গ করা গেল। সেই সময় স্থির হইয়া গেল, পরদিন অতি প্রত্যূষে মুরুটিয়ায় স্নানযাত্রার মেলা দেখিতে যাইতে হইবে। তৎক্ষণাৎ চাকরকে দুইখানি গোরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া রাখিতে আদেশ করা হইল; উষাগমের পূর্ব্বেই তাহারা আমাদের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইবে।

সরকারী খাজনা-খানার ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া চারিটা বাজিয়া গেল। দুই পাঁচ মিনিটের মধ্যে দরজায় গাড়োয়ানের আবির্ভাব হইল; গলায় ঘুঙ্গুর-বাঁধা দুই দামড়া বলদ ও একখানি ছৈ-বিশিষ্ট গরুর গাড়ী। প্রতিবেশী বন্ধু-গৃহেও এইরূপ একখানি গো-শকট উপস্থিত হইয়াছিল; গাড়ীর ভিতর বিচালীর গদী—এই গদীর উপর যথারীতি শয্যা বিস্তার করিয়া আমরা দুই বন্ধু তাহার ভিতর প্রবেশ করিলাম। নির্জ্জন পল্লীপথে গাড়ী হট্ হট্ করিয়া চলিতে লাগিল।

প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যে আমরা গ্রাম ছাড়িয়া মাঠে পড়িলাম; প্রথমটা কিছুকাল গাড়ীর মধ্যেই বসিয়া ছিলাম। কিন্তু দেখা গেল, তাহাতে হঠাৎ জখম হইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত প্রবল! সকলেই জানেন, গোরুর গাড়ীতে স্প্রিং থাকে না—এবং পল্লীগ্রামের পথ সমতল নহে। গাড়ী চলিতে চলিতে হট্ করিয়া 'ন্যাসা'য় পড়িলেই আমাদের দুই বন্ধুর মাথায় সজোরে ঠোকা-ঠুকি বাধিল; আর দুই চারিবার ঠোক্কর লাগিলে মাথা ফাটিয়া রক্ত নির্গত হইত, কিন্তু তাহার আর অবসর দিলাম না; রণে ভঙ্গ দিয়া গাড়ীর ছাপ্পরের মধ্যে পাশা-পাশি শয়ন করিলাম! হটর হটর করিয়া মেঠো পথে গাড়ী ছুটিয়া চলিল; সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ আন্দোলিত হইতে লাগিল।

মাঠে পড়িয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তখন পাঁচটা বাজে; আকাশে আর নক্ষত্র নাই; কেবল শুক-তারা উষার ললাটে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। পূর্ব্বাকাশ লোহিত হইয়া উঠিয়াছে; পশ্চিম গগন কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। মাঠের উপর দিয়া সুশীতল বায়ু বহিয়া যাইতেছে; সেই বায়ুহিল্লোলে বৃক্ষ-পত্রের সর সর কম্পন, তরু-শাখায় নবজাগ্রত বিহঙ্গমকুলের সহস্র কাকলী-

শোভা, এবং চতুর্দ্দিকের প্রগাঢ় শান্তি—গাড়ীর কষ্ট ভুলিয়া প্রাণ ভরিয়া পল্লীর দৃশ্য-বৈচিত্র্য দেখিতে লাগিলাম। যত দূর দৃষ্টি যায়, দেখিলাম,—শ্যামা মা যেন সবুজ মখমলের শাড়ী পরিয়া ললাটে উষার সিন্দুর-রাগ ধারণ করিয়া মুখ টিপিয়া হাসিতেছেন, তাঁহার আনন্দাশ্রু বৃক্ষপত্রে, তৃণক্ষেত্রে শিশিরবিন্দুরূপে শোভা পাইতেছে! মনে মনে সুজলা সুফলা মলয়জ-শীতলা শস্যশ্যামলা বঙ্গজননীকে প্রণাম করিলাম।

জেলাবোর্ডের সুদীর্ঘ মেঠো পথ পদ্মাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের গ্রাম হইতে মুরুটিয়ার দূরত্ব ছয় ক্রোশ। গো-শকটে ছয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করা মন্দ সাহস বা ধৈর্য্যের কাজ নহে! তবে আমরা পল্লীবাসী; গো-শকটা-রোহণে আজন্ম অভ্যস্ত; সুতরাং গাড়ীর মধ্যে পড়িয়া থাকিতে তেমন কষ্ট হইল না। গাড়োয়ান গরুর ল্যাজ ধরিয়া, চুমকুড়ি ছাড়িয়া, সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া উভয় হস্তে বলদদ্বয়ের পিঠের দাঁড়া টিপিয়া তাড়াতাড়ি গাড়ী চালা-ইতে লাগিল। যতই আমরা অগ্রসর হইলাম, পথে ততই যাত্রীর ভিড় বাড়িতে লাগিল।

পথের দুই ধারে ধানের ক্ষেত। ধান্যক্ষেত্রের সীমান্তে বহু দূরে আম কাঁঠালের বাগান; বাগানের অন্তরালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম; সেই সকল গ্রাম হইতে বালক যুবক বৃদ্ধ শত শত লোক 'আইল' ভাঙ্গিয়া পথের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। সেই সকল দলে বালিকা যুবতী বৃদ্ধারও অভাব নাই। সংবৎসরের পরে মেলা দেখিতে পাইবে—এই আনন্দে ও উৎসাহে তাহারা আমাদের গাড়ীর পাশ দিয়া দ্রুত চলিতে লাগিল। কোনও যুবতীর ক্রোড়ে এক বৎসরের একটি পুত্র বা কন্যা, কোনও বর্ষীয়ান পুরুষের স্কন্ধে একটি তিন বৎসরের শিশু।—যাত্রিগণের বেশ-বৈচিত্র্যই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কাহারও কাঁধে গামছা, হাতে বাঁশের লাঠী; কাহারও অঙ্গে ফুলকাটা শাদা কামিজ, পরিধেয় বস্ত্রখানি অপেক্ষা তাহা শুভ্র, কোরা চাদরখানি তো করিয়া বুকে বা কটিদেশে বাঁধা, কিন্তু ব্রুশ করা কালো জুতা জোড়াটি হাতে! কাহারও বুকের পকেটে গিলটির চেনে তের সিকা মূল্যের ওয়াটারবারি ঘড়ী; কাহারও কাঁধে অতি পাতলা ফিন্‌ফিনে সবুজ সিল্কের চাদর; কাহারও হাতে ছাতা, মাথায় লাল রুমাল বাঁধা। পল্লীযুবকগণের বিচিত্র বসন ভূষণ, বিচিত্র বেশ!

অল্প নহে; ছিন্নচীরধারিণী ভিখারিণী হইতে গুলবাহার-শাড়ী-পরিহিতা মণ্ডলদের ঝি পর্য্যন্ত সকলকেই সে দলে দেখিতে পাইলাম। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু নারীর সংখ্যাও অল্প নহে; কাহারও হাতে রুপার বালা, কোমরে গোট, পায়ে বাঁক-মল; কাহারও প্রকোষ্ঠে কালো চুড়ির গোছা; কাহারও কানে পাশা, নাকে নথ, গলায় দানা; কাহারও সীমন্তের সিন্দুর অতি স্থূল আকারে মস্তকের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত প্রসারিত; কাহারও মাথার খোঁপাটি গম্বুজাকৃতি, তাহার উপর দুটি রুপার 'পঁটে'; কপালে টিপ, নয়নে কাজল। পুরুষ ও রমণীরা দলে দলে চলিতেছে, হাসিতেছে, গল্প করিতেছে—যেন মনে সুখের সীমা নাই, উৎসাহের অন্ত নাই। ভাবিলাম, কত অল্পে ইহারা সুখী, কিন্তু সেই সুখও কত পরিমিত!

আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, কতকগুলি বৈষ্ণব ও ফকীর মেলা দেখিতে যাইতেছে। বোধ হয়, ভিক্ষা-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যও আছে। বৈরাগী বাবাজীদের ল্যাজে বাঁধা এক একটি প্রকৃতি; ইহারা সংসারত্যাগী, কিন্তু সেবাদাসী ভিন্ন এক পাও চলিতে পারে না। এ অঞ্চলের মেলাস্থলে অসংখ্য নেড়ানেড়ীর সমাগম হয়; ভেক না হইলে ভিক মিলে না, এই প্রচলিত প্রবাদানুসারেই বোধ হয় বাবাজীরা ঘটা করিয়া সাজ সজ্জা করিয়াছেন। কাঁচা পাকা দাড়ী আবক্ষ লম্বিত; কাহারও কাহারও দাড়ির অগ্রভাগে গেরো দেওয়া; দীর্ঘ কেশগুলি মাথার সম্মুখে চূড়াকারে বাঁধা; কেহ কেহ সেই চূড়ায় এক একটি কৃষ্ণচূড়া ফুল গুঁজিয়াছে; অঙ্গে দীর্ঘ আলখেল্লা—পৃথিবীর সকল রঙ্গের বস্ত্রের টুকরাই সেই আলখেল্লায় বর্ত্তমান। হাতে 'গাবগুবাগুব' যন্ত্র; পায়ে নূপুর; বাবাজীদের সেবাদাসীরাও বেশ সাজ করিয়াছে,—কাহারও হাতে রুপার চুড়ি, কাহারও হাতে রুপার বালা বা কাচের চুড়ি, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি, নাকে রসকলি, মুখে হাসি, হাতের খঞ্জনীতে ক্বচিৎ ঘা পড়িতেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বাবাজীদের পায়ের নূপুর রুণু ঝুনু করিয়া বাজিতেছে; বৈষ্ণবীরা পানের সঙ্গে খসান চিবাইতে চিবাইতে ও গল্প করিতে করিতে চলিয়াছে।

এ অঞ্চলে মুসলমান ফকীর একান্ত বিরল। আমি যে সকল ফকীরের কথা বলিলাম, তাহারা দরবেশ, বা বাউল। তাহাদের ললাটে তিলক, কণ্ঠে স্থূল মালা, সেই মালায় স্ফটিক, পদ্মবীজ, প্রবাল, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি নানা সামগ্রী

ঝুলি, হাতে লাঠী বা কিস্তি (দরিয়াই নারিকেলের মালা)। দুই চারিটি খাঁটী গোঁসাই গোবিন্দকেও চলিতে দেখিলাম। বর্ত্তুল উদরটি তাঁহাদের আগে আগে চলিয়াছে; কৌপীনের উপর শুভ্র বহির্ব্বাস কটিতটে আঁটা, মুণ্ডিত মস্তকে স্থূল আর্কফলা, ললাটের ঊর্দ্ধদেশে দুই দিকে 'রাধা কৃষ্ণ' নামাঙ্কিত ছাপা। উভয় বাহুতে, বক্ষঃস্থলে, উভয় পঞ্জরে সীতারাম, মদনমোহন, গোপীনাথ প্রভৃতি নানা নামের ছাপা; কণ্ঠে স্থূল তিন কণ্ঠী তুলসীর মালা, রূপার আংটায় বৃহৎ হরিনামের ঝোলাটি সেই মাল্যদামে ঝুলিতেছে; বাবাজীদের দাড়ী-গোঁপ-বিবর্জ্জিত মুখে শান্তি ও সন্তোষ সুপ্রকাশিত! জ্যৈষ্ঠের প্রখর রৌদ্রে বাবাজীদের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত; ঘর্ম্মে ললাটের তিলক ও অঙ্গের ছাপা গলিয়া পড়িতেছে; খর-রবিতাপে বাবাজীরা কিছু কাতর।

পথটির অনেক স্থলই ছায়াচ্ছন্ন। পথের দুই ধারে মধ্যে মধ্যে আম কাঁঠালের গাছ, তেঁতুলগাছ, জামগাছ, বট পাকুড়ের গাছ; জেলা বোর্ড এই সকল বৃক্ষের অধিকারী; শ্রান্ত পথিক কেবল ছায়ার অধিকারী। আজ দেখিলাম, শত শত পথিক এই সকল বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শ্রান্তি দুর করিতেছে,—স্বেদজলে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত। পথিপ্রান্তে জাম গাছে অসংখ্য কাল জাম পাকিয়া রহিয়াছে, পিপাসার্ত্ত বালক ও পল্লী-যুবকের দল পিপাসা-শান্তির জন্য জামগাছে উঠিয়া জাম খাইতেছে; কোনও সঙ্গী বালক গাছে উঠিতে না পারিয়া নীচে হইতে দুটি পাকা জাম চাহিলে—কেহ এক থোকা অর্দ্ধপক্ক 'মাঝরাঙ্গা' রঙ্গের জাম নীচে ফেলিয়া দিতেছে; কেহ তত দূর বদান্যতার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক মনে করিয়া জাম খাইয়া তাহার আঁটিগুলি প্রার্থীর মস্তকে নিক্ষেপ করিতেছে!

বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। রৌদ্রের উত্তাপ ইহারই মধ্যে অত্যন্ত প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের গাড়ীর মধ্যে বসিয়া থাকিতে কষ্টবোধ হইল, গাড়ী হইতে একবার নামিলাম; কিন্তু সেই রৌদ্রপ্রতপ্ত পথ দিয়া পদব্রজে যাত্রা করা আরও কঠিন বোধ হইল; অগত্যা পুনর্ব্বার গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়োয়ান আশ্বাস দিল, "আর বাবু, আস্যে পড়েছি, দণ্ড দুই সবুর করেন, কোশ খানেক ভুঁই পাড়ি দিতে পাল্লেই কাম হাঁসিল।"

কিন্তু পথের ত আর শেষ হয় না। পাঁচ ছয় ক্রোশ আসিয়াছি,

তর হইতেছে। তাড়াতাড়িতে গাড়ীর চাকায় তেল দেওয়া হয় নাই, 'ক্যাঁ' 'কোঁ' শব্দে গাড়ী অতি ধীরে চলিতে লাগিল। আমাদের সম্মুখে আট দশ-খানি গাড়ী; পশ্চাতেও দশ পনেরখানি হইবে। এই সকল গাড়ীতে নানা পল্লীগ্রাম হইতে গ্রামবাসীরা মেলা দেখিতে যাইতেছে। আমাদের অগ্রে যে সকল গাড়ী চলিতেছিল, তাহাদের চক্রোৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশি বায়ুপ্রবাহে আমাদের চোখে মুখে উড়িয়া পড়িতে লাগিল। মাথার অবস্থা এরূপ হইল যে, চুলের মধ্যে একস্তর মাটী জমিয়া গেল। আমার সঙ্গী উকীল বন্ধুটি কিন্তু অতিরিক্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—তিনি তোয়ালে দিয়া পুনঃ পুনঃ মাথা ঘসিতে ও মুখ মুছিতে লাগিলেন, এবং "কি কু কর্ম্মই করা গিয়াছে, এমন স্থানে কি ভদ্রলোক আসে!" ইত্যাদি বাক্যে মানসিক আক্ষেপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই আক্ষেপোক্তিতে গাড়োয়ানদের ভ্রূক্ষেপ নাই! তাহারা মেলাস্থলের যতই সন্নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, তাহাদের আনন্দ ও উৎসাহ ততই বর্দ্ধিত হইল। তাহারা 'পাল্লাপাল্লি' করিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল। পশ্চাতের অনেক গাড়ী আগে গেল, সম্মুখের কোনও কোনও গাড়ী পশ্চাতে পড়িল। এইরূপ 'গাড়ী-দৌড়ে' যে সকল গাড়োয়ান হটিয়া গেল, বিজয়ী গাড়োয়ানেরা স্থূল রসিকতায় তাহাদিগের ক্ষমতাকে ধিক্কার দিতে লাগিল; পরাজিত গাড়োয়ানেরা সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাতে বলদ-যুগলের ল্যাজ ডলিয়া ও তাহাদের তলপেটে পদতাড়না করিয়া চুমকুড়ি ছাড়িয়া বলিতে লাগিল,—"আগে চল, বাবাধন ডা!" এক জন গাড়োয়ান তাহার সঙ্গীকে পশ্চাতে ফেলিবার অভিপ্রায়ে সম্মুখস্থ গাড়ীর পাশ কাটাইয়া যাইবার চেষ্টা করিল; পথ তেমন প্রশস্ত নহে, পথের পাশেই বর্ষার জলনিকাশের 'নয়ঞ্জুলি'—দড় বড় দড় বড় করিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে গাড়ীর বলদ দুটি ঝোঁক সামলাইতে পারিল না, হুড়মুড় শব্দে গাড়ী নয়ঞ্জুলির মধ্যে গিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে আরোহী চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে বেটা হারামজাদা, শেষে কি গর্ত্তে ফেলে খুন করবি?" তাহার সহযাত্রী আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "ওরে বাবারে! মাথাটা ছাতু হয়ে গিয়াছে রে!" —আমরা গাড়ী থামাইয়া কি বিভ্রাট ঘটিল দেখিবার জন্য নামিলাম। আহত আরোহিদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ গাড়ীর ভিতর হইতে টানিয়া বাহির করা হইল। এই গাড়ীর আরোহিদ্বয় শ্যামনগরের কুঠীর নায়েব প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ও তাহার শ্যালক উক্ত কুঠীর আমীন কাঙ্গারাম মণ্ডল,—মেলা দেখিতে

যাইতেছিল। গাড়ীর ছৈ-এর 'বাতা'র গুঁতা লাগিয়া কুড়োরামের কপাল খানিক কাটিয়া গিয়াছিল। কুড়োরামের মুখভঙ্গী দেখিয়া—তাহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিবে কি, দর্শকেরা হাসিয়াই অস্থির! কুড়োরাম গাড়োয়ানকে শ্যালক সম্বোধন করিয়া বলিল, "কপাল কাটলো, তাতে ক্ষেতি নেই, রক্তে যে আমার বারো টাকা দামের রেশমী চাদরখানা নষ্ট হয়ে গ্যালো, তার কি? এমনই করে কি গাড়ী হাঁকায়? একবার কুঠীতে ফিরে চ, শ্যামচাঁদের ঘায়ে তোকে সোজা করব।" গাড়োয়ানেরা ধরাধরি করিয়া গাড়ীখানি নয়ঞ্জুলি হইতে টানিয়া তুলিল, কুড়োরাম আমীন আর গাড়ীতে উঠিল না, অবশিষ্ট পথটুকু হাঁটিয়া চলিল।

বেলা প্রায় এগারটার সময় আমরা মুরুটিয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। গ্রামখানি ক্ষুদ্র। জমদীদারের কাছারীবাড়ী হইতে গ্রাম্য গৃহস্থগণের আবাস-গৃহ—সকলই খড়ো ঘর। গৃহগুলির প্রাচীর মৃত্তিকা-নির্ম্মিত, ক্ষুদ্রাবৃহৎ—দোচালা হইতে আটচালা পর্য্যন্ত সকল গৃহই বেশ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন—গোশালাগুলিও। কোনও বাড়ীতে দুখানি চালা-ঘর, কোন বাড়ীতে তিন চারিখানি। ঘরগুলি বিচ্ছিন্ন, দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত;—প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীর আঙ্গিনাটুকু বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন; কাহারও ঘরের কানাচেতে একটা আমগাছ, কোনও ঘরের কোণে একটি অনতিবৃহৎ কাঁঠাল গাছ। গাছের গোড়ায় লতাপাতা দিয়া 'ওম বাঁধা'; সরু বোঁটায় কলসী বা ধামার মত মোটা মোটা কাঁঠাল ঝুলিতেছে। কাহারও চালে লাউ কুমড়োর গাছ উঠিয়াছে; কাহারও ঘরের সম্মুখে খানিকটা যায়গা জাফরীর বেড়া দিয়া ঘেরা; বেড়ার মধ্যে তামাক, বেগুন ও ডাঁটার চারা। কাহারও উঠানে অনুচ্চ ডাব গাছের ছায়ায় একটি পয়স্বিনী গাভী 'খুঁটা'য় বাধা রহিয়াছে, নাক মুখ ডুবাইয়া 'নাদা'য় জাব খাইতেছে; দুগ্ধপানে পরিতৃপ্ত তিন মাসের বাছুরটি একটি নিবিড়-পত্র গাব গাছের ছায়ায় শুইয়া ঘুমাইতেছে; ঘরের পাশে গৃহস্থের ছাই গাদা, একটা কালো কুকুর তাহার উপর কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে গ্রাম্য পথে যাত্রিসমাগম নিরীক্ষণ করিতেছে। মলিনবস্ত্রপরিহিত চাষার ছেলে মেয়েরা সারি বাঁধিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক দুই তিন করিয়া গোরুর গাড়ী গণিতেছে; গৃহস্থ ঘরের দাবায় বসিয়া থেলো হুঁকায় পরম নিশ্চিন্তমনে তামাক টানিতেছে, এবং এবার মেলায় কিরূপ জনসমাগম

হইবে, কত দোকান আসিয়াছে, ইত্যাদি অপরিহার্য্য বিষয়ের আলোচনায় সঙ্গিগণের কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতেছে।

বেলা এগারটার পর জগন্নাথের মন্দিরের সম্মুখে আসিয়া শুনিলাম, জগন্নাথের স্নানযাত্রা অনেকক্ষণ পূর্ব্বে শেষ হইয়া গিয়াছে। একটি ক্ষুদ্র ইষ্টকালয় তাঁহার মন্দির। স্বতন্ত্র মন্দিরের অস্তিত্ব নাই। মুরুটিয়া গ্রামের জগন্নাথ এই গৃহে অবরুদ্ধ থাকেন। পুরোহিত ঠাকুর দিনান্তে একটা ফুল ফেলিয়াও দারুব্রহ্মের সম্ভাষণ করেন কি না সন্দেহ। কিন্তু স্নানযাত্রার সময় তাঁহার আনন্দের সীমা থাকে না। মুরুটিয়ার জগন্নাথ রথের সময় তেমন আদর যত্ন লাভ করেন না; সুতরাং বলিতে হয়, স্নানযাত্রাই তাঁহার 'স্পেশ্যাল পরব'।

স্নানযাত্রার পর ঠাকুরের ভোগ শেষ হইয়াছে। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা স্ব স্ব আসনে বিশ্রাম করিতেছেন। দলে দলে যাত্রী বিগ্রহত্রয়কে প্রণাম করিয়া মেলা দেখিতে যাইতেছে। অনেকে প্রণামীও দিতেছে।—প্রণামী-সংগ্রহের লোভে পুরোহিতেরা আজ ঠাকুরঘর বন্ধ করেন নাই।

গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে ভৈরব নদ অবস্থিত। ভৈরবের তীরেই মেলা বসিয়াছে। সে দিকে লোক জনের বসতি নাই। স্থানটিকে নদীর দেওয়াড় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বকালে ভৈরব নদ নামেই পরিচিত ছিল; নবাব সৈন্যেরা এই পথে যশোহর অঞ্চলে যুদ্ধযাত্রা করিত। তখন বাঙ্গালায় ধন ছিল, ধান ছিল, মান ছিল; এখন তাহার কিছুই নাই; এখন ধনের পরিবর্ত্তে বন, ধানের পরিবর্ত্তে পাট, এবং মানের পরিবর্ত্তে অপমান বঙ্গের ভূষণ হইয়াছে। বঙ্গের অধিকাংশ নদীর যে অবস্থা—এখন ভৈরবেরও সেই অবস্থা,—বোধ করি, তাহার অপেক্ষাও দুরবস্থা হইয়াছে। মোহনা বন্ধ হওয়ায় নদী মজিয়া গিয়াছে। নদীতে এক বুক মাত্র জল, তাহাও শৈবালে, টোপাপানায় ও পঙ্কে পরিপূর্ণ। নদীর উভয় তীরে শস্যক্ষেত্র। কোথাও গহন বন;—ব্যাঘ্র, বন্যবরাহ, „ম্যালেরিয়া, ওলাবিবি দীর্ঘকাল হইতে এ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছে; যাহাদের অদৃষ্টে দুঃখভোগ অপরিহার্য্য, ইহার মধ্যে তাহারাই কিছুকাল ধরিয়া কোনও রকমে টেঁকিয়া আছে। কিন্তু তাহাদের উদরে অন্ন নাই, দেহে বস্ত্র নাই, প্রাণে সুখ নাই।

তথাপি সংবৎসর পরে গ্রামখানিতে আজ নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে। বৎসরের জড়তা পরিহার করিয়া সকলেই কয়েক দিনের উৎসবে

নন্দকে তাহাদের সংকীর্ণ জীবনপথের পাথেয়-রূপে গ্রহণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রভাত হইতে এ পর্য্যন্ত মেলাস্থলে সহস্রাধিক লোক সমাগত হইয়াছে; আট দশ ক্রোশ দূর হইতে গ্রাম্য লোকেরা মেলা দেখিতে আসিয়াছে।

দোকান পশারীও বড় কম আসে নাই; উত্তরে কৃষ্ণনগর ও পশ্চিমে বহমরপুর, নদীয়া মুর্শিদাবাদের প্রধান নগরদ্বয় হইতেও বিস্তর দোকান আসিয়াছে। দোকানদারেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সারি সারি অস্থায়ী চালা তুলিয়া তাহার মধ্যে দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। দু'দিকে দোকান, মধ্যে সংকীর্ণ পথ। এক এক রকম জিনিসের দোকান এক এক দিকে। কোথাও কাপড়ের দোকান, কোথাও বাসনের দোকান, কোথাও নানাবিধ মনোহারী দ্রব্যের দোকান। গত তিন বৎসরের চেষ্টার পর পশ্চিম বঙ্গের দূরবর্ত্তী পল্লীতে এই মেলা উপলক্ষে স্বদেশীর যে অবস্থা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত শোচনীয়,—হৃদয়বিদারক; দেখিলাম, রাশি রাশি বিদেশী পণ্য দ্রব্য,—জর্ম্মানীর আমদানী চীনে মাটীর শিবদুর্গা কালী গণেশ হইতে ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় পর্য্যন্ত সকলই নিরাপত্তিতে বিক্রীত হইতেছে। দুই তিনটি দোকানে নানা আকারের সুন্দর সুন্দর পাথরের বাটী, খোরা, ডিস্ প্রভৃতি বিক্রয়ার্থ সজ্জিত আছে; সেখানে দশ জন বর্ষীয়সী পল্লীনারী ভিন্ন অন্য কাহাকেও দেখিলাম না। তাঁহারাই পাথর ও খোরা খুরীর দর করিতেছে; কিন্তু বিলাতী কাচের এনামেলের বাসনের দোকানে অত্যন্ত ভিড়। পল্লীগ্রামের ভাই সাহেবেরা ও পল্লীবাসী নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু যাত্রীরা পরমানন্দে বিলাতী কাচের ও লোহার বাসন কিনিতেছে; শত শত লোকের হাতে কাচের বাটী, এনামেলের ডিস্, পেয়ালা, গামলা!—আমার একটি বন্ধু এক জন মাতব্বর মুসলমান যাত্রীকে কয়েকটি এনামেলের বাটী কিনিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু! তোমার দেশের এমন সুন্দর পিতল কাঁসার জিনিস থাকিতে এই সকল বাজে বিলাতী জিনিস কেন কিনিলে?" মুসলমান মাতব্বরটি তাহার সুদীর্ঘ দাড়িতে করচালন করিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর শ্রীমুখবিনিঃসৃত পলাণ্ডু-গন্ধে বায়ুমণ্ডল সুবাসিত করিয়া সহাস্যে বলিল, "আমার খোস!" যে দেশের পৌণে ষোল আনা লোকের মতি গতি এমন বিকৃত, যাহারা এত দূর অধঃপতিত, জাতীয় স্বার্থে সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন ও

এত রকম সুন্দর সুন্দর পিতল কাঁসার বাসন আমদানী হইয়াছে যে, তাহা দেখিলে চক্ষু জুড়ায়; কিন্তু তাহা তেমন অধিক বিক্রয় হইতে দেখিলাম না। কৃষ্ণনগর হইতে দুই একখানি মাটীর পুতুলের দোকান আসিয়াছে; নানা রকম সুন্দর সুন্দর পুতুল; কিন্তু সাদা বিলাতী কাচের পুতুলই অনেক যাত্রীর হাতে দেখিলাম। জুতার দোকানে চাষার ভয়ঙ্কর ভিড়; পেটে ভাত না থাক, পায়ে জুতা চাই; নিত্য তাহাদের পিঠে যে পয়জার পড়িতেছে, তাহাই যেন যথেষ্ট নহে।

বিলাতী ছাতি ভয়ঙ্কর সস্তা; স্বদেশী ছাতি বলিয়াই তাহা বিক্রীত হইতেছে। তাহার কঞ্চির বাঁট ভিন্ন আর কিছুই স্বদেশী নহে,—তাহার কাপড়, শিক, স্প্রিং, এমন কি, ছাতি জড়াইয়া বাঁধিবার ফিতাটুকু ও বোতামটা পর্য্যন্ত বিলাতী! বর্ষা আসন্নপ্রায়, সুতরাং দলে দলে চাষারা গেঁজে হইতে সিকি, দুয়ানি, আধুলি বাহির করিয়া, কেহ বা ট্যাঁক হইতে একটি টাকা খুলিয়া ছাতি কিনিতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে দেখিতাম, কোথাও মেলা বসিলে সেখানে খাঁটী স্বদেশী তালপত্রের আতপত্র প্রস্তুত হইত; চারি পাঁচ পয়সা দিয়া পল্লীবাসীরা এক একটা তালপাতার ছাতা কিনিত; একটা তালপাতার ছাতা পাঁচ বৎসরেও নষ্ট হইত না। কিন্তু এখন আর তালপাতার ছাতাতে মন উঠে না; অন্ততঃ পক্ষে ঘটী-বাটী বাঁধা দিয়াও মেলায় বার গণ্ডা পয়সার ইস্প্রিংএর ছাতি কিনিতে হইবে। রাজপুরুষেরা কেন না বলিবেন, "তোমাদের দেশের চাষার পর্য্যন্ত পায়ে জুতা, মাথায় ছাতা।—ইণ্ডিয়ার Prosperityর সীমা নাই!"—দুঃখের কথা বলিব কি, আমাদের গাড়োয়ানটা পর্য্যন্ত একটি পয়সা চাহিয়া লইয়া তামাক খাইবার জন্য দিয়েশলাই কিনিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল, "চকমকি রাখিস্ না কেন?" সে বলিল, "আধ পয়সার দিয়েশালুয়ে দশ দিন তামাক খাওয়া হয়—সোলা রে, ঠুকনী রে, পাথর রে, এ সব জঞ্জাল কে সঙ্গে টেনে বেড়ায়?" দেশের লোকের মতি কিরূপ বিগড়াইয়াছে, দেখুন! দেখিলাম, যে সকল লোক ক্ষেত্রে কৃষাণী করিয়া দৈনিক আট পয়সা উপার্জ্জন করে, বা 'খোরাক পোষাক' সহ পাঁচ সিকা বেতনে গাড়োয়ানী কিংবা রাখালী করে, তাহারাও মেলা দেখিতে আসিয়া দুই পয়সা দিয়া এক এক রকম বিলাতী সিগারেট

আমার পূর্ব্বোক্ত বন্ধুটি এই জাতীয় একটি সিগারেটপায়ী 'মাল্‌তের পো'কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আধ পয়সার তামাক কিনিলে পাঁচ সাত বার খাওয়া চলে, তা না কিনিয়া সিগারেট খাও কেন?" মাল্‌তের পো এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া দশনকান্তিতে আমাদের মনের ভ্রান্তি ঘুচাইয়া বলিল, "বলেন কি কর্ত্তা! তামাক রাখ, টিকে রাখ, কল্‌কে রাখ, তামাকে ফ্যাঁসাদ কত! আর এ ক্যামন মজা, মুখে পুরে দিয়েশলুই ধরাতে না ধরাতে তামাকের তেষ্টা মেটে।" কাপড়ের দোকান অনেক দেখিলাম। চাষারা সেখানে বোম্বাই কাপড় চাহিতেছে, কিন্তু দোকানদারেরা অসঙ্কোচে বোম্বাই বলিয়া বিলাতী চালাইতেছে। পল্লীগ্রামে স্বদেশীর এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া পরিতপ্ত হইলাম।

লোহালক্কড় হইতে 'ক্যাঁচকেচে'র মাদুর পর্য্যন্ত কত জিনিসের দোকান দেখিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। মিষ্টান্নের দোকান শতাধিক। মধ্যাহ্নে ক্ষুধার তাড়নায় যাত্রীরা এই সকল দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। লুচিকচুরীতে অনেকের ক্ষুধা দুর হইতেছে না, তাহারা নুতন মাটীর কলসীতে নদী হইতে জল আনিয়া কলাপাতায় চিঁড়া-দৈএর ফলার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে; আম, কাঁঠাল, কলা, গুড় প্রভৃতি ফলারের উপকরণ। কুমারের দোকানে মাটীর হাঁড়ি কলসী পর্ব্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। কাঁঠাল-বিক্রেতাগণ গরুর গাড়ীতে বোঝাই দিয়া ছোট বড় হাজার হাজার কাঁঠাল বিক্রয় করিতে আনিয়াছে,—সেই কাঁঠালের স্তূপ দেখিয়া মনে হয়, এত কাঁঠাল কিনিবে কে? কিন্তু ক্রেতার অভাব নাই; এবার পল্লী অঞ্চলে অপর্য্যাপ্ত কাঁঠাল ফলিয়াছে; যে গাছে কখনও কাঁঠাল ধরে না, তাহাতেও এবার কাঁঠাল দেখা যাইতেছে। দুই চারি পয়সায় এক একটা কাঁঠাল পাওয়ায় অনেক গরীব লোক এই অন্নকষ্টের দিনে কাঁঠাল খাইয়াই দিনপাত করিতেছে।

দেখিলাম, আমোদ-প্রমোদের প্রায়োজনও এখানে উপেক্ষিত হয় নাই। সর্ব্বপ্রথমেই আমাদের দৃষ্টি 'কুপন' খেলার দিকে আকৃষ্ট হইল। ইহা এক-জাতীয় জুয়াখেলা; এক পয়সা বাজি ধরিয়া যদি 'জিত' হয়, তাহা হইলে কয়েকটি পয়সা লাভ হয়; যদি 'হার' হয়, তবে সেই পয়সাটিই যায়। চাষার ছেলেরা দুই চারি আনা হাতে লইয়া খেলিতে বসিয়াছে; কেহ দুই এক টাকা জিতিয়া সরিয়া পড়িতেছে; কেহ বা কষ্ট-সঞ্চিত অর্থ

খেলা করে যে, প্রথমে অন্য লোকে কিছু কিছু জিতিলেও, শেষে সর্ব্বস্ব হারায়। লালপাগ্‌ড়ীর দল এই অবৈধ খেলা চলিতে দেখিয়াও সে দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না! রূপচাঁদের মহিমায় কি না সম্ভব?

একটা ফাঁকা জায়গায় নাগরদোলা ও কাঠের ঘোড়া বন্‌ বন্‌ শব্দে ঘুরিতেছে। চাষার দল—ছেলে বুড়ো—তাহাতে 'পাক' খাইতেছে; কোনও কোনও রসিক নাগর পল্লীবারবিলাসিনীকে পাশে বসাইয়া নাগরদোলায় উঠিয়াছে! দলে দলে লোক উৎসবের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সেখানে সমাগত হইয়াছে। নিকটে পানের দোকান নানা ভঙ্গীতে সাজাইয়া বিভিন্ন পল্লীর 'বয়াটে' ছোকরারা 'এক পয়সায় চার চার গোলাপী খিলি' বেচিতেছে।

বারবিলাসিনীগণের দোকান এ অঞ্চলে মেলার প্রধান বিশেষত্ব। মেলায় ইহাদের সমাগম যত অধিক হয়, জমীদারদের তত লাভ। এই জন্য তাঁহারা মেলা-ক্ষেত্রের একটি অংশ তাহাদের জন্য 'রিজার্ভ' রাখেন। ইহারাই মেলার প্রধান কলঙ্ক। তাহাদের প্রবেশাধিকার না থাকিলে, শুনিয়াছি, মেলা জমে না। এক একটি রূপজীবিনী তিন চারি হাত লম্বা 'টোঙ্গে' রূপের দোকান খুলিয়া বসিয়াছে। মেলার একধারে এইরূপ শত শত টোঙ্গ। অর্থোপার্জ্জনের আশায় নানা পল্লী হইতে তিন শতের অধিক রূপজীবিনীর সমাগম হইয়াছে। কাহারও পায়ে স্থূল কাঁসার মল; প্রকোষ্ঠে রূপার খাড়ু বা বালা, নাকে নলক বা নথ; কাহারও অঙ্গে দুই চারিখানি গিল্‌টীর গহনা; পরিধানে বোম্বাই শাড়ী, ঢাকাই শাড়ী, গুলবাহার শাড়ী, নীলাম্বরী, বালুচরী, ধূপছায়া চেলী। শীকারের সন্ধানে অনেকে চারিগাছ মলের ঝন্‌ঝনিতে গ্রাম্য চাষীদের ও পাইক-পেয়াদা-নগদীগণের চিত্তবিভ্রম উৎপন্ন করিয়া মেলার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

মেলাস্থানে নেড়া-নেড়ী, দরবেশ, নানা শ্রেণীর ভিখারী, বৈষ্ণব, বৈরাগী অনেক জুটিয়াছে, দেখিলাম; তাহারা কোনও কোনও স্থলে আড্ডা ফেলিয়া গান জুড়িয়া দিয়াছে। বৈষ্ণবীদের কাঁসার মত খন্‌খনে মিহি কণ্ঠস্বরের সহিত বাবাজীদের মোটা মোটা সুর মিলিয়া অপূর্ব্ব শব্দসমন্বয় উৎপন্ন হইতেছে। ইহাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র ডুগি, খঞ্জনী, নূপুর, গোপীযন্ত্র বা

লোক 'ভাঙ্গিয়া' পড়িতেছে; মুহুর্মুহু গাঁজা চলিতেছে; গাঁজার গন্ধে সে দিকে অগ্রসর হয়, কাহার সাধ্য?

এক স্থানে একটা ছোট তাম্বু; তাম্বুর সম্মুখে একখানি লাল কাপড়ে লেখা আছে, "দি গ্রেট নেশনাল্ সার্কেস্!" তাহার অদূরে "অত্তাশ্চের্জ্জ বন্দে মাতরম্ মেজিক!" 'নেসনাল্' ও 'বন্দে মাতরম্' শেষে বেদের বানর-নাচ ও ভেল্কী-ওয়ালার বিজ্ঞাপনে পর্য্যন্ত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে! কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্? কিন্তু হঠাৎ অত্যন্ত বাড়াবাড়ির এইরূপই পরিণাম। আক্ষেপ করিয়া ফল নাই। দর্শকেরা এই বস্ত্রাবাসের সম্মুখে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বস্ত্রাবাসের দ্বারপ্রান্তে একটা লোক কাল গঞ্জীফ্রক গায়ে দিয়া বানরের মুখস্ মুখে আঁটিয়া চাদরের লেজ কাঁধে লইয়া নানাভঙ্গীতে নাচিতেছে, আর এক জন একখানা টুলের উপর বসিয়া একটি ক্ষুদ্র হারমোনিয়মে সুর দিয়া রাসভ-নিন্দিত স্বরে গাহিতেছে, "মনাগুন জ্বল্‌চে দ্বিগুণ, কর্‌লে কি গুণ, ঐ বিদেশী!" 'সার্কেস্' দেখিয়া মনাগুনের জ্বালা নিবাইবার জন্য দলে দলে চাষারা দুই পয়সা দক্ষিণা দিয়া তাম্বুর ভিতর প্রবেশ করিতেছে। "অত্তাশ্চের্জ্জ বন্দে মাতরম্ মেজিকে"র দর্শনী কিন্তু এক পয়সার অধিক নহে।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া বড় পরিশ্রান্ত হওয়া গেল। বেলা দুইটার সময় একটা দোকানে কিছু জলযোগ শেষ করিয়া মেলাস্থল হইতে বিদায়গ্রহণের আয়োজন করিতেছি, এমন সময় আকাশে হঠাৎ একখানি মেঘ উঠিয়া ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। শুনিয়াছিলাম, স্নানযাত্রার দিন বৃষ্টি হইবেই; কিন্তু হঠাৎ এ ভাবে বৃষ্টি আসিবে, কে ভাবিয়াছিল? শীঘ্র বৃষ্টি থামিল না—আকাশের চারি দিকে ক্রমে মেঘরাশি স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল; চারি দিক্ অন্ধকার করিয়া জোরে জোরে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। দোকানদারেরা দোকানের ঝাঁপ ফেলিয়া দিল। দর্শকগণ যে যেখানে পাইল, আশ্রয় লইল; অনেকে আশ্রয়স্থলের অভাবে গাছের তলায় দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে মেলার প্রমোদ-ক্ষেত্র নিস্তব্ধ শ্মশানের ভাব ধারণ করিল; কেবল ঝম্ ঝম্ জলের শব্দ, আর মুহুর্মুহু মেঘগর্জ্জন! আমরা নিরুপায় হইয়া জমীদারের কাছারী-ঘরে আশ্রয় লইয়াছিলাম—সেখানে তখন এক দল দরবেশ দর্শকগণের সম্মুখে বসিয়া গোপীযন্ত্রের সহিত তাহাদের স্থূল কণ্ঠস্বর মিলাইয়া নানা ভাবে অঙ্গভঙ্গী করিয়া মাথা নাড়িতে

আপন দেল কেতাব সে ঢুড়ে লে।
মুরসিদ আমার কোন্‌খানে বিরাজে রে॥
(মুরসিদ আমার কোন্ শিয়রে জাগে রে!)
ঘরখানি বান্ধো বান্দা, দুয়ারখানি ছান্দো,
আপনি মরিয়ে যাবো, মিছে পরের লেগে কান্দো রে!
আঠারো মোকামের মধ্যে জলে হাব সরে রে,
তিল প্রমাণ জায়গা বান্দা আঠারো সজ্জা পড়ে রে!
আমার খো'দার দোস্ত মহম্মদ নবি,
কোন্‌খানে নেমাজ করে রে॥
আশমান জোড়া ফকীর রে ভাই, জমীন জোড়া কেঁথা,
এ সব ফকীর ম'লে পরে তার কবর হবে কোথা রে!
মুরসিদ আমার কোন্ শিয়রে জাগে রে!

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

স্বপ্ন-ভঙ্গ।

হা বিধি! সে স্বপ্ন কেন ভাঙ্গিলে আমার?
কল্পনার কোলে বসি, দরিদ্র যে জন,
লভে যদি ত্রিলোকের সুখ-রাজ্য-ভার,
তোমার মুকুট সে ত করে না হরণ!
জানে সে কাঁদিতে শুধু এসেছে ধরায়,
অসীম নিরাশা তাই রেখেছে পুষিয়া;
তবু যদি স্বপ্নবশে শান্তি কভু পায়,
তা'ও কি নিষ্ঠুর! তুমি লইবে কাড়িয়া?
কতকাল ধরি' করি' নিষ্ফল প্রয়াস,
এক দিন অবশেষে নিশান্ত-সময়ে,
যদ্যপি এ পরাণের মিটিল পিয়াস,
কেন না পারিনু তাঁরে ধরিতে হৃদয়ে?
স্বপনে জীবন যদি জুড়ায় এমন,
কেন পুন আইল এ মৃত্যু-জাগরণ?

গোলাপজাম।

১

ফুলশয্যার নিশি! গভীর, শান্ত ও স্নিগ্ধ। রাত্রি তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। রজনীকান্ত তখনও জাগিয়া। নববধূর মুখের প্রথম কথা শুনিতে কে না জাগে? কত মধুর; কত আশার অঙ্কুর! কত ভবিষ্যৎ বর্ষের প্রথম কাহিনী!

কনকলতা কিন্তু বেজায় চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। স্বভাবসিদ্ধ সভ্যতার খাতিরে রজনীকান্ত প্রথমেই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল; "কনক! তুমি কোন্ জিনিস সকলের চেয়ে খেতে ভালবাস?"

কনকের ভয় হইয়াছিল, পাছে স্বামী কোনও শক্ত কথা জিজ্ঞাসা করে। প্রশ্নটা নিতান্ত সহজ দেখিয়া কনক সরিয়া আসিল। আবার ঈষৎ ভয় পাইয়া ফিরিয়া গেল। রজনী সাহস পাইয়া করস্পর্শ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল;

"তুমি কি খেতে ভালবাস, কনক?"

বধূ মুখ বাড়াইল, কিন্তু ভয়ে কথা বাহির হইল না। রজনী কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল,—"বল না, ভয় কি? আমি কাহাকেও বলিব না।"

কনকলতা অতিধীরে একবারমাত্র বলিল,—

"গোলাপজাম।"

রজনীকান্ত আহ্লাদে মগ্ন হইয়া জীবন-সঙ্গিনীর প্রথম কথার অপূর্ব্ব মাধুরী চিন্তা করিতে লাগিল। কথাটা তাহার বড় ভাল লাগিয়াছিল। ক্রমে ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়ে গ্রথিত হইয়া গেল।

২

উভয়েরই পক্ষে তাহা পূর্ব্বস্মৃতি। কিন্তু কনকের পক্ষে তাহা ক্লেশ-বিজড়িত। বৈশাখের ঝড়ে, প্রায় সাত বৎসর পূর্ব্বে, কনকলতার গোলাপজামের গাছটি উদ্যানে পড়িয়া গিয়াছিল। গাছটি তাহার মাতার স্বহস্ত-রোপিত। তাহার পরে কেহই সে গাছের কথা মুখে আনে নাই। আবার নূতন জীবনে নূতন অবলম্বন পাইয়া সেই পুরাতন স্নেহস্মৃতি কনকের হৃদয়ে জাগরূক হইয়াছিল। বাঁচিয়া থাকিলে কনকের মাতার আজি কত সুখের দিন হইত।

রজনীকান্ত কিন্তু তাহা জানে না। তাহার বিলাসপুরের বৃহৎ উদ্যানে গোলাপজামের চারা একটাও বাঁচে নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, এবার গিয়াই আবার রোপণ করিবে।

কনকলতা বড়মানুষের মেয়ে। কলিকাতায় কনকের পিতার সাতখানা বাড়ী। তাহার মধ্যে বড়খানি কনকের বিবাহের যৌতুক। কনকের একটিমাত্র ভাই বিনোদ। বিনোদের চারি বৎসর হইল বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বিনোদ ও বিনোদের স্ত্রী সরযূবালার মতে রজনীকান্তের কলিকাতায় থাকাই ব্যবস্থা। কিন্তু রজনী তাহা শুনিল না। সে বিলাস-পুরে আজীবন চাষবাসের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহার প্রতিজ্ঞা যে, সে চাকুরী করিবে না। দোকান কিংবা অন্য ব্যবসায়ও রজনীর অভিপ্রেত নহে। মহানগরীর রোল হইতে বহু দূরে থাকাই তাহার সাধ। সে সকলের অনুনয়, বিনয়, অনুরোধ সদর্পে ঠেলিয়া চলিয়া গেল।

৩

রজনীর সম্বলের মধ্যে দুই শত বিঘা জমী এবং পিতৃদত্ত একখানি বাটী। বিলাসপুর দাক্ষিণাত্যে। নিকটেই অমরকণ্টকের পাহাড়। নর্ম্মদার জন্মভূমি।

রজনীর পিতামাতা কেহই জীবিত ছিল না। রজনীর পিতার সহিত কনকলতার পিতার বাল্যকালে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল, এবং যদিও উভয়ের সহিত শেষে দেখা হয় নাই, কনকের পিতা রজনীকে পুত্রসম ভালবাসিতেন। রজনী বি. এ, পাশ করিয়া পিতার নিকট গিয়াছিল। মৃত্যুকালে রজনীর পিতা বলিয়াছিলেন, "বাবা, মুখুর্য্যে মহাশয়ের নিকট আমি তোমার বিবাহ সম্বন্ধে প্রতিশ্রুত। আমাদিগের সহায়-সম্পত্তি নাই, এবং কনকলতা বড় ভাল মেয়ে।"

ইহাই বিবাহের কারণ। রজনীর পিতা ব্যবসায় করিয়া বড় কিছু করিতে পারেন নাই। কিন্তু রজনী তাহাতে বড় ক্ষুণ্ণ নহে। রজনীর মতে বিবাহ গলগ্রহ, কিন্তু পিতৃসত্য অলঙ্ঘনীয়।

রজনী স্বদেশী হাঙ্গামার মধ্যে না থাকিলেও তাহার মন ছিল। কিন্তু কলিকাতার রাজপথে, বন্ধুগণের বৈঠকে, এবং দীঘির পাড়ের বক্তৃতায় কোনও গভীর সত্য আবিষ্কার করিতে না পারিয়া, রজনীর মন পূর্ব্ববৎ লাঙ্গল, গরু ও খোলামাঠের দিকে আকৃষ্ট হইল।

সকলে বলিল, "নূতন বৌকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত।" রজনী হাসিয়া বলিল, "অসম্ভব, আত্ম-অবলম্বন নামক একটা প্রথা আছে, তাহা স্ত্রীপুরুষের পক্ষে সমানভাবে আবশ্যক। সময় হইলে লইয়া যাইব।

৪

রজনীর আবাসস্থান কিছু নূতন ধরণের। চতুর্দ্দিকে অভেদ্য শালবন মণ্ডলাকারে বিস্তীর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র পরিবেষ্টন করিয়াছিল। সেই বনের মধ্যে শতাধিক অসভ্য কুলীর কুটীরশ্রেণী। সৎ, স্নেহবদ্ধ, কর্ম্মঠ ও উদার-হৃদয় বন্যজাতি যদি 'অসভ্য' হয়, তবে তাহারা অসভ্য।

তাহারা জাতিতে 'কোড়া।' 'কোড়া' সাঁওতাল ও ভীলের মধ্যজাতি।

রজনীর চাষবাস অপূর্ব্ব। দুই শত বিঘার মধ্যে পঞ্চাশ বিঘা ফল ও ফুলে পরিপূর্ণ। বাকি শস্য। ফলের মধ্যে কিছুই বাদ যায় নাই। ফুলও সম্পূর্ণ। বিবাহের পর রজনী আসিয়া ফুলের ভাগ আরও বাড়াইল। একটা পুষ্করিণী কাটিল। বাটীর সম্মুখে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ফুলের কেয়ারি টব সংস্থাপিত হইল।

রজনীর অভাবনীয় ব্যস্ততা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া প্রজাগণ বুঝিয়াছিল যে, শীঘ্রই বিলাসপুরের নির্জ্জন গৃহে প্রেম-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিতা হইবে। 'বুধী' কোড়াদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চতুরা বালিকা। সে রাষ্ট্র করিয়া দিল যে, 'রাজা' বিবাহ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু 'রাণী' আসেন নাই। শীঘ্রই আসিবেন।

বিবাহের এক বৎসর পরে বিনোদ সরযূ ও কনকলতাকে লইয়া বিলাসপুরে আসিল। রজনীকে পূর্ব্বে সংবাদ দেওয়া হয় নাই। হঠাৎ আসাতে রজনী ঈষৎ ত্রস্ত হইয়া পড়িল।

৫

ত্রস্ত হইবার বিশেষ কারণ ছিল না। কিন্তু রজনী সহরের মানুষ নহে। বনে থাকিলে মনের একটু তারতম্য হয়। অল্প কারণে ভয়, বিষাদ, চাঞ্চল্য আসিয়া পড়ে।

বিনোদের বলা উচিত ছিল।

গিয়াছিলেন, এবং আজমীরে তাঁহার শ্যালকের বাটীতে সকলকে আহ্বান করিয়াছিলেন। সেই অবসরে বিনোদ ঈষৎ কূটনীতি অবলম্বন করিয়া কনককে লইয়া বিলাসপুর প্রদক্ষিণ করিতে মনঃস্থ করিয়াছিল।

বিনোদ এবং সরযূর আহ্লাদের সীমা থাকিল না। কি সুন্দর প্রদেশ! কি মহিমপূর্ণ পর্ব্বতমালা! কি মনোহর উদ্যান, এবং শ্যামল ক্ষেত্র! বিনোদ ষ্টেশনে গিয়া বন্দুক যোগাড় করিল, এবং শীঘ্রই অমরকণ্টকে হরিণ শীকার করিতে গেল।

কিন্তু সরযূ, কনক এবং 'ঠাকুরজামাই'কে লইয়া বিপদে পড়িল। বুদ্ধিমতী সরযূ বুঝিতে পারিল যে, উভয়ের মধ্যে একটা অন্তরাল আসিয়া পড়িয়াছে। কেহ কাহারও সহিত কথা কহে না। কেহ কাহারও দিকে তাকায় না।

সরযূ জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরজামাই, আমার মাথা খাও, কি হইয়াছে, বল।" কিন্তু রজনী সহরের মানুষ নয়। সে কোনও উত্তর দিল না।

৬

সরযূ নিরানন্দ ভালবাসে না। যত্ন, আদর, হাসিখুসি, গল্প, বাগান ও পুষ্করিণী, পর্য্যটন, রজনীর কিছুরই ক্রটী ছিল না, কিন্তু কনক তাহার মধ্যে নাই। সরযূ ভাবিল—কনক না হাসিলে রজনীর সংসার হাসিল কই? সে সংসার অতি নির্জ্জন। অত্যন্ত আভাহীন।

কনক সন্ধ্যার আঁধারে একটি শালবৃক্ষের তলে 'বুধীর' সহিত কথা কহিতেছিল।

বুধী। তুই আমাদের 'রানী'।

কনক। না। মিথ্যা কথা। আমি কল্যই চলিয়া যাইব।

বুধী। গেলেই—আসিতে হয়।

কনক। কখন না, আমি এ স্থান ভালবাসি না।

বুধী কনকের হীরকাঙ্গুরীয় ও নেক্‌লেস্ দেখিয়া ভাবিল, "ইহারা সহরের পরী, বনে আসে না।"

বুধী। এখানে বাঘ ভালুক নাই, কিন্তু খাবার মেলে না। রাজা কেবল ফল খাইয়া থাকেন। তুই বুঝি ফল খেতে পারিস্ না?

কনকের ইচ্ছা হইল, বুধীর কান মলিয়া দেয়। কিন্তু সরযূ আসিয়া বাধা দিল।

সরযূ। তুই আকাশ পাতাল কি ভাব্‌ছিস্‌ ?

কনক। পাতাল ভাব্‌ছি, আকাশ নয়।

সরযূ। সত্য বল্‌না, কি হয়েছে ?

কনক। আমি এখানে থাকিব না।

সরযূ। রজনী আছে, কেন থাকিবে না ?

কনক। এ ঘোর জঙ্গল, আমার মন টেঁকে না, আমি বাবার কাছে যাব।

সরযূ বুঝিল, উভয়ের ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকার।

৭

কনকের অসামান্য দোষ ছিল। সে অতিশয় অভিমানিনী। কেবল সরযূ তাহা জানিত। সরযূ বুঝিল যে, কোনও কারণে কনকের হৃদয়ের সেই স্থান রজনী স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু তাহা আবিষ্কার করা সুকঠিন। কনক তেমন মেয়ে নয়। প্রাণ গেলেও প্রাণের কথা বলিবে না।

কিন্তু রজনীও বেতর। তীব্রশোণিত, এবং ততোধিক অভিমানী।

সরযূ বলিল, 'আচ্ছা, সবুরেই মেওয়া ফলে।' কথাটা তিন জনের মধ্যেই রহিল। বিনোদ জানিতে পারিল না। বিনোদ হরিণ শীকার করিয়া আত্মগর্ব্বে নবদম্পতীর প্রেমকাহিনী সম্বন্ধে কোনও কথার অবতারণা করা বাহুল্য বিবেচনা করিয়া কনক ও সরযূকে লইয়া আজমীরে চলিয়া গেল।

তার পর আর কি ? প্রস্ফুটিত উদ্যান কণ্টকে ভরিয়া গেল, পুষ্করিণীর স্বচ্ছ সলিল লতাপাতায় পরিপূর্ণ হইল, বাটীর প্রকোষ্ঠ হইতে আলোক অন্তর্হিত হইল।

দুই বৎসর কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে বিনোদের পত্রে রজনীর সংবাদ আসিত। "আমি এক রকম আছি, চাষবাস চলিতেছে, এ সালে ধান হয় নাই। শালবনে বাঘ আসিয়া দৌরাত্ম্য করিতেছে।" বিনোদ লিখিল, "একবার কলিকাতায় এস।" রজনী লিখিল, "চাষ ফেলিয়া যাওয়া অসম্ভব।"

৮

কনক হৃদয়ের ব্যথা লুকাইয়া রাখিত। তাহার পক্ষে সেটা স্বভাব-সিদ্ধ। কিন্তু সরযূর দুঃখ উছলিয়া উঠিল। এই রকম করিয়া কি দিন যাইবে ?

সরযূ লিখিল, "ঠাকুরজামাই, আমার মাথা খাও। কনক কি দোষ

কিন্তু রজনী কোনও দোষ দিল না। পত্রের উত্তর আসিল না। প্রায় দুই মাস কাটিয়া গেল।

শ্রাবণ মাস। অশ্রান্ত জলধারা বর্ষণে কলিকাতার দ্বিতল, শীতল এবং স্নিগ্ধ। আকাশ পরিষ্কার। নক্ষত্র, বিমল বায়ুর সহিত আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল।

সরযূ ছাদে আসিয়া দেখিল, কনকলতা শুইয়া আছে।

সরযূ। খালি ছাদে অমন করিয়া থাকা উচিত নয়। আজ শনিবার, থিয়েটার দেখিতে যাইব, চল, কাপড় পরিবে।

কনক। না, তুমি যাও। আমার অত্যন্ত বুকে ব্যথা হইয়াছে।

সরযূ। কনক, মাথা খাও, কি কথাটা, একবার বল।

কনক। (ঈষৎ হাসিয়া) দিদি, কিছুই না। আমি অভাগিনী!

সেই অভাগিনীর মধ্যে দুই বৎসরের পূর্ণ বিষাদ জীর্ণ-শীর্ণ শরীর ধ্বংস করিতেছিল, তাহা সরযূ দেখিল। এমন সময় বিনোদ আসিয়া বলিল, "কনি, বিলাসপুর থেকে একটা পার্শেল এসেছে।"

৯

পার্শেলটা সরযূর নামে। একটা বাঁশের ঝুপ্‌ড়ী। বেশী বড়ও নয়, ছোটও নয়। তাহার মধ্যে গোটাকতক শুষ্ক ফুল ও পাতা, এবং একগুচ্ছ গোলাপ-জাম।

কনকলতা ছাদেই পড়িয়া রহিল; বলিল, "আহা, কি চমৎকার গোলাপ-জাম, এমন জন্মে কোথায়ও দেখি নাই। ও মা, ইহার সঙ্গে একখানা পত্র।"

পত্র সরযূর নামে,—"স্নেহের ভগ্নী, আমি পীড়িত। কোনও বন্ধু অবস্থা খারাপ দেখিয়া অমরকণ্টকের পাহাড়ে লইয়া আসিয়াছে। তোমরা ভাবিও না, কিন্তু সংসার, হৃদয়ের ন্যায় ভঙ্গপ্রবণ, এবং সংসারের মানুষও তাই। আমার 'জমিদারী' হইতে ডালি আসিয়াছে। আমি যত্ন করিয়া চারি বৎসর ধরিয়া কতকগুলি ফুল ও ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলাম। সেগুলি তোমরা দেখ নাই। গভীর বনে, একটা মন্দিরের পার্শ্বে, লুকাইয়া রোপণ করিয়াছিলাম। গোলাপজামের গাছটি কোনও পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন। তাই তোমাদের দেখাই নাই। শুনিলাম, এত দিন পরে তাহাতে ফল ধরিয়াছে। যদি ফলগুলি ভাল লাগে, তবে মনে করিও, আমার উহাই জীবন-সম্পত্তি, উত্তরাধিকারী

সরযূ বিনোদকে পড়িয়া শুনাইল। বিনোদ গম্ভীরভাবে বলিল, "আমাকে এখনই নাগপুরের মেলে যাইতে হইবে।"

১০

সেই পত্রখানির মধ্যে কিছু ছিল, যাহা সরযূ সম্পূর্ণ বুঝে নাই। কিন্তু কনক যে পত্রখানি শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়াছিল, তাহা বিনোদ অনেকক্ষণ পরে বুঝিতে পারিল।

উভয়ে কনকের মুখে জল দিল, বাতাস করিল। ক্রমে কনকের জ্ঞান হইলে বিনোদ বলিল ;

"তোমাদের চরিত্র দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।"

কনক বলিল, "দাদা, আমি এখন নির্লজ্জা, আমি আর লুকাইতে পারি না, আমাকে লইয়া চল।"

সেই রাত্রিতেই আবার তিন জনে দাক্ষিণাত্য অভিমুখে চলিল। শ্রাবণের বারিধারা ঠেলিয়া, কত পর্ব্বত-শ্রেণী লঙ্ঘন করিয়া, কত নদ-নদী ভাঙ্গিয়া!

দুই দিন পরে সকলে অমরকণ্টক পর্ব্বতের শীর্ষে উপস্থিত হইল। কনক বাতাহতার ন্যায় কাঁপিতেছিল।

সরযূ। কনক! তুমি কাঁপ্‌ছ কেন?

কনক। ঐ যে 'বুধী' আসিতেছে, আগে উহাকে জিজ্ঞসা কর, সে কেমন আছে।

বুধী হরিণীর ন্যায় ছুটিয়া আসিল। "রাণী! আমি বলেছিলাম, তুমি আস্‌বে, তবে এবার মলিন বেশ, রূক্ষ কেশ।"

কনক। 'বুধী'! বল না, সে কেমন আছে।

বুধী। সে কোন রকম নাই। অনেক কথা কয়।

সকলে বুঝিল—বিকার।

কনক তীব্রস্বরে বলিল, "পথ দেখাইয়া দে।"

১১

কনকের স্পর্শে রজনীর বিকার অন্তর্হিত হইয়াছে। অভিমানিনী সতী স্বীয় করস্পর্শে আত্মজীবন ঢালিয়া দিয়াছিল। শত বনৌষধি ও শত ধন্বন্তরীর মহিমা তাহার নিকট তুচ্ছ।

রজনী সরযূকে বলিল, "ভাই, তোমাদের কনক বড় গভীর মেয়ে।"

রজনী। না, অদ্যই বলিব। কথাটা বড় হাসির। ফুলশয্যার দিন আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, আমি বিলাসপুরে আসিয়াই গোলাপজামের গাছ রোপণ করিব। সে প্রতিজ্ঞা মনে মনে। কনক বোধ হয়, মনের কথা বুঝিতে পারে। তোমরা যখন আসিয়াছিলে, তখন কনক গোলাপজামের গাছ খুঁজিতেছিল, কিন্তু সেটা অনেক দূর-বনের মধ্যে, তাই পায় নাই। ইহাই অভিমানের গোড়া।

সরযূ। তোমার কথা ভার বোধ হইতেছে।

রজনী। ক্রমেই লঘু হইবে। একটু জল খাব।

সরযূ। কনক দেবে। আর একটা কথা বলি, সে যে চারি বৎসর প্রায় অনশনে আছে, তার মুখে একটু গোলাপজাম দিও।

রজনী। কি আশ্চর্য্য! তবে বাঁচিয়াছিল কি করিয়া?

সরযূ। কেবল অভিমানে এবং আত্মদানে।

কাব্যে সমালোচনা।

পূর্ব্বকালের 'কবির লড়াই' ও একালের 'সমালোচনা'র মধ্যে অনেকটা প্রভেদ আছে। 'কবির লড়াই' অপূর্ব্ব। বঙ্গদেশই ইহার আকর-স্থান। ইহার মধ্যে ছন্দোবন্ধ, রচনার পারিপাট্য, তবলার চাঁটী ও বেহালার সুর ছিল। মল্লযুদ্ধ আসরেই হইত, আসরেই বাহবা পড়িত, এবং আসরেই হাতে হাতে বিদায়। সুর ও লয়যোগে যুদ্ধ অন্য দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যঙ্গ-কাব্য বহুৎ দেখা গিয়াছে। পোপ, বাইরণ, ড্রাইডেন, অনেকানেক কবি এককালে এ হেন কাব্যে ভক্তগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা 'কবির লড়াই'এর সমকক্ষ নহে।

জিনিসটা এই। সুর ও লয় সংযোগে যাহা করা যায়, তাহা নকল হইলেও, ঈষৎ উচ্চ-জগতের। আসল হইলে ত কথাই নাই। কাব্যে গালি দিলেও তাহার কদর আছে। গালি দেওয়া জঘন্য, কিন্তু কবিতা পবিত্র দেশের হাব-ভাব, স্থানবিশেষে কটু ঔষধের সহিত মধুবৎ অনুপানের কাজ করে।

কালক্রমে প্রথাটা উঠিয়া গিয়াছে। কথার ছন্দ, ও সুর লয়ের ব্যবহার দর্শক ও শ্রোতৃবৃন্দের সমক্ষে আসরে কবিগণের আক্রমণার্থ অবতারণা করা নীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে। এখন যদি কিছু বলিতে হয়, তবে সেটা সমালোচনা দ্বারা। রঙ্গস্থল মাসিকপত্রিকা। খড়্গাঘাত নেপথ্যে। কাব্য সম্বন্ধে সমালোচনা হইতে পারে, কিন্তু কবিতায় করা উচিত নহে। ‘মাছের তেলে মাছ ভাজা’ অত্যন্ত বেস্বাদবী।

এই নবীন প্রথার বশবর্ত্তী কবিগণ আর কাব্যের সাহায্যে পরস্পরকে আক্রমণ করিতে পারেন না। অর্থাৎ, আসরে বসিয়া, কাব্য-শরাসন লইয়া, রাগ-রাগিণী-সহকারে অন্য কবিকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ শ্লেষোক্তি দ্বারা জর্জ্জরিত করিবার উপায় এখন আর নাই। ইহা দুঃখের বিষয়। কিন্তু ইহাও দেখিতে হইবে যে, বঙ্গদেশ স্বাস্থ্য-বিহীন হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ ব্যভিচারে সুকুমার ও সুকোমল কবিগণের জ্বর ও বিসূচিকা হইবার সম্ভাবনা। একে ত কবিতা লেখাই একটা ভীষণ ব্যাপার। আমি বিংশ বৎসরাবধি কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতেছি। ভাব আসে, কিন্তু মস্তকে অধিকক্ষণ থাকিলে মাথা ধরে, এবং মস্তক অতিক্রম করিয়া উদরে গেলে পেট ব্যথা করে (অর্থাৎ ছন্দোবন্ধের সময়)! ভাবটা কি বায়ুর বিকার? কে জানে।

গদ্যে আক্রমণ পদ্য অপেক্ষা সোজা। পদ্য নাগরদোলা। ঘুরিতে ঘুরিতে শ্বাসরোধ হয়। আবার খানিকক্ষণ উন্মুক্ত ময়দানে পরিভ্রমণ করিলে, হৃদয় খোলসা হইয়া পড়ে। পূর্ব্বকালে এক জন যাত্রার অধিকারী সারারাত্রি সামলা মাথায় দিয়া বসিয়া থাকিত। এখন তাহা পারে না। আদব-কায়দার আধিক্য ও নিয়মাবলীর কঠোর বন্ধন এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে।

বিবেচনা করিয়া দেখুন, এখনকার কবি নির্ব্বিবাদে মাসিকপত্র চালাইতে পারেন, মাসিকপত্রে সমালোচনা করিতে পারেন, গদ্য লিখিতে পারেন, এবং চোগাচাপকান পরিধান করিয়া আপিস যাইতে পারেন। উপায় নাই। লোকের বিপদ্ হইলে ব্রাহ্মণ-ঠাকুর বাটীতে না থাকিলে স্ত্রী ভাত রাঁধিয়া দেন, স্ত্রী না থাকিলে দরওয়ান্, দরওয়ান না থাকিলে ঘোড়ার সহিস দেয়। যাহার যাহা পেশা, তাহার অভাব হইলে অন্যপেশাভুক্ত লোককে সাধুদিগের পরিত্রাণার্থ কর্ম্মক্ষেত্রে আসিতে হয়। যদি ভাল সমালোচকের অভাব হয়, তবে কবিকেই আত্মরক্ষার্থ গলায় উত্তরীয় বাঁধিতে হইবে।

দেখা উচিত। যত দিন কবির লড়াই ছিল, দুই এক দল পেশাদারও ছিল। যখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে, তখন 'মাসিকপত্রে' সমালোচনা ছাড়া আর উপায় নাই। এমন কথা কিছু নয় যে, সকলের দোষই দেখিতে হইবে, এবং গুণ বাদ দিতে হইবে। সমালোচনা ঠিক 'লড়াই' নহে। কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্র ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অঙ্গভঙ্গী চলে। স্যাঙ্গার সহিত সেতার চলে, ধ্যানের সহিত কটাক্ষ চলে, প্রার্থনার সহিত কামনা চলে।

অনেক ওস্তাদ ভাল সঙ্গতদার না পাইলে নিজেই বাঁয়া লইয়া, তাল সহকারে হেলিয়া দুলিয়া গাহিতে কুণ্ঠিত হন না, এরূপ দেখা গিয়াছে। বিজ্ঞ সমালোচক না থাকিলে অন্য গাহকের দোষ-গুণ বর্ণনা করিয়া থাকেন, এরূপও শুনা গিয়াছে। বর্ণনার ক্ষমতা, ব্যঙ্গের ক্ষমতা, এবং সমালোচনার ক্ষমতা কাহারও না থাকিলে আসরে মহা অভাব উপস্থিত হয়। দর্শকবৃন্দ ম্যাড়ার মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। এরূপ স্থলে বর্ণশঙ্করত্ব আবশ্যক। পেশাদারগণ ইহাতে চটিতে পারেন, কিন্তু সে রকম পেশাদার এখন কোথায়?

কাব্যে এবং সঙ্গীতে সমালোচনা, এখনকার মতে নিতান্ত নীতি-বিরুদ্ধ হইলেও, ইহাতে একটু বিশেষত্ব ছিল। গুণগ্রাহী ব্যক্তি কাব্য-মধুটুকু সংগ্রহ করিয়া স্থূল গালিটুকু ছাড়িয়া দিতেন। কিন্তু গদ্যে, গালির দিকেই নজর পড়ে। ইহা নিবারণার্থে কতিপয় উপায় আমাদিগের মাসিকপত্রে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। তাহা তিন প্রকার :—

১। বৈজ্ঞানিক।

২। জৈবনিক।

৩। নৈতিক, কিংবা আধ্যাত্মিক।

কবির শরীরাংশ আক্রমণ করা বৈজ্ঞানিক প্রথা। জীবনবৃত্তান্তের অবতারণা, 'জৈবনিক' উপায়। কবির নীতি কি ধর্ম্ম লইয়া নাড়া-চাড়া করা, নৈতিক কিংবা আধ্যাত্মিক উপায়। সমালোচকগণের স্মরণার্থ তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বৈজ্ঞানিক উপায়।

শারীরিক অংশ আক্রমণ করিতে হইলে লক্ষ্য পদার্থের দেহের সহিত তাহার কাব্যের সামঞ্জস্য সংস্থাপন করিতে হইবে। অধুনা বঙ্গদেশে ত্রিবিধ

সুদীর্ঘ কেশ, দিব্য গোঁফ ও অল্প দাড়ি। সুন্দর চেহারা, মধুর কণ্ঠ, এবং ভাবে-মগ্ন ভাব। দেখিলে আনন্দ হয়, থাকিলে ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা করে, চলিয়া গেলে, হৃদয় দলিয়া যায়। অনেক পুণ্যবলেই ঈদৃশ সৌন্দর্য্য মনুষ্য জাতি লাভ করিতে সক্ষম। বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিগণ এই আকারের। সকলে ঠিক একরকম না হইতে পারেন, কিন্তু ধরণটা এক। সকলে নিখুঁত সুন্দর না হইতে পারেন, কিন্তু দুই এক জন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। ইংলণ্ডে বায়রণ, শেলী, কীট্‌স্, টেনিসন প্রভৃতি অনেকটা এই প্রকার। হয় ত দুই এক জনের দাড়ি নাই, কিন্তু থাকিলে আরও ভাল হইত। হয় ত দুই এক জনের স্বর কিছু কর্কশ, কিন্তু তাহা সর্দ্দি লাগিয়া। আপনারা মনে করিতে পারেন যে, এই ভুবনমোহন রূপ অনেকটা পঞ্চপাণ্ডবের তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের মত।

"তৃতীয় পাণ্ডব তেঁহ নাম বৃহন্নলা।"—বিরাট পর্ব্ব।

এরূপ প্যাটার্ণের কবির কবিতার পারিপাট্য তাঁহাদিগের কেশের পারিপাট্যের ন্যায়। অতি সুন্দর ভাষা, অতি সুন্দর ছন্দ ও রচনা। চক্ষু ভাসা-ভাসা, টানা-টানা, কাহারও দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিলে সে তৎক্ষণাৎ সাফ্‌। অবশ্য ইহা কেবল ভারতবর্ষের সম্পত্তি নহে। পারস্যে সাদি ও হাফেজ ও সুফী কবিগণ, তুরস্কের ওমার কবিগণ, এবং ইতালীর প্রসিদ্ধ কবি ও চিত্রকরগণ এই জাতীয়। ইহা রহস্যের কথা নহে, কিন্তু ঠিক যে, তাঁহাদিগের ভাব অতি স্বপ্নময়, এবং এত চঞ্চল যে, কথায় কথায় মর্ত্ত্য হইতে চঞ্চলার ন্যায় ঊর্দ্ধে গিয়া আকাশে মিশাইয়া যায়। ধরা যায় না, এবং ধরা দিতেও চাহে না। ইহার উপমা দিতে আমরা অক্ষম। যদি ক্লিওপেট্রার মূর্চ্ছা রঙ্গস্থলে দেখিয়া থাকেন, তবে অনেকটা বুঝিতে পারিবেন। সেই সুন্দর চক্ষু-তারকা, দেখিতে দেখিতে উল্টাইয়া যাওয়া, দেখিতে দেখিতে দক্ষিণেও বামে, এবং দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য (হোমিওপ্যাথিক মতে ইগ্‌নেশিয়া কিংবা ভ্যালিরিয়ান ঔষধের লক্ষণ)! ভাবের দৌড়ও সেই রকম।

দ্বিতীয়তঃ, গোঁফ-দাড়ি-হীন, সবল, হৃষ্টপুষ্ট, নদীয়ার-চাঁদ-কবি। হাস্যরস-পূর্ণ, কিংবা বীররস-পূর্ণ। মোটা গলা, এবং প্রশস্ত হৃদয়। ঘুমাইলে নাক ডাকে। অল্পে হাসিয়া এবং কাঁদিয়া ফেলে (পল্‌সেটিলা, কিংবা কাল-

স্থির, এবং জাগ্রত। স্বপ্নময়তা নাই, স্বপ্নের কথা বলিলেও বোধ হয়,—লোকটা এখানেই হুবহু বসিয়া রঙ্গ করিতেছে। নেশা চট্ করিয়া পাড়িয়া ফেলিতে পারে না। সময় হইলে ভীম প্রহরণ ধরিতে প্রস্তুত।

"মধ্যম পাণ্ডব যেঁই বধিল কীচক।"—বিরাট পর্ব্ব।

বীররসাত্মক ও হাস্যরসাত্মক কর্ম্মবীর ও কাব্যবীরগণ এই ধরণের। এ শ্রেণীর কবি ইচ্ছা করিলে তীব্র সমালোচক হইতে পারেন, এবং কিছু একটা হাতে পাইলেই কাজ সারিতে পারেন। সেটা উপন্যাসই হউক, কাব্যই হউক, এবং নাটকই হউক। এরূপ লোককে বেশ বিশ্বাস করা যায়, হৃদয় দিলে "দলিয়া যায় না", ভাব করিলে বেশ মিশিয়া যায়, এবং বয়োধিকের সহিত ধর্ম্মভাবে মজিয়া যায়। ইহাঁদিগের কবিতায় বীণার ঝঙ্কার নাই, বরং মৃদঙ্গের নির্ঘোষ আছে। রণস্থলে নেপোলিয়ন, সভায় গ্লাডষ্টোন, ধর্ম্মে গৌরাঙ্গ, উপন্যাসে বঙ্কিম, সংবাদপত্রে বাঁড়ুয্যে মহাশয়, এবং কবিতায় ও নাটকে রায় মহাশয় এই প্রকার নির্ভীক ও উদার জাতিস্থ।

তৃতীয়তঃ, চাপদাড়ি-বিশিষ্ট, ধর্ম্মের ও সত্যের অনুরোধে কবি। 'ইতি-গজ' আখ্যাত প্রথম পাণ্ডব। ইহা ব্যতিরেকে ক্ষুদ্র ও আশৈশব-লালিত-পালিত খণ্ড কবি, নকুল ও সহদেবের ন্যায়। ইঁহাদিগের আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়।

যদি পূর্ব্বকালের 'কবির লড়াই' থাকিত, তবে নিশ্চয় শারীরিক লক্ষণগুলি কাব্যে বিবৃত করিতে পারিতেন। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইহা রুচি-বিরুদ্ধ। অধুনা তাহা ঈষৎ সমালোচনাচ্ছলে বলিতে পারেন। অথচ গালি যেন না হয়।

আমরা কেবল আভাস দিতেছি মাত্র, কথাগুলি আপনারা বিন্যাস করিবেন। মনে করুন, রবীন্দ্র বাবুর কোনও কবিতার ভাব আপনি বুঝিতে পারিলেন না, এবং সহসা চটিয়া গেলেন। চটিয়া যাইবারই কথা; কারণ, এমন কবিতা লেখা উচিত যে, ছোট লোক হইতে বড় লোক পর্য্যন্ত সকলে বুঝিতে পারে (এই মত ধরিয়া ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ 'একস্‌করশ্‌ন' লিখিয়াছিলেন)। এমত স্থলে ঘুমন্ত অবস্থায় রবি বাবুর কেশ আক্রমণ করাই উচিত। ইহাই বৈজ্ঞানিক প্রথা। যদি কথার মধ্যে ভাবগ্রহণ না করা যায়,

বাঁড়ুয্যের রোগ হয়, তখন দশ জন দিগ্‌গজ ডাক্তার আসিয়া রোগ চিনিতে পারে নাই। সকলে বলিল "ছোট লোক, নচেৎ এমন রোগ হয় কেন যে, আমরা চিনিতে পারি না?" রোগী তাহা শুনিতে পাইয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "রোগের বিধাতাই ইহার তথ্য জানেন। নমস্কার।" সকলে হাসিলেন।

যদি তথ্য অভিধানে না পাওয়া যায়, তবে চক্ষু, কর্ণ, কেশ, নাসিকা প্রভৃতির সমালোচনা করিলে বেশ চলিয়া যায়, এবং যদি কোথাও না পাওয়া যায়, তবে হাস্যরসে উড়াইয়া দেওয়া উচিত।

জৈবনিক উপায়।

যদি চেহারার সহিত কাব্যের মিল না থাকে, তবে জীবনবৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিতে হইবে। যদি কাব্য বীররসাত্মক হয়, তবে কবির নিশ্চয় সিংহ রাশিতে জন্ম; শ্লেষ্মাত্মক হইলে বৃশ্চিক রাশি; এবং প্রেমের ছড়াছড়ি থাকিলে কন্যারাশি। এই প্রকারে জন্মকোষ্ঠী নির্দ্ধারণপূর্ব্বক বংশের দিকে চলিয়া যাউন। হয় ত বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন, কিংবা কুলাঙ্গার। অমুক সালে জন্ম, অমুক সালে বিদ্যালয় হইতে শেষ বিদায়। পেশা কি? যদি কাব্যই পেশা হয়, তবে লোকরঞ্জনের দিকেই তাঁহার দৃষ্টি বেশী। যদি দোকান থাকে, তবে কেনাব্যাচাই তাঁহার উদ্দেশ্য।

আরও গভীরভাবে অনুসন্ধান করিলে কবির জীবনের সুখ দুঃখ লইয়া আলোচনা করিতে পারিবেন। যদি কবি হতাশপ্রেমিক হন, তবে তাঁহার হৃদয় এককালে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; অন্ততঃ মোচড়াইয়া গিয়াছিল। কবিতাও তদ্রূপ ভাঙ্গা ভাঙ্গা, কিংবা মোচড়ান (ঘড়ির স্প্রিংএর মতন) পাইবেন। যদি প্রথম প্রেমের অবসানের পর নূতন প্রেমের পত্তন করিয়া থাকেন, তবে কাব্য হরিতকীর ন্যায় সুস্বাদু হইয়া থাকে।

এ হেতু কবি কিংবা কোনও সাহিত্য-বীরের জীবদ্দশাতেই তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত উদ্ঘাটিত করিলে সমালোচনার কাজ হইয়া যায়। ইহা বাল্মীকি প্রমুখ প্রথা। তাহার কারণ, কাব্য-সতীর অগ্নিপরীক্ষা ও পাতাল-প্রবেশের পূর্ব্বেই কবিকে তাঁহার শ্রাদ্ধের যোগাড় করিতে হয়। রঙ্গালয়ে লব কুশ কবির জীবনবৃত্তান্ত গাহিবে, পারিষদবর্গ হাসিবে, কাঁদিবে, বাহবা দিবে। তাহার উপর যদি সঙ্গে 'হাফ-টোন' ছবি থাকে, তবে সোনায় সোহাগা। অনেক সময় খালি ছবিতেই কাজ হয়।

সাকার কবির কাব্য হয় নিরাকার,
নিরাকার কবি সদা রচেন সাকার।
তাই দেখি কহিলেন প্রভু নিত্যানন্দ,
শ্রীহরির চাতুরীতে মনে লাগে ধন্দ।

বাস্তবিক এটা একটা হেঁয়ালি। নিরাকার ঈশ্বরের বিশ্ব সাকার হইতে কেন চাহে, এবং সাকার কবির কল্পনা কেন নিরাকারের দিকে ধায়, তাহা কবিগণই জানেন। তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, কবি রঙ্গালয়ে উপস্থিত না হইয়া, যদি অলক্ষ্যে অদৃশ্য থাকিয়া, কবিতা লিখিয়া সংসার হইতে অপসৃত হন, তাহা হইলে লোকে তাঁহার সাকার মূর্ত্তির পূজা না করিয়া নিরাকার কাব্যেরই পূজা করিবে। কিন্তু ইহা সকল ধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। আর যদি সাকার পূজা করিতেই হয়, তবে গোঁফদাড়ী-বিহীন দেবতারই করা ভাল।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উপায়।

যদি শারীরিক ও জৈবনিক লক্ষণের বিশ্লেষণ দ্বারা সমালোচনা পরিপুষ্ট না হয়, তবে কবিতা ধরিয়া টানা উচিত। আপনি বলিতে পারেন যে, 'কাব্য' স্ত্রীলোক, কাজটা দুঃশাসনের মত হয়। আমরা বলি, অত দূর না গিয়া তাহার নৈতিক ভাগটুকু লইয়া প্রথমতঃ আক্রমণ করা উচিত। বেশ করিয়া দেখুন যে, কবি স্বীয় কাব্যবর্ণিতা সুন্দরীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেছেন। কুরূপাকে সুরূপা করিতেছেন কি না, কুমারীর সহিত কোর্টশিপ করিতেছেন কি না, ইহার ফল দুর্নীতিময় কি না, এবং ইহাতে দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে কি না। যদি তাহা হয়, তবে স্ত্রীলোকটার গলা টিপিয়া ধরুন।

স্ত্রীলোক। "সখি ধর রে ধর—নিতম্ব পীন পয়োধর ভূমিতে লুটায় হায়।"

সমালোচক। মা! বঙ্গ-কবির হাতে পড়িয়া তোমার এ কি দুর্দ্দশা! (ক্রন্দন)

দর্শক। মহাশয়! ক'চ্চেন কি?

সমালোচক। দেখুন ত মশায়! এরূপ কি সহ্য যায়?

দর্শক। ছাড়িয়া দিন, এটা আপনার মত লোকের উপযুক্ত কাজ নয়। আপনি যশস্বী কবি; অনেকের পূজ্য, এবং সকলের আদর্শ। নারীহত্যা করিয়া মাথায় কলঙ্ক লওয়া আপনার উচিত নয়।

সমালোচক। আমি কেবল দুর্নীতি হত্যা করিতেছি, কাব্য হত্যা করিতেছি না, কিংবা কাব্যবর্ণিতা সুন্দরীকে উৎপীড়ন করিতেছি না।

দর্শক। ইহা আপনার পেশা নয়। আপনার 'সুনীতি' যখন কেহ হত্যা করিতে অগ্রসর হয় নাই, তখন আপনার কাহারও দুর্নীতি হত্যা করা উচিত নয়।

সমালোচক। আপনি দেখ্‌ছি Extremist, কিন্তু আমি তাহা মানি না। যখন সমাজে কেহ মুখ তুলিয়া আপত্তি করিতে চাহে না, তখন ইহা আমারই কর্ত্তব্য।

দর্শক। আপনার বীরত্ব সম্বন্ধে আমার কোনও সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিতাটি পড়িয়া আপনার যত নীতি-দাহ হইয়াছে, আমাদিগের তত হয় নাই। মনে করিয়া দেখুন, আপনার কবিতাটি (রমণী সম্বন্ধে)

'পথে ঘাটে মাঠে তারে, যদি পাই দেখিবারে,
অমনি ধড়াস করে' কেঁপে উঠে বুক'

পড়িয়া যদি কাহারও বুক কাঁপে, তবে বোধ হয় আপনিও তাহার জন্য সমান ভাবে দায়ী।

সমালোচক। (তুচ্ছভাবে) আপনি বোধ হয় কবির উদ্দেশ্য দেখেন না।

দর্শক। (চটিয়া) মহাশয়! উদ্দেশ্য কাহার কি জানি না, কিন্তু সকলের মত এক হয় না। আপনি যদি কাহাকেও 'শালা' বলেন, তবে দুই অর্থ হয়। এক অর্থ তাহার ভগ্নীর সহিত অবৈধ সম্বন্ধ, এবং অন্য অর্থ তাহার সহিত দাম্পত্য সম্বন্ধ। যদি আপনার শেষ অর্থ ধরিয়া উদ্দেশ্য মহৎ দাঁড় করান যায়, তথাপি রাম শ্যাম তাহা শুনিবে না। এবং রাম শ্যাম যদি ছোট-লোক হয়, তবে শুনিতেও পারে। কাব্য দ্রৌপদীর ন্যায় পঞ্চস্বামীর মন যোগাইতে বাধ্য, এবং কবিগণ কেবল ভাব ছড়াইতে থাকিবেন। তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অধিকার নাই।

সমালোচক। মহাশয়! আপনার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। আদর্শ চরিত্রকে কলুষিত করা মহাপাপ, দুর্নীতি-বিস্তারের ত কথাই নাই। ইহার নিবারণার্থ সকলের বদ্ধপরিকর হওয়া উচিত। জাতীয় আদর্শ অপেক্ষা পবিত্রতর প্রতিমা আর নাই। চরিত্র-সংগঠনার্থ তাহারই পূজা করা

দর্শক তাহা বিলক্ষণ জানি, কিন্তু আপনার রণস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক তর্জ্জন-গর্জ্জনাদি ভাড়াটীয়া বাড়ীওয়ালার মত।

দর্শকের মতামতের জন্য, কিংবা সমালোচকের মতামতের জন্য আমরা দায়ী নহি। তবে দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় যে, সমালোচনার ভঙ্গী অনেক মোলায়েম করা যাইতে পারে। মুখভঙ্গী অনেক প্রকার। যথা, অবজ্ঞা-সূচক (হাস্য ও ওষ্ঠ ও নাসিকার কুঞ্চন), ক্রোধ (চক্ষু রক্তবর্ণ ও কম্পন), ঘোর দুঃখ (অশ্রুপাত), হতাশ ভাব, ইত্যাদি। বৃদ্ধ ও পূজ্য সমালোচক-গণের দুঃখপ্রকাশ করা এবং বেদম্ হতাশ হইয়া পড়া কিঞ্চিৎ শ্রেয়স্কর। সম্মার্জ্জনী লইয়া বাহিরে আসিলে রঙ্গস্থল ভীষণাকার হইয়া পড়ে, কাক ও শকুনির প্রাদুর্ভাব হয়। এটা যেন মনে থাকে, রাজস্থানের বীরদর্প সিমলা কিংবা যোড়াসাঁকোতে চলে না।

আমরা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সমালোচকগণকে অনুরোধ করি যে, পুরাতন কবির লড়াই ঘসিয়া মাজিয়া আরও মসৃণ করিতে থাকুন। হাঙ্গামা উৎপাত সময়োপযোগী নহে। অন্ততঃ যাহারা দূরদেশে থাকে, তাহাদের বক্ষ দুড় দুড় করে। ভয় হয় যে, বঙ্গের কাব্য-সরোবরে যাও বা দুই একটা রুই মৃগেল আছে, তাহারা অল্প জলে আসিয়া মারা না পড়ে।

রামায়ণের সমাজ।

ক্রিয়া-কাণ্ড।

আমরা 'রামায়ণের সমাজ' প্রবন্ধে সংক্ষেপে তদানীন্তন ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য সমাজের অবস্থার আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎকাল-প্রচলিত ক্রিয়া-কাণ্ডের আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

ভারতের সর্ব্বত্র লৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয় সভ্য-সমাজও এই লৌকিক ক্রিয়া-কাণ্ডের প্রভাব হইতে বিমুক্ত নহেন। অসভ্য-সমাজেও লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহার রীতিপদ্ধতি তেমন উন্নত নহে। সমাজ যতই সভ্যতার দিকে অগ্রসর হয়, সমাজের ক্রিয়া-কাণ্ডও সেইরূপ সংশোধিত ও সংস্কৃত হইতে থাকে।

হইয়াছিল। বৌদ্ধ-বিপ্লবের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহিত ভারতীয় ক্রিয়া-কাণ্ডও পুনরায় ভারতীয় সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। বৌদ্ধ-বিপ্লবের পূর্ব্বে, ব্রাহ্মণ্যযুগে ভারতে বৈদিক ধর্ম্মের প্রভাব ছিল; সুতরাং লৌকিক ক্রিয়া-কলাপও বৈদিক রীতির অনুসরণে অনুষ্ঠিত হইত। রামায়ণে যেরূপ ক্রিয়া-কাণ্ডের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় সমাজের ক্রিয়াকলাপ তাহা অপেক্ষা বহুপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থান ও পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রভাবই ইহার কারণ। এই বিপ্লবে অনেক বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ড লয়ও পাইয়াছে। বিপ্লবে লয় ও উদ্ভব স্বাভাবিক।

এখন প্রাচীন ভারতীয় সমাজে কি কি ক্রিয়া-কাণ্ড প্রচলিত ছিল, তাহার আলোচনা করা যাউক।

জাতকর্ম্ম; নামকরণ।

প্রাচীন ভারতে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে, একাদশ দিবসে নামকরণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহাই তখনকার সমাজে প্রচলিত প্রাথমিক জন্ম-কর্ম্ম।

পুত্র জন্মগ্রহণ করিবার পর একাদশ দিবসে রাজা দশরথ ব্রাহ্মণ্‌ও পৌর ও জনপদবাসীদিগকে প্রচুরপরিমাণে ভোজন করাইয়া কুলগুরু বশিষ্ঠের সাহায্যে আত্মজদিগের নামকরণ করিলেন। (আদি—১৮-২১।২৪ শ্লো)

উপনয়ন।

নামকরণের পর উপনয়ন। দশম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রামের উপনয়ন হইয়াছিল। রামায়ণে কেবল উল্লেখমাত্র দেখা যায়। এই উল্লেখে ক্রিয়া-কাণ্ডের রীতি পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

বিবাহ।

উপনয়ন সংস্কারের পর বিবাহ। বৈবাহিক আচার অনুষ্ঠান ও তৎ-সম্পর্কিত ক্রিয়া-কাণ্ডের বিস্তৃত বিবরণ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়। তখন বৈবাহিক অনুষ্ঠানের প্রথমেই বর-পক্ষ ও কন্যা-পক্ষ, উভয় পক্ষকে স্ব স্ব বংশগৌরব কীর্ত্তন করিতে হইত। রাম প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের বিবাহের পূর্ব্বে বর-পক্ষে কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ সূর্য্যবংশের বংশাবলী ও বংশগৌরব কীর্ত্তন করেন। কন্যা-পক্ষে কন্যা-কর্ত্তা জনক নিজেই স্বীয় পিতৃপিতামহের নাম ও বংশগৌরব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। (আদি—৭০ সর্গ।)

নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ।

বিবাহের পূর্ব্বে গোদান করিয়া পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ (নান্দীমুখ) করিবার বিধি ছিল। রাজা দশরথকে সম্বোধন করিয়া মিথিলাধিপতি জনক বলিতেছেন ;—

"রামলক্ষ্মণয়ো রাজন্ গোদানং কারয়স্ব হ।
পিতৃকার্য্যঞ্চ ভদ্রং তে ততো বৈবাহিকং কুরু ॥ (আদি ; ৭১ সর্গ ; ২৩।

"রাম লক্ষ্মণের নিমিত্ত গোদান ও বিবাহের জন্য পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করুন।" বলা বাহুল্য, পুত্রবৎসল রাজা দশরথ বিবাহের পূর্ব্বদিবস যথাবিধি পিতৃ-কার্য্য-সম্পাদনান্তে পুত্রদিগের মঙ্গলকামনা করিয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে এক লক্ষ সুবর্ণশৃঙ্গ দুগ্ধবতী সবৎসা গাভী ও বহু ধন প্রদান করিলেন।

(আদি—৭২ সর্গ।)

বিবাহপ্রণালী।

এই বৈবাহিক অনুষ্ঠানপ্রণালী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। রামায়ণে তদানীন্তন বিবাহের যে রীতি পদ্ধতি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা এইরূপ ;—জনকের যজ্ঞাগারে এক বেদী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ বেদীর চারি দিকে গন্ধপুষ্প, যবাঙ্কুরযুক্ত বিচিত্র কুম্ভ, শরাব, ধূপ পূর্ণ পাত্র, শঙ্খ-যুক্ত শঙ্খাধার, অর্ঘ্যভাজন, হরিদ্রালিপ্ত অক্ষত, স্রুব, স্রুক, কুশ প্রভৃতি রক্ষিত হইয়াছিল। উভয় পক্ষে কুলপুরোহিত ও ঋষিগণ উপস্থিত। যথাসময়ে বর-পক্ষের কুলপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠ ঐ বেদীর উপর সমপ্রমাণ দর্ভ কল্প-সূত্রোক্ত নিয়মানুসারে বেদমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মন্ত্রপূত করিয়া আস্তীর্ণ করিয়া বিধি ও মন্ত্র সহকারে বহ্নিস্থাপন পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা জনক সর্ব্বাভরণভূষিতা সীতাকে আনায়ন করিয়া অগ্নির সমীপে রামের অভিমুখে স্থাপন পূর্ব্বক রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ;—

ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্ম্মচরী তব ॥২৬
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্ণীষ্ব পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা ॥*২৭ (আদি ; ৭৩ পর্ব্ব)

---

* কন্যাদাতা জনক এই কথা গুলা মন্ত্র ব্রাহ্মণের উপদেশে বলিয়াছিলেন কি, আপনি বলিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ রামায়ণে নাই। বর্ত্তমান সময় সম্প্রদানকালে ব্রাহ্মণ মন্ত্র বলিয়া

আমার তনয়া এই সীতা তোমার সহধর্ম্মিণী হউক। তুমি তোমার পাণি দ্বারা ইহার পাণি গ্রহণ কর। এই মহাভাগ্যবতী সীতা অতিশয় পতিব্রতা হইবেন, এবং ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা তোমার অনুগতা থাকিবেন।

কন্যাদাতা জনক এই বলিয়া রামের হস্তে মন্ত্রপূত জল নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর বর কন্যার হস্তধারণ করিয়া তিনবার অগ্নিপ্রদক্ষিণ করিয়া বেদী, রাজা জনক ও ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে বৈবাহিক কার্য্য সমাপ্ত করিলেন। (আদি; ৭৩) এবং পত্নী সহ নিজ শিবিরে গমন করিলেন। বিবাহে প্রচুর যৌতুকসামগ্রীও প্রদত্ত হইয়াছিল।

হুইলার জনক রাজাকে স্বয়ং মন্ত্র পাঠ করিতে দেখিয়া একটি নূতন ঐতিহাসিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছেন। হুইলার লিখিয়াছেন,—'ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই বিবাহে ব্রাহ্মণের প্রায় কোনও কার্য্যই করিবার প্রয়োজন হইল না।' It will be noticed that the Brahmans play little or no part in the ceremony.—Ramayana. Page 59. হুইলারের এইরূপ অদ্ভুত মন্তব্যে উপনীত হইবার কারণ,—তিনি কৃতনিশ্চয় যে, বাল্মীকি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময়—অর্থাৎ বৌদ্ধ-বিপ্লবের পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত হইয়া রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, এবং রামায়ণ রচিত হইবার সময়ও ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব সমাজে সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রামায়ণ-রচনার কাল সম্বন্ধে হুইলার লিখিয়াছেন,— 'Valmiki, the author of the Ramayana, appears to have flourished in the age of Brahmanical revival, and the main object of his poem is to blacken the Character of the Buddhist and to represent Rama an incarnation of Vishnu.' —Introduction of Ramayana. হুইলারের এই উভয় উক্তিই ভিত্তিহীন। আমরা 'রামায়ণের সমাজ' প্রবন্ধে দেখাইয়া আসিয়াছি যে, চাতুর্ব্বর্ণ্যসম্মত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণের পূর্ণ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে রামায়ণ লিখিত হইয়াছিল; বৌদ্ধবিপ্লবের পর ব্রাহ্মণ্য-প্রতিষ্ঠার সময় নহে।

রামের বিবাহে ব্রাহ্মণের কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া হুইলার লিখিয়াছেন,—

"Vasistha indeed is introduced as reciting the ancestry of Rama and even as preparing the alter and performing the homa; but it is Janaka, the father of the bride who performs the actual ceremonies of marriage and this circumstance is alone sufficient to indicate that the original tradition refers to the period when the authority of the Brahmans were by no means so established as they were in later years.'

জনক আত্মমুখে স্বীয় পিতৃপুরুষের নামকীর্ত্তন ও বিবাহে স্বয়ং মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন,

বর-কন্যার অভ্যর্থনা।

বিবাহের পর দিন রাজা দশরথ পুত্র, পুত্রবধূ ও যৌতুকসামগ্রী লইয়া মিথিলা হইতে প্রস্থান করিলেন। অযোধ্যায় বর কন্যার অভ্যর্থনা-উৎসবের আয়োজন হইল। মহাসমারোহে নাগরিকগণ অযোধ্যার রাজপথগুলিকে জলসেকে ধূলিশূন্য ও পুষ্প ও ধ্বজাপটে সুসজ্জিত করিল। বর কন্যা রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। চারি দিকে তূর্য্যধ্বনি হইতে লাগিল। পুর-বাসীরা মাঙ্গল্য দ্রব্য হস্তে লইয়া বর কন্যাকে গ্রহণ করিলেন। (আদি—৭৭)

কেবল বর কন্যারই এইরূপ রাজকীয় অভ্যর্থনা হইত না। সম্মানিত অতিথি ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের জন্যও এইরূপ অনুষ্ঠান হইত। রাজজামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের অভ্যর্থনা উপলক্ষেও অযোধ্যা এইরূপ পুষ্পপতাকায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। অভ্যর্থনা উপলক্ষে এইরূপ নগর-সজ্জা পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল নহে।

বধূ-বরণ।

বর-বধূর অভ্যর্থনার পর স্ত্রী-আচার। স্ত্রী-আচার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ রামায়ণে পাওয়া যায় না। রামায়ণে বধূ-বরণের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কৌশল্যা,

---

নাই। হুইলার যে অধ্যায়ের আলোচনায় এইরূপ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই অধ্যায়েই জনক ব্রাহ্মণদিগকে বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে অনুরোধ করিতেছেন। জনক ঋষিপ্রবর বশিষ্ঠকে বলিতেছেন :—

কারয়স্ব ঋষে সর্ব্বামৃষিভিঃ সহ ধার্ম্মিক ॥
রামস্য লোকরামস্য ক্রিয়াং বৈবাহিকীং প্রভো। —৭৩সর্গ ; ১৮, ১৯।

ধার্ম্মিক মহর্ষে! আপনি ঋষিগণের সহিত লোকাভিরাম রামের বৈবাহিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করুন।

জনকের প্রার্থনায় বশিষ্ঠ জনকের কুলপুরোহিত শতানন্দের ও রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলে পর জনক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রপূত জল রামের হস্তে নিক্ষেপ করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাতে ব্রাহ্মণকে অগ্রাহ্য করা হইল কিসে? যিনি কন্যাদাতা রূপে উপস্থিত, তিনিই সম্প্রদান করিবেন, ইহাতে ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশ ও যজ্ঞের মন্ত্রপূত জল ব্যতীত অন্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না। এ স্থলে তাহাই হইয়াছে। নিজ মুখে পিতৃপুরুষের নামকীর্ত্তনেও ব্রাহ্মণের অপ্রাধান্য প্রদর্শিত হয় নাই। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ও রামায়ণের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। হুইলার বর্ত্তমানকালে ব্রাহ্মণকে মন্ত্র পড়াইতে দেখিয়া সেই আদর্শে প্রাচীন যুগের বিচার করিয়াছেন।

হুইলার রামায়ণ ও মহাভারতের আলোচনা প্রসঙ্গে এইরূপ অনেক অদ্ভুত বিতর্কের সৃষ্টি

কৈকেয়ী, সুমিত্রা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ বধূগণকে মঙ্গল আলাপন পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ করিলেন। অতঃপর তাঁহারা নববধূদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া দিয়া নমস্যদিগকে নমস্কার ও দেবালয়সমূহে পূজা করাইলেন। (আদি ; ৭৭।) এইরূপে বৈবাহিক উৎসব শেষ হইল।

অভিষেক-সংযম।

রামায়ণে আর্য্য ও অনার্য্য উভয় সমাজের অভিষেকের বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। আর্য্যসমাজে অভিষেকের পূর্ব্বে সংযমব্রত-পালনের ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। অভিষেকের পূর্ব্ব দিন রাম সংযমব্রত পালন করিলেন ;—স্নান করিয়া নিয়ত-মানস হইয়া পত্নীর সহিত নারায়ণের উপাসনা করিলেন। অনন্তর বিধি অনুসারে মস্তকে ঘৃতপাত্র গ্রহণ করিয়া (১) নারায়ণের উদ্দেশে প্রজ্বলিত অগ্নিতে সেই ঘৃত কতক হবন করিলেন, এবং অবশিষ্ট স্ত্রীর সহিত ভক্ষণ করিয়া নিয়তমানস ও বাক্‌যত হইয়া কুশশয্যায় রাত্রিযাপন করিলেন। (অযো—৬ সর্গ।)

অভিষেকের উপকরণ ও কার্য্যপ্রণালী।

বিবাহের ন্যায় অভিষেকের উপকরণ ও ক্রিয়াপ্রণালীও লক্ষ্য করিবার বিষয়। অভিষেকের নিমিত্ত যজ্ঞস্থলে গঙ্গাজল ও সাগরজলে পূর্ণ কাঞ্চনঘট, উড়ুম্বরকাষ্ঠনির্ম্মিত উত্তম পীঠ, যবশর্ষপাদি বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, লাজ, পুষ্প, কুশ, মদমত্ত হস্তী, অশ্বচতুষ্টয়যোজিত রথ, খড়্গ, ধনু, শিবিকা, ছত্র, শ্বেত চামর, সুবর্ণভৃঙ্গার, পাণ্ডুরবর্ণ বৃষ, চতুর্দ্দন্ত সিংহ, অশ্ব, সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সমিধ, অগ্নি, এই সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত আটটি সুন্দরী কন্যা, কয়েকটি অলঙ্কৃতা সধবা স্ত্রী, ও নৃত্যগীতনিপুণা বরাঙ্গনা আনীত হইয়াছিল। (২) (অযোধ্যা ; ১৪ সর্গ।)

---

(১) মূলে আছে,—প্রগৃহ্য শিরসা পাত্রীং হবিষো বিধিবত্ততঃ।
মহতে দৈবতায়াজ্যং জুহাব জ্বলিতানলে ॥—অযোধ্যা ; ৬সর্গ ; ২।

হুইলার ইহার অনুবাদ করিয়াছেন,—

Placing on his head the vessel containing the purefying liquids &c. এই purefyiug liquids কি ? হুইলারই Foot-note এ প্রায়ই লিখিয়াছেন—"The purefying liquids are the fine products of the sacred cow Viz. Milk, curds, butter, urine and ordure.,' ইহা ব্যবস্থা-শাস্ত্রোক্ত 'পঞ্চগব্য'। হুইলার এই পঞ্চগব্যকে অনুবাদে স্থান দিয়াছেন কোন রামায়ণের বলে, বুঝিতে পারিলাম না।

(২) কিন্তু [illegible] সেই প্রাথমিক অনুষ্ঠানে অভিষেক-ক্রিয়ার পরিবর্তে [illegible]

যথাসময়ে রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণ রামকে সীতার সহিত রত্নময় পীঠে উপবেশন করাইয়া সাগরজলে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর বশিষ্ঠের অনুমতিক্রমে, ঋত্বিক, ব্রাহ্মণ, কন্যা, মন্ত্রী, বণিক ও পৌরগণ তাঁহাকে সর্ব্বৌষধিরসে অভিষিক্ত করিলে, বশিষ্ঠ তাঁহাকে রত্ন-সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া সূর্য্যবংশের কুলাগত রাজমুকুট তাঁহার শিরোদেশে প্রদান করিলেন। রাজভ্রাতা শত্রুঘ্ন মস্তকোপরি পাণ্ডুবর্ণ ছত্রধারণ করিলেন। মিত্ররাজদ্বয়—সুগ্রীব ও বিভীষণ শুভ্র চামর বীজন করিতে লাগিলেন। (লঙ্কা; ১৩০ সর্গ।)

রামায়ণোক্ত অনার্য্যসমাজেও এইরূপ অভিষেকের ব্যবস্থা ছিল। বালির মৃত্যুর পর বানরগণ এইরূপ পদ্ধতি অনুসারে সুগ্রীবকে রাজ্যে ও অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। (কিষ্কিন্ধ্যা; ২৬ সর্গ)। বিভীষণের অভিষেকের উল্লেখও এই স্থানে করা যাইতে পারে।

প্রাচীন ভারতের এই নিয়ম এখন পাশ্চাত্য দেশসমূহেও অনুষ্ঠিত হইতেছে। কুলপুরোহিত বশিষ্ঠের পদানুসরণ করিয়া এখন ইউরোপের প্রধান ধর্ম্মযাজকগণ অভিষেকসময়ে রাজাদিগের মস্তকে রাজমুকুট স্থাপন করিতেছেন।

অভিষেক উৎসব।

অভিষেকের আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া, উৎসব ও আমোদ প্রমোদ। অযোধ্যার সেই রাজ্যাভিষেকক্রিয়া কেবল কতকগুলি মুনি ঋষির শাস্ত্রীয় কোলাহলেই পরিসমাপ্ত হয় নাই। ইহাতে দেশবিদেশাগত রাজন্যগণেরও মহামিলন হইয়াছিল। চারি দিক হইতে অধীন ও মিত্ররাজগণ বহু উপঢৌকন লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিয়াছিলেন। অযোধ্যার রাজসভায় বিরাট দরবারের আয়োজন হইয়াছিল। এই অভিষেক উপলক্ষে রাজধানী অযোধ্যা কিরূপ ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল, পাঠক তাহা মহাকবির ভাষায় পাঠ করুন।

"সিতাভ্রশিখরাভেষু দেবতায়তনেষু চ।
চতুষ্পথেষু রথ্যাসু চৈত্যেষ্বট্টালকেষু চ॥১১

এই সকল উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছিল। রামায়ণে পরবর্ত্তী অভিষেকের বর্ণনা এরূপ

নানাপণ্যসমৃদ্ধেষু বণিজামাপণেষু চ।
কুটুম্বিনাং সমৃদ্ধেষু শ্রীমৎসু ভবনেষু চ ॥১২
সভাসু চৈব সর্ব্বাসু বৃক্ষেম্বালক্ষিতেষু চ।
ধ্বজাঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ সাধুপতাকাশ্চাভবংস্তথা ॥১৩
নটনর্ত্তকসঙ্ঘানাং গায়কানাঞ্চ গায়তাম্।

*   *   *

কৃতপুষ্পোপহারশ্চ ধূপগন্ধাধিবাসিতঃ।
রাজমার্গঃ কৃতঃ শ্রীমান্ পৌরৈরামাভিষেচনে ॥১৭
প্রকাশীকরণার্থঞ্চ নিশাগমনশঙ্কয়া।
দীপবৃক্ষাংস্তথা চক্রুরনুরথ্যাসু সর্ব্বশঃ ॥১৮
অলংকারং পুরস্যৈবং কৃত্বা তৎপুরবাসিনঃ।
আকাঙ্ক্ষমাণা রামস্য যৌবরাজ্যাভিষেচনম্ ॥১৯
সমেত্য সঙ্ঘশঃ সর্ব্বে চত্বরেষু সভাসু চ।
কথয়ন্তো মিথস্তত্র প্রশশংসুর্জনাধিপম্ ॥২০—৬ষ্ঠ সর্গ।

অযোধ্যার হিমাদ্রিশৃঙ্গোপম দেবালয়, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্যবৃক্ষ, অট্টালিকা, সভা, অত্যুচ্চ বৃক্ষ, নানাবিধপণ্যপরিপূর্ণ আপণ ও সমস্ত গৃহ-সমূহে ধ্বজা ও পতাকা সকল উত্থিত হইল। চতুর্দ্দিক নট, নর্ত্তক ও গায়কগণের কর্ণপ্রীতিকর মনোহর ধ্বনিতে মুখরিত হইতে লাগিল। পুরবাসিগণ রাজপথ ও তোরণসমূহ পুষ্পগুচ্ছে পরিশোভিত ও চন্দন ও ধূপগন্ধে আমোদিত হইল। রজনীতে সমস্ত নগরী আলোকমালায় উদ্ভাসিত রাখিবার জন্য রাজপথ সমুদয়ের দুই পার্শ্বে দীপ-বৃক্ষ প্রোথিত করিল। এইরূপে অযোধ্যা নগরীকে সম্যক প্রকারে সুশোভিত করিয়া পৌরগণ দলে দলে সভাপ্রাঙ্গণে মিলিত হইতে লাগিল।

যাঁহারা রাজরাজেশ্বরের অভিষেক উপলক্ষে পুষ্পতোরণশোভিতা, আলোকসমুজ্জ্বলা রাজধানী কলিকাতার বিচিত্র শোভা দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই সভ্যতা-প্রদীপ্ত আধুনিক সজ্জার সহিত সেই প্রাচীন ভারতের রাজধানী অযোধ্যার এই সাজ-সজ্জার তুলনা করুন।

এইবার আমরা মৃতদেহ-সৎকার ও তৎসংসৃষ্ট ক্রিয়াকাণ্ডের আলোচনা করিব।

ক্রমশঃ।

সহযোগী সাহিত্য।

প্রাচীন ভারতে কৃষীবলের সম্মান।

অগষ্ট মাসের 'মডারণ্ রিভিউ' নামক মাসিকপত্রে শ্রীযুত দ্বিজদাস দত্ত 'ভারতীয় কৃষকের প্রাচীন সম্মান' শীর্ষক একটি অতি সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধে লেখকের তত্ত্বানুসন্ধিৎসা ও গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। হলকর্ষণ প্রভৃতি বৃত্তি অবলম্বনে যাঁহারা মানব জাতির খাদ্য উৎপন্ন ও পশুপালনে যাঁহারা সমাজের উন্নতিবিধান করেন, ন্যায়ের দৃষ্টিতে তাঁহারাই সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এখন সমগ্র সভ্যজগতে কৃষীবল ও পশুপাল সমধিক সম্মানিত। শ্রীযুত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন, ১৮৮৮ অব্দে ইংলণ্ডের নিউপোর্ট কৃষি-প্রদর্শনীতে তদানীন্তন যুবরাজ ও বর্ত্তমান সম্রাট যে সমস্ত পশু প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্বপ্রধান পারিতোষিক পাইয়াছিল। এই স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক, য়ুরোপে পশুপালনও কৃষিরই অন্তর্ভূত। আমাদের দেশে যাহা বৈশ্যবৃত্তি ('কৃষিঃ পশুপালং, বাণিজ্যঞ্চ') বলিয়া বিবেচিত, এক বাণিজ্য ভিন্ন তাহার সমস্তই প্রায় কৃষির অন্তর্গত। সুতরাং সম্রাটের এই পশুপালন কার্য্য কৃষিকার্য্য বলিয়াই পরিগণিত। দ্বিজ বাবু লিখিয়াছেন, আমাদের দেশে 'গিরস্তি' ও 'গিরস্ত' বলিলে এখনও চাষী ও কৃষিজীবী বুঝায়। দ্বিজ বাবুর এ কথার আমরা সর্ব্বথা অনুমোদন করিতে পারিলাম না। স্থানবিশেষে 'গিরস্ত' কথা চাষা অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর ঐ কথায় দ্বিতীয়াশ্রমী বহুপরিবার-প্রতিপালককেই বুঝাইয়া থাকে। পল্লীগ্রামে 'অমুক খুব গেরস্ত' বলিলে, নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির অনেক চাষ ও খামার আছে, ইহা বুঝায় না;—তাহার সংসারে বহু পরিবার, এবং তাহার অবস্থা ভাল, ইহাই বুঝায়। কোনও অকৃতদার প্রতিপাল্যজনহীন ব্যক্তির ক্ষেত খামার ও চাষ অনেক থাকিলেও, তাহাকে 'গিরস্ত' বলা হয় না। তবে কোনও কোনও অঞ্চলে পল্লীগ্রামে এই শব্দের ব্যঞ্জনা-শক্তি 'ক্ষেত খামার' পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া পড়িয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য। ইহার পর গার্হস্থ্য আশ্রম বা কৃষি-জীবনের প্রাধান্য সপ্রমাণ করিবার জন্য দ্বিজ বাবু 'বশিষ্ঠ-সংহিতা' হইতে নিম্নলিখিত বচন কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

'যথা নদীনদাঃ সর্ব্বে সমুদ্রে যান্তি সংস্থিতিম্।
এবমাশ্রমিণঃ সর্ব্বে গৃহস্থে যান্তি সংস্থিতিম॥
যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ।
এবং গৃহস্থমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি ভিক্ষুকাঃ॥

সমস্ত নদ নদী যেমন সমুদ্রে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সমস্ত আশ্রমই গৃহস্থের নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সকল প্রাণী যেমন জননীকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে, সেইরূপ ভিক্ষোপজীবী সমস্ত আশ্রমই গৃহস্থকে আশ্রয় করিয়া জীবিত থাকে।

দ্বিজ বাবুর উদ্ধৃত বশিষ্ঠ-সংহিতার এই বচনে গৃহস্থাশ্রমের শ্রেষ্ঠত্বই সূচিত হইতেছে,

সর্ব্বভূতকে অন্নদান, যজ্ঞ ও তপস্যা গৃহস্থের অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং দ্বিজ বাবু যে উদ্দেশ্যে এই শ্লোক দুইটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

দ্বিজ বাবু লিখিয়াছেন,—সংস্কৃত ভাষায় কৃষি সম্বন্ধে কোনও পুস্তক নাই বটে, কিন্তু প্রাচীন ভারতে কৃষিবিজ্ঞান শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত ও অধীত হইত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কৃষি সম্বন্ধে সংস্কৃত অনেক গ্রন্থ লুপ্ত হইয়াছে, এ কথা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু বর্ত্তমানে সংস্কৃত ভাষায় কৃষি-বিষয়ক একখানি পুস্তকও নাই, এ কথা বলিলে সত্যের অপলাপ হয়। কৃষি-পরাশর নামে যে গ্রন্থখানি অদ্যাপি প্রচলিত আছে, তাহা অতি প্রাচীন। ইহা ভিন্ন অন্যান্য অনেক গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে কৃষি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিত আছে, দেখা যায়। দ্বিজ বাবু বলিয়াছেন, 'খনার বচন' নামে যে সমস্ত জনপ্রিয় প্রবচন চলিত আছে, তাহা লুপ্ত কৃষিবিজ্ঞান হইতেই সংগৃহীত। কৃষি, বাণিজ্য, কুসীদ ও পশুপালন বৈশ্যেরই কর্ত্তব্য। বৈশ্যগণ দ্বিজাতির মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং যাহা বৈশ্যের বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রাচীন ভারতে কখনও হীন বৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত না। এই প্রবন্ধে দ্বিজ বাবু প্রচলিত জাতিভেদ ও বর্ণভেদ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়াছেন; বাহুল্যভয়ে এ স্থলে আমরা তাহার আলোচনা করিলাম না।

প্রাচীন ভারতে বৈশ্যদিগের রাজনীতিক ও সামাজিক মর্য্যাদা কিরূপ ছিল, দ্বিজ বাবু তাহার সম্যক আলোচনা করিয়াছেন। রামায়ণ ও মহাভারতে দেখা যায়, সম্রাট্গণ বিশাম্পতি নামে অভিহিত হইতেন। দ্বিজ বাবু বলিতেছেন,—বিশ্ শব্দের অর্থ বৈশ্য, বণিক জাতি; বিশাম্পতি শব্দের অর্থ বৈশ্যদিগের রক্ষক। বলা বাহুল্য, বিশ্ শব্দে যেমন বণিক জাতিকে বুঝায়, সেইরূপ উহার দ্বারা সাধারণ মনুষ্যকেও বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং বিশাম্পতি শব্দের অর্থে কেবল বৈশ্যদিগের পতি বুঝায়, কিংবা নরনাথ বুঝায়, এখন তাহাই বিবেচ্য। তবে প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অপেক্ষা বৈশ্যজাতি ধন-ধান্যে শ্রেষ্ঠ ছিল, এ কথা অবিসংবাদিত। সুতরাং দস্যু তস্করের হস্ত হইতে বৈশ্যদিগকে রক্ষা করাই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। ধন-ধান্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া দানই বৈশ্যদিগের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথা মহাভারতে,—

> বজ্রপাণিঃ ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ক্ষত্রং বজ্ররথং স্মৃতম্।
> বৈশ্যা বৈ দানবজ্রাশ্চ কর্ম্মবজ্রা যবীয়সঃ॥

ব্রাহ্মণ বজ্রপাণি; কারণ, ব্রাহ্মণ হস্ত দ্বারা দেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় বজ্ররথ; কেন না, রথে চড়িয়াই ক্ষত্রিয় শত্রুজয় করিয়া থাকেন। বৈশ্য দানবজ্র; কেন না, দান দ্বারাই বৈশ্য জগতের দরিদ্রের দারিদ্র্যমোচনে সমর্থ। আর শূদ্র কর্ম্মবজ্র; কেন না, কর্ম্মের দ্বারাই শূদ্র জগতের হিতসাধন করিয়া থাকে। দ্বিজ বাবু বলিয়াছেন,—প্রাচীন হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ মেষপালকস্থানীয়, ক্ষত্রিয় মেষপালকের কুক্কুরস্বরূপ, এবং বৈশ্য মেষস্থানীয় ছিল।

বৈশ্যদিগের রক্ষাই যে পূর্ব্বতন নরপতিগণের প্রধান কার্য্য, দ্বিজ বাবু মহাভারতের সভা

কচ্চিন্ন চৌরৈর্লুব্ধৈঃ কুমারৈঃ স্ত্রীবলেন বা।
ত্বয়া বা পীড়্যতে রাষ্ট্রং কচ্চিৎ তুষ্টাঃ কৃষীবলাঃ॥
কচ্চিদ্রাষ্ট্রে তটাকানি পূর্ণানি চ বৃহন্তি চ।
ভাগশো বিনিবিষ্টানি ন কৃষির্দেবমাতৃকা॥
কচ্চিন্ন ভক্তং বীজঞ্চ কর্ষকস্যাবসীদতি॥—সভাপর্ব্ব; ৩৫ অধ্যায়।

নারদ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—তোমার প্রজাগণ চৌর কর্ত্তৃক, লুব্ধ ব্যক্তি কর্ত্তৃক, রাজন্যবর্গ কর্ত্তৃক, স্ত্রীজাতি কর্ত্তৃক, এবং তোমা কর্ত্তৃক পীড়িত হইতেছে না ত? তোমার রাজ্যের কৃষীবল সন্তুষ্ট আছে ত? তোমার রাজ্যের যথাস্থানে নিবিষ্ট বৃহৎ তড়াগাদি জলে পূর্ণ রহিয়াছে ত? তোমার রাজ্যে কৃষি কেবল পর্জ্জন্যের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া নাই ত? কৃষকদিগের আহার্য্য ও বীজের জন্য প্রচুরপরিমাণে শস্য সঞ্চিত আছে ত?

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে রাম-ভরত-সংবাদে রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

সুকৃষ্ট-সীমা-পশুমান্ হিংসাভিরভিবর্জ্জিতঃ।
অদেবমাতৃকো রম্যঃ শ্বাপদৈঃ পরিবর্জ্জিতঃ॥
পরিত্যক্তো ভয়ৈঃ সর্ব্বৈঃ খনিভিশ্চোপশোভিতঃ।
বিবর্জ্জিতো নরৈঃ পাপৈঃ মম পূর্ব্বৈঃ সুরক্ষিতঃ॥
কচ্চিজ্জনপদঃ স্ফীতঃ সুখং বসতি রাঘব।
কচ্চিত্তে দয়িতাঃ সর্ব্বে কৃষিগোরক্ষজীবিনঃ॥

হে ভরত, আমাদের পূর্ব্বপুরুষের শাসিত রাজ্যের সুদূর সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ সুকর্ষিত হইতেছে ত? উহা পশুপালে পূর্ণ আছে ত? লোকে হিংসা-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে ত? লোকে দেবতা বা বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া নাই ত? সমস্ত দেশ শ্বাপদশূন্য ও রম্য হইয়া আছে ত? দেশের সকলে নির্ভয় ও খনি দ্বারা পরিশোভিত রহিয়াছে ত? লোক পাপপরিবর্জ্জিত হইয়াছে ত? লোকে সুখ সমৃদ্ধিতে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে ত? দেশের কৃষিজীবী ও পশুপালগণ সকলে তোমার উপর সন্তুষ্ট আছে ত?

ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে বৈশ্যদিগের রক্ষাই রাজার প্রধান কার্য্য ছিল, এবং বৈশ্য জাতি রাজার শ্রেষ্ঠ প্রজা বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রসঙ্গতঃ এখানে এ কথা বলা আবশ্যক যে, অতি প্রাচীন কালেও ভারতীয় কৃষীবলকে কেবল পর্জ্জন্যের কৃপালাভের জন্য হতাশপ্রাণে আকাশ পানে চাহিয়া থাকিতে হইত না; রাজ্যের স্থানে স্থানে রাজা বিস্তীর্ণ তড়াগাদি খনিত করিয়া তাহা জলপূর্ণ রাখিবার ব্যবস্থা করিতেন। পর্জ্জন্যের কৃপা না হইলে প্রজাগণ সেই তড়াগ হইতে ক্ষেত্রে জলসেচন করিত।

কৃষি যে কেবল বৈশ্যেরই বৃত্তি ছিল, তাহা নহে; আবশ্যক হইলে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণও কৃষির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। পরাশর-সংহিতায় ক্ষত্রিয়ের কৃষিসেবার বিধান আছে। 'ক্ষত্রোঽপি কৃষিং কৃত্বা দ্বিজান দেবাংশ্চ পূজয়েৎ।' ক্ষত্রিয় কৃষিকর্ম্মের দ্বারা দেবগণের ও দ্বিজগণের পূজা করিবে। দ্বিজ বাবু দেখাইয়াছেন যে জনক রাজা স্বহস্তে হলকর্ষণ

ছিলাম, এমন সময় এই কন্যা ফলা-লাঙ্গলের মুখে ভূমি হইতে উত্থিত হইয়াছিল, সেই জন্য আমি ইহার নাম সীতা রাখিয়াছি। বিদেহ রাজ্যের সম্রাট রাজর্ষি জনক স্বহস্তে হলকর্ষণ করিতেন, আর আজ কাল আমাদের দেশের সাধারণ লোকও হলকর্ষণ নীচকার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে! ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? ব্রাহ্মণের পক্ষে হলকর্ষণ নিষিদ্ধ বটে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের পক্ষেও হলকর্ষণের ব্যবস্থা আছে। যথা, পরাশর-সংহিতা—

স্বয়ং কৃষ্টে তথা ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জ্জিতৈঃ।
নির্ব্বপেৎ পঞ্চ যজ্ঞানি ক্রতুদীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ॥

ব্রাহ্মণ স্বয়ং চাষ করিয়া স্বয়ং ধান্য উৎপাদন করিয়া পঞ্চযজ্ঞ করিবেন। ব্রহ্মচারী অবস্থায় ব্রাহ্মণ যখন গুরুগৃহে বাস করিতেন, তখন তাঁহাকে কৃষিকার্য্য শিখিতে হইত। মহাভারতে লিখিত আছে,—ধৌম্যের আরুণি নামক এক শিষ্য ছিল। একদা ধৌম্যের ক্ষেত্রের আলি ভাঙ্গিয়া জল বহির্গত হইতেছিল। ধৌম্য জল-নিকাশের পথ রুদ্ধ করিবার জন্য আরুণিকে তথায় পাঠাইয়া দেন। আরুণি কোনও রূপেই জলের গতিরোধ করিতে পারিল না। অগত্যা সে কেদারখণ্ডের ভগ্ন স্থানে শয়ন করিয়া জলনির্গমনের পথ রুদ্ধ করিল। উপমন্যু নামে ধৌম্যের আর এক জন শিষ্য ছিল। ধৌম্য তাহার উপর গোরক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ যখন শুক্রাচার্য্যের নিকট অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহাকেও গোচারণ করিতে হইত। যে কৃষ্ণ ও বলরাম নারায়ণের ও অনন্তদেবের অবতার বলিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছেন, সেই কৃষ্ণ গোকুলে গোচারণ করিতেন; সেই হলধর হলকর্ষণ করিতেন; ইহা সকলেই জানেন। যদি প্রাচীন ভারতে পশুপালন ও হলকর্ষণ নীচ কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহা হইলে নারায়ণের অবতার ও অনন্তদেবের অবতার সেই কার্য্য করিতেন না।

কৃষির ন্যায় পশুপালনও ভারতে পবিত্র কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। আপস্তম্ব-সংহিতায় পশুপালন ও গোদোহন কার্য্যের অতি সুন্দর ব্যবস্থা আছে। আপস্তম্ব-সংহিতার ২১ শ্লোকে লিখিত আছে,—

দ্বৌ মাসৌ পায়য়েদ্বৎসং দ্বৌ মাসৌ দ্বৌ স্তনৌ দুহেৎ।
দ্বৌ মাসাবেকবেলায়াং শেষকালে যথারুচি॥

গাভী প্রসব করিলে পর প্রথম দুই মাসের গাভীর দুগ্ধ বৎসকেই পান করিতে দিবে। পরে দুই মাস ঐ গাভীর দুইটিমাত্র স্তন দোহন করিবে। দুই মাস এক বেলা দোহন করিবে। পরে যথারুচি দোহন করিবে। দ্বিজবাবু লিখিয়াছেন,—ইহাতে পূর্ব্বে গাভী সমস্ত হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইত, এখনকার মত তখন গোবৎসগণ অকালে ভবের খেলা সাঙ্গ করিত না। এ দেশের প্রাচীন গো-পালন-নীতির সহিত পাশ্চাত্য গোপালননীতির তুলনা করিয়া দ্বিজ বাবু দেখাইয়াছেন যে, পাশ্চাত্য গো-পালন-পদ্ধতি অপেক্ষা প্রাচীন কালের ভারতীয় গোপালন-পদ্ধতি অনেক উৎকৃষ্ট। ইউরোপ ও আমেরিকায় ভবিষ্যতে দুগ্ধ-প্রদানের জন্য যে

গাভীর দুগ্ধ দোহন করা হয়, তাহাদিগের বাছুরকে কশাইখানায় বিক্রয় করা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীন ভারতে গোপালনের যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা ইউরোপীয় ব্যবস্থা অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। ইহার দ্বারা প্রত্যেক গাভী অত্যন্ত বলশালিনী ও পয়স্বিনী হইয়া উঠিত।

দ্বিজ বাবু বলিয়াছেন,—অধিক দিনের কথা নয়, পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বেও এ দেশের ভদ্রলোকগণ চাষে মন দিতেন। তাঁহাদের গোলা-ভরা ধান ছিল; পুকুর-ভরা মাছ ছিল; গোয়াল-ভরা গরু ছিল। শাক শব্জী কিছুরই জন্য তাঁহাদিগকে ভাবিতে হইত না। তখনকার গোধন খোলা ময়দানে স্বচ্ছন্দে চরিয়া হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইত। এখনকার গোধন অবরুদ্ধ স্থানে রক্ষিত হইয়া জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। এখন আমরা চাকুরী করিতে শিখিয়াছি; শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি; কৃষিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছি; তাই আজ আমাদের দুঃখ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কৃষিকে উন্নত ও দ্বিজাতির যোগ্য কার্য্য বলিয়া সম্মানিত করিতেন, কিন্তু চাকুরীকে শ্ববৃত্তি ও শূদ্রের কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিতেন। আজ কাল অনেকে দ্বিজাতি হইবার আশায় শাস্ত্র হইতে নানা বচন ও প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিতেছেন; কিন্তু তাঁহারা শ্ববৃত্তি, শূদ্রবৃত্তি, সেবাবৃত্তি অর্থাৎ চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া দ্বিজাতির যোগ্য কার্য্য কৃষি বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেছেন না, ইহা কি বাস্তবিক হাস্যাস্পদ নহে? আপৎকাল উপস্থিত হইলে দ্বিজাতি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যে কোনও কার্য্য করিতে পারেন, কিন্তু 'ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন।' সেবাবৃত্তির দ্বারা কখনও উদরপূরণ করিতে পারেন না। যাঁহারা দ্বিজাতি বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন, বা দ্বিজাতির পর্য্যায়ে উন্নীত হইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা যেন মনে রাখেন, কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্—কর্ম্ম অনুসারেই বর্ণবিভাগ। উচ্চবর্ণলাভের প্রয়াস করিলে উচ্চবর্ণের কার্য্য করিতে হয়।

মালবে মহারাষ্ট্র-অধিকার।

মালবদেশ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের লীলা-ভূমি। সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের পুণ্য-তীর্থক্ষেত্র মালবের প্রাচীন রাজধানী উজ্জয়িনীর নামের সহিত আমাদের সংস্কৃত কাব্যকুঞ্জের কত পুরাতন, কত মোহময়ী স্মৃতি অখণ্ডনীয়-রূপে বিজড়িত রহিয়াছে। মালবের নামোল্লেখ করিলে কবিকুলগুরু কালিদাসের সাকূত-মধুর-কোমল, বিলাসিনী-কণ্ঠ-কূজিত-প্রায় কবিতাবলী কাহার না স্মৃতিপথে উদিত হয়? এই প্রদেশের অন্তর্গত ধারানগরীর অধিপতি ভোজরাজের কীর্ত্তিও কি সংস্কৃত সাহিত্য হইতে কখনও বিলুপ্ত হইবে? বিগত সহস্র বর্ষের মধ্যে মালবের কত পরিবর্ত্তনই না সাধিত হইয়াছে। কিন্তু বিক্রমাদিত্য ও ভোজরাজের নাম

সাহিত্যসেবী সমাজে যে উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল, অদ্যাপি তাহা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় নাই। ভোজবিক্রমের ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সুরম্য রাজধানী, তাঁহাদিগের রণদুর্ম্মদ সামন্ত-চক্র, আকুমারীপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত-সভা, ভাগীরথীর জলপ্রবাহের ন্যায় অজস্র দান, নিত্যোৎসবমগ্ন প্রকৃতিপুঞ্জের সদানন্দময় কলহাস্য, যুবকবৃন্দের অদম্য উৎসাহ, রমণীগণের কবিজন-চিত্তহারী মনোজ্ঞ রমণীয়তা, বন্দিজনের বৈতালিক সঙ্গীত প্রভৃতি সে কালের যাবতীয় গৌরব-সম্পদ সিপ্রার জলে ধৌত হইয়া গিয়াছে! (১) কিন্তু তাহাদের স্মৃতি ভারতবাসীর চিত্ত অদ্যাপি মোহ-মদিরায় অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে।

ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয়কালে মালবেরও অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল—খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে তথায় বিধর্ম্মী মুসলমানদিগের শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মালবের অতি প্রাচীন রাজধানী উজ্জয়িনী—পরবর্ত্তী কালের রাজধানী ধারানগরী। মুসলমানেরা 'মান্দু' নগরে নূতন রাজধানী স্থাপিত করিয়া উহা প্রকাণ্ড প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করাইয়াছিলেন। এই প্রাচীর-বেষ্টনের পরিধি ৩৭ মাইল! মহারাষ্ট্রীয়েরা মুসলমানদিগের হস্ত হইতে মালবের উদ্ধারসাধন করিয়া প্রাচীন ধারানগরীর শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মান্দু অতি প্রকাণ্ড ও সমৃদ্ধিশালী নগর হইলেও মহারাষ্ট্র নায়কগণের অনুরাগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও ভোজরাজ যে প্রমার-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, নিয়তির অপূর্ব্ব বিধানে সেই প্রমার (পওয়ার) বংশে সমুদ্ভূত উদয়জী, পেশওয়ে বাজী রাও কর্ত্তৃক মালব-বিজয়-কার্য্যে সর্ব্বপ্রথম নিয়োজিত হন। ইংরাজ-লেখকেরা উদয়জীর চরিত্রে নির্ম্মম দস্যু-প্রকৃতির আরোপ করিতে পারেন, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, হিন্দুগণের গৌরব-স্থল প্রাচীন ধারানগরী মালবের যে অংশে অবস্থিত ছিল, উদয়জী সর্ব্বপ্রথম সেই অংশই মুসলমানের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যত্নপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রাচীন গৌরবের পুনরুদ্ধার-চেষ্টার মূলে যে মহদ্ভাব বিদ্যমান ছিল, তাহার প্রকৃতি সহৃদয় হিন্দু ব্যতীত আরও কাহারও সহজে হৃদয়ঙ্গম

(১) বিক্রমাদিত্যের উজ্জয়িনী সিপ্রা-নদীর জলে ধৌত ও ভূগর্ভগত হইয়াছে। বর্ত্তমান

হইতে পারে না। উদয়জী প্রমারের বংশধরেরা অদ্যাপি ধারানগরীতে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ডে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছেন। (২)

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মালবে মহারাষ্ট্রীয়দিগের দৃষ্টি নিপতিত হয়। (৩) মহারাজ শিবাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সাম্ভাজী মোগলদিগের হস্তে নিষ্ঠুররূপে নিহত হওয়ায় মহারাষ্ট্রীয়গণের চিত্তে যে উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহারই ফলে এক দল মহারাষ্ট্রীয় মালব প্রদেশ আক্রমণ করিয়া তত্রত্য মোগল রাজপুরুষদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিবার চেষ্টা করেন। সে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগের শক্তি যেরূপ ক্ষীণ ছিল, তাহাতে সম্মুখসমরে মালবের সুভেদারের পরাজয়-সাধন-পূর্ব্বক তথায় মহারাষ্ট্রশাসন প্রবর্ত্তিত করা

---

(২) বর্ত্তমান ধার রাজ্যের পরিমাণ ১,৭৩৯ বর্গমাইল। লোক-সংখ্যা প্রায় ১,৪২,১১৫। রাজস্বের আয় প্রায় ৭,৬৫০০ টাকা। রাজাধিপতি ভোজের বংশলোপে মালবে কিছুদিন তুয়ার-বংশীয় ও তাহার পর দীর্ঘকাল চৌহানবংশীয় রাজপুতগণের শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। মালবে অদ্যাপি চৌহানদিগের যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। মালবের অধিবাসীদিগের মধ্যে ক্ষত্রিয়ের সংখ্যাই অধিক। রাজপুতানার ন্যায় মালবকেও ক্ষত্রিয়-প্রধান দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা সঙ্গত। চৌহানদিগের পর আনন্দ দেও নামক বৈশ্য-বংশীয় জনৈক পরাক্রান্ত ব্যক্তি ঐ প্রদেশের ঐ সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মুসলমান সৈন্য মালব আক্রমণ করে। হিন্দুগণ বহুদিন পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতের অপরাপর প্রদেশের হিন্দুগণের ন্যায় মালবের হিন্দুগণও সহজে স্বাধীনতায় জলাঞ্জলি দেন নাই; দীর্ঘকাল মুসলমান-শক্তিকে বিশিষ্টরূপ বাধা প্রদান করিয়াছিলেন। মহম্মদ তোঘলকের আমলে মালবে মুসলমান-শাসন বহুপরিমাণে বদ্ধমূল হয়। মধ্য-ভারতের ইতিহাস-লেখক মালকম বলেন,—One fact, however, appears clear, that the country (Malwa) was only partially subdued. We find Hindu princes and chiefs in almost every district, opposing the progress of the invaders, and often with such success as to establish dynasties of three or four generations who ruled over a considerable part of the country.

(৩) মহারাষ্ট্রদেশে এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্যের সহিত মহারাষ্ট্রদেশের তদানীন্তন রাজধানী প্রতিষ্ঠানের অধিপতি শালিবাহনের সহিত দীর্ঘ কাল-ব্যাপী যুদ্ধ চলিয়াছিল। পরিশেষে কোনও পক্ষেরই জয়ের সম্ভাবনা না ঘটায়, মতান্তরে শালি-বাহন জয়লাভ করায়, উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সেই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে অদ্যাপি নর্ম্মদার উত্তরে বিক্রমাদিত্যের ও দক্ষিণাপথে শালিবাহনের অব্দ প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। এই কিম্বদন্তী যত দূর সত্য হউক, মালবপতির সহিত যে মহারাষ্ট্রবাসীর যুদ্ধ প্রায় দুই সহস্র বৎসর

কিছুতেই তাঁহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং লুণ্ঠন-নীতির অবলম্বন-পূর্ব্বক আপনাদিগের সংহার-শক্তির পরিচয় দিয়া মালবের রাজ-পুরুষদিগকে বিপন্ন ও আতঙ্কগ্রস্ত করাই মহারাষ্ট্রীয়েরা তখন যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্থির করিলেন। পাশ্চাত্য ইতিহাসলেখকেরা ধর্ম্মনীতির দোহাই দিয়া মারাঠাগণের এই কার্য্যপ্রণালীর যতই নিন্দা করুন, সংহার-শক্তির পরিচয় না দিয়া জগতে কোনও জাতি কখনও রাজনীতিক প্রভুত্ব বা শক্তিশালী জাতিসমূহের নিকট সম্মানলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই. এ কথা তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। শক্তিশালী মোগলদিগের নিকট হইতে স্বত্ব ও সম্মান লাভ করিবার জন্যই স্বল্পশক্তি ও স্বল্পসংখ্য মারাঠাদিগকে লুণ্ঠন-প্রধান অব্যবস্থিত যুদ্ধ-নীতির (predatory warfare) অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। মোগলেরা যখন দেখিলেন যে, মহারাষ্ট্রীয়-দিগের ভীষণ সংহার-শক্তির হস্ত হইতে রাজ্য-রক্ষা করা ক্রমে দুষ্কর হইয়া উঠিতেছে, তখন তাঁহারা মারাঠাদিগকে চৌথ ও সরদেশমুখী প্রভৃতির স্বত্ব দান করিতে সম্মত হইলেন। মহারাষ্ট্রীয়েরাও ঐ সকল স্বত্ব লাভ করিবামাত্র শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেশের উন্নতি-বিধানে যথাসম্ভব মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। (৪)

১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়েরা মালবে প্রথম লুণ্ঠন-প্রধান অভিযান করেন। ১৬৯৪ অব্দে তথায় তাঁহাদিগের দ্বিতীয় অভিযান হয়। ইহার পর হইতে ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় প্রতিবর্ষেই মালবের রাজপুরুষেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের

---

(8) The character and constitution of their (মারাঠাদিগের) early power made it impossible for them to maintian themselves in many of the countries they were able to plunder; but the ability to destroy generated a right to share in the produce. Hence all those Maratha sources of Revenue (Chouth, Sirdeshmukhi etc.) which they introduced into India. Whenever these were admitted the country had a respite from their ravages.—Malcolm's 'Central India and Malwa.' Chap. iii.

ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট ডফও বলেন,—

Whenever the demands of Chouth and Surdeshmukhi were promptly acknowledged, they carefully refrained from plundering. p. 177.

অর্থাৎ, চৌথ ও সরদেশমুখী দান করিতে যাহারা বিনা আপত্তিতে স্বীকৃত হইত, মহারাষ্ট্রীয়েরা কদাচ তাহাদিগের দেশে লুঠপাট করিতেন না।

আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। মোগল রাজপুরুষদিগের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করিয়া সম্রাটের নিকট হইতে মালবের চৌথ স্বত্ব আদায় করাই এই সকল অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল; এই কারণে অভিযান-কালে মারাঠারা দেশের সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জের উপর অত্যাচার করেন নাই। দেশ-লুণ্ঠন অপেক্ষা সরকারি খাজানা লুঠ করিবার ও বিধর্ম্মী রাজপুরুষদিগের পৃষ্ঠপোষক ধনবান্ অধিবাসীদিগের ধনবল হরণ করিবার দিকেই মারাঠাদিগের প্রধান দৃষ্টি ছিল। মহাত্মা শিবাজীই এই নীতির প্রবর্ত্তন করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বিধর্ম্মী রাজ-শক্তির বল-ক্ষয় ও জাতীয় শক্তির পরিপুষ্টি-সাধন করিবার উপায় শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, নীতি-শাস্ত্রকারদিগের মতে,—

'কোষো যস্য স দুর্দ্ধর্ষো দুর্গং যস্য স দুর্জ্জয়ঃ।'

এই কারণে তিনি শত্রুপক্ষের অর্থ-হরণ করিয়া কোষবলের সহিত তাহাদিগের দুর্দ্ধর্ষতা-লাঘব এবং আত্মপক্ষের ধন-বল ও তজ্জনিত দুর্দ্ধর্ষতা বর্দ্ধিত করিবার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এইরূপে আহরিত অর্থ দুর্গাদির নির্ম্মাণ, সংস্কার ও সেনাদলের সংখ্যা-বৃদ্ধি কার্য্যেই ব্যয়িত হইত। জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই, সে কালের মহারাষ্ট্রদিগের ন্যায় অবস্থাপন্ন জাতিমাত্রকেই পরাধীনতার পঙ্ক হইতে মস্তক উত্তোলন ও আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই-রূপ নীতির অবলম্বন করিতে হইয়াছে। কিন্তু ভারতের ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ ভিন্ন জগতের আর কেহ এইরূপ ঘটনাকে 'দস্যুতা' নামে অভিহিত করিতে সাহসী হন নাই। পরবর্ত্তী কালের দুই এক জন উচ্ছৃঙ্খল মারাঠা সর্দ্দার ভিন্ন আর কেহই এই শিক্ষার অপব্যবহার করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের জাতীয় চরিত্রে কলঙ্কারোপ করেন নাই। মালবেও যে অভিযানকারী মহারাষ্ট্রীয়েরা শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত নীতি হইতে বিচলিত হন নাই—নিরীহ প্রকৃতি-পুঞ্জের পীড়নে কখনও তাঁহাদের আগ্রহ প্রকাশ পায় নাই, এ কথা মালবের হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরা একবাক্যে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বরং তাঁহাদিগের মতে, অওরঙ্গজেবের অত্যাচারে প্রপীড়িত মালবীয় হিন্দু সামন্ত নরপতিগণের আহ্বানে ও আনুকূল্যেই মহারাষ্ট্রীয়েরা সর্ব্বপ্রথমে মালবে প্রবেশ লাভ করেন। (৫) মালবের মুসলমান রাজধানী মান্দুর

(৫) In their first invasion of Central India, the war the Mahrattas carried

বর্ত্তমান জমীদারদিগের নিকট ঐ প্রদেশের ইতিহাসের যে পাণ্ডুলিপি ঐতিহাসিক মালকমের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত আছে যে, মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রাথমিক অভিযানকালেও কেবল সরকারি খাজানা লুণ্ঠন করিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই; ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা নালচাঘাট অতিক্রম করিয়া মান্দুনগর অধিকার ও ধারানগরীর দুর্গ অবরোধ করেন। তিন মাস কাল ঐ দুর্গ অবরোধের পরও তাঁহারা যখন উহা অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন দুর্গের নিম্নভাগে সুরঙ্গ খনন-পূর্ব্বক তাহাতে বারুদ পূর্ণ করিয়া অগ্নি-সংযোগ করিলেন। বারুদে আগুন লাগিবামাত্র মহাশব্দে দুর্গপ্রাচীর বিদীর্ণ হইয়া ভূমিসাৎ হইল। মারাঠারা "হর হর মহাদেব!" ধ্বনিসহকারে দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুর্গের অধ্যক্ষ ও সুবেদার সাদুল্লা খান ও তদীয় ভ্রাতা আব্দাল্লা খানকে ভূপাল অভিমুখে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা-করিতে হইয়াছিল। দুর্গস্থিত মুসলমান সৈনিকগণ পরাভব-স্বীকার করিবামাত্র তাঁহাদিগকে স্ব স্ব ব্যক্তিগত ধন-সম্পত্তির সহিত দুর্গত্যাগ করিয়া অভীষ্ট দেশে গমন করিবার অনুমতিও প্রদত্ত হইয়াছিল। এই বিবরণে প্রকৃতি-পুঞ্জের প্রতি মহারাষ্ট্রীয়দিগের দুর্ব্যবহারের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। বরং দেশলুণ্ঠন অপেক্ষা দেশাধিকারের দিকেই যে তাঁহাদের সমধিক মনোযোগ ছিল, ইহাও এই বিবরণ হইতে প্রতীয়মান হয়। তবে এই প্রকার অভিযান বা যুদ্ধবিগ্রহের সাময়িক কুফল যে সাধারণ প্রজাকেও কিয়ৎপরিমাণে ভোগ করিতে হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। মালববাসী প্রকৃতিপুঞ্জকেও যদি তাহা কিয়ৎপরিমাণে ভোগ করিতে হইয়া থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই।

---

at this stage of their power, to have taken a large share of the revenue, but not to have destroyed, like more barbarous invaders, the source from which it was drawn; for if they had, it could not have recovered so rapidly, as we find from revenue records that it did. But there is in the whole of the proceedings of this period, the strongest ground to conclude, *that they were acting with the concurrence and aid of the Hindu chiefs of the empire*, whose just reasons for discontent with the reigning monarch Aurungeb, have been noticed. This fact indeed, as far as relates to sawaee Jay Shing Raja of Boondar or Jeypoor is distinctly stated in several contemporary authorities

মালবের মুসলমান সুভেদারেরা মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে পুনঃ পুনঃ অসমর্থ হওয়ায় সম্রাট্ অওরঙ্গজেব জয়পুরের অধিপতি মহারাজ সওয়াই জয়সিংহকে মালব-শাসনের আধিপত্য দান করিয়া প্রেরণ করিলেন। (১৬৯৮—৯৯ খ্রীঃ) মহারাজ সওয়াই জয় সিংহ হিন্দুদিগের সবিশেষ পক্ষপাতী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই কারণে উচ্চপদস্থ মোগল কর্ম্মচারীরা সর্ব্বদা তাঁহার ব্যবহার-সম্বন্ধে সম্রাটের মনে সন্দেহের সঞ্চার করিবার চেষ্টা করিতেন। এ ক্ষেত্রেও তাঁহারা জয়সিংহের বিরুদ্ধাচরণ করিতে বিরত হন নাই। মহারাজ জয়সিংহ তাহা অবগত হইয়া সম্রাটের বিশ্বাস-ভাজন হইবার জন্য প্রকাশ্য দরবারে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে মালব হইতে বিতাড়িত করিবার প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু পবিত্র ক্ষত্রিয়-বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় অভ্যুদয়-কামী হিন্দু ভ্রাতৃগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার কল্পনা তিনি নিতান্তই বিসদৃশ বলিয়া বিবেচনা করিলেন। এই কারণে তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য মালব পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিয়া গোপনে পত্র লিখিলেন। সেই গূঢ় পত্রে ইহাও জানান হইল যে, আবার শুভ অবসর উপস্থিত হইলেই তাঁহাদিগকে সাদরে মালবে আহ্বান করা হইবে। মহারাষ্ট্রীয় সেনানীগণ মহারাজ জয়সিংহের এই প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন না। মহারাজ জয়সিংহের মালবে পদার্পণের পর রাজপুতে ও মারাঠায় নামমাত্র একটি যুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষে অস্ত্র-বিনিময় হইতে না হইতেই, পূর্ব্বসংকেত-ক্রমে মহারাষ্ট্রীয়েরা রণে ভঙ্গ দিয়া স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। জয়সিংহও স্বল্পকাল মালবে অবস্থিতিপূর্ব্বক উত্তর-ভারতে প্রতিগমন করিলেন। (৬)

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে মহারাষ্ট্র-পতি রাজারামের দেহাত্যয়

(৬) গ্রাণ্ট ডফ এই সকল ঘটনার কোনও উল্লেখ করেন নাই। তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের মালবাদি প্রদেশের অভিযানকে বিশুদ্ধ লুণ্ঠনপিপাসামূলক ব্যাপার বলিয়াই নির্দ্দেশ করিবার পক্ষপাতী। মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতি যে রাজপুতদিগের কোনও প্রকার সহানুভূতি ছিল, এ কথার তিনি উল্লেখ করেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়দিগকে সর্ব্বজনঘৃণিত দুর্দ্দান্ত দস্যু-রূপেই তিনি অধিকাংশ স্থলে চিত্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পক্ষান্তরে, ম্যালকমের কথায় প্রকাশ যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতি রাজপুত নরপতিদিগের সবিশেষ শ্রদ্ধা ছিল—তাঁহাদিগের

ঘটিল। তথাপি মহারাষ্ট্র সেনানীগণের উৎসাহ দমিত হইল না। কেহ কেহ বলেন, ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে ভৈরবকৃষ্ণ নামক জনৈক মারাঠা সর্দ্দার নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইয়া সাগর প্রদেশের অন্তর্গত 'ধামুনী' নামক স্থান আক্রমণ করিয়াছিলেন। (৭) কিন্তু সে অভিযানের ফল স্থায়ী হয় নাই। ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে নেমাজী সিন্দের (সিন্ধিয়ার) অধীনতায় আবার এক দল মহারাষ্ট্রীয় নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইয়া মালবে প্রবেশ করিয়াছিল। সম্রাট্ অওরঙ্গজেবের আদেশে সেনাপতি জুলফিকার খাঁ তাঁহাদিগের কার্য্যে বাধা-দানের জন্য মালবে প্রেরিত হইয়াছিলেন। মোগল সেনাপতির সহিত সংঘর্ষে সেনা-ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া নেমাজী মালব পরিত্যাগ করেন। এই অভিযানেও মহারাষ্ট্রীয়েরা মালব হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ-সংগ্রহে অসমর্থ হন নাই। তাহার পর যখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্বাধীনতার জন্য আরব্ধ সংগ্রামের শেষ হয়, এবং মহারাজ শাহু স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সাতারার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তখন উদয়জী পওয়ার (প্রমার) স্বীয় দলবল সহ মালবে অভিযান করেন। তাঁহার চেষ্টায় মান্দুনগরে মহারাষ্ট্রপতির বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন হয়। ধারানগরীও হস্তগত করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছিলেন। মালবের তদানীন্তন সুবেদারকে নিতান্ত দুর্ব্বল দেখিয়া তিনি তাঁহার নিকট হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায় করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া মহারাজ শাহুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই রাজা গিরিধর বাহাদুর নামক জনৈক নাগর (গুজরাথী) ব্রাহ্মণ মোগল পক্ষ হইতে সুবেদার নিযুক্ত হইয়া মালবে আগমন করেন। তিনি মালবে মোগলদিগের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করায় উদয়জী পওয়ারকে মালব পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার পর ১৭১৯ খ্রীঃ পেশওয়ে বালাজী বিশ্বনাথ যখন

---

(৭) We are not surprised to find the Rajput princes and chiefs of Jeypur, Marwar, Mewar and Malwa, so far from continuing to be the defence of the (Moghul) Empire, were either secretly or openly the supporters of the Maratha intruders, to whose first invasion of Malwa, we are told by every Persian or Hindoo writer that notices the subject, hardly any opposition was given and we possess many testimonials to show that they chiefly attributed their success on this occasion to the action of religious feeling.

দিল্লী গমন করেন, তখন তিনি সম্রাটের নিকট মালবে চৌথ সরদেশমুখী আদায় করিবার অধিকার প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দিল্লীর দরবার হইতেও মারাঠাদিগকে সময়ান্তরে সে অধিকার দান করা হইবে বলিয়া আশ্বাস প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু বালাজীর পুত্র পেশওয়ে বাজীরাও 'সময়ান্তরে'র অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবার লোক ছিলেন না। তিনি বাহুবলে ঐ স্বত্ব আদায় করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন। (৮)

১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও রামচন্দ্র গণেশকে মালবে গমন করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বর্ষে তিনি উদয়জী পওয়ারকে মালবে প্রেরণ করেন। উদয়জীর কার্য্য যাহাতে অবৈধ বা স্বেচ্ছাচার-মূলক বলিয়া কেহ মনে করিতে না পারে, সেই জন্য বাজী রাও মালবের প্রত্যেক পরগণার ভিন্ন ভিন্ন রাজপুরুষের নামে নির্ব্বিবাদে উদয়জীকে চৌথ ও সরদেশমুখী দান সম্বন্ধে মহারাজ শাহুর স্বাক্ষরযুক্ত আদেশ-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, উদয়জী যথাসময়ে মালবের মোগল রাজপুরুষ ও সামন্ত নরপতিগণের নিকট হইতে বাহুবলে চৌথ ও সরদেশমুখী সংক্রান্ত সমস্ত প্রাপ্য আদায় করিয়া লইয়া আসেন। এই ব্যাপারের প্রতিশোধ-গ্রহণ করিবার জন্য পরবর্ত্তী বর্ষেই অর্থাৎ ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে মালবের সুভেদার আজিম উল্লা খান তাঁহার এক জন সর্দ্দারকে (দাউদ খানকে) বাজী রাওয়ের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। বাজী রাওয়ের হস্তে দাউদ খানের পরাজয় ঘটে। অতঃপর ঐ অব্দের ডিসেম্বর মাসের প্রারম্ভে বাজী রাও কনিষ্ঠ চিমণাজী আপ্পা ও সর্দ্দার উদয়জী পওয়ার, মল্হার রাও হোলকর, রাণোজী শিন্দে (সিন্ধিয়া) প্রভৃতি সর্দ্দারগণকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং মালবে অভিযান করিলেন। তত্রত্য নবীন সুভেদার রাজা গিরিধর বাহাদুর মোগলদিগের অধিকার-রক্ষার জন্য সমরলিপ্সু হইয়া তাঁহাদিগের গতিরোধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাজী রাওয়ের সহিত সমরে তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব স্বীকার করিতে

(৮) উদয়জী পওয়ারের পূর্ব্বপুরুষেরা মালবের অধিবাসী ছিলেন। ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বে তাঁহারা তথা হইতে দক্ষিণাপথে গিয়া উপনিবিষ্ট হন। উদয়জীর পিতা সাম্ভাজী পওয়ার মহারাজ শিবাজীর অধীনতায় সেনানায়কত্ব করিতেন। মহারাজ রাজারামের জিঞ্জী দুর্গে বাস-কালে সাম্ভাজী অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্য প্রকাশ করিয়া পদোন্নতি লাভ করেন। তৎপুত্র উদয়জী মহারাজ শাহুর প্রীতিভাজন হইয়া 'বিশ্বাস রাও' উপাধি লাভ

হয়। রাজা গিরিধর মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে উজ্জয়িনীর চতুষ্পার্শ্বে সুদৃঢ় প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তথাপি রণ-কর্কশ মারাঠাদিগের শৌর্য্যপ্রভাবে উজ্জয়িনীও সহজেই বাজী রাওয়ের হস্তগত হয়। তাহার পর মহারাষ্ট্র সর্দ্দারেরা 'শারঙ্গপুর' অবরোধ করিবার চেষ্টা করায় তত্রত্য মুসলমান শাসন-কর্ত্তা তাঁহাদিগকে ১৫ সহস্র মুদ্রা নিষ্ক্রয় দান করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। তদবধি সারঙ্গপুরের শাসনকর্ত্তাকে প্রতি বৎসর যথানিয়মে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে বার্ষিক ১৫ সহস্র মুদ্রা করদান করিতে হইত। কথিত আছে, এই অভিযানকালে বাজী রাও বুন্দেলখণ্ড পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া পথিমধ্য-স্থিত নরপতিগণের নিকট হইতে করাদান ও বুন্দেলখণ্ডের নরপতির সহিত সখ্য-স্থাপন করিয়াছিলেন।

দুঃখের বিষয়, এই অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ কোনও প্রাচীন গ্রন্থে বা ঐতিহাসিক কাগজ-পত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মালবের হিন্দু সামন্ত নরপতিগণ ও রাজপুতানার ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ মোগলদিগের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া যেরূপে পুনঃ পুনঃ মহারাষ্ট্রীয়দিগের আশ্রয়-প্রার্থী হইতেছিলেন, মহারাষ্ট্রীয়দিগের শক্তি-বৃদ্ধি-দর্শনে তাঁহাদিগের হৃদয়ে যেরূপ আশার উদ্রেক হইয়াছিল, তাহাতে স্বয়ং বাজী রাওকে অভিযানের নেতৃত্ব-গ্রহণ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ-সাধনে অগ্রসর হইতে দেখিয়া যে তাঁহাদের হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হইয়াছিল, তাঁহারা কেহ গোপনে কেহ বা প্রকাশ্যভাবে যে তাঁহার অভিনন্দন করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয় সে কালের হিন্দুমাত্রের গৌরবের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। দীর্ঘকালের মুসলমান-শাসিত ভারতে যে আবার হিন্দু শক্তি মস্তক উত্তোলন করিতে সমর্থ হইবে, ইহা অনেকেরই স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। পক্ষান্তরে, অওরঙ্গজেবের অত্যাচারে ও পরবর্ত্তী সম্রাট্‌গণের দৌর্ব্বল্যজনিত অরাজকতায় হিন্দু জাতির হৃদয়ে মোগল-শাসনের প্রতি বিষম বিতৃষ্ণার সঞ্চার হইয়াছিল। এই কারণে মহারাষ্ট্র জাতিকে মোগল-শাসনের উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর দেখিয়া অধিকাংশ হিন্দুরই হৃদয়ে অসীম আনন্দ ও আশার সঞ্চার হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অনুষ্ঠিত যুদ্ধ-বিগ্রহকে ভিন্নধর্ম্মী ইতিহাস-লেখকেরা যদিও predatory excursions ও pillaging incursions (লুণ্ঠনোদ্দেশ্য-মূলক অভিযান) নামে অভিহিত

(Holy War) বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং তাঁহাদের সহানুভূতিস্রোত স্বভাবতই নিঃশব্দে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতি ধাবিত হইত। এ কথা ঐতিহাসিক ম্যালকমকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে। (৯) তাহার পর বাজী রাওর ন্যায় ব্রাহ্মণ যখন এই ধর্ম্মযুদ্ধে'র নায়কত্ব গ্রহণ করিয়া হিন্দু-শক্তির বিজয়-কেতন-হস্তে পবিত্র "হর হর মহাদেব !" শব্দে বিধর্ম্মী রাজশক্তির বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেন, তখন সেই 'ধর্ম্ম-যুদ্ধের' পবিত্রতা শতগুণ বৃদ্ধি পাইত, সন্দেহ নাই। সেই পবিত্র গৌরবকর দৃশ্য দেখিয়া সেকালের প্রকৃত হিন্দু-মাত্রের হৃদয়ে যে আনন্দোচ্ছ্বাস উদ্বেল হইয়া উঠিত, তাহা বর্ণনা অপেক্ষা মনে মনে অনুভব করাই সহজ-সাধ্য। বাজী রাওয়ের মন্ত্রিত্বকালের প্রথম চারি বৎসরের সমস্ত পত্র-ব্যবহার (Corespodence) যদি কখনও আবিষ্কৃত হয়, তবে তাহার মধ্যে এই বিষয়ের বিশদ-বিবরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস। ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট ডফ ইতিহাস লিখিবার প্রচুর উপকরণ লাভ করিয়াও, মহারাষ্ট্র জাতির প্রতি অনুরাগের অভাববশতঃ সে সকলের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। ঐতিহাসিক ম্যালকম মালবের প্রাচীন জমীদার ও জাইগীরদারদিগের নিকট হইতে যে সকল উপকরণ পাইয়াছিলেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এ বিষয়ে সংক্ষেপে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন ; যথা,—

Raised by the genius of Sevajee to the proud rank of being first the scourge and afterwards the destroyer of the Mohmedan Empire. The cause of the Maharattas had, in all its early stages, the aid of religious feeling. It was a kind of Holy War ; and the appearance of Brahmins at the head of the armies gave in the first instance, force to this impression.

(৯) মালব-বিজয়ের জন্য অনুমতি-প্রার্থনা-কালে শ্রীপতি-রাওয়ের আপত্তির উত্তরে বাজী রাও দরবারে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাতেও এ বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন,—'পিতৃদেবের (বালাজী বিশ্বনাথের) সহিত উত্তর-ভারতে গিয়া আমি সেখানকার অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। হিন্দুস্থানের দেশীয় রাজন্যবর্গের সহিত এ বিষয়ে পূর্ব্বেই আমাদিগের সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। এখন কেবল মহারাজের আদেশ পাইলেই

সে যাহা হউক, পরবর্ত্তী বর্ষে অর্থাৎ ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বাজী রাওকে পুনরায় মালবে অভিযান করিতে হয়। এবারও রাজা গিরিধর বাহাদুর, মালবে মহারাষ্ট্র-আধিপত্য-স্থাপন-কার্য্যে বাজী রাওকে বাধা-দান করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়দিগকে কর দান করিতে হয়। যুদ্ধে জয়-লাভের পর যে লুণ্ঠন-ক্রিয়া আরব্ধ হয়, তাহাতে বহু সম্পত্তি বাজী রাওয়ের হস্তগত হইয়াছিল। নূতন সৈন্যদল-গঠনের জন্য তাঁহার যে ঋণ হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ এই অর্থের সাহায্যে তিনি পরিশোধ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে মালবে মহারাষ্ট্র-পতির স্বার্থে দৃষ্টি রাখিবার ভার উদয়জী পওয়ারের প্রতি অর্পিত হইল। এই কার্য্যের জন্য সৈন্য-পোষণের ব্যয়-স্বরূপ তাঁহাকে মালবের মোকাসা স্বত্বের (অর্থাৎ চৌথের শতকরা ৭৫ অংশের) অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিবার আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। বাজী রাও যদিও এইরূপে বাহু-বলেই মালব হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের বন্দোবস্ত করিলেন, তথাপি যাহাতে পূর্ব্বোক্ত করের অতিরিক্ত মালববাসীর নিকট হইতে আদায় না করা হয়, তৎপ্রতি তিনি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, এবং দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে যাহাতে মালবশাসন করিবার বৈধ অধিকার-পত্র লাভ করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন। শুদ্ধ পাশব-বলে কার্য্যোদ্ধার করিবার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। অর্থগৃধ্নুর মত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া বা প্রাচীন রাজ-বংশাদির বা অভিজাতবর্গের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করিয়া দেশবাসীর চিত্তে বেদনা-দান বা ভীতির সঞ্চার করিবার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। দেশবাসীর প্রকৃতি বুঝিয়া, তাহাদের চিরাগত-সংস্কার ও অনুরাগ-বিরাগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, যথোচিত ধীরতা ও সতর্কতার সহিত কার্য্য করা তাঁহার নীতির মূল মন্ত্র ছিল। সকল দেশেরই প্রকৃত রাজনীতি-বিশারদের চরিত্রে এই সকল সদ্‌গুণ সবিশেষ পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। বাজী রাও এই সকল গুণে বোধ হয় পৃথিবীর কোনও দেশের রাজনীতি-বিশারদ ব্যক্তি অপেক্ষাই হীন ছিলেন না। সেকালের ভারতীয় রাজনীতি-ক্ষেত্রে এই সকল গুণে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই প্রতিপদেই—প্রায় সকল কার্য্যেই তিনি সাফল্য-লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সৌভাগ্য-ক্রমে, তাঁহার অধীন সেনায়কগণও এই সকল গুণের সম্যক্ অধিকারী ছিলেন বলিয়া বাজী রাওয়ের কর্ম্মপথ বহু-

স্বভাবতই পূর্ব্বোক্ত গুণগ্রামে অলঙ্কৃত—বিশেষতঃ মালব ও মধ্য-ভারতীয় প্রদেশসমূহের বিজয় ও শাসনকালে তাঁহাদিগের ঐ সকল রাজনীতি-সম্মত গুণ বিশিষ্টরূপেই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহারা রাজপুত ও অন্যান্য নরপতি-গণের প্রতি, তাঁহাদিগের আশারও অতীত সম্মান প্রদর্শন করিয়া এবং দিল্লীর সাক্ষিগোপাল সম্রাটের মর্য্যাদাও রক্ষা করিয়া চলিতেন। তাঁহাদিগের ব্যবহারে বিনয় ও নম্রতার অভাব কদাচিৎ পরিলক্ষিত হইত। (১০)

বলা বাহুল্য, ইংরাজদিগকেও প্রথমাবস্থায় এ দেশে এইরূপ নীতিরই অনু-সরণ করিতে হইয়াছিল।

অবমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠতঃ।
স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যনাশো হি মূর্খতা॥

---

(১০) This (province of Malwa), it was true, he had first conquered ; but he had professedly levied no more than the Maharatta tributes (Chouth, Sirdesh-mukhi &c) and appears to have sought with solicitude a legitimate title to govern it in the name of the Emperor. The peculiarity of character which has been noticed in this race was never more displayed than on their becom-ing masters of Central India. Baji Rao and his principal leaders content with the profit and substance of what they had attained, so from weakening impression or alarming prejudice, by the assumption of rank and state, seem to have increased in their professions of humility, as they advanced in power. They affected a scrupulous sense of inferiority in all their intercourse and correspondence with the Emperors and with their principal chiefs, parti-cularly the Rajpoot princes. The Marhatta leaders indeed, not only sub-mitted to be treated, in all points of form and ceremony, as the inferiors of those whose countries they had dispoled and userped, but in hardly any instance considered the right of conquest is a sufficient title to the smallest possession, grants for every userpation were sought and obtained from those who possessed the local sovreignity. By this mode of proceeding, which was singularly suited to the feelings of a people like the inhabitants of India who may be generally described as inveterate in their habits and abhorrent of change, they evaded many of those obstacles which had impeded former

রাজনীতির এই মূল সূত্র মহারাষ্ট্রীয়েরা যেরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, সে কালের আর কোনও জাতি বোধ হয় সেরূপ করিতে পারেন নাই। স্বদেশের অভ্যুদয়-কামী পরাধীন জাতির পক্ষে এই নীতি-সূত্রই যে সাফল্য-লাভের সোপান-স্বরূপ, এ কথা ছত্রপতি মহাত্মা শিবাজীর সময় হইতেই মহারাষ্ট্রবাসীর হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। এই নীতির প্রতি উপেক্ষা-প্রকাশ হেতু রাজপুত জাতি রাজনীতি-ক্ষেত্রে সফলতা-লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। মালকম বলেন, পূর্ব্বোক্ত নীতির বলেই মারাঠীরা স্বল্প সময়ের মধ্যে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ স্থলে আপনাদের ক্ষমতা-বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাজী রাও ও তাঁহার সামসময়িক দূরদর্শী মহারাষ্ট্রীয়েরা বুঝিয়াছিলেন যে, মোগল-শাসনের প্রতি দেশবাসীর বিরাগ জন্মিয়া থাকিলেও, দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি তাঁহাদিগের শ্রদ্ধা কিছুমাত্র হ্রাস পায় নাই। দিল্লীর সিংহাসনারূঢ় ব্যক্তি যতই হীনবুদ্ধি ও ক্ষীণশক্তি হউন না কেন, বাবর, হুমায়ুন ও আকবরের বংশধর বলিয়াই তিনি লোকের নিকট ভারতবর্ষের ন্যায়সঙ্গত অধীশ্বর বলিয়া বিবেচিত হইতেন। জাঠ, রাজপুত ও বুন্দেলা প্রভৃতি জাতির প্রধান ব্যক্তিগণ সময়ে সময়ে দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও, 'তক্ত তাউসে'র (ময়ূর-সিংহাসনের) অবমাননা সহ্য করিতে পারিতেন না। দেশবাসীর এই মনোভাব বাজী রাও ও তাঁহার সহকারী সর্দ্দারেরা বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াই দেশাধিকার-ব্যাপারে বাহু-বলকে প্রাধান্য-দান করা নীতি-সঙ্গত কার্য্য বলিয়া মনে করেন নাই। তাই মালবাদি দেশ বাহুবলে জয় করিবার পরও তাঁহারা দিল্লীর সাক্ষিগোপাল সম্রাটের নিকট হইতে ঐ সকল প্রদেশে শাসনাধিকার পাইবার সনন্দ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতেন। পাঠক দেখিবেন, বাজী রাও বাহু-বলে নানা দেশ জয় করিয়াও ঐ সকল দেশের শাসন-দণ্ড পরিচালন বিষয়ে দিল্লীশ্বরের সনন্দ-লাভের জন্য বহুবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে কালের লোকমতের (public opinion) প্রতি সম্মান প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে এইরূপ নীতি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। যে মহৎ উদ্দেশ্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা লইয়া বাজী রাও কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, দক্ষিণাপথে যে মহদ্ভাব প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা যদি উত্তর-ভারতীয় হিন্দুগণের হৃদয়কে আংশিক ভাবেও অধিকার করিত, তাহা হইলে মহারাষ্ট্র বীরদিগকে দিল্লীর সাক্ষিগোপালের প্রাধান্য অধিক দিন মৌখিক ভাবেও স্বীকার করিতে হইত না। কিন্তু পঞ্চ শত বৎসরের দাসত্বের ফলে উত্তর-ভারতীয় হিন্দুগণের চিত্তে 'তক্ত তাউসের' প্রতি অন্ধ ভক্তির সঞ্চার হইয়াছিল—আকবর-প্রমুখ মোগল নরপতিদিগের সৃষ্ট রাজনীতিক কুহেলিকায় তাঁহাদিগের চিত্ত অভিভূত হওয়ায় তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অভ্যুদয়-দর্শনে আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াও তাঁহারা ময়ূরসিংহাসনের মোহ অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের মনোভাবের এই বিশেষত্ব পরবর্ত্তী কালের পুণার রাজনীতিবিদেরা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই।

তাই ১৭৬১ সালের পাণিপথের যুদ্ধের প্রাক্‌কালে সুপ্রসিদ্ধ সদাশিব রাও বা ভাউ সাহেব ঔদ্ধত্যসহকারে দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসন ভগ্ন করিয়া ঘোর বিপন্ন হইয়াছিলেন। ঐ ঘটনার ফলে জাঠ ও রাজপুতগণের সহানুভূতি হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ বঞ্চিত হইয়া পাণিপথে ভীষণ পরাজয়-ভোগ করিতে বাধ্য হন। ঐ দুর্ঘটনার কয়েক বৎসর পরে মাধব রাও শিন্দে (সিন্ধিয়া) বাহু-বলে প্রায় সমগ্র উত্তর-ভারত জয় করিয়াও দিল্লীর সাক্ষি-গোপালের প্রতি প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্মান-প্রদর্শন-পূর্ব্বক এই ভ্রমের সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সেই সময় হইতে মহারাষ্ট্রীয় লেখকেরা দিল্লীর সিংহাসনে হিন্দুর ন্যায়-সঙ্গত অধিকার প্রতিপন্ন করিবার জন্য যত্নশীল হইলেন। ফলকথা, বুদ্ধিমান্ বাজী রাও উত্তর-ভারতবাসীর পূর্ব্বোক্ত মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই বাহু-বলে বিজিত প্রদেশেরও শাসনাধিকার লাভ করিবার জন্য দিল্লীর সাক্ষি-গোপালের নিকট পুনঃ পুনঃ সনন্দ-প্রার্থী হওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।

এইরূপে বাজী রাও এক দিকে দিল্লীর দরবারের নিকট মালবের শাসনাধিকারের সনন্দ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; অন্য দিকে মালববাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের প্রতি অনুরাগী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই কারণে অল্পদিনের মধ্যেই ঐ প্রদেশ স্বল্পায়াসে মহারাষ্ট্রীয়গণের সম্পূর্ণ হস্তগত হইয়াছিল। (১১)

মহারাষ্ট্রীয়েরা ক্রমশঃ মালবে উপনিবেশ স্থাপন-পূর্ব্বক তথায় স্থায়িভাবে বসতি করিবার চেষ্টা করায় ঐ প্রদেশ তাঁহাদিগের নিকট জন্মভূমির তুল্য প্রিয় হইয়া উঠিল। উত্তর-ভারতে মহারাষ্ট্র-প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠাবিষয়েও তাঁহাদিগের এই উপনিবেশ-সংস্থাপন-পদ্ধতি যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। সে যাহা হউক, এই ঘটনার পর প্রায় ৫ বৎসর কাল মারাঠা সর্দ্দারেরা মহারাজ শাহুর আদেশ-পত্রের বলে মালব হইতে প্রায় নির্ব্বিঘ্নেই চৌথ আদায় করিয়াছিলেন। বাজী রাও অন্যান্য গুরুতর রাজনীতিক সমস্যার মীমাংসায় ব্যস্ত থাকায় মালবের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। তাহার পর যে সকল ঘটনায় মালবের শাসনাধিকার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য হন, সময়ান্তরে তাহার আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর।

(১১) All accounts regarding the establishment of the Marhattas in Central india agree, that their first administration of that country was moderate and good, particularly as contrasted with those aggravated evils which are ever the concomitants of falling power, when the necessities of sovereign lead him to oppress those whom he cannot protect. Their conduct for a period was very conciliatory, and they soon established a strength that made the weak government of Mahomed Shah despair of recovering a country which became the home of the invaders, from whence they carried their predatory excursions into Hindusthan and a grant of a part of its revenues not excepting the lands near Delhi was one of the early fruits of their success.—Malcolm's Central India and Malwa. Chap. iii.

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

প্রবাসী। আষাঢ়। প্রথমে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা'। তাহার পর স্বরলিপি,—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের একটি গানের স্বরলিপি রচিয়াছেন। মিশ্র খাম্বাজে রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন,—

'আরো আরো প্রভু, যেমন খুসি আমায় মারো।'

গানটি এমন উদ্ভট ও অক্ষমতার পরিচায়ক যে, রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। 'সঙ্কলন ও সমালোচনে' নানা বিষয়ের সমাবেশ আছে। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদারের 'ইউরোপের সভ্যতা ও সুবিধা' উল্লেখযোগ্য। লেখক বলিয়াছেন,—'বাঙ্গালীরা পশ্চিমের লোককে 'মেড়ো' ওড়িশার লোককে 'উড়ে' বলিয়া ঘৃণা করে। অন্য প্রদেশের কথায় কাজ কি, বঙ্গের এ প্রদেশে ও প্রদেশে যে রকম ব্যবহার, তাহাতেই বাঙ্গালীর যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।'—বিজয় বাবু ভুলিয়াছেন,—এ ভাব বঙ্গে সার্ব্বভৌমিক নহে। আর এই স্বদেশী যুগে সে ভাবের অস্তিত্ব নাই। উপহাস বা বিদ্রূপ সর্ব্বত্র ঘৃণার ফল নহে। বিজয় বাবু বলেন,—'ইউরোপের সহরে দূর হইতে লোকে তোমাকে বিদেশী বলিয়া লক্ষ্য করিয়া মনে মনে যতই বলুক, সামনে কদাচ রূঢ় ব্যবহার করিবে না।' ইহা কি সত্য? অনেক বিলাতফেরতের মুখে শোনা গিয়াছে,—নিরক্ষর জনসাধারণ ও রাজপথচারী বালক-চমূ 'ব্ল্যাকী!' 'ব্ল্যাকী!' ধ্বনিতে ধূমধূসর ব্যোম প্রতিধ্বনিত করিয়া কৃষ্ণকায় ভারতবাসীদের অনুসরণ করে। বিলাতের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী লর্ড সল্‌সবরী ভারত-রত্ন দাদাভাই নৌরোজীকে 'Black man' বলিয়া প্রকাশ্য বক্তৃতায় গালি দিয়াছিলেন। জন বুল অত্যন্ত আত্মান্ধ, দৃপ্ত ও সঙ্কীর্ণচিত্ত,—পৃথিবীর সভ্যদেশের অনেক ভ্রমণকারী তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বিজয় বাবু অল্প দিন বিলাতে ছিলেন, বোধ হয়, এ বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা গভীর ও নির্ভরযোগ্য নহে। 'পারস্যপ্রসূনে' কবিতা বলিয়া যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা 'কাব্যি'র অপভ্রংশ।

'সখার সঙ্গে ইহ পরলোকে
যদি যাপি এক কণা-জল'

কি ভীষণ প্রহেলিকা! 'এক কণা জল' যাপন ইংরাজী, না বাঙ্গালা, না উর্দ্দু, না গার্গীয়ের আবিষ্কৃত—সেই আদিপুরুষের ভাষা? যাহার অর্থই হয় না, তাহা লিখিয়া নিষ্কর্ম্মার না হয় সময় কাটিয়া যায়। কিন্তু তাহা ছাপিয়াও পাঠক-সম্প্রদায়কে বিব্রত করিয়া 'প্রবাসী'র লাভ কি, বলিতে পারি না। ইহাতে অক্ষম ও অসার রচনা প্রশ্রয় পায়। বাঙ্গালার কাঁটা-বনে আর আলকুশীর চাষ করিয়া লাভ কি? 'বাহিরিবে এ জীবন সাথেতে'—এই রুগ্ন চরণে ছন্দ বেচারী মাঠে মারা গিয়াছে। শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামীর 'তাজ' অক্ষমতার তাজমহল বটে। শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার 'প্রতিবাদে' যে স্বচ্ছ-সরল, কৌতুক-তরল হাস্যরস ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহা উপভোগ করিয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। 'প্রবাসী'র 'কাব্যির' প্রগাঢ় ছায়ার পার্শ্বে বিজয় বাবুর এই সুন্দর সরস হাসির কবিতাটি আলোর মত সমুজ্জ্বল ও মনোহারী বলিয়া মনে হয়। শ্রীদ্বিজদাস দত্তের 'পাট না নালিতা' সুরচিত বটে, কিন্তু ও 'কৃষি-গেজেটে'র যোগ্য। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'প্রবাসিনী' নামক গল্পটি সুরচিত। আখ্যানবস্তু সুন্দর। লেখক স্কটল্যাণ্ডে এই গল্পটির অবতারণা করিয়াছেন। অতুল, হেম, লীলা ও মিসেস্ রায়ের ছবি বেশ ফুটিয়াছে। গল্পটি প্রভাত-কিরণে সমুজ্জ্বল। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী 'কবি নবীনচন্দ্রে যুগধর্ম্মের প্রভাব' নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন, আমরা সর্ব্বত্র তাহার অনুমোদন করিতে অক্ষম। কিন্তু অল্প পরিসরে সে বিতর্ক অসম্ভব। সে যাহা হউক, প্রবন্ধটি আমরা সকলকে পড়িতে বলি। 'পুষ্পসার' উল্লেখযোগ্য। 'দময়ন্তীর স্বয়ংবর' ও 'দেব সেনাপতি কার্ত্তিকেয়' নামক ছবি দুখানি 'ভারতীয়

চিত্রকলা পদ্ধতি'র কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। কুমারটুলীর কল্যাণে ইতিপূর্ব্বে ঘোড়া-কার্ত্তিক দেখা গিয়াছে,—এবার 'প্রবাসী'র কল্যাণে 'ওড়া-কার্ত্তিক' দেখা গেল! 'চিত্র পরিচয়ে'র লেখক বলেন,—'ময়ূর-পৃষ্ঠে আকাশ-পথে সঞ্চরণ দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে।' বলা বাহুল্য,—এই ইঙ্গিতের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। নতুবা উড্ডীয়মান কার্ত্তিকের সৌন্দর্য্য আমরা উপভোগ করিতে পারিতাম না। 'চিত্র-পরিচয়ের' লেখক লিখিয়াছেন,—'কবির যেমন স্বাধীন কল্পনার অধিকার আছে, চিত্রকরেরও তেমনই (স্বাধীন) কল্পনার অধিকার আছে।' কিন্তু যে 'স্বাধীন কল্পনা'য় মহাদেব হাড়গিলে, জগন্মাতা পার্ব্বতী লালসাময়ী নারী ও মানুষের হাত পা যোজনবিস্তৃত বিকারে পরিণত হয়, তাহা কল্পনা অভিধানের যোগ্য নহে। কল্পনার স্বাধীনতার দোহাই দিয়া যদি কেহ ব্যভিচারের সৃষ্টি করে,—চিত্রে ও কাব্যে কোথাও তাহার স্থান নাই।

মৃণ্ময়ী। প্রথম ভাগ; তৃতীয় সংখ্যা, আষাঢ়। বাঙ্গলা সাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী বাঙ্গালার সাহিত্য-সাগরে এই ক্ষুদ্র পান্সীখানি ভাসাইয়া বাদাম তুলিয়া দিয়াছেন। আশা করি, সাফল্যের তীরে ভিড়িতে পারিবে; শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'জমা-খরচ' নামক দশপদী কবিতায় পাটীগণিতের ও গদ্যের প্রাধান্য একটু অধিক। 'শঙ্করদেব' উল্লেখযোগ্য। আষাঢ়ের 'মৃণ্ময়ী' প্রবন্ধসম্পদে সমৃদ্ধ নহে।

ভারত-মহিলা। আষাঢ়। শ্রীমতী ললিতা রায় 'দেশসেবায় নারী জাতি' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—'ভারতের পুরুষদিগের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে; এখন তাঁহারা চাহিয়া দেখুন, তাঁহারা যে নির্ব্বোধের ন্যায় নারীর উন্নতির পথে বাধা দিতেছেন, তাহাতে জাতি ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। নারী যত দিন পুরুষের আজ্ঞাধীন এবং পুরুষ যত দিন নারীর প্রভু থাকিবেন, তত দিন দেশ জাগিতে পারে না।' পুরুষ জাতির পক্ষ হইতে সত্যেন্দ্র বাবু বহুদিন পূর্ব্বে গাহিয়াছিলেন,—

'না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগেনা!'

লেখিকাও সেই গানের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের পুরুষ কি ইচ্ছা করিয়া নারী জাতির উন্নতির পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছে? আমাদের মনে হয়, ভারতের পুরুষ নারীজাতির 'উন্নতির পথে বাধা' দিবার জন্য আদৌ উৎসুক নহেন। তাঁহারা আপনাদের 'উন্নতির পথে যে বাধা'র সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই বাধাই নারীজাতির চরণে শৃঙ্খলের ন্যায় জড়াইয়া গিয়াছে। যদি ভারতের পুরুষ নারীজাতির উন্নতির পথে বাধা দিয়া আপনাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতেন তাহা হইলে, নারীজাতি ও শ্রীমতী ললিতা রায় প্রভৃতি তাঁহাদিগকে স্বার্থপর বলিতে পারিতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে অপবাদের অবকাশ নাই। 'স্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্যান্ সাধয়তি?' আমরা বলি,—আপনারা জাগুন, এবং পারেন ত আমাদের জাগাইয়া দিন। বহু দিন দাসত্বের 'চণ্ডু' সেবন করিয়া আমাদের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে যে, নারীজাতির—বহু বিদেশী জাতির—সংস্কারক ও রাজনীতিকগণের বহু চাবুক আহার করিয়াও আমরা 'চক্ষু উন্মীলন' করিতে পারিতেছি না। 'মানবের মাতৃজাতি নারীগণ স্বাধীন' হইলে কামা-কল্পতরুর শাখায় অমৃত-ফল ফলিতে পারে, তাহা আমরা অস্বীকার করিব না; কিন্তু যতদিন 'মানবের পিতৃজাতি' স্বাধীন না হয়, তত দিন এ স্বপ্ন কল্পনার নন্দনবনে আশাকুঞ্জেই বিরাজ করিবে। 'স্ত্রীজাতির উন্নতি ও কেশবচন্দ্র' উল্লেখযোগ্য। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্তের 'ঋষির পরাজয়' পড়িবার চেষ্টা করিয়া আমরা পরাজয় মানিয়াছি। যাঁহারা 'দেবী অঘোরকামিনী'কে জানেন, 'অঘোর-প্রকাশ' তাঁহাদের প্রীতিপ্রদ হইতে পারে। চিঠিগুলি কেন মুদ্রিত হইতেছে, বলিতে পারি না। ইহাতে যে সকল ঘরাও কথা ও অত্যন্ত সাধারণ ঘটনার উল্লেখ আছে, সাধারণের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। জীবনচরিতে উপযুক্ত স্থলে এই সকল পত্রের 'সারসংগ্রহ' সঙ্গত হইতে পারে, কিন্তু শ্রীরাম বাবুর বেতন কত ছিল, শিবনাথ বাবুকে ২৲ দু' টাকা দিও, মেয়ে দুটি যেন কাঁচা আম খাইয়া বেড়ায় না,—এ সকল তথ্য সাহিত্যের ও মাসিকপত্রের পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী।

তাণ্ডব।

—:০:—

১

অঙ্গে বিভূতি অজিন-বসন
হের গো সৃষ্টি-মণ্ডপে—
সঙ্গে অযুত ভূত-প্রেতগণ
ভৈরবে নাচে তাণ্ডবে!
গম্ভীর গুরু ডমরু বাজিছে,
ফণী দোলে তালে উল্লাসি';
নন্দীর করে পটহে নাদিছে—
"বোম বোম হর-সন্ন্যাসী!"

২

অনল-দীপ্ত দ্বাদশ সূর্য্য
ঊর্দ্ধ গগনে স্তম্ভিত;
প্রবল ঝটিকা বাজায় তূর্য্য,
শৈল-সিন্ধু কম্পিত
বিরচি' গরলে অর্ঘ্য-পাদ্য
বাসুকি উঠিল নিশ্বাসি',
উপচি' পাতাল উঠিল বাদ্য—
"জয় জয় হর-সন্ন্যাসী!"

৩

বক্ষে শঙ্কা জাগিল চকিতে—
চমকে ইন্দ্র-চন্দ্র;
যক্ষ রক্ষ বিহ্বল-চিতে
ভুলিল রক্ষা-মন্ত্র!
রচিছে স্তোত্র দেবতাবর্গ—
উচ্চরে বাণী বিন্যাসি';

নাচে রে রুদ্র মাতায়ে স্বর্গ !
"বোম বোম্ হর-সন্ন্যাসী !"

৪

অগণিত লোকে বাজে বাদিত্র
গরজি' অধিক গরবে ;
দ্বিগুণিত ভূত-ফণীর নৃত্য,
ভীম তাণ্ডব পরবে।
তুলিল গঙ্গা ফেনিল লহরী
জটায় জটায় উচ্ছ্বাসি' ;
ঘূরিল ত্রিশূল গগন উপরি !
"জয় জয় হর-সন্ন্যাসী !"

৫

আজি যে তোমার নৃত্য হেরিয়া,
তোমার চরণ-প্রান্তে
নাচিছে বিশ্ব শূন্য ঘেরিয়া
আলোক বিকাশি' ধ্বান্তে ;
অশিব মথিয়া মঙ্গল-গাথা
উঠিছে, শুনিছে বিশ্বাসী।
হে শিব, সর্ব্ব-বিশ্ব-বিধাতা !
বোম্ বোম্ হর-সন্ন্যাসী !

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

হরিদাসের মাছ-ধরা।

মৎস্য ধরা একটি বাৎসরিক বিড়ম্বনা। ইহাতে প্রায়ই শরীর নষ্ট, মনঃকষ্ট, এবং অযথা জীবহিংসার কারণ ইষ্টদেবতাগণ রুষ্ট হইয়া পড়েন। কিন্তু সখের মধ্যে এটা বড় গুরুতর সখ। প্রবৃত্তির রাজা ও নিবৃত্তির মহাশত্রু।

শ্রাবণ মাসের ঘনঘোরঘটা বারংবার বর্ষিয়া যাওয়াতে পুষ্করিণী সকল কলেবর বর্দ্ধিত করিয়া বাঁধাঘাটের শীর্ষ আচ্ছাদন করিয়া ফেলিল। পঙ্ক

পরিত্যাগ করিয়া বড় বড় রোহিত, মৃগেল ও কাত্‌লা নির্ভয়ে অল্প জলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

স্বভাবশতঃ হরিদাসের হৃদয় তিন চারি দিন ধরিয়া নৃত্য করিতেছিল। শনিবারে তাহা তাণ্ডবাকারে পরিণত হইয়া পড়িল।

সহরটা বড় ছোট খাট নয়; বেহার অঞ্চলে; কিন্তু পুষ্করিণী-হীন বলিলেও চলে। প্রায় চারি ক্রোশ হইতে আরম্ভ করিয়া বার ক্রোশের মধ্যে দুই চারিটি পুষ্করিণী আছে। সকলের সম্বলের মধ্যে তাহাই।

দীনু আসিয়া সংবাদ দিল যে, হরিহর মিশ্রের পুষ্করিণীতে গত কল্য মৎস্য লাফ্ দিয়াছিল। সে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

হরিদাস পূর্ব্বাপর অনেকবার ঠকিয়া এ বৎসর একটু সন্দিহান হইয়াছে;—সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কেহ দেখিয়াছে কি?"

ক্রমে দীনুর স্বপক্ষে বলাই, গদাধর ও সাতকড়ি আসিয়া জুটিল। চক্ষুর নিমেষে সপ্রমাণ হইয়া গেল,—পুষ্করিণীটাতে রোহিত মৎস্য ঠাসা। দশ সেরের নিম্নে কোনটা নয়। হরিদাস লম্ফ দিয়া বলিল, "তবে লাগ।"

বলাইচন্দ্র শিক্ষানবীশ। দীনু পাকা শিকারী। গদাধর ও সাতকড়িও বহুকালের পুরাতন লোক, কিন্তু কালক্রমে উদ্যমহীন হইয়া পড়িয়াছিল। গদাধরের মন কিছু আঁকাবাঁকা।

তাহারা বলিল, "অত দূর হাঁটিয়া যাইতে পারিব না।"

হরিদাস একটা ভাড়াটিয়া গাড়ী যোগাড় করিল; এবং বহু অনুনয় বিনয় পূর্ব্বক সকলকে রাজি করিয়া নিজের তোড় জোড় ও আস্‌বাব্ দুরস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইল।

টোপ্ ও চারের মশলা প্রভৃতির ভার বলাইচন্দ্রের উপর। বলাইচন্দ্র সন্ধ্যার মধ্যেই সপ্তপ্রকার মশ্‌লা ভাজিয়া, চূর্ণ করিয়া, তাহার গামছার মধ্যে সাতটা বড় বড় মোড়কে বাঁধিয়া ফেলিল। হরিদাস ছিপ, হুইল, বঁড়্‌শী প্রভৃতি টানিয়া, বাঁধিয়া, খাটাইয়া, এবং সূতার দৃঢ়ত্ব ও কঠিনত্ব নানাবিধ ভাবে পরীক্ষা করিয়া হৃদয়ে শান্তিলাভ করিল। "এবার মাছ যায় কোথা!"

রাত্রিকালে স্থির হইল যে, প্রত্যূষে হরিদাস বলাইচন্দ্রের বাটীতে যাইবে, এবং তথা হইতে-বাজারে গিয়া ভাড়াটিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিবে।

রাত্রিকালে হরিদাসের নিদ্রা হয় নাই। কখনও রোহিত মৎস্যের বিরাট

লম্ফ, কখনও হুইলের তীব্র মধুর শব্দ, কখনও কাতলার চোঁচা দৌড় ও বন্ধুগণের শিকার-দাপট, অথবা মৎস্য পলাইয়া যাওয়ায় হাহুতাশ ও দীর্ঘনিশ্বাস হরিদাসের স্বপ্নদেহে বিচরণ করিতেছিল।

প্রাতঃকালে হরিদাস চট্ চা খাইয়া গৃহিণীকে বলিল, "তুমি এক টাকার তৈল আনাইয়া রাখিও ; আজ মাছে বাড়ী ভরিয়া যাইবে।"

হরিহর মিশ্রের নিকট হইতে পূর্ব্বদিনই পাঁচ জন লোকের মৎস্য ধরিবার 'পাশ' (আজ্ঞাপত্র) সংগ্রহ হইয়া গিয়াছে। ভোর পাঁচটায় সময় বাটীর বাহির হইয়া হরিদাস দেখিল, আকাশ কিছু মেঘাচ্ছন্ন। তাহাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু 'ওয়াটার-প্রুফ্'টা লওয়া উচিত। হরিদাস, বলাই ও দীনু ব্রাহ্মণ। গদাধর ও সাতকড়ি শূদ্র। হরিদাস বলাইচন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইবামাত্র বলাইচাঁদ কিছু উৎকণ্ঠিতভাবে বলিল, "আমার স্ত্রীর রাত্রিকালে জ্বর আসিয়াছে।"

হরিদাস। কোনও ভয় নাই। মাছ আনিলেই সারিয়া যাইবে। দাঁড়াও, আমি একটা 'প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্' করিয়া দিই।

হরিদাস পূর্ব্বে ক্যাম্বেলে ডাক্তারী পড়িত ; এখন কাপড়ের দোকান করে ; কিন্তু মধ্যে মধ্যে বন্ধুবান্ধবের জ্বর জ্বালা হইলে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিত। দেখিতে বেশ সুপুরুষ, কিন্তু অত্যন্ত স্থূলকায়।

ইত্যবসরে বলাই চট্ করিয়া মশলার পুঁটুলি বাঁশবনে লুইয়া গেল। বলাইচাঁদের মাতা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি নিয়ে যাচ্ছিস র‍্যা ?"

হরিদাস বলিল, "কাপড় ও গামছা। আমরা গঙ্গাস্নান করিয়া তবে যাইব।

বলাইকে সংগ্রহ করিয়া হরিদাস বাজারে গেল। সেখানে দীনু, গদাধর ভাড়াটিয়া গাড়ীতে চাপিয়া বসিয়াছিল।

বলাই বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে !"

সকলে (ত্রস্ত ভাবে) "কি ?"

বলাই। তিন ব্রাহ্মণ ও এক শূদ্রে যাত্রা অসঙ্গত ও বিপজ্জনক।

হরিদাস। সাতকড়ি কই ?

গদাধর। সে আসিবে না।

হরিদাস বলিল, "রামতারণ ঠাকুরকে লও।"

পূর্ব্বে কাহারও দৈনিক খাওয়া দাওয়ার কথা মনে ছিল না। চাউল, দাইল,

হাঁড়ী ও কাষ্ঠ প্রভৃতি শীঘ্র সংগৃহীত হইল, এবং রামতারণ ঠাকুর 'কোচ-বাক্সে' অধিষ্ঠিত হইয়া সকলকে আশ্বস্ত করিল।

দীনবন্ধু এতক্ষণ প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্ন ছিল। হরিদাস তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "দীনু, আর কি লইতে হইবে, বল।"

দীনু গম্ভীরভাবে কহিল, "এখনও কিছু যোগাড় হয় নাই। ময়দা, ছাতু, পিঠুলি, পিঁপড়ের ডিম, কেঁচো,—এ সব কই?"

বলাই বলিল, "যদি বৃষ্টি আসে? বাঁশের ছাতা লওয়া উচিত।"

রামতারণ ঠাকুর। পান তামাকের কোনও বন্দোবস্ত হয় নাই?

গদাধর কোনও কথা কহিল না। সে নিজে চালাকী করিয়া রাত্রিকালে সকলই সংগ্রহ করিয়াছিল।

রামতারণ ও দীনু ক্ষিপ্রহস্তে ও দ্রুতপদে এ দোকান হইতে ও দোকান, এবং এখান হইতে ওখানে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেলা নয়টার মধ্যে সব যোগাড় করিল। কেবল পিপীলিকার ডিম্ব পাওয়া সুকঠিন!

হরিদাস বলিল, "আমি গাছে চড়িয়া দেখি?"

বলাই। কোনও আবশ্যক নাই। আমি জানি,—ময়রাদের আমগাছে পিঁপড়ের আড্ডা।

বলাই পূর্ব্বে ডিম্বসংগ্রহের তথ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিল। বৃক্ষে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই ঘন পত্রের মধ্যে বিকট চীৎকারধ্বনি শ্রুত হইল।

হরিদাস। কি হয়েছে র‍্যা?

বলাই। সর্ব্বশরীর লাল ডেঁয়ো পিঁপড়েয় ছেয়ে ফেলেছে।

হরিদাস। ঝাড়িয়া ফ্যাল্।

বলাই। ঝাড়িবার যো নাই। (পুনরায় চীৎকার!)

হরিদাস বৃক্ষের নিম্নভাগে উপস্থিত হইয়া উর্দ্ধে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, বলাইচাঁদের অবস্থা শোচনীয়। কেবল পিপীলিকা নহে, বড় বড় ভীমরুল তাহার পকেটের চতুর্দ্দিকে উড়িতেছিল।

হরিদাস। তোর পকেটে কি র‍্যা?

বলাই। মা সন্দেশ করেছিলেন, তাই গোটা কতক লইয়াছিলাম।

দীনু গম্ভীরভাবে পরামর্শ দিল, "একটা বাঁশের ডগায় ন্যাকড়া বাঁধিয়া কেরোসিন তৈলে জোবড়াইয়া ধোঁয়া দাও।"

গদাধর অবজ্ঞাসূচক স্বরে বলিল, "তাহাতে কিছু হইবে না।"

বহু তর্ক বিতর্কের পর তাহাই স্থির হইল। ইত্যবসরে বলাই যন্ত্রণায় অধীর হইয়া গাছ হইতে লাফ দিয়া পড়িল।

হরিদাস শীঘ্র স্পিরিট্-ক্যাম্ফার ও 'লিডম' প্রভৃতি বসাকের দোকান হইতে সংগ্রহ করিয়া বলাইচাঁদের সর্ব্ব গাত্রে মালিস করিল। তাহার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ লাঘব হইলে সকলে গাড়ীতে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিল। তখন বেলা ১০টা।

সাতকড়ি বলিল, "কিছু হবে,—তা বোধ হয় না;—এখানেই অর্দ্ধেক দিন কেটে গেল।"

৩

যাত্রিগণ গাড়ীর মধ্যে সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া রাজপথ দিয়া চলিল। পথ অতি সুন্দর। দুই পার্শ্বের দৃশ্য রমণীয়। বিস্তীর্ণ জলাকীর্ণ ক্ষেত্রে কৃষকগণ মনের আনন্দে ধান্য রোপণ করিতেছিল। অদূরে পর্ব্বত-মালা মধ্যে মধ্যে উচ্চ শিখরে মেঘ-বাষ্প আলিঙ্গন করিতেছিল। প্রবল পূর্ব্ব-বায়ু তাহা উড়াইয়া আবার পশ্চিম-কোণে লইয়া যাইতেছিল।

সকলেরই মুখ গম্ভীর। হরিদাস বলিল, "তোমরা ভয় করিও না। একবার বৃষ্টি হইয়া গেলে টপাটপ্ রুই মাছ খাইবে।"

দীনু বলিল, "ঠিক তাই, যদি মাছ থাকে তবে।"

হরিদাস চটিয়া বলিল "তুমি ত বলেছিলে—মাছ আছে!"

দীনু। আছে নিশ্চয়ই। তবে অনেক সময় খায় না।

বলাই। একটা থাকিলেও ধরিব।

বলাইচাঁদের আশ্বাসে গদাধর হাসিল।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সকলে পুষ্করিণীর পাড়ে উপস্থিত। পুষ্করিণী বৃহৎ, কিন্তু পদ্মপত্রে অর্দ্ধভাগ পরিপূর্ণ। গদাধর একটি সুবিধাজনক স্থান দেখিয়া 'চার' করিল। হরিদাস বলাইকে লইয়া পশ্চিম পাড়ে গেল। দীনু বুঝিল, এই বাতাসে এহেন পুষ্করিণীতে মৎস্য পাওয়া দুষ্কর।

তৈল আনা হয় নাই। বলাইচাঁদ বলিল, "ফর্দ্দে লেখা ছিল না। তবে উপায় কি?"

হরিদাস বলিল, "ঘি মাখ।"

এবং গোটা দুই সন্দেশ খাইয়া যথাবিহিত পরস্পরের স্থানে মৎস্য-শিকারে রত হইল।

রামতারণ ঠাকুর বৃক্ষের নিম্নে খিচুড়ীর বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন।

বাতাস পূর্ব্ব অপেক্ষা অধিকতর বেগে বহিতেছিল। বড় বড় ঢেউ পদ্মপত্র কম্পিত করিয়া পশ্চিম পাড়ে আঘাত করিতেছিল। হরিদাস বলিল, "বলাই! গতিক্ বড় খারাপ।" দীনু বলিল, "ভয় নাই। বেলা দুইটার মধ্যে বর্ষিয়া যাইবে, এবং তার পরই রুই নামিবে।"

বলাই। ঈশ্বর তাই করুন।

গদাধর। ঘোড়ার ডিম হবে!

কিন্তু দীনুর কথা অনেকটা ফলিল। যখন সকলে বৃক্ষতলে বসিয়া খিচুড়ী-ভক্ষণে রত, তখন মস্তকের উপর ঘোর কালো মেঘ জমিতেছিল। খিচুড়ী সাবাড় না হইতে হইতেই মুষলধারা।

বলাই। আমার আলুভাতে গলিয়া গিয়াছে।

হরিদাস। খিচুড়ীটা চট্ সাপটিয়া খা।

বংশছত্র বৃথা হইল। মস্তকে ধরিবার লোক নাই। ক্রমে সকলে দারুণ ভিজিয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলেন। চক্ষু পুকুরের দিকে।

দীনু গোঁফে তা দিতেছিল।

"দেখ্ছিস বলাই!"

অদূরে পদ্মপত্রের মধ্যে লোহিত রক্তবর্ণ পুচ্ছ উল্টাইয়া একটা রোহিত মৎস্য অদৃশ্য হইয়া গেল।

হরিদাস ও বলাই লম্ফ দিয়া পাড়ে গেল। আর সময় নষ্ট করা উচিত না।

ধড়াং! ওঃ চারে মাছ আসিয়াছে!

৪

বৃষ্টি থামিয়াছে। সূর্য্যদেব প্রখর কিরণ বিস্তার করিয়া মধ্যগগন পার হইয়া পশ্চিমে হেলিতেছেন। বেলা তখন ২॥০ টা। বাতাস থামিয়া গিয়াছে। কেহই সন্তপ্ত নহে। ধান্যক্ষেত্র ও পুষ্করিণীর পাড় সুশীতল। কেবল মধ্যে মধ্যে জল হইতে সামান্য উষ্ণতা উঠিতেছিল।

সকলে নিস্তব্ধ। কেবল বাব্লা বৃক্ষের নীচে রামতারণ ঠাকুর তামাকু

এমন সময় গদাধর হঠাৎ কসিয়া টান মারিল। টান্‌টা মৎস্যের গাত্রে লাগে নাই। তীরবেগে বঁড়শী পাড় হইতে রামতারণের হুঁকার ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া, হুঁকা সহিত কলিকা জলে ফেলিয়া দিল!

রামতারণ। (চটিয়া) তুমি কি রকম লোক? আর একটু হইলে আমার চক্ষু গিয়াছিল।

গদাধর ক্রুদ্ধভাবে বলিল, "তুমি আমার পশ্চাতে বসিয়া ভাল কর নাই।"

দীনু হাসিয়া বলিল, "কি হে গদাধর! চারে যে হুঁকোর জলের আবির্ভাব!"

সর্ব্বনাশ! এখন উপায়।

গদাধর বলিল, "আমি উহা কেয়ার করি না।"

দীনু বুঝিতে পারিয়াছিল, গদাধরের কেঁচোর টোপে বেলে মাছ খাইয়াছিল। রুই, মৃগেল ও কাত্‌লার কোনও চিহ্ন নাই।

হরিদাস স্থূলকায়, সুতরাং অত্যন্ত ঘামিয়া গিয়াছে। ক্রমে উত্তাপ বাড়িতেছে। বলাইচাঁদ বাম পার্শ্বে 'ফাতা' নিরীক্ষণ করিতেছে।

হরিদাস চুপি চুপি বলিল, "বলাই, সাবধান! তোর চারে মাছ এসেছে।"

বলাই। কি করিয়া টের পাইলে দাদা?

হরিদাস। ঐ দ্যাখ্, জোড়া ফুট!

ক্রমে 'ফুট' বিম্বাকারে বলাইচাঁদের ফাতার নিকট ঘন ঘন উঠিতে লাগিল।

বলাই। চার ঘোলাচ্ছে।

হরিদাস। চুপ। ওটা কাত্‌লা। কুঁড়ো দে—কুঁড়ো দে।

বলাই কম্পিতহস্তে কুঁড়া দিতে লাগিল।

হরিদাস। গাঁথিলে রাখ্‌তে পারবি ত?

বলাই। না। আমি বড় মাছ কখনও ধরি নাই।

হরিদাস। ফাতা চাপিলেই কসিয়া টান মারিস্।

কথা শেষ হইতে না হইতেই ফাতা অদৃশ্য! অমনই সজোরে টান!

বলাই। ওঃ পাথরের মত।

হরিদাস। ঢিল্ দে, ঢিল্ দে।

বিদ্ধ জলজন্তু পদ্মপত্রের মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল। বলাই বলিল, "দাদা! সর্ব্বনাশ, তুমি ধর।"

বোধ হয় প্রকাণ্ড কাত্‌লা। মাটী লইয়াছে। টানাটানিতে কোনও ফল হইতেছে না। হরিদাস বলাইচাঁদের ছিপ হাতে লইয়া দণ্ডায়মান। ঘর্ম্মাপ্লুত-কলেবর!

বলাই, দীনু ও গদাধরকে ডাকিল। গদাধর আসিল না। দীনু বলিল, "চার ছাড়িয়া যাওয়া উচিত নয়, এই মাছ খাইবার সময়।"

হরিদাস মনে মনে ভাবিল, "কি স্বার্থপর!"

"আচ্ছা, কোনও দরকার নাই; বলাই! তুমি জলে নাম।"

বলাই কোমরে গামছা বাঁধিয়া জলে নামিল। জল বেশী নয়। প্রায় হাঁটু সমান।

হরিদাস। কি আশ্চর্য্য, তুমি হাঁটুজলে চার করিয়াছিলে?

বলাইচাঁদ পদ্মমৃণাল দুই হস্তে উভয় পার্শ্বে ঠেলিতে ঠেলিতে ফাতার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। হরিদাস বলিল, "নীচে হাত দিয়া দেখ। আমার সন্দেহ হ'চ্ছে,—মাছ খুলিয়া গিয়াছে। বঁড়শী পদ্মের শিকড়ে লাগিয়া আছে।"

কিন্তু বলাইচাঁদের মুখ নীলবর্ণ হইয়া উঠিল। চক্ষু উল্টাইয়া গেল।

রামতারণ ঠাকুর পাড়ে বসিয়া তাহা দেখিয়াছিল, হরিদাস দেখিতে পায় নাই; কারণ, বলাইচাঁদের মুখ পূর্ব্বদিকে। রামতারণ ঠাকুর বিকট চীৎকার করিয়া বলিল, "আপনারা আসুন, বলাই বাবু অজ্ঞান হইয়াছেন।"

হরিদাস সভয়ে ছিপের সূতা ঢিল করিয়া দিল। তাহার সন্দেহ হইয়াছিল যে, বলাইচাঁদের হাতে বঁড়শী বিদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু তাহা নহে। বলাইচাঁদ হাত বাড়াইয়া মৎস্যের অনুসন্ধান করিতেছিল, সেই সময় একটি প্রকাণ্ড গোলাকার পদার্থ তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি কামড়াইয়া ধরিয়াছিল।

সেটা প্রবীণ কচ্ছপ। তাহাকেই বলাই বাবু সসম্ভ্রমে গাঁথিয়াছিলেন! স্বভাবের গুণেই হউক, কিংবা শত্রুর গন্ধ পাইয়াই হউক, কচ্ছপপ্রবর বলাইচাঁদের অঙ্গুলি সাবাড় করিবার অভিপ্রায়ে ঘন ঘন দন্তপেষণ করিতে লাগিল।

বিজ্ঞ দীনবন্ধু ও গদাধর চট্ করিয়া তাহা বুঝিল, এবং রামতারণের সাহায্যে কচ্ছপের সহিত বলাইকে টানিয়া পাড়ে আনিল।

পথে অনেক লোক যাইতেছিল, তাহারা এই অভিনব ব্যাপার দেখিয়া দাঁড়াইয়া গেল, এবং লোকারণ্য হইয়া পড়িল।

হরিদাস 'কেস্'টা 'শক্ত' বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কচ্ছপ তখনও ছাড়ে নাই। আরও বিপদের কথা এই যে, জোড়া বঁড়শীর মধ্যে যেটা কচ্ছপের মুখে, সেটার কাঁটা বলাইয়ের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

বলাইচাঁদ বলিল, "কখনই না। আমার প্রাণ যাইবে। কচ্ছপের গলা কাট।"

পরিদর্শকগণ বলিল, "তাই ঠিক, কি বল বিজয় নাপিত ?"

নাপিত বলিল, "তাহাই উত্তম, আমার নিকট ক্ষুর আছে।"

তখন শাণিত ক্ষুরের সাহায্যে কচ্ছপের দীর্ঘ গলদেশ দ্বিখণ্ডিত হইল, কিন্তু মুখ বলাইচাঁদের অঙ্গুলি কঠিনভাবে আক্রমণপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ আঁটিয়া থাকিল।

হরিদাসের মতে, তৎক্ষণাৎ বলাইচাঁদকে ডাক্তারখানায় লইয়া যাওয়া স্থির হইল। ফরসেপ্ ও তীক্ষ্ণ বক্র ছুরিকা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না।

৫

যাত্রিগণ সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা। কেবল হরিদাস বলাইচাঁদের 'অপারেশন' হইয়া যাওয়ার পর বলাইকে নিজের বাটীতে শুশ্রূষার্থ শয়ন করাইলেন।

ক্রমে সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া বলাইচাঁদের বাটী পর্য্যন্ত পঁহুছিল। বলাইচাঁদের মাতা ও সহধর্ম্মিণী গগন ফাটাইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। হরিদাস সান্ত্বনা করিতে গেলেন।

বলাইচাঁদের মাতা। তুমি কি সর্ব্বনাশ ক'রেছ বাছা! আমার বলাইয়ের বুড়ো আঙ্গুল গেছে। ডান হাতের গো, ডান হাতের! অহহ! সে যে কেরাণী, কি ক'রে দিন চালাবে ? অহ-হ-হ।

বলাইচাঁদের স্ত্রী। উহু-হু-হু! (ক্রন্দন।)

ইত্যবসরে বলাই চলিয়া আসিয়াছিল। বলাই বলিল, "তোমরা যদি ছোট লোকের মত চ্যাঁচাও, তবে মাথা ফাটাইয়া দিব। আমার কিছু হয় নাই। গোটা আঙ্গুল বর্ত্তমান। আর রবিবারে আবার দেখ্‌তে হবে।"

শক্তির অপচয়।

শক্তির অপচয়ের ন্যায় বাজে খরচ বোধ হয় আর কিছুই নাই। টাকা কড়ি লইয়া আমরা অনেক সময় বাজে খরচ করি, কিন্তু সেই খরচটাকে প্রকারান্তরে জমার ঘরে আনিয়া ফেলা অসম্ভব হয় না। চতুর গৃহস্থ এই প্রকারেই

শক্তি জিনিসটা টাকা কড়ি নয়। তাই ঐ চাতুরী তাহার সম্বন্ধে খাটে না। একবার হাতছাড়া হইয়া গেলে শক্তিকে ঠিক্ সেই আকারে পাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে।

গাছের সুপক্ক ফলটি পাড়িবার জন্য তুমি একটু শক্তির প্রয়োগ করিয়া যে প্রস্তরখণ্ডটি ছাড়িয়া দিলে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া সেটি যখন দেওয়ালে গিয়া ধাক্কা দিল, তখন তোমার শক্তির ষোলআনাই বাজে খরচ হইয়া গেল। লোষ্ট্র ধাক্কা দিয়া দেওয়ালের একটু অংশ ভাঙ্গিয়া দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু তাপেরও সৃষ্টি করিল সত্য, কিন্তু এই সকল কাজেই এখানে শক্তির ষোল আনাই বাজে খরচ হইয়া গেল।

লোষ্ট্রাঘাতে ফল মাটীতে পড়িলে, শক্তিব্যয় সার্থক হয় বলিয়া আমরা সাধারণতঃ মনে করিয়া থাকি; কিন্তু বৈজ্ঞানিকদিগের সূক্ষ্মদৃষ্টি এখানেও শক্তির অপচয় দেখিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক বলিবেন,—ফল পাড়িবার জন্য যতটুকু শক্তি আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তি লোষ্ট্রখণ্ডে প্রয়োগ করিয়াছিলে। এই অতিরিক্ত শক্তিটাই বায়ুর ভিতর দিয়া লোষ্ট্রকে চালাইবার সময়, বাতাসকে অনাবশ্যক গরম করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শক্তির এই প্রকার অপচয় নিবারণ করিবার উপায় আছে কি? বৈজ্ঞানিকগণ এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—ফল পাড়িবার সময় বাতাসের বাধা অতিক্রম করিতে গিয়া লোষ্ট্রখণ্ড যে শক্তির অপচয় করে, তাহা নিবারণ করিবার উপায় নাই। যতদিন বায়ুর আবরণে পৃথিবী মণ্ডিত থাকিবে, এবং ভূমধ্যাকর্ষণের কার্য্য সমভাবে চলিবে, তত দিন ফল পাড়িবার দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করিলেই, শক্তির ঐরূপ অপব্যয়ও করিতে হইবে। কিন্তু এই শ্রেণীর অপব্যয় ছাড়া আরও যে কতকগুলি অপব্যয় আছে, তাহা নিতান্তই বাজে খরচ।

একটা উদাহরণ লইলে বৈজ্ঞানিকদিগের পূর্ব্বোক্ত উক্তিটির মর্ম্মবোধ হইবার সম্ভাবনা। মনে করা যাউক, আমরা ঘরে আলো জ্বালিতে যাইতেছি। এই কার্য্যের জন্য আমরা যখন দীপ জ্বালিতে চাই, তখন দীপশিখাকে কোনও প্রকারেই তাপহীন ও নির্ধূম করিতে পারি না। বলা বাহুল্য, তাপ ও ধূম অন্ধকারনাশের কোনও সহায়ই হয় না, বরং তাহার

ধোঁয়া উৎপন্ন করিতে ব্যয়িত হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—শক্তির এই প্রকার কতকগুলি অপচয়-নিবারণের উপায় আমাদেরই করতলগত রহিয়াছে। দীপাধারের আকার ও চিম্‌নীর গঠনাদি পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা তৈলের শক্তির অনেকটা আলোকে পরিণত করিতে পারি। সুতরাং প্রতিবিধানের উপায় থাকা সত্ত্বেও শক্তির এই প্রকার ব্যয়কে সম্পূর্ণ বাজে খরচই বলিতে হয়।

প্রকৃতির নানা কার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাহাদের মধ্যেও বাজে খরচ আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। সূর্য্য কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া যে শক্তি বিকীরণ করিয়া আসিতেছে, তাহার অতি সামান্য অংশই গ্রহ উপগ্রহগুলির উপর পড়িয়া সার্থক হইতেছে। প্রথম দৃষ্টিতে ইহাকে ঘোর অপব্যয় বলিয়া মনে হইবারই কথা। কিন্তু প্রকৃতির কর্ম্মক্ষেত্রের প্রসারতার কথা স্মরণ করিলে, অপব্যয়ের কথাটাকে আর মনে স্থান দিতে পারা যায় না। অনন্ত বিশ্বই প্রকৃতির কর্ম্মক্ষেত্র। যে শক্তিটিকে আমরা অপব্যয় মনে করি, প্রকৃতি তাহাকে কোনক্রমেই হারায় না। যুগযুগান্তর পরে এবং কোটী কোটী মাইল দূরে হয় ত সেই শক্তিই একদিন এক নূতন মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে। শক্তি এই প্রকার নব নব রূপ পরিগ্রহণ করে বলিয়াই প্রকৃতির প্রকৃতিত্ব প্রকাশ পায়। ক্ষুদ্র মানব সেই বিরাট শক্তির অধীশ্বরেরই মুখাপেক্ষী। করুণাময় স্বামী প্রকৃতির হাত দিয়া আমাদিগকে যে একটু শক্তিকণিকা দান করেন, তাহাকে আমাদের সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রের গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রাখিয়া কাজ আদায় করিতে না পারিলেই সম্পূর্ণ ক্ষতি। একবার সেই নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলে, শক্তিকণাটিকে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না।

ইংরাজ পণ্ডিত সার্ উইলিয়ম্ র‍্যামজে (Sir William Ramsay) আধুনিক রসায়ন-তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে আজকাল অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি এই বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত অধুনাতন সুসভ্য মানবসমাজের একটা বৃহৎ বাজে খরচের উপর জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইনি বলিতেছেন, জাতির পরমায়ু কেবল সেই জাতির অন্তর্গত লোকের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। আমরা নানা বাহিরের জিনিসকে জাতীয়তার মধ্যে টানিয়া আনিয়া জাতীয় জীবনকে এমন সঙ্কটাপন্ন করিয়া

হইয়া পড়ে। গ্রীক্ ও রোমান্ সম্রাজ্য জাতিগত যোগ্যতার উপর নির্ভর করিয়াই গৌরবান্বিত হইয়াছিল, এবং সেই সকল যোগ্যতার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছিল। এখনকার জাতিগুলিকে বাহিরের প্রাকৃতিক শক্তিই রসপ্রদান করিয়া জীবিত রাখে। প্রকৃতির সুদৃষ্টিপাতে যে জাতির খাদ্যের অভাব নাই, এবং যাহারা কয়লা, তৈল প্রভৃতির জন্য পরমুখাপেক্ষী হয় না, আধুনিক যুগে তাহারাই দীর্ঘায়ু হয়। শক্তির ক্ষয় নাই সত্য, কিন্তু আমাদের প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য যে শক্তিটুকু ভোজ্য ও ইন্ধনের আকারে আমাদের করায়ত্ত হইতেছে, তাহা নিতান্তই মুষ্টিমেয়। সুতরাং সেই সকল প্রাকৃতিক দানগুলিকে নিয়মিতভাবে ব্যয় না করিলে, ভবিষ্যতে একদিন সঙ্কটে পড়িতেই হইবে।

অধ্যাপক র‍্যামজে আজকালকার নিত্যব্যবহার্য্য কয়লার উদাহরণ লইয়া ভবিষ্য-সঙ্কটের কথাটি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কয়লা জিনিসটা আধুনিক সভ্যতার একটা প্রধান উপকরণ। যে সকল কলকারখানার উপর সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, এই কয়লাই তাহাদের খোরাক যোগাইতেছে। অথচ কয়লার ভাণ্ডার সসীম। আজকাল প্রতি বৎসর যে পরিমাণ কয়লার খরচ হইতেছে, তাহা লইয়া হিসাব করিলে দেখা যায়, পাঁচ শত বৎসর পরে ইংলণ্ডের ন্যায় কয়লাপ্রধান দেশেও আকরিক কয়লা দুর্ল্লভ হইয়া পড়িবে। ভবিষ্যৎবংশীয়দিগের জীবনযাত্রা যাহাতে সহজ হয়, তাহার ব্যবস্থা বিধান মানব-সমাজের একটা প্রধান কর্ত্তব্য। আধুনিক সমাজ কয়লার অপব্যবহার করিয়া সেই কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে।

কয়লা নিঃশেষিত হইলে জলপ্রপাত ও পার্ব্বত্য নদীর স্রোতের শক্তিকে শৃঙ্খলিত করিয়া সংসারে কাজ চালানো যাইবে ভাবিয়া অনেকে নিশ্চিন্তমনে অনাবশ্যক কয়লা পোড়াইয়া থাকেন। র‍্যামজে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, জলের শক্তি কখনই কয়লার স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। সমগ্র য়ুরোপখণ্ডের নদনদী ও জলপ্রপাতগুলির শক্তি একত্রিত করিলে কেবলমাত্র কুড়ি লক্ষ 'হর্স-পাওয়ারে'র * (Horse power) শক্তি পাওয়া যায়, অথচ এক ইংলণ্ডের কল-কারখানাগুলির জন্যই দশ কোটী হর্স-পাও-

---

* সাড়ে ষোল হাজার সের ওজনের জিনিসকে এক মিনিট সময় এক ফুট উঁচু করিয়া

য়ার আবশ্যক হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, য়ুরোপের সমবেত জলশক্তি ইংলণ্ডের জন্য আবশ্যক কয়লার শক্তির পাঁচ ভাগের এক ভাগও পূর্ণ করিতে পারিবে না।

তারহীন বার্ত্তাবহযন্ত্র, নূতন ব্যোমযান উদ্ভাবিত হওয়ায়, এবং রেডিয়ম্ ধাতুর অদ্ভুত গুণগুলির সহিত পরিচয় লাভ করায়, বৈজ্ঞানিক সাধারণের মধ্যে আজকাল একপ্রকার মত্ততা আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাঁরা বলিতেছেন, কয়লা নিঃশেষ হইতে এখনও পাঁচ শত বৎসর লাগিবে। এই দীর্ঘকালে ভবিষ্য-বৈজ্ঞানিকগণ নিশ্চয়ই কয়লার শক্তির স্থানে কোনও এক নূতন শক্তিকে বসাইতে পারিবেন। অধ্যাপক র‍্যামজে বৈজ্ঞানিকদিগের এই বিশ্বাসকে ঘোর কুসংস্কার আখ্যা দিয়া, শীঘ্রই ইহাকে বর্জ্জন করিবার পরামর্শ দিতেছেন। প্রকৃতির শক্তিসম্পদ্ যে সকল রূপান্তর গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের বৈচিত্র্য সাধন করিতেছে, তাহার এক বৃহৎ অংশ লোকলোকান্তরের কোথাও সুপ্তাবস্থায় আছে কি না, তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। সুতরাং যাঁহারা হঠাৎ একদিন সুপ্ত শক্তির উদ্বোধন দেখিবার জন্য আশা করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে নিরাশ হইতেই হইবে। কোটী যোজন দূরবর্ত্তী কোনও নক্ষত্রলোকের সুপ্তশক্তি জাগিয়া উঠিয়া কখনই আমাদের কারখানার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইবে না।

চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রের প্রত্যেক অংশে প্রতিদিনই জলোচ্ছ্বাস হইয়া থাকে। কোনও প্রকারে এই জোয়ার-ভাঁটার শক্তিকে শৃঙ্খলিত করিতে পারিলে আমাদের কলকারখানায় এক নবশক্তির যোজনা করা যাইবে, এই ভাবিয়া অনেকে আশান্বিত হইয়া রহিয়াছেন। অধ্যাপক র‍্যামজে এই শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদিগকেও সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সমুদ্রে কল পাতিয়া জোয়ার-ভাঁটার শক্তিকে ধরিতে গেলে, বা সূর্য্যকিরণের তাপকে পুঞ্জীভূত করিয়া কাজে লাগাইবার জন্য যন্ত্র খাড়া করিলে, ঝটিকাক্ষুব্ধ সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত ও প্রবল বায়ুর ধাক্কা সহ্য করিয়া সেগুলি কখনই কার্য্যোপযোগী থাকিবে না।

পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশের তুলনায় ভূগর্ভের গভীর প্রদেশ অদ্যাপি অত্যন্ত উষ্ণাবস্থায় আছে। আগ্নেয়গিরির অগ্নি-উদ্গিরণ ও উষ্ণপ্রস্রবণ প্রভৃতি দ্বারা সেই তাপের পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েক জন পণ্ডিত আশা দিয়াছেন, এই ভূগর্ভসঞ্চিত তাপকে ভবিষ্যতে কয়লার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে

পারে। অধ্যাপক র‍্যামজে এই আশ্বাসবাণীর আলোচনা করিয়া ভূগর্ভের তাপকেই একমাত্র আহরণযোগ্য শক্তি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভূপৃষ্ঠ হইতে ভূগর্ভের গভীর প্রদেশ পর্য্যন্ত গর্ত্ত খুঁড়িলে হয় ত ফুটন্ত জল পাওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু কেবল এই একমাত্র অনিশ্চিত ও অপরীক্ষিত ব্যাপারের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার জন্য পরামর্শ দিতে তিনি সাহসী হইতেছেন না।

জলীয়-বাষ্পচালিত কল দিয়া কোনও কাজ করাইতে হইলে যে পরিমাণ তাপ আবশ্যক হয়, সেই কাজই আধুনিক গ্যাস্-এন্‌জিন্ দ্বারা করাইতে গেলে কেবল তিন ভাগের এক ভাগ তাপের আবশ্যক হয়। সুতরাং জলীয়-বাষ্পচালিত কলে গ্যাস-চালিত কল অপেক্ষা তিন গুণ অধিক কয়লা না পোড়াইলে কাজ পাওয়া যায় না। অধ্যাপক র‍্যামজে এই ব্যাপারটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কলিয়া জলীয়-বাষ্পচালিত কলের স্থানে গ্যাস্-এন্‌জিন্ চালাইবার পরামর্শ দিতেছেন।

আধুনিক সভ্যতার আড়ম্বর রক্ষা করিবার জন্য কয়লার খনি যেমন শূন্য হইয়া আসিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকা আমেরিকার বৃহৎ অরণ্যগুলিও লোপ পাইতেছে। অরণ্যগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিতে পারিলে, অঙ্গারের ভাণ্ডার শূন্য হইলে কাষ্ঠের দ্বারা অনেক কাজ চালাইতে পারা যাইত। অধ্যাপক র‍্যামজে দেশনায়কদিগকে ইহার প্রতিও দৃষ্টিপাত করিতে বলিতেছেন। পৃথিবীর যে সকল স্থান এখন শূন্য পড়িয়া আছে, সেখানে নূতন করিয়া অরণ্য প্রস্তুত করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে যে কেবল কয়লার অভাব মোচিত হইবে, তাহা নয়। নূতন অরণ্যে অনুর্ব্বর ভূমি সরস ও শস্যপ্রসূ হইয়া পড়িবে, এবং মেঘ কালবর্ষী হইয়া ধরণীকে আবার প্রাচীনকালের ন্যায় শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিবে।

কালনেমির আবর্ত্তনে বাধা দেওয়া মনুষ্যের সাধ্যাতীত। বিধাতা যে কঠোর নিয়মে জন্ম-মৃত্যু ও সৃষ্টি-লয়ের চালনা করিতেছেন, তাহা চিরদিনই অমোঘ থাকিবে। সুতরাং দূর ভবিষ্যতে যে পৃথিবীর এই মূর্ত্তি থাকিবে না, তাহা সুনিশ্চিত। এমন একদিন নিশ্চয়ই আসিবে, যখন লণ্ডন ও নিউ-ইয়র্কের ন্যায় বড় সহরগুলি পূর্ব্বসমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ বক্ষে ধরিয়া, সহস্রাধিক অধিবাসীরও আহার্য্য যোগাইতে পারিবে না। আধুনিক সভ্যতার অপব্যয়-গুলি যাহাতে এই প্রকার দূরবর্ত্তী অস্পষ্ট বিভীষিকাগুলিকে শীঘ্রই মূর্ত্তিমান ও বাস্তব করিয়া তোলে, তাহার উপায়-উদ্ভাবন আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

রামায়ণের সমাজ।

অন্ত্যেষ্টি প্রভৃতি।

হিন্দুর মৃতদেহের অগ্নিসংকার বিধি ও প্রেতের উদ্দেশে যে সকল বিধি ব্যবস্থা আধুনিক কালে প্রবর্ত্তিত আছে—রামায়ণের যুগেও তাহার অনেক-গুলি অনুষ্ঠিত হইত। আমরা অনার্য্য সমাজের মৃতদেহের সংকার পদ্ধতি সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি; এইবার আর্য্য সমাজের রীতি পদ্ধতির আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

মৃতদেহ-রক্ষা।

বৃদ্ধ রাজা দশরথ মৃত্যু মুখে পতিত হইয়াছেন। উপযুক্ত পুত্রগণ পিতার মৃত্যুর সময় অযোধ্যায় উপস্থিত নাই।—রাম লক্ষ্মণ বনে গিয়াছেন, ভরত ও শত্রুঘ্ন রাজগৃহে। সুতরাং ভরতের আগমনপ্রতীক্ষায় রাজ-দেহ বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত হইল। এই ব্যবস্থা তখন বিধিবিরুদ্ধ বা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া কেহ উল্লেখ করেন নাই; এমন কি, দশ রাত্রি পরে ভরত মাতুলালয় হইতে আসিয়াও পিতৃদেহের এইরূপ ব্যবস্থার জন্য কোনও প্রকার পরিতাপ করিলেন না। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুসমাজে এ প্রথা প্রচলিত নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজে এই নিয়মের প্রসার বর্দ্ধিত হইয়াছে।

অগ্নিসংকার-বিধি।

পিতার মৃত্যুর দশ দিবস পরে ভরত মাতুলালয় হইতে আসিলে রাজার মৃতদেহ তৈলদ্রোণী হইতে তুলিয়া বিবিধরত্নখচিত উৎকৃষ্ট শয্যায় স্থাপিত হইল। তখন মহারাজের অগ্নিহোত্রাগার হইতে আনীত অগ্নি দ্বারা ঋত্বিক ও যাজকগণ যথাবিধি হোম করিলেন। অনন্তর রাজ-পরিচারকগণ মৃত মহীপতির দেহ শিবিকা-মধ্যে স্থাপিত করিয়া তাহা বহন করিয়া সরযূতীরে (শ্মশানে) লইয়া চলিল। বহুসংখ্যক লোক শিবিকার অগ্রে অগ্রে রাজপথে সুবর্ণ, মণি, মুক্তা ও বস্ত্র ছড়াইয়া যাইতে লাগিল। অপর কয়েক ব্যক্তি সরল, পদ্মক, দেবদারু, চন্দন, অগুরু, গুগ্গুল ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিল। অনন্তর ঋত্বিকেরা [illegible] লইয়া রাজা দশরথের শব ঐ চিতায় স্থাপন করাইলেন এবং

অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়া তৎকালোচিত মন্ত্র পাঠ করিলেন। তখন সামজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সামগান করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীগণ ঋত্বিকগণের সহিত রাজ-দেহ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। চিতা জ্বলিতে লাগিল।

দশরথের চিতা জ্বলিতে থাকুক, আমরা ইত্যবসরে হুইলারের অদ্ভুত রামায়ণ হইতে এ সম্বন্ধে কতিপয় পংক্তি পাঠকগণের বিচারের জন্য উপস্থিত করি।

হুইলার লিখিয়াছেন,—"ব্রাহ্মণগণ চিতা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বিবিধ দ্রব্য প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একটি উৎসর্গীকৃত পশু গ্রহণ করিলেন, এবং তাহাকে হত্যা করিয়া চিতার উপর নিক্ষেপ করিলেন। তৎপর রাজদেহের চারি দিকে অন্ন নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা চিতাভূমির চতুর্দ্দিকে একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিলেন, এবং সবৎসা গাভী নিক্ষেপ করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘৃত, তৈল ও মাংস প্রদান করিতে লাগিলেন।" *

রামায়ণের কোন স্থান হইতে হুইলার এই অদ্ভুত তত্ত্বের আবিষ্কার করিলেন, আমরা তাহা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারিলাম না। হুইলার এই পশুহত্যার বিবরণ প্রদান করিবার পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"The description of these ceremonies is very interesting, as it evedently refers to an ancient period in Hindu History, when animal sacrefies were still largely in vogue." আমরা হুইলারের এই বিসদৃশ মন্তব্যের কোনও মতেই সমর্থন করিতে পারিলাম না।

হুইলার রামায়ণকে বৌদ্ধবিপ্লবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং বৌদ্ধযুগের অহিংসা ধর্ম্মের পর, আঘাতের প্রতিঘাতের বিরুদ্ধ ফল পশুহিংসা ও পশুহননের পূর্ণ চিত্র দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিতে গিয়া তিনি এই অদ্ভুত তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন।

---

* * And they took a purified beast, which had been consecrated by the proper formulas, and slew it and threw it on the funeral pile. And then threw boiled rice on all sides of the royal body and they made a furrow round about the place where the pile was erected according to the ordinance; and they offered the cow with her calf, and scattered ghee, oil and flesh on all sides"—Ramayana, Page 174.

তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী মন্তব্য অপেক্ষা পরবর্ত্তী মন্তব্য আরও অদ্ভুত! তিনি অধ্যায়শেষে এই পশুহনন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;—"The Sacrifice of a cow and her calf probably for the purpose of feasting, is an ancient rite which has long fallen into disuse."

রামায়ণের কোনও স্থানেই গো-হত্যার উল্লেখ নাই! অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব-পীড়নের কথা আদিকাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মৃগয়া ব্যতীত অন্যত্র পশুহনন বা পশু বলিদানের ব্যবস্থা আর্য্য-ভারতে প্রচলিত ছিল, রামায়ণে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। উত্তরকাণ্ডে লঙ্কার অনার্য্যসমাজে গো-মেধ ও রামের গো-সব যজ্ঞ-সম্পাদনের গল্প আছে। আমাদের বিশ্বাস, উত্তরকাণ্ড পরবর্ত্তী কালের রচনা।

হুইলার যাহা মনে মনে কল্পনা করিয়াছেন, তাহাই 'যেন তেন' সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার আর একটি সিদ্ধান্ত এই যে, ভারতীয় হিন্দুরা আমোদ প্রমোদেও গোহত্যা করিত! এই অপসিদ্ধান্তের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যে স্থানেই গো শব্দের উল্লেখ দেখিয়াছেন, সেই স্থানেই স্বীয় অদ্ভুত গবেষণার সমর্থনে ও 'Probbaly' শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাচীন ঋষিদিগের সপিণ্ডীকরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রামায়ণের যুগে বিবাহকালে গোদানের ব্যবস্থা ছিল; আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি। এই গো-দানের উল্লেখ করিয়াও হুইলার লিখিয়াছেন,—"At marriage ceremonies a cow and her calf are still present, and *probably* in ancient times were sacrefied for the purpose of an entertainment.

কি অদ্ভুত 'probably'!

হুইলারের প্রসঙ্গে আমরা আলোচ্য বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এইবার প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

তর্পণ ও অশৌচ।

মৃতদেহের অগ্নিসংকার হইলে রাজমহিষীরা ভরতের সহিত সরযূ-জলে প্রেতোদ্দেশে তর্পণ করিলেন। তর্পণের পর ভরত মন্ত্রী ও পুরোহিতদিগের সহিত পুরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন ও নানা কঠোর নিয়ম পালন করিয়া দশাহ অতিবাহিত করিলেন। (অযোধ্যা—৭৬ সর্গ।)

শ্রাদ্ধ।

মৃতদেহ-সংকারের পর দশ দিবস অতীত হইলে একাদশ দিবসে রাজকুমার ভরত কৃতশৌচ হইয়া পরদিবস (দ্বাদশ দিবসে) ঋত্বিকগণ দ্বারা শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

অস্থি-সংগ্রহ।

অনন্তর মৃতের পারত্রিক মঙ্গলার্থ ভরত ব্রাহ্মণদিগকে প্রচুর অন্ন, ধন, রত্ন, রজত, ছাগ, গো, দাস, দাসী ও গৃহ দান করিয়া ত্রয়োদশ দিবসে চিতাভস্ম হইতে উন্মোচন করিয়া চিতাশোধন করিলেন। (অযোধ্যা—৭৭ সর্গ।)

অষ্টকা ও পিণ্ডদান।

প্রেতের উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদানের প্রথাও তৎকালে আর্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল। অযোধ্যাকাণ্ডের অষ্টাধিকশততম সর্গে অষ্টকাশ্রাদ্ধের উল্লেখ আছে।

রাম চিত্রকূটে অবস্থানকালে পিতৃবিয়োগসংবাদ শ্রবণ করিয়া ইঙ্গুদী ফল দ্বারা প্রেতের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন। (অযোধ্যা, ১০৩ সর্গ।)

অগ্রায়ণ।

হেমন্ত ঋতুতে নবান্নভোজনের প্রাক্কালে নব শস্য দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়া পরে নবান্নভোজনের নিয়ম রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়।

(অরণ্য—১৬শ সর্গ।)

এই নবান্ন যজ্ঞ রামায়ণে অগ্রায়ণ নামে অভিহিত হইয়াছে। অগ্র—অয়নে অনুষ্ঠেয় বলিয়াই ইহা অগ্রায়ণ নামে অভিহিত।

বাস্তু-শান্তি।

বাস্তু-শান্তি বা গৃহপ্রতিষ্ঠার রীতি তৎকালেও প্রচলিত ছিল। রাম চিত্রকূটে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বিধিবিহিত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (আরণ্য—১৫শ সর্গ।)

পূজা—স্বস্ত্যয়ন ও মানসিক।

দেবগণের উদ্দেশে পূজা অতি প্রাচীন কাল হইতে সমাজে প্রচলিত। এই পূজা প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। রামায়ণে এই দেবোদ্দেশে প্রার্থনা স্বস্ত্যয়ন, মানসিক, উপাসনা, পূজা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। তখনও এই সকল পূজার জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না। রাম নিজেই বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া সংযম ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

কৌশল্যাও নিজেই বিষ্ণুপূজা করিয়াছিলেন। কৌশল্যা ও ভরদ্বাজ রামের জন্য স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলেন। বালির স্ত্রী তারা বালির জয়শ্রীলাভের জন্য নিজেই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া স্বস্ত্যয়ন করিয়াছিলেন। (কিষ্কি—১৬ সর্গ।) তখন ব্রাহ্মণ দ্বারাও স্বস্ত্যয়ন করাইবার রীতি ছিল। কৌশল্যা ব্রাহ্মণ দ্বারা রামের জন্য স্বস্তিবাচন করাইয়াছিলেন। সীতা গঙ্গা ও যমুনা নদী পার হইবার সময় কায়মনে গঙ্গা ও যমুনাকে প্রণাম করিয়া মানসিক করিয়াছিলেন। সীতা মানসিক করিয়াছিলেন—হে গঙ্গে! হে যমুনে! যদি আমরা মঙ্গলে মঙ্গলে ফিরিয়া আসিতে পারি—তবে আমি সহস্র গো, সহস্র কলস সুরা ও বিবিধ বস্ত্র দ্বারা আপনাদিগের পূজা দিব। (অযোধ্যা—৫২ ও ৫৫ সর্গ।) তখন দেবালয়ে দেবোদ্দেশে পূজা হইত। বিবাহের পর সীতাকে দেবালয়ে লইয়া গিয়া পূজা করান হইয়াছিল। পুরোহিত কর্ত্তৃক দেবপূজার প্রথা পরবর্ত্তী কালে প্রচলিত হইয়াছে।

বৃক্ষপূজা।

তখন নদী ও বৃক্ষবিশেষের পূজা প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অতি আদিম কালেও প্রচলিত ছিল। আদিম কালে যাহা কিছু বিশাল বলিয়া প্রতীত ও প্রত্যক্ষ হইত, তাহাকেই আদিম মানবগণ ভক্তিভাবে পূজা করিত। ইহা হইতেই পর্ব্বত, নদী, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ প্রভৃতির পূজা মানবসমাজে প্রচলিত হইয়াছে। রামায়ণেও এই জড় বস্তুর প্রতি ভক্তি ও সম্ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। রামায়ণে বৃক্ষ ও নদী-পূজার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। শ্যাম নামক বট বৃক্ষ তখন জনগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইত। ভরদ্বাজের উপদেশে সীতাও শ্যাম বটকে ভক্তিভাবে অভিবাদন করিয়াছিলেন। (অযো—১৫ সর্গ।) অযোধ্যায় বহু চৈত্যবৃক্ষ ছিল। নাগরিকগণ ভক্তির সহিত ঐ সকল চৈত্যবৃক্ষের পূজা করিত।

প্রত্যুপবেশন ও প্রায়োপবেশন।

কার্য্যোদ্ধারের জন্য 'ধরণা' দিবার রীতিও তখন প্রচলিত ছিল। ঐ প্রথার নাম প্রত্যুবেশন। প্রত্যুবেশনে ক্ষত্রিয়ের অধিকার ছিল না। ইহা কেবল ব্রাহ্মণেরাই করিতেন। ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া শেষে প্রত্যুবেশন করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে ক্ষত্রিয়ের অধিকার নাই বলিয়া রাম নিষেধ করেন; তখন ভরত তাহা হইতে

নাম প্রায়োপবেশন। অঙ্গদ প্রভৃতি বানরেরা সীতার অনুসন্ধানে বিফল-মনোরথ হইয়া সুগ্রীবের ভয়ে জীবনত্যাগের জন্য প্রায়োপবেশন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে এই প্রায়োপবেশনকে আত্মহত্যার পর্য্যায়-ভুক্ত করা যায়। কিন্তু তৎকালে তাহা দূষণীয় ছিল না।

যজ্ঞ।

দেবপূজা হইতে ক্রমে যজ্ঞের সৃষ্টি হইয়াছে। যজ্ঞ ক্রমে বহু নামে সমাজে প্রচলিত হইতেছিল। রামায়ণের যুগে আর্য্য, অনার্য্য, উভয় সমাজেই যজ্ঞের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণে নিম্নলিখিত যজ্ঞগুলির উল্লেখ দৃষ্ট হয়।—

রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞে অগ্নিষ্টোম, উক্থ্, অতিরাত্র, জ্যোতিষ্টোম, আয়ুষ্টোম, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও আপ্তোর্য্যাম প্রভৃতি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। (আদি—১৪ সর্গ।) দশরথ ও কুশনাভ পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিয়াছিলেন। (আদি—১৩ ও ১৪ সর্গ।) বশিষ্ঠ সবনার সাহায্যে স্বাহার ও বষট্কার সাধ্য বিবিধ যাগযজ্ঞ এবং দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ সাধন করিতেন। (আদি—৫৩।) রাম রাজা হইয়া বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞ করেন। ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে গোমেধ, রাজসূয়, বৈষ্ণব, মাহেশ্বর প্রভৃতি সাতটি যজ্ঞ করেন। (উত্তর—২৫।) দক্ষিণাত্যের বানরসমাজে যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের কোনও উল্লেখ নাই।

বলি।

তখন যাগ, যজ্ঞ, হোম প্রভৃতির সহিত বলির ব্যবস্থা ছিল। সে বলি পশুবলি নহে। রাম বাস্তু-শান্তি উপলক্ষে বৈশ্বদেব, বৈষ্ণব ও রৌদ্র বলি দান করিয়া-ছিলেন। কৌশল্যা রামের মঙ্গলকামনা করিয়া যে যাগ করাইয়াছিলেন, তাহাতে বাহ্য বলি প্রদান করিয়াছিলেন। রামায়ণে নরবলির উল্লেখ আছে। রাজা অম্বরীশের যজ্ঞে নরবলি প্রদত্ত হইয়াছিল। (আদি—৬২।) ইহা রামায়ণের যুগের বহু পূর্ব্বের ঘটনা বলিয়া বর্ণিত। *

স্তব-স্তোত্র।

রামায়ণে স্তবস্তোত্রের উল্লেখ আছে। তখনও সকল দেবতার স্তোত্র সমাজে প্রচলিত হয় নাই। লঙ্কাকাণ্ডের ১১৬ সর্গে 'আদিত্যহৃদয়' নামক সূর্য্য-

* পাতালবাসী মহীরাবণ নরবলি দিবার জন্য রাম লক্ষ্মণকে অপহরণ করিয়াছিলেন বলিয়া যে গল্প কৃত্তিবাস-প্রণীত রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার উল্লেখ আর্য রামায়ণে নাই

স্তবের উল্লেখ আছে। আদি কাণ্ডের ৬২ সর্গে অগ্নি, ইন্দ্র ও বিষ্ণুস্তোত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্ম, সূর্য্য, অগ্নি ও ইন্দ্র ঋষিযুগ হইতেই আর্য্য-ভারতে পূজা পাইয়া আসিতেছিলেন। রামায়ণে বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা রামায়ণ যুগের চিত্র নহে। শিবস্তোত্র ও শিবমাহাত্ম্য রামায়ণের প্রথম ৬ কাণ্ডে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

মূর্ত্তিপূজা।

বিষ্ণুপূজা ও শিবপূজা রামায়ণের যুগে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বিষ্ণুমাহাত্ম্য ও বিষ্ণুস্তোত্র রামায়ণে 'প্রক্ষিপ্ত' বলিয়াই মনে হয়। শিবস্তোত্র ও শিবপূজার উল্লেখ প্রথম ছয় কাণ্ডে নাই। উত্তরাকাণ্ডে আছে। উত্তরাকাণ্ডে লিঙ্গপূজার উল্লেখ আছে। রাবণ নর্ম্মদাতীরে স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ স্থাপিত করিয়া চন্দন ও পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন। (উত্তরা—৩৬ সর্গ, ৪২।৪৩ শ্লোক।)

রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড লিখিত হইবার সময় ভারতে তান্ত্রিক যুগের সম্যক প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সুতরাং এই কাণ্ডের বর্ণিত চিত্র রামায়ণের সমসাময়িক চিত্র নহে। পুরাণাদিতে রামের যে দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে, বঙ্গীয় কবি কৃত্তিবাস প্রভৃতি তাহারই অনুসরণে মূর্ত্তিপূজার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কোনও কোনও রামায়ণে মূর্ত্তিপূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রাম· সেতুবন্ধনের পূর্ব্বে তথায় রামেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

"সেতুমারভ্যমানস্তু তত্র রামেশ্বরং শিবম্।
সংস্থাপ্য পূজয়িত্বাহ রামো লোকহিতায় চ॥"

বঙ্গীয় রামায়ণে এই পূজার উল্লেখ নাই।

দেবগণ।

রামায়ণে তেত্রিশ দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাই। দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয় এই তেত্রিশ দেবতা। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির ন্যায় দেবসংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা স্বাভাবিক। এখন দেবসংখ্যা তেত্রিশ কোটী। রামায়ণে প্রথম ৬ কাণ্ডে ব্রহ্মা, প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, সোম, যম, অগ্নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বরুণ, বায়ু ও মারুতগণের বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিবিধ গল্পচ্ছলে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় মহাদেব, হর, কাম, ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত, অনন্ত নাগ, দেববৈদ্য ধন্বন্তরি, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা ও তৎপুত্র বিশ্বরূপের উল্লেখ আছে। ভগ, ধাতা, বিধাতা, ধর্ম্ম, কাল, সাধ্য,

দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত দেবগণের কেহ কেহ ঋষিসমাজ কর্ত্তৃক সম্মানিত ও পূজিত হইতেন। ইঁহাদের সকলের পূজা ঋষিসমাজেও প্রচলিত ছিল না।

গার্হস্থ সমাজে ইহাঁদের কাহারও পূজা তখন প্রচলিত হয় নাই; সাধারণে তখনও ইঁহাদের স্বাতন্ত্র্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহাদিগের অস্তিত্ব লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত, প্রয়োজনে তাঁহারই নাম করিত। যেমন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, আকাশ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত তেত্রিশ দেবতা, গৃহদেবতা, বনদেবতা প্রভৃতি নামেও লোকে দেবতার নাম গ্রহণ করিত। কিন্তু রামায়ণের কোনও স্থলেই কাহাকেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এই ত্রিদেবতার নাম করিতে দেখা যায় না।

কৈকেয়ী রাজা দশরথকে প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করিয়া দেবতাদিগকে সাক্ষী করিতেছেন। কৈকেয়ী বলিতেছেন,—

তচ্ছৃণ্বন্তু ত্রয়স্ত্রিংশদ্দেবাঃ সেন্দ্রপুরোগমাঃ॥ ১৩
চন্দ্রাদিত্যৌ নভশ্চৈব গ্রহরাত্র্যহনী দিশঃ।
জগচ্চ পৃথিবী চেয়ং সগন্ধর্ব্বা সরাক্ষসা॥ ১৪
নিশাচরাণি ভূতানি গৃহেষু গৃহদেবতাঃ।
যানি চান্যানি ভূতানি জানীয়ুর্ভাষিতং তব॥ ১৫
সত্যসন্ধো মহাতেজা ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যবাক্ শুচিঃ।
বরং মম দদাত্যেষ সর্ব্বে শৃণ্বন্তু দৈবতাঃ॥ ১৬—অযোধ্যা; ১১শ।

"ইন্দ্র প্রভৃতি তেত্রিশ দেবতা শ্রবণ করুন, চন্দ্র, সূর্য্য, নভোমণ্ডল, গ্রহ, দিক, জগৎ, পৃথিবী, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, নিশাচর প্রাণী, গৃহদেবতা, অন্যান্য দেবতা সকলে অবগত হউন, এই সত্যসন্ধ ধর্ম্মজ্ঞ মহীপতি দশরথ আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন।"

কৈকেয়ী সকলকেই সাক্ষী মান্য করিলেন, কিন্তু আদিদেবত্রয়,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের নাম তিনি উচ্চারণ করিলেন না কেন?

অন্যত্র, কৌশল্যা রামকে বনগমনকালে বিদায় দিতেছেন। তিনি সকল দেবতার নিকট কায়মনোবাক্যে রামের কুশল ভিক্ষা করিয়া বলিতেছেন,— "মহেন্দ্র প্রভৃতি লোকপালগণ, বিশ্বদেব, সাধ্যগণ, ধাতা, বিধাতা, মরুৎ, মহর্ষি পূষা, ভগ, অর্য্যমা, ঋতু, দ্বাদশ মাস, সংবৎসর, দিন, রজনী, মুহূর্ত্ত, নক্ষত্র

পুত্র! শ্রুতি, স্মৃতি, ধর্ম্ম, ভগবান স্কন্দদেব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বৃহস্পতি, নারদ, সপ্ত ঋষি ও দিকপালদিগের সহিত দিক সকল তোমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন। পুত্র! আমি চল ও অচল, বায়ু, কুবের, বরুণ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ এবং সমুদ্র ও পর্ব্বত সকলকে স্তব করিলাম, ইঁহারা তোমাকে নিয়ত রক্ষা করুন। দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা তোমায় রক্ষক হউন। কলা ও কাষ্ঠা তোমার কল্যাণবিধান করুন। * * পৃথিবী ও অন্তরীক্ষচারী প্রাণী, সমগ্র দেবতা এবং তোমার শত্রুবর্গ হইতে তোমার মঙ্গল হউক। রাম! শুক্র, সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের ও যম, আমি ইঁহাদিগকে অর্চ্চনা করিলাম। রঘুশ্রেষ্ঠ! অগ্নি, বায়ু, ধূম এবং মহর্ষিগণমুখনির্গত মন্ত্র সকল স্নানকালে তোমাকে রক্ষা করুন। রাম, সর্ব্বলোকপ্রভু! সর্ব্বলোকস্রষ্টা এবং অপরাপর দেব ও ঋষিগণ বনবাসে তোমার রক্ষক হউন।" (বঙ্গবাসী ; অযো—২৫ সর্গ।)

কৌশল্যার এই সুদীর্ঘ প্রার্থনাতেও আমাদের আধুনিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা-দ্বয়ের নাম নাই। এমন কি, যে বিষ্ণুপূজা কৌশল্যা নিজে করিতেন বলিয়া রামায়ণের পাঁচ সর্গ পূর্ব্বে (বিংশ সর্গে) উল্লেখ দেখা যায়, কৌশল্যা সেই উপাস্য দেবতার নাম করিলেন না! ইহা বিশেষ চিন্তনীয়। বর্ত্তমানে আমরা ইহাই বলিব যে, রামায়ণের যুগে বিষ্ণু ও শিবের পূজা প্রচলিত হয় নাই। কৌশল্যা ও রামের বিষ্ণুপূজার উল্লেখ ও রামকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রচার করিবার চেষ্টা পরবর্ত্তী বিষ্ণুপ্রাধান্যসময়ে কোনও বিষ্ণুভক্ত কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ও রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত ও স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে। শিবপ্রসঙ্গ-গুলিও কোনও শিবভক্ত কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী সময়ে রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। ব্রহ্মা প্রজাপতি বলিয়া প্রাচীনকাল হইতেই যজ্ঞাংশ প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছেন বটে, কিন্তু তিনিও সমাজে বিশেষ পূজা পান নাই।

অযোধ্যা প্রদেশের প্রচলিত রামায়ণে ষষ্ঠীদেবীও স্থান পাইয়াছেন। বোম্বাই ও বঙ্গীয় সংস্করণে ষষ্ঠী দেবীর ও অন্যান্য দেব-দেবীর এখনও আবির্ভাব হয় নাই। এই সকল ক্ষুদ্র দেবদেবী পৌরাণিক যুগের পরবর্ত্তী কাল হইতে সমাজে পূজা পাইতেছেন,—ইহা বলাই বাহুল্য।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

মেঘালোকে।

যখন মেঘের মদির মধুর মায়াতে
দীপ্ত দিবস দশ দিকে আসে মুদিয়া,
নবনীল ছায়া ঘনায় কানন-কায়াতে,
রাখে দিগ্বধূ দ্যুলোক-দুয়ার রুধিয়া ;
সহসা মেঘের মহা মৃদঙ্গ-মন্দ্রে
গহনে গগনে বীণাবেণু উঠে বাজিয়া !
ছন্দে ছন্দে ঝঙ্কৃত শত তন্ত্রে
মেঘসোহাগিনী রাগিণী বেড়ায় নাচিয়া !
ইন্দ্রধনুতে ইন্দুমালিকা গাঁথিয়া,
মুকুতা-মৌলী শিখী খেলে সুখে মাতিয়া !

চকিত ভৃঙ্গ মঞ্জু মালতী-মুকুলে,
স্তব্ধ পাখীর সুধা-সঙ্গীত-লহরী,
পল্লীর পথে নবঘননীল দুকূলে
সরম-মুদিতা বধূ উঠে ভয়ে শিহরি' !
ঝর-ঝর ধারা—মর-মর তরু লতিকা,
আকুলকণ্ঠে ডাহুক ফুকারে সরসে,
মৃগমদবাসে পুষ্পিত নীপ-বীথিকা,
স্মিত তরুদল কামিনীকুসুম-বরষে !
স্থলকমলের করুণ কোমল নয়নে
অমিয়-হাসিটি বিকশে নবীন স্বপনে !

বেণু-বন-বেণী বিধূত মত্ত পবনে,
তাল-তরু-রাজি অটল শ্যামল ছত্রে,
বেদনাবিধুর কে কাঁদে আঁধার গগনে,
অশ্রু মুকুতা ঠিকরে কমলপত্রে !
কার কণ্ঠের কুন্দ-কুসুম-মালিকা,
বলাকার হার মেঘেতে লুকায় পলকে ?
কার চুম্বনে ফুল্ল কুটজ-কলিকা,
চারু চম্পক কম্পিত কার অলকে ?

মেদুর মেঘের ছায়ামায়ালোকে পশিয়া
স্বপনবিবশা কে রহ গো তুমি বসিয়া ?

নিখিল ভরিয়া যে নীল রূপের মাধুরী,
ঝরিয়া ঝরিয়া তৃপ্তি বিলায় ভুবনে ;
যে রূপ মোহিত মরতে ফুকারে দাদুরী ;
ঊর্দ্ধে চাতকী আকুল প্রেমের স্বপনে ;—
ছন্দে মন্দ্রে জাগি' উঠে যেই রাগিণী
কভু মৃদু কভু মহাঝঙ্কার তুলিয়া,
চন্দন-তরু বেড়িয়া নবীনা নাগিনী
নাচে তালে তালে হরষে হেলিয়া দুলিয়া !—
সে রূপমাধুরী—সে গীতিছন্দ ধরিয়া
রেখেছ কি তব মুগ্ধ হৃদয় ভরিয়া ?

নব-মেঘপটে তাই কি নিমেষে নিমেষে,
অতি উজ্জ্বল বিদ্যুত-রেখা আঁকিয়া,
চাহিছ লিখিতে রূপ-রস-রাগ আবেশে
সুন্দর-গীতি মনের মাধুরী মাখিয়া ?
চিরঝঙ্কার উঠিছে না বুঝি ছন্দে ?
অসীম মাধুরী ফুটে না অমৃতকিরণে ?
তাই বন্দিনী বিবশা বাসনা-বন্ধে
কাঁদ একাকিনী ব্যর্থ সাধন স্মরণে ?
গীতিরূপে যবে সে সুধামাধুরী ফুটিবে,
এক সঙ্গীতে বিশ্ব মাতিয়া উঠিবে !

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

সহযোগী সাহিত্য।

ইংরেজী উপন্যাসে বিদেশী চরিত্র।

'লিভিং-বুদ্ধ'।

সুবিখ্যাত ইংরাজ ঔপন্যাসিক গাই বুথবি তৎপ্রণীত 'মাই ইণ্ডিয়ান কুইন' নামক উপন্যাসে ভারতীয় ক্ষত্রিয় বীরপুরুষ ও বীরনারীর চরিত্র কিরূপ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণে অঙ্কিত করিয়াছেন, বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সাহিত্যে' তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এবার আমরা আর এক জন আধুনিক ইংরাজ ঔপন্যাসিকের রচিত একখানি 'রোমান্সের' সংক্ষিপ্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

এই উপন্যাসের নাম 'লিভিং-বুদ্ধ',—অর্থাৎ 'জীবন্ত বুদ্ধ'। ঔপন্যাসিকের নাম রয় হর্নিম্যান। মিঃ হর্নিম্যানের উপন্যাসের কার্য্যক্ষেত্র তাঁহার স্বদেশের বাহিরে বহুদূরবর্ত্তী চীনসাম্রাজ্যে সম্প্রসারিত; সুতরাং বলা বাহুল্য, তিনি বরাহচক্ষু, উন্নতহনু, শিখাধারী চীনাম্যানদের চরিত্রাঙ্কণে এই উপন্যাসের অনেক পরিচ্ছেদ পূর্ণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচ্য-দেশবাসিগণের দুর্ভাগ্যক্রমে যেখানেই তিনি চীনা সাহেবদের কথা লিখিয়াছেন, সেইখানেই, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, তাঁহার নাসিকা কুঞ্চিত হইয়াছে! আমরা নিম্নে এই উপন্যাসের আখ্যায়িকার সার-সঙ্কলন করিলাম। ইহা দীর্ঘ হইলেও, আশা করি, পাঠকগণ ধৈর্য্যধারণ করিয়া ইহা পাঠ করিতে পারিবেন।

আখ্যায়িকার সার-সংগ্রহ।

গ্রন্থারম্ভে চব্বিশ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি দীর্ঘ ভূমিকা। এই ভূমিকায় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় সিপাহীযুদ্ধের একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। ঘটনার স্থল,—সিপাহী-যুদ্ধের প্রধান লীলা-ক্ষেত্র লক্ষ্ণৌ নগরের প্রায় এক শত মাইল উত্তরে অবস্থিত বেণাপুত্ত (Benaputta) নামক গ্রাম। এই গ্রামে মিসেস্ বর্ণি নামক এক ইংরাজ সৈনিকসীমন্তিনী স্বামী ও শিশুপুত্র লইয়া বাস করিতেন। এই যুবতীর বয়স একুশ বৎসর; বালকটির বয়স এক বৎসরের অধিক নহে।

একদিন এই যুবতীর স্বামী কাপ্তেন বর্ণি কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে কার্য্যোপলক্ষে গমন করিলে, এক জন প্রতিবেশী ইংরাজ যুবক কাপ্তেনের বাংলোয় উপস্থিত হইয়া মেমসাহেবকে সংবাদ দিল, মিরটে ভীষণ বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া মেমসাহেব বড় ভীত হইলেন; কারণ, সে সময় কাপ্তেন বর্ণি ও তাঁহার অধীনস্থ দুই জন লেপ্টেনাণ্ট ভিন্ন সে অঞ্চলে আর এক জনও ইংরাজ ছিল না।

দুই এক দিনের মধ্যেই বেণাপুত্তেও সিপাহী সৈনাগণের মধ্যে বিদ্রোহের অনল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, এবং বিদ্রোহীরা মীর রাও নামক এক জন সিপাহী সৈন্যের অধিনায়কতায় রাত্রিকালে কাপ্তেন সাহেবের বাংলো আক্রমণ করিল। কাপ্তেন বর্ণি ও তাঁহার লেপ্‌টেনাণ্টদ্বয় গৃহরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর লেফ্‌টেনাণ্ট ওয়ালেস ও ব্রেথওয়েট দেশীয় সিপাহীর হস্তে ভবলীলা সংবরণ করিলে, কাপ্তেন বর্ণি তাঁহার স্ত্রী

কাপ্তেনকে পলাইতে দেখিয়া এক জন সিপাহী বন্দুক তুলিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ঘোড়া টিপিল; গুলি কাপ্তেন সাহেবের ঘাড়ে বিঁধিল, কিন্তু তিনি পড়িলেন না, আহত হইয়াও চলিতে লাগিলেন।

ক্রোশের পর ক্রোশ ধরিয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর; তাহার ভিতর দিয়া সংকীর্ণ রাজপথ দূরান্তরিত রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে; পথের কোনও অংশে বনজঙ্গল বা পাহাড় পর্ব্বত নাই; কিছু দূর চলিয়াই কাপ্তেনের মাথা ঘুরিয়া উঠিল; অশ্বও পথশ্রমে পরিশ্রান্ত হইয়া হাঁপাইতে লাগিল; তাহার গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর হইয়া আসিল। অবশেষে একটি বালুকাপূর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া কাপ্তেন তাঁহার স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'ঘোড়া চলিতেছে না, আমিও আহত হইয়াছি; একটু বিশ্রাম করিতে হইবে।'

কিন্তু সেখানে বিশ্রাম করা হইল না। অনুসরণকারী সিপাহীরা দ্রুতবেগে তাঁহাদের পশ্চাতে আসিতেছিল; তাহাদের অশ্বপদধ্বনি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। অগত্যা তাঁহারা পথ হইতে একটু দূরে কতকগুলি লতাগুল্মের অন্তরালে গিয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, এবং ঘোড়াটিকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

চতুর্দ্দিকে সৌরকর-প্রদীপ্ত উত্তপ্ত বালুকারাশি। কাপ্তেনপত্নী ক্যাথারাইন তাঁহার শালখানি দিয়া শিশুপুত্রকে ঢাকিয়া সেই বালুকারাশির উপর শয়ন করাইলেন—। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, তাঁহাদের গৃহত্যাগের পূর্ব্বে সিপাহীদের নিক্ষিপ্ত একটি গুলি কাপ্তেনের গৃহবাতায়ন ভেদ করিয়া শিশুর একটি অঙ্গুলি উড়াইয়া লইয়া গিয়াছিল। শিশুটি বড়ই কাঁদিতেছিল। ক্যাথারাইন তাঁহার স্বামীর স্কন্ধের বস্ত্র অপসারিত করিয়া দেখিলেন, ক্ষত অল্প নহে, রক্তে কামিজ ভিজিয়া গিয়াছে! তিনি তাঁহার ঘাগরার (Skirt) কিয়দংশ ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। আবার অদূরে অশ্বপদশব্দ শুনিতে পাওয়া গেল।

ভয়বিহ্বলা ক্যাথারাইন তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, 'জ্যাক, ঐ উহারা আসিতেছে, শুনিতে পাইতেছ?' কিন্তু কে এ কথার উত্তর দিবে? কাপ্তেন বর্ণির অবসন্নদেহ মাটীতে ঢলিয়া পড়িল; শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল; নয়নসমক্ষে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

ক্যাথারাইন অশ্রুপূর্ণনেত্রে প্রিয়তমের দেহ কোলে তুলিয়া লইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন। সে মুখে মৃত্যুর ছায়াপাত হইয়াছিল।

সেই পথপ্রান্তে বিপন্না পত্নী ও আহত শিশুপুত্রকে ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিয়া কাপ্তেন বর্ণি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনেকক্ষণ বিলাপের পর ক্যাথারাইন পতির মৃতদেহ বালুকারাশিতে সমাহিত করিয়া ক্ষুধিত শিশু পুত্রটিকে বুকে তুলিয়া লইলেন: তখন সে ক্ষুধায় বড় অস্থির হইয়াছিল। তাহাকে লইয়া লোকালয়ে কিঞ্চিৎ আহার্য্য দ্রব্যের সন্ধানে চলিলেন। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা হইল, হয় ত বিদ্রোহীরা তাঁহাদের সন্ধান পাইয়া উভয়কেই বধ করিবে। ক্যাথারাইন পুত্রকে আর গ্রামের মধ্যে লইয়া না গিয়া একটি অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কতকগুলি শুষ্ক পত্র দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া তাহারই উপর শিশুটিকে শয়ন করাইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন।

গ্রামপ্রান্তে এক বৃদ্ধা একখানি কুটীরে বাস করিত। ...

দর্শনে ব্যথিত হইল ; তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ ছাগদুগ্ধ পান করিতে দিল ; কয়েকখানি রুটীও সংগ্রহ করিয়া দিল। ক্যাথারাইন অনাহারী পুত্রকে একাকী বনে রাখিয়া আসিয়াছিলেন. তিনি কিছুই খাইতে পারিলেন না। অথচ শত্রুহস্তে ধরা পড়িবার ভয়ে দিবসে বৃদ্ধার কুটীর-ত্যাগেও সাহস করিলেন না। সন্ধ্যার পর ক্যাথারাইন কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য লইয়া পুত্রের সন্ধানে অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে কয়েকবার ডাকিলেন ; কিন্তু শিশুর সাড়া পাইলেন না। কম্পিতপদে পুত্রের পর্ণশয্যার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শয্যা শূন্য, পুত্র সেখানে নাই !—সেই নৈশ অন্ধকারে স্বামি-পুত্র-হীনা দুর্ভাগিনী নারীর ব্যথিত আর্তনাদে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

* * * * * * *

দক্ষিণ-ভারতে ও মধ্য-ভারতে যে সকল অরণ্যচর যাযাবর জাতি (বেদে) বাস করে, তাহাদের মধ্যে বৃঞ্জারি নামক একটি জাতি আছে। তাহারা তিব্বত অঞ্চলে সমতল ক্ষেত্রের নানা পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে যায়। দুই জন বৃঞ্জারি ক্যাথারাইনের শিশু পুত্রটিকে চুরি করিয়া লইয়া তিব্বতের দিকে যাইতেছিল।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পর কয়েক সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে। বালকের সে রূপ আর নাই ; তাহার তুষারশুভ্র বর্ণ মলিন হইয়াছে ; তাহার স্বর্ণকান্তি কেশরাশি জটাসমাচ্ছন্ন ; ইংরাজশিশু ইতিমধ্যেই তাহার মায়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। বৃঞ্জারি-রমণীর কোলে বসিয়া সে মৃদু মৃদু হাসিতেছিল ; বেদিনী সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিতেছিল।

পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া এক স্থানে তাহারা একটি তাম্বুতে কয়েক জন তিব্বতী ও চীনাম্যানকে দেখিতে পাইল। ইহারা বৌদ্ধপুরোহিত। বৃঞ্জারি-দম্পতী তাহাদিগকে দেখিয়াই প্রথমে পলায়নের উদ্যম করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সে চেষ্টা সফল হইল না। এক জন পুরোহিত ছেলেটিকে দেখিতে পাইয়াছিল ; সে বলিয়া উঠিল, 'আমরা যাঁহার সন্ধানে ঘুরিতেছিলাম, তিনি আসিয়াছেন, বেদিনীর ক্রোড়ে ঐ যে শিশুটি দেখা যাইতেছে, উনিই জীবন্ত বুদ্ধ।'

আর এক জন বলিল, 'দৈববাণী হইয়াছে,—জীবন্ত বুদ্ধের এক হাতে চারিটিমাত্র অঙ্গুলি আছে ; এই শিশুর তাহা আছে কি না দেখ।'

সিপাহীর বন্দুকের গুলিতে শিশুর একটি অঙ্গুলি উড়িয়া গিয়াছিল। তাহার দক্ষিণ হস্তে চারি অঙ্গুলি দেখিয়া পুরোহিতেরা আনন্দে বিহ্বল হইল ! বুদ্ধদেব তাঁহার ভক্তদের বিস্মৃত হন নাই, নরদেহ ধারণ করিয়া বেদিনীর ক্রোড়ে চড়িয়া ভক্তবৃন্দের নিকটে আসিয়াছেন ভাবিয়া তাহারা আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল, এবং নতজানু হইয়া বুদ্ধবোধে সেই বালকের উপাসনা করিতে লাগিল। তাহার পর তাহারা বেদে ও বেদেনীকে কিঞ্চিৎ রজতমুদ্রা পুরস্কারস্বরূপ দান করিয়া ক্যাথারাইনের শিশুপুত্রকে বুদ্ধদেবের অবতারবোধে ক্রোড়ে লইয়া চীনদেশের সাংলো নামক বৌদ্ধ মঠের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

এইখানেই গ্রন্থের ভূমিকার শেষ।

ভূমিকায় লিখিত ঘটনার আটাশ বৎসর পরে ডেভিড হাবিলাও নামক এক জন ইংরাজ

ছিলেন ; তাঁহাদের সঙ্গে মিঃ ব্লেক ও ফ্রেজার নামক দুই জন ইংরাজ বন্ধু ছিলেন। এই মিশনরীর কন্যাটি তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত ; তাহার নাম রথ। তাঁহার পত্নী ক্যাথারাইন আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কাপ্তেন বর্ণির বিধবা পত্নী ; স্বামী পুত্র হারাইয়া সংসার মরুময় বোধ হওয়ায় আবার নূতন করিয়া সুখের কুঞ্জ-নির্ম্মাণের জন্য মিসেস বর্ণি মিঃ হাবিলাণ্ডের গলায় মালা দিয়াছিলেন। রথ বিলাতে বালিকাবিদ্যালয়ে পাঠ সম্পন্ন করিয়া পিতার সহিত চীন-ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিল। এই যুবতীর বয়স উনিশ বৎসর। মিঃ ব্লেক ও ফ্রেজার কি উদ্দেশ্যে এই দলে আসিয়াছিলেন, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও, উপন্যাস-পাঠে এটুকু বুঝা যায় যে, রথের রূপ-রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া তাঁহারা চীনের মুলুকে গিয়া পড়িয়াছিলেন।

পাদরীপত্নী ক্যাথারাইন 'জীবন্ত বুদ্ধ' জীবটি কিরূপ, পূর্ব্বে তাহার পরিচয় পান নাই। হাবিলাণ্ড কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন, জীবন্ত বুদ্ধ কোনও বৌদ্ধমঠের এক জন মোহান্ত ; চীনাম্যানদের বিশ্বাস, তাঁহার দেহ ও মন নিষ্পাপ, এবং তিনি অসাধ্যসাধন করিতে পারেন। এক জন 'জীবন্ত বুদ্ধে'র মৃত্যু হইলে মৃত বুদ্ধের আত্মা কোনও বালকের দেহে প্রবেশ করে ; বৌদ্ধ পুরোহিতেরা দেবজ্ঞের নিকট সন্ধান লইয়া সেই বালককে খুঁজিয়া বাহির করে, এবং তাহাকে লইয়া আসিয়া মৃত মোহান্তের গদীতে বসায়।

পাদরী-বনিতা অর্থাৎ মৃত কাপ্তেন বর্ণির ভূতপূর্ব্ব পত্নী ক্যাথারাইন নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, 'মানুষ এত কুসংস্কারান্ধ হইতে পারে? ইহা বড়ই ভয়াবহ। মানুষ ঈশ্বরবোধে মানুষের পূজা করে!'—নারীর গর্ভজাত সন্তান যীশুখ্রীষ্টের উপাসিকা মেমসাহেব হতভাগ্য বৌদ্ধদিগের কুসংস্কারে লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন। তিনি বুঝিলেন, এই সকল কুসংস্কারান্ধ অধঃপতিত জীবকে খ্রীষ্টধর্ম্মের আলোকে আনয়ন করিতে না পারিলে আর তাঁহার জীবনের ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে না। মিঃ ব্লেক সকল কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে, আমরা খৃষ্টানের দেশে জন্মিয়াছি।'

খৃষ্টান মিশনরীগণের উৎসাহ অদ্ভুত, অধ্যবসায়ও অতুলনীয়। এই কয়েক জন মিশনরী চীনের দুর্গম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া একটি ক্ষুদ্র 'মিশন হাউস' প্রতিষ্ঠিত করিলেন, একটি বালিকা-বিদ্যালয় খুলিলেন, এবং হাটে, মাঠে, ঘাটে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। স্থানীয় অধিবাসীরা চীনদেশসুলভ অশিষ্টতার চূড়ান্ত নমুনা দেখাইয়া (with exquisite chinese incivility) ধার্ম্মিক মহাত্মাদের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। এমন কি, বিবর্ণ ও স্ফূর্ত্তিহীনা চীনা বালিকারা তাহাদের পায়ের বেদনা (Aching feet) ভুলিয়া ধর্ম্মপ্রচার দেখিতে আসিল

যে সহরে তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই সহরে এক জন মান্দারিন অর্থাৎ চীনা-ম্যাজিষ্ট্রেট বাস করিতেন। পাদরী হাবিলাণ্ড এক দিন তাঁহার সহিত দেখা করিতে চলিলেন। মান্দারিন মিঃ হাবিলাণ্ডকে বলিলেন, 'আপনি এখানে কেন ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়াছেন? এখানে যে জীবন্ত বুদ্ধ বাস করেন, তাঁহার অসামান্য শক্তি। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তিনিও সেইরূপ এখানকার লোকের হৃদয় আকৃষ্ট করিয়াছেন ; হয় ত তাঁহার অনুচরগণের সহিত আপনাদের বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে।'—ধর্ম্মাত্মা পাদরী মান্দারিনের কথায় ধূর্ত্ত পূর্ব্বদেশ-

জানিবেন, ইম্পীরিয়াল গবর্মেণ্ট আমাদের রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।'—মান্দারিন এক জন সামান্য মিশনরীর গবর্মেণ্টের নিকট এরূপ প্রতিপত্তির পরিচয়ে বিস্মিত হইলেন, এবং হাবিলাণ্ডকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করিলেন।

গ্রন্থকার এই উপন্যাসে চীনাম্যানের চরিত্রকথা যে ভাবে ও যে ভঙ্গীতে বর্ণনা করিয়াছেন, এ স্থানে তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা প্রকাশিত হইল। তিনি বলেন,—'To the European there is no mob so treacherous as the Chinese. This is merely because of their impassivity. It is the quality of the race to conceal the passions and emotions which may be animating it till they find vent in action. In some ways they are indeed a nation of Chasterfields : in others nothing can exceed their vulgarity' ইহার ভাবার্থ এই যে, সাধারণ চীনাম্যানদের মত বিশ্বাসঘাতক জাতি পৃথিবীতে আর নাই। এই জাতির বিশেষত্ব এই যে, ইহারা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে গুপ্ত রাখিয়া কার্য্যকালে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ করে; কোনও কোনও বিষয়ে তাহাদের বৈরতার সীমা নাই।

মিঃ হাবিলাণ্ড ও ফ্রেজার একদিন পথে বাহির হইয়া দেখিলেন, একখানা পাল্কীতে জীবন্ত বুদ্ধ তাঁহার মঠ হইতে স্থানান্তরে যাইতেছেন! তাঁহার সম্মুখে ও পশ্চাতে অনেক লোক। 'লিভিং বুদ্ধ'র আকৃতি দেখিয়া তাঁহাদের উভয়েরই বিস্ময়ের সীমা রহিল না! ফ্রেজার বলিলেন, 'এই লোকটি চীনাম্যান নহে, এসিয়াবাসীও নহে।' হাবিল্যাণ্ড কোনও কথা বলিলেন না; এই যুবককে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে নানা চিন্তার তরঙ্গ উঠিতেছিল।

বাসায় ফিরিয়া তাঁহারা ক্যাথারাইন ও রথের নিকট জীবন্ত বুদ্ধের কথা উত্থাপিত করিলেন, এবং সেই যুবকের আকার প্রকারের সমালোচনা করিতে লাগিলেন। ক্যাথারাইন সহসা তাঁহার স্বামীকে বলিলেন, 'ডেভিড্! আজ কোন্ দিন, তাহা কি তোমার মনে আছে? আজ আমার জ্যাকির জন্মদিন, আজ সকালে তাহার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি। সে কি আজও জীবিত আছে? তোমরা অনেক দিন হইতেই বলিয়া আসিতেছ, জ্যাকি জীবিত নাই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, সে এখনও বাঁচিয়া আছে।'

হাবিলাণ্ড বলিলেন, 'এ তোমার ভ্রম মাত্র।'

মিঃ হাবিলাণ্ড যথাকালে মান্দারিনের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলেন। মান্দারিনের গৃহে উপস্থিত হইয়া এক জন ধনবান্ সুশিক্ষিত চীনাম্যানকে দেখিলেন, তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুলে একটি প্রকাণ্ড অঙ্গুরীয়ক, তাঁহার অঙ্গুলিগুলিতে সুদীর্ঘ নখর, এই সকল নখরে প্রচুরপরিমাণে ময়লা জমিয়াছে, অথচ তাঁহার পরিচ্ছদের বিপুল আড়ম্বর! এই চৈনিক ভদ্রলোকটির নাম চেং। চেংএর সহিত পাদরী সাহেবের নানা কথার আলোচনা চলিতে লাগিল। এই স্থলে গ্রন্থকার চীনাদিগের জাতীয় চরিত্রে কঠোর কটাক্ষপাত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই! বিলাতের গৃহকোণে বসিয়া তিনি স্বচ্ছন্দে চীনাম্যানের প্রকৃতিগত বর্ব্বরতা ও ক্রূরতার (inherent barbarity and cruelty of the Chinese nature) দুঃস্বপ্ন দেখিতেছেন! কি সূক্ষ্মদৃষ্টি!

চেং জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয় কি এখানে ব্যবসা করিতে আসিয়াছেন?'

হাবিলাও বুঝাইয়া দিলেন, তিনি মিশনরী, তাঁহার সঙ্গী বন্ধু মিঃ ফ্রেজার তাঁহার সঙ্গে চীনদেশে বেড়াইতে আসিয়াছেন।

কথাবার্ত্তা আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না। ভোক্তৃগণ টেবিলে গিয়া বসিলেন। নানাপ্রকার বিচিত্র খাদ্যদ্রব্য টেবিলে 'থরে বিথরে' সজ্জিত। খাদ্যদ্রব্যের সঙ্গে দুইটি কাটাও আসিল; এই কাটীর নাম, 'চপ্ষ্টিক্'; এই কাটীর সাহায্যে চীনারা ভোজ্যদ্রব্য মুখে তুলিয়া লয়। আহার করিতে করিতে ভোক্তারা এক একবার থামিয়া এক এক ঢোক 'সামশু' (এক প্রকার তীব্র চীনদেশীয় মদ্য) পান করিতে লাগিলেন। টেবিলে নানাজাতীয় মাংসও আনীত হইয়াছিল;—মেষমাংস, পক্ষিমাংস; বরাহমাংসের ত কথাই নাই। পলাণ্ডুসহযোগে তেলে ভাজা কুকুরমাংসও তাঁহাদের রসনাতৃপ্তির জন্য আসিয়াছিল। হাবিলাও বা ফ্রেজার তাহা স্পর্শও করিলেন না। মান্দারিণ মহাশয় সিক্ত তোয়ালের সাহায্যে পুনঃপুনঃ ললাটের ঘর্ম্ম অপসারিত করিতে লাগিলেন। আহার শেষ হইলে ধূমপান ও গল্প চলিতে লাগিল।

কথা কহিতে কহিতে মান্দারিন মহাশয়ের হাই উঠিতে লাগিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, কিয়ৎকাল চণ্ডু না টানিলে তিনি সুস্থ হইতে পারিবেন না। তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া এক জন চীনাম্যান মিঃ হাবিলাওর কানে কানে বলিলেন, 'অহিফেনেই দেশটা উচ্ছন্ন গেল; এ জন্য বিদেশীরাই দায়ী।'

হাবিলাও বলিলেন, 'আমরা দায়ী কেন?'

চীনাম্যানটি বলিলেন, 'আপনারাই ত এ দেশে এই অভিশাপ আনিয়াছেন।'

হাবিলাও বলিলেন, 'কিন্তু আমরা ত আপনাদের আফিং খাইতে বলি না; আপনারা ইহার অপব্যবহার করেন কেন? আপনারাও আমাদের কখনও চিনিতে পারিবেন না, আমরাও আপনাদের বোধ হয় চিনিতে পারিব না; চিরদিন আমরা পরস্পরকে অসভ্য মনে করিব।'

অনন্তর জীবন্ত বুদ্ধের প্রবর্ত্তিত নানা সংস্কারের আলোচনার পর সভাভঙ্গ হইল।

অতঃপর মিঃ হাবিলাও জীবন্ত বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ফ্রেজার ও ব্লেককে তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহে রাখিয়া তিনি একাকী একদিন মঠে যাত্রা করিলেন। মিঃ হাবিলাও মঠে উপস্থিত হইলে এক জন তিব্বতদেশীয় সন্ন্যাসী নানারত্নালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া হাবিলাওর নিকট আসিল, এবং তাঁহার পোষাকটি কিরূপ কাপড়ে নির্ম্মিত, তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিল; কিন্তু হাবিলাও বিরক্তি প্রকাশ করায় লোকটা লজ্জিত হইয়া দূরে সরিয়া গেল।

মঠে নানাজাতীয় অসংখ্য ভক্ত। মিঃ হাবিলাও নীরবে বৌদ্ধ যতিগণের উপাসনাপদ্ধতি দেখিতে লাগিলেন; তিনি মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন। তিনি জীবন্তবুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলে সন্ন্যাসীরা প্রথমে তাঁহাকে সে চেষ্টায় বিরত হইতে বলিল; কিন্তু অবশেষে এক জন অল্পবয়স্ক লামা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া জীবন্তবুদ্ধের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। মিঃ হাবিলাও চীনভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। জীবন্তবুদ্ধের সহিত অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মালোচনা করিলেন।

হাবিল্যাণ্ড অনেকক্ষণ পর্যান্ত স্থিরদৃষ্টিতে বুদ্ধের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া নিম্নস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'হা পরমেশ্বর!' আর কিছু বলিতে না পারিয়া তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

মঠের বাহিরে আসিয়া মিঃ হাবিল্যাণ্ড দেখিলেন,—এক জন তাতারদেশীয় বৌদ্ধসন্ন্যাসী নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। হাবিল্যাণ্ড তাহার অনুসরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সন্ন্যাসী বলিল, তাহাদের দলের এক জন লোক অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছে; যদি তিনি সেই পীড়িত সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাহার বড় উপকার হয়।

হাবিল্যাণ্ড সেই সন্ন্যাসীর সহিত একটি কুটীরে উপস্থিত হইয়া পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিলেন। রোগ সম্বন্ধে তাঁহার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা ছিল; রোগ পরীক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন,—'এ রোগী বাঁচিবে না।' তিনি রোগীর ধমনী পরীক্ষা করিবার সময় দেখিতে পাইলেন, তাহারও দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি নাই!

সেই কুটীরের দ্বার রুদ্ধ ছিল। করাঘাতের শব্দে সন্ন্যাসী দ্বার খুলিয়া দেখিল, জীবন্ত বুদ্ধ সেই কুটীরে আসিয়াছেন। তিনি বলিলেন,—'এই কুটীরে এক জন সন্ন্যাসী পীড়িত হইয়াছে, এ সংবাদ পূর্ব্বে আমাকে দেওয়া হয় নাই কেন?'

মিঃ হাবিল্যাণ্ড বলিলেন, 'লোকটির মৃত্যুকাল উপস্থিত; এখন তাহার জীবন রক্ষা হওয়া অসম্ভব।'

জীবন্ত বুদ্ধ পীড়িত সন্ন্যাসীর সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া নিঃশব্দে স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। রোগী সারিয়া উঠিল! হাবিল্যাণ্ড ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। ইংরাজের ন্যায় আকৃতিপ্রকৃতিবিশিষ্ট এই বুদ্ধ কে?

জীবন্ত বুদ্ধ যে সন্ন্যাসীকে রোগমুক্ত করিলেন, সে তিব্বত দেশের লোক; তাহার বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। পূর্ব্বোক্ত তাতার সন্ন্যাসী জীবন্ত বুদ্ধের অসামান্য শক্তি ও প্রতিপত্তির পরিচয়ে হিংসায় জ্বলিয়া মরিতেছিল। যে এই পীড়িত তিব্বতী সন্ন্যাসীকে পথ হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিল; তাহার অভিপ্রায় ছিল যে, তাহার কাটা আঙ্গুল দেখাইয়া জীবন্ত বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দিগণের নিকট প্রতিপন্ন করিবে, এই তিব্বতী সন্ন্যাসীই আসল জীবন্ত বুদ্ধ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটি ভণ্ড ও প্রতারক চাতুর্য্যবলে জীবন্ত বুদ্ধের স্থান অধিকার করিয়াছে।

তিব্বতী সন্ন্যাসীটির নাম মাকা। মাকা তাতার সন্ন্যাসীর প্রস্তাব শুনিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইল, এবং তাহার ষড়যন্ত্রে যোগদান করিতেও সম্মত হইল। সে বলিল, 'আমি এখানে একজন সাধারণ সন্ন্যাসীর ন্যায় বাস করিব; মঠের সকল গুহ্য বিবরণ অবগত হইব; পরে যথাসময়ে আত্মপ্রকাশ করা যাইবে।'

পাদরী হাবিল্যাণ্ড মহা উৎসাহে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি জীবন্ত বুদ্ধের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটা দেখিয়াছিলেন, সে কথা ক্যাথারাইনের অগোচরে রাখিলেন। ক্যাথারাইনও প্রচারকার্য্যে স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। তিনি একটি বিদ্যালয় খুলিয়া কতকগুলি ছোট ছোট চীনা বালিকাকে বিদ্যাদান করিতে লাগিলেন।

মিশনরীদম্পতির ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্য সাংলো নগরের জনসাধারণের বিদ্বেষবুদ্ধি উত্তেজিত

করিল। পূর্ব্বোক্ত মান্দারিণ হাবিলাওকে ডাকাইয়া বলিলেন, তাঁহার প্রচারকার্য্যে জনসাধারণ বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সাংলো নগরে লামাদিগের শক্তি ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত অধিক, অতএব তাঁহার সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য।

হাবিল্যাও বলিলেন, 'জীবন্ত বুদ্ধ তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছেন, সেখানকার লোক তাঁহাদের শত্রুতাচরণ করিবে না।'

মান্দারিণ বলিলেন, 'জীবন্ত বুদ্ধ অত্যন্ত উদার হইতে পারেন, কিন্তু দেশে ধর্ম্মধ্বজীর অভাব নাই, তাহারা তাঁহার উপদেশে ভুলিবে, এরূপ সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প।'

প্রকৃত কথা এই যে, মান্দারিণ শাসনবিভাগের কর্ত্তা ছিলেন, জীবন্ত বুদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধানকর্ত্তা। মান্দারিণের শক্তি পার্থিব, বুদ্ধের শক্তি ঐশী, মান্দারিণ জীবন্ত বুদ্ধ অপেক্ষা কত ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল, প্রতিপদে তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেন। যখন তিনি শুনিতে পাইলেন, উদারহৃদয় জীবন্ত বুদ্ধ মিশনরীগণকে অভয়দান করিয়াছেন, তখন তাহাদিগকে বিপন্ন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান সংকল্প হইল। তিনি প্রকাশ্যে হাবিলাওকে সাবধান করিয়া গোপনে জনসাধারণকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে একদিন মান্দারিণ হাবিলাওের বাংলায় উপস্থিত হইয়া সুন্দরী রথকে দেখিতে পাইলেন। রথের অপরূপ লাবণ্যে মান্দারিণের হৃদয়ে পাপলালসা জাগিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, যেমন করিয়া হউক, এই সুন্দরীকে হস্তগত করিতে হইবে; রথের তুলনায় মান্দারিণ তাঁহার পত্নী ও উপপত্নীগুলিকে নির্জ্জীব চীনের পুতুল বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

জীবন্ত বুদ্ধের গল্প শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য রথের মনে বড় আগ্রহ জন্মিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাকালে কাহাকেও কিছু না বলিয়া রথ গোপনে নির্জ্জন বনপথ দিয়া মঠের প্রান্তভাগে উপস্থিত হইল। সেখানে সে দেখিল, অদূরে গিরিউপত্যকায় এক গৌরবর্ণ সৌম্যমূর্ত্তি যুবাপুরুষ পশ্চিমগগনে দৃষ্টি সন্নিবদ্ধ করিয়া ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। যুবতী নির্নিমেষনেত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সুন্দর মূর্ত্তি চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। অনেকক্ষণ পরে সে গমনোদ্যতা হইয়া যেমন একখণ্ড প্রস্তরের উপর পদস্থাপন করিবে, অমনই পদস্খলন হইয়া ভূপতিত হইল; সে অস্ফুট শব্দ করিয়া মূর্চ্ছিত হইল। জীবন্ত বুদ্ধ সেই শব্দে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকটে আসিলেন, এবং অন্যের অলক্ষ্যে তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া হাবিলাওের বাংলোর সন্নিকটে রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রেক ও ফ্রেজার রথের সংজ্ঞাহীন দেহ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া গৃহে চলিলেন। রাত্রিশেষে রথের সংজ্ঞা হইল বটে, কিন্তু তাহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিল। জীবন্ত বুদ্ধকেই সে তাহার জীবনের ধ্রুবজ্যোতিঃ বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

দৈবক্রমে আর একদিন রথের সহিত জীবন্ত বুদ্ধের সাক্ষাৎ হইল। এবার রথকে দেখিয়া তিনি কিছু বিচলিত হইলেন। রথের সহিত তাঁহার এই দুইবারের সাক্ষাতের কথা পূর্ব্বোক্ত তাতারী সন্ন্যাসীর অজ্ঞাত ছিল না। সে বিদ্রোহী সন্ন্যাসিগণের সহিত মিলিত হইয়া এই কথা প্রচার করিল যে, 'জীবন্ত বুদ্ধ এক জন প্রকাণ্ড ভণ্ড, সে ইংরেজ ধর্ম্মপ্রচারকের কন্যার প্রেমাকাঙ্ক্ষী; অতএব পাদরীদের ঘরে আগুন লাগাইয়া তাহাদিগকে পোড়াইয়া মার, এবং

বহু সংখ্যক সন্ন্যাসী ও সাধারণ লোক এ প্রস্তাবের সমর্থন করিল। তাহার পর একদিন সহসা হাবিল্যাণ্ডের বাংলোয় আগুন লাগিল। অর্দ্ধদগ্ধ গৃহ কোনও রূপে রক্ষা পাইল। ফ্রেজার বলিল, 'চীনারা বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করিল, এখান হইতে সরিয়া পড়া যাউক।' কিন্তু ধর্ম্মাত্মা হাবিলাণ্ড এই কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় বিচলিত হইলেন না। তিনি যীশুর নামে সকল উৎপীড়ন সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গতিক ভাল নয় দেখিয়া ফ্রেজার কয়েক দিনের জন্য স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন; তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, নদীপথে কতকগুলি জাহাজী গোরা লইয়া আসিয়া তাহাদের সাহায্যে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ প্রদান করিবেন। তাঁহার খৃষ্টীয় সহিষ্ণুতা এত অত্যাচার সহ্য করিতে পারিল না।

আর একদিন ধর্ম্মপ্রচারের পর হাবিলাণ্ড গৃহে ফিরিতেছেন, এমন সময় কতকগুলি চীনাম্যান তাঁহাকে আক্রমণ করিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ক্যাথারাইন ও রথ তাঁহার সঙ্গে ছিল। চীনাদের হস্তে সে দিন তাঁহাদের কি দুর্দ্দশা হইত, বলা যায় না; কিন্তু জীবন্ত বুদ্ধ দৈবযোগে সহসা পাল্কীতে চড়িয়া সেই পথে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আদেশে তাঁহার অধীনস্থ লামারা আক্রমণকারীদিগকে দূর করিয়া দিল। এইদিন সর্ব্ব প্রথম ক্যাথারাইন জীবন্ত বুদ্ধকে দেখিলেন। বহু দিন পূর্ব্বে অপহৃত শিশু পুত্রের স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু কেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; বিমনা হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

জীবন্ত বুদ্ধ বিদেশিগণের প্রতি এই ব্যবহারে বড় বিরক্ত হইয়া মান্দারিণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং এই উপদ্রবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

মান্দারিণ বুদ্ধের সুনীল নেত্রের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি-বাণ সহ্য করিতে পারিলেন না। সে দৃষ্টি মান্দারিনের কলুষিত তুচ্ছবিষয়লিপ্ত অন্তরাত্মার অন্তর্দ্দেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিল, (to see straight down into the recesses of his job mongering soul)। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, জীবন্ত বুদ্ধ গ্রন্থকারের স্বজাতি; আর এই মান্দারিণ, যতই সম্ভ্রান্তবংশীয় হউন, পীতবর্ণ চীনাম্যান মাত্র, সুতরাং ইউরোপীয়ের অবজ্ঞার পাত্র। জীবন্ত বুদ্ধের পাশে তিনি মর্কট-রূপে চিত্রিত হইবার যোগ্য!

মান্দারিণ সসঙ্কোচে বলিলেন, 'জনসাধারণ বিদেশীদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে; আপনার লামারাই এই উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে।'

বুদ্ধ বলিলেন, 'দেখিও, যেন বিদেশীদের শান্তির কিছুমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে।'

মান্দারিন মনে মনে বড় চটিলেন; মঠের সমস্ত সন্ন্যাসী খৃষ্টানদের শত্রু, কেবল বুদ্ধ তাহাদের পক্ষাবলম্বী, তিনি এ রহস্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। যাহা হউক, পুনঃ পুনঃ নানা রূপে বিপন্ন ও উৎপীড়িত হইয়াও পাদরী সাহেব ধর্ম্মপ্রচারে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলেন না। একদিন রাত্রিকালে ক্যাথারাইন বাড়ীর বাহিরে শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া তাঁহার স্বামীকে জাগাইলেন; উভয়ে গিয়া দেখিলেন, দ্বারপ্রান্তে বস্ত্রমণ্ডিত একটি ক্ষুদ্র বালিকা পড়িয়া আছে! ক্যাথারাইন এই বালিকাটিকে সযত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বামীর গির্জ্জায় তাহাকে ব্যাপ্তাইজ করিলেন। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই এই বালিকার মৃত্যু হইল। চীনাম্যানেরা দুর্নাম রটাইল, এই বিদেশীদের অত্যাচারেই বালিকাটি মরিয়াছে। তাহাকে কষ্ট দিয়া মারিবার

তিব্বতী সন্ন্যাসী মাকা ও তাহারদেশীয় সন্ন্যাসী দেখিল, খৃষ্টানেরা ধর্ম্মপ্রচারে বুদ্ধের সহায়তা লাভ করিতেছে। তাহারা মঠের সন্ন্যাসীদের ও দেশের লোককে বুদ্ধের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। উত্তেজনার ফলও ফলিল। একদিন মিশন-হাউস-সংলগ্ন বালিকাবিদ্যালয় হইতে ক্যাথারাইনের গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইয়া গেল ; রথ চীনা ভৃত্যের সঙ্গে তাঁহার সন্ধানে বিদ্যালয়ে গমন করিলেন ; সেখানে গিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার মাতা অনেকক্ষণ পূর্ব্বে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। রথ বালিকা-বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের আয়োজন করিতেছে, এমন সময় বিদ্যালয়ের চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর গোলমাল শুনিতে পাইল ; ভয়ে সে দ্বার রুদ্ধ করিল ! অল্পক্ষণের মধ্যেই বহুসংখ্যক চীনাম্যান তাহাকে হত্যা করিবার জন্য বিদ্যালয় আক্রমণ করিল। একটি অসহায়া বিদেশিনী যুবতীকে হত্যা করিবার জন্য দুরন্ত চীনাম্যানেরা কিরূপ প্রকাণ্ড আয়োজন করিয়াছিল, তাহার উজ্জ্বল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার লিখিতেছেন,—'the street which stretched away in front of the Mission House was full from end to end with a shrieking foaming mob whose blood was up.'—চীনাম্যানেরা যে এমন অসভ্য জানোয়ার, তাহা পূর্ব্বে কে জানিত ?

(আগামী বারে সমাপ্য।)

হাসি।

তোমার আনন্দ পেয়ে হাসিছে অনন্ত লোক,
বিকশিত শুভ্র মুখে মুছে গেছে দুঃখ শোক।
হাসে চন্দ্র, হাসে সূর্য্য, হাসে নক্ষত্র তারকা,
হাসে পুত্র, পিতা, মাতা, হাসে বন্ধু প্রাণসখা ;
হাসে দিবস নিশীথ, হাসিছে৷ বসন্ত শীত,
হাসে পুষ্প, পরিমল নব কিসলয়দল,
নদনদী সরোবর হাসে বিশ্ব চরাচর,
হৃদয়ে হৃদয়ে তব প্রেম-হাসি সমীরিত ;
জোছনার আলিঙ্গনে হাসে শ্যাম ধরাতল ;
গগনের পটে কিবা শোভে দেখি ছবি আঁকা
মধুময় প্রেম মুখ চিরশুভ্র-হাসি-মাখা !
ওই সে হাসির কণা জগতে রয়েছে ছেয়ে ;
তোমার আনন্দ পেয়ে যেন সবাকার চেয়ে
সুমধুর হাসিরাশি ভক্ত হৃদে প্রস্ফুটিত।

চাঁদ রায় ও কেদার রায়।

—— :০: ——

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে চাঁদ রায় ও কেদার রায়, এই দুই ভ্রাতা মোগলদিগের শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া আপনাদিগকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। (১) ইহাঁদের রাজধানী সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁ হইতে নয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী পদ্মাতীরে অবস্থিত ছিল। শ্রীপুর বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্ভুক্ত। মোগলেরা বিক্রমপুরকে সরকার সোনার গাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়া তাহাকে আপনাদের অধীনস্থ ভূভাগ বলিয়া ঘোষণা করিলেও, চাঁদ রায় কেদার রায় কখনও অধীনতা স্বীকার করেন নাই। বিক্রমপুরের চতুর্দ্দিকে বহু নদী বিদ্যমান থাকায়, তাঁহারা এক স্থান হইতে আর এক স্থানে গমন করিয়া মোগল সৈন্যদিগকে ব্যতিবস্ত করিয়া তুলিতেন; কাজেই মোগল সৈন্যগণ ইহাঁদিগকে বশীভূত করিতে পারিতেন না। এই রাজবংশের সহিত খিজিরপুরাধিপতি ঈশা খাঁর বিশেষ সদ্ভাব ছিল; তাঁহারা কখনও ঈশা খাঁর বিরুদ্ধাচরণ করিতেন না। ঈশা খাঁও মৈত্রীভাব রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

---

(১) কথিত আছে যে, এই বংশের আদিপুরুষ নিম রায় কর্ণাট হইতে আসিয়া বিক্রমপুরস্থ আড়ফুলবাড়িয়া নামক গ্রামে বাস করিতে থাকেন। এই নিম রায়ের বংশেই চাঁদ রায় ও কেদার রায় জন্মগ্রহণ করেন। বহু অনুসন্ধানেও চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের পিতার নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ইহাদের গুরুবংশ ও পুরোহিত-বংশের কেহই কোনও প্রাচীন কাগজপত্র কিংবা কোনও কুলজী গ্রন্থ হইতে উহা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারেন নাই। নিম রায় সম্বন্ধে ডাক্তার সাহেব লিখিয়াছেন যে,—'The tradition is, that about a hundred and fifty years before the reign of Akbar, Nim Rai came from Karnat and settled at Araphullbaria in Bikrampur. He is believed to have been the first Bhuya, and to have obtained the sanction of the ruling monarch to his retaining the tittle as an hereditary one in fermly.' —James Wise.—on the Barah Bhuyas. Asiatic Society's Journal 1874.'

ওয়াইজের মতে, নিম রায় সম্রাট আকবরের রাজত্বের প্রায় ১৫০ দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে কর্ণাট হইতে বিক্রমপুরে আগমন করেন। শ্রীযুত নিখিলচন্দ্র রায় মহাশয় অনুমান করেন যে, যে সময়ে সেনরাজগণ বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সেই সময়েই তাঁহাদের স্বদেশবাসী

এক সময়ে ঈশা খাঁ মিত্ররাজ কেদার রায়ের বাটীতে আগমন করেন। কেদার রায় ও এই রাজ-অতিথির উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এই আনন্দকোলাহলের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই উভয় পক্ষের প্রীতির বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া চিরবিদ্রোহের ও মনান্তরের সৃষ্টি হইল। (২) কেদার রায়ের এক অপূর্ব্বরূপলাবণ্যবতী যুবতী বিধবা ভগ্নী ছিলেন—তাঁহার নাম ছিল সোনা বা সোনামণি। এই বালবিধবা ভ্রাতৃদ্বয়ের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবন কাটাইতেছিলেন। ঈশা খাঁ যখন কেদার রায়ের অতিথিরূপে শ্রীপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন তিনি কোনও রূপে এই ললনারত্নকে দেখিতে পাইয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন। হায়! রমণীর রূপ, জগতে তুমিই যত অনিষ্টের মূল।

ঈশা খাঁ সোনামণির রূপলাবণ্যে এত মোহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি খিজিরপুরে গমন করিয়াই সোনামণিকে পাইবার জন্য এক জন দূত প্রেরণ করেন। তিনি জানিতেন না যে, ইহাতে বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায়ের মনে দারুণ ঘৃণার ও ক্রোধের সঞ্চার হইবে। কেদার দূতকে বিদায় দিয়া যুদ্ধঘোষণা করিয়া ঈশা খাঁর অধিকৃত কলাগাছির দুর্গ আক্রমণ করিয়া তাহা ধ্বংস করেন। ঈশা খাঁ আত্মরক্ষার জন্য ত্রিবেণীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, কেদার রায় উক্ত দুর্গ আক্রমণ করিয়া খিজিরপুর লুণ্ঠন করেন। এ দিকে যখন রণোন্মত্ত কেদার রায় স্বীয় অসীমশক্তিপ্রভাবে ঈশা খাঁর দুর্গ প্রভৃতি বিধ্বস্ত করিয়া মুসলমানের ঘৃণিত প্রার্থনার উপযুক্ত প্রতিশোধ দিতে সক্ষম হইয়াছেন মনে করিয়া কথঞ্চিৎ আরাম অনুভব করিতেছিলেন, তখন ঈশা খাঁও এক বিশ্বাসঘাতকের সহায়তায় কেদার রায়ের সর্ব্বনাশসাধনে ব্রতী হইলেন।

শ্রীমন্ত খাঁ কেদার রায়ের অমাত্য ছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া এক সময়ে কেদার রায় কোটীশ্বরের দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতিত্ব প্রদান করেন। শ্রীমন্ত ইহার প্রতিকূলতা করেন; কিন্তু পরিশেষে রাজাজ্ঞায় ঐ দেবল ব্রাহ্মণকে গোষ্ঠীপতি শ্রোত্রিয় বলিয়া মানিতে বাধ্য হন। এই ঘটনা হইতেই শ্রীমন্ত খাঁ হৃদয়ে এই রাজপরিবারের অনিষ্টচিন্তা পোষণ করিয়া

(২) প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুত আনন্দনাথ রায় কেদার রায়কে চাঁদ রায়ের পুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ দুই ভ্রাতা বলিয়াই কথিত হইয়া থাকেন। আমরাও সেই বিশ্বাসে তাঁহাদিগকে দুই ভ্রাতা বলিয়াই উল্লেখ করিলাম। বংশপরম্পরাগত

আসিতেছিলেন। এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া শ্রীমন্ত গোপনে ঈশা খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করেন। ঈশা খাঁও এই পামরকে পরমসমাদরে গ্রহণ করেন, এবং বহু অর্থ পারিতোষিক প্রদান করিয়া শ্রীমন্ত খাঁকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করান যে, যে উপায়েই হউক, সোনামণিকে আনিয়া আমার অঙ্কশায়িনী করিয়া দিতে হইবে। শ্রীমন্ত খাঁ উহাতে স্বীকৃত হন, এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া স্বর্ণময়ীকে ঈশা খাঁর হস্তে অর্পণ করেন। এত দূর কৌশলের সহিত এই ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল যে, চাঁদ ও কেদার রায় ইহার বিন্দুমাত্রও জানিতে পারেন নাই। কথিত আছে যে, চাঁদ রায় ঈশা খাঁ কর্ত্তৃক সোনামণির অপহরণ ব্যাপার অবগত হইয়া লজ্জায় ও অপমানে একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন, এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই কোটীশ্বরের পদমূলে স্বীয় নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া জগতের সর্ব্বপ্রকার গ্লানি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

চাঁদ রায়ের মৃত্যুর পরে কেদার রায় একাকী আপনার পরাক্রমপ্রকাশে প্রবৃত্ত হন। তিনি কেবল যে ঈশা খাঁর রাজ্য আক্রমণ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন, তাহা নহে। কেদার একেবারে মোগলের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া আপনাকে স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মোগলেরা যখন পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করেন, তখন তাঁহারা সরকার সোনার গাঁয়ের সহিত সনদ্বীপও মোগলসাম্রাজ্য-ভুক্ত করিয়া লন। এক্ষণে কেদার রায় উহার পুনরুদ্ধারের জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। সনদ্বীপের অধিকার লইয়া বাঙ্গালী ও মগ, এবং ফিরিঙ্গী ও মগের মধ্যে যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায় নৌযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার বহু কোষা (সেকালের রণতরী) ও নৌ-সৈন্য ছিল। তিনি এ সকল সৈন্য ও রণতরীর পরিচালনের জন্য কতকগুলি পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উহাদের মধ্যে আবার কার্ভালিয়ন বা কার্ভালোই প্রধান ছিল। এই কার্ভালো ও তাহার সহযোগী মার্টিন নামক ফিরিঙ্গীর সাহায্যে কেদার রায় মোগলদিগের কবল হইতে সনদ্বীপের উদ্ধার করেন, এবং দুইবার আরাকান-রাজকে পরাজিত করিয়া সনদ্বীপ নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া রাখেন। কিন্তু পরিশেষে উহা আরাকান-রাজের অধিকারভুক্ত হয়। এই নৌ-যুদ্ধ ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। (৩)

যখন বিক্রমপুরে কেদার রায় এইরূপে সর্ব্বত্র স্বীয় বাহুবলপ্রকাশে কীর্ত্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন, সে সময়ে আকবর বাদশাহের মৃত্যুর পর ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাহাঙ্গীর পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালার বারভূঞাগণের বীরত্বকাহিনী জ্ঞাত ছিলেন। সিংহাসনারোহণের পর ক্রমশঃই ভূঞাদিগের উদ্ধত ব্যবহারের কথা শ্রবণ করিয়া তিনি এই সকল বিদ্রোহী জমীদারগণের দমনার্থ অম্বরাধিপতি হিন্দুকুলাঙ্গার রাজা মানসিংহকে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া ভূঞাদলের উচ্ছেদার্থ প্রেরণ করিলেন।

মহারাজা মানসিংহ বাঙ্গলা দেশে আসিয়াই প্রথমতঃ ভূঞাদলের মধ্যে মতভেদের সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ ভেদ ঘটাইতে তাঁহাকে বিশেষ কষ্টও পাইতে হয় নাই। কারণ, ভূঞাদল পূর্ব্ব হইতেই পরস্পরে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের সহিত তাঁহার জামাতা চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের, রামচন্দ্রের সহিত ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্যের, বিক্রমপুরাধিপতি কেদারের সহিত খিজিরপুরের ঈশা খাঁ মসনদ আলির মনোমালিন্য সুচতুর মানসিংহের নিকট অধিক কাল গুপ্ত রহিল না।

ইহার উপর আবার ভবানন্দ মজুমদার ও শ্রীমন্ত খাঁ প্রভৃতি স্বদেশদ্রোহী কুলাঙ্গারগণ তাঁহার সহায়তায় প্রবৃত্ত হইল। এই কুলাঙ্গারদ্বয় কিরূপে ও কোন্ পথে সৈন্য-পরিচালন করিলে যুদ্ধজয়ের সম্ভাবনা অধিক, মানসিংহকে সে পরামর্শ দিতে পশ্চাৎপদ হইল না। মানসিংহ এইরূপে সমুদয় গৃহচ্ছিদ্র অবগত হইয়া যুদ্ধঘোষণা করিয়া ভৌমিকগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ইহাতে এই ফল হইল যে, অধিকাংশ ভৌমিকই ভয়ে বা প্রলোভনে মোগলের আধিপত্য স্বীকার করিল। কিন্তু কেবল দুই মহাপুরুষ হিমাদ্রির ন্যায় অটলচিত্তে স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থ অগ্রসর হইলেন। প্রতাপের স্বাধীনতা-ঘোষণার অব্যবহিত পরেই পদ্মার তটস্থিত বিক্রমপুরের রাজধানী কেদার রায়ের প্রিয়তম শ্রীপুরের দুর্গশিরেও বিক্রমপুরের স্বাধীনতাধ্বজা সেনরাজবংশের পতনের বহুকাল পরে পুনরায় গৌরবের সহিত উড্ডীয়মান হইল। জানি না, সেদিন বিক্রমপুরের গৃহে গৃহে কি আনন্দকোলাহলই জাগিয়া উঠিয়াছিল! বঙ্গের নর নারী সে শুভযোগে স্বাধীনতার

স্বাধীনতাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম বোধে মোগল সৈন্যের গতিরোধার্থ উলঙ্গ-কৃপাণহস্তে প্রস্তত হইতে লাগিল!

যখন একে একে অন্যান্য ভৌমিকগণ মানসিংহের পদানত হইলেন, তখন মানসিংহ বুঝিতে পারিলেন যে, বাঙ্গালার দুই দীপ্ত সূর্য্য প্রতাপ ও কেদারকে দমন করিতে না পারিলে তাঁহার সমুদয় চেষ্টা যত্নই ব্যর্থ হইবে। যদি এই দুই বীরপুরুষকে পরাজিত করিতে না পারেন, তবে তাঁহার আর মোগলবাহিনী সহ দিল্লীতে ফিরিয়া যাইবার সুযোগ ঘটিবে না। রণকুশল মোগল সেনাপতি এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রতাপাদিত্যকে আক্রমণ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং বিক্রমপুরাধিপতি কেদার রায়কে পরাজিত করিবার নিমিত্ত স্থলপথে জনৈক উপযুক্ত সেনানায়কের অধীনে শ্রীপুরাভি-মুখে এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মানসিংহের বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালীকে দমন করা বিশেষ কঠিন হইবে না। তিনি জানিতেন না, কিংবা বুঝিতে পারেন নাই যে, কি দুর্জ্জয় শক্তির সহায়তায় প্রতাপ ও কেদার বাঙ্গালায় স্বাধীনতার ধ্বজা উড্ডীন করিয়াছেন। বাঙ্গালী যে বীরত্বে ক্ষত্রিয় বীরগণ অপেক্ষা কোনও অংশেই হীন বা ন্যূন নহে, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে ছিল না। এ দিকে যখন নরাধম বঙ্গকুলকুলাঙ্গার ভবানন্দের সহায়তায় সেনাপতি মানসিংহ রাহুর ন্যায় বঙ্গের দীপ্ত স্বাধীনতা-সূর্য্যকে গ্রাস করিবার জন্য বহু দূর অগ্রসর হইয়াছেন, সেই সময়ে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার প্রেরিত মোগলবাহিনী বিক্রমপুরাধিপতির প্রবল আক্রমণ সহিতে না পারিয়া রণে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে! এই সংবাদে মোগল সেনাপতির চমক ভাঙ্গিল। তিনি যত সহজে বাঙ্গলা জয় করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা আর তত সহজসাধ্য বলিয়া মনে হইল না। স্থলপথে পরাজিত হইয়া তিনি জলযুদ্ধে বিক্রমপুরাধিপতিকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করিবার সংকল্প করিয়া এক শত রণতরী, সাহসী ও নির্ভীক মোগলসৈন্য ও সমর-বিদ্যা-বিশারদ সেনাপতি মন্দা রায়কে প্রেরণ করিলেন। মানসিংহের প্রেরিত এই রণতরীসমূহ কেদার রায়ের গর্ব্ব ও বিক্রমপুরের স্বাধীনতাহরণ করিবার উদ্দেশ্যে অর্দ্ধচন্দ্রশোভিত পতাকা উড়াইয়া "আল্লা হো আক্‌বর!" রবে পদ্মার উভয় তীর প্রতিধ্বনিত করিয়া বীরদর্পে শ্রীপুরের দিকে অগ্রসর হইল। মোগলের সহিত এই জলযুদ্ধে বঙ্গবীরগণ যে সাহস ও কৃতিত্বের

কেদার রায় গুপ্তচরপ্রমুখাৎ সমুদয় অবগত হইয়া গ্রামে গ্রামে চর পাঠাইয়া সৈন্যসংগ্রহে ও যুদ্ধের আয়োজনে ব্রতী হইলেন। স্বদেশভক্ত বীরের নিকট জীবন থাকিতে শত্রুহস্তে মাতৃভূমি তুলিয়া দেওয়া কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? চারি দিক হইতে সহস্র সহস্র সৈন্য রাজধানী শ্রীপুরে সমবেত হইতে লাগিল। স্বদেশপ্রেমের দিব্যশক্তি নির্জ্জীব নরনারীর বাহুতেও শক্তিসঞ্চার করিয়া দিল। কেদার রায়ের কোষা-(রণতরী)-সমূহ বঙ্গীয় সৈনিকবৃন্দে সুশোভিত হইয়া, মধু রায় ও কার্ভালো, এই দুই বীরেন্দ্র সেনাপতির নেতৃত্বে মোগল সৈন্যের প্রতীক্ষায় প্রস্তুত হইয়া রহিল।

কালো জলে কালো ঢেউ তুলিয়া আজ যেমন মেঘনাদ (মেঘনা) নদ বিক্রমপুরের পূর্ব্ব প্রান্ত ধৌত করিয়া প্রত্যেক তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে অধীনতানিগড়-বদ্ধ হৃদয়ের সুতীব্র লাঞ্ছনার বিষময় যন্ত্রণা ব্যক্ত করিতেছে, তেমনই সে একদিন উদ্দাম যৌবনের পুলকচাঞ্চল্যে স্বাধীনতার গৌরবময় হর্ষে আনন্দ-সঙ্গীত গাহিয়াছিল! কিন্তু সে দিন এখন কোথায়? তাহার এই সুবিশাল বক্ষে এক দিন যে সমরলীলা সংঘটিত হইয়াছিল, নির্ভীকহৃদয় বঙ্গবীরগণ যে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কালো জলে মোগল-বাহিনীর লোহিত শোণিতে করালবদনী রণরঙ্গিনীর যে ভীষণা-মূর্ত্তির বিকাশ হইয়াছিল, সেই লোহিত আভা, সেই ভৈরব-গর্জ্জনারাব, সেই ফেনিলোচ্ছল তরঙ্গরাশির অট্টহাসি এখনও যেন কানে বাজিতেছে—এখনও যেন সুদূর অতীতের বঙ্গবীরগণের সহস্রকণ্ঠোচ্চারিত রণ-জয়ের আনন্দ-কোলাহল দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।

চিরদিনই কি বাঙ্গালী ভীরু কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণিত ছিল? সত্য সত্যই কি তাহারা কামান ভেরীর প্রবল নিনাদে, অসির ঝনঝনায় ও রণবাদ্যের প্রবল নির্ঘোষে ভীতচকিতহৃদয়ে প্রেয়সীর অঞ্চল-ছায়ায় লুকাইতে চাহিত? তাহারা কি একদিন মাতৃভূমির হিতার্থ—প্রাণপ্রিয়তম জন্মভূমির স্বাধীনতা-রক্ষার্থ যুদ্ধস্থলে আত্মবিসর্জ্জন করিতে অগ্রসর হয় নাই? তাহারা কি রাজ-পুতদিগের ন্যায় জীবনকে তুচ্ছ ও মৃত্যুকে অমৃত জ্ঞানে অতুলসমৃদ্ধিশালী মোগল-পাঠানের সহিত যুদ্ধ করিতে যায় নাই? পাঠক! একবার অতীত ইতিহাসের আলোচনা কর, দেখিবে, তোমরা কি ছিলে, কি হইয়াছ;—দেখিবে, তোমরা কোন উচ্চ শিখর হইতে অবনতির গাঢ়তম অন্ধকারাচ্ছন্ন

গহ্বরে নিপতিত হইয়াছ ! তখন হৃদয়ে গৌরবময়ী বৈদ্যুতিক-শক্তির সঞ্চার অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিবে ; ভাবিবে, আমরা কি সেই বাঙ্গালী ? বর্ত্তমান সময়ে আমরা যেমন দীন দরিদ্র বাহুবলহীন ও দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত, কঙ্কালসার দেহে জীবনযাপন করি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সেরূপ ছিলেন না। তাঁহাদের বাহুতে বল ছিল, হৃদয়ে সাহস ছিল, তরবারির ভীষণ আঘাতে শত্রুর মুণ্ড ছিন্ন করিবার শক্তি সামর্থ্যও ছিল। তখনকার বাঙ্গালী ভীরুতা কি, তাহা জানিত না ; তাহারা বিলাসব্যসনাসক্ত ছিল না ; দুর্ভিক্ষ ও অন্নকষ্ট কি, তাহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারিত না। তখন এক দিকে যেমন শস্য-শ্যামলা সোনার বাঙ্গলার ক্ষেতে ক্ষেতে সোনা ফলিত, সেইরূপ বীর্য্যবতী বঙ্গ-নারীগণও বীরকুমার প্রসব করিতেন। সে সময়ে শান্তি ও সুখ, ধীরত্ব ও ও বীরত্ব সম্মিলিতভাবে বঙ্গের কুটীরে কুটীরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

মেঘনার উপকূলে কেদারের সহিত মোগলের নৌ-যুদ্ধ।

এ দিকে দেখিতে দেখিতে মানসিংহের এক শত রণতরী তীরবেগে আসিয়া মেঘনার উপকূলে উপনীত হইল। মানসিংহ শ্রীপুর নগরী বিধ্বস্ত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। বৈশাখের মধ্যভাগে বাঙ্গালী ও মোগলের তুমুল যুদ্ধ বাধিল। সেদিন নীলমেঘাবৃত গগনতলে প্রচণ্ড বায়ুর তীব্র আস্ফালনে মেঘনা প্রবল উচ্ছ্বাসে বহিয়া যাইতেছিল। আকাশে থাকিয়া থাকিয়া বিদ্যুৎ ঝলসিতেছিল। সেই প্রকৃতির ভীষণ বিপ্লবের মধ্যে মেঘ ও কামানের গর্জ্জনে বাঙ্গালী ও মোগলে ভীষণ সংগ্রাম চলিতে লাগিল। এক দিকে স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থ বঙ্গবীরগণ প্রাণবিসর্জ্জন দিতে রণরঙ্গে মাতিয়াছেন ; অপর দিকে বাহুবলদৃপ্ত দিগ্বিজয়ী মোগল সেনানী। এক দিকে স্বার্থ, ঐশ্বর্য্য ও সুখের বিশ্বগ্রাসিনী কামনা ; অন্য দিকে হৃদয়ের তপ্তশোণিতদানে স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষার্থ মৃত্যুবাসনা ; সে বাসনায় স্বার্থ নাই—মোহ নাই। আছে কেবল স্বাধীনা বঙ্গজননীর কল্যাণময়ী মূর্ত্তির শ্রীচরণসেবার আকাঙ্ক্ষা।

ভৈরব রবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। সে প্রলয়-তাণ্ডবে মেঘনার তরঙ্গভঙ্গে উভয় পক্ষের রণতরী নাচিতে নাচিতে পরস্পরের সন্নিহিত হইতে লাগিল। "আল্লা হো আক্‌বর !" ও 'জয় মা কালী !" ধ্বনি সুদূর দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইল। তীরে উৎসুক নরনারী ব্যাকুলহৃদয়ে দেশের মঙ্গল প্রার্থনা

কেদার কি তাঁহার মাতৃভূমি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না? বাঙ্গালীর বাহুতে কি বল অন্তর্হিত হইয়াছে? সত্য সত্যই কি দেশ বীরশূন্য হইয়াছে? অই শোন, চতুর্দ্দিকে প্রলয়-মন্দ্রে ধ্বনিত হইতেছে,—কখনই না! কেদারকে যে আজ তাঁহার গুরুদেব সিদ্ধ সাধক গোসাঞি ভট্টাচার্য্য দেবী ছিন্নমস্তার আশীর্ব্বাদী বিল্বপত্র দিয়া বলিয়াছেন, "যাও বৎস, ভয় নাই—মায়ের বরে তুমি নির্ব্বিঘ্নে রণজয়ী হইবে,—মোগলবাহিনীর সাধ্য কি যে, তোমায় পরাজিত করে?" তেজস্বী ব্রাহ্মণসন্তানের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইবে, ইহাও কি কখনও সম্ভব? কখনও নহে—কখনও নহে। সেই দিন সেই ভীষণ সমরে, মেঘনার সেই ভয়ঙ্কর জলযুদ্ধে মোগল সৈন্য পরাজিত হইল। বিজয়োন্মত্ত বঙ্গসৈন্যের প্রবল আক্রমণ তাহারা রোধ করিতে সমর্থ হইল না। একে একে মোগল রণতরী মেঘনা-বক্ষে নিমজ্জিত হইল। "জয় বাঙ্গালীর জয়!" "জয় কেদারের জয়!" রব কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! মেঘনার তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে, জীমূতের প্রবল মন্দ্রে, বাতাসের উন্মত্ত রোলে বিক্রমপুরাধিপতির বিজয়বার্ত্তা দিকে দিকে ঘোষিত হইতে লাগিল। (৪)

মধু রায় ও মুকুটপুর।

বীরেন্দ্র মধুরায় এই ভীষণ যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মধু রায় স্বীয় বীরত্বের জন্য মুকুট রায় নামে অভিহিত হইতেন, সে কালে মুকুট রায় উপাধি বিশেষ গৌরবব্যঞ্জক ছিল। (৫) বিক্রমপুরে অদ্যাপি মধু মুকুট রায়ের প্রাচীন স্মৃতি-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। মুকুট রায় যে স্থানে স্বীয় বাসস্থান (রাজধানী) নির্ম্মাণ করেন, তাহা এখনও মুকুটপুর (মটুকপুর) নামে কথিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার খনিত দীর্ঘিকাসমূহ ও প্রায় ৮০ হাত প্রশস্ত পদ্মাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাজপথ বিদ্যমান থাকিয়া মুকুটপুরের দীঘী

(৪) * * * Cadry lord of the place, where he was suddenly assaulted with one hundred cosses, sent by Mansinga, Governor under the Mogal, who having subjected that tract to his master sent forth this Navie against Cadry. Mandary a mnd famous in these parts being Admiral; where after a bloudie fight Mandry was slain.

—Parch's Pilgrims Pt. IV. BK. V. P. 513.

(৫) এই মধুমুকুট রায়ের সহিত বর্দ্ধমান জেলার জাহাঙ্গীরাবাদ পরগণাভুক্ত পূর্ব্বস্থলী

ও দরজা নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। বিক্রমপুরস্থ (বর্ত্তমান উত্তর বিক্রমপুরের) ধীপুর ও রাউতভোগ গ্রামের প্রান্তভাগে যে সুরক্ষিত "দেউল বাড়ী"র ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়, উহাই তাঁহার বাটীর অন্তঃপুর ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ বাটীর চতুর্দ্দিকে যে বিস্তৃত গড় খনিত হইয়াছিল, উহা এখনও "দেউল গড়" নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। এই দেউল-বাড়ীর পূর্ব্ব-উত্তর দিকে যে দু'টি অব্যবহার্য্য দীঘী আছে, তাহাতে সময় সময় কারুকার্য্যবিশিষ্ট চৌকাট, কবাট ও অন্যান্য অনেক প্রাচীন বস্তু পাওয়া যায়। অনুসন্ধান করিলে যে আরও পাওয়া যাইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? মধু মুকুট রায়ের কোনও বংশধর অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন কি না, তাহার কোন সন্ধান পাই নাই। তবে তাঁহার জ্ঞাতি ও দেওয়ান শ্রীপতি রায়ের অধস্তন দশম পুরুষ রাউতভোগ গ্রামে "দে-সরকার" নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন। এই শ্রীপতি রায়ের তৃতীয় পুরুষ শ্রীরূপ রায় নবাবের কর্ম্মচারী ছিলেন, এবং বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা বহুদিন হইতেই রাউতভোগ গ্রামে বাস করিতেছেন। মধু রায়ের বাড়ীর দ্বারপণ্ডিত যোগেশ্বর চক্রবর্ত্তীর বংশধরগণও অদ্যাপি জীবিত আছেন। এই জলযুদ্ধে কেদার রায়ের পর্ত্তুগীজ সেনাপতি কার্ভালো শরবিদ্ধ হইয়াও বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জলযুদ্ধে বাঙ্গালীর এইরূপ বীরত্ব অন্য কোথাও প্রদর্শিত হইয়াছে কি না, জানি না। বৈদেশিক ঐতিহাসিকেরাও স্ব স্ব গ্রন্থে এই যুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন।

বংশ-পরম্পরায় এই সমর-কাহিনী নানা প্রকার কল্পনার বর্ণবিচিত্রতায় রঞ্জিত করিয়া বিক্রমপুরের পল্লীবৃদ্ধেরা গল্প করিয়া থাকেন। স্বয়ং দেবী ভগবতী আসিয়া কেদারের সহায়তা করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদের বিশ্বাস।

সে দিন মেঘনার চঞ্চল বক্ষে তরঙ্গের উন্মত্ত নর্ত্তন কল্পনা করিয়া অতীত কাহিনী মনে পড়িয়া অলক্ষ্যে একবিন্দু তপ্তাশ্রু পতিত হইল; শ্মশান বিক্রমপুরে এখন কি আছে? সেই গর্ব্ব, সেই বীরত্ব, সেই একতা, সেই মহত্ত্ব এখন বিস্মৃতির সাগরে লীন হইয়াছে।

নৌযুদ্ধের পরাজয়কাহিনী মানসিংহের নিকট পহুঁছিলে, তিনি কেদার রায়কে বিধ্বস্ত করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন, এবং ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে

বাঙ্গলার স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিলেন না। প্রতাপের পরে মুকুন্দ রায়ের রাজধানী ভূষণা নগরী বিধ্বস্ত ও হস্তগত করিয়া মোগল সেনাপতি মোগল-বাহিনী সহ বিক্রমপুরে আগমন করেন। কথিত আছে যে, মানসিংহ শ্রীপুরের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে শিবিরসংস্থাপন করিয়া যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে কতিপয় দূত সহ তরবারি, শৃঙ্খল ও একখানি লিপি চাঁদ রায়ের নিকট প্রেরণ করেন। লিপিতে এইরূপ লিখিত ছিল,—

“ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী,
সকল পুরুষমেতৎ ভাগি যাও পালায়ী,
হয়-গজ-নর-নৌকা-কম্পিতা বঙ্গভূমি,
বিষম-সমর-সিংহো মানসিংহঃ প্রযাতি ॥”

কেদার রায় মানসিংহের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তরবারিখানি গ্রহণ করেন, এবং দূতের নিকট শৃঙ্খল প্রত্যার্পণ করিয়া তদীয় পত্রের নিম্ন-লিখিতরূপ উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন,—

“ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকম্।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ ॥”

মানসিংহ কেদার রায়ের নিকট হইতে এইরূপ উত্তর পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ শ্রীপুর নগরী অবরোধ করিবার জন্য এক দল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সেই সময়ে কেদারের অধীনে ৫০০ শত রণতরী ছিল। কামানের প্রলয়-গর্জ্জনে, উভয় পক্ষের ঘোরতর অগ্নিক্রীড়ায়, ভীষণ সমরের সূত্রপাত হইল। নয় দিবস তুমুল যুদ্ধ চলিল, কিন্তু কোনও পক্ষেরই জয় পরাজয় হইল না—কেদার রায়ের অদ্ভুত বীরত্বদর্শনে মানসিংহ বিস্মিত হইয়াছিলেন, বাঙ্গালীর বাহুতে যে এত বল, বাঙ্গালী যে আপনার মাতৃভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী বলিয়া বিবেচনা করে, ক্ষত্রকুলকলঙ্ক, মোগলের পাদুকাবাহী মানসিংহের তাহা আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। প্রবাদ এই যে, অবশেষে বিশ্বাসঘাতক শ্রীমন্ত খাঁর সহায়তায় গুপ্ত ঘাতকের সাহায্যে কেদারকে হত্যা করিয়া মানসিংহ বিক্রমপুর-জয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদি কুলাঙ্গার দেশদ্রোহিগণ শত্রুর পক্ষাবলম্বন না করিত, তাহা হইলে যে বাঙ্গালার ইতিহাস বিভিন্ন

করিয়া দশম দিবসে কেদার রায় স্বীয় ইষ্টদেবী দশমহাবিদ্যার মন্দিরে মুদিত নয়নেযখন দেবীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, তখন সেই ধ্যানপরায়ণ মহাবীরকে মোগলপক্ষীয় গুপ্তঘাতক শাণিত তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, উভয় পক্ষে ঘোরতর অগ্নিক্রীড়ার পর কেদার রায় আহত হইয়া মোগলের হস্তে বন্দী হন, এবং মানসিংহের নিকট নীত হইবার অব্যবহিত পরেই তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়। আমাদেরও ইহাই প্রকৃত বলিয়া অনুমিত হয়। (৬) কেদার রায় বীরত্বে প্রতাপাদিত্য অপেক্ষা কোনও অংশেই নিকৃষ্ট ছিলেন না, বরং নৌযুদ্ধে তিনি প্রতাপ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ছিলেন। (৭) বাঙ্গালী যে এককালে বাহুবলে কত দূর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল, প্রতাপ ও কেদার, এই দুই বীরপুরুষের জীবন-চরিতের পর্য্যালোচনা করিলে তাহা আমরা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিতকার রামরাম বসু ও শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন যে, প্রতাপাদিত্য কেদার রায়কে পরাজিত করিয়াছিলেন।—কিন্তু আমরা এ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণই পাই নাই। বোধ হয়, প্রতাপের বীরত্বের সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য উক্ত লেখকদ্বয় ঐরূপ উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

---

(৬) "Raja Mansingh * * * turned his attention towards Kaid Rai of Bengal, who has collected nearly 500 vessels of war and had laid seige to Kilmak the imperial Commander in Srinagur. Kilmak held out, till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally overcame the enemy, and after a furious cannonade took Kaid Rai prisoner, who died of his wounds soon after he was brought before the Raja."—Elliot's History of India VOL. VI. Inayatulla's Takmilla. Akbarnama—P. III) এই ভীষণ যুদ্ধে মোগল সেনাপতি কিলমক্ কেদার রায় কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া শ্রীনগরে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ফতেজঙ্গপুর নামক স্থানে এই রণাভিনয় হইয়াছিল।

(৭) প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় বলেন যে, 'বারভূঞাগণের মধ্যে যদি কাহাকেও সর্ব্বপ্রথম আসন প্রদান করা কর্ত্তব্য হয়, আমাদের বিবেচনায় তবে তাহা বিক্রমপুরের কেদার রায়ের প্রাপ্য। ঈশা খাঁ মসনদ আলি সর্ব্বপ্রধান ছিলেন বটে, কিন্তু পরিণামে তিনিও মোগল-পতাকামূলে মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইলেন। অধিকাংশই তৎপথাবলম্বন করেন, করিলেন না কেবল তিনটি মহাপ্রাণ; বিক্রমপুরের কেদার রায়, ভূষণার মুকুন্দ রায় ও যশোহরের প্রতাপাদিত্য।'—ঐতিহাসিক চিত্র; ১৩১২, বৈশাখ, বীরকাহিনী নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কাঞ্চী বা কাঞ্জীভরম্।

সাধারণ বর্ণনা।

কাঞ্চীনগরী দর্শন করিলাম। এ স্থানের লোকসংখ্যা ৪৬,১৬৪।

ইহারই প্রাচীন নাম কাঞ্চী, বা কাঞ্জীপুরম্ (স্বর্ণনগরী)। যে সাতটি মহাতীর্থ মোক্ষপ্রদ বলিয়া কথিত, কাঞ্চী তাহার মধ্যে অন্যতম। (১) এই নগরী দক্ষিণ-ভারতের কাশী নামে বিখ্যাত। কাঞ্চী নগরী দৈর্ঘ্যে প্রায় পাঁচ ছয় মাইল হইবে। রাস্তাগুলি সমুদয়ই সুপ্রশস্ত। বিশেষতঃ, উহাদের উভয় পার্শ্বে নারিকেলবৃক্ষশ্রেণী থাকায় বড়ই সুন্দর দেখায়। পথের ধারে স্থানে স্থানে বাগান, এবং ছোট ছোট কুঞ্জ। সে সমুদয় ছায়া-নিবিড় স্থানে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর কিরণেও তাঁতীগণ তাঁত পাতিয়া বস্ত্র ইত্যাদি নানাবিধ দ্রব্য বয়ন করিয়া থাকে। নারিকেলবৃক্ষশ্রেণীর শীতল ছায়ায় ও মন্দমন্দ সমীর-সঞ্চালনে তাহারা দ্বিপ্রহরের রৌদ্র-দীপ্ত প্রকৃতির রুদ্রতেজ অনুভব করে না। এই নগরী সাধারণতঃ শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণু-কাঞ্চী, এই দুই ভাগে বিভক্ত। এ স্থানে জলের কল আছে।

ব্রাহ্মণের পাঁচটি ও শূদ্রের একটি হোটেল থাকায় নবাগত যাত্রিগণের আহারাদি সম্পর্কে কোনও অসুবিধা হয় না। ব্যয়ও সামান্য; ৵১০ দশ পয়সা হইতে ।০ চারি আনা পর্য্যন্ত। এতদ্ব্যতীত যাত্রিগণের থাকিবার জন্য দশটি ছত্রম্ আছে। এ সকল ছত্রে থাকিতে পারা যায়, কিন্তু আহারাদির বন্দোবস্ত যাত্রীদিকে নিজে করিয়া লইতে হয়। যাতায়াতের জন্য ঝটকা, গো-যান ইত্যাদি সমুদয়ই পাওয়া যায়।

প্রাচীন ইতিহাস।

চোল রাজ্যের মধ্যে ইহা একটি বিশেষ বিখ্যাত নগরী। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কাঞ্চী টোণ্ডামণ্ডলমের রাজধানী ছিল। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজবংশের পতন হইলে, ইহা গোলকুণ্ডার মুসলমান নরপতির শাসনাধীন হয়। তাহার কিয়ৎকাল পরে ইহা আরকট রাজ্যের অন্তর্গত হয়। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব ফরাসীদিগের নিকট হইতে ইহা অধিকার করেন। কিন্তু ঐ বর্ষেই রাজা সাহেবকে ফিরাইয়া দিতে হয়। ফরাসীরা ১৭৫৭

---

(১) অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥—স্কন্দপুরাণম্।

খৃষ্টাব্দে এই স্থান আক্রমণ করিয়া অগ্নিসাৎ করেন। পর বৎসরে ইংরেজগণ ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে মান্দ্রাজে অভিযান করেন, এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া এই নগর ফরাসীদের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউএন সিয়ং যখন (কি-এন্-চি-পু-লো) কাঞ্চী নগরীতে আগমন করেন, তখন ইহা দ্রাবিড় রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেই সময়ে এই স্থানে এক শতটি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ও ৮০টি দেবমন্দির ছিল। ধর্ম্মপাল বোধিসত্ব কাঞ্চীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বৌদ্ধগণ এই স্থানকে পুণ্যভূমি বলিয়া মনে করিত। সেই জন্য এ স্থানে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু-যাত্রী সমাগত হইত। পাণ্ড্যরাজগণের সময়ে এ স্থানে জৈন ধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। জৈনগণ এ স্থানের বহু বৌদ্ধ অধিবাসীকে বিতাড়িত করেন।

এই নগরের অনতিদূরে পুল্ললপুর নামক একটি স্থান দৃষ্ট হয়। পুল্ললপুরে ইংরেজ ও মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে বিখ্যাত হাইদার আলি জেনারেল বেলীর সৈন্যব্যূহ ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঘটনা ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ঘটে। যখন কাঞ্চীপুরে বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৮) রাজ্যাভিষিক্ত হন, তখন তিনি কাঞ্চীপুরের শতস্তম্ভ মঠ ও কতক-গুলি মন্দির সংস্কৃত করিয়াছিলেন।

১৪৩১ শকে ক্ষোদিত একখানি অনুশাসনপত্র হইতে জানা যায় যে, অত্রত্য বরদরাজ স্বামীর মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ তিনি কয়েকখানি গ্রাম প্রদান করিয়াছিলেন। এই সমুদয় গ্রাম হইতে প্রায় এগার শত টাকা কর আদায় হইত। কাঞ্চীনগরী যে কেবল তীর্থস্থান, তাহা নহে। ইহা একটি মহা পীঠস্থানও বটে। বৃহন্নীল তন্ত্র বলেন,—

"কাঞ্চ্যাং কনককাঞ্চী স্যাদবন্ত্যামতিপাবনী।

—বৃহন্নীলতন্ত্রে পঞ্চম পাঠ।

তোড়ল তন্ত্রের মতে, এই তীর্থ মহাদেবের কটিদেশস্বরূপ। যথা,—

নাভিমূলে মহেশানি অযোধ্যাপুরী সংস্থিতা।
কাঞ্চীপীঠং কটিদেশে শ্রীহট্টং পৃষ্ঠদেশকে॥

—তোড়লতন্ত্র; ৭ম উল্লাস।

কাঞ্চীতে প্রস্তরনির্ম্মিত বহু মন্দির, মূর্ত্তি ও নানাপ্রকার প্রাচীন ঐতি-

দর্শনযোগ্য। প্রত্যেক মন্দিরের প্রত্যেক প্রস্তরস্তম্ভে কত প্রাচীন তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন, তাহা কে বলিতে পারে? কত স্মৃতি, কত শিল্প, কত ধনৈশ্বর্য্যের গৌরবস্তম্ভ এই সমুদয় মন্দিরসমূহে বিদ্যমান; তাহার উদ্ধার দৈবজ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষ ব্যতীত অপরের পক্ষে অসম্ভব। ইহা দেখিবার, কিন্তু বুঝাইবার নহে। প্রাচীন শিল্প-নৈপুণ্য ও স্থপতিবিদ্যার অভূতপূর্ব্ব কৌশলে বিমুগ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু কাহাকেও তাহা বুঝাইতে পারি, এমন শক্তি নাই।

শিব-কাঞ্চী।

শিবকাঞ্চীতে শিব-মন্দির ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু-মন্দির অবস্থিত। শিব-কাঞ্চীতে একাম্রনাথ, ভগবতী কামাক্ষী দেবীর মূর্ত্তি, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিমূর্ত্তি ও সমাধিস্থান। বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজস্বামী নামক বিষ্ণুর উলঙ্গ মূর্ত্তি। এতদ্ব্যতীত বেগবতীধারাতীর্থ, রবিতীর্থ, সোমতীর্থ, মঙ্গলতীর্থ, বুধতীর্থ ও শনিতীর্থ প্রধান। আমরা সর্ব্বপ্রথমে শিব-কাঞ্চী দর্শন করিলাম। এ দেশীয় লোকের নিকট ইহা বারাণসীতুল্য। শিব-কাঞ্চীর এই মন্দিরটি একাম্রনাথের নামে উৎসর্গীকৃত। এই শিবলিঙ্গ দক্ষিণ-ভারতের বিখ্যাত পঞ্চলিঙ্গমের অন্যতম। মন্দিরের সুবৃহৎ ও সুউচ্চ গোপুরমটি বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। ইহাতে অদ্যাপিও হাইদার আলির কামানের গোলার আঘাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বসন্তকালে এখানে পঞ্চদশ-দিবসব্যাপী মেলা বসে। বড় গোপুরমটি ব্যতীত এই মন্দিরে আরও কয়েকটি ছোট ছোট গোপুরম ও সুবৃহৎ মণ্ডপ আছে। ইহার একটি অট্টালিকাতে এক হাজার প্রস্তরস্তম্ভ বিদ্যমান। পাঠক! একবার কল্পনা করুন যে, প্রাচীন ভারতে স্থপতিবিদ্যা কত দূর উন্নত ছিল! যে গৃহে সুবৃহৎ নানাপ্রকার কারুকার্য্যে খচিত সহস্র স্তম্ভ বিদ্যমান, সে গৃহটি কত বৃহৎ, এবং তাহা নির্ম্মাণ করিতে কত অর্থব্যয়, কত পরিশ্রম, কত শিল্পী ও পরিশ্রমীর আবশ্যক হইয়াছিল! এ স্থানের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তর গোপুরমটি দশতালা, তাহার উচ্চতা ১৮৮ ফিট; ইহা সমচতুষ্কোণ; ইহার প্রত্যেক দিক্ই ৭৪ ফিট দীর্ঘ। যখন আমরা ইহার পাদদেশে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন আমরা ইহার উচ্চতা ও শিল্প-নৈপুণ্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম! সুপ্রশস্ত ও সুকঠিন গ্রেনাইট প্রস্তর দ্বারা ইহার কলেবর গ্রথিত। এমন একটু স্থান নাই, যে স্থানে কোনও লতা পাতা ফুল ফল বা কোনও পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্ত্তি

কিরূপে যে দুরবর্ত্তী পর্ব্বতসমূহ হইতে এই সকল প্রস্তরখণ্ড আনীত হইয়াছিল, এবং কত দিনে কত পরিশ্রমে কিরূপ অধ্যবসায়ে যে ইহাদের গঠন হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে এক দিকে বিস্ময় ও অপর দিকে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। হায়! হায়! মহাকালের করাল শাসনে কত উন্নত অবস্থা হইতেই না আমাদের চরম অধঃপতন হইয়াছে! প্রত্যেক গোপুরমেই উঠিবার সোপান আছে। এইগুলির উপর আরোহণ করিলে চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্যাবলী আলেখ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সিঁড়িগুলি খুব উঁচু, এবং সিঁড়ির পথ এত অন্ধকার যে, আলোর সহায়তা ভিন্ন তদুপরি আরোহণ করা অসম্ভব। আমরা সঙ্গে প্রদীপ লইয়াছিলাম।

বিষ্ণুকাঞ্চী।

বিষ্ণুকাঞ্চীর বিষ্ণুমন্দির শিবকাঞ্চী হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। বিষ্ণু-মন্দিরের নিকটস্থ মণ্টপমের একটি হলে একশতটি স্তম্ভ আছে। প্রত্যেক স্তম্ভে নানাজাতীয় জন্তুসমূহের দেহ অতি সজীবভাবে ক্ষোদিত। কোনটিতে অশ্বারোহী অশ্বারোহণে দ্রুত-গমনে যাইবার জন্য তুরঙ্গপৃষ্ঠে কশাঘাত করিতেছে; কোথাও বা অসিহস্তে যোদ্ধা যুদ্ধে যাইবার জন্য ব্যগ্র! এবংবিধ বহু প্রকারের ক্ষোদিত মূর্ত্তির সজীবতা দর্শন করিলে বিস্ময়ে তন্ময় হইতে হয়।

পৌরাণিক তত্ত্ব।

কাঞ্চীনগরীর উৎপত্তি বিষয়ে পুরাণে কথিত আছে যে, মহাদেবের মতে ইহা শ্রীক্ষেত্র, রামেশ্বর, এমন কি, কাশী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। এ স্থান যাহারা দর্শন করে, এবং এ স্থানে যাহারা বাস করে, তাহারা অনায়াসে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। ভবানী-পতি আরও বলেন যে, "আমি সমস্ত শাস্ত্রকে আম্র-বৃক্ষরূপে রাখিয়া লিঙ্গরূপে একাম্রনাথ নামে অভিহিত হইয়া এ স্থানে বাস করিতেছি। কাঞ্চীতে বাস করিলে মানুষ সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। প্রলয়েও এই নগরীর বিনাশ নাই, আমি সে সময়ে ইহাকে ত্রিশূলে রক্ষা করিব।

দাক্ষিণাত্যের লোকেরা এ স্থানে মৃত্যু হইলে মুক্তি হয় বলিয়া বিশ্বাস করে। আর্য্যাবর্ত্তের লোকেরা যেমন জীবনের শেষভাগে কাশীতে বাস করিয়া থাকে, দাক্ষিণাত্যের লোকেরাও তদ্রূপ কাঞ্চীতে বাস করে। এ স্থানের একাম্রনাথ লিঙ্গ ক্ষিতিমূর্ত্তি। তজ্জন্য অন্যান্য দেবালয়ের ন্যায় এ স্থানে জলাভিষেক হয় না।

প্রাচীন আম্রবৃক্ষ।

সুন্দর ও পুরাতন। এই মন্দির এক সময়ে এক জন রাজা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয় নাই; ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ইহার বিপুল কলেবর সমাপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহার মূল মন্দির চোল রাজারা নির্ম্মাণ করেন, এবং গোপুরম ইত্যাদি পরে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণদেব রায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে একটি প্রাচীন সহকার বৃক্ষ বিরাজমান। বৃক্ষটি কত কালের, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। তবে তিন চারি শত বৎসর কিংবা তাহারও অধিক প্রাচীন হইতে পারে। স্থানীয় জন-সাধারণের বিশ্বাস, এই বৃক্ষটি অনন্তকালের সাক্ষী, এবং সর্ব্বশাস্ত্ররূপী। এই সহকার তরুর চারিটি শাখায় মিষ্ট, কটু, তিক্ত ও অম্ল, এই চারি প্রকারের আম্র ফলিয়া থাকে। যাঁহারা এই বৃক্ষের ফল খাইয়াছেন, তাঁহারা ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। মন্দিরস্থ পুরোহিতেরা বলেন যে, পূর্ব্বে প্রত্যহ একটি করিয়া সুপক্ক আম্র এই বৃক্ষ হইতে পাওয়া যাইত, এবং তাহাই একাম্রনাথকে ভোগ দেওয়া হইত। এখন আর প্রত্যহ সেরূপ আম্র পাওয়া যায় না। অনেকে এই হইতেই একাম্রনাথের নামোৎপত্তির সিদ্ধান্ত করেন। একাম্রনাথের মন্দিরের সন্নিহিত কামাক্ষী দেবীর মন্দির একাম্রনাথের মন্দির অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। কামাক্ষীদেবীর মন্দিরোৎপত্তি সম্বন্ধে স্থলপুরাণে লিখিত আছে যে, একদা দেবী ভগবতী কৌতুহলপরবশা হইয়া পশ্চাদ্দিক হইতে দেবাদিদেব মহাদেবের চক্ষুস্ত্রয় হস্ত দ্বারা আবরণ করিয়াছিলেন; ইহাতে মুহূর্ত্তমধ্যেই সৃষ্টি-বৈষম্যের সম্ভাবনা ঘটিল। কারণ, সূর্য্য, চন্দ্র ও বহ্নি, এই ত্রিনয়ন আচ্ছাদিত হইলে কিরূপে আলো প্রকাশিত হইবে? ভগবতীর এইরূপ গর্হিত কার্য্য করায় পাপের সঞ্চার হইল। মহাদেব এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত ভগবতীকে পৃথিবীতে আসিয়া কাঞ্চীপুরস্থ একাম্রনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থিত কম্পা নদীর তীরে তপস্যা করিবার আদেশ করিলেন। যখন ছয় মাস উত্তীর্ণ হইল, তখন মহাদেব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মহেশ্বরীকে দর্শন দিলেন, এবং তাঁহাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন। কামাক্ষী দেবীর মন্দিরের ইহাই পৌরাণিক ইতিহাস। ফাল্গুন মাসে যখন এখানে পঞ্চদশদিবসব্যাপী একাম্রনাথের উৎসব হয়, তখন উহার দশম দিবসের রাত্রিতে কামাক্ষীদেবীর ভোগমূর্ত্তির * সহিত একাম্রনাথের ভোগমূর্ত্তি একত্র রাখা হয়।

* দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক মন্দিরেই বিগ্রহের দুইটি করিয়া মূর্ত্তি আছে, তাহার একটি পূজার, অপরটি ভোগমূর্ত্তি। উৎসব ইত্যাদিতে ভোগমূর্ত্তিই প্রদর্শিত হয়।

বিষ্ণু-মন্দিরের পৌরাণিক ইতিহাস।

কামাক্ষী দেবীর মন্দিরপ্রাঙ্গণে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমাধি আছে। সমাধির উপরে তাঁহার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। আমরা বিষ্ণুমন্দিরের পৌরাণিক ইতিবৃত্তও এ স্থানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। স্থলপুরাণে লিখিত আছে যে, কোনও সময়ে ব্রহ্মা যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত কাঞ্চীপুরে স্থান নির্দ্দেশ করেন। সরস্বতী দেবী ব্রহ্মার এই যজ্ঞের কথা অবগত ছিলেন না। তিনি নারদপ্রমুখাৎ বিবরণ অবগত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিতা হইলেন, এবং যজ্ঞস্থল ভাসাইয়া দিবার জন্য নদীরূপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা প্রমাদ গণিলেন। তিনি অবশেষে নিরুপায় হইয়া বিষ্ণুর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। বিষ্ণু যজ্ঞরক্ষার্থ সরস্বতীর গতিরোধে প্রবৃত্ত হইলেন। সরস্বতী দেবীও সহজে হটিবার পাত্রী নন। তিনিও অন্তঃসলিলা হইয়া প্রবাহিতা হইতে লাগিলেন। বিষ্ণু নিরুপায় হইয়া অবশেষে উলঙ্গদেহে এদোক্ষোরী নামক স্থানে নদীমুখে পতিত হইলেন। দেবী সরস্বতী বিষ্ণুর উলঙ্গ-মূর্ত্তিদর্শনে লজ্জিতা হইয়া আপনার সঙ্কল্পপরিত্যাগে বাধ্য হইলেন। ব্রহ্মাও নির্ব্বিবাদে হয়-মাংস আহুতি দিলেন। বিষ্ণু সেই হুত মাংস ভক্ষণ করিতে করিতে যজ্ঞীয় অগ্নিমধ্যে আবির্ভূত হইলেন। বিষ্ণুর মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সমবেত ঋষি ও ঋত্বিকগণের ঐকান্তিক প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া কাঞ্চী নগরে শ্রীবরদরাজস্বামিরূপে তিনি বিরাজ করিতে লাগিলেন।

কিংবদন্তী এই যে, একাদশ শতাব্দীতে কাঞ্চীপুরের শাসনকর্ত্তা গঙ্গাগোপাল রাও এই বিষ্ণুমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন। বরদরাজের কৃপায় তাঁহার পুত্রসন্তান হয়। সে জন্য তিনি এক শিব-মন্দির ভগ্ন করিয়া সেই ইষ্টক দ্বারা এই বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে বরদরাজস্বামীকে আনাইয়া প্রতিষ্ঠিত করেন।

এই বিষ্ণুমন্দির হইতেই এই স্থানের নাম বিষ্ণুকাঞ্চী হইয়াছে। বিষ্ণু-মন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে বিজয়নগরের কৃষ্ণরায় কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বিখ্যাত শতস্তম্ভ মণ্ডপ বিদ্যমান। একখানি প্রস্তর কাটিয়া এই সুবৃহৎ মণ্ডপটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে আরও কয়েকটি মণ্ডপ আছে। তন্মধ্যে বাহন মণ্ডপ ও কল্যাণ মণ্ডপই শ্রেষ্ঠ। এই মন্দিরের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ ৩০০০৲ টাকা আয়ের একখানি গ্রাম এবং মান্দ্রাজ গবর্মেণ্ট হইতে ৯৯৬১৲ টাকা

প্রদান করিয়াছিলেন। এই দেবমন্দিরস্থ মণি মুক্তাদির মূল্য লক্ষ টাকার অধিক হইবে। বৈশাখ মাসে এ স্থানে দশদিবসব্যাপী মহোৎসব হয়। তখন এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। কাঞ্চী নগরীর দুই মাইল দূরবর্ত্তী ত্রিপতিকুণ্ড্রম নামক স্থানের জৈন মন্দির ও মসজিদ দর্শনীয়। বিজাপুরের বিখ্যাত ফকীর হজরৎ সাহেবের কবরের উপর এই মস্জিদটি নির্ম্মিত হইয়াছে। এ স্থানে উচ্চ-ইংরেজী-বিদ্যালয়, আফিস আদালত প্রভৃতি সমুদয়ই আছে। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।

ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। পঞ্চদশ ভাগ; চতুর্থ সংখ্যা। পরিষৎ-পত্রিকায় মাসের কোনও উল্লেখ নাই! পরিষৎ কি কাল-সমুদ্রের লহরী গণনা করিবেন না? শ্রীহরমোহন মজুমদার 'আয়ুর্ব্বেদে অস্থিবিদ্যা প্রবন্ধের মীমাংসা' করিয়াছেন, এবং পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু ফুটনোটে লিখিয়াছেন,—'মীমাংসক পূর্ব্বপ্রবন্ধের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি উপস্থিত করিয়াছেন, প্রবন্ধলেখক কবিরাজ মহাশয় তাহার উপযুক্ত উত্তর পাঠাইয়াছেন। সুতরাং এ অস্থি-যুদ্ধ এখন চলিল। শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'স্বাভাবিক অবস্থায় উদ্ভিদের চরিত্র' নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি অত্যন্ত উপাদেয়। 'নাদির-উন্-নিকাৎ' প্রবন্ধে শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী লিখিয়াছেন,—'পারসী ভাষায় 'নাদির-উন-নিকাৎ' নামে সাতখানি পুস্তক প্রচলিত আছে। এই সাতখানি পুস্তকের অভিপ্রায় এক এবং প্রতিপাদ্য বিষয়ও এক। কিন্তু সাত জন ভিন্ন ভিন্ন লেখক এই সাতখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। সাত জন গ্রন্থকার হিন্দু এবং উচ্চবর্ণের সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। ইঁহাদের মধ্যে ক্ষত্রিয়জাতীয় যদুদাস এবং ব্রাহ্মণবর্ণভুক্ত রাই চাঁদ পণ্ডিতের পুস্তকদ্বয় অত্যুৎকৃষ্ট এবং সুপরিচিত। এই উপাদেয় পুস্তকে হিন্দুর বেদান্তমত ও মুসলমানের সুফী মতের আধ্যাত্মিক ভাবে এরূপ নিরপেক্ষরূপে ও পাণ্ডিত্য সহ আলোচনা করা হইয়াছে যে, হিন্দু ও ইশ্লাম এতদুভয়ে ইহাকে সারবান এবং অতীব প্রয়োজনীয় শাস্ত্র বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন।' লেখক সংক্ষেপে এই গ্রন্থের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত 'একখানি প্রাচীন চৌতিশা'র পরিচয় দিয়াছেন। এস্. বসুর 'কোচ ও রাজবংশীয় জাতিতত্ত্ব' উল্লেখযোগ্য। ইঁহার 'কোচ ও রাজবংশী শব্দসংগ্রহ'ও পরিষদের উপযোগী। শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ 'সিলেট নাগরী'র ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীদেবনারায়ণ ঘোষ 'ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রাচীন কবি' প্রবন্ধে 'ডাকে'র ইতিহাস

উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীকেদারনাথ মজুমদার 'কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র পুরাণ' প্রবন্ধে মহারাষ্ট্রপুরাণ সম্বন্ধে শ্রীব্যোমকেশ মুস্তোফীর মতখণ্ডনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদের 'মোসলমান নামতত্ত্ব' আলোচনার যোগ্য। পরিষৎ-পত্রিকার প্রবন্ধের সূচীপত্রে বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু রচনায় উৎকর্ষ নাই। সম্পাদক মহাশয় পত্রিকার গৌরব-রক্ষায় অবহিত হইলে আমরা সুখী হইব। কেবল পাদপূরণে পত্রিকার দামোদর পূর্ণ করিয়া কোনও লাভ নাই।—পরিষৎ একখানি কাশীদাসী মহাভারতের পাণ্ডুলিপি উপহার পাইয়াছেন। দেখিতেছি, তাহাতে 'সৌণ্ডিক পর্ব্ব' আছে! ইহা কি 'সৌপ্তিক পর্ব্বে'র পরিষৎ-প্রদত্ত রূপ? অথবা মাতালের মনোরঞ্জনের জন্য কাশীদাস 'শৌণ্ডিক পর্ব্ব' রচিয়া গিয়াছিলেন?

প্রবাসী। শ্রাবণ। 'সঙ্কলন ও সমালোচনে' 'স্বাস্থ্যনীতির অনুশাসন' সকলেরই পাঠ করা উচিত। 'আধুনিক সাহিত্য' ও 'রচনায় অপূর্ব্বতা' উল্লেখযোগ্য। শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'মেথর' নামক কবিতায় লিখিয়াছেন,—

'এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম্ম করি' লাঞ্ছনা সহিতে।'

নবীন কবির তরুণ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস উপভোগ্য বটে, কিন্তু তাঁহার 'মেথর' কবিতার বস্তু নহে। কল্যাণের কর্ম্ম করিয়া যাহারা লাঞ্ছনা সহ্য করে, কবিতাটি তাহাদের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু মেথর যে পৃথিবীকে 'নির্ম্মল' করে, তাহা নিষ্কাম কল্যাণ-চিকীর্ষার ফল নহে। মেথরের পক্ষে তাহাই জীবিকা। সে কবিতা লিখিতে পারে না, হাইকোর্টের বিচারপতি হইবারও তাহার যোগ্যতা নাই, তাই সে এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। তাহার বৃত্তি পরার্থমূলক নহে। সুতরাং সত্যেন্দ্রনাথ কবিতায় 'মেথরে'র যে গৌরবঘোষণা করিয়াছেন, তাহা হাস্যরসেরই উদ্দীপক হইয়াছে। মেথরকে ঘৃণা করিতে বলিতেছি না। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ মেথরে দধীচির ন্যায় যে আত্মত্যাগের আরোপ করিয়াছেন, তাহাতে সে ভাবের অত্যন্ত অভাব। যে বিধানে কেহ মেথর-বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়, কেহ বা বাদশাহ হইয়া থাকে, সে বিধান কিরূপ, বলিতে পারি না। ইউরোপে দাস দাসীরা মেথরের কর্ত্তব্য পালন করে; কিন্তু তাহারা এ দেশের মেথরের ন্যায় অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হয় না। আজ যে মেথর, পুরুষকারবলে কাল সে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হইতে পারে। ইউরোপে সে পথ মুক্ত। সকল সমাজেই বৈষম্য আছে। বৈষম্য সর্ব্বত্র সমর্থনযোগ্য, তাহাও বলিতে পারি না।—কিন্তু সে স্বতন্ত্র প্রশ্ন। সেই বৈষম্যের ফলে সমাজে যাহারা পদদলিত হয়, তাহাদের লাঞ্ছনায় করুণার উদ্রেক হয় বটে, কিন্তু যাহারা করুণার পাত্র, তাহারাই ত্যাগী, লোকহিতকামী নহে। যাঁহারা স্বেচ্ছায় সেবাব্রত, শুশ্রূষাকারিণীর ব্রত গ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে 'নির্ম্মল' করেন, তাঁহারা 'গঙ্গাজল' হইতে পারেন, মেথর-সাধারণকে সেই পর্য্যায়ে পরিগণিত করিবার কোনও হেতু নাই। এই জন্য সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাটি ব্যর্থ হইয়াছে। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ক্রমে আমাদের 'অবোধ্য' হইয়া উঠিলেন। তাঁহার একটি গানের প্রথম কলি এই,—

'আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে
গোপন তব চরণ ফেলে

নিশার মত নীরব ওহে
সবার দিঠি এড়ায়ে এলে!'

শ্রাবণের ঘন গহনে পরিণত হইল, তাহাও বুঝিলাম। কিন্তু চরণ কেমন করিয়া 'গোপন' হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সাপের পা 'গোপন' বটে। কিন্তু এ 'গোপন' চরণ কাহার? পরে আছে,—'নীলাঞ্জ নীল আকাশ।' 'নীলাঞ্জ নীল' কি, বুঝিতে পারিলাম না। শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জাপানের ধর্ম্ম' উল্লেখযোগ্য। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের ইংরাজী কবিতা হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক অনূদিত 'সাগরের প্রতি' উপভোগ্য। শ্রীশরচ্চন্দ্র রায় 'মারাঠী জাতির অভ্যুদয়ে' রাণাডের মত আহরণ করিয়াছেন; নিজের মত ব্যক্ত করেন নাই। শ্রীরজনীকান্ত গুহের 'মেগাস্থেনীসের ভারতভ্রমণ' নিরবচ্ছিন্ন সারসঙ্কলন নহে। লেখক এই প্রবন্ধে দুই একটি ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত সঙ্ক্ষিপ্ত 'দুকূলহারা' আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ছোট গল্প নহে। আখ্যানবস্তু উপাখ্যানের যোগ্য,—কিন্তু উদ্ভট। চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মৌলিকতার উৎস! নামে 'শ্রী' নাই, এবং রচনা-ভঙ্গীতেও অদ্ভুত মৌলিকতার পরিচয় দিয়া থাকেন। কিন্তু এবার তিনি গল্পের নামকরণে যে মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে 'রাম উল্টা বুঝিয়াছেন'—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দুকূল-হারা অর্থাৎ 'বিবসনা'ই কি চারুর অভীষ্ট? অথবা যে দু' কূল হারাইয়াছে, এই অর্থ লেখকের অভিপ্রেত? প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি যদি চিত্তাঙ্গ নিবিষ্ট করিতেন, তাহা হইলে এ বিভ্রাট ঘটিত না। শ্রীইন্দুমাধব মল্লিকের 'আমাদের সংসারের নিত্যকার অপচয়' আলোচনার যোগ্য, সর্ব্বথা স্মরণীয়। 'নব বধূ' চিত্রের ব্যাখ্যায় দেখিতেছি,—'এই পুরাতন চিত্রে সেরূপ কোন আড়ষ্টতা নাই। ছবিটি দেখিলেই মনে হয়, যেন তরুণীদ্বয় সত্য সত্যই অগ্রসর হইতেছেন। মল্লিনাথের এইরূপ মনে হইয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের মনে হইতেছে, তিনি যাহাকে 'গতি' মনে করিয়াছেন, তাহাকে 'স্থিতি' মনে করিলেও কোনও ক্ষতি নাই! আর সমস্ত আড়ষ্ট ভাব বোধ হয় অর্দ্ধেন্দুকুমারের অঙ্কিত বুদ্ধদেবই হরণ করিয়াছেন। সুতরাং 'আড়ষ্টতা'র দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। সে জন্য বিলাপ করিয়া কোনও লাভ নাই। 'আড়ষ্টতা'ও যে শব্দশাস্ত্রের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, তাহাও আমরা অস্বীকার করিব না। 'সুজাতা বনদেবতাকে ভোগ দিতে গিয়া তরুমূলে বুদ্ধকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহাকেই দেবতা ভ্রমে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, এবং তাঁহারই সম্মুখে খাদ্যের পাত্র স্থাপন করিলেন।' একটি বাক্যে এত তৎ-শব্দের শ্রাদ্ধ সচরাচর দেখা যায় না। সে যাহা হউক, সুজাতার পদ্মপাণিদ্বয় যে ভাবে বুদ্ধদেবের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, বুদ্ধদেব যদি তরুমূলে উপবেশন না করিয়া উচ্চ তরু-শাখায় সমাসীন থাকিতেন, সেখানেও সুজাতার কর বংশ-দণ্ডদ্বয় তাঁহার সম্মুখে পায়সপাত্র ধরিয়া দিতে পারিত! এমন দীর্ঘতর পাণি আকাশ হইতে চন্দ্র সূর্য্যকেও অনায়াসে পাড়িয়া আনিতে পারে। 'স্বাভাবিকতা'র শ্রাদ্ধই যদি 'প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি'র একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আমরা নাচার। এই চিত্রে প্রাচ্য কেবল একটি বিচিত্র কলস। 'এনাটমী'র বিরুদ্ধ হইলেই কোনও চিত্র যদি অবনীন্দ্র বাবুর যাদুঘরের যোগ্য হয়, তাহা হইলে অচিরে

সাহিত্য, ২০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

ভারতীয় ইতিহাস-প্রসঙ্গ।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষাংশে মিসিয়া দেশে ডিওন নামক এক জন সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের অনেক কাল রোম নগরে অতিবাহিত হয়। গুণমুগ্ধ জনসাধারণ ডিওনকে খৃসোসটম অর্থাৎ স্বর্ণমুখ উপাধি প্রদান করে। কিন্তু তাঁহার ভাষা অতিশয় অলঙ্কারপূর্ণ, বর্ণনা অতিরঞ্জনদুষ্ট। তিনি ভারতবর্ষের বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। এই বিবরণও তাঁহার অন্যান্য রচনা ও বক্তৃতার ন্যায়ই দোষগুণবিশিষ্ট। আমাদের প্রবন্ধের মুখবন্ধস্বরূপ তদীয় ভারত-বিবরণের মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে।

ভারতীয়গণ অত্যন্ত সুখী। তাহাদের নদীতে জল নাই; একটি স্বচ্ছ সুরাপূর্ণ, অন্যটি মধুপূর্ণ, অন্য একটি তৈলপূর্ণ। এই সকল নদী পৃথিবীর বক্ষঃস্থলস্বরূপ শৈলমালা হইতে বহির্গত হইয়া প্রবাহিত হইয়াছে। শক্তিসামর্থ্যে ও আমোদ প্রমোদে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত ভারতবাসীর বহু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানে লোক কষ্টসাধ্য ও অপকৃষ্ট উপায়ে সঞ্চয় করিয়া থাকে;—তাহাদিগকে বৃক্ষ হইতে ফল, গোবৎসকে বঞ্চনা করিয়া দুগ্ধ ও মধুমক্ষিকার চক্র ভগ্ন করিয়া মধু অপহরণ করিতে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের সঞ্চয়-প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিশুদ্ধ। ভারতীয় রাজন্যগণ এক মাস কাল নদ নদী হইতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল সঞ্চয় করেন। ইহাই রাজকর। অবশিষ্ট একাদশ মাস প্রকৃতিপুঞ্জের সঞ্চয়সময়-রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। ভারতীয়গণ নদীর উৎস-স্থানে বা তটদেশে পুত্র-কলত্রাদি সহ ক্রীড়া-কৌতুকে কালযাপন করিতেছে; তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী চিরউৎসবময়। ভারতবর্ষের নদীসমূহের তীরে সতেজ প্রস্ফুট পদ্মফুল সকল চতুর্দ্দিকের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এই সকল পদ্ম অতি সুখাদ্য; অন্যান্য দেশের পদ্মফুলের ন্যায় কেবল গোজাতির আহার্য্য নহে। ভারতবর্ষে এক প্রকার বীজ উৎপন্ন হয়। ইহা গম ও যব অপেক্ষা সুখাদ্য। ইহার খোসা গোলাপফুলের পাপড়ীর ন্যায়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা

বৃহৎ ও সুগন্ধ। ভারতবর্ষীয়েরা ইহার ফল মূল উভয়ই আহার করে। এই বৃক্ষ উৎপন্ন করিতে পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই। তাহাদের স্নানের জন্য দুই প্রকার জলাশয় বিদ্যমান আছে; এক প্রকার জল উষ্ণ ও রৌপ্য অপেক্ষা স্বচ্ছ। অন্য প্রকার জল গভীরতা ও শীতলতা নিবন্ধন ঘননীলাভ। এই সকল জলাশয়ে সৌন্দর্য্যের আদর্শস্বরূপ বালকবালিকাগণ একত্র মিলিত হইয়া সন্তরণ করে। তাহারা স্নানান্তে শ্যামল তৃণ-গুল্মাস্তীর্ণ তীরদেশে সমাগত হয়। তৎকালে আনন্দকোলাহলের ও সঙ্গীতালাপের সুস্বর উত্থিত হইয়া চারি দিক মুখরিত করে। এই তীরদেশ তরুপুষ্প-শোভিত ও নয়নাভিরাম; সমগ্র প্রমোদক্ষেত্র তরুশাখাপ্রশাখায় সমাচ্ছন্ন, ছায়াশীতল; বৃক্ষ সকল ক্ষুদ্র ও ফুলভরে অবনত; ফল সমুদয় অনায়াসে আহরণযোগ্য। ভারতবর্ষে বিহঙ্গের সংখ্যা বহু; তাহাদের কাকলীতে পর্ব্বতরাজি সর্ব্বদা শব্দায়মান; অন্যান্য দেশের বাদ্যধ্বনি অপেক্ষা ঐ সকল বিহঙ্গের সুমধুর অস্ফুট ধ্বনি অধিক শ্রুতিসুখাবহ; বাতাস মৃদু, গ্রীষ্মের প্রারম্ভকালের ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ। আকাশ সুনীল, স্বচ্ছ ও সুন্দর-নক্ষত্ররাজি-পরিশোভিত; অন্য দেশের আকাশ তাদৃশ শোভাসম্পন্ন নহে। ভারতবর্ষীয়েরা ৪০ বৎসর কাল জীবিত থাকে; (১) তাহারা চিরযৌবন-শালী; জরা, রোগ ও অভাব তাহাদিগকে ক্লিষ্ট করে না। যদিও ভারতীয়-গণের সুখভোগের সীমা নাই, তথাপি ব্রাহ্মণ নামক যে এক শ্রেণীর ভারতবাসী দেখা যায়, তাঁহারা স্বদেশবাসীর নিকট হইতে দূরে অব-স্থান করেন। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনায় লোকাতীত শক্তির ধ্যানে তাঁহা-দের জীবন অতিবাহিত হয়। তাঁহারা স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রসাধনায় নিরত হইয়া বহু-বিধ শারীরিক কষ্ট সহ্য করেন; তাঁহাদের তাদৃশ উৎকট কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতা দেখিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। ব্রাহ্মণগণ পরম সত্যের অধি-কারী হইয়াছেন। এই সত্য একবার আস্বাদন করিলে লোকে সমগ্র সত্যের

---

(১) বাগ্মী ডিওন নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, ভারতবাসীর পরমায়ু ৪০ বৎসর। এই নির্দ্দেশ সত্য নহে। কারণ, অনেক গ্রীক লেখক ভারতবাসীকে দীর্ঘজীবী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা দৃষ্টান্তস্বরূপ লিখিতেছি যে, প্যানাডিয়াসের মতে কোনও কোনও স্থানের ভারতবাসীর জীবনকাল ১৫০ বৎসর ছিল। ফিলোষ্ট্রেটোস নামক এক জন গ্রীক লেখক লিখিয়া গিয়াছেন যে, তক্ষশীলায় চারি শত বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তির বাস ছিল। ডিওনের

জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই পরম সত্য অশেষ; তজ্জন্য এই পথের সাধককে চিরকালের জন্য অতৃপ্তভাবে সাধনায় নিযুক্ত থাকিতে হয়।

ডিওন খৃসোসটম কর্তৃক অঙ্কিত ভারতীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সুখ সমৃদ্ধির চিত্র অতিরঞ্জনদুষ্ট ও অতিপ্রাকৃত বর্ণনায় পূর্ণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তদীয় ব্রাহ্মণ-চিত্র সত্যানুমোদিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বৈদেশিক আলেখ্যমাত্রেই ভারতীয় ব্রাহ্মণের চিত্র ভাস্বরবর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে।

বারদিসানেস (বারদিসানেস সিরীয়ার অধিবাসী ছিলেন; খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষ হইতে কতিপয় রাজদূত সিরিয়া দেশে গমন করেন। বারদিসানেস তাঁহাদের নিকট হইতে ভারত-তথ্য সঙ্কলন করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।) নামক এক জন লেখক লিখিয়াছেন,—ব্রাহ্মণগণ একবংশজাত; তাঁহারা বংশানুক্রমে পৌরোহিত্য কার্য্য নির্ব্বাহ ও ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া আসিতেছেন। ব্রাহ্মণগণ কোনও প্রকার রাজকর প্রদান করিতে বাধ্য, অথবা রাজার শাসনাধীন নহেন। ব্রাহ্মণকুলে যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহাদের অনেকে পর্ব্বতে বাস করেন, অনেকের আবাসবাটী গঙ্গানদীর তীরে অবস্থিত। পর্ব্বতবাসী ব্রাহ্মণগণ গোদুগ্ধ ও ফল মূলে জীবনধারণ করেন। নদীতীরবাসিগণের আহার্য্যও কেবল ফলমূল। তবে ফলমূলের অভাবে তাঁহারা নীবার ধান্য সংগ্রহ করিয়াও ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার আহার্য্য বস্তু ব্রাহ্মণসমাজে অপবিত্র ও অধর্ম্মজনক বলিয়া পরিগণিত। এক এক জন ব্রাহ্মণের নিমিত্ত এক একটি কুটীর নির্দ্দিষ্ট আছে। তাঁহারা এই কুটীরে বাস করিয়া প্রায় সমস্ত অহোরাত্র ঈশ্বরোপাসনায় অতিবাহিত করেন। সমাজে বাস, এমন কি, পরস্পরের সাহচর্য্য ও বাক্যালাপও তাঁহাদের অতিশয় অপ্রীতিকর; এই জন্য যদি কোনও কারণবশতঃ তাঁহাদিগকে সামাজিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হয়, তবে তাঁহারা নির্জ্জন স্থানে বাস ও মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেন। ব্রাহ্মণগণ অনেক সময় উপবাস করেন।

ক্লিমেনেস আলেকজেণ্ড্রিনাস ও প্যালাডিয়াস (ক্লিমেনেস খৃষ্টের জন্মের দুই শত বৎসর পরে এবং প্যালাডিনাস খৃষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পরে ভারতবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।) প্রভৃতি আর কতিপয় বৈদেশিক লেখকও ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের সদাচার ও সংযম সম্বন্ধে সাক্ষ্য

প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমরা বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয়ের উল্লেখে বিরত হইলাম। কিন্তু প্যালাডিনাস ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে অশ্রুতপূর্ব্ব প্রথার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এখানে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইতেছে। ব্রাহ্মণগণ গঙ্গার এক তীরে এবং ব্রাহ্মণীগণ গঙ্গার অপর তীরে বাস করেন। বর্ষা-সমাগমে ব্রাহ্মণগণ গঙ্গার অপর তীরে উপনীত হন, এবং চল্লিশ দিন কলত্রাদি সহ বাস করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করেন। তাঁহারা পরিণয়ের পর পাঁচ বৎসর বর্ষাকালে ঐ প্রকার গমনাগমন করেন। কিন্তু পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই যদি কোনও ব্রাহ্মণ দুইটি সন্তান লাভ করেন, তবে তিনি তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া কলত্রাদির সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলেন। ব্রাহ্মণ জাতির জনবৃদ্ধি সামান্যপরিমাণে হইয়া থাকে। ইহার দুইটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; প্রথম, ব্রাহ্মণগণ অতিশয় কৃচ্ছ্রসাধ্য প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন; দ্বিতীয়, সংযমাচারে তাঁহারা অতিশয় তৎপর।

আমরা যে সময়ের বর্ণনা করিতেছি, তৎকালে হিন্দু ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ শ্রমণ, উভয়েই ভারতবর্ষে বাস করিতেন, এবং রাজন্যবৃন্দ ও জন-সাধারণ কর্তৃক তুল্যরূপে সম্মানিত হইতেন। বারদিসেনাস সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন যে, রাজন্যবৃন্দ রাজ্যশাসনসংক্রান্ত বিষয়ে উপদেশ লাভ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের দ্বারস্থ হইতেন।

বারদিসেনাসের গ্রন্থের কিয়দংশ শ্রমণ-সম্প্রদায়ের বিবরণে পূর্ণ। আমরা এখানে তাহার সারসঙ্কলন করিয়া দিলাম।—ব্রাহ্মণগণ একবংশ-সম্ভুত; কিন্তু সকল বর্ণের মুমুক্ষু ব্যক্তিই শ্রমণশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। যদি কেহ শ্রমণশ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে গ্রাম্য বা নাগরিক কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। এই স্থানে তিনি সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করেন। তাহার পর তিনি মস্তকমুণ্ডন ও শ্রমণকুল-সুলভ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শ্রমণগণের সহিত বাস করিতে প্রবৃত্ত হন। এই সময় হইতে তিনি পুত্রকলত্রাদির সহিত সকল প্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ করেন, এবং তাহাদের চিন্তা হইতেও বিরত হন। দেশাধিপতি ঈদৃশ গৃহত্যাগী ব্যক্তির ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পত্নীর সমস্ত ভার আত্মীয় স্বজনের উপর অর্পিত হয়। শ্রমণগণ নগরের বহির্ভাগে বাস করেন;

ব্যয়ে নির্ম্মিত মঠে ও মন্দিরে বাস করেন। এই সকল মঠে কর্ম্মচারিবর্গ নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা আশ্রমের জন্য আহার্য্য বস্তু সমুদয় রাজভাণ্ডার হইতে প্রাপ্ত হন। এই সকল আশ্রমে ঘণ্টাধ্বনি হইলে আগন্তুকগণ প্রস্থান করেন, এবং শ্রমণগণ উপস্থিত হইয়া ধ্যানে নিরত হয়েন। তাঁহা-দের ধ্যান পরিসমাপ্ত হইলে দ্বিতীয়বার ঘণ্টাধ্বনি হয়। তখন তাঁহারা আহারে উপবেশন করেন। এই সময় ভৃত্যগণ অন্ন পরিবেশন করে। যদি কোনও শ্রমণ একাধিক বস্তু আহার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে তাঁহাকে শাক সবজী অথবা ফল দেওয়া হয়। ভোজনক্রিয়া সমাপ্ত হইবা-মাত্র তাঁহারা পুনর্ব্বার শাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত হন। শ্রমণগণের পক্ষে বিবাহ অথবা ধনার্জ্জন নিষিদ্ধ।

শ্রমণগণসম্বন্ধীয় এই বিবরণের পর বারদিসেনাস ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের পারলৌকিক বিশ্বাস কিরূপ ছিল, তাহারা বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের মৃত্যু সম্বন্ধে ধারণা এইরূপ যে, জীবন দীর্ঘ বলিয়া তাঁহারা অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন; জীবনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁহাদের সংশয় না থাকিলেও, তাঁহারা উহা প্রকৃতিদত্ত ভারস্বরূপ বিবেচনা করেন। এই জন্য ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণ দেহ হইতে আত্মার মুক্তিসাধন করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকেন। অনেক সময় সুস্থ ও নিরাপদ ব্যক্তিও জীবন শেষ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া আপনার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তদীয় আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে এই সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কোনও প্রকার যত্ন করেন না; বরং তাঁহাকে সুখী বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং পরলোকগত আত্মীয়স্বজনবর্গের নিকট জ্ঞাপন করিবার জন্য নানা সংবাদ বলিয়া দেন। ফলতঃ, দেহপরিত্যাগের পর আত্মার যোগাযোগ হয়, এইরূপ তাঁহাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। পরলোকে জ্ঞাপন করিবার জন্য সংবাদাদি প্রদত্ত হইলে সংকল্পারূঢ় ব্যক্তি পবিত্রভাবে দেহান্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রজ্বলিত চিতামধ্যে প্রবিষ্ট হন, এবং সমাগত জনমণ্ডলী কর্ত্তৃক উচ্চারিত মন্ত্র শ্রবণ করিতে করিতে প্রাণপরিত্যাগ করেন। আমাদের দেশের লোক আত্মীয় স্বজনের অদূরবর্ত্তী বিদেশগমনে যেরূপ দুঃখিত হয়, মৃত্যুও ভারতবাসীকে তত দূর ব্যথিত করিতে সমর্থ নহে। এইরূপে যাঁহারা অমরত্বের অধিকারী

অদ্যাপি এরূপ কোনও তার্কিকের আবির্ভাব হয় নাই, যিনি গ্রীক তার্কিকের (Sophist) ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "যদি প্রত্যেকেই এই ভাবে দেহান্ত করেন, তবে সৃষ্টির কি হইবে?" পম্পিনিয়াস নামক এক জন গ্রীক লেখক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—বৃদ্ধাবস্থা বা পীড়া উপস্থিত হইলে ভারতীয়গণ লোকালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া নিরুদ্বেগ-চিত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করেন। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া খ্যাত, তাঁহারা গৌরবলাভেচ্ছু হইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা না করিয়া জ্বলন্ত কুণ্ডে জীবনাহুতি দেন।

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের বৃত্তান্ত হইতে আমরা তাঁহাদের বাহ্য ধর্ম্মতত্ত্বে আসিয়া উপস্থিত হইতেছি। শ্রমণগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। আদি-কালে ব্রাহ্মণগণ আপনাদের উপাস্য দেবতার উদ্দেশ্যে স্তোত্রপাঠ ও যজ্ঞ করিতেন। কিন্তু দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা অর্চ্চনা করিবার প্রথা ছিল না; পরে ক্রমশঃ দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আমরা জোহাননিস ষ্টোবাইয়স নামক এক জন গ্রীক লেখকের গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে, অন্ততঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তদীয় গ্রন্থে শিব-পার্ব্বতীর—অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তির বিস্তৃত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠকগণের কৌতূহলনিবারণের জন্য আমরা তাহার অনুবাদ প্রদান করিতেছি। মহারাষ্ট্রদেশে সমুচ্চ পর্ব্বতগাত্রে একটি গুহা বিদ্যমান আছে। এই গুহায় দশ কি দ্বাদশহস্ত-পরিমিত একটি মূর্ত্তি দণ্ডায়মান দেখিতে পাওয়া যায়। সে মূর্ত্তির হস্তযুগল অনুপ্রস্থভাবে সংন্যস্ত। ইহার দক্ষিণাঙ্গে নরমূর্ত্তি, বামাঙ্গে নারীমূর্ত্তি। একাধারে নরনারী-মূর্ত্তি দর্শকবৃন্দের বিস্ময় উৎপাদন করে; দুইটি বিসদৃশ মূর্ত্তি একাধারে অভেদ্য ভাবে গঠিত হইয়াছে। এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির দক্ষিণ নেত্রে সূর্য্য ও বাম নেত্রে চন্দ্র অঙ্কিত; দুই বাহুতে নানা দেব দেবী, আকাশ, পর্ব্বত, নদী, সমুদ্র, মহাসমুদ্র ও জীবজন্তু প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থের চিত্র অঙ্কিত। ভারতীয়গণের বিশ্বাস এই যে, সৃষ্টির সময়ে পরমেশ্বর যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের আদর্শস্বরূপ এই মূর্ত্তি স্বীয় পুত্রকে অর্পণ করেন। এই মূর্ত্তি কি কি উপাদানে গঠিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। একদা এক জন নরপতি এই মূর্ত্তির এক গুচ্ছ কেশ উৎপাটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রবলবেগে রক্তপাত হইতে

যথাশক্তি পূজা অর্চনা করিয়াও আর তাঁহার জ্ঞানের সঞ্চার করিতে পারেন নাই। অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির মস্তকের উপর সিংহাসনে আর একটি দেবমূর্ত্তি স্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে এই মূর্ত্তির অঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণগণ পাখার দ্বারা বাতাস না করিলে ঐ ঘর্ম্মে ভূমিতল পর্য্যন্ত সিক্ত হইয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা পাঠ করিলে প্রতীতি জন্মে, তৎকালে দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা অর্চনার প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ এই সাকার উপাসনা ও বর্ণভেদপ্রথা ভারতবর্ষের অন্যতম বিশেষত্ব বলিয়া পরিগণিত ছিল। হিন্দুজাতি প্রধানতঃ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত ছিল। বৈশ্য সামাজিক মর্য্যাদায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অপেক্ষা হীন ছিলেন। এ সম্বন্ধে ডিওন থৃসোসটম্ লিখিয়াছেন,—আমি ভারতীয় ব্রাহ্মণগণের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেছি, তাহা অতিরঞ্জিত নহে। ভারতবর্ষ হইতে যে সকল লোক আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি সমুদ্রতীরবাসীদিগের সহিত বাণিজ্যার্থ ভারতীয় বণিকগণ আগমন করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে এই জাতীয় লোকের প্রতিষ্ঠা বা সম্ভ্রম নাই; ভারতীয়গণ তাহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়া থাকে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কসমস নামক এক জন গ্রীক লেখক খৃষ্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কসমসের উপাধি ছিল,—ইণ্ডিকো-প্লিউ ষ্টেস। এই শব্দের অর্থ,—ভারতীয় নাবিক। কস্মস বাণিজ্যব্যবসায়ী ছিলেন। সম্ভবতঃ তদুপলক্ষেই ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কসমস এক স্থলে লিখিয়া গিয়াছেন,—সিংহলদ্বীপের বন্দরে ভারতবর্ষ, পারস্য প্রভৃতি দেশসমূহ হইতে অর্ণবপোত আগত হয়। সিংহলবাসী বণিকগণও পৃথিবীর নানা স্থানে অর্ণবপোত প্রেরণ করিয়া থাকেন। চীন ও অন্যান্য দেশ হইতে সিংহল দ্বীপে মুসব্বর, চন্দনকাষ্ঠ, রেশম, লবঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ পণ্যের আমদানী হয়। সিংহলের বণিকগণ এই সমুদয় দ্রব্য ভারত-বর্ষের মালাবার, কাল্লিয়ান (বোম্বাই নগরের নিকটবর্ত্তী কল্যাণের প্রাচীন নাম।) ও সিন্ধু প্রদেশে প্রেরণ করেন। এই সকল পণ্যের পরিবর্ত্তে তাঁহারা মালাবার হইতে গোলমরিচ, কাল্লিয়ান হইতে তাম্র, পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিবার জন্য বস্ত্র ও তিল শস্য, এবং সিন্ধু প্রদেশ হইতে মৃগনাভি কস্তুরী ও

সৌরাষ্ট্র (সৌরাষ্ট্র প্রদেশের নগর), কাল্লিয়ান, সিবর (সম্ভবতঃ চৌল; এই নগর বোম্বাই হইতে দক্ষিণ দিকে ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত।) মালাবারস্থিত নগরসমূহ (ইহার সংখ্যা পাঁচ—পারতি, ম্যাঙ্গারোথ [ম্যাঙ্গালোর], সালোপত্তন, নলপত্তন, পৌদপত্তন। পত্তন শব্দের অর্থ,—নগর।) বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল রূপে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত সমুদ্র-উপকূলে ও অন্তঃপ্রদেশে বহুসংখ্যক বাণিজ্যনগর বিদ্যমান আছে। ভারতবর্ষ সুবৃহৎ দেশ।

বাণিজ্য উপলক্ষে বিদেশ হইতে নানাধর্ম্মাবলম্বী বণিকগণ ভারতবর্ষে উপনীত হইতেন। উদারস্বভাব রাজন্যগণের অনুমতিক্রমে তাঁহারা ধর্ম্মচর্চ্চার জন্য স্থানে স্থানে স্বধর্ম্মানুগত উপাসনালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। কসমস লিখিয়াছেন,—মালাবারে একটি গির্জ্জা ঘর বিদ্যমান ছিল, এবং কাল্লিয়ানে এক জন পাদ্রী বাস করিতেন। কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের সহিত খৃষ্টধর্ম্মের পরিচয় ঘটিয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর একখানি গ্রন্থপাঠে জানা যায়, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে আলেকজাণ্ড্রিয়ায় পাণ্ডাইনস নামক এক জন দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বধর্ম্মের বিস্তারের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন, এবং ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ভারতবর্ষে উপনীত হন। পাণ্ডাইনস ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া দেখেন যে, তৎপূর্ব্বেই মথি-লিখিত সুসমাচার প্রচারিত হইয়াছে, এবং কতিপয় ভারতবাসী যীশুকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছে।

জোহানেস ষ্টোবাইয়সের গ্রন্থে অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী কি নির্দ্দোষ, তাহা অবধারণ করিবার এক অদ্ভুত প্রথার উল্লেখ আছে। বারদিসানেসের গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া জোহানেস লিখিয়াছেন,—কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে নির্দ্দোষ বলিয়া প্রকাশ করিলে, তাহাকে পদব্রজে একটি জলাশয় অতিক্রম করিতে হয়। এই জলাশয়ের গভীরতা মানুষের জানুর পরিমাণ অপেক্ষা অধিক নহে; যদি ঐ ব্যক্তি যথার্থই নির্দ্দোষ হয়, তবে সে নিরাপদে ঐ জলাশয় অতিক্রম করিতে পারে; কেবল জানু পর্য্যন্ত জলে সিক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু দোষী হইলে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র তাহার মস্তক পর্য্যন্ত জলে নিমগ্ন হইয়া যায়। তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাকে জল হইতে উত্তোলন করিয়া ইচ্ছামত দণ্ড দিবার জন্য অভিযোগকারীর হস্তে অর্পণ করেন। কিন্তু প্রাণদণ্ড দিবার নিয়ম নাই।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত।

ত্রিমূর্ত্তি।

প্রভাতে নেহারি তব উদয় অচলে নব
প্রসন্ন বদন।
ব্রহ্মা রূপ ধরি' তুমি অপরূপ বিশ্ব-ভূমি
সৃজিছ কেমন!
কিবা দীপ্ত রূপচ্ছটা হেমময় বর্ণ-ঘটা
ঝলিছে পুলকে;
কনক-তুলিকা টানি' ফুটাইছ বিশ্বখানি
আঁধার-ফলকে।
ফুটি' উঠে লতা ফুল, সকাকলি পাখীকুল,
মানবী, মানব—
সে চিত্রে দিতেছ প্রাণ,—জড় বিশ্ব লভি' জ্ঞান,
করে ধন্য রব।

তার পর ব্যাপি' বিশ্ব অপরূপ নব দৃশ্য,—
স্বচ্ছ নীলাকাশ,
ঊর্দ্ধে রবি জ্বল-জ্বল্, উগ্র দীপ্ত ধরাতল
চাহিছে সত্রাস!
মহানীল সেই তব বিষ্ণুমূর্ত্তি অভিনব
উদগ্র ভাস্বর
সবিতৃ-কিরীট-দীপ্র, প্রভায় ভরিছে ক্ষিপ্র
সর্ব্ব চরাচর।
প্রভাতে যে বিশ্ব-সৃষ্টি, পাপহর খর দৃষ্টি
তাহারি উপরে,
রাখিয়াছ ধ্বান্তহারী রবি! বিষ্ণুদীপ্তিধারী,
নবস্নেহভরে।

অস্তগামী রবি মাঝে, তোমারি মূরতি সাজে,
রুদ্র-অবতার!
সহস্র লোহিত জটা— আরক্ত বদনচ্ছটা

পূরবী বিষাণে তব বাজি' উঠে অভিনব
মরণ-রাগিণী ;
বিশ্ব-বিনাশের মাঝে অই শিবমূর্ত্তি রাজে
দুঃখ শোক জিনি'।
'বিরহ-বেদনা মাঝে রাজে—শিবমূর্ত্তি রাজে,
নাহি, নাহি ভয়',—
হে রুদ্র ! কহ এ কথা, ভুলিব ভাবনা ব্যথা,
লভিব অভয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

কর্ম্মাদী ব্রত।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহে কর্ম্মাদী ব্রত প্রচলিত আছে। এ জেলার সর্ব্বত্র এ ব্রতের অনুষ্ঠান হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিদিনে এই ব্রত করিতে হয়। বিবাহিত স্ত্রীলোক যাবজ্জীবন এই ব্রত করিয়া থাকেন। ব্রতের জন্য পূর্ব্বদিন দূর্ব্বা বাঁধিতে হয়। ইহাতে একুশটি লম্বা দূর্ব্বা ও একুশটি চাউল একটা কাঁঠাল পাতায় বাঁধিয়া দূর্ব্বার সঙ্গে কলার বাসনা দিয়া বাঁধিতে হয়। ব্রতের দিন স্নান করিয়া সিক্তবস্ত্রে একটি কলার খোলের ডোঙ্গায় ঐ বাঁধা দূর্ব্বা, পান ও একটি সুপারী, আম, কলা, লেবু, ডালিম প্রভৃতি পাঁচটি ফল লইয়া তাহার মধ্যে ধান দিয়া তুলসীগাছের নিকট পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া ঐ দূর্ব্বা দ্বারা একুশবার কপালে জল ছিটাইতে হয়। একটা পুকুর কাটিতে হয়, এবং জলের পরিবর্ত্তে কাঁচা দুগ্ধ দ্বারা সেই পুকুর পূর্ণ করিতে হয় ; পুকুরের পাড়ে একুশটি কড়ি দিতে হয়। ব্রাহ্মণ আসিয়া ব্রত করিলে পর, স্ত্রীলোকে ব্রতের কথা বলেন। ব্রতের দিন অন্নাহার নিষিদ্ধ। দৈ চিঁড়া খাইতে হয়। ষষ্ঠীর দিন মা যেমন পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করেন, কর্ম্মাদী দিনেও সেইরূপ স্ত্রীলোকেরা স্বামীর মঙ্গলকামনা করিয়া দূর্ব্বা দিয়া থাকেন।

ব্রত-কথা।

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তাঁর দুই কন্যা। শিশু কন্যা দুটিকে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের হাতে সঁপিয়া দিয়া ব্রাহ্মণী মৃত্যুমুখে পতিত হন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মেয়ে দুটিকে যত্নে

রাজবাড়ীতে বেড়াতে গেলেন। ব্রাহ্মণের মেয়ে দুটি রাজবাড়ীতে গেলেন, কিন্তু কেহ তাঁহাদের সঙ্গে কথাও কহিল না! রাজবাড়ী কি না, লোকের বড় ভিড়, কে কার খবর নেয়। তাঁরা ক্রমে অন্দরবাড়ীতে ঢুকিলেন। রাণী তখন রাজকন্যার চুল বাঁধিতে বসিয়াছিলেন। রাজকন্যার রূপে যেন পুরী আলো করে তুলেছে। এমন সময় রাজা অন্দরে এলেন। শব্দ শুনে সব দৌড়ে পালাচ্ছে, সহসা কন্যার রূপ দেখে রাজা একটু বিস্মিত হয়ে রাণীকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, "আমার বাড়ীতে এ মেয়ে কে?"

রাণী অবাক! "কেন, এ যে তোমার মেয়ে, তোমার বিদেশে যাওয়ার সময় এ মেয়ে যে গর্ভে ছিল।"

"কই, এ কথা ত আমাকে পূর্ব্বে বল নাই? তা, কাল প্রাতে যার মুখ আমি সর্ব্বাগ্রে দেখতে পাব, তার হাতেই এ মেয়ে সমর্পণ করব।

ব্রাহ্মণকন্যা দুটি এ কথা শুনতে পেয়ে ভাবলেন, আমাদের মা নাই, এ কন্যাকে যদি মা করতে পারি, তবে আর দুঃখ কষ্ট থাকবে না। তাই তাঁরা পিতাকে এ সংবাদ জানাইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ভাবলেন যে, যদি রাজকন্যাকে বিবাহ করতে পারি, তবে টাকা পয়সার আর অভাব থাকিবে না, আমি বড়লোক হতে পারব। ভেবে ভেবে ব্রাহ্মণের আর সে রাত্রে নিদ্রা হল না। রাত থাকতে ব্রাহ্মণ রাজবাড়ীর দিকে যাত্রা কল্লেন! তখনও কাক কোকিল ডাকে নাই। রাজপথে লোকজন চলে নাই। একা ব্রাহ্মণ ভাবতে ভাবতে রাজবাড়ীতে উপস্থিত। রাজা যেই শয্যা ত্যাগ করে বার হবেন, এমন সময় ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্ব্বাদ করলেন, রাজা একটু আশ্চর্য্য হলেন!

রাজার প্রতিজ্ঞা, তা কি ব্যর্থ হতে পারে? তিনি সমাদর করে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের করে কন্যাকে সমর্পণ করলেন, এবং অনেক টাকাকড়ি যৌতুক দিয়া ব্রাহ্মণকে কন্যা সহ তাঁর নিজ বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজকন্যাকে বিবাহ করে কেমন যেন হয়ে গেলেন। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কি না, তাই রাজকন্যার বড় বাধ্য হলেন। মেয়ে দুটিকে আর দেখতে পারেন না। এই ভাবে দিন কতক গেল। শেষে রাজকন্যার উত্তেজনায় বৃদ্ধ ঠিক করলেন, মেয়ে দুটিকে বনবাসে দিয়ে আসবেন।

দিন ঠিক করে ব্রাহ্মণ মেয়ে দুটিকে বল্লেন,—মা! তোমরা অনেক দিন তোমাদের মাসীর বাড়ী যাও নাই, তোমাদের মাসী খবর পাঠাইয়াছেন, চল,

আটখানা ! তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। পিতা আগে আগে চল্লেন, মেয়েরা বাপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। এইরূপে অনেক দূর চলে গেলেন। যেতে যেতে মেয়েরা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তখন ব্রাহ্মণ একটি ছায়াযুক্ত বটবৃক্ষতলে বিশ্রামের জন্য বসলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ; বালিকারা ক্ষুধার তৃষ্ণায় অবসন্ন। তাঁরা পিতার উরুতে মাথা রেখে বিশ্রাম করিতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তাঁরা নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মণ এই সুযোগে মেয়েদের ঘাড় উরু থেকে নাবিয়ে প্রস্থান করেন। সেই বিশাল বনে দুটি বোন পড়ে রইলেন। রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর, তখন বন্যজন্তুর কোলাহলে তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হল। চেয়ে দেখেন, এ কি ! জনমানব নাই—বাবা কই ? তখন বুঝলেন,—বিমাতার চক্রে বাপ তাঁদের নির্ব্বাসিত করেছেন। এখন অন্য উপায় নাই। গ্রামের রাস্তা জানেন না, গাছতলায় থাকাও নিরাপদ নয় তাঁরা বটগাছকে কর-জোড়ে বললেন, বটবৃক্ষ ! আমরা নিরাশ্রয় ; বাবা আমাদের তোমার আশ্রয়ে রেখে গিয়াছেন। যদি আমাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া থাক, তোমার শাখা নামাও, আমরা আজ রাত্রে তোমার আশ্রয়ে থাকি। বটগাছ তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হয়ে নিজের বাহু নামাইয়া দিল। বটগাছের আশ্রয়ে কন্যা দুটির সে রাত্রি কাটিল।

পর দিন সেই দেশের এক রাজপুত্র আর মন্ত্রীর পুত্র মৃগয়া করতে বনে এসেছিলেন। তাঁরা ক্লান্ত হয়ে সেই বটবৃক্ষের ছায়ায় বিশ্রাম করবার জন্যে বসলেন। রাজপুত্র পিপাসায় কাতর, ভৃত্যকে জল আনতে হুকুম করলেন। ভৃত্য জল এনে রাজপুত্রের হাতে দিলে। এমন সময় উপর থেকে একটা চুল জলে পড়ে গেল ! রাজপুত্র দেখে আশ্চর্য্য হলেন ! এ অরণ্যে এত বড় চুল কোথা থেকে এল ? সহসা উপরে চেয়ে দেখেন—দুটি পরম-সুন্দরী কন্যা। দেখে রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা দেবী, না মানবী, না রাক্ষসী ? উপর থেকে উত্তর হলো,—আমরা দেবীও নই, রাক্ষসীও নই,—মানুষী। তখন রাজা কন্যাদিগকে নামাতে বল্লেন। কন্যারা বললেন, অন্যে যেন আমাদের স্পর্শ না করে, আমরা নিজেই নেমে যাচ্ছি। এই বলে তাঁরা নেমে এলেন। তখন রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন, এবং কি জন্য তারা এই ঘোর অরণ্যে গাছের উপর বসে আছেন, তা জানতে চাইলেন। কন্যাদ্বয় বললেন, আমাদের পরিচয় আর কি দিব

আমরা ব্রাহ্মণের কন্যা, নিতান্ত দীনদুঃখিনী। এই বলে' দু' জনে কাঁদতে লাগলেন। রাজপুত্র কন্যাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া তাদের রাজবাড়ীতে নিয়ে গেলেন, এবং বড় ভগ্নীকে রাজপুত্র এবং ছোট ভগ্নীকে মন্ত্রিপুত্র বিয়ে করলেন। এইরূপে সুখে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। বহুদিন কেটে গেল। উভয়েরই গর্ভ হইল। দেখতে দেখতে তাঁদের দুই ভগ্নীর গর্ভে দুইটি পুত্র-সন্তান জন্মিল।

বহু দিন কেটে গেল। কর্ম্মাদী ব্রতের দিন এলো। তখন রাণী কর্ম্মাদী ব্রত করবার উদ্যোগ করলেন। রাজা এই কলার খোল ডোঙ্গার ব্রত দেখে চটে' লাল হয়ে গেলেন, এবং মন্ত্রিপুত্রকে ডেকে বল্লেন, বন থেকে এক মেয়ে ধরে এনে রাণী করেছি, যা ইচ্ছা তাই করে; একে নিয়ে আবার সেই বনে রেখে এস। রাজার আদেশ অমান্য করে, কার সাধ্য? মন্ত্রিপুত্র কন্যাকে নির্ব্বাসনে নিয়ে চল্লেন। কিন্তু স্ত্রীর অনুরোধে তার আহারের সংস্থান করে অরণ্যের মধ্যে একটা কুঁড়ে ঘর তুলে দিলেন। সেইখানে রাণী পুত্র সহ বনবাস করতে লাগলেন। এক দিন দু' দিন করে দিন চলে যেতে লাগল।

আবার বছর ফিরে এল। ঘরে ঘরে কর্ম্মাদী ব্রতের অনুষ্ঠান হয়েছে। কিন্তু রাণীর হাতে পয়সা নাই, কি করেন, কেমন করে ব্রত করেন, ছেলে ঘরে ঘরে ব্রত দেখে কাঁদে। শেষে মা ছেলেকে মাসীর বাড়ী যেতে বল্লেন। দুঃখিনীর ছেলে, মন্ত্রীর বাড়ীতে যেতে দেবে কেন? বিশেষ, মাসীও ছেলেকে না চিনতে পারে। তাই নিজের হাতের একটি আংটী হাতে দিয়ে ছেলেকে বলে দিলেন, এই নিয়ে তোমার মাসীর বাড়ী যাও, গিয়ে বাঁধা ঘাটের উপর বসে থেকো; দেখবে, তোমার মাসীর স্নানের জল নেবার জন্য দাসীরা আসবে। তাদের মধ্যে একটি বুড়ী দাসী দেখতে পাবে। সকলে জল নিয়ে চলে যাবে, কিন্তু সে বুড়ী কি না, জলের কলস তুলতে পারবে না, তোমাকে সাহায্য করতে ডাকবে। যখন জলের কলস তুলে দেবে, তখন কলসের ভিতর আংটীটা ফেলে দিও। ঐ বুড়ী দাসীর জলই তোমার মাসী মাথায় দেন। যখন মাসী মাথায় জলের কসল ঢালবেন, তখন অংটীটা দেখে তোমাকে চিনতে পারবেন।

বালক ঠিক বাঁধা ঘাটে বসে ছিল। তখন দেখে 'দপ্ দপ্' করে চার পাঁচ জন দাসী এসেই কলস ভরে জল নিয়ে গেল। শেষে এক বুড়ী

দেবার সময় আংটী জলের ভিতর ফেলে দিলে। দাসী জল নিয়ে গিয়ে মন্ত্রিপত্নীর মাথায় ঢেলে দিলে। ও মা! এ কি! এ যে একটা আংটী! দাসী আংটী তুলে মন্ত্রিপত্নীর হাতে দিলে। তিনি দেখেই চিনলেন,—তাঁর ভগ্নীর আংটী। অমনি বুড়ী দাসীকে ডাকলেন, আজ কে তোর কলসী তুলে দিলে? দাসী বল্লে, কেন, একটি ছেলে বসে ছিল, সেই আমাকে সাহায্য করেছে। মাসী বল্লেন, তাকে যত্ন করে নিয়ে আয়। তখন দাসী দৌড়ে বাঁধা ঘাটে গিয়ে ছেলেকে ধরে নিয়ে এলো। মাসী তাকে স্নান করিয়ে ভাল কাপড় পরতে দিলেন, এবং ভাল ভাল খাবার খেতে দিলেন। বাড়ী যাবার সময় মাসী তাঁর বোনের জন্যে খাবার দিলেন, এবং ভাঁড়ার থেকে দুটি সোনার কুমুর হাতে দিয়ে বল্লেন, তোমার মাকে দিও। এতেই তোমাদের দুঃখ যাবে। বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! যেই বালক বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, অমনি করমপুরুষ ঠাকুর এক চিলের বেশ ধরে এসে বালকের হাত থেকে ছোঁ মেরে সব নিয়ে গেলেন। নখ দিয়ে বালকের হাত মুখ আঁচড়ে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেন। বালক কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে ফিরে এলো।

মা ছেলেকে বার করে দিয়ে পথের দিকে চেয়ে আছেন, কখন ছেলে বাড়ী আসে! দূর থেকে ছেলের মলিনমুখ দেখে মার প্রাণ শুকিয়ে গেল, বলতে লাগলেন তোর মাসী বুঝি মেরেছে, সে বড়লোকের স্ত্রী,—তাই সে গরীবের বাছাকে মেরেছে। ছেলে বাধা দিয়ে বল্লে, মাসীমা আমাকে আদর করেছেন; তোমাকেও অনেক খাবার দিয়েছিলেন। দুই সোনার কুমোরও দিয়েছিলেন। কিন্তু পথে আসতে কোথা থেকে একটা চিল এসে ছোঁ মেরে সব নিয়ে গেল,—সঙ্গে সঙ্গে আমাকে আঁচড়ে গেল। মা শুনে কাঁদতে লাগলেন।

এ দিকে রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বল্লেন, আমার স্ত্রীকে এনে দাও। মন্ত্রী বল্লেন, সে কেমন কথা মহারাজ? যাকে বনে দিয়ে এসেছি, কেমন করে' তাকে এনে দেব? রাজা শেষে বল্লেন, সাত দিনের ভিতর যেমন করে হয়, তাকে এনে দিতে হবে। নয় ত তোমার গর্দ্দান যাবে। মন্ত্রী চিন্তিত হলেন। বাড়ী এসে একবারে শুয়ে পড়লেন। মন্ত্রী খান্ না; ঘুমোন না; বাড়ী শুদ্ধ লোক অবাক্। শেষে মন্ত্রিপত্নী জিজ্ঞাসা করলেন,

বল্লেন, রাণীকে বনে দাও, আজ বলেন, তাকে এনে দাও। এখন আমি কি করি? মন্ত্রিপত্নী বল্লেন, তার জন্যে চিন্তা কি? তুমি গিয়ে রাজাকে বল, তিনি যদি তাঁর বাড়ী থেকে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত দুধের পুকুর কাটান, তাঁর বাড়ী থেকে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত কড়ির জাঙ্গাল দেন, তাঁর বাড়ী থেকে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত কাপড়ের পর্দ্দা টাঙ্গান, তবে রাজার স্ত্রীকে এনে দিতে পারি। রাজা সম্মত হলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঢোল দিয়ে প্রচার কল্লেন, সকল প্রজাকেই আমার পুকুরে দুধ দিতে হবে।

এ দিকে সেই ব্রাহ্মণ একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছেন। এই দুধের পুকুরে কিছু পাবেন, এই আশায় এসে উপস্থিত। মন্ত্রিপত্নী—তাঁর মেয়ে,—দেখেই চিনে ফেল্লেন, এবং বাপকে আটক করে রাখলেন।

ক্রমে পুকুর দুধে ভরে গেল। পর্দ্দার বন্দোবস্ত হল। টালের উপর টাল কড়ি পড়ে গেল। মন্ত্রিপত্নী লোকলস্কর নিয়ে ভগ্নীকে আনতে গেলেন। হাতী গেল, ঘোড়া গেল, পাল্কী গেল, কত লোক গেল। লোক জনের হৈ হৈ শব্দে রাণীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখেন, তাঁর কুঁড়ের চারি দিকে লোক লস্কর! ও মা! এ কি কাণ্ড! ঘরের ভিতর লোক গেল। দেখেন, তাঁর বোন! বোনকে দেখে দুই বোনে একটু কাঁদলেন; তার পর বল্লেন, রাজা তোমাকে নিতে লোক পাঠিয়েছেন। শুনে রাণী আরও খানিকক্ষণ কাঁদলেন। পরে দুই বোনে পাল্কীতে উঠলেন। পাল্কী মন্ত্রীর বাড়ী গেল। সেখান থেকে রাজার বাড়ী রওনা হইল। পথে ঘোড়া আছাড় খাইল, হাতীও পড়িয়া গেল। শেষে রাজপুত্র পড়িয়া গেলেন। সকলেই অবাক! রাজা একেবারে অগ্নিশর্ম্মা! রাস্তা অপরিষ্কার ব'লে রাজা সাত ভাই মালীর গর্দ্দান লইবার হুকুম দিলেন। দেখতে দেখতে সাত ভাইয়ের মুণ্ড ধরাশায়ী হইল। রাণী পুত্র সহ বাড়ী এলেন।

কর্ম্মাদী ব্রতের উদ্যোগ করে ব্রত শেষ হয়েছে। এখন রাণী কার সঙ্গে গুঁড়া বদল * করেন, সকলেই খাইয়া ফেলিয়াছে। রাণী আহার করিতে পারিতেছেন না। গ্রামের মধ্যেই সেই সাত মালীর মা পুত্রশোকে অনাহারে আছেন। রাজার বাড়ী থেকে লোক গেল। সে এলো না। রাণী নিজে

---

* গুঁড়া বদল—নিয়ম আছে, ব্রত শেষ হইলে পাড়া প্রতিবাসীর সহিত গুঁড়া বদল করিতে

ডেকে পাঠালেন;—তোমার কোনও চিন্তা নেই, আমার কাছে এসো। মালিনী কাঁদতে কাঁদতে রাণীর পায়ে পড়লো। রাণী তাঁকে যত্ন করে তুলে তার সঙ্গে গুঁড়া বদল করলেন। ব্রত শেষ করে রাণী মালিনীর সাত পুত্রের উপর দুর্ব্বা-তুলসীর জল দিলেন; অমনি সাত পুত্র জেগে উঠলো! সকলে অবাক হয়ে গেল। রাজা রাণী সুখে ঘর সংসার করতে লাগ্‌লেন। বাপের সঙ্গে সকলের চেনা হল। এই ব্রতের এই ফল। যে এ ব্রত না করে, তার উপর কর্ম্মপুরুষ দেবতা অসন্তুষ্ট হন। তার পদে পদে অমঙ্গল হয়।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

খৃষ্টের উপদেশ।

যীশুখৃষ্ট একদিন বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন। চারি দিকে শত্রু কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়া কূল পাইতেছিলেন না। নিজের মুষ্টিমেয় অনুচরের দুর্দ্দশার অবধি ছিল না। কখন কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, কখন বা জীবনে বিনষ্ট হন, এ আশঙ্কা সর্ব্বদাই করিতে হইত। শত্রুগণ বিপুল শক্তিশালী; নিজের ভাবোন্মত্ততা ভিন্ন অন্য কোনও সম্বল ছিল না। এই অবস্থায় পতিত হইয়া তিনি সেই মুষ্টিমেয় অনুচরবর্গকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়। সেই উপদেশ সকল ম্যাথিউ-লিখিত সুসমাচার হইতে নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিলাম। যাঁহারা প্রচার-কার্য্যে ব্রতী আছেন তাঁহাদিগের এ সকল বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত।

১। যীশু তাঁহার দ্বাদশ অনুচরকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করিলেন, এবং আদেশ দিলেন যে, "জেণ্টাইল"দিগের * পথে যাইও না; স্যামারিটান্‌দিগের * নগরে প্রবেশ করিও না।

২। উহাদিগের নিকট না যাইয়া বরং অধঃপতিত ইজরেইলদিগের† নিকট যাও।

৩। তোমরা যাও, এবং প্রচার কর যে, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

---

* ইহারা বিপক্ষ।

† ইহারা যীশুর আপন সমাজ।

৪। পীড়িতকে রোগমুক্ত কর, কুষ্ঠরোগীর শুশ্রূষা কর, মৃতকে জীবিত কর, ভূতগ্রস্তকে সুস্থ কর। তোমরা ভগবানের নিকট মুক্তহস্তে পাইয়াছ, তদ্রূপ মুক্তহস্তে দান কর।

৫। স্বর্ণ, রৌপ্যাদি অর্থ সঞ্চয় করিও না।

৬। হস্তের দণ্ড লইও না, পায়ের জুতা লইও না, অঙ্গে দুইটি কোর্ট লইও না। পথ-সম্বল নিষ্প্রয়োজন; কারণ, পরিশ্রমী আহার পাইবার যোগ্য হইবেই।

৭। যে নগরে প্রবেশ কর, তথায় যোগ্য লোকের অনুসন্ধান করিও। যত দিন তথায় থাক, ঐ ব্যক্তির আতিথ্য গ্রহণ করিও।

৮। কোনও বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলে সম্মান দেখাইও।

৯। ঐ বাটী যোগ্য ব্যক্তির হইলে আশীর্ব্বাদ করিও,—যেন তাহার মঙ্গল হয়। অযোগ্য ব্যক্তির হইলে আশীর্ব্বচন তোমাদিগের নিজের নিকটেই রাখিয়া দিও।

১০। যাহারা তোমাদিগকে স্থান দিবে না, তোমাদিগের কথায় কর্ণপাত করিবে না, তাহাদিগের বাটী ও নগর পরিত্যাগ করিও; তৎপরে আর তাহা-দিগের সহিত কোনও সংস্রব রাখিও না।

১১। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে, শেষ বিচারের দিনে ঐ নগরের দশা সডম্ ও গমরহার দশা অপেক্ষাও অসহনীয় হইবে।

১২। উত্তমরূপ প্রণিধান কর—ব্যাঘ্রের মুখে যেমন মেষকে পাঠায়, তেমনই আমি তোমাদিগকে পাঠাইতেছি। তোমরা সর্পের ন্যায় চতুর হইও, এবং পারাবতের ন্যায় নিরীহ হইও।

১৩। মানুষের নিকট সাবধান থাকিও। কারণ, তাহারা তোমাদিগকে বিচারালয়ে ধরাইয়া দিবে, এবং সেই প্রকারে পীড়ন করিবে। *

১৪। আমার জন্য তোমাদিগকে রাজা ও শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট ধরাইয়া দিবে। * তোমরা জেণ্টাইলস্‌দিগের ও তাহাদিগের বিপক্ষ বলিয়া তোমাদিগকে রাজদ্বারে উপস্থিত করিবে।

১৫। যখন তাহারা তোমাদিগকে ধরাইয়া দেয়, তখন কি প্রকারে কি কথা বলিবে, সে বিষয়ে কোনও চিন্তাই করিও না; কারণ, যাহা বলিতে হইবে, তাহা সেই সময় তোমাদিগের মনেই উদিত হইবে।

১৬। কারণ, কথা কি তোমরা বলিবে? কথা তোমরা বলিবে না। তোমাদিগের পরমপিতার পরমাত্মাই তোমাদিগের মধ্য হইতে কথা কহিবেন।

১৭। ভ্রাতা ভ্রাতাকে, পিতা পুত্রকে মৃত্যু-মুখে ফেলিয়া দিবে। পুত্র পিতামাতার বিরুদ্ধে উত্থিত হইবে, এবং তাঁহাদিগকে হত্যা করাইবে।

১৮। আমার নামের জন্য সকলেই তোমাদিগের সহিত শত্রুতা করিবে। কিন্তু যে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সহ্য করিবে, সেই উদ্ধার পাইবে।

১৯। যখন তাহারা এক নগরে তোমাদিগকে উৎপীড়ন করিবে, তখন অন্য নগরে পলায়ন করিও। আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্য-সন্তানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে তোমরা ইজরেইলদিগের নগরে গমন করিতে পারিবে না।

২০। শিষ্য গুরুর উপরে নহে, ভৃত্যও প্রভুর উপরে নহে।

২১। শিষ্য গুরুর মত হইলেই, এবং ভৃত্য প্রভুর মত হইলেই প্রচুর হইল। * * * *

২২। এ নিমিত্ত বলিতেছি, তাহাদিগকে ভয় করিও না। কিছুই ঢাকা থাকিবে না, সকলই প্রকাশিত হইবে; কিছুই গুপ্ত থাকিবে না, সকলই জানা যাইবে।

২৩। আমি তোমাদিগকে আঁধারে বসিয়া যাহা বলিতেছি, তোমরা আলোকে তাহা প্রচার করিও। কর্ণে যাহা শুনিতেছ, গৃহের উপর হইতে তাহা প্রচার কর।

২৪। যাহারা দেহকে হত্যা করে, কিন্তু আত্মাকে বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না। কিন্তু যিনি নরকে দেহ ও আত্মা উভয়কেই বিনষ্ট করিতে পারেন, তাঁহাকেই ভয় করিও।

২৫। দুইটি চড়াই পাখী কি এক ফার্দিংএ বিক্রয় হয় না? কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে একটিও তোমাদিগের পরম পিতার বিধান ব্যতীত ভূতলে পতিত হইবে না।

২৬। তোমাদিগের মস্তকের সমস্ত কেশরাশি পূর্ব্ব হইতেই গণনা করা রহিয়াছে।

২৭। সুতরাং ভীত হইও না। সেই পরম পিতার চক্ষে তোমরা বহু-সংখ্যক চড়াই অপেক্ষা অধিক মূল্যবান।

২৮। মানুষের সমক্ষে যে আমাকে স্বীকার করিবে, আমিও তাহাকে স্বর্গস্থ পিতার নিকটে স্বীকার করিব।

২৯। কিন্তু মানুষের সমক্ষে যে আমাকে অস্বীকার করিবে, আমিও তাহাকে স্বর্গস্থ পিতার নিকটে অস্বীকার করিব।

৩০। মনে ভাবিও না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তিদান করিবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছি। আমি শান্তি দিতে আসি নাই; কিন্তু তরবারি দিতে আসিয়াছি।

৩১। আমি পিতা পুত্রে, কন্যা ও মাতাতে, শ্বশ্রূ ও পুত্রবধূতে বিপক্ষতা জন্মাইবার নিমিত্ত আবির্ভূত হইয়াছি।

৩২। আপনার বাটীস্থ লোকই শত্রু হইয়া উঠিবে।

৩৩। পিতা অথবা মাতা, পুত্র অথবা কন্যা,—ইহাদিগকে আমা অপেক্ষা যে অধিক ভালবাসিবে, সে আমার যোগ্য নহে।

৩৪। যে ক্রস্‌-দণ্ড হস্তে করিবে না, অথচ আমার অনুসরণ করিবে, সে আমার যোগ্য নহে।

৩৫। যে জীবন রক্ষা করিবে, সেই জীবন হারাইবে। যে আমার নিমিত্ত জীবন হারাইবে, সে-ই জীবন প্রাপ্ত হইবে।

এই সকল মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে অথবা বুঝাইতে আমি অক্ষম। আমি এইমাত্র বুঝি যে, ইহা পুনঃপুনঃ শুনিবার ও মনন করিবার আবশ্যকতা আছে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীশশধর রায়।

সহযোগী সাহিত্য।

ইংরেজী উপন্যাসে বিদেশী চরিত্র।

'লিভিং বুদ্ধ'।

কিন্তু যুবতী রথ জন-সমুদ্রের সেই বিকট গর্জ্জনে ভীত না হইয়া বীরের ন্যায় আত্মরক্ষার্থ গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান রহিল, এবং মনে মনে জীবন্ত বুদ্ধের সহায়তা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

উত্তেজিত জনমণ্ডলী দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। রথ গৃহকোণে দণ্ডায়মান হইয়া মৃত্যুকে বরণ করিতে চাহিল না; একটি দ্বার খুলিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ঙ্করমূর্ত্তি চীনাম্যান তাহার সম্মুখে আসিয়া উন্মুক্ত তরবারি তাহার মস্তকের উপর উদ্যত করিল। আর এক মুহূর্ত্ত পরেই তরবারি হয় ত তাহার মস্তকে পড়িত, কিন্তু কপট

লম্পট, মান্দারিন উন্মত্ত চীনাম্যানদের ঠেলিয়া তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং আক্রমণকারীদিগকে দূর করিয়া দিলেন।

যে চীনা ভৃত্য রথের সঙ্গে বিদ্যালয়ে আসিয়াছিল, সে মিঃ হাবিল্যাণ্ডকে রথের বিপদের সংবাদ জানাইতে গিয়াছিল। মিঃ হাবিল্যাণ্ড ব্রেকের সহিত বন্দুক হস্তে কন্যার উদ্ধারার্থ মিশন-হাউসের দিকে আসিয়া দেখিলেন, সহরের দেউড়ী বন্ধ, প্রহরীরা অনুনয় বিনয়ে বা উৎকোচের প্রলোভনেও দেউড়ী খুলিয়া দিল না। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা জীবন্ত বুদ্ধের সাহায্যপ্রার্থনা করিবার জন্য মঠের দিকে চলিলেন। বহু কষ্টে বুদ্ধের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। বুদ্ধ তাঁহার অনুচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া নগরের দেউড়ীতে উপস্থিত হইলেন। দেউড়ীর প্রহরীরা তাঁহাকে দেখিয়া নতজানু হইয়া তাঁহার অভিবাদন করিল বটে, কিন্তু দেউড়ী খুলিল না। তখন বুদ্ধ বলিলেন, 'যদি সহজে দেউড়ী খুলিয়া না দাও, তাহা হইলে ছয় সহস্র লামা মঠ হইতে আসিয়া নগর ধ্বংস করিবে।' বুদ্ধের এই কথা শুনিয়া প্রহরীরা ভয় পাইয়া দেউড়ী খুলিয়া দিল। বুদ্ধ তাঁহার অনুচরগণকে বালিকাকে উদ্ধার করিবার আদেশ দিয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এই ঘটনায় লামা ও তাতার সন্ন্যাসীর দুরভিসন্ধি অনেকপরিমাণে সুসিদ্ধ হইয়া আসিল। ঘাটে, পথে, মঠে সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, বুদ্ধ তাঁহার উপপত্নীকে রক্ষা করিবার জন্য সন্ন্যাসীর দলকে লইয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। এ সকল কথা বুদ্ধেরও কানে উঠিল; কিন্তু তিনি বিচলিত হইলেন না।

উক্ত ঘটনার পরদিন মান্দারিন বুদ্ধকে এক পত্র লিখিলেন। সেই পত্রে তিনি জানাইলেন, সাংলো নগরে যে কয়েক জন বর্ব্বর ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়াছে, তাহাদের ধর্ম্ম দেশের লোকের পক্ষে অত্যন্ত অহিতকর; তাহাদের লইয়া নগরে বড়ই গণ্ডগোল চলিতেছে। জীবন্ত বুদ্ধ স্বয়ং তাহাদের আশ্রয়দান করিয়াছেন। কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্য অবিলম্বে তাহাদিগকে নগর হইতে দূর করিয়া দেওয়া উচিত।

এই পত্রের উত্তরে বুদ্ধ লিখিলেন, 'আমার জানা আছে, শান্তিরক্ষার নিমিত্ত যে সকল সৈন্য প্রতিপালিত হইতেছে, তাহাদের কার্য্যনৈপুণ্যের অস্তিত্ব কাগজে ভিন্ন অন্য কোথাও বর্ত্তমান নাই। যাহা হউক, বিদেশীরা যদি বুদ্ধিমান হন, তাহা হইলে তাঁহারা অবিলম্বেই এ নগর পরিত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই।

কুমারী রথ বুদ্ধের গুণগ্রামে ও সুমোহন রূপে এতই মুগ্ধ হইয়াছিল যে, সে তাঁহার ধ্যান ধারণায় ব্যস্ত হইয়া উঠিল। একদিন রাত্রে রথ নিদ্রাঘোরে শয্যা হইতে উঠিয়া গুপ্ত পথে মঠের দিক চলিল। কোথায় যাইতেছে, কেন যাইতেছে, তাহা জানিতে পারিল না। বুদ্ধ সে সময় মঠের বাহিরে একটি মুক্ত স্থানে বসিয়া চন্দ্রালোকিত নৈশসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। রথ তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে 'প্রভু! স্বামী'! বলিয়া আহ্বান করিল; তাহার পর তাঁহার পাদমূলে জানু নত করিয়া বসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঘুমঘোরেই সে গৃহের দিকে চলিল। পথে যাহাতে তাহার কোনও বিপদ না ঘটে, এই অভিপ্রায়ে বুদ্ধ কিছু

লইয়া শস্যক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন; তাঁহারা দেখিলেন, রথ আগে আগে যাইতেছে, তাহার পশ্চাতে বৃদ্ধ! তাঁহাদিগকে দেখিয়া হাবিলাও ও ক্যাথারাইন সবিস্ময়ে পাছে কোনরূপ শব্দ করেন, এই ভয়ে বৃদ্ধ দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া তাঁহাদিগকে নীরব থাকিতে ইঙ্গিত করিলেন। ক্যাথারাইন সেই হাত দেখিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন! ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। তাঁহার শিশু পুত্রের দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছিল না; ইহারও নাই! এ কি সেই?

ক্যাথারাইনের ভাবান্তর দেখিয়া তাঁহার স্বামী বুঝিতে পারিলেন, অতঃপর তাঁহার নিকট সত্য কথা গোপন করিয়া ফল নাই। তিনি ক্যাথারাইনের নিকট স্বীকার করিলেন, তাঁহারও বিশ্বাস, জীবন্ত বুদ্ধই ক্যাথারাইনের অপহৃত পুত্র। মিঃ হাবিলাও চীনাম্যানদের কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ উৎপীড়িত ও বিপন্ন হওয়ায় সাংলো নগর পরিত্যাগ করিবারও সংকল্প করিলেন। কিন্তু ক্যাথারাইন বাঁকিয়া বসিলেন; তিনি বলিলেন, এত দিন পরে যদি পুত্রের সন্ধান মিলিল, তাহা হইলে আর তিনি তাহাকে ছাড়িয়া যাইবেন না। বলা বাহুল্য, রথও সাংলো ত্যাগ করিতে চাহিল না।

পুত্র বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে, যীশুর পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার সুযোগ না পাইয়া অনন্ত নরকের পথ প্রশস্ত করিয়াছে, ইহা ভাবিয়া ক্যাথারাইন বড়ই কাতর হইলেন। হাবিলাও তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন চীনদেশে এক জন সংস্কারকের বড় প্রয়োজন; ধর্ম্মসংস্কারের জন্য, চীন জাতির কুসংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত ভগবান তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, অতএব হে সুন্দরী! আক্ষেপ ত্যাগ কর।

পুত্রের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া ক্যাথারাইন সাংলো ত্যাগ করিলেন না। সুতরাং অন্য সকলেও সেখানে যেমন ছিলেন, সেইরূপ রহিলেন। রথের রূপমুগ্ধ মান্দারিন সেই সুন্দরীর হৃদয় জয় করিবার জন্য নানা ভাবে মিশনরী পরিবারের সাহায্য করিতে লাগিলেন। এবং এক দিন তিনি হাবিলাওের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জানাইলেন, নগরের জনসাধারণ আপাততঃ নিরুদ্যম থাকিলেও, তাহারা যে অধিক দিন তাঁহাকে শান্তিতে থাকিতে দিবে, তাহার সম্ভাবনা নাই; তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া সে স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। কেবল যে সাংলোতেই মিশনরীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতেছে, এরূপ নহে; চীন দেশে যেখানে যত মিশনরী আছেন, তাঁহাদের সকলকেই আক্রমণ করিবার ষড়যন্ত্র হইয়াছে। এক জন সম্ভ্রান্তবংশীয় উচ্চপদস্থ ম্যাজিষ্ট্রেট ভিন্নজাতীয় ও ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট স্বদেশীয় জনসাধারণের নিন্দাবাদে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না! খৃষ্টান লেখকের হাতে পড়িয়া ভিন্নদেশীয় অনেক সম্ভ্রান্ত ও দায়িত্বজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তির চিত্রও এইরূপ কৃষ্ণবর্ণে লাঞ্ছিত হয়!

অনেক চিন্তার পর হাবিলাও কিছুকালের জন্য সাংলো ত্যাগ করা সঙ্গত মনে করিলেন। মান্দারিন হাবিলাওের গৃহ হইতে বিদায়গ্রহণের পূর্ব্বে রথ তাহার জীবনের সঙ্কটময় মুহূর্ত্তে তাহার সাহায্যের জন্য মান্দারিনকে ধন্যবাদ প্রদান করিল। মান্দারিন তাঁহার জ্যাকেট হইতে একটি হীরকখচিত 'ক্রস' বাহির করিয়া তাহা রথকে দান করিলেন। রথও ইতস্ততঃ

মান্দারিন প্রস্থান করিলে, বৃদ্ধের এক জন অনুচর হাবিলাণ্ডের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জানাইল, বৃদ্ধ মহাশয় স্বয়ং পাদরী সাহেবের গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, কিন্তু লোকনিন্দাভয়ে তিনি আসিতে পারিলেন না। অতএব পাদরী মহোদয় যেন একবার তাঁহার মঠে যান।

হাবিলাণ্ড সেই অনুচরের সহিত মঠে চলিলেন। পথিমধ্যে তাতারদেশীয় সন্ন্যাসী ও যাকার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহার ঈষৎ হাস্য করিয়া দাঁড়াইল।

বৃদ্ধ হাবিলাণ্ডকে বলিলেন, স্থানীয় জনসাধারণের যেরূপ মনের ভাব, তাহাতে তাঁহাদের অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য সাংলো ত্যাগ করা উচিত। হাবিলাণ্ড বলিলেন, তিনি শীঘ্রই স্থানান্তরে যাইবেন; তবে যদি তাঁহাদের গমনে বাধা দেওয়া হয়, কি তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়, তাহা হইলেই কিছু বিলম্ব হইতে পারে।

মান্দারিন হাবিলাণ্ডের বাংলো হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া রথ ও বৃদ্ধ সম্বন্ধে নানা অশ্রাব্য জনরব শুনিতে পাইলেন। তিনি যে যুবতীকে হস্তগত করিবার জন্য সচেষ্ট, সে গোপনে বৃদ্ধের প্রেমাবদ্ধ, এ কথা শুনিয়া মান্দারিনের হৃদয় ক্রোধে ও ক্ষোভে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি মিশনরীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, সম্রান্ত-সমাজে এ কথা প্রচারিত হওয়ায় তাঁহাকে পদে পদে অপদস্থ হইতে হইল; এবং 'ফুসিয়া লীগ' নামক বিপ্লববাদীর দল স্বদেশদ্রোহী মান্দারিনকে হত্যা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়া উঠিল।

মান্দারিন মহাশয় অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় কালযাপন করিতে লাগিলেন; অতঃপর তিনি পাদরীদের বিরুদ্ধে যে সকল কথা শুনিতে পাইলেন, তাহা তাঁহাদিগকে জানাইতে তাঁহার সাহস হইল না। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার পশ্চাতে গোয়েন্দা লাগিয়াছে। রথের প্রাণ রক্ষা করিতে না পারিলে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হয় না। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাকে লইয়া পলায়ন করিলেও যে তাহার প্রাণরক্ষা হইবে, সে সম্ভাবনা অল্প বলিয়া তাঁহার মনেহইল। তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে উদ্বেগপূর্ণ ও বিষণ্ণ দেখিয়া তাঁহার 'দায়িত্বজ্ঞানহীন বাচাল স্ত্রী'র (chattering irresponsible wife) শিশু পুত্রটিকে আনিয়া তাঁহার কোলে দিলেন। কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে মান্দারিন চণ্ডুর নলের প্রতি তেমন প্রেম প্রকাশ না করায় তাঁহার স্ত্রীর আশা হইয়াছিল, হয় ত স্বামীর চরিত্র সংশোধিত হইতে পারে। মান্দারিন পুত্রকে আদর করিলেন না দেখিয়া তাঁহার স্ত্রী অভিমানভরে ছেলেটিকে কোলে লইয়া দূরে চলিয়া গেলেন। তাহার অল্পক্ষণ পরেই মান্দারিনের একটি বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া তাঁহার নিকট 'ফুসিয়া' ফুল রাখিয়া গেল। 'ফুসিয়া লীগ' নামক সম্প্রদায়ভুক্ত বিপ্লববাদিগণের মধ্যে এইরূপ নিয়ম ছিল যে, কাহাকেও হত্যা করিবার পূর্ব্বে সেই দলস্থ কোনও লোক তাহার উপর 'ফুসিয়া পুষ্পগুচ্ছ' রাখিয়া যাইবে। মান্দারিন সেই পুষ্পগুচ্ছ দেখিবামাত্র সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন! তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। চণ্ডুর নল হাত হইতে পড়িয়া গেল!

পর দিন সন্ধ্যাকালে মান্দারিন মহাশয় অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে চণ্ডু টানিতে টানিতে বাতায়ন-

মৃত্যুর বিভীষিকাপূর্ণ মূর্ত্তি নৃত্য করিতেছিল। কিন্তু তখনও তিনি ইংরাজ যুবতীর কথা ভুলিতে পারেন নাই!

সহসা দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া এক জন দূত সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সে তাঁহাকে জানাইল, প্রধান মান্দারিনের (অর্থাৎ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের) সহিত অবিলম্বে তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিতে হইবে। নগরে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে।

দূতকে বিদায়দান করিয়া মান্দারিন ভৃত্যদের আহ্বান করিলেন; কিন্তু কাহারও সাড়া শব্দ পাইলেন না। অনন্তর তাঁহার আশ্রিত ধাত্রীপুত্রকে আহ্বান করিলেন। সেই যুবক একখানি তীক্ষ্ণধার ছোরা লইয়া তৎক্ষণাৎ মান্দারিনকে আক্রমণ করিল, এবং সেই ছোরা তাঁহার বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিল। ধাত্রীপুত্র মান্দারিনের মস্তকের নিকট এক থোকা 'ফুসিয়া' পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিল।

নগরের জনকোলাহল উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। হাবিলাণ্ড ও তাঁহার পরিবারবর্গ সকলেই বুঝিলেন, আবার নূতন কোনও বিপদ উপস্থিত! তাঁহারা উৎকর্ণ হইয়া উন্মত্ত ও ক্ষিপ্তবৎ নগরবাসিগণের কোলাহল শ্রবণ করিতেছিলেন, এমন সময় বুদ্ধ ও এক জন লামা তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বুদ্ধ তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'মুহূর্ত্তমাত্র এখানে থাকিবেন না; নগরবাসীরা আপনাদের আক্রমণ করিতে আসিতেছে। লণ্ঠন নিভাইয়া আমার সঙ্গে আসুন।'

হাবিলাণ্ড ও ব্লেক পিস্তল সংগ্রহ করিলেন, এবং ক্যাথারাইন ও রথকে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধের অনুসরণ করিলেন।

রাত্রি ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন। পথ অত্যন্ত বন্ধুর ও সংকীর্ণ। তাঁহারা নদীতীর পাশ দিয়া ছুটিতে লাগিলেন; প্রতিপদে ক্যাথারাইনের পদস্খলন হইতে লাগিল দেখিয়া বুদ্ধ তাঁহাকে কোলে লইয়া চলিলেন; রথ, ব্লেক ও তাঁহার পিতার অনুসরণ করিল।

সকলে পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। পাহাড়ের উপর কিছু দূর উঠিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদের বাসগৃহ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে। তাঁহারা একটি নদী পার হইয়া আসিয়াছিলেন; উন্মত্ত নগরবাসীরা তাঁহাদিগকে বধ করিবার জন্য নদী তীর পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়াছে, সেই অগ্নির আলোকে তাহাও তাঁহারা দেখিতে পাইলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অনুসরণকারীরা পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল। কিন্তু বুদ্ধ তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া একটি গুপ্ত গুহাপথে মঠে প্রবেশ করিলেন।

বুদ্ধ মঠে উপস্থিত হইবামাত্র, তাঁহার এক জন অনুচর তাঁহাকে বলিল, 'আপনি যে তিব্বতী-সন্ন্যাসীকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, সে ঘোষণা করিয়াছে, আপনি জাল বুদ্ধ, এবং সে-ই প্রকৃত বুদ্ধ! মঠের অনেক সন্ন্যাসী তাহার কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।'

তিব্বতী সন্ন্যাসী মাকা মঠের সন্ন্যাসিগণকে তাহার দলভুক্ত করিবার জন্য বক্তৃতা আরম্ভ করিয়াছিল; সে বলিতেছিল, 'দেখ, আমিই প্রকৃত বুদ্ধ। প্রমাণ চাও? দেখ, আমার দক্ষিণ হস্তে চারিটির অধিক অঙ্গুলি নাই। যদি তোমরা জাল বুদ্ধের দক্ষিণ হস্তটি পরীক্ষা করিয়া

জন্মাবধিই আমার চারিটির অধিক অঙ্গুলি নাই। এই জাল বুদ্ধ বিদেশী, বিধর্ম্মী। সে তোমাদের সনাতন ধর্ম্মমত লণ্ডভণ্ড করিতেছে; অনেক ধর্ম্মানুষ্ঠান রহিত করিয়াছে। আমি যে আসল বুদ্ধ, তাহার আরও প্রমাণ দেখ।' মাকা একখানি প্রকাণ্ড ছুরিকা দ্বারা নিজের উদরে আঘাত করিল। রক্তস্রোতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভাসিয়া গেল। কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই কোনও কৌশলে তাহার সেই ক্ষত তিরোহিত হইল; ক্ষতের চিহ্নমাত্র রহিল না! তাহার ক্ষত হইতে যে রক্ত ঝরিয়া পড়িয়াছিল, মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসীরা তাহা স্ব স্ব মস্তকে লেপন করিয়া, মাকার নেতৃত্ব স্বীকার করিল।

বুদ্ধের অনুগত সন্ন্যাসীরা বিপদ বুঝিতে পারিয়া তাঁহার বাসগৃহের সম্মুখে শত্রুপক্ষের গতিরোধের জন্য দণ্ডায়মান হইল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। হাবিলাও ও ব্রেক বন্দুকের গুলিতে বহু শত্রু বধ করিলেন। কিন্তু শীঘ্র টোটা ফুরাইয়া গেল। মাকা একখানি তরবারিহস্তে নিরস্ত্র বুদ্ধকে আক্রমণপূর্ব্বক বধ করিল। কিন্তু মাকারও প্রাণরক্ষা হইল না; মঠের কয়েকটি কুকুর সহসা ছুটিয়া আসিয়া মাকাকে অক্রমণপূর্ব্বক তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল।

বুদ্ধের মৃত্যুর পর সন্ন্যাসীরা শ্বেতাঙ্গদলকে আক্রমণ করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। তখন হাবিলাও জীবনরক্ষার অন্য উপায় নাই দেখিয়া একটি গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং দরজা বন্ধ করিয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দিলেন। সেই ঘর হইতে পর্ব্বতের অন্য অংশে যাইবার একটি গুপ্ত পথ ছিল। সেই পথে তাঁহারা পর্ব্বতপ্রান্তবাহিনী নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। ফ্রেজার ইতিপূর্ব্বে একখানি গনবোট লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা সেই বোটে আরোহণ করিয়া লাং-লো হইতে পলায়ন করিলেন; অগ্নিরাশি ভীষণ দাবানলে পরিণত হইয়া সমগ্র মঠটিকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

গ্রন্থকার এই সুবৃহৎ উপন্যাসে এইরূপে তাঁহার উপাখ্যানের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। আমরা এই প্রবন্ধে আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্ত মর্ম্মমাত্র প্রকাশ করিলাম। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে চীনাম্যানদিগের চরিত্র ব্যাঘ্র ভল্লুকের প্রকৃতি অপেক্ষাও ভয়াবহ রূপে চিত্রিত করিয়াছেন; সমগ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, চীন জাতির মধ্যে মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্মজ্ঞান নাই, মানবের কোনও সুকোমল বৃত্তি তাহাদের হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইবার অবসর পায় নাই! অথচ এই উপন্যাস পাঠ করিয়া বিলাতের অনেক সমালোচক অসঙ্কোচে সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়াছেন,—এই উপন্যাসের লেখক চীন দেশের অধিবাসিগণের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি ও সমাজ জীবন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ বলিয়াই চীন জাতির এমন নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন!

বনফুল।

হে গোবিন্দ, হে মাধব, নারায়ণ, মুকুন্দ, মুরারি!
আমি চাহি হইবারে শ্বেতবর্ণ ক্ষুদ্র বনফুল ;—
নেত্রে হাসি, ঋষিপত্নী পরি' কান্ত বাকল-দুকূল,
স্বহস্তে তুলিবে মোরে! "জয় হরি" বদনে উচ্চারি'
বিনায়ে বিনায়ে গাহি' কৃষ্ণ-স্তোত্র, প্রাণ-মনোহারী ;
বাজাইয়া শঙ্খ ঘণ্টা, উন্মাদন জ্বালিয়া গুগ্‌গুল,
তপোবন-আশ্রমের ঋষিবৃন্দে করি হর্ষাকুল,
অর্পিবে তোমার পদে! ধন্য ভাগ্য, যাই বলিহারি!
দাস-ভাবে চুম্বি পদ দিনে দিনে হব ভাগ্যবান ;
সখা-ভাবে হয়ে মরি সুচিকণ বরগুঞ্জমালা,
আলিঙ্গিব কণ্ঠ তব! কৌস্তুভ-কিরণ করি' পান,
জ্যোতির্ম্ময়! হব আমি হিরণ্ময় অপূর্ব্ব উজ্জ্বলা!
তার পর? তার পর মধুর ভাবেতে হয়ে ভোর,
মাথার ভূষণ হয়ে পাব মুক্তি, ওগো চিত্তচোর!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

কৃষ্ণ-কথা।

---:০:---

শ্রীবৃন্দাবন-লীলা সাঙ্গ হইয়াছে; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এখন দ্বারকায় রাজা। আর সে বনে বনে ধেনু চরান, বনফলে উদর পূরান, বনফুলের মালা গাঁথা, থাকিয়া থাকিয়া রাধানামে সাধা বাঁশী বাজান, যমুনাতীরে কেলিকদম্বমূলে পরকীয়া প্রীতি, সে সব কিছুই নাই। এখন কেবল রাজতক্তে বসিয়া চামরের বাতাস খাওয়া, আর চাটুকারের চাটুবাণীতে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করা। তাহার পর প্রহরে প্রহরে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় রাজভোগ। এত রাজসম্পদ, এত ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে করিতে যে 'রাখালরাজ সেই বংশীধারী'র মনে একটু বিকার, একটু মদগর্ব্ব হয় নাই, সে কথাও বলা যায় না। নরলীলা করিতে

দ্বারকার প্রজারা যখন রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে নূতন রাজার জন্মোৎসব উপলক্ষে ঘরে ঘরে আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করিতেছে, তখন ভগবান্ আদেশ করিলেন, "এক বৃহৎ অন্নসত্র বসাও, তাহাতে জগতের সমুদয় প্রাণী স্ব স্ব রুচির অনুরূপ সুখাদ্য উদর পূর্ণ করিয়া খাইতে পাইবে, এইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে। 'চব্বিশ প্রহর' ধরিয়া এই 'অন্নকূট মহোৎসব' চলিবে। অকাতরে অর্থব্যয় কর, আমার রাজভাণ্ডারে অভাব কিসের?" আদেশমাত্র কর্ম্মচারিবর্গ সমস্ত আয়োজন করিল। স্বয়ং ভগবান্ সুবর্ণরথে আরোহণ করিয়া বিশাল অন্নক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া গেলেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে দ্বারকাপতির অতুল বিভব দেখিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মনে কনিষ্ঠের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ঈর্ষার সঞ্চার হইল কি না, কে জানে?

অন্নসত্রে পৃথিবীর সর্ব্ব-জীবের প্রবেশের সময় উপস্থিত। এমন সময় গরুড় স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া সত্রের দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। অন্ন নিমন্ত্রণক্ষেত্রে অবারিত দ্বার, কেহই গরুড়ের পথরোধ করিল না। গরুড় শনৈঃ শনৈঃ সজ্জিত অন্নস্তূপের সমীপবর্ত্তী হইয়া তিন গ্রাসে রাশীকৃত ভোজ্য নিঃশেষ করিলেন। দেবতারা সবিস্ময়ে গরুড়ের কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। সত্রের কর্ম্মচারীরা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রাজদরবারে সংবাদ দিল।

এই অভাবনীয় সংবাদ পাইবামাত্র ভগবান্ রথারূঢ় হইয়া অন্নসত্রে আসিয়া পঁহুছিলেন। বহুদিন পরে গরুড়কে দেখিয়া বৈকুণ্ঠের কথা, লক্ষ্মীর কথা মনে পড়িয়া গেল, ভগবান্ উন্মত্ত হইলেন; মানুষী মায়ায় অভিভূত ভগবানের চক্ষু হইতে দরদরধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। মহাভক্ত গরুড়ও প্রভুকে পাইয়া হর্ষগদ্গদ হইয়া চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে গেল। ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই আত্মহারা। কাহারও চক্ষের পলক পড়ে না। মুহূর্ত্ত পরে ভগবান্ শূন্য অন্নস্থালীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হায়! হায়! গরুড়, কি করিলে? আমি যে জগতের নিখিল জীবকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, ভোজনবেলা উপস্থিত, বুভুক্ষু অতিথি দ্বারে, কিরূপে তাঁহাদের ক্ষুধা শান্ত করিব? আমার দারুণ অধর্ম্ম হইবে, আমার করুণাময় নামে কলঙ্ক পড়িবে।" গরুড় বলিলেন "প্রভু! বিচলিত হইবেন না। নরলোকে বাস করিয়া আপনার নির্গুণ সাত্ত্বিক প্রকৃতিতে রজোগুণের ঈষৎ ছায়া পড়িতেছিল, রাজভোগে

করিয়া গৌরবলাভের আকাঙ্ক্ষায় আপনি এই মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন; আপনাকে দেখাইলাম, পার্থিবসম্পদ কি অকিঞ্চিৎকর! প্রকৃত অতিথিসৎকারে ব্যাঘাত ঘটিবে না, আমি তাহার উপায় করিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া গরুড় বিশাল পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক আকাশমার্গে উড্ডীন হইয়া চক্ষুর নিমেষে চন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলেন, এবং তথা হইতে অমৃতভাণ্ড আহরণ করিয়া গগনতল হইতে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধরাধামের নিখিল বুভুক্ষু প্রাণী পরিতৃপ্ত হইল; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, অবসাদ সমস্তই দূরীভূত হইল। ভগবান্ আনন্দে বিহ্বল হইয়া গরুড়কে কোল দিলেন।

২

ইহার পর কিছু দিন গেল। ভগবান্ ষোড়শসহস্র রাণী লইয়া বিহার করিতেছেন। কিন্তু মনে শান্তি নাই। রাণীদিগের মান, অভিমান, কলহকোলাহল, ঈর্ষা দ্বেষ সময়ে সময়ে প্রবল হইয়া উঠে। তখন সেই অশান্তির মধ্যে কেবল অচলা লক্ষ্মীসদৃশী রুক্মিণী-সত্যভামার নিষ্কাম সেবায় ও পতিভক্তিতে চিত্তের চাঞ্চল্য প্রশমিত হয়। যখন হৃদয় নিতান্ত অশান্ত হইয়া পড়ে, তখন পুরী-সংলগ্ন বৃক্ষবাটিকায় কুসুমচয়ন করেন, এবং আনমনে ভ্রমর-ভ্রমরীর গুঞ্জন, প্রেমাভিনয় দেখিতে দেখিতে ব্রজের কথা মনে পড়ে। রুক্মিণী-সত্যভামা আড়াল হইতে পতির ভাব দেখেন, নিকটে আসিতে সাহস করেন না। ভগবান্ কতবার মনে করিয়াছেন, দৈবী শক্তি প্রকাশ করিয়া রাণীদিগকে স্তম্ভিত করেন; কিন্তু পাছে তাহাতে আবার রজোগুণের বিকাশ হয়, এই ভাবিয়া নিরস্ত হয়েন। গরুড়-প্রদত্ত শিক্ষার পর তিনি অন্তর হইতে রাজসিক ভাব একেবারে উন্মূলিত করিয়াছেন।

একদিন ষোড়শসহস্র রাণীর আদর আব্দার সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পুষ্পোদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এবং মুগ্ধনয়নে প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, এক ভ্রমর-দম্পতীর মধ্যে প্রণয়কলহের সূত্রপাত হইয়াছে। প্রণয়িনী কুপিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিতেছেন, প্রণয়ী তটস্থ। ভগবান্ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন, "হায়! যে মায়ায় আমি বদ্ধ, এই সামান্য পতঙ্গটিও দেখিতেছি সেই মায়ায় বদ্ধ। দেখি, ইহাদের কি অবস্থা দাঁড়ায়।"

ভ্রমর কিছুক্ষণ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া যখন দেখিল, প্রণয়িনীর স্বর

অবলম্বন না করিলে ইহার নিবৃত্তি হইবে না। এই সিদ্ধান্ত করিয়া সে চোখ ঘুরাইয়া মুখ বাঁকাইয়া রোষভরে বলিয়া উঠিল, "জান, আমি মানুষের ন্যায় দুর্ব্বল দ্বিপদ নহি, নির্ব্বোধ পশুদিগের ন্যায় চতুষ্পদও নহি, আমি ষট্‌পদ; ইচ্ছা করিলে পদাঘাতে পৃথিবী রসাতলে দিতে পারি? তুমি অবলা স্ত্রীজাতি, আমার সঙ্গে বলপরীক্ষা করিতে আস?" শুনিয়া ভ্রমরীর তর্জ্জনগর্জ্জন থামিয়া গেল। মুখে আর রা নাই। সুড় সুড় করিয়া ভ্রমরের বামপার্শ্বে বসিয়া মধুপানে প্রবৃত্ত হইল।

ভগবান্ এইরূপ 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' দেখিয়া ত একেবারে অবাক্! তিনি অতি সন্তর্পণে ভৃঙ্গরাজকে কনিষ্ঠ অঙ্গুলীতে উঠাইয়া লইয়া অন্তরালে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তুমি এখনই ভ্রমরীকে যে ভয় প্রদর্শন করিলে, সত্য সত্যই কি তোমার সে শক্তি আছে?" ভ্রমর করযোড়ে মৃদুস্বরে বলিল, "প্রভু, আমার শক্তি বা শক্তিহীনতা কি আপনার অজ্ঞাত? কি করি? এইরূপ উপচারের আশ্রয় না লইলে যে মানভঞ্জন হয় না। শাস্ত্রকারেরাও নাকি এইরূপ মিথ্যাকথায় পাপ নাই বলিয়া গিয়াছেন।" ভগবান্ মৃদু হাসিয়া ভৃঙ্গরাজকে ছাড়িয়া দিলেন। সে উড়িয়া গিয়া ভ্রমরীর পাশে বসিল। এই ঘটনা দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের একবার মনে হইল, "আমিও ত এই উপায়ে কলত্রবর্গকে বশীভূত করিতে পারি। আমার পক্ষে এরূপ ভয়প্রদর্শন মিথ্যাচরণও ত হইবে না।" আবার মনে হইল, "না, এ ত রজোগুণের ক্রিয়া, এ চিন্তাকে মনে স্থান দিব না। পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত অশান্তি সহিয়া থাকিব, স্থিরচিত্ততাই ত সত্বগুণের প্রকৃত লক্ষণ।"

এখন ঘটনাটি রুক্মিণী সত্যভামা আড়াল হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা একটা মত্‌লব আঁটিয়া ভ্রমরীকে বসনাঞ্চলে উড়াইয়া গৃহাভ্যন্তরে লইয়া আসিলেন। তাহার পর দুই সখীতে যুক্তি করিয়া ভ্রমরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, তুমি যে তোমার প্রণয়ীর আস্ফালন শুনিয়া একেবারে নির্ব্বাক হইলে? তুমি কি সত্যসত্যই বিশ্বাস কর যে, সেই বীরপুরুষ এক পদাঘাতে পৃথিবী রসাতলে দিতে পারে?" ভ্রমরী একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী, আমি কি বুঝি না যে, ভৃঙ্গরাজ কেবল মুখসাপটে দড়? বুঝিয়াও চুপ করিয়া যাই। আপনারাও ত ঘরকন্না করিতেছেন, আপনারা কি জানেন না যে, পুরুষের কাছে হার না মানিলে বড় হায়রাণ হইতে হয়?" কথাটা শুনিয়া একমুখ হাসিয়া তাঁহারা বলিলেন, "তোমাকে এক কর্ম্ম করিতে

হইবে। এবার ভ্রমর ওরূপ ভয় দেখাইলে, তুমি বলিবে যে, 'আচ্ছা, তোমার যাহা সাধ্য থাকে, তাহাই কর।' আমরা একটু রঙ্গ দেখিব।" ভ্রমরী ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া উড়িয়া গেল।

ভ্রমরী কলহ বাধাইতে অদ্বিতীয়। অর্দ্ধদণ্ড না যাইতেই আবার সেই প্রণয়-কলহ। সেই কথাকাটাকাটি, মাথাকুটাকুটি, সেই তর্জ্জনগর্জ্জন। যথাকালে ভ্রমরের সেই ভয়প্রদর্শন। আর রুক্মিণী-সত্যভামার শিক্ষামত ভ্রমরীর সাজ্ঘাতিক উত্তর। ভ্রমর সে কথা শুনিয়া ত একেবারে আকাশ হইতে পড়িল! উপায়ান্তর না দেখিয়া একেবারে শ্রীকৃষ্ণের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া বিপদ্‌বার্ত্তা জানাইল।

লীলাময় দেখিলেন যে, ভ্রমরের জিদ্ বজায় না থাকিলে পুরুষজাতির গৌরব চিরদিনের মত ক্ষুণ্ণ হয়। ভবিষ্যতে আর স্ত্রী স্বামীকে মানিবে না, সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ দায় হইয়া উঠিবে। তিনি আপদুদ্ধারকল্পে গরুড়কে স্মরণ করিলেন।

গরুড় ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাত করিয়া করযোড়ে জিজ্ঞাসিলেন, "প্রভু, অধীনকে অদ্য কি জন্য স্মরণ করিয়াছেন?" শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্যাপার গরুড়কে শুনাইলেন। গরুড় বলিলেন, "প্রভু, এখন আমাকে কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন।" ভগবান্ বলিলেন, "যখন ভ্রমর ভূমিতে পদাঘাত করিবে, তখন তুমি দ্বারকাপুরী রসাতলে প্রেরণ করিবে; আবার যখন ভ্রমর দ্বিতীয়বার ভূমিতে পদাঘাত করিবে, তখন তুমি দ্বারকাপুরী রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিবে। তাহা হইলেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" গরুড় তাহাই করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সাহস পাইয়া ভ্রমর আবার উড়িয়া গিয়া ভ্রমরীর গায়ে পড়িয়া ঝগড়াটা পাকাইয়া তুলিল। ভ্রূকুটী করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি, এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার সঙ্গে সমান উত্তর?" তবে দেখিবে?' এই বলিয়া ভ্রমর সজোরে ভূমিতে পদাঘাত করিল। বৃক্ষে বৃক্ষে কুসুমকিশলয় কাঁপিয়া উঠিল। গরুড়ও প্রস্তুত ছিল; তদ্দণ্ডেই দ্বারকাপুরী রসাতলে নীত হইল। আর্ত্ত নরনারীর কোলাহলে দিগ্বলয় মুখরিত হইল। ভ্রমরী ভয়ে মৃতপ্রায় হইয়া ব্যাকুলকণ্ঠে ভ্রমরকে বলিল, "ক্রোধং প্রভো! সংহর সংহর।" তখন ভ্রমর ভ্রমরীর বাক্যে শান্ত হইয়া পুনরায় ভূমিতে পদাঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ গরুড় দ্বারকাপুরী রসাতল হইতে উদ্ধার করিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। ভ্রমর-ভ্রমরীর কলহ মিটিয়া গেল।

এ দিকে এই প্রলয়ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শসহস্র রাণীর মুখ ভয়ে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। তাঁহারা কম্পমানকলেবরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে 'বিপত্তৌ মধুসূদনং' স্মরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়ভিক্ষা করিতে ছুটিলেন। পথিমধ্যে রুক্মিণী-সত্যভামার সঙ্গে দেখা। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রাণীরা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দিদি! এ কি সর্ব্বনাশ! কেন এমন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল?" রুক্মিণী-সত্যভামা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "জান না, ভ্রমরীর কলহে ভ্রমরকে মনঃক্ষুণ্ণ দেখিয়া প্রভু সৃষ্টি রসাতলে দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরে অনুতপ্তা ভ্রমরীর অনুরোধে প্রভু ক্রোধ সংবরণ করিয়াছেন। তোমরা কি জান না, পতিপত্নীতে অপ্রীতি ঘটিলে সৃষ্টি রসাতলে যায়?" রুক্মিণী-সত্যভামার কথা শুনিয়া ষোড়শসহস্র রাণী এ উহার মুখপানে চাহিতে লাগিলেন। সকলেরই মনে এক কথা। "আমরা যে প্রতিনিয়তই প্রভুর সঙ্গে কলহ করি। ধন্য তাঁহার প্রেম যে, তিনি ইহা সহ্য করিয়া থাকেন। হায়, আমরা এতদিন এমন উদার প্রেমের, এমন ধৈর্য্যশালিতা ও ক্ষমাশীলতার মর্ম্ম বুঝি নাই।" এই ভাবিয়া তাঁহারা সকলেই গললগ্নীকৃতবাসে পরমপ্রভুর পা জড়াইয়া ধরিলেন, প্রকাশ্যে বলিলেন, "প্রভু, আমরা অজ্ঞান নারী, ক্ষমা করুন, আমরা আর কখনও আপনার সঙ্গে কলহ করিয়া আপনার প্রশান্ত সাগর-সদৃশ হৃদয় সংক্ষুব্ধ করিব না।" শ্রীকৃষ্ণ সবিস্ময়ে চাহিলেন, দেখিলেন, সস্মিতমুখী রুক্মিণী-সত্যভামা সম্মুখে দাঁড়াইয়া। চোখের ঈশারায় কি কথা হইল, জানি না। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন সকল বুঝিলেন। বুঝিয়া প্রসন্নমনে তাঁহার সেই ষোড়শসহস্র রাণীকে বাহুবেষ্টনে বাঁধিয়া ফেলিলেন, এবং প্রীতিচিহ্নস্বরূপ তাহাদের বিম্বাধরে প্রণয়চুম্বন দিলেন। তাঁহারা আনন্দাতিশয্যে শিহরিয়া উঠিলেন। পরম সতী রুক্মিণী-সত্যভামা ও পরম ভক্ত গরুড় অনিমেষলোচনে লীলাময়ের লীলা দেখিতে লাগিলেন, এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। দেবগণ স্বর্গ হইতে সেই মধুর দৃশ্য দেখিয়া হর্ষাকুল হইলেন। আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইল, দিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন হইল, মলয়পবন বহিতে লাগিল—"দিশঃ প্রসেদুঃ মরুতো ববুঃ সুখাঃ"। ভগবানের চিদাকাশে সাত্ত্বিক ভাবের পূর্ণবিকাশে জগৎ আনন্দময় হইল; কলহ, বিবাদ, রাগ দ্বেষ মান, অভিমান জগৎ হইতে তিরোহিত হইল। গরুড় করযোড়ে বলিলেন, "ঠাকুর, আমার মনস্কামনা পূরিয়াছে, এত দিনে আপনার সাত্ত্বিকী প্রকৃতির

ইচ্ছাময়, আপনার ইচ্ছায় যেন জগতে আজ হইতে চিরশান্তি বিরাজমান থাকে।" এই প্রার্থনা করিয়া গরুড় প্রভুর নিকট সবিনয়ে বিদায় লইয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিলেন। ভগবান্ ষোড়শসহস্র রাণী ও রুক্মিণী-সত্যভামাকে লইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। *

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কঠোর কর্ত্তব্য।

পরাজিত শত্রু-সেনা ; নায়কেরে তা'র
আনিল সমরে জিনি' মোর সেনাদল ;
শত ক্ষ'তে উচ্ছ্বসিয়া ঝরে অনিবার
তখনো শোণিত-স্রোত উত্তপ্ত তরল।

অবসন্ন, শ্রান্তি-ছায়া দু'খানি নয়নে ;
উন্নত ললাট তার শোণিতে রঞ্জিত ;—
যেন মেঘ-লেশ-হীন পূরব গগনে
দীপ্তি-সমুজ্জ্বল সূর্য্য হ'তেছে উদিত !

বারেক দেখিনু চাহি, মোর সভাতলে
সহস্র বীরের মাঝে কে হেন সুন্দর !
মুষ্টিমেয় সেনা লয়ে অসীম কৌশলে
কে অসংখ্য সেনাগণে যুঝিতে তৎপর ?

ফিরিয়া দেখিনু—মোর সিংহাসনমূলে
রক্তসিক্ত শিলা 'পরে দীপ্ত বীরবর ;
শ্রান্ত মূর্চ্ছা নেমে আসে নয়নের কূলে—
গর্ব্ব-তেজো-দীপ্ত মূর্ত্তি অনিন্দ্যসুন্দর।

---

* Kipling এর 'just so stories' নামক শিশুপাঠ্য পুস্তকের 'The Butterfly tha stamped' নামক গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত। তুলনায় সমালোচনার জন্য পাঠক-সমাজকে মূল গল্পটি পড়িতে অনুরোধ করি।—প্রবন্ধলেখক।

হায়—যদি পারিতাম করিতে সেচন
মোর দীনা দাসী-সম সজলনয়নে
বিলুণ্ঠিত শ্রান্ত শিরে করিতে বীজন ;
প্রক্ষালিতে শত অস্ত্র-ক্ষত সযতনে ;

মুক্ত করি' কর-বদ্ধ শৃঙ্খল-বন্ধনে,
ভূমিবিলুণ্ঠিত শির অঙ্ক পরে তুলি'
মুছে দিতে পারিতাম অঙ্গুলি-চালনে
কুঞ্চিত কুন্তল হ'তে সমরের ধূলি !

আগ্রহলোলুপদৃষ্টি—রহিনু চাহিয়া
মুহূর্ত্ত বিমুগ্ধ—যেন আঁকা চিত্রপটে।
মৃত্যু-আজ্ঞা ! অশ্রু-উৎস উঠে উচ্ছ্বসিয়া ;
নিবারিত করিলাম নয়নের তটে।

সহসা পশিল কর্ণে অধীর গুঞ্জন—
সৈনিকের কোষ-বদ্ধ অসি-ঝণৎকার ;—
এখনো স্ফুরে না কেন আদেশ-বচন
সম্রাজ্ঞীর ওষ্ঠাধরে ? মৌন তিরস্কার।

কণ্টকে গঠিত যেন মোর রাজবেশ,
মুকুট মানিনু যেন পাষাণের ভার ;
পাষাণে বাঁধিয়া হৃদি করিনু আদেশ,—
'লয়ে যাও' ! গেল যেন সকলি আমার !

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

সায়েদ্ বন্দরে।

গ্রীক্ জাতির সভ্যতায় ইউরোপ আলোকিত হইয়াছিল; কিন্তু মূলতঃ মিশর (ঈজিপ্ত) দেশের প্রাচীন সভ্যতা হইতে গ্রীক্ সভ্যতার উৎপত্তি। মিশরের সেই সুপ্রাচীন সভ্যতার ভগ্ন, জীর্ণ, লুপ্ত কঙ্কালের কণামাত্র খুঁজিয়া তুলিয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাই। কিন্তু সে প্রাচীন মিশরবাসী আর নাই। আজ—

"কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল?
বাঁধিয়ে পাষাণস্তূপ, অবনীতে অপরূপ,—
দেখাইলা মানবের কি কৌশল বল;—
প্রাচীন মিশরবাসী— কোথা সে সকল?
পড়িয়া রয়েছে স্তূপ অবনীতে অপরূপ; —
কোথা তারা? এবে কারা হয়েছে প্রবল
শাসন করিতে এই অবনীমণ্ডল?"

প্রাচীন মিশরবাসী আর নাই; "পৃথিবী হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। যে আরবদেশীয়েরা এখন মিশরের প্রধান অধিবাসী, তাহাদেরও সেই প্রাচীন সারাসানী গৌরব আর নাই। নামে যাহাই হউক, মিশর এখন কার্য্যতঃ ইউরোপীয় শাসনের অধীন। মিশর দেশে আরবের লোকের বড় দুর্নাম। স্বদেশেও উহাদের এখন সভ্যতার খ্যাতি নাই। কিন্তু—

"সৌভাগ্য-কিরণজালে উহারাই কোন কালে
করেছিল মহাতেজে পৃথিবী শাসন।
পশ্চিমে হিস্পানি শেষ, পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দুদেশ,
কাফের যবন-বৃন্দে করিয়া দমন
উল্কা সম অকস্মাৎ হইল পতন।

লোহিত সাগরের উভয় কূলেই কেবল মরুক্ষেত্র। সেই মরুপ্রান্তরের মধ্যে সুবিস্তীর্ণ নগ্ন পর্ব্বতমালা। সমস্ত দেশ যেন মরুক্ষেত্র। কিন্তু সূর্য্য-দগ্ধ বালুকারাশির তলে, অতি স্বচ্ছ নির্ম্মল সুশীতল জল। নগ্ন রুক্ষ শৈলমালার পদপ্রান্তে নাতিবিস্তৃত শ্যামল দেশে বহুবিধ সুখাদ্য ফল। মরুপ্রান্তে শৈলপাদে ও শ্যামল ক্ষেত্রে, স্নিগ্ধ জল ও মিষ্ট ফলে পুষ্ট বিধাতার চারু

আরব-কামিনী বড় সুন্দরী। বেদানার রসে রঞ্জিত আঙ্গুরের মত ঠোঁট, এপেলের মত কপোল, আরবের মারব-কলঙ্ক দূর করিয়াছে। কেবল মক্কা মদিনায় নয়—পোর্ট সায়েদের বন্দরে পথে ঘাটে যে লাবণ্য মুখের অর্দ্ধ-উন্মুক্ত আবরণের পার্শ্বে ঝলকিয়া উঠে, তাহার একটা ক্ষুদ্র ঢেউ য়ূনানী ভামিনীর সৌন্দর্য্য-গৌরব ভাসাইয়া লইয়া যায়।

কিন্তু চাঁদে কলঙ্ক! অমন সুন্দর যাহাদের ঠোঁট, তাহারা পান খায় না কেন? মরুক্ষেত্রে আঙ্গুর হয়, খেজুর হয়, আর চেষ্টা করিলে কি বরোজ হইত না? বরোজের পানে যে সরোজ ফুটাইতে পারে, তাহা কি আরবী বুদ্ধিতে যোগায় না? আল্‌বরুণীর প্রেতাত্মা হয় ত বলিতেছেন,—"কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাং!" সেটা না হয় বুঝিলাম; কিন্তু অতি সূক্ষ্ম হইলেও মুখের উপর ক্ষুদ্র কৃষ্ণ বসনখানির আবরণ কেন?

আরব-নারীর মুখের আবরণে একটু নূতনত্ব আছে। আর্য্যাবর্ত্তের ঘোম্‌টা নয়, হিন্দুস্থানের ইস্‌লাম্‌-আশ্রিতার ঘেরাটোপ নয়; মুখের উপরকার ছোট পরদাখানি মুখশ্রীকে সম্পূর্ণ লুকাইয়া রাখিতে পারে না। একটা কারু-কার্য্যখচিত নলের গায়ে সূক্ষ্ম বসনখানি আঁটা; এবং সেই নলটি নাকের উপর বসানো। চোখ ও ঠোঁট সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে; ভ্রূলতা ও কপোলপ্রান্তও ঢাকা পড়ে না। তবুও আবরণ! সংস্কৃত পণ্ডিত আল্‌বরুণী আবার "বল্কলেনাপি" বলিবেন না কি? রমণীরা পান খান না; কিন্তু কাজল পরেন। মল্‌টায় রমণীর চক্ষু অতি উজ্জ্বল,—হয় ত জগতে অতুল্য! কিন্তু এই কাজল-পরা চক্ষুর দৃষ্টিও উজ্জ্বল, কোমল ও হাস্যময়!

এক দিন আগ্রা ও শাজাহানাবাদের প্রসাদে সারাসানী সভ্যতার আলোকে,—যমুনার জল, বসোরার গুল্‌, সিরাজের সুরা ও আরবের সুন্দরী, মোগল পাতশাহদিগকে উদ্‌ভ্রান্ত করিত। "যবনীমুখপদ্মানাং মধুমদং" এক দিন না কি চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য অসহ্য মনে করিয়াছিলেন। বাণভট্ট সাক্ষী; এক দিন শকাঙ্গনার গণ্ড-দীপ্তিতে হর্ষবর্দ্ধনের হর্ষ-বর্দ্ধন হইয়াছিল। কিন্তু এ সৌন্দর্য্য তাহা অপেক্ষা হীন নহে। পোর্ট সায়েদ্‌ গ্রীক্‌-ব্যবসায়ীতে পরিপূর্ণ; সুন্দরী যবনীরা রাজপথ উজ্জ্বল করিয়া পরিভ্রমণ করেন। ইরাণী সুন্দরীর অতিদীর্ঘ নাসিকার সহিত পারসীদিগের কৃপায় আমরা সুপরিচিত।

কিন্তু হায়! যখন জাহাজের ডেকে বসিয়া, 'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী'রা ঘৃণার হাসি হাসিয়া আরব-নারীর সৌন্দর্য্যের সমালোচনা করেন, তখন মনে হয়,—

হিংসা হংস-ময়ূর-কোকিলকুলে কাকেষু লীলারতিঃ।

কিন্তু দুঃখ এই, আরবের লোকেরা প্রাচীন সভ্যতা হারাইয়া ও পরাধীন হইয়া চোহাড় হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা মক্কায় হজ্ করিতে যান, আমি তাঁহাদের অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, দস্যুর হাত হইতে ত্রাণ পাইয়া ফিরিয়া আসা বড় শক্ত। কিন্তু পোর্ট সায়েদে ইংরেজ ও ফরাসীর প্রাদুর্ভাবে পুলিসের বন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং চিহ্নিত গাইডের ব্যবস্থা আছে। তাহাতে নগরভ্রমণে এখন কোনও ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু এখনও একাকী বেড়াইতে গেলে অনেককেই বিপদে পড়িতে হয়। গলা টিপিয়া মারিয়া সর্ব্বস্ব শোষণ করিবার জন্য অনেক গোয়েন্দা পথে ঘাটে ফিরিয়া থাকে। হজরৎ মহম্মদের পবিত্র ধর্ম্ম ইহাদিগকে কি স্পর্শ করিতে পারে নাই? সুযোগ পাইয়া ইউরোপীয়েরা সমগ্র মুসলমান সম্প্রদায়কে গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত করিয়া থাকেন। আমার এক জন মুসলমান বন্ধু একদিন এই প্রসঙ্গে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন,—"কেহ তিরস্কার করিলে রাগ করিয়া জবাব খুঁজিয়া ঝগড়া করিয়া লাভ নাই; মুসলমানের ধর্ম্মে যদি পবিত্রতার উৎস থাকে, তবে একদিন এ কলঙ্ক ধুইয়া লইয়া যাইবে।" সর্ব্বান্তঃকরণে একেশ্বরবাদী সমাজের মঙ্গল প্রার্থনা করি।

মিশরের প্রাচীন অধিবাসীর জীবন-প্রদীপ বহুকাল হইল, নির্ব্বাপিত হইয়াছে; কবির ভাষায়,—"The life-blood of old Egypt courses with the muddy Nile." কিন্তু এখন মিশরে মুসলমানদিগের অবস্থা কি, তাহা ইতিহাস না পড়িয়া হল্ কেইনের নবপ্রকাশিত White Prophet নামক কথা-গ্রন্থ হইতে পাঠকেরা অনেকপরিমাণে জানিতে পারেন। যাহারা চোহাড় ও গুণ্ডা, তাহারা কি আপনাদের নীচ প্রকৃতির দোষেই ঐরূপ হইয়াছে, না অবস্থার দোষে, এবং ঘটনার তাড়নায় রাক্ষস সাজিয়াছে? কে বলিতে পারে যে, একদিন এল্এঝারের বিদ্যা-মন্দির অধিবাসীদিগকে শত গুণে ভূষিত করিয়া তুলিবে না?

ভৌগোলিক হিসাবে ও বাণিজ্যের বিচারে পোর্ট সায়েদ্ পূর্ব্ব ও পশ্চিমের

হইতে ইউরোপ জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিল। আবার কি হইবে, কে বলিতে পারে? কেইরোর প্রশস্ত রাজপথ, আলেক্‌জন্দ্রিয়ার ভবন-বাতায়ন ও পোর্ট সায়েদের বন্দর যে রূপসীদিগের সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত, তাঁহারা যে দূর ভবিষ্যতের জননী, সে অজ্ঞেয় কালের ভাণ্ডারের কথা কে বলিতে পারে?

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আহম্মদাবাদ।

আহম্মদাবাদ গুজরাটের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগর, এবং ইহাই গুর্জ্জর প্রদেশের রাজধানী। শাবরমতী নাম্নী নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বিনীর বাম পার্শ্বে এই নগর অবস্থিত। নদীবক্ষ হইতে নগরের দৃশ্য অতিশয় রমণীয়। যিনি দূর হইতে প্রাচীন গৌরব বৈভবে পূর্ণ এই নগরের মহান সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়াছেন, তিনি যে মুগ্ধ হইয়াছেন, এ কথা আমরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারি। নগরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে প্রায় একক্রোশপথব্যাপী উচ্চ প্রাচীর আছে। ১৪১৩ হইতে ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গুজরাটের রাজা আহম্মদশাহ কর্ত্তৃক এই প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ইতিহাস।

আহম্মদনগরের উৎপত্তি সম্পর্কিত ইতিহাস সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, সুলতান্ দাউদ শাহের পুত্র আহম্মদ শাহকে তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ফিরোজ শাহ স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছাড়িয়া দিবার কিয়দ্দিবস পরে এক দিন তিনি মৃগয়া করিতে করিতে এক পরমরমণীয় স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, নির্ম্মলসলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে; উহার উভয় তীরে শ্যামল বৃক্ষবল্লরীসমূহ ফল-ফুলে শোভমান; নদীবক্ষে তাহাদের ছায়া প্রতিফলিত হইয়া প্রত্যেক তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে; নানাজাতীয় বিহগনিচয়ের সুমধুর কলধ্বনিতে কাননভূমি মুখরিত। এই স্থানের এইরূপ মনোমোহন সৌন্দর্য্যে সুলতান নিতান্ত বিমোহিত হইলেন, এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই তিনি আহম্মদাবাদ বিদর নামক এক সুন্দর নগরের

প্রাচীন কালে এই নগরেই দময়ন্তীর পিতা বিদর্ভাধিপতি ভীম সেনের রাজধানী ছিল। ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান আহম্মদ শাহ এই নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। অতিপূর্ব্বে এই স্থানের নাম অশ্ববল ও কর্ণাবতী ছিল। ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই নগর মোগল সম্রাট আকবরের অধিকারভুক্ত হয়। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই স্থানের অতিশয় সমৃদ্ধি হয়। সে সময়ে ইহার খ্যাতি বিশেষরূপে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ফেরেস্তা-পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, আহম্মদাবাদের উন্নতির সময়ে সে স্থানের প্রায় ৩৬০টি রাজ্য প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্র-শক্তির অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এই নগর মুনিম খাঁ ও দাগাজী গাইকোয়াড়ের অধিকারভুক্ত হয়। ইঁহারা উভয়ে মিলিয়া কিছু দিন ইহার উপস্বত্বাদি ভোগ করিবার পরে, ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে আহম্মদবাদ মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তে পতিত হয়। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষ গর্ডন আহম্মদবাদ আক্রমণ করেন; এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই নগর ইংরাজের অধিকৃত হইয়াছে।

সমস্ত রাত্রি বাসায় নিদ্রার স্নেহময় ক্রোড়ে ক্লান্তি দূর করিয়া পর দিবস প্রত্যূষে নগর দেখিতে বাহির হইলাম। আমরা নগরের সর্ব্বপ্রধান রাজপথে উপস্থিত হইলাম। উভয় পার্শ্বে অট্টালিকা অপেক্ষা খোলার চালওয়ালা গৃহের সংখ্যাই অধিক। রাজপথে অত্যন্ত জনতা। সকলেই ব্যস্তবাগীশ! ক্রমে আমরা মাণিক চৌক নামক নগরের সুপ্রসিদ্ধ বাজারে আসিয়া উপনীত হইলাম। এ স্থানের ঘাঁটী বর্ণনা করিতে হইলে বলিতে হয়,—"পাগড়ীর উপরে পাগ্ড়ী, পাগ্ড়ি তদুপরি!" কত লোক আসিতেছে; যাইতেছে; কেহ বস্ত্র কিনিতেছে; কেহ তামাসা দেখিতেছে; কেহ বেড়াইতেছে; কেহ বা মিছামিছি দর দস্তর করিতেছে। আহম্মদ-নগরের প্রাচীন সমৃদ্ধি বর্ত্তমান সময়েও বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

দর্শনীয় স্থানসমূহের মধ্যে প্রাচীন জুম্মা মস্‌জিদ, আহম্মদ শা ও তাঁহার বেগমদিগের সমাধি, দস্তর খাঁর মস্‌জিদ (এই মস্‌জিদটি কুতবউদ্দীনের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল)। মির্জ্জাপুরের রাণীর মস্‌জিদ, নারায়ণ স্বামীর মন্দির, নয় গজ পীর। নয় জন পীরের কবর এই স্থানে

যোগ্য সৌধ ইত্যাদির মধ্যে রাণী সিপারের মস্‌জিদ ও কবর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ। এই সকল নগরমধ্যবর্ত্তী দর্শনীয় স্থানসমূহ ব্যতীত আহম্মদাবাদের চতুর্দ্দিকে প্রায় ১২ মাইল স্থানের মধ্যে আরও বহুতর দর্শনীয় ভগ্নাবশেষ আছে। তন্মধ্যে হাতি সিংহের মন্দির, দরিয়া খাঁর কবর, শাহিবাগ, মিয়া খাঁ চিস্তির মস্‌জিদ, অচ্যুত বিবির মস্‌জিদ, দাদাহরির হ্রদ, ভবানীর হ্রদ, চিন্তামনের জৈন মন্দির, হৌজ-ই-কুতব, কঙ্করিয়াতলাও প্রভৃতি প্রধান। আমরা এই স্থানের প্রধানতম স্পৃহনীয়দর্শন স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি। অনেকে এখানকার সিদি সৈয়দের ও মহাফিজ খাঁর মস্‌জিদেরও প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহাদের শিল্প-নৈপুণ্য ও নির্ম্মাণ-কৌশল অল্প প্রশংসনীয় নহে। বৈদেশিকগণের নানাবিধ অত্যাচার ও উৎপীড়ন, লুণ্ঠন ও আক্রমণ পুনঃপুনঃ সহিয়াও আহম্মবাদে যে সমুদয় দর্শনীয় কীর্ত্তি বিশ্বধ্বংসী কালের সহিত যুদ্ধ করিয়া অদ্যাপি জীবিত আছে, সে সকল ভারতের চির গৌরবের ও চির আদরের।

জুম্মা মস্‌জিদ।—এই সুপ্রসিদ্ধ মস্‌জিদ আহম্মদাবাদের সুবিখ্যাত তিন দরজার সন্নিহিত। ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের মস্‌জিদসমূহের মধ্যে সৌন্দর্য্যে ইহা অতুলনীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ফাগুর্সন ইহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—

* * The principal was the Jumma Musjid, which though not remarkalbe for its size, is one of the most beautiful mosques in the East. (History of Indian and Eastern Architecture by James Fergusson, Page 527) ইহার বাহ্যিক পরিসর ৩৮২+২৫৮ ফিট, এবং মূল মস্‌জিদটি দৈর্ঘ্যে ২১০ ফিট, এবং প্রস্থে ৯৫ ফিট। ইহার মেজে (ফ্লোর) মর্ম্মর প্রস্তরে গ্রথিত। ছাতের উপরে শ্রেণীবদ্ধভাবে পঞ্চদশটি অনিন্দ্যসুন্দর গুম্বজ বিরাজিত থাকায় দূর হইতে এই মস্‌জিদের সৌন্দর্য্য সহজেই ভ্রমণকারীর মনোযোগ আকর্ষণ করে, এবং নিকটে আসিলে আরও বিশেষরূপে মুগ্ধ হইতে হয়। মধ্যস্থ গুম্বজ তিনটি অপরাপর গুম্বজ অপেক্ষা হইতে বৃহত্তর ও উচ্চতম। ২৬০টি স্তম্ভে মস্‌জিদটি পরিশোভিত।

রাণী সিপ্‌রির মস্‌জিদ।—ইহাকে "আহম্মদের রত্ন" নামে সর্ব্বসাধারণে

মহম্মদ শা বেগুরার (Mahamid Shah Begura) বিধবা পত্নী কর্ত্তৃক এই মস্‌জিদটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর সৌধাবলীর পর্য্যায়ে ইহা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যেও উল্লেখযোগ্য, প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপ মত প্রকাশ করিতেও দ্বিধা করেন নাই। ইহা দ্বারা পাঠকবর্গ সহজেই ইহার কলানৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইহা স্থাপত্যের ও ভাস্কর্য্যের একটি শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তিস্তম্ভ।

এতদ্ব্যতীত হাতি সিংহের সমাধি ও অধুনাতনকালে নির্ম্মিত স্বামী নারায়ণের মন্দিরটি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। গুজরাটের মসজিদ ও অট্টালিকা প্রভৃতির গঠনপ্রণালী অধিকাংশই হিন্দুভাবাপন্ন বলিতে পারা যায়।

কঙ্করিয়া তলাও।—ইহার প্রাচীন নাম হৌজ-ই-কুতব। ইহা গুজরাটের নরপতি সুলতানউদ্দীন কর্ত্তৃক ১৪৫১ খৃষ্টাব্দে খনিত হইয়াছিল। এই জলাশয়টি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় এক মাইল হইবে। এই সুদীর্ঘ সরোবরের চতুর্দ্দিকে সোপানাবলী বিদ্যমান আছে। সরোবরের মধ্যে একটি দ্বীপ আছে। তাহার নাম নাগিনা, অর্থাৎ অঙ্গুরী-মধ্যবর্ত্তী রত্ন। তীর হইতে ঐ দ্বীপে যাইবার একটি সুন্দর তৃণশষ্পাবৃত পথ আছে। সরোবরের নির্ম্মল সলিলে বেষ্টিত, কলকাকলীকূজিত, বৃক্ষবল্লরীসমাকীর্ণ এই দ্বীপটি বড়ই সুন্দর। শীতল সমীরণসেবনে ক্লান্ত দেহ সঞ্জীবতা লাভ করে। দ্বীপের মধ্য হইতে তীরের শোভা ও অদূরবর্ত্তী নগরের সৌন্দর্য্য নিতান্ত লোচনানন্দদায়ক। আমরা বহুক্ষণ এই স্থানে বসিয়া শান্তি লাভ করিলাম। সরোবর-বক্ষে মৃদুপবনস্পর্শে ছোট ছোট ঢেউগুলি উঠিতেছিল, পড়িতেছিল। পাখীগুলি মনের সুখে গাহিয়া হৃদয়ে শান্তির সুবিমল ধারা ঢালিয়া দিতেছিল। কি সুন্দর! হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রীতি অনুভব করিলাম।

মহারাষ্ট্রীয়দিগের সময়েই আহম্মদাবাদের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। তাঁহারাই আহম্মদ শাহ প্রভৃতি মুসলমান নরপতিগণের নির্ম্মিত প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহের ধ্বংস করিয়া গিয়াছেন। ইংরেজ গবর্মেণ্টের অধীনে এই নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এ নগরে বহুতর বিদ্যালয়, হাঁসপাতাল, পিঁজরাপোল, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি আছে। প্রতি বৎসর এখানে বহুতর মেলা হইয়া থাকে। এখানকার সোনা রূপা ও জরির বটা

প্রদেশে, এমন কি, সমস্ত দেশীয় রাজগণের রাজ্যেও আদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আহম্মদাবাদ বোম্বাই বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা। এই জেলার ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা, এবং বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে ইহা একটি প্রধান বাণিজ্য-স্থান। এ জেলার অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিকার্য্য করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, প্রাচীন কালে আহম্মদাবাদ জেলা সমুদ্রগর্ভে নিহিত ছিল;—কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে ইহা বর্ত্তমান ভূমির আকার ধারণ করিয়াছে।

আমরা এ সকল বিষয়ের আলোচনার অধিকারী নহি। তবে আহম্মদাবাদের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করিলে ইহা অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। এ জেলার অধিবাসীদিগের মধ্যে কুনবি, রাজপুত ও কোলিরাই প্রধান। ইহাদিগের মধ্যে আবার কুনবিরা অঞ্জনা, কদাবা ও নেবা, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। কুন্‌বিদের মধ্যে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে তাহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত বিপন্ন মনে করে। পূর্ব্বে ইহারা কন্যা জন্মিলে তাহাকে হত্যা করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু ১৮৭০ সালে কুন্‌বিদের শিশু-হত্যা-নিবারণের উদ্দেশে একটি আইন-প্রবর্ত্তনের পর হইতেই তাহা নিবারিত হইয়াছে।

এই জেলার লোকসংখ্যা প্রায় ৮৫০০০০ লক্ষ। আহম্মদাবাদ, ধোলকা, বীরজাম, ধোলেরা, ধন্ধুক, গোবা, পরান্তিজ, মোরাশ ও শানন্দ, এই কয়টি ইহার প্রধান নগর। ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইহা রেশম ও তুলার নিমিত্তই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

আমরা সন্ধ্যার অধ্যবহিত পরে আহম্মদাবাদ নগর পরিত্যাগ করিয়া গায়কবাড় রাজ্যের রাজধানী বরোদা নগরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। সে দিন রজনী জ্যোৎস্নাময়ী ছিল। কাজেই রেলপথের উভয় দিকের সৌন্দর্য্য-চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিতে করিতে অগ্রসর হইলাম। কোথাও কৌমুদীপরিপ্লাবিত, তৃণগুল্মবিহীন, সুবিস্তৃত প্রান্তরভূমি সমুদ্রের ন্যায় প্রতীত হইতেছিল; কোথাও শ্যামল শৈলশ্রেণী মাথা তুলিয়া তারা-চন্দ্রবিভূষিত আকাশের পানে চাহিয়া রহিয়াছে। কোথাও শালবনে সারি সারি শালবৃক্ষ-সমূহ একটির পর একটি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।—কোন্ দূর বনে সীমান্তরেখা

সমস্ত রাত্রি গাড়ীতে কাটাইয়া রজনীর প্রায় শেষভাগে ট্রেণ বরোদা ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। রাত্রির শেষভাগে কাহাকেই বা ডাকাডাকি করিব? আর স্বয়ং রাস্তা চিনিয়া লওয়া ও কেবলমাত্র শকট-চালকের উপর নির্ভর করা সঙ্গত নহে ভাবিয়া, আমরা সদলবলে নিকটবর্ত্তী মহারাজার অন্যতম ঠাকুরবাড়ীতে আশ্রয় লইলাম;—এবং সারা রাত্রির অনিদ্রা বশতঃ শয্যায় গা ঢালিয়া দিবামাত্র নিদ্রার সুকোমল অঙ্কে আশ্রয়লাভ করিলাম।

শ্রীধরণীকান্ত লাহিড়ী।

রামায়ণের সমাজ।

আহার্য্য ও আহার।

রামায়ণের সমসাময়িক সমাজে প্রচলিত দেবকর্ম্ম, পিতৃকর্ম্ম ও লৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিষয় পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অধ্যায়ে তৎকালীন ভারতীয় সমাজের আহার, নিদ্রা, বেশ-ভূষা, প্রাত্যহিক আচার ব্যবহার ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

রামায়ণে খাদ্যসামগ্রীস্বরূপ যে সকল বস্তুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই,—পলান্ন, মোদক, অন্ন, মিষ্টান্ন, মহামূল্য পানীয়, খাণ্ডব, পায়স, দধিকুল্যা, গৌড়ীমদ্য, আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস, নীবার ধান্যের অন্ন, তক্র, রসাল, মৌরেয় মদ্য, উৎকৃষ্ট সুরা, ইক্ষুরস, ভক্ষ্য, ভোজ্য, চোষ্য, লেহ্য প্রভৃতি দ্রব্য, ইক্ষু, মধু, লাজ, ভদ্রক, মাদক দ্রব্য, ছাগ, মেষ ও বরাহের মাংস, ব্যঞ্জন, ফলনির্য্যাস, সুগন্ধি সূপ, বৃক্ষরস, দধি, শ্বেত দধি, শুভ্র অন্ন, মৃগমাংস, ময়ূর ও কুক্কুটের মাংস, দুগ্ধ, শর্করা, সিদ্ধ উত্তম বন্য অন্ন, রুরু ও গোধার মাংস, ঘৃত, চক্রতুণ্ড ও পুষ্ট মৎস্য, রোহিত ও নল মৎস্য, ঘৃতপিণ্ডাকার পক্ষিমাংস, সৌবিরক মদ্য, লবণাম্ল-মিশ্রিত সূপ, স্বাদু অবলেহ, শূলপক্ক মৃগ-মাংস, লবণ, বাধ্রীনস-গণ্ডার-মাংস, নানারূপ কুকল, শশক ও ছাগ, সুপক্ক একশাল্য মৎস্য, মহিষ-মাংস, শর্করা, মধু, পুষ্প ও ফল হইতে উৎপন্ন চূর্ণ, গন্ধদ্রব্যে বাসিত সুরা, স্বাদু মদ্য, মধুর মদ্য, সোম রস ইত্যাদি। এই সকল খাদ্যদ্রব্যের সমস্তই আর্য্য-সমাজের ভক্ষ্য বলিয়া কথিত হয় নাই। শূল-পক্ক মৃগ-মাংস, (গণ্ডারের) মাংস,

কুকল, শশক, একশাল্য মৎস্য, মহিষ-মাংস প্রভৃতি লঙ্কার রাক্ষসদিগের ভোজনাগারের দৃশ্য হইতে গৃহীত হইয়াছে।

রামায়ণের প্রথম ছয়কাণ্ডে অন্ন শব্দের বহুল উল্লেখ আছে। এই অন্ন অন্নগতপ্রাণ বাঙ্গালীর প্রিয় তণ্ডুলসিদ্ধ ভাত, কি অযোধ্যাবাসীর যব, গোধূমোৎপন্ন খাদ্য, সে সম্বন্ধে কাহারও কাহারও সন্দেহ হইতে পারে। অন্ন শব্দে যে কেবল ভাতই বুঝায়, তাহা নহে। অন্ন শব্দে যব, গম, মিঠাই প্রভৃতিকেও বুঝাইয়া থাকে। যদি তাহাই হয়, তবে তৎকালে অযোধ্যাবাসী কি প্রকার অন্নে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহার বিচার আবশ্যক।

আদিকাণ্ডের পঞ্চম সর্গে অযোধ্যাপুরীর বর্ণনা-প্রসঙ্গে অযোধ্যা 'ধনধান্যবান' ও 'শালিতণ্ডুলসম্পূর্ণ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই উক্তি হইতে ধনধান্য ও তণ্ডুল জীবিকার উপায় বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অন্যত্র, রাম বনে গমন করিলে পর কৌশল্যা বিলাপ করিতে করিতে দশরথকে বলিতেছেন,—

ভুক্ত্বাশনং বিশালাক্ষী সূপদংশান্বিতং শুভম্।
বন্যং নৈবারমাহারং কথং সীতোপভোক্ষ্যতে॥

—অযোধ্যা ; ৮১ সর্গ ; ৫।

"যে বিশালাক্ষী সীতা সতত উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন সমন্বিত উত্তম অন্ন ভোজন করিতেন, তিনি কি প্রকারে (দাক্ষিণাত্যের) বন্য নীবার ধান্যের অন্ন ভক্ষণ করিবেন।"

কৌশল্যার এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, তৎকালে আর্য্যভারতে ব্যঞ্জন আহার করিবার প্রথা ছিল। বর্ত্তমানের 'দাল রুটী' তখনও প্রচলিত হয় নাই। দাইলের উল্লেখ রামায়ণের প্রথম ছয়কাণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায় না। চতুর্বিধ অন্ন, মিষ্টান্ন, নানাবিধ উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন, মৃগ, ময়ুর ও কুক্কুটের মাংস, মৌরেয় মদ্য ও উৎকৃষ্ট মদ্য, দধি, দুগ্ধ, শর্করা, ইক্ষুরস, মধু ইত্যাদি বিশিষ্ট খাদ্য বলিয়া গণ্য ছিল। মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতের জন্য যে আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে এই সকল দ্রব্যের সমাবেশ দৃষ্ট হয়।

দাইল ও রুটীর ব্যবহার বোধ হয় ক্রমে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। উত্তরাকাণ্ডে নানাবিধ কলাই, যব ও স্নেহ-শস্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত কাণ্ডের ৯৫ সর্গে মুগ, মাষ, চনক, কুলথ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

ইহাতে মনে হয়, উত্তরাকাণ্ডের রচনার সময় এই সকল খাদ্য সমাজে প্রয়োজনীয় বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

তিল হইতে তৈলের উৎপত্তি। তৈল তখন রন্ধনকার্য্যে ব্যবহৃত হইত কি না, বলা যায় না। রামায়ণে ঘৃত-পক্ক ব্যঞ্জনাদির উল্লেখই দৃষ্ট হয়। অন্যান্য কার্য্যে তৈলের ব্যবহার ছিল। (১) মস্তকে সুগন্ধি তৈল ব্যবহৃত হইত।

অযোধ্যার রাজপরিবারে আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার খাদ্যই রুচি অনুসারে ব্যবহৃত হইত। রাম লক্ষ্মণ বরাহ, ঋষ্য, পৃষৎ, মহারুরু ও ঘৃতপিণ্ডাকার স্থূল পক্ষীর মাংস ভক্ষণ করিতেন। (২) তখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগের গণ্ডার, শল্যকী, গোধা, শশ ও কূর্ম্ম, এই পাঁচটি পঞ্চনখ জন্তু ভক্ষ্য ছিল,—

পঞ্চ পঞ্চনখা ভক্ষ্যা ব্রহ্মক্ষত্রেণ রাঘব।
শল্যকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কূর্ম্মশ্চ পঞ্চমঃ॥

—কিষ্কিন্ধ্যা; ১৭ সর্গ; ৩৯।

পায়স, কৃসর ও ছাগমাংস যাগ ও শ্রাদ্ধাদি নিমিত্ত-ব্যতিরেকে ভোজন করা একেবারে নিষিদ্ধ ছিল। (৩)

রামায়ণের সমাজে মদ্যপান অব্যাহতভাবে চলিত ছিল কি না, তাহার বিচার আবশ্যক। তৎকালে দেবকার্য্যে ও অতিথিসৎকারে মদ্য ব্যবহৃত হইত। সীতা মদ্য দ্বারা গঙ্গা ও যমুনার পূজা করিবেন, মানসিক করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ ভরতের আতিথ্য-সৎকার উপলক্ষে প্রচুর উৎকৃষ্ট সুরার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

বৈদিক যুগে সোমরসের অব্যাহত ব্যবহার ছিল। তৎকালে ঋষিরা সোমরস পান করিতেন, এবং দেবতাদিগকেও তাহা ভক্তিভাবে নিবেদন করিতেন।

---

(১) প্রদীপে তৈল ব্যবহৃত হইত। (সুন্দর—১৮) তৈলপূর্ণ ভাণ্ডে মৃতদেহ রক্ষিত হইত।

(২) বরাহ-মৃষ্য-পৃষতং মহারুরুম।
আদায় মেধ্য ত্বরিতং বুভুক্ষিতৌ॥ ইত্যাদি অযোধ্যাকাণ্ড; ৫২।১০২ শ্লোক।

(৩) পায়সং কৃসরং ছাগং বৃথা সোঽশ্নাতু নির্ঘৃণঃ। অযোধ্যা; ৫৭ সর্গ ৩০। এই সকল নিয়মের ব্যভিচারও ঘটিত। ভরদ্বাজের আশ্রমে প্রচুর পায়সের বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এবং বুভুক্ষুরা

কোনও কোনও যজ্ঞে সুরাই প্রধান আহুতিরূপে ব্যবহৃত হইত। (১) তৎপরে সুরার ব্যবহার ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছিল। আদিকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে, মহর্ষি বশিষ্ঠ ক্ষত্রিয়-রাজা বিশ্বামিত্রের সৎকারের জন্ত সবলার সাহায্যে নানাবিধ সুরার আয়োজন করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তখন সুরাপান নিষিদ্ধ ছিল কি না, রামায়ণে তাহার উল্লেখ নাই।

বশিষ্ঠের গৃহে বিশ্বামিত্রের জন্ত ও ভরদ্বাজের গৃহে ভরতের জন্ত নানা প্রকার সুরা আনীত হইলেও, তাঁহারা ঐ সুরা পান করিয়াছিলেন, এরূপ উল্লেখ রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুরাপায়িগণই সুরা পান করিয়াছিলেন, এইমাত্র উল্লেখ আছে। যথা,—"সুরাঃ সুরাপাঃ পিবতঞ্চ পায়সং, বুভুক্ষিতঃ—।" সুরাপায়ী সুরাপান করিল; ক্ষুধিতেরা পায়স পান করিল। অযোধ্যাকাণ্ডে রাজা দশরথ কৈকেয়ীর নিকট বলিতেছেন,

অনার্য্য ইতি মামার্য্যাঃ পুত্রবিক্রায়কং ধ্রুবম্।
বিকরিষ্যন্তি রথ্যাসু সুরাপং ব্রাহ্মণং যথা॥ ১২শ; ৭৮।

যদি আমি এইরূপ করি (রামকে বনে পাঠাই), তাহা হইলে আর্য্যগণ রথ্যা-সমূহে সমবেত হইয়া আমাকে মদ্যপায়ী ব্রাহ্মণের ন্যায় অনার্য্য বলিয়া নিন্দা করিবে।

ইহা দ্বারা ব্রাহ্মণের মদ্যপান নীতিবিরুদ্ধ ও অনার্য্যোচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের ও সাধারণের পক্ষে মদ্যপান নিন্দনীয় ছিল কি না, বুঝা যায় না।

অন্যত্র দশরথ বলিতেছেন,—

সতীং ত্বামহমত্যন্তং ব্যবস্থাম্যসতীং সতীম্।
রূপিণীং বিষসংযুক্তাং পীত্বেব মদিরাং নরঃ॥
—অযোধ্যা; ১২শ সর্গ; ৭৬।

'মানুষ যেমন বিষাক্ত মদ্য প্রিয়দর্শন বলিয়া পান করিয়া পরিণামে মদ্যকে বিষ বলিয়াই মনে করে, আমিও তেমনই অসতীকে সতী বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছি।

(১) আর্য্যগণের আদি বাসভূমি তুষারমণ্ডিত হিমানী-প্রদেশে সুরা স্বাস্থ্য ও দেহ-রক্ষার পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয় ছিল। এই কারণে সুরার ব্যবহার স্বাস্থ্যের সাধন বলিয়া তাহার ব্যবহার চলিত হইয়া থাকিবে। যাহা তাঁহারা স্বয়ং গ্রহণ করিতেন, তাহাই দেবতাকে নিবেদন করিতেন। উষ্ণপ্রধান দেশে আসিয়া তাঁহারা সুরাপানের অপকারিতা অনুভব করিয়া সুরা-

দশরথের এই উক্তি দ্বারা মদ্যের ব্যবহার সপ্রমাণ হয় বটে, কিন্তু তাহা পদস্থ নীতিপরায়ণ লোকদিগের পক্ষে বিষবৎ পরিত্যজ্য, ইহাই ব্যক্ত করে।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ত্রয়স্ত্রিংশৎ সর্গে লক্ষ্মণ সুরার দোষ দেখাইয়া বলিয়াছেন,—

নহি ধর্ম্মার্থসিদ্ধ্যর্থং পানমেব প্রশস্যতে।
পানাদর্থশ্চ কামশ্চ ধর্ম্মশ্চ পরিহীয়তে॥ ৪৬

"ধর্ম্ম ও অর্থ বিষয়ে মদ্যপান প্রশস্ত নহে। কারণ সুরাপানে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গের হানি হয়।"

এই উক্তি লক্ষ্মণের উচ্চ-প্রকৃতির নিদর্শন। কিন্তু ইহা দ্বারা তৎকালীন সমাজে মদ্যপান যে হেয় ছিল, অথবা সাধারণ-সমাজ মদ্যপানে বঞ্চিত ছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় কি?

লক্ষ্মণ অন্যত্র বলিতেছেন,—

গোঘ্নে চৈব সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥

—কিষ্কিন্ধ্যা; ৩৪ সর্গ; ১২।

"পণ্ডিতেরা গো-হত্যাকারী, সুরাপায়ী, চোর, ভগ্নব্রতদিগেরও নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই।"

এই বাক্যেও সুরাপান দোষ-জনক বলিয়াই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা সুরাপান যে সমাজে প্রচলিত ছিল না, ইহা বুঝা যায় না।

লক্ষ্মণ নৈতিক উপদেশের ছলে সুগ্রীবকে মদ্যপানের অনিষ্ট-কারিতা বুঝাইয়া দিতেছেন বটে, কিন্তু তৎকালীন ক্ষত্রিয়-সমাজ যে লক্ষ্মণ-নির্দ্দিষ্ট উচ্চ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, রামায়ণে এরূপ কোনও সুস্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ব্যক্তিগত ভাবে লক্ষ্মণের মদ্যপান সম্বন্ধে কোনও কথা রামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু রামের মদ্যপানের বিষয় রামায়ণে উক্ত হইয়াছে।

হনুমান অশোকবনে সীতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া বলিতেছেন,—

ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্‌ক্তে ন চৈব মধু সেবতে।
বন্যং সুবিহিতং নিত্যং ভক্তমশ্নাতি পঞ্চমম্॥

(আপনার বিরহে) রাঘব মধু-সেবন ও মাংস-ভোজন ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি কেবল অরণ্য-জাত সুবিহিত খাদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন।

হনুমানের এই উক্তি হইতেই জানা যায়, আর্য্য-সমাজে সুরার ব্যবহার ছিল।

উত্তরাকাণ্ডের রচনা-কালে সুরার প্রভাব অতিরিক্তমাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই কাণ্ডে মদ্য, মাংস ও স্ত্রীসম্ভোগের চাপল্য অত্যন্ত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণের প্রথম ছয়কাণ্ডে রামের মদ্যপান সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আর্য্য-সমাজের কোনও স্ত্রীলোককে মদ্য স্পর্শ করিতে দেখা যায় নাই। এই উত্তরাকাণ্ডে আসিয়া আমাদিগকে তাহাও দেখিতে হয়।—

কুশাস্তরণসংস্তীর্ণে রামঃ সন্নিষসাদ হ।
সীতামাদায় হস্তেন মধু মৈরেয়কং শুচি ॥

—উত্তর ; ৫২ সর্গ ; ১৮।

"রাম তাঁহার অশোক-কাননস্থিত লতাগৃহে কুসুমাস্তরণে বসিয়া সীতাকে বামহস্তে লইয়া মৈরেয় মধু পান করাইলেন।" শুধু তাহাই নহে, মৈরেয় মধুর সঙ্গে "মাংসানি চ সুমিষ্টানি ফলানি বিবিধানি চ"—এ ব্যবস্থা ছিল! এইরূপ অবস্থায় যখন উত্তরকাণ্ডের রাম-সীতা প্রতিদিন উপবনে বিহার করিতেন, তখন তাঁহাদের সম্মুখে প্রতিদিনই পানোন্মত্তা রূপবতীরা নৃত্য-গীতে তাঁহাদিগকে প্রমোদিত রাখিত।

উত্তরাকাণ্ডের এই সীতা ও রামের চরিত্র বাল্মীকি-চিত্রিত সীতা ও রামের চরিত্রের সহিত তুলিত হইতে পারে কি না, ইহাও বিচার্য্য।

আমরা পূর্ব্বে বারংবার বলিয়া আসিয়াছি, রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড পুরাণের ভবিষৎ-অধ্যায়ের ন্যায় পরবর্ত্তী কালের রচনা। এই কাণ্ডের বর্ণিত বিষয়ের আলোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয়, তান্ত্রিক মতের প্রতিষ্ঠা হইবার পর যখন 'পঞ্চ মকার' সমাজে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, ঠিক সেই-সময়ে এই কাণ্ডটি লিখিত ও রামায়ণের সহিত সংযোজিত হইয়াছিল। এই সময় আরও বহু প্রক্ষিপ্ত রচনা রামায়ণের বিরাট গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ হনুমানের কথিত "ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্‌ক্তে

রচয়িতা অথবা অন্য কোনও তান্ত্রিক কবি কর্তৃক রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। (১)

যে কবি লক্ষ্মণের মুখে সুরাপানের সমর্থন করাইলেন না, তিনি যে তাঁহার আদর্শ সৃষ্টিকে এইরূপে কলঙ্কিত করিবেন, ইহা বোধ হয় কোনও হৃদয়বান্ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন না। (২)

তাহার পর রামও যে মদ্যের দোষ প্রদর্শন না করিয়াছেন, এমন নহে। রাম ভরতকে রাজনৈতিক প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করিবার সময় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

দশ পঞ্চ চতুর্বর্গান্ সপ্তবর্গঞ্চ তত্ত্বতঃ।
অষ্টবর্গং ত্রিবর্গঞ্চ বিদ্যাস্তিস্রশ্চ রাঘব॥

—অযোধ্যা ; ১০০ সর্গ ; ৬৮

এই দশ বর্গ দশবিধ কামজ দোষ। স্মৃতিশাস্ত্র দশবর্গের নির্দ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন,—

মৃগয়াক্ষৌ দিবাস্বাপঃ পরিবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যা চ কামজো দশকো গণঃ।

—মনু ; ৬ অঃ।

---

(১) মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের মতে, ব্রাহ্মণের পক্ষে মদ্যপান অমার্জ্জনীয়। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন,—'ব্রাহ্মণনা মহামোক্ষং মদ্যপানে প্রিয়ংবদে'। হে প্রিয়ংবদে! মদ্যপান করিলে ব্রাহ্মণের মহামোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।

আর একটি শিবউক্তি এই—

মদ্যপানং বিনা দেবি তত্ত্বজ্ঞানং ন লভ্যতে।
অতএব হি বিপ্রস্তু মদ্যপানং সমাচরেৎ॥

এইরূপ লেখকের কবলে পড়িয়াই মহাকবির রাম-চরিত্র স্থানে স্থানে কলঙ্কিত হইয়াছে।

(২) বঙ্কিম বাবু তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রের প্রক্ষিপ্ত নির্ব্বাচন প্রণালী পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন, মহাভারতের কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শ্রেষ্ঠ কবিদের বর্ণিত চরিত্রগুলির সর্ব্বাংশ পরস্পর সুসঙ্গত হয়। যদি কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে। মনে কর, যদি কোন হস্তলিখিত মহাভারতের কাপিতে দেখি যে, স্থানবিশেষে 'ভীষ্মের পরদারপরায়ণতা ও ভীমের ভীরুতা' বর্ণিত হইতেছে, তবে জানিব ঐ অংশ প্রক্ষিপ্ত।' এই স্থলে আমরাও স্বর্গীয় সাহিত্য-সম্রাটের অনুসরণ করিয়া তাঁহার মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি, এবং নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, 'রামায়ণের এই

যিনি ভরতকে মৃগয়া, অক্ষ-ক্রীড়া, দিবা-নিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রীসেবা, মদ্যপান, গীত-বাদ্য ও বৃথা-ভ্রমণ প্রভৃতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি যে স্বয়ং তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন, তাহা মনে করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।

এই স্থলে কেহ কেহ এই একটি আপত্তির উত্থাপন করিতে পারেন যে, রাম মধুপান করিতেন। হনুমানও মধুর উল্লেখই করিয়াছেন। আমরা মধুকে পুষ্পসার না ভাবিয়া মদ্য বলিয়া কল্পনা করিতেছি কেন? ইহাও চিন্তনীয় বিষয়। মধুও মদ্যের নামান্তর।

মুনি-ঋষিগণ বিল্ব, কপিত্থ, পনস, বীজপূরক, আমলকী, আম্র, কন্দমূল প্রভৃতি আহার করিতেন। তাঁহারা যে কেবল ফলমূলাহারীই ছিলেন, তাহা নহে। স্ব স্ব আশ্রমে তাঁহারা অযত্ন-সুলভ ও অনায়াসলভ্য ফলমূল ও হবির্ভোজন করিতেন বটে, কিন্তু পরগৃহে সামিষ, সুস্বাদু হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। বশিষ্ঠ ঋষি রাজা সৌদাস নিকট সামিষ সুস্বাদু হবিষ্যান্ন আহার করিতে চাহিয়াছিলেন (উত্তর—৬৫)।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-রমণীর প্রস্তুত সিদ্ধ অন্ন গ্রহণ করিতেন। ব্রাহ্মণবেশধারী রাবণকে অতিথি-পরায়ণা সীতা ব্রাহ্মণ অতিথি মনে করিয়াই বলিতেছেন,—

ইদঞ্চ সিদ্ধং বনজাতমুত্তমম্,
ত্বদর্থমব্যগ্রমিহোপভুজ্যতাম্॥ অরণ্যকাণ্ড; ৩৬—সর্গ।

"এই সিদ্ধ বনজাত উত্তম অন্ন আপনার জন্য রক্ষিত হইয়াছে আপনি ভোজন করুন।" তখনও ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়া প্রচুর দক্ষিণা পাইতেন। সে দক্ষিণা "যৎকিঞ্চিৎ তাম্রখণ্ড" নহে। ব্রাহ্মণ একদিনের ভোজন-দক্ষিণায় লক্ষপতি হইতে পারিতেন!

তখন দাক্ষিণাত্যের অসভ্য অনার্য্য অধিবাসিগণ নীবার ধান্যের অন্নও কাঞ্জিক ভক্ষণ করিত। বানরেরা ফলমূল আহার ও মধু-মদ্য পান করিত। (কিষ্কিন্ধ্যা—১৭)

রাক্ষসের ভোজন-সম্বন্ধে বিশেষ কোনও বিধি নিয়ম ছিল না। ইহারা সর্ব্বভুক্ বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। নরমাংস ইহাদের একান্ত প্রিয় ছিল। এতদ্ব্যতীত মৃগমাংস, মহিষ-মাংস, বরাহমাংস, ময়ূর ও কুক্কুটমাংস বাধ্রীনস, কৃকল, ছাগ, শশক প্রভৃতিও ভক্ষণ করিত। লঙ্কার রাজপরিবারে উৎকৃষ্ট সরবত ব্যবহৃত হইত। ঐ সকল সরবত শর্করা, মধু, পুষ্প ও ফল হইতে

বিশিষ্ট উপায়ে প্রস্তুত করা হইত। বৃক্ষোৎপন্ন সুরা ও শৌণ্ডিক কর্ত্তৃক প্রস্তুত উৎকৃষ্ট সুরার স্ত্রী পুরুষ সকলেই আদর করিত। রাক্ষসেরা অন্নও ভোজন করিত। (সুন্দর—১১)

কুম্ভকর্ণ পর্ব্বত-প্রমাণ অন্ন ও কলসপূর্ণ রক্ত পান করিতেন (লঙ্কা—৬০।) "পর্ব্বত" ও "কলস" যে প্রচুর অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ইহা বোধ হয় পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে না।

প্রদোষাহার ও প্রত্যূষাহার ইহাদিগের প্রধান আহার। বোধ হয়, এই জন্যই এই সময়দ্বয়ের ভোজন রাক্ষসী ভোজন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

ধনিগৃহে ও অতিথিসৎকারে স্বর্ণময় ও রৌপ্যনির্ম্মিত ভোজনপাত্রাদি ব্যবহৃত হইত। মদ্যপানের জন্য স্ফটিকপাত্র ও রত্নপাত্রেরও উল্লেখ দেখা যায়। (লঙ্কা—৬০। সুন্দর—১১)

বসন ভূষণ।

রামায়ণে ক্ষৌমবস্ত্র ও কৌশেয় বস্ত্রের প্রচুর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তখন সাধারণের নিত্য ব্যবহারে কার্পাস বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। বিশেষ পর্ব্ব বা উৎসব উপলক্ষে সকলেই সূক্ষ্ম ক্ষৌম ও কৌশেয় বসন পরিধান করিতেন। রাজপরিবারের সকলেই ক্ষৌমবাস পরিধান করিতেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এইরূপ বস্ত্র-ব্যবহারে বিশেষ উৎসব বা ঘটনা কল্পিত হইত। মন্থরা রাম-ধাত্রীকে পাণ্ডুবর্ণ ক্ষৌমবস্ত্র পরিতে দেখিয়া মহোৎসবের অনুষ্ঠান অনুমান করিয়াছিলেন। (অযো—৭) রাজবধূগণ সূক্ষ্ম কৌশেয় বস্ত্র ব্যবহার করিতেন।

স্ত্রী পুরুষ সকলেই পরিধেয় বস্ত্রের সহিত ওড়না ব্যবহার করিতেন। শয়ন-শয্যায় চিত্র কম্বল ও রোমজ কম্বল সকল ব্যবহৃত হইত। কাশ্মীর প্রদেশ তখন হইতেই কম্বলের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভরতের মাতুলালয় রাজগৃহ বর্ত্তমান কাশ্মীর প্রদেশে অবস্থিত ছিল। তথায় তখন অপর্য্যাপ্ত-পরিমাণে কম্বল প্রস্তুত হইত। শয্যায় কম্বল ব্যতীত অজিনাস্তরণ ও অন্যান্য আস্তরণ ব্যবহৃত হইত। (অযোধ্যা—৮৮)

সাধারণ নাগরিকগণের পরিধানে ধুতি (বস্ত্র), শরীরে উত্তরীয়, কর্ণে কুণ্ডল, মস্তকে উষ্ণীষ (মুকুট), কণ্ঠে মাল্য ও উরোভূষণ (নিষ্ক), সর্ব্বাঙ্গে চন্দনাদির লেপ, বাহুতে অঙ্গদ প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য ছিল। (আদি—৬) সাধারণ লোকের মধ্যেও গন্ধদ্রব্যের ব্যবহার ছিল।

স্নান ও হস্তমুখপ্রক্ষালনে চূর্ণ কষায় (আমলকী-চূর্ণ), কল্ক (খইল), দন্তকাষ্ঠ, গামছা প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। দর্পণ, ব্যজন, কাষ্ঠপাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, অঞ্জন, অঞ্জনকরণ্ডিকা, শ্মশ্রুপ্রসাধন কুর্চ্চ (কাঁকুই), ছত্র, কজ্জল, তিলক, উপানহ প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। (অযোধ্যা—৯২) রাজবেশ সাধারণ পরিচ্ছদ অপেক্ষা স্বতন্ত্র ছিল।

প্রতিদিন আহার করা যেমন অবশ্যকর্ত্তব্য, সেইরূপ রমণীগণের পক্ষেও মালাচন্দন ও অঞ্জন-ব্যবহার নিত্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত ছিল। কৈকেয়ীর মানসিক ভাব হইতেও ইহা লক্ষিত হইবে। কৈকেয়ী মনে মনে সংকল্প করিলেন,—

অহং হি নৈবাস্তরণানি ন স্রজো,
ন চন্দনং নাঞ্জনপানভোজনম্।
ন কিঞ্চিদিচ্ছামি নচেহ জীবিতং,
ন চেদিতো গচ্ছতি রাঘবো বনম্॥—অযো ; ৯।৬৪ শ্লোক।

"যদি রাম বনে গমন না করেন, তবে আমি পান-ভোজন করিব না, উত্তম বসন, মালা-চন্দন, অঞ্জন কিছুই ব্যবহার করিব না। অধিক কি, আর বাঁচিতেও ইচ্ছা করি না।"

তখন আর্য্য-ভারতের স্ত্রীলোকেরা অঙ্গদ, অঙ্গুরী, কণ্ঠহার, কাঞ্চী, কুণ্ডল, কেয়ূর, চূড়ামণি, নিষ্ক, বলয়, হার, নূপুর প্রভৃতি পরিধান করিতেন। এই সকল অলঙ্কার সাধারণতঃ সুবর্ণে নির্ম্মিত হইত, এবং তাহাতে মণিমুক্তা গ্রথিত থাকিত। অঙ্গুরীয় নামাঙ্কিত করিবারও প্রথা ছিল। রাম যে অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞান-স্বরূপ হনুমানের হস্তে দিয়াছিলেন, তাহাতে নাম অঙ্কিত ছিল।

স্ত্রীলোকেরা চরণে অলক্তক (আল্‌তা), অঙ্গে অঙ্গরাগ ও অনুলেপন প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। কৈকেয়ী মন্থরার মুখে সোনার তিলক চিত্রিত করিয়া দিবেন বলিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, তখন উল্কি পরিবার রীতিও ছিল।

পুরুষেরা কেহ কেহ কাকপক্ষের মত জুল্‌পি রাখিতেন। রাম-লক্ষ্মণ কাকপক্ষধারী ছিলেন। স্ত্রীলোকেরা দীর্ঘকেশ রক্ষা করিত। ব্রাহ্মণেরা শিখা রাখিতেন। বনচারিগণ মস্তকে জটা ধারণ করিতেন। রাম তাহাই

দাক্ষিণাত্যের অসভ্যেরা মস্তকে কুসুমের শিরোভূষণ পরিধান করিত। (অযোধ্যা—৯৩।) এবং পরিধানে বল্কল ব্যবহার করিত।

কিষ্কিন্ধ্যার বানরগণ সাধারণ বস্ত্র পরিধান করিত। তাহারা সর্ব্বদা উত্তরীয় ব্যবহার করিত না। কোথাও যাইতে হইলেই উত্তরীয় গ্রহণ করিত। সুগ্রীবের উক্তিই ইহার প্রমাণ। সুগ্রীবকে কিপ্রকারে বালী নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, রামের নিকট সেই দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিয়া বলিলেন,—

এবমুক্ত্বা তু মাং তত্র বস্ত্রেণৈকেন বানরঃ।
তদা নির্ব্বাসয়ামাস বালী বিগতসাধ্বসঃ॥ ২৬।

—কিষ্কিন্ধ্যা ; ১০ সর্গ।

"এই বলিয়া বালী আমাকে একবস্ত্রে নির্ব্বাসিত করিয়াছে।"

বর্ত্তমান আর্য্য-সমাজে প্রাচীন আর্য্য-সমাজের ন্যায় উত্তরীয়-ব্যবহার-প্রথা পরিত্যক্ত হইয়াছে ; কিষ্কিন্ধ্যার প্রথা অনুকৃত হইতেছে। বঙ্গীয় প্রাচীনদিগকে এখনও গৃহে অনেক স্থলে একবস্ত্র থাকিতে দেখা যায় না। নব্য যুবকেরা কোথাও যাইতে হইলেই অতিরিক্ত বস্ত্রের ব্যবহার প্রয়োজন মনে করেন।

কিষ্কিন্ধ্যার অনার্য্য রমণীগণ নূপুর, কাঞ্চী, হেমসূত্র প্রভৃতি ভূষণ ব্যবহার করিত। সুগ্রীবের শয়ন-পর্য্যঙ্ক অতি বিচিত্র ছিল। সেই পর্য্যঙ্কের চতুর্দ্দিক রূপযৌবন-গর্ব্বিতা সুন্দরী স্ত্রীগণের সুমধুর সঙ্গীতে ধ্বনিত হইত। (কিষ্কিন্ধ্যা—৩৩।)

লঙ্কার ঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই। রাজভবনের সীমন্তিনীগণ স্বর্ণসূত্র-খচিত বস্ত্র, উর্ণাতন্তু-নির্ম্মিত বস্ত্র, বিবিধ কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিতেন। কার্পাস-বস্ত্র ও মেষলোমজ বস্ত্রও ব্যবহৃত হইত।

রাবণ কখন পুষ্পবাস-যুক্ত ধবলবস্ত্র ও উত্তরীয়, কখন রক্তবস্ত্র ও ইন্দ্রনীল-মণিগ্রথিত বৃহৎ মেখলা পরিধান করিতেন। তাঁহার কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে অঙ্গদ, কণ্ঠে মাল্য, মস্তকে মুকুট সর্ব্বদাই বিরাজ করিত। (সু—১৮।২২)

মহিলাগণ নীলকান্ত হার, প্রবাল-রচিত হস্তাভরণ, মণিময় মুক্তাহার, শত-পদ্ম-গ্রথিত স্বর্ণমাল্য, বিবিধ হার, ত্রিকর্ণ, কাঞ্চী, নূপুর, অঙ্গদ, কুণ্ডল প্রভৃতি

প্রাত্যহিক কার্য্য ও লৌকিক আচরণ।

রাজা দশরথ প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইতেন। নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্ব হইতেই বন্দী, সূত, মাগধ, স্তুতিপাঠক ও গায়কগণ রাজভবনে সমাগত হইয়া রাজগুণ কীর্ত্তন করিতে থাকিত। নিশা-অবসানে দুন্দুভিধ্বনি হইলে, সেই গীতস্তুতি ও দুন্দুভিধ্বনিতে রাজপরিবারের সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হইত, বৃক্ষকুলায়ে নিদ্রিত পক্ষী ও পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিকুলও জাগ্রত হইত। এবং সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত হইত। (অযোধ্যা—৬৫।)

স্ত্রী ও নপুংসক পরিচারকগণ অন্তঃপুরে আগমন করিত। স্নানকার্য্যাধ্যক্ষ কাঞ্চনঘটে হরিচন্দন-বাসিত জল আনয়ন করিত। পবিত্রা কুমারীগণ প্রাতঃকৃত্যের দ্রব্যাদি ও বস্ত্রাদি আনয়ন করিত। অতঃপর রাজা প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন।

রাজকুমারগণও ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করিয়া সুচি ও সমাহিত হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন ও গায়ত্রীজপ করিয়া অগ্নিহোত্র সমাধান ও গুরুজনদিগকে বন্দনা করিতেন। (আদি—২৯ ৩১।৩২ শ্লোক।)

গুরুজনদিগের সহিত যতবার সাক্ষাৎ হইত, ততবারই নিজ নাম উচ্চারণপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেন। (অযোধ্যা—৩।৪ শ্লোক।) গুরুজন কোনও বস্তু প্রদান করিলে কৃতাঞ্জলিপুটে তাহা গ্রহণ করিয়া মস্তকস্পর্শপূর্ব্বক দাতাকে প্রণিপাত করিবার বিধি ছিল। গৃহে সমাগত অতিথি বয়সে বৃদ্ধই হউন, আর বালকই হউক, তাহাকে অগ্রে পাদ্যঅর্ঘ্যদানে সম্মানিত করিয়া তৎপরে প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করা হইত।

আধুনিক পাশ্চাত্য করমর্দ্দন-প্রথাটি সেই প্রাচীনতম সময়েও প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। রাম-সম্ভাষণে সুগ্রীব বলিতেছেন,—

রোচতে যদি মে সখ্যং বাহুরেষ প্রসারিতঃ।
গৃহ্যতাং পাণিনা পাণির্ম্মর্য্যাদা বধ্যতাং ধ্রুবা॥ ১১।

—কিষ্কিন্ধ্যা; ৫।

"এই আমি হস্ত প্রসারণ করিলাম, যদি আমার সহিত মিত্রতা করিতে আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আপনার হস্ত দ্বারা আমার হস্ত গ্রহণ করিয়া অক্ষয় প্রীতি বন্ধন করুন।

রামায়ণের আর্য্য-সমাজে এইরূপ করমর্দ্দনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। বানর-রাজ সুগ্রীবই রামের সহিত এই উপায়ে সখ্যতা-সংস্থাপন করিয়াছিলেন। (১) এই প্রথা অতি প্রাচীন, এবং বর্ত্তমান সভ্যসমাজে সমাদৃত ও আমাদেরও অনুকরণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কোলাকুলি বা আলিঙ্গনের প্রথাও সুপ্রাচীন। পিতা মাতা পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন। এই প্রথা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

এখন স্ত্রীলোকেরা বক্ষে ও ললাটে করাঘাত করিয়া রোদন করিয়া থাকে। অদৃষ্টের প্রতি ধিকার ও অন্তঃকরণের দুঃখ ব্যক্ত করাই এই স্থানদ্বয়-নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য। কিন্তু তৎকালে উদরে করাঘাত করিবার প্রথা দৃষ্ট হয়। সীতা ও সূর্পনখা উদরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিয়াছিলেন। (২) সূর্পনখার এইরূপ ব্যবহারকে উদরসর্ব্বস্ব রাক্ষসী প্রথা বলা যাইতে পারে। সীতা বাহু তুলিয়াও বিলাপ করিয়াছিলেন। ইহা অধৈর্য্য প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। শপথ করিবার রীতিও প্রাচীন। বালী সুগ্রীবকে পাদ-স্পর্শ করিয়া শপথ করাইয়াছিলেন। হনুমান্ মলয়, মন্দর, বিন্ধ্য, সুমেরু, দর্দ্দুর পর্ব্বতের নাম ও ফলমূলের উল্লেখ করিয়া শপথ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই সকল স্থান ও দ্রব্য হনুমানের অতিশয় প্রিয় ছিল। কৈকেয়ীও ভরতের নামে শপথ করিয়াছিলেন। (অযোধ্যা—১২।) প্রিয় বস্তু ও প্রিয়জনের নামে শপথ এখনও প্রচলিত আছে।

---

(১) কেহ কেহ বলেন বশিষ্ঠ-সম্ভাষণেও রাম বশিষ্ঠের করধারণ করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

অনার্য্যসমাজের করমর্দ্দন প্রথা সুগ্রীবের মুখে যেরূপ বিশদ ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, এ স্থলে সেরূপ নহে। বৃদ্ধ বশিষ্ঠকে রাম নিজে যাইয়া বাহুতে ধরিয়া রথ হইতে অবতরণ করাইলেন। ইহাই বোধ হয় সঙ্গত অর্থ। "রাম হস্ত দ্বারা তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক রথ হইতে অবতারিত করিলেন।" এই অর্থও করিয়াছেন।

(২) করাভ্যামুদরং হত্বা রুরোদ—। আরণ্য।

ইতি লক্ষ্মণমাশ্রুত্য সীতা শোকসমন্বিতা।

পাণিভ্যাং রুদতী দুঃখাদুদরং প্রজঘান হ॥ আরণ্য।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী। ভাদ্র। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের 'আর্য্য আদর্শ ও গুণত্রয়' এবারকার 'ভারতী'র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বামী শীলানন্দ' ফেলিসিয়াঁ শালের ফরাসী হইতে সঙ্কলিত। সিংহলের বৌদ্ধ শ্রমণ স্বামী শীলানন্দ ফরাসী দার্শনিক ফেলিসিয়াঁ শালের নিকট সংক্ষেপে পুনর্জন্মের ও নির্ব্বাণের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান নিবন্ধে তাহার আভাস পাওয়া যায়। শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত 'অখিল মাঝে বিফল কাজে ছড়িয়ে পড়া আমারে' অর্থাৎ তাঁহাকে কুড়াইয়া আনিয়া মার চরণে 'নিবেদন' করিয়াছেন। শুধু কথা গাঁথিলে কবিতা হয় না, 'নিবেদনে' কবি এই চিরসত্যই নিবেদন করিয়াছেন! যখন বলিবার কিছু না থাকে, তখন কলম ধরিতে নাই। হাতে অন্য কাজ না থাকিলে অনেকে ছন্দ ও মিল লইয়া কন্দুক-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন। তাহা সঙ্গত নহে। কবিতা সাধনার বস্তু। 'আমারে কভু রোষ' নি তবু' প্রভৃতি কবিতা নহে, তাহার অপচার। অপচারে কোনও সাহিত্যের পুষ্টি হয় না। 'দিদিমার বিরক্তি' সুন্দর নক্সা। দিদিমার চিত্রখানি কল্পনার অতিরঞ্জিত নহে, তাহা বাস্তবের স্বভাবসঙ্গত ফটো। দিদিমা সেকালের সমুজ্জ্বল চরিত্র,—স্নিগ্ধ, সংযত, পবিত্র। সে চরিত্র 'বজ্রের অপেক্ষাও কঠোর, কিন্তু কুসুমের অপেক্ষাও কোমল'। এ কালে বাঙ্গালীর উত্তরপুরুষ আর এমন দিদিমার স্নেহ পাইবে কি? যিনি দিদিমার ছবি আঁকিয়াছেন, তিনি দেখিতে জানেন, এবং আঁকিয়া দেখাইতে পারেন। তাঁহার নিপুণ তুলিকার দিদিমার সহজ সরল সৌন্দর্য্যটুকু এমন অনায়াসে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। 'ডেনমার্কে কৃষকদের উচ্চশিক্ষা' উল্লেখ-যোগ্য। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বৃষ্টি' নামক ইংরাজী হইতে অনুদিত গল্পটি অত্যন্ত আষাঢ়ে, অত্যন্ত উদ্ভট!—চীনের সম্রাট লি-ও-এ মর্ম্মর-প্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়াইয়া ছিলেন। বৃষ্টি পড়িতেছিল। সম্রাট পথের দিকে চাহিয়াই কহিলেন, 'আহা, ঐ লোকটির কি কষ্ট! এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে পথে চলেছে, মাথায় একটা টুপিও নাই!' সম্রাট বয়স্যকে বলিলেন, 'আমি জানিতে চাই, আমার পিকিনে এমন হতভাগ্য ক' জন আছে—মাথায় একটা টুপি দিবারও যাদের সামর্থ্য নাই?' বয়স্য প্রধান মন্ত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন। মন্ত্রী সেনাপতিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেনাপতি নগর-রক্ষককে তলপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ টুপীহীন চীনে ধরিবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। 'বিশ হাজার আট শ একাত্তর জন' টুপীশূন্য চীনে গ্রেপ্তার হইল, এবং 'আধ ঘণ্টার মধ্যে কারাপ্রাঙ্গণে বিশ হাজার আট শ একাত্তরটি হতভাগ্য চীনবাসীর শিরহীন দেহ গড়াগড়ি যাইতে লাগিল।' এই গল্পের একটু ল্যাজ আছে;—রাজ্যে এক জনও টুপীহীন হতভাগ্য নাই শুনিয়া সম্রাট সন্তুষ্ট হইলেন! গল্প বটে!—'চীন গল্পের ইংরাজী হইতে' গল্পটি সঙ্কলিত হইয়াছে। কোনও চীনা সাহিত্যিক গল্পটি রচিয়াছেন, না কোনও ইংরেজ

গল্পের সৃষ্টি করিয়াছে? সৌরীন্দ্র বাবু অনেক দিন গল্প লিখিতেছেন, সহসা এই উদ্ভট গল্পটির প্রতি তাঁহার এত মায়া জন্মিল কেন? 'শিরহীন' হয় না, শিরোহীন। যদি দয়া করিয়া সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা বিকৃত করিবেন না।—নয় ত কন্ধ-কাটা লিখুন। মৌলিকতার খাতিরে ব্যাকরণকে জবাই করিলে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়। শ্রীযোগীন্দ্র সমাদ্দার 'বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ভারতের কথা' নামক সুরচিত নিবন্ধে কয়েকখানি প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ করিয়াছেন! শ্রীনন্দলাল বসুর অঙ্কিত চৈতন্য নামক চিত্রের প্রতিলিপির চৈতন্য মন্দ নহে; কিন্তু 'ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা'র অনুশাসনে আঙ্গুল ও পা অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত লম্বা হইয়াছে। 'শঙ্করাচার্য্যের দর্পচূর্ণ' নামক চিত্রখানি ভেঙ্কটাপ্পা নামক এক জন মান্দ্রাজী শিক্ষানবিশের প্রথম চিত্র। 'ভারতী'র চিত্রসৌন্দর্য্যের মল্লিনাথ তাঁহার প্রশংসা করেন নাই; কিন্তু 'ভারতীয় প্রাচীন চিত্রকলা পদ্ধতি'র পক্ষ হইতে আমরা তাঁহার প্রশংসা করিতেছি। এই চিত্রের শঙ্করাচার্য্য আর যাহাই হউন, অস্বাভাবিক নহেন। 'ব্রহ্মরূপ অগ্নিদেবতা'র প্রাচীন চিত্রখানিও উল্লেখযোগ্য।

প্রবাসী। ভাদ্র। সর্ব্বপ্রথমে 'কৈকেয়ী মন্থরা সংবাদ' নামক একখানি অপরূপ চিত্র,—আষাঢ়ে কল্পনার উদ্ভট উদ্গার! মন্থরা দেখিয়াই নয়ন মন্থর হইয়া গেল, সমগ্র সৌন্দর্য্য ভোগ করিবার জন্য দৃষ্টি আর চিত্রকরের কল্পনালোকে কুচ করিতে পারিল না। যত পারো, গালি দাও, সত্য কথা বলিতে ছাড়িব না,—এ চিত্র কল্পনার অপমান, অত্যন্ত জঘন্য। 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।' হাভেলের অঙ্কুশের ইঙ্গিতে যাঁহাদের গম্ভীর-বেদিনী অতিস্থূল রুচি-করেণু নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়, তাঁহারাই চিত্র-জগতের এই 'নাক্সি' খোস-মজ্‌লে বাহাল-তবীয়তে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকুন! 'নেপোলিয়নের চরিত্রের এক দিক' নামক ফরাসী গল্পটি উপভোগ্য। শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্তের 'সূর্য্য' নামক ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধটি সুলিখিত। লেখক সহজ ভাষায় মধুরভাবে 'সূর্য্যে'র বৈজ্ঞানিক পরিচয় পাঠকের গোচর করিয়াছেন। চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' গল্প, না ভ্রমণ-কাহিনী, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। রচনাটি মন্দ নহে। পঞ্জাব-প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারের রেখা-চিত্রে মাধুর্য্য আছে। এ সংখ্যায় আর কোনও উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ নাই।

সুপ্রভাত। ভাদ্র। শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের 'নানক-চরিত' উল্লেখযোগ্য। স্বদেশভক্ত লেখক আজ নির্ব্বাসিত। তাঁহার নানক-চরিত অনেকের অশ্রুজলে সিক্ত হইতেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। 'শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথে'র প্রথমাংশ এখনও দেখি নাই। দ্বিতীয় অংশে দেখিতেছি,—রবীন্দ্রনাথ হুগোর 'নতার দেম' পড়েছেন, আর কিছু পড়েন নি। তিনি টলষ্টয়ের 'আনা কেরেনিনা' পড়েছেন। রবীন্দ্র বাবু বলেন,—টলষ্টয় 'আমার কেমন repulsive—অত্যন্ত বিরক্তিজনক ব'লে মনে হয়। বোধ হয় এর কারণ এই যে, আমার ও টলষ্টয়ের উপন্যাস-রচনা-প্রণালীর মধ্যে সাদৃশ্য আছে।' অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও মৌলিক মন্তব্য বটে! রবীন্দ্র বাবু টলষ্টয়ের 'আনা' ভিন্ন আর কোনও রচনা পড়িয়াছেন কি না, তাঁহার বসোয়েল জিতেন্দ্রলাল তাহার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু রবীন্দ্র বাবু বলিয়াছেন,—'টলষ্টয়ের বেশী কিছু পড়ি নাই।' তাহাই সম্ভব। বেশী পড়িলে রবীন্দ্র বাবু বুঝিতে পারিতেন, তাঁহার সহিত টলষ্টয়ের বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য

নাই! টলষ্টয় যে বিরাট, বিশাল মানবতার একনিষ্ঠ পুরোহিত, বাঙ্গালার অন্ধকূপে জিতেন্দ্রলাল তাহার সাদৃশ্য দেখিয়াছেন! ইহাকেই বলে,—দৃষ্টি-বিভ্রম! অন্ধের হস্তিদর্শনও বোধ করি এইরূপ। যাক, রবীন্দ্র বাবু বাঙ্গালা সাহিত্যে 'রাজার নন্দিনী প্যারী'; তিনি 'যা বলেন, তা শোভা পায়।' কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, রবীন্দ্র বাবু নিজেই তাঁহার উপন্যাসের রচনাপ্রণালীর পরিচয় দিলেন, তাঁহার 'রাজা ও রাণী'র রাণীর মত সাধারণকে আর বলিবার অবকাশ দিলেন না!—এই-বার রবীন্দ্র বাবুর মোসাহেব-মহলে ইউরোপীয় সাহিত্যকে তুচ্ছ করিবার ঢেউ উঠিবে। সে মুরু-ব্বিয়ানার বেগ বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা সাহিত্য সংবরণ করিতে পারিবে কি? 'নিষ্কৃতি' মোপাসাঁর অনুবাদ। অনুবাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দ্দয়ভাবে বাঙ্গালা ভাষাকে ছানিয়া 'নিষ্কৃতি'র সৃষ্টি করিয়াছেন। চারু বাবু লিখিয়াছেন,—'তাহার সেই চামচিকার ন্যায় দোদুল্য মূর্ত্তি গ্রামিকদিগের করুণা অপেক্ষা হাস্যই অধিক উদ্রেক করিত।' এ কথায় অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু দেখি-তেছি না। সরলচিত্তে স্বীকার করিতেছি, তাঁহার ভাষার 'চামচিকার ন্যায় দোদুল্য মূর্ত্তি' দেখিয়া আমরাও হাসিয়াছি বটে, কিন্তু হাসির অপেক্ষা করুণারই অধিক উদ্রেক হইয়াছে! 'দোদুল্য' চারুর অত্যন্ত প্রিয়, তিনি দুইবার তাঁহার ভাষাভামিনীর কম কণ্ঠে 'দোদুল্য' দুলাইয়া দিয়াছেন! আর একটু নমুনা দেখুন,—'একেবারে উত্থানশক্তিরহিত, অনড়।' একবারে 'উত্থানশক্তিরহিত'! কোথায় লাগে মলিম্লুচ, প্রাড়্‌বিবাক? তার পরই 'অনড়'! একাধারে মিছরী ও মুড়ি! 'তাহাকে হেচ্‌কা দিয়া উঠাইয়া লাঠির উপর প্রতিষ্ঠিত করিল।' যখন হেঁচকা দিলেন, তখন লাঠীর উপর খাড়া করিলেন না কেন? 'বিড়ালের সম্মুখে ইঁদুরের মত ফটিকের সমস্ত বুদ্ধি লুপ্ত হইয়া কেমন ভয়ের আবছায়া তাহাকে বেষ্টন করিয়াছিল।' কি অপূর্ব্ব বচনবিন্যাস! বিড়ালের সম্মুখে ইঁদুর যে লুপ্ত হইয়া যায়, এত দিন তাহা জানিতাম না। সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়ার এমন জগা-খিচুড়ীও সচরাচর দেখা যায় না! বাঙ্গালা ভাষা বেওয়ারীশ মরদা বটে, কিন্তু তা বলিয়া কি এমন করিয়া ঠাসিতে হয়? মোপাসাঁর সুন্দর গল্পটি চারু-ভাষার উপদ্রবে মাঠা মারা গিয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের 'কারাকাহিনী' উপভোগ্য।

মুকুল। ভাদ্র। 'হস্তী' ইংরাজী হইতে সঙ্কলিত। সুখপাঠ্য। 'শ্রীযুত দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়' বালকদিগের উপযোগী। বিচারপতি দিগম্বরের চরিত্র বালকগণের—বাঙ্গালীর আদর্শস্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে। দিগম্বর বাবুর ও পারস্যের নবীন শাহের চিত্র সুন্দর হইয়াছে। 'বুধ' একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ,—বোধ করি 'মুকুলে'র পক্ষে একটু গুরুপাক।

মায়া-পুরী।

—:০:—

কেন জানি না, আমি এক মায়া-পুরী রচনা করিয়া আপনাকে সেই পুরীমধ্যে আবদ্ধ ভাবিয়া বসিয়া আছি, ও আপনাকে সম্পূর্ণ পরতন্ত্র মনে করিয়া হা হুতাশ করিতেছি। এই মায়া-পুরীর নাম বিশ্বজগৎ; আমি ইহাকে কল্পনা করিয়া আপনাকে সর্ব্বতোভাবে ইহার অধীন ধরিয়া লইয়াছি। এই কাল্পনিক জগৎ আমারই একটা কিম্ভূতকিমাকার খেয়াল হইতে উৎপন্ন, এবং এই কাল্পনিক জগতের অন্তর্গত যাবতীয় ঘটনা আমারই খেয়ালে উদ্ভূত; আমি কিন্তু ঠিক্ উল্টা ভাবিয়া আপনাকে ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ ও সঙ্কুচিত করিয়া উহার অধীনতা-পাশে বদ্ধ হইতেছি। এই বন্ধনের বৃত্তান্ত লইয়া বিজ্ঞান শাস্ত্র; কিন্তু এই বন্ধন যখন কাল্পনিক বন্ধন, তখন বিজ্ঞান শাস্ত্রের এইখানে গোড়ায় গলদ।

এই গোড়ার গলদ স্বীকার করিয়া লইয়া আমি মানবজীবন আরম্ভ করি। বিশ্বজগতের একটা অংশকে আমি অবশিষ্ট অংশ হইতে পৃথক্ করিয়া দেখি, এবং তাহার নাম দিই আমার দেহ। এই বিশ্বজগৎ অতি প্রকাণ্ড,—অনন্ত কি সান্ত, তাহা লইয়া এখানে বিতর্ক তুলিব না—কিন্তু এই প্রকাণ্ড জগতের যে অংশকে আমি আমার দেহ এই নাম দিই, উহা সমুদায়ের তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র। যে চর্ম্মাবরণের মধ্যে আমার দেহখানি বর্ত্তমান, বস্তুতঃ সেইখানেই আমার দেহের সীমা, অথবা তাহা অতিক্রম করিয়া আর কিছু দূর পর্য্যন্ত দেহ বিস্তৃত আছে, জীববিদ্যা, বা পদার্থবিদ্যা এখনও তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না; কিন্তু আমরা মোটামুটি ঐখানেই সীমানা ধরিয়া লই। এই সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ দেহটাকে আমরা নিতান্তই আপনার আত্মীয় ভাবি, এবং ইহার বাহিরে বিশ্বজগতের যে বিশাল কায় বিদ্যমান, তাহাকে অনাত্মীয় বা পর ভাবি। দেহটাকে এত আত্মীয় ভাবি যে, সেকালের ও একালের বহু পণ্ডিত ও বহুতর মূর্খ—যাঁহাদের শাস্ত্রসম্মত উপাধি ছিল দেহাত্মবাদী—তাঁহারা এই দেহকেই আমার সর্ব্বস্ব স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। যিনি এই

বিশ্বজগতের এবং বিশ্বজগতের অন্তর্গত এই দেহের কল্পনাকর্ত্তা ও রচনাকর্ত্তা ও দ্রষ্টা ও সাক্ষী, তাঁহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ করিতে চাহেন। সে কথা এখন থাক্। এই দেহ, যাহা আমার আপন ও বিশ্বজগতের অপরাংশ, যাহা আমার পর, এই উভয়ের সম্পর্ক বড় বিচিত্র। বিশ্বজগতের এই অপরাংশকে বাহ্যজগৎ বলিব। এই দেহের সহিত বাহ্যজগতের অনুক্ষণ কারবার চলিতেছে, এবং এই কারবারের নামান্তর জীবন। এই কারবার যে ক্ষণে আরম্ভ হয়, সেই ক্ষণে জীবনধারী জীবের জন্ম, এবং কারবার যে ক্ষণে সমাপ্ত হয়, সেই ক্ষণে তাহার মৃত্যু। জন্ম ও মৃত্যু, এই দুই ঘটনার মাঝে যে কাল, সেই কাল ব্যাপিয়া দেহের সহিত বাহ্যজগতের সম্পর্ক থাকে ও কারবার চলে। সে কিরূপ সম্পর্ক? প্রথমতঃ উহা বিরোধের সম্পর্ক। বাহ্যজগৎ দেহকে আত্মসাৎ করিবার চেষ্টায় আছে; সহস্র পথে, সহস্র উপায়ে উহাকে নষ্ট করিয়া আপনার পাঞ্চভৌতিক উপাদানে লীন করিতে চাহিতেছে; শীতাতপ, রৌদ্র-বর্ষা, সাপ-বাঘ, পুলিস ও ডাক্তার, ম্যালেরিয়া, প্লেগ ও বেরিবেরি, এই সহস্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেহকে বিপন্ন, নষ্ট ও লুপ্ত করিতে চাহিতেছে। ফলে বাহ্যজগৎই জীবদেহের পরম বৈরী, এবং একমাত্র বৈরী। কেন না, জীবের যত কিছু শত্রু আছে, সকলেই বাহ্যজগৎ হইতে আসিতেছে। দেহের সহিত বাহ্যজগতের আর একটা সম্পর্ক আছে, উহা মিত্রতার সম্পর্ক। কেন না, বাহ্যজগৎ হইতে মশলা সংগ্রহ করিয়া দেহ আপনাকে গঠিত, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিয়াছে; এবং বাহ্যজগৎ হইতেই শক্তি সংগ্রহ করিয়া ও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া আপনাকে বাহ্যজগতের আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য নিযুক্ত রহিয়াছে। বাহ্যজগতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য দেহের বাহ্যজগৎ ভিন্ন অন্য অবলম্বন নাই। এই কারণে বাহ্যজগৎ আমার পরম মিত্র, এবং একমাত্র মিত্র। একমাত্র যে শত্রু, সেই আবার একমাত্র মিত্র, এই সম্পর্ক অতি বিচিত্র; কুত্রাপি ইহার তুলনা নাই। বাহ্যজগতের মূর্ত্তি—এ কেমন হরগৌরী-মূর্ত্তি; হর আট প্রহর শিঙ্গা বাজাইয়া প্রলয়ের মুখে টানিতেছেন, আর বরাভয়করা গৌরী সেই প্রলয় হইতে রক্ষা করিতেছেন। বাহ্যজগতের সহিত দেহের কারবার যুগপৎ দুই প্রণালীতে চলিতেছে; এই কারবারের নাম—জীবন-দ্বন্দ্ব, এবং জীবমাত্রই অষ্টপ্রহর এই দ্বন্দ্বে নিযুক্ত রহিয়াছে। দ্বন্দ্বের পরিণতি কিন্তু বাহ্যজগতেরই জয়; জীবকে একদিন পরাস্ত ও

জীব-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা হয় ত বলিবেন, জীবমাত্রই মরিতে বাধ্য নহে; "মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাম্" এই কবিবাক্য বিজ্ঞান-সম্মত নহে; কেন না, নিম্নশ্রেণীতে নমিয়া এমন জীব দেখা যায়, যাহারা বস্তুতই মরে না। উচ্চতর-শ্রেণীর জীবেরাই মরণ-ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছে। উচ্চতর জীবেই মরণ-ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়াছে, এবং তাহারাই বাহ্যজগতের সহিত বিরোধে পরাভূত হয় ও মরিয়া যায় সত্য; কিন্তু বাহ্যজগৎকে ফাঁকি দিবারও একটা কৌশল তাহারা উদ্ভাবন করিয়াছে। স্বভাবতঃ মৃত্যু উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা পিতা অথবা মাতা সাজিয়া, অথবা যুগপৎ পিতা ও মাতা সাজিয়া দেহের এক বা একাধিক খণ্ড বাহ্যজগতে নিক্ষেপ করে, এবং সেই দেহখণ্ড আবার বাহ্যজগৎ হইতে মশলা ও অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পিতা মাতার মতই বাহ্যজগতের সহিত লড়াই করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই ব্যাপারের নাম বংশরক্ষা, এবং জীব যখন মরিয়া যায়, সন্তান তখন তাহার উত্তরাধিকারী হইয়া তাহারই মত জীবনদ্বন্দ্ব চালাইতে থাকে। বাহ্যজগতের একমাত্র লক্ষ্য—জীবনকে লোপ করা; জীবনের একমাত্র লক্ষ্য—আপনাকে কোন না কোনরূপে বাহাল রাখা।

আধুনিক জীববিদ্যা জীবদেহকে যন্ত্র হিসাবে দেখিতে চান। যন্ত্রমাত্রেরই একটা উদ্দেশ্য থাকে। ঘটিকাযন্ত্র কাঁটা ঘুরাইয়া সময় নিরূপণ করে। ষ্টীম এঞ্জিন চাকা ঘুরাইয়া জল তোলে, ময়দা পেষে, গাড়ি টানে। যন্ত্রের মধ্যে যে সকল অবয়ব আছে,—যেমন ঘটিকাযন্ত্রের স্প্রিং, পেণ্ডুলম, চাকা, কাঁটা ইত্যাদি—প্রত্যেক অবয়বের একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে; প্রত্যেক অবয়ব আপনার কার্য্য নিষ্পন্ন করিলে যন্ত্রটি আপনার উদ্দেশ্য-সাধনে সমর্থ হয়। দেহমধ্যেও সেইরূপ নানা অবয়ব আছে; নাক, কাণ, চোখ, হাত, পা, দাঁত, এবং সকলের উপর উদর প্রত্যেকে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করিলে দেহযন্ত্র চলিতে থাকে। উদরের উপর অভিমান করিয়া কেহ কর্ম্মে শৈথিল্য করিতে গেলেই ঠকিয়া যায়। যন্ত্রকে চালাইতে হইলে বাহির হইতে শক্তি যোগাইতে হয়; যেমন ঘড়িতে দম দিতে হয়; এঞ্জিনে কয়লার খোরাক যোগাইতে হয়;—দেহযন্ত্রেও বাহির হইতে শক্তি যোগাইতে হয়। পায়স পিষ্টক এবং মৎস্য মাংস শক্তি বহন করিয়া দেহমধ্যে সঞ্চিত রাখে। সকল যন্ত্রেরই বিপত্তি আছে, বাহির হইতে চেষ্টা দ্বারা সেই বিপত্তি নিবারণের উপায় করিতে হয়। ঘড়ির চাকায় ময়লা ধরিলে

তৈল দিতে হয়, স্প্রিং ছিঁড়িলে বদলাইয়া দিতে হয়, দেহযন্ত্রেও বিপত্তি-নিবারণের জন্য ঔষধ-প্রয়োগের ও অস্ত্র-চিকিৎসার প্রয়োজন হয় ; ডাক্তার ও সার্জন এখানে ছুতারের ও কামারের কাজ করেন। যে সকল যন্ত্রে কারিকরি অধিক, সেখানে যন্ত্রের মধ্যেই এমনি বন্দোবস্ত থাকে যে, বৈকল্য ঘটিবার আশঙ্কা হইলেই যন্ত্র আপনা হইতে আপনাকে সংশোধন করিয়া সামলাইয়া লয়। যেমন এঞ্জিনের ভিতর গবর্ণার থাকে ; চাকার বেগ অনুচিতপরিমাণে বাড়িবার বা কমিবার উপক্রম হইলে উহা বাড়িতে বা কমিতে দেয় না। ষ্টীমের চাপ মাত্রা ছাড়িয়া বাড়িতে গেলে "বিপত্তির দুয়ার" অর্থাৎ safety valve আপনা হইতে খুলিয়া গিয়া খানিকটা ষ্টীম বাহির করিয়া দেয়। এইরূপে আপনা হইতে আপনাকে সংশোধন করিয়া লইবার কৌশল দেহযন্ত্রমধ্যে এত অধিক আছে যে, যন্ত্রনির্ম্মাতার কারিকরিতে বিস্মিত হইতে হয়। দেহযন্ত্রের কোন অংশে বৈকল্য ঘটিলেই দেহযন্ত্র তাহা সংশোধনের চেষ্টা করে, আপনাকেই আপনি মেরামত করিয়া লয় ; কামারের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। কর্ম্মকার ডাক্তার আসিয়া অনেক সময় হিতে বিপরীত ঘটান। ভাঙ্গা হাড় আপনা-আপনি জোড়া লাগে, আণ্টীভেনীন ব্যতিরেকেও সাপেকাটা মানুষ মাথা তুলিয়া উঠে ; দেহমধ্যে দুষ্ট জীবাণু প্রবেশ করিলে লক্ষ শ্বেতকণিকা রক্ত স্রোতে ভাসিয়া গিয়া সেই জীবাণুকে ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হয়, এমন কি, নিজে ঔষধ তৈয়ার করিয়া সেই দুষ্ট জীবাণুর উদ্গিরিত বিষের বিষত্ব নাশ করে।

এই সকল কারণে জীবদেহকে যন্ত্র হিসাবে দেখা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই যন্ত্রের উদ্দেশ্য কি ? ঘড়ির উদ্দেশ্য সময়-নিরূপণ, এঞ্জিনের উদ্দেশ্য ময়দা পেষা, ময়দাভোজীর পক্ষে অত্যন্ত মহৎ উদ্দেশ্য। কিন্তু জীবদেহের জীবনযাত্রার উদ্দেশ্য কি ? জীব যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন আহার করেন ও নিদ্রা যান, এবং সময়মত অকারণে লম্ফ ঝম্প করেন। কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী যাবতীয় কার্য্যের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবন-রক্ষা। জীবনযাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য জীবনযাত্রা। গরুকে আমরা নিতান্তই জোর করিয়া লাঙ্গলে ও গাড়িতে খাটাইয়া লই ; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, সেই গরু কেবল লাঙ্গল ও গাড়ি টানিবার জন্যই গোজন্ম গ্রহণ করে নাই। সময় মত ঘাস খাইয়া, রোমন্থন করিয়া, ঘুমাইয়া, শিং নাড়িয়া, লাফাইয়া,

জীবলীলা সাঙ্গ করাই তাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অকস্মাৎ বাঘের সম্মুখে পড়িলে তাহার উদ্দেশ্য সহসা ব্যর্থ হইয়া যায় বটে, কিন্তু সেই আকস্মিক দুর্ঘটনার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহার জীবন-ধারণের মহত্তর উদ্দেশ্য দেখা যায় না। মনুষ্য-নির্ম্মিত যে সকল যন্ত্র কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করে না, যাহা কেবল নাচে, বা লাফায়, বা ঘুরিয়া বেড়ায়, বা প্যাঁক প্যাঁক করে, তাহা যন্ত্রের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর যন্ত্র; তাহা বালকের কৌতুকের জন্য ক্রীড়ণক রূপে ব্যবহৃত হয়। সেইরূপ জীবের দেহযন্ত্র, যাহার একমাত্র উদ্দেশ্য খাইয়া, শুইয়া, লাফাইয়া, চেঁচাইয়া কেবল আত্মরক্ষায় নিযুক্ত থাকা, তাহাও এই হিসাবে একটা প্রকাণ্ড কৌতুক বলিয়াই বোধ হয়। যিনি এই দেহযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া বসিয়া বসিয়া কৌতুক দেখিতেছেন, তাঁহার ভিতর যদি কোনও নিগূঢ় উদ্দেশ্য থাকে, তাহা আমরা অবগত নহি। অন্ততঃ জীববিদ্যা তাহা অবগত নহে।

ফলে জীববিজ্ঞান দেহযন্ত্রকে এইরূপ একটা কৌতুকের সামগ্রী বলিয়াই দেখেন। কৌতুক হইলেও দেহের সহিত মানব-নির্ম্মিত অন্য যন্ত্রের কয়েকটা বিষয়ে পার্থক্য আছে। অন্য যন্ত্র নির্ম্মাণের জন্য কারিকরের অপেক্ষা করে। সন্ধ্যার সময় খানিকটা কাঠ, আর পিতল আর লোহা টেবিলের উপর রাখিয়া দিলাম, প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম, ম্যাকেবের ঘড়ির মত একটা ঘড়ি আপনা হইতে তৈয়ার হইয়াছে; এরূপ দেখা যায় না। কিন্তু জীবদেহ আপনাকে আপনি গড়িয়া তোলে। কোনও কারিকরের জন্য অপেক্ষা করে না। অবশ্য একবারে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না; কিন্তু ক্ষুদ্র একটু বীজ, যাহার মধ্যে কোনও অবয়বই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সে বাতাস হইতে, মাটী হইতে, জল হইতে মশলা সংগ্রহ করিয়া আপনার সমস্ত অবয়ব গঠন করিয়া ডাল-পালা পত্রপুষ্প নির্ম্মাণ করিয়া বৃহৎ বটবৃক্ষে পরিণত হয়। জীবন-হীন জড়পদার্থেও মশলা বাছিয়া লইয়া আপনাকে বিচিত্র আকারে গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা দেখা যায় বটে, যেমন মৃৎকণিকার পরে মৃৎকণিকা জমিয়া, মাটীর স্তরের উপর স্তর জমিয়া, স্তরের চাপে স্তর জমাট বাঁধিয়া পাহাড় পর্ব্বতের দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে; অথবা চিনির দানা চিনির সরবত হইতে অনাবশ্যক জল বর্জ্জন করিয়া কেবল চিনির কণিকা সংগ্রহ দ্বারা বৃহদাকার মিছরিখণ্ডে পরিণত হয়। কিন্তু জীবদেহের পুষ্টিতে ও পরিণতিতে এবং

মাটী সংগ্রহ করিয়া বাড়ে, আর মিছরির দানা চিনি সংগ্রহ করিয়া বাড়ে, এমন কি, বিচিত্র আকার পর্য্যন্ত ধারণ করে। কিন্তু কোনরূপ লড়াইয়ের বন্দোবস্ত করে না। মহাকায় হিমাচল হইতে ক্ষুদ্র মিছরির দানা পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা বিষয়ে একবারে উদাসীন। বায়ু, জল ও তুষার, হিম ও রৌদ্র, হিমালয়ের মাথা ফাটাইয়া ও বুক চিরিয়া পর্ব্বতরাজকে জীর্ণ বিদীর্ণ ও চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, পর্ব্বতরাজ একবারে উদাসীন; ইহা নিবারণের জন্য তাঁহার কোনও চেষ্টাই নাই। কালক্রমে তাঁহার প্রকাণ্ড শরীর ধূলি-কণায় পরিণত হইয়া ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। মিছরির দানার পক্ষেও তাহাই; তাহাকে খলে ফেলিয়া গুঁড়া কর, আর জিহ্বায় দিয়া গলিত কর, আত্মরক্ষার জন্য তাহার কোন ব্যবস্থা নাই। বাহিরের জগৎ হইতে শক্তিপ্রবাহ আসিয়া হিমাচলকে ও মিছরিখণ্ডকে আঘাত করিতেছে, সেই আঘাতে তাঁহারা নড়িতেছেন, কাঁপিতেছেন, গলিতেছেন। ইহাকে যদি সাড়া দেওয়া বলা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক আঘাতেই তাঁহারা সাড়া দেন। কিন্তু জীবদেহ যে ভাবে বাহ্যজগতের আক্রমণে সাড়া দেয়, সেরূপ ভাবে উহারা সাড়া দেয় না। জীবদেহও আঘাত লাগিলে নড়ে, কাঁপে, চঞ্চল হয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে সেই আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। অনেক সময় তাহার সাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যই আত্মরক্ষার চেষ্টা। আক্রমণ করিলে ছাগশিশু পলাইয়া যায়, সাপে ফণা তুলিয়া ছোঁ দেয়, ক্ষুদ্র পিপীলিকা এবং জলৌকা আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া সাধ্যমত আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। জন্তুর মধ্যে, এমন কি, উদ্ভিদের মধ্যে, এবং যাহা না জন্তু, না উদ্ভিদ, জীবসমাজে অতি নিম্নস্থানে যাহাদের স্থান, তাহাদেরও এই আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রত্যেক জীব আপনার অবয়বগুলিকে এরূপে গড়িয়া লইয়াছে, যাহাতে সে বাহ্যজগতের সহিত বিরোধে সমর্থ হয়, যাহাতে বাহ্যজগতের সহস্রবিধ আক্রমণ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে। জীবের যাবতীয় চেষ্টাই তাহার আত্মরক্ষার অনুকূল; জড়যন্ত্রে আমরা এই চেষ্টা দেখিতে পাই না। যন্ত্র-নির্ম্মাতা কারিকর তাহাতে যে কয়টা অবয়ব দিয়াছেন, এবং সেই অবয়বগুলিকে যে কার্য্য-সাধনের উপযোগী করিয়াছেন, জড়যন্ত্র কেবল সেই কয়টি অবয়ব লইয়া

তাহার ক্ষমতা নাই। দেহযন্ত্রের বিধান এ স্থলে অসাধারণ। এইখানে একটা পার্থক্য। মনস্বী অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র তাঁহার অসামান্য প্রতিভাবলে দেখাইয়াছেন যে, জীব ও জড় উভয়েই বাহ্য শক্তির আঘাত পাইলে সাড়া দেয়, এবং সেই সাড়া দিবার প্রণালীও উভয় পক্ষে একই প্রকার। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, বিশেষ কারণ উপস্থিত হইলে জীবদেহের সাড়া দিবার ক্ষমতা যেমন লোপ পায়, জড় দেহেরও এইরূপ সাড়া দিবার ক্ষমতা লোপ পায়। সাড়া দিবার ক্ষমতাকে যদি জীবনের লক্ষণ বলা যায়, তাহা হইলে জড় দ্রব্যেরও জীবন আছে, এবং সেই জীবনের সমাপ্তি বা মৃত্যুও আছে। এ পর্য্যন্ত আপত্তি চলিবে না। কিন্তু জীবের সাড়া দিবার চেষ্টা যেমন সর্ব্বতোভাবে তাহার জীবনরক্ষা ও আত্মরক্ষার অনুকূল, জড়ের চেষ্টা সেরূপ কোনও উদ্দেশ্যের অনুকূল, তাহা বলিতে গেলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে।

পারিপার্শ্বিক শক্তির আঘাতে ও আক্রমণে আপনাকে পরিণত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া লইবার এই ক্ষমতা জীবদেহে বর্ত্তমান। জীবদেহের আর একটা ক্ষমতা আছে, পূর্ব্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি—সেটা সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা। পারিপার্শ্বিক সরবত হইতে চিনি বাছিয়া লইবার ক্ষমতা মিছরির দানার আছে; যেমন যব, গম, শাক, পাতা হইতে রক্ত-মাংসের উপাদান সংগ্রহ করিয়া লইবার ক্ষমতা জন্তুদেহে রহিয়াছে। কিন্তু একত্র এই বাছাই কার্য্য উদ্দেশ্য-বর্জ্জিত, অন্যত্র ইহা উদ্দেশ্যের অনুকূল। মিছরির দানা খণ্ডিত করিলে সেই বিচ্ছিন্ন মিছরিখণ্ড নূতন করিয়া মিছরি-জীবন আরম্ভ করিতে পারে। চারুপাঠোক্ত পুরুভুজ আপনাকে খণ্ডিত করে ও সেই নূতন পুরুভুজও নূতন করিয়া পুরুভুজ-জীবন আরম্ভ করিয়া থাকে। উচ্চতর জীবও আপনার কিয়দংশ বীজরূপে নিক্ষিপ্ত করিলে সেই বীজ নবজীবন আরম্ভ করিয়া থাকে। কিন্তু এই বীজের নবজীবন আরম্ভের একটা উদ্দেশ্য আছে। পিতামাতা যেখানে মরণধর্ম্মশীল, বীজ সেখানে নবজীবন আরম্ভ করিয়া পিতামাতার জীবনের প্রবাহ—বাহ্যজগতের সহিত বিরোধের নিরন্তর চেষ্টা—বন্ধ হইতে দেয় না। সন্তানোৎপত্তির একটা উদ্দেশ্য আছে; ব্যক্তি যায়, কিন্তু জাতি থাকে। ব্যক্তি যে সকল ধর্ম্ম লইয়া বাহ্য জগতের সহিত লড়াই করিতেছিল, তাহার বংশপরম্পরা সেই সকল ধর্ম্ম উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া জীবনের স্রোত থামিতে দেয় না।

মিছরির খণ্ডে এই ক্ষমতা আছে বলিলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের বর্ত্তমান অবস্থায় অত্যুক্তি হইবে। ঘটিকাযন্ত্রের বাচ্চা হয় না; হইলে ঘড়ির দোকান অনাবশ্যক হইত।

সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পৃথিবীতে এককালে যে সকল জীব ছিল না, কালক্রমে তাহারা আবির্ভূত হইয়াছে; অথচ এই সকল অভিনব জীব সৃষ্টি করিবার জন্য সৃষ্টিকর্ত্তাকে কোনরূপ কারখানা বসাইতে হয় নাই। প্রচুর প্রমাণ আছে যে, পৃথিবীতে এককালে মানুষ, বা গরু ভেড়া, বা পাখী, বা সাপ ব্যাঙ, এমন কি, মাছ পর্য্যন্ত ছিল না। তার পর মাছের আবির্ভাব হইয়াছে। তার পর ক্রমশঃ টিকটিকি, পাখী, চতুষ্পদ ও দ্বিপদের আবির্ভাব হইয়াছে। এখন টিকটিকিই বা কত রকমের, পাখীই বা কত রকমের, পশুই বা কত রকমের, এবং কালা ও ধলা এই জাতিভেদ করিলে মানুষই বা কত রকমের। পৃথিবীটাই একটা চিড়িয়াখানা; এক পয়সা দর্শনী না দিয়া আমরা এই চিড়িয়াখানায় প্রবেশ পাইয়াছি। এককালে জীবের এত অল্প জাতি ছিল, ক্রমশঃ এত অধিকসংখ্যক জাতির আবির্ভাব কিরূপে হইয়াছে, বুঝিবার জন্য নানা পণ্ডিত নানারূপে চেষ্টা করিয়াছেন। ডারুইন যতটা সফল হইয়াছেন, ততটা আর কেহ হন নাই। ডারুইন দেখিতে পাইলেন, জীবদেহে, অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর জীবদেহে, কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম্ম বিদ্যমান। প্রথমতঃ, জীব খাইতে না পাইলে বাঁচে না। খাইতে পাইলেও একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সে মরিয়া যায়। এই মরণ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আপনাকে রক্ষা করিতে না পারিলেও সন্তান জন্মাইয়া বংশ রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। উহা আত্মরক্ষারই এক প্রকারভেদ। সন্তান স্বভাবতঃ পিতামাতারই যাবতীয় ধর্ম্ম উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অবস্থাভেদে আপনাকে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত ও পরিণত করিয়া থাকে। একই পিতামাতার পাঁচটা সন্তান পাঁচরকমের হয়, সর্ব্বতোভাবে এক রকমের হয় না। পাঁচটা সন্তানই জন্মলাভের পর বাহ্যজগতের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু সকলের সামর্থ্য ঠিক্ সমান থাকে না; কাহারও একটু অধিক, কাহারও বা একটু অল্প থাকে। এই বাহ্যজগতের সহিত সংগ্রাম কি ভীষণ, ডারুইনের পূর্ব্বে তাহা কেহ স্পষ্ট দেখিতে পান নাই। শীতাতপ, রৌদ্রবর্ষা, জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, এ সকল ত আছেই; কিন্তু সংগ্রামের ভীষণতা বস্তুতঃ অন্নের চেষ্টায়। বোধোদয়ে পড়া গিয়াছিল,

কিন্তু ধরাধামনামক চিড়িয়াখানার মালিক শতকোটী জীবকে এই চিড়িয়াখানায় বদ্ধ করিয়া বলিয়াদিয়াছেন, তোমরা পরস্পরকে ভক্ষণ কর, আমি তোমাদের অন্নের জন্য এক পয়সা ঘরের কড়ি খরচ করিতে প্রস্তুত নহি; কিন্তু তোমরা যদি পরস্পরকে ধরিয়া খাও, তাহা হইলে কাহারও অন্নাভাব হইবে না। অতএব নিশ্চিন্ত হইয়া পরমানন্দে পরস্পরকে ভোজন কর। অতি উত্তম বন্দোবস্ত, সন্দেহ নাই। অতঃপর সেই পরমকারুণিক মালিকের অনুমতিক্রমে বাঘে গরু খাইতেছে, গরু ঘাস খাইতেছে, ঘাস ধানগাছের অন্নে ভাগ বসাইয়া ধানগাছের সংহার করিতেছে; আর ধানের অভাবে দুর্ভিক্ষহত মনুষ্য মাতা বসুন্ধরার ক্রোড়ে জীর্ণ কঙ্কাল ন্যস্ত করিয়া কীটপতঙ্গের ও শৃগালকুক্কুরের ও বায়স-গৃধ্রের অন্নসংস্থান করিয়া দিতেছে। অতি উত্তম বন্দোবস্ত, সন্দেহ নাই। এই ভীষণ জীবনযুদ্ধে যাহার সামর্থ্য আছে, পটুতা আছে, সেই ব্যক্তিই কায়ক্লেশে জিতিয়া যায়, ও বংশরক্ষার অবসর পায়। যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা অপটু, তাহারা বংশরক্ষায় সমর্থ হয় না। কে কিসে জয় লাভ করে, বলা কঠিন। কেহ ধারাল দাঁতের জোরে, কেহ জোরাল শিঙের বলে, কেহ তীক্ষ্ণ দৃষ্টির বলে জয়লাভ করে। কেহ সম্মুখযুদ্ধে সামর্থ্য দেখাইয়া জিতিয়া যায়—তাহার বংশপরম্পরার শেষ পরিণতি সিংহ ও শার্দ্দূল। কেহ বা রণে ভঙ্গ দিয়া "যঃ পলায়তি স জীবতি" এই মহাবাক্যের সার্থকতা সাধন করে—তাহার বংশধর শশক ও হরিণ।

ফলে জীবসমাজে একটা বাছাই কার্য্য চলিতেছে। পণ্ডিতেরা ইহার নাম দিয়াছেন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। জীবন-সংগ্রামে যাহাদের কোন না কোনরূপ পটুতা আছে, তাহাদিগকেই বাছাই করিয়া লওয়া হয়। যাহাদের পটুতা নাই, তাহাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে মারিয়া ফেলা হয়। এই বাছাই কার্য্য যে নিতান্ত অপক্ষপাতে ও বিবেচনাসহকারে নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহা নহে। অনেকে পটুতা সত্ত্বেও সামান্য ক্রটীতে মারা পড়ে; অনেকে অপটু হইয়াও ফাঁকি দিয়া বাঁচিয়া যায়। এ বিষয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রকৃতি ঠাকুরাণীর নিকট হারি মানেন। তবে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই বাছাই কার্য্য অবিরাম গতিতে চলিতেছে; কাজেই মোটের উপর যাহারা কোন না কোন কারণে বাহ্যজগতের সহিত যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত, সমর্থ ও দক্ষ, তাহারাই বাঁচিয়া যায়। যাহার যে ...

পুরুষানুক্রমে গঠিত ও পুষ্ট হইয়াছে। যাহার যে ক্ষমতা এই পক্ষে অনুকূল, তাহার সেই ক্ষমতা পুরুষানুক্রমে পুষ্ট হইয়াছে।

জীবের দেহযন্ত্রের অন্তর্গত অবয়বগুলিতে জীবনরক্ষার অনুকূল নানা কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালের জীববিদ্যা-বিশারদেরা এই কৌশল দেখিয়া চমৎকৃত হইতেন। নাক কাণ কোন এক একটা অবয়বের মধ্যে কত কারিকরি, কত কৌশল। আবার যে জীবের পক্ষে যেমনটি আবশ্যক, তাহার পক্ষে তেমনি বিধান। অসম্পূর্ণতা আছে সন্দেহ নাই; অসম্পূর্ণতা না থাকিলে জীবের আধিব্যাধি শোক তাপ হইবে কেন? তৎসত্ত্বেও যে গঠন-কৌশল দেখা যায়, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য যে জীবন-রক্ষা, সেই জীবনরক্ষার অনুকূল এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় যে, জীববিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা এককালে এই সকল কৌশলের আলোচনায় রোমাঞ্চিত হইতেন, এবং এই যন্ত্রের নির্ম্মাণকর্ত্তার স্তুতিগানে নাগরাজের মত সহস্র-জিহ্বা প্রকাশ করিতেন। ডারুইনের পর আমরা দেখিতেছি, জীবদেহের নির্ম্মাণ-কর্ত্তাকে কোনরূপ কারখানা খুলিতে হয় নাই। মাথা খাটাইয়া কোনরূপ নক্সা বা ডিজাইন প্রস্তুত করিতে হয় নাই। অথচ তিনি এমনই একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন যে, জীবদেহ আপনা হইতে আপনাকে সহস্র বিভিন্ন উপায়ে গঠিত ও পরিণত করিয়া লইয়াছে। জীবদেহের যে কয়েকটি শক্তি গোড়ায় মানিয়া লওয়া গিয়াছে, সে শক্তি কয়টা থাকিলে এরূপ হইবেই ত! বাঘের মধ্যে যে দন্তহীন, চিলের মধ্যে যে দৃষ্টিহীন, হরিণের মধ্যে যে পলায়নে অক্ষম, প্রজাপতির মধ্যে যে বিচিত্রবর্ণ ফুলের উপর আপনার বিচিত্রবর্ণ ডানা প্রসার করিয়া ফুলের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া আপনার শত্রুর মুখে ছাই দিতে পারে না, ফুলের মধ্যে যে ফুল মধুর প্রলোভনে, রঙ্গের আকর্ষণে, গন্ধের প্ররোচনায় প্রজাপতিকে আকর্ষণ করিয়া তাহা দ্বারা আপনার পরাগ-রেণু পুষ্পান্তরে বহন করাইয়া বংশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না, জীবনসংগ্রামের কুরুক্ষেত্রে তাহার জীবন-রক্ষার উপায় নাই; সে বংশ রাখিবার অবকাশ পায় না। যাহাদের ঐ ঐ গুণ আছে, তাহারাই মোটের উপর বাঁচিয়া থাকে ও বংশ রাখে, এবং তাহাদের বংশধরের ঐ ঐ গুণ, ঐ ঐ কৌশল, আবিষ্কার করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি।

আত্মরক্ষা করিতে হইলে যাহা হেয়, অর্থাৎ জীবন-সমরে প্রতিকূল, ... বর্জ্জন করিতেই হইবে। যাহা উপাদেয়, অর্থাৎ জীবন-

সময়ে অনুকূল, তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইবে। জীবমাত্রেই এই চেষ্টা, অন্ততঃ উন্নতশ্রেণীর জীবমাত্রেই, যাহারা প্রকৃতির হাতে কেবলমাত্র ক্রীড়ার পুতুল নহে, সেই উন্নত জীবমাত্রেই এই চেষ্টা থাকিবে। নতুবা সে সময়ে পরাভূত হইবে, তাহার বংশ থাকিবে না। এই সকল জীবের মধ্যে যাহারা আবার আরও উচ্চশ্রেণীতে রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এই হেয়-বর্জ্জন ও উপাদেয়-গ্রহণের জন্য একটা অতি অদ্ভুত কৌশলের আবির্ভাব দেখা যায়। এই শ্রেণীর জীব উপাদেয়-গ্রহণে সুখ পায়, আর হেয়-বর্জ্জন করিতে না পারিলে দুঃখ পায়। জীবমধ্যে এই সুখদুঃখের আবির্ভাব কবে, কোথায়, কিরূপে হইল, এ একটা বিষম সমস্যা। বুদ্ধিজীবী মানুষ হয় ত এমন ঘটিকাযন্ত্র তৈয়ার করিতে পারে যে, সেও হেয়বর্জ্জনে ও উপাদেয়-গ্রহণে সমর্থ হইবে। এমন ঘড়ি তৈয়ার করা চলিতে পারে, যে কোন দুষ্ট ব্যক্তি তাহার পেণ্ডুলমে হাত দিতে গেলে, অমনি একটা শলাকা ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহাকে একটা খোঁচা দিবে; অথবা দম ফুরাইয়া গেলে, ঘটিকাযন্ত্র একটা হাত বাড়াইয়া সূর্য্য-রশ্মি আকর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা আপনার দম দিয়া লইবে। প্রথমটা হইবে হেয়-বর্জ্জন, দ্বিতীয়টা হইবে উপাদেয়-গ্রহণ। কিন্তু এই কার্য্যে সমর্থ হইলে ঘটিকাযন্ত্র সুখী, আর অসমর্থ হইলে দুঃখী হইতে পারিবে, এ কথা বলিতে সাহস করি না। ঘটিকা-যন্ত্র সুখদুঃখ-অনুভবে অসমর্থ। সকল জীবই যে সুখদুঃখ অনুভব করিতে পারে, তাহাও জোর করিয়া বলা চলে না; অণুবীক্ষণে যে সকল ক্ষুদ্র জীবাণু দেখা যায়, তাহাদের কথা দূরে আস্তাম্, কেঁচো কিংবা জোঁকের মত উন্নত জীব, যাহারা অহরহঃ আত্মরক্ষার জন্য হেয় বর্জ্জন করিতেছে ও আত্মপুষ্টির জন্য উপাদেয় গ্রহণ করিতেছে, তাহারাও সুখদুঃখ অনুভবে সমর্থ কি না, বলা কঠিন। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা আসিয়া তর্ক তুলিবেন, কেঁচো জোঁক দূরে থাক, মহাশয় যে সর্ব্বতোভাবে আমারই মত মনুষ্যধর্ম্মা জীব, আপনারই যে সুখদুঃখের অনুভব-ক্ষমতা আছে, তাহার প্রমাণ কি? আপনাকে হাসিতে দেখি ও কাঁদিতে দেখি, এবং উভয় স্থলেই আপনার মুখভঙ্গী ও দন্তবিকাশ ও চীৎকারের প্রণালী দেখিয়া আমি অনুমান করিয়া লই, আপনি আমারই মত হাসির সময় সুখভোগ করেন ও কান্নার সময় দুঃখভোগ করেন। কিন্তু উহা আমার অনুমানমাত্র; আপনার সুখ-দুঃখের অনুভব কস্মিন্ কালে, কস্মিন্ উপায়ে আমার প্রত্যক্ষগোচর হইতে

অন্যের সুখদুঃখ আমার কাছে কেবল মুখভঙ্গী ও দন্তবিকাশের অতিরিক্ত কিছুই নহে। সে কথা থাক। যখন জ্ঞানগোচর জগতের এক আনা আমার প্রত্যক্ষগোচর, বাকি পনের আনার জন্য আমাকে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়, তখন স্বীকার করিয়া লইলাম, মহাশয়ও আমারই মত সুখানুভবে ও দুঃখানুভবে সমর্থ। মহাশয় যখন সমর্থ, তখন মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষ হনুমান্‌ও সমর্থ ছিলেন, এবং গরু-ভেড়া, চিল-শকুনি, টিকটিকি-গিরগিটি, মাছি-মশা পর্য্যন্তও না হয় সুখদুঃখ-বোধে সমর্থ, স্বীকার করিলাম।

জীবের এই সুখদুঃখের অনুভব-ক্ষমতা কিরূপে পুষ্ট হইল, এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ডারুইন-শিষ্যেরা বড় কুণ্ঠা বোধ করিবেন না। এই অনুভবে জীবের লাভ আছে কি না, তাঁহারা কেবল ইহাই দেখিবেন। যদি এই অনুভব-ক্ষমতা জীবন-দ্বন্দ্বে কোনরূপ সাহায্য করে, তাহা হইলে উহার আবির্ভাবের জন্য ডারুইন-শিষ্য চিন্তিত হইবেন না। বলা বাহুল্য যে, অনুভবশক্তি-হীন জীব অপেক্ষা অনুভবশক্তি-যুক্ত জীবের জীবন-সংগ্রামে সুবিধা অত্যন্ত অধিক। এত অধিক যে, সুখদুঃখভোগী জীবের সহিত ইতর জীবের এ বিষয়ে তুলনাই হয় না। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে উন্নত জীবের অবস্থা এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, মোটের উপর উপাদেয়-গ্রহণেই তাহার সুখ ও হেয় বর্জ্জন করিতে না পারিলেই তাহার দুঃখ। যে বাহ্যজগতের সহিত তাহার যুগপৎ মিত্রতা ও শত্রুতা, সেই বাহ্যজগতের কিয়দংশ সে সুখ-জনক ও কিয়দংশ দুঃখজনক-রূপে দেখিয়া থাকে। বাহ্যজগতের মূর্ত্তিই তাহার নিকট বদলাইয়া গিয়াছে। মানুষের কথাই ধরা যাক। মানুষ দেহমধ্যে পাঁচ পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের দরজা খুলিয়া বিশ্বজগতের কেন্দ্রস্থানে বসিয়া আছে। চারি দিক্ হইতে জাগতিক শক্তিসমূহ তাহার সেই ইন্দ্রিয়দ্বারে আঘাতের পর আঘাত করিতেছে। সেই আঘাতপরম্পরা গোটাকতক তার বাহিয়া মাথার ভিতর প্রবেশ করিলে মাথার মগজ কিলবিল করিয়া উঠে। মনুষ্য-দেহ যন্ত্র, বাহ্য-শক্তির উত্তেজনায় সেই যন্ত্র সাড়া দেয়। কিন্তু আমার মাথার খুলির ভিতরে যে এমন কাণ্ড হইতেছে, আমি তাহার কিছুই জানিতে পারি না। ঐ সকল জাগতিক শক্তির সহিত, ঐ সকল আঘাতপরম্পরার সহিত আমার মুখ্যতঃ কোনও সম্পর্ক নাই। আমার সহিত মুখ্য সম্পর্ক কয়েকটা অনুভূতির; পাঁচটা ইন্দ্রিয়ে আঘাত করিলে পাঁচ রকমের অনুভূতি জন্মে,—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এই শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের সহিত আমার মুখ্যসম্পর্ক

একমাত্র সম্পর্ক। কেন না, আমার পক্ষে জগৎ, যে জগৎকে আমি জানি, সেই জগৎ রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শময়। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শহীন জগৎ যদি থাকে, তাহা আমার জ্ঞানগোচর নহে। এই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ যে আমি অনুভব করিতেছি, ইহাই আমার জ্ঞান; আমি ইহাই জানি, আর কিছু জানি না। জীবনহীন যন্ত্রের এই জ্ঞান নাই। ঘটিকাযন্ত্র বা এঞ্জিন রূপ, রস সম্বন্ধে জ্ঞানহীন; অতএব বাহ্যজগৎ সম্বন্ধেও সে একেবারে জ্ঞানহীন। আবার জীবন থাকিলেই যে এই জ্ঞান থাকিবে, তাহা জোর করিয়া বলিতে পারি না। কেঁচো কিংবা জোঁক বাহ্যজগতের উত্তেজনা পাইলে সাড়া দেয়,—জড়যন্ত্রেও যেমন সাড়া দেয়,—কিন্তু বাহ্যজগৎসম্বন্ধে কেঁচোর বা জোঁকের কোনরূপ জ্ঞান আছে, ইহা খুব জোরের সহিত কেঁচোতত্ত্ববিৎও বলিতে পারেন না। জীবজগতের খুব উচ্চপ্রকোষ্ঠে যাহাদের বাস, তাহাদেরই এই জ্ঞান আছে, আমরা অনুমানপূর্ব্বক বলিতে পারি।

ফলে উন্নতজীব বাহ্যজগৎকে জানে না; সে জানে কেবল রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শকে। এই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শের পরম্পরাই তাহার নিকট বাহ্যজগৎ। কোন রূপ, কোন রস, কোন গন্ধ, কোন শব্দ, কোন স্পর্শ জীবের সুখপ্রদ—তাহাই তাহার উপাদেয়, তাহাই গ্রহণের জন্য সে ব্যাকুল; যাহা দুঃখপ্রদ, তাহাই তাহার হেয়; তাহা বর্জ্জন করিতে সে ব্যস্ত। সে আর কিছু দেখে না। কোন্ অনুভবটা সুখ দেয়, কোন্‌টা দুঃখ দেয়, তাহাই দেখে ও তদনুসারে যাহা সুখজনক, তাহা গ্রহণ করে ও যাহা দুঃখজনক, তাহা বর্জ্জন করে। সৌভাগ্যক্রমে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে এরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে, যাহা জীবনরক্ষার অনুকূল, তাহাই মোটের উপর আরাম দেয়, যাহা মোটের উপর প্রতিকূল, তাহাই দুঃখ দেয়। মোটের উপর বলিলাম, কেন না, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফল কোথাও সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই; সর্ব্বত্রই খট্‌কা আছে ও অসম্পূর্ণতা আছে। অসম্পূর্ণতা আছে বলিয়াই গাঁজা, গুলি ও মদের দোকান চলিতেছে। জীবন-সমরে প্রতিকূল হইলেও মানুষের ঐ সকল দ্রব্যের প্রতি নেশা আছে,—উহা একরকমের আরাম দেয় ও ভ্রমক্রমে উপাদেয় বলিয়া গৃহীত হয়। এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মোটের উপর যাহা জীবন-দ্বন্দ্বে অনুকূল, তাহাই সুখজনক বলিয়া উপাদেয়, ও যাহা প্রতিকূল, তাহা দুঃখজনক বলিয়া হেয়।

উচ্চতর জীবকে জীবনসমরে আশ্চর্য্যভাবে সমর্থ করিয়াছে। আগুনে হাত দেওয়া জীবনের পক্ষে অনুকূল নহে; আমরা আগুন হইতে হাত সরাইয়া লই; আগুনের জন্য নহে, আগুন যে বেদনা দেয়, তাহারই জন্য। এইরূপ সর্ব্বত্র। যাহা দুঃখজনক, আমরা তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে দূরে যাই; যাহা সুখজনক, তাহাকে টানিয়া লই। মিষ্টান্ন দেখিলেই আমাদের লালা নিঃসরণ হয়, আর ঝাল ও তিক্তরস হইতে রসনা সংবরণ করি। এইরূপে আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি। সময়ে সময়ে ঠকিতে হয় বটে; কিন্তু মোটের উপর জীবনযাত্রার প্রণালী এই যে, সুখকে অন্বেষণ করিতে হইবে ও দুঃখকে পরিহার করিতে হইবে; এই শিক্ষা আমরা প্রকৃতি দেবীর পাঠশালায় লাভ করিয়াছি।

যাহাদের এই প্রবৃত্তি নাই, যাহারা লঙ্কা আর নিমের পাতা পেট ভরিয়া খায়, আর লুচিমণ্ডায় দ্বিধাবোধ করে, প্রকৃতিদেবী তাহাদের গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলেন, তাহাদের ভিটা পর্য্যন্ত উচ্ছিন্ন হয়; তাহাদের বংশে-বাতি দিতে কেহ থাকে না। কাজেই যাহাদের সুখলাভের ও দুঃখ-পরি-হারের প্রবৃত্তি আছে, তাহারাই পাঠশালা হইতে পাস করিয়া বাহিরে আসিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া লক্ষ পুরুষের গলা টেপার পর জীবের এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। মাষ্টারমহাশয় আমাদের কল্যাণের জন্য বেত মারেন, তাহাতে আমাদের ক্ষোভ হয়; কিন্তু এই নিষ্ঠুর লেডী মাষ্টার যে মন্দ ছেলেদের একবারে গলা টিপিয়া দেন, তজ্জন্য আমরা ক্ষুব্ধ নহি।

জীবন-রক্ষার জন্য এই প্রবৃত্তিগুলার এত প্রয়োজন যে, প্রকৃতি দেবী সেগুলার সম্বন্ধে আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার দিকে একবারেই তাকান নাই। তাঁহার নিষ্ঠুর আইনের প্রয়োগে একবারে কঠোর বিধান বাঁধিয়া দিয়াছেন। ক্ষুধা লাগিলেই খাইতে হইবে, তৃষ্ণা হইলেই জলের অন্বেষণ করিতে হইবে, আগুন হইতে হাত গুটাইয়া লইতেই হইবে; এ সকল বিষয়ে আমাদের কোনরূপ স্বাধীনতা নাই। এই সকল প্রবৃত্তির নাম সংস্কার। উচ্চতর জীব যখনই ভূমিষ্ঠ হয়, তখনই এই সংস্কারগুলি লইয়া জন্মে,—পিতামাতার নিকট হইতে জন্ম সহ প্রাপ্ত হয়। জন্ম সহ প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহাদের নাম দিতে পারি সহজাত সংস্কার, ইংরেজিতে বলে instinct। এই সকল সহজাত সংস্কার জীবকে জীবন-পথে চালাইতেছে; মোটের উপর, সুপথেই চালাইতেছে, যে

সংস্কারের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে থাকিলে, মোটের উপর জীবন-যাত্রা বেশ চলিয়া যায়। মোটের উপর,—কেন না, বাহ্যজগৎ হইতে এমন সকল আক্রমণ আসে, সহজাত সংস্কারে সে স্থলে কোনরূপ কর্ত্তব্য উপদেশ দেয় না। জীবের জীবনে যে সকল আক্রমণ ও আঘাত অনুক্ষণ, সদা সর্ব্বদা ঘটিতেছে, সেগুলার সম্বন্ধে সহজ-সংস্কারই প্রধান অবলম্বন। এখানে সংস্কারের বলেই কর্ত্তব্য নির্ণয় হয়; ভাবিবার চিন্তিবার অবসর থাকে না। কিন্তু এমন অনেক ঘটনা ঘটে, রূপ, রস, গন্ধাদির এমন মিশ্রণ ও সমবায় মাঝে মাঝে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে জীব কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে; তাহার সহজাত সংস্কার তাহাকে কোনও লক্ষ্য নির্দ্দেশ করে না। অনুক্ষণ এই আক্রমণ ঘটে না বলিয়াই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন এই সকল আক্রমণ-রক্ষার ঝটিতি কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। কাজেই জীব এখানে কি করিবে, তাহা ঠাওর করিতে পারে না। এই সকল আঘাত ও উত্তেজনা কখনও বা সুখ দেয়, কখনও বা দুঃখ দেয়, কখনও বা সুখদুঃখ কিছুই দেয় না। কিন্তু জীব সেরূপ স্থলে সুখলাভের বা দুঃখপরিহারের চেষ্টা করিতে গিয়া সময় সময় ঠকিয়া যায়; আপাততঃ সুখজনক বলিয়া যাহাকে গ্রহণ করে, ভবিষ্যতে বা পরিণামে তাহা দুঃখ আনয়ন করে। আপাততঃ দুঃখ মনে করিয়া যাহাকে পরিহার করে, তাহা পরিণামে কল্যাণকর হইতে পারিত। সহজ-সংস্কারের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে এ সকল স্থলে পরিণামে মঙ্গল হয় না।

অদ্ভুতের উপর অদ্ভুত এই যে, এইরূপ স্থলেও কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের জন্য কতকগুলি জীব একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। যেখানে সহজসংস্কার কোনও উপদেশ দেয় না, সেখানে বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি আসিয়া গন্তব্য পথ দেখাইয়া দেয়। এই বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তির ক্ষমতা অতি আশ্চর্য্য। উন্নত জীবের মধ্যে আবার যাহারা অত্যুন্নত প্রকোষ্ঠে বর্ত্তমান আছে, তাহাদের মধ্যেই এই বৃত্তি ও এই ক্ষমতা স্পষ্ট দেখা যায়। মৌমাছি অতি অদ্ভুত ধরণের মৌচাক নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে মধুসঞ্চয় করে। পিঁপীড়া আরও অদ্ভুত ধরণে সমাজ-পালনের ব্যবস্থা করে; কিন্তু বুদ্ধিপূর্ব্বক করে, ইহা বলা চলে না। উহারা সহজাত-সংস্কারের প্রভাবেই ঐ সকল কাণ্ড করিয়া থাকে। মৌমাছি যন্ত্রের মত তাহার চাক পুরুষানুক্রমে নির্ম্মাণ করিয়া

সকল কার্য্যে তাহারা কেবল বাধ্য আছে ; এ বিষয়ে তাহাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছু নাই। জীবন ধরিতে গেলে উহাদিগকে ঐরূপ করিতেই হইবে। না করিলে জীবন-যাত্রা চলে না বলিয়াই প্রকৃতিদেবী প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন দ্বারা উহাদিগকে ঐ প্রবৃত্তি ও ঐ ক্ষমতা দিয়াছেন। যাহাদের ঐ প্রবৃত্তি ছিল না, বা ঐ ক্ষমতা ছিল না, তাহাদিগকে টিপিয়া মারিয়াছেন। উচ্চ পশুপক্ষীর বুদ্ধি-বৃত্তি ও বিচারশক্তি আছে কি না, বলা বিষম সমস্যা। তৃতীয়ভাগ শিশু-শিক্ষার হাতী যখন তাহার মাহুতের মাথায় নারিকেল প্রহার করিয়াছিল, তখন সে যে বিচার-শক্তির পরিচয় দেয় নাই, তাহা বলা দুষ্কর। আমার কোন আত্মীয় মহাজনি-ব্যবসা করিতেন ; তাঁহার বাড়ীর দরজায় খাঁচার মধ্যে একটি ময়না পাখী ঝুলিত। কোন ব্যক্তি দরজার চৌকাঠে পা দিবামাত্র পাখী জিজ্ঞাসা করিত, "টাকা এনেছিস্ ?" পাখীর এই কর্ম্ম কতটুকু সংস্কার-প্রেরিত, আর কতটুকু বিচার-পূর্ব্বক কৃত, বলা কঠিন। কিন্তু বানর যখন তাহার পালকের আদেশক্রমে কদমগাছে উঠে, আর সাগর ডিঙ্গায় ও শ্বাশুড়ীকে ভেংচায়, তখন তাহার এই ব্যবহার যে বুদ্ধি-পূর্ব্বক নহে, ইহা বলা কঠিন। সে যাহাই হউক, জীবের মধ্যে মনুষ্যে এই বৃত্তি পরাকাষ্ঠা পাইয়াছে। এই বৃত্তির উৎকর্ষ হেতু মনুষ্য জীবজগতে শ্রেষ্ঠ।

এই বুদ্ধিবৃত্তি যে জীবন-রক্ষার পক্ষে অনুকূল, তাহাতে কোন সংশয়ই নাই। কেন না, সহজসংস্কার যেখানে পথ দেখায় না, অথচ ঠকাইয়া দেয়, বুদ্ধিবৃত্তি সেখানে গন্তব্য নির্ণয় করিয়া জীবন-রক্ষার উপায় করে। বুদ্ধি বৃত্তি জীবন রক্ষার যখন অনুকূল, তখন ডারুইনশিষ্যের আর ভাবনা নাই। তিনি অকুতোভয়ে বলিবেন, ঐ বুদ্ধিবৃত্তিও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনে লব্ধ। হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই। বুদ্ধিবৃত্তিও পুরুষ-পরম্পরায় সংক্রান্ত হইতেছে এবং সম্ভবতঃ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে ইহার তীক্ষ্ণতা ও পরিসর ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে! কিন্তু সহজাত-সংস্কারের সহিত ইহার অত্যন্ত প্রভেদ। মানুষ পিতামাতার নিকট হইতেই এই বুদ্ধিবৃত্তি পাইয়া থাকে ; কিন্তু ইহার প্রয়োগ-নৈপুণ্য মানুষকে শিক্ষা দ্বারা লাভ করিতে হয়। মানুষ জন্মকালে যে বুদ্ধিবৃত্তি লাভ করে, জন্মের পর শিক্ষা দ্বারা সেই বৃত্তির প্রয়োগ-প্রণালী শিখিয়া লয়। পিতা-মাতা যে অবস্থায় কখনও পড়েন নাই, যে অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না, পুত্র সেই অবস্থায় পড়িলে কিরূপে চলিতে হইবে, বুদ্ধি-বৃত্তি তাহা স্থির করিয়া দেয়। এমন কি, পিতামাতা কোন অবস্থায় পড়িয়া

বুদ্ধি-প্রভাবে যদি কোন পথ নির্ণয় করিয়া থাকেন, পুত্র জন্মমাত্রেই সেই পথ জানিতে পারে না। তাহাকে নূতন করিয়া তাহা শিখিয়া লইতে হয়। এই শিক্ষা মোটের উপর ঠেকিয়া শেখা। এখানে সুখ-দুঃখের উপর নির্ভর চলে না। বাহ্য-জগতের কোন আক্রমণ আমাকে একটা আঘাত দিয়া গেল, আমি তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলাম না; সহজাত সংস্কার এখানে পথ দেখাইয়া দেয় নাই; আমি ঠকিয়া গেলাম। কিন্তু এই যে ঠকিয়া গেলাম, এই ঘটনাটা আমার অভ্যন্তরে মুদ্রিত ও অঙ্কিত রহিল। পরবর্ত্তী আক্রমণের জন্য আমি প্রস্তুত থাকিলাম। সেবার আর আমি ঠকিলাম না। আমার বুদ্ধি-বৃত্তি আমাকে বলিয়া দিয়াছে, এইরূপে এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। অতীতের অভিজ্ঞতা-ফলে এইরূপে আমি ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হই। বাহ্যজগতের আক্রমণ নানা দিক্ হইতে নানা মূর্ত্তিতে আসিয়া আমাদিগকে নানারূপে ঘা দিতেছে ও ঠকাইতেছে। ক্রমশঃ আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছি; ভবিষ্যতের আক্রমণ যাহাতে বিপন্ন করিতে না পারে, তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেছি। কি করিলে কি হয়, অতীতের অভিজ্ঞতা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে। আমরা সেই ধারণা সঞ্চয় করিতেছি ও আবশ্যকমত প্রয়োগ করিতেছি। কোন্ বস্তুর সহিত কোন্ বস্তুর কিরূপ সম্পর্ক, কোন্‌টা হিতকর, কোন্‌টা অহিতকর, কোন্‌টা সুখদায়ক হইলেও হেয়, বা দুঃখদায়ক হইলেও উপাদেয়, তাহার সমাচার আমাদের মধ্যে আমরা মুদ্রিত করিয়া রাখিতেছি। সেই অভিজ্ঞতার ফলে আমরা পথ নিরূপণ করিতেছি। সহজাত পাশবিক সংস্কারের বশে যন্ত্রবৎ নীয়মান না হইয়া অথবা যন্ত্রবৎ পরিচালিত না হইয়া আমরা স্বাধীনভাবে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদের জীবন-রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছি। যে রূপ, রস, গন্ধ আসিয়া আমাদিগকে আঘাত দিতেছে, সেই রূপ, রস, গন্ধকেই আমরা স্বকার্য্য-সাধনে প্রেরণ করিতেছি। তাহাদিগকেই আমরা খাটাইয়া লইতেছি। তাহারা শত্রুভাবে আসিলেও তাহাদিগকে আমরা জীবনরক্ষার অনুকূল করিয়া লইতেছি। ইহারই নাম বৈজ্ঞানিকতা। মনুষ্য এই জন্য বৈজ্ঞানিক জীব! বিশ্বজগতের মধ্যস্থলে আমি বসিয়া আছি, এবং বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে সহস্র সমাচার আমার ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রবেশ করিয়া আমার অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত করিতেছে। আমি নিরীক্ষণ করিতেছি; আমি সাক্ষী; আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা চিত্রপটে

কাজ কি না—জীবনরক্ষা। রূপ-রসাদির প্রবাহ আসিয়া আমার চিত্তপটে রেখা টানিয়া যাইতেছে। তাহার সাহায্যে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইতেছি। অতএব আমি বৈজ্ঞানিক।

কিসে কি হইতেছে, কিসের পর কি ঘটিতেছে, কখন কি ঘটিতেছে, ইহা বসিয়া বসিয়া দেখা, এবং এই দর্শনজাত অভিজ্ঞতাকে জীবন-যুদ্ধের কাজে লাগান, বৈজ্ঞানিকের এইমাত্র কার্য্য। মনে করিও না যে, বগলে থার্মমিটার ও চোখে দূরবীন না লাগাইলে বৈজ্ঞানিক হয় না। ষ্টীম-এঞ্জিন আর ডাইনামো, আর মোটরগাড়ী আর গ্রামোফোন দেখিয়া বুঝিও না যে, যন্ত্র-তন্ত্রের বহ্বারম্ভ না হইলে বৈজ্ঞানিক হয় না। বসিয়া বসিয়া জগৎযন্ত্রের গতিবিধির আলোচনা ও সেই আলোচনাকে আপন জীবনযাত্রায় নিয়োগ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক হয়। এই অর্থে আমরা সকলেই ছোট বড় বৈজ্ঞানিক। এমন কি, তৃতীয়ভাগ শিশুশিক্ষার হাতী, যে রাগ করিয়া মাহুতের মাথায় নারিকেল ভাঙ্গিয়াছিল, সেও যে একটা ছোটখাট বৈজ্ঞানিক ছিল না, তাহা নির্ভয়ে বলিতে পারি না। আজ বড় বড় বৈজ্ঞানিকের হাতে, কেলবিনের হাতে, অথবা এডিসনের হাতে বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সংবাদ শুনিয়া ত্রস্ত হইবার হেতু নাই; কেন না, মানবের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি কোন্ অতীত কালে কোন্ অজ্ঞাতনামা বৈজ্ঞানিক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে, ইতিহাস তাহার খবরও রাখে না। আমাদের যে অরণ্যবাসী পূর্ব্বপিতামহ সর্ব্বপ্রথমে কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কোনও এডিসনের কোনও আবিষ্কার তাহার সহিত তুলনীয় নহে। তুমি, আমি, সে, প্রত্যেকেই এই বিশ্বজগতের দিকে চাহিয়া আছি, ও যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছি, তাহা আমাদের কাজে লাগাইতেছি। আমরা সকলেই বৈজ্ঞানিক; কেহ ছোট, কেহ বড়। প্রত্যেকেই আমরা কিছু না কিছু নূতন ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি, এবং এই আবিষ্কৃত ঘটনা-সমষ্টি পুঞ্জীভূত হইয়া ও পুরুষ-পরম্পরাক্রমে সঞ্চিত হইয়া মানবজাতির অভিজ্ঞতা বর্দ্ধিত করিতেছে।

আমরা প্রত্যেকেই বিশ্বজগতের পর্য্যবেক্ষক। সকলের দৃষ্টি-শক্তি সমান নহে। কেহ উপর উপর দেখেন, কেহ তলাইয়া দেখেন। কাহারও দৃষ্টি স্থূল, কাহারও সূক্ষ্ম; কেহ দূরের বস্তু দেখেন, কাহারও দৃষ্টি সমীপদেশেই নিবদ্ধ। কেহ অত্যন্ত চক্ষুষ্মান, কেহবা চক্ষু সত্ত্বেও অন্ধের মত ব্যবহার করেন।

কেহ আন্দাজে দূরত্ব নিরূপণ করেন, কেহ গজকাঠী হাতে লইয়া মাপিয়া দেখেন। কেহ সহজ চোখে তাকান, কেহ চোখের সম্মুখে চশমা ও পরকলা লাগাইয়া দেখেন। সহজ চোখে যাহা দেখা যায়, চোখের সামনে খানকতক কাচের পরকলা রাখিলে তার চেয়ে অধিক দেখা যায়; কাজেই যে বড় বৈজ্ঞানিক, সে দূরবীণ দিয়া দূরের জিনিস দেখে, বা অণুবীক্ষণ দিয়া ছোট জিনিস বড় করিয়া দেখে। জগতে যাহা আপনা হইতে ঘটিতেছে, কেহ তাহাই দেখিয়া তুষ্ট; কেহ বা পাঁচটা ঘটনা ঘটাইয়া দেখিয়া তুষ্ট। পাঁচটা দ্রব্য পাঁচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাদের পরস্পর ব্যবহার দেখিলে, তাহাদের দ্বারা পাঁচটা ঘটনা ঘটাইয়া দেখিলে, অনেক নূতন খবর পাওয়া যায়,—যাহা কেবল স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে পাওয়া যায় না। এইরূপ ঘটনা-ঘটনের ইংরেজি নাম experiment করা; আমরা সকলেই কিছু না কিছু experiment করিতেছি। বৈজ্ঞানিকতা যাঁহার ব্যবসায়, তাঁহাদের কেহ অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনে আগুন ধরাইয়া দেখিতেছেন, কি হয়; কেহ দস্তার উপর দ্রাবক ঢালিয়া দেখিতেছেন, কি হয়; কেহ চুম্বকের নিকট লৌহখণ্ড ধরিয়া দেখিতেছেন, কি হয়; কেহ ইন্দুরের লেজ কাটিয়া দেখিতেছেন, তাহার বাচ্ছার দশা কি হয়; কেহ রোগীকে ঔষধ গেলাইয়া দেখিতেছেন, সে শীঘ্র ভবসংসার পার হয় কি না। এইরূপ ঘটনা ঘটাইয়া অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সুচারু ব্যবস্থা করায় সম্প্রতি মনুষ্যের অভিজ্ঞতা অতিমাত্রায় বাড়িয়া চলিতেছে, এবং এই রীতির অবলম্বন-হেতু বৈজ্ঞানিকতার মাহাত্ম্যও অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ফলে আমিও দেখি, তুমিও দেখ, আর লর্ড কেলবিনও দেখেন; কিন্তু তুমি আমি যাহা দেখি, লর্ড কেলবিন তাহার তুলনায় অনেক বেশী দেখেন, অনেক সূক্ষ্ম দেখেন, মাপ করিয়া দেখেন, এবং দেখিতে যাহাতে ভুল না হয়, তাহার ব্যবস্থা করেন। ইন্দ্রিয় যাহাতে প্রতারিত না করে, তাহার ব্যবস্থা করেন। আবার আমরা যাহা কাজে লাগাইতে পারি না, কেলবিন অবলীলা-ক্রমে তাহা কাজে লাগান। আমরা উভয়েই বৈজ্ঞানিক, কেহ অতি ছোট, কেহ অতি বড়।

বিশ্বজগতের ঘটনা-পরম্পরা বৈজ্ঞানিক বসিয়া বসিয়া দেখিতেছেন; কিন্তু উহা কেন ঘটিতেছে, কি উদ্দেশ্যে ঘটিতেছে, তাহা কিছু বলিতে পারেন কি? ... বৃক্ষচ্যুত নারিকেল ভূমিতে পড়ে; কিন্তু

কেন পড়ে, তাহার উত্তর কোনও বৈজ্ঞানিক এ পর্য্যন্ত দেন নাই, কেহ দিবেন না। পৃথিবীর আকর্ষণে পড়ে বলিলে কোনও উত্তরই হইল না; কেন না, পৃথিবী কেন আকর্ষণ করে, তার পরেই এই প্রশ্ন আসিবে। পৃথিবী বিকর্ষণ না করিয়া আকর্ষণ করে কেন, তাহা কে জানে? বিকর্ষণ করিলে অবশ্য আমাদের সুবিধা হইত না, নারিকেল আমাদের ভোগে লাগিত না; কিন্তু পৃথিবী যদি বিকর্ষণই করিতেন, তাহা হইলে আমরা কি করিতাম? বোঁটা হইতে খসিবামাত্র যদি নারিকেল তাহার শস্য ও ক্ষীরসমেত বেলুনের মত উধাও হইয়া উঠিয়া যাইত, তাহা হইলে পৃথিবীর সহস্র বৈজ্ঞানিক হতাশ-ভাবে ঊর্দ্ধমুখে দূরবীণ লাগাইয়া চাহিয়া দেখিতেন, এবং কত মিনিটে কত ঊর্দ্ধে উঠিল, তাহার হিসাব রাখিতেন; কিন্তু নারিকেল ফল আর রসকরায় পরিণত হইত না। পদার্থবিদ্যা খুলিয়া আমরা দেখিতাম, লেখা আছে, পৃথিবী-মাতা সকল দ্রব্যকেই আকর্ষণ করেন, কিন্তু নারিকেলের প্রতি তাঁহার অন্য ব্যবহার; নারিকেলকে তিনি টানেন না, ঠেলিয়া দেন। মনুষ্যজাতির সৌভাগ্যক্রমে পৃথিবী-মাতা নারিকেলকেও টানিতেছেন, এ জন্য আমরা কৃতজ্ঞ আছি। কিন্তু কেন যে পৃথিবীর এই আকর্ষণ-প্রবৃত্তি, তাহার কোনও উত্তর নাই। হয় ত নিউটনের কোনও পরবর্ত্তী পুরুষ দেখাইবেন, নারিকেল ও পৃথিবীর মাঝে কোনরূপ স্থিতিস্থাপক রজ্জুর বন্ধন রহিয়াছে, যাহার ফলে এই আকর্ষণ; অথবা পিছন হইতে নারিকেল এমন কিছু ঠেলা পাইতেছে, তাহাতেই তাহার ভূপতনে প্রবৃত্তি; কিন্তু ইহাতেও সেই 'কেন'র উত্তর মিলিল না। কোনও পণ্ডিত অনুমান করিয়াছিলেন, পিছন হইতে কণিকা-বৃষ্টির ঠেলা পাইয়া উভয় দ্রব্য পরস্পরকে আকর্ষণ করে। কিন্তু সেই অনুমান সঙ্গত হইলেও, সেই কণিকা-বৃষ্টিই বা কেন হয়, এবং ঠেলাই বা কেন দেয়, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কেহ সাহস করেন নাই।

এইরূপ কারণ-অনুসন্ধানের জন্য কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যস্ত নহেন। জগতে ঘটনা-পরম্পরা ঘটিয়া যাইতেছে; তজ্জন্য তাঁহার কোনও দায়িত্ব নাই। ঐরূপ না ঘটিয়া অন্যরূপ ঘটিলেও তাঁহার কোনরূপ মাথাব্যথা হইত না। তিনি যাহা দেখেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করেন, তাহারই আলোচনা করেন, এবং সম্ভব হইলে সেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে জীবনের কি কর্ম্ম সাধিত হইতে পারে, তাহার সন্ধান করেন। জগতে যত ঘটনা ঘটিতেছে, সবই যদি ভিন্ন ভিন্নরূপে ঘটিত, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিককে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত। অন্ততঃ

তিনি ঐরূপ ঘটনাকে কোনরূপেই আয়ত্ত করিতে পারিতেন না। সূর্য্য যদি প্রত্যহ পূর্ব্বে না উঠিতেন, দোকান হইতে চাল কিনিয়া ঘরে আসিয়া যদি দেখা যাইত—তাহার অর্দ্ধেক নাই, খাইতে বসিয়া যদি কোনদিন দেখা যাইত—যত খাই তত ক্ষুধা বাড়ে, লুচি ভাজিতে গিয়া যদি দেখা যাইত—কড়াইয়ের ঘি কেরোসিন হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞান-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিতে হইত, এবং মনুষ্যকেও জীবনযাত্রা-সম্বন্ধে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িতে হইত। সুখের বিষয়, প্রকৃতি দেবীর এইরূপ খেয়াল নাই। প্রকৃতিতে একটা শৃঙ্খলা আছে, সঙ্গতি আছে। আজ যাহা যেরূপে ঘটে, কালও তাহা সেইরূপে ঘটিবে। আবার অনেকগুলা ঘটনা একই রকমে ঘটে। কেন সেই শৃঙ্খলা আছে, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু আছে, তাহা দেখিতেছি। বৈজ্ঞানিক, যিনি পরকলা চোখে, মাপকাঠী হাতে, বসিয়া বসিয়া দেখিতেছেন, তিনি এই সকল শৃঙ্খলা খুঁজিয়া বাহির করেন। তোমার আমার চোখে যাহা পড়ে না, তাঁহার চোখে তাহা পড়ে। তিনি জাগতিক নিয়মের আবিষ্কার করেন। নারিকেল ফলের গতির যে নিয়ম, চাঁদের গতিরও সেই নিয়ম, গ্রহগণের গতিরও সেই নিয়ম। ইহা নিউটনের পূর্ব্বে কাহারও চোখে পড়ে নাই; নিউটনের চোখে পড়িয়াছিল, তাহাতেই নিউটনের নিউটনত্ব।

ফলে বৈজ্ঞানিক কেবল দ্রষ্টা। জগতে যাহা ঘটিতেছে, এবং সেই ঘটনা-পরম্পরা যে নিয়মে চলিতেছে, তাহাই তিনি দেখেন। কিন্তু তিনি জগতের কতটুকু দেখেন? এইখানে বলিতে বাধ্য হইব যে, দূরবীক্ষণ আর অণুবীক্ষণ প্রভৃতি সহস্র যন্ত্র সহায় থাকিতেও তিনি জগতের অতি অল্প অংশই দেখিতে পান। কেন না, বিশ্বজগতের অন্ত কোথায়, তাহা তিনি এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, এবং সেই জন্য জগৎকে অনন্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন। পাঁচটার অধিক ইন্দ্রিয় নাই; এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ও আবার নানা দোষে অসম্পূর্ণ। আচার্য্য হেলমহোৎট্জ একবার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ চক্ষু, উহাতে এত দোষ বিদ্যমান যে, যদি কোনও শিল্পী ঐরূপ নানাদোষ-দুষ্ট যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিত, তিনি তাহার দাম দিতেন না। ইন্দ্রিয়গুলির দোষ-সংশোধনের ও ক্ষমতা-বর্দ্ধনের সহস্র উপায় উদ্ভাবন করিয়াও জগতের অতি অল্প অংশই

গোচর; পনের আনা অনুমান করিয়া লইতে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ এই প্রত্যক্ষগোচর ও অনুমান-লব্ধ জগতের বাহিরে ও ভিতরে জগতের আর একটা বৃহত্তর অংশ কল্পিত হয়, যাহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক কোনও কথা বলিতেই সাহস করেন না। সেই অংশ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে সুখের বিষয়, বৈজ্ঞানিক ক্রমশই জগতের জ্ঞাত অংশ হইতে অজ্ঞাত অংশে অধিকার বিস্তার করিতেছেন। অজ্ঞাত জগৎ ক্রমশই তাঁহার জ্ঞানের সীমার মধ্যে আসিতেছে। এই অজ্ঞাত অংশ সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম কল্পনা করেন; অধিকাংশ স্থলে কল্পনা অমূলক হইয়া দাঁড়ায়, কখনও বা তাহার কিছু একটা মূল পাওয়া যায়। যে সকল অসাধারণ ঘটনাকে আমরা অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করি, তাহা প্রায়ই এই অজ্ঞাত বা অল্পজ্ঞাত জগৎ হইতেই আসে। তাহার অসাধারণত্ব দেখিয়া আমরা চমকিয়া উঠি; আমাদের পরিচিত জগতের ঘটনাবলীর সহিত তাহাদের সামঞ্জস্য দেখিতে পাই না। পরিচিত জগতের যে সকল ঘটনাবলীকে আমরা নিয়মবদ্ধ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে উহারা খাপ খায় না। এই জন্য ঐ সকল ঘটনার সত্যতা-বিষয়ে আমরা সন্দিহান হই। বিজ্ঞান-ব্যবসায়ী বড় সাবধানে চলেন; অনুমান ও কল্পনার উপর নির্ভর না করিলে চলে না বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ না পাইলে তাঁহার সংশয় কিছুতেই মেটে না। বিশেষতঃ যে সকল ঘটনা একেবারে অসাধারণ, ও পরিচিত জগতের সহিত অসমঞ্জস, তাহাদের সত্যতা অগ্নিপরীক্ষা করিয়া না লইলে তাঁহার মনের ধোঁকা কিছুতেই যায় না। প্রত্যক্ষ-লব্ধ কোন ঘটনা, তাহা যতই অদ্ভুত হউক বা যতই অসাধারণ হউক, তাহাকে অগ্রাহ্য করিবার অধিকার তাঁহার একেবারেই নাই। তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে, এবং পরিচিত জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে আপাততঃ তাহার স্থান দিতে না পারিলেও ভবিষ্যতে স্থান মিলিবে, এই ভরসায় থাকিতে হইবে। যে কোনও ব্যক্তি একটা অসাধারণ কার্য্যের বর্ণনা করিলেই তাহা মানিয়া লইতে বৈজ্ঞানিক বাধ্য নহেন। কেন না, মনুষ্য অসত্যবাদী না হইলেও ভ্রান্তিপর। তাহার সকল কথার উপর ভর দেওয়া চলে না। কিন্তু ক্রুকস বা ওয়ালাসের মত ব্যক্তি যখন কোন অসাধারণ ঘটনার বিবরণ লইয়া উপস্থিত হন, তখন নীরব হইয়া ভবিষ্যতের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। বলা উচিত, জাগতিক কোন ঘটনা যতই

উহাকে প্রত্যক্ষগোচর করিলাম, এবং যখনই উহার সত্যতা অঙ্গীকার করিলাম, তখনই উহা ব্যাবহারিক জগতের অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িল, উহা অতিপ্রাকৃত থাকিল না। আধুনিক প্রেততাত্ত্বিকেরা যত অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা সমস্তই সত্য হইতে পারে; কিন্তু যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহা অতিপ্রাকৃত হইবে না। ব্যাবহারিক জগতে অতিপ্রাকৃতের স্থান নাই।

প্রত্যক্ষগোচর, অনুমানলব্ধ, ও কল্পিত, এই তিন অংশ একত্র করিয়া বৈজ্ঞানিক বিশ্বজগতের একটা মূর্ত্তি গড়িয়া লইয়াছেন। বিশ্বজগতের প্রকৃত মূর্ত্তি যে কি, তাহা কোনও বৈজ্ঞানিকের জানিবার উপায় নাই। তাঁহার যে কয়টা ইন্দ্রিয় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে অভিব্যক্ত হইয়াছে, তদ্দ্বারা রূপ,রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ভিন্ন আর কোনও কিছু জ্ঞানগম্য, বা অনুমানগম্য, বা কল্পনা-গম্য হইবার উপায় নাই। যদি ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অধিক থাকিত, অথবা এই ইন্দ্রিয়গুলিই অন্যরূপ জ্ঞানের আমদানি করিত, তাহা হইলে জগতের মূর্ত্তিও তাঁহার নিকট অন্যরূপ হইত। কেমন হইত, তাহা এখন আমাদের কল্পনাতেও আসে না। আপাততঃ তিনি ঐ রূপ, রস, গন্ধাদি পাঁচটা বস্তুকে দেশে ও কালে সন্নিবেশিত করিয়া, জগতের একটা মূর্ত্তি গঠন করিয়া লইয়াছেন, এবং সেই মূর্ত্তির মধ্যে নানা অবয়ব সন্নিবিষ্ট করিয়া একটা বিশাল যন্ত্র-নির্ম্মাণের প্রয়াস পাইতেছেন। এই যন্ত্রের প্রত্যেক অবয়বের একটা কার্য্য নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, এবং সকল অবয়বের মধ্যে এক একটা সম্পর্ক নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। আপন আপন কার্য্য-সাধন করিয়া পরস্পরের সম্পর্ক দ্বারা সেই অবয়বগুলি সুষ্ঠুভাবে যাহাতে সমুদয় যন্ত্রটিকে চালাইতে পারে, ইহা নির্দ্দেশ করিতে পারিলেই বৈজ্ঞানিক সন্তুষ্ট থাকেন। যতক্ষণ তিনি কোন একটা যন্ত্রাঙ্গের কার্য্য নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, বা সেই যন্ত্রাঙ্গটি কি উদ্দেশ্যে সেখানে রহিয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ করিতে পারেন না, ততক্ষণ তাঁহার তৃপ্তি হয় না। এইখানে তাঁহাকে বুদ্ধির খেলা খেলিতে হয়। কল্পিত বিশ্ব-যন্ত্রটির পরিচালন-বিধি বুঝিবার জন্য নানা অঙ্গের কল্পনা করিতে হয়, নানা সম্পর্কের কল্পনা করিতে হয়। নিউটন এবং ফ্যারাডে, লাপ্লাস এবং ফ্রেনেল, হেলমহোলৎজ এবং কেলবিন, মাক্সোয়েল এবং জে জে টমসন, ডালটন এবং আরিনিয়স, ডারুইন এবং ওয়াইজম্যান প্রভৃতি মনীষিগণ এই-রূপ কল্পনার জন্য আপনাদের অসামান্য ধীশক্তি প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু

এখনও তাঁহাদের কল্পনা প্রাকৃত জগৎযন্ত্রের সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য দর্শনে সমর্থ হয় নাই। এখনও কোন্ যন্ত্রাঙ্গ কিরূপে কোন্ কাজ করিয়া জগৎ-যন্ত্রকে এমনি ভাবে চালাইতেছে, সর্ব্বত্র তাহার মীমাংসা হয় নাই। জীবন-রহিত জড় দ্রব্যে কখন কিরূপে জীবনের আবির্ভাব হইল, জীবের মধ্যে কিরূপে সুখ-দুঃখের বেদনা-বোধ আবির্ভূত হইল, কিরূপে তাহার মধ্যে চেতনার সঞ্চার হইল, চেতন জীব কিরূপে আবার বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার-শক্তি লাভ করিল,এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই। ডারুইন-বাদী দেখাইয়াছেন, জীবের জীবন-রক্ষার্থ এই সকল ব্যাপারের আবশ্যকতা আছে; অতএব জীব যখন জীবন ধারণ করে, তখন তাহাতে এই সকল ব্যাপার ঘটিলে ভাল হয় ও ফলেও ঘটিয়াছে। কিন্তু জগৎযন্ত্রকে যন্ত্রহিসাবে দেখিলে ঐ ঐ ব্যাপারের কিরূপে আবির্ভাব হইয়াছে, তাহার সম্যক্ উত্তর পাওয়া যায় নাই। এখনও জীবের ও জড়ের মধ্যে, এবং অচেতন ও চেতনের মধ্যে যে প্রাচীরের ব্যবধান আছে, সেই ব্যবধান লুপ্ত হয় নাই। প্রাচীরের এখানে একটা ওখানে একটা গবাক্ষ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। কিন্তু জগৎযন্ত্র এখনও নানা প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠের মধ্যে অব্যাহতভাবে স্রোত বহাইবার উপায় এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

আর একটা কথার উল্লেখ করিয়া আমার পরমদয়ালু শ্রোতৃগণকে অব্যাহতি দিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, জীবের যত কিছু চেষ্টা কেবল আত্মরক্ষার জন্য, জীবন-যুদ্ধে বাহ্যজগতের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষার জন্য। মনুষ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্য লইয়া বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা স্তূপীকৃত করিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য বাহ্যজগৎকেই আপনার জীবন-রক্ষায় নিয়োগ করা। অরণ্য-বাসী মনুষ্য যে দিন ভূমিতে বীজ পুঁতিয়া শস্য-সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিল, এবং সেই শস্য আগুনে পাক করিয়া আরণ্য ওষধির বনকে সুপথ্য অন্নে পরিণত করিয়াছিল, সেই দিন সে অজ্ঞাতসারে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিচয় দিয়াছিল, পৃথিবীর যাবতীয় লাবরেটারিতে সেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কারখানা অদ্যাপি চলিতেছে। এই আত্মরক্ষার প্রযত্নে ও আত্মপুষ্টির প্রযত্নে আমরা আজ বিস্ময়কর সফলতা লাভ করিয়াছি। দেবরাজের বজ্রে একদিন যাঁহার আবির্ভাব ছিল, তিনি আজ আমাদের গাড়ী চালাইতেছেন, পাখা টানিতেছেন, জল তুলিতেছেন, দূর হইতে সংবাদ বহন করিতেছেন। জাগতিক শক্তিচয়কে

কল্পিত লঙ্কেশ্বর স্বর্গের সমস্ত দেবতাকে ভৃত্যত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের তপস্যা-বলে আমরা প্রত্যেকেই এক একটা লঙ্কেশ্বর হইয়াছি। যে বাহ্যজগতের আক্রমণে আমরা ব্যতিব্যস্ত, যে বাহ্যজগৎ একদিন আমাদের উপরে জয় লাভ করিবেই, আমরা আপাততঃ কয়েকটা দিন তাহার উপর প্রভুত্ব খাটাইয়া আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তির অতুলনীয় জয়-জয়-কার দিতেছি। কিন্তু ইহাই কি আমাদের পরম লাভ?

মোটের উপর জগতে যাহা আমাদের অনিষ্টকর, তাহাই আমাদের হেয়, তাহার বর্জ্জনে আমরা সুখ লাভ করি; আর যাহা আমাদের হিতকর, তাহাই আমাদের উপাদেয়, তাহার গ্রহণেও আমরা সুখ লাভ করি। জীবের মধ্যে যাহারা সুখভোগে অধিকারী, তাহারা সকলেই তাহা করে; এবং করে বলিয়াই তাহারা জীবন-রক্ষায় এমন সমর্থ হয়। আমরা মনুষ্য হইয়াও জীব, অতএব আমরাও অন্য জীবের ন্যায় জীবন-রক্ষার্থ সুখান্বেষী হইয়া হেয়-বর্জ্জন ও উপাদেয়-গ্রহণে তৎপর আছি; তাই আমাদের জীবন-রক্ষার ও জীবন-সমৃদ্ধির অনুকূল যাবতীয় চেষ্টা এই সুখান্বেষণের অভিমুখে। আমরা যে স্বভাবতঃ সুখান্বেষণ করি, তাহার এই নিগূঢ় উদ্দেশ্য। কিন্তু মনুষ্যের একটা বিশেষ অধিকার আছে, ইতর জীবের তাহা নাই। মনুষ্য অনেক সময় বিনা উদ্দেশ্যে সুখ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এই সুখে তাহার কোন লাভ নাই, জীবন-রক্ষায় এতদ্দ্বারা তাহার কোন আনুকূল্য হয় না; ইহা উদ্দেশ্য-হীন সুখ;—ইহা অতি বিশুদ্ধ নির্ম্মল বস্তু, ইহাকে সুখ না বলিয়া আনন্দ বলাই উচিত। মনুষ্য এই বিশুদ্ধ আনন্দের অধিকারী। মনুষ্য গান গাহিয়া যে আনন্দ পায়, মনুষ্য কবিতা শুনিয়া যে আনন্দ পায়, নদী-তীরে বসিয়া নদী-তরঙ্গের কুলু-কুলু ধ্বনি শুনিয়া যে আনন্দ পায়, সে আনন্দ এই আনন্দের নিম্ন সোপানে স্থিত। ইহাতে আনন্দই লাভ, আর কোন লাভ নাই। উহার উচ্চতম সোপানে উঠিয়া প্রকৃতির মোহন মূর্ত্তির দিকে কেবল চাহিয়া চাহিয়া যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাতে জীবনরক্ষার কোন সুবিধা ঘটিবে কি ঘটিবে না, সে প্রশ্ন তোলাই চলে না। তুলিতে গেলে সেই আনন্দের পবিত্রতা ও নির্ম্মলতা নষ্ট হয়। বৈজ্ঞানিক জড়জগৎকে ভৃত্যত্বে নিয়োগ করিয়া জীবন-যুদ্ধে সাহায্য লাভ করিতেছেন বটে; কিন্তু এই জগতের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া, এই জগতের নিয়মশৃঙ্খলার আবিষ্কার করিয়া, এই জগতের আঁধার অংশ আলোকে

বৈজ্ঞানিক যে পরম আনন্দ লাভ করেন, তাহার নিকট এই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন, ডাইনোমো ও মোটর, বৈদ্যুতিক ট্রাম ও বৈদ্যুতিক পাখা, ষ্টীমশিপ আর এরোপ্লেন, অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। মানব-সমাজের মারামারি, কাটাকাটি, রক্তারক্তির মধ্যে বণিকের পণ্যশালা বা বিলাসীর আরাম-নিকেতন কিছুতেই শান্তি আনয়ন করিতে পারে না। মানব জাতির অতীত ইতিহাস পূর্ণ করিয়া জীবন-যুদ্ধের যে ভীষণ কোলাহল আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় বধির করিতেছে, বাহ্যজগতের উপর বিজ্ঞানের এই প্রভুত্ব-লাভের জয়জয়কার সেই কোলাহলের মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে। এই বৈজ্ঞানিকতা-স্পর্দ্ধি-মানব-সভ্যতার মধ্যস্থলেও যখন সবল মানব ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় দুর্ব্বল মানবের শোণিত-পানে কুণ্ঠিত হইতেছে না, তখন জীবন-যুদ্ধের ভীষণতা যে বৈজ্ঞানিকতার প্রভাবে মৃদুতা ধারণ করিবে, মানবসমাজের বর্ত্তমান কালে তাহার কোন আশ্বাসই নাই। এই ক্রূর সংগ্রামের অশান্তির মধ্যে যদি কিছুতে চিত্তক্ষেত্রে শান্তির বারি বর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে উপরে যে আনন্দের কথা উল্লেখ করিয়াছি, সেই আনন্দ। বৈজ্ঞানিকের গর্ব্ব এই ও গৌরব এই যে, তিনি ধরাধামে এই আনন্দের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন ; আমরা অঞ্জলি ভরিয়া উহার ধারা-পানে তৃপ্ত হইতেছি। জীবনের সমরক্ষেত্রে পরস্পর যুধ্যমান কোটী মানবের পাদ-পীড়নে যে ধূলিরাশি উত্থিত হইতেছে, সেই ধূলি-বিক্ষেপে এই বিশুদ্ধ আনন্দ-ধারাকে কলুষিত করিও না! প্রাচীন ঋষি উচ্চকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন, বিজ্ঞানই আনন্দ ও বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। এই কল্পিত মায়া-পুরীতে বদ্ধ জীব যদি ব্যাবহারিক জগতের সম্পর্কে থাকিয়াও পূর্ণ ভূমানন্দের পূর্ব্বাস্বাদ-লাভে অধিকারী হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের উৎস হইতে যে আনন্দ-প্রবাহ বিগলিত হইতেছে, তাহাকে ব্যাবহারিক জীবনের কল্পিত সুখ-দুঃখের কর্দ্দমলিপ্ত করিয়া পঙ্কিল করিও না।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

চিত্রাঙ্গদা।

বর্ত্তমান কালের বিখ্যাত ইংরাজ সাহিত্যসেবী এবং প্রথম শ্রেণীর সমালোচক-আচার্য্য জর্জ্জ সেণ্টস্‌বরী আজ কয়েক বৎসর হইল, "Revised Impressions" (প্রত্যালোচিত বা সংশোধিত ধারণা) নামে একখানি

উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহাতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিভাশালী লেখকদিগের সম্বন্ধে তাঁহার নিজের প্রথম ধারণা এবং পূর্ব্বতন মতসমূহের আলোচনা করিয়াছেন। সাহিত্যসেবিমাত্রেই জানেন, কোন কোন গ্রন্থ প্রথম পাঠকালেই একেবারে চিত্তকে জয় করিয়া ফেলে, কিন্তু পরে তাহাদের প্রভাব ক্রমশঃই মন্দীভূত হইয়া আসে। আবার কোন কোন গ্রন্থ প্রথম পরিচয়ে রসহীন বলিয়া বোধ হইলেও, উত্তরোত্তর পাঠে তাহাদের সৌন্দর্য্য অনুভূত হইতে থাকে, এবং ক্রমশঃ তাহারা চিত্তের উপর স্থায়ী আধিপত্য স্থাপন করে।

Byronএর প্রথম "চটক" ইংরাজী-সাহিত্যে প্রবাদবাক্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এদিকে Wordsworthএর সহিত আলাপ যতই বাড়িতে থাকে' ততই তাঁহার কবিতাসমূহের গভীর এবং মর্ম্মগত সৌন্দর্য্য উপলব্ধ হয়।

এইরূপে দেখা যায়, অনেক গ্রন্থ সম্বন্ধেই আমাদের প্রথম ধারণা স্থায়ী হয় না। সম্প্রতি রবি বাবুর রচিত "চিত্রাঙ্গদা" নামক কাব্য সম্বন্ধে আমাদের প্রথম ধারণার পুনরালোচনা করিতে হইয়াছে। প্রকাশ হইবার কালেই আমরা "চিত্রাঙ্গদা" পাঠ করি। সেই প্রথম পাঠে এবং তাহার পরও কয়েকবার পাঠকালে ইহা আমাদের একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর প্রথমশ্রেণীর খণ্ডকাব্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল। রচনার উৎকর্ষে, ভাষাভঙ্গীর মৌলিকতায়, শব্দরচনার নৈপুণ্যে, ছন্দের লীলাময়ী গতিতে, মানবপ্রকৃতির অভিজ্ঞতায়, নাট্যগুণে এবং সর্ব্বশেষে নিছক-কবিত্ব-রসে সাহিত্য-সংসারে ইহাকে অনন্য-সাধারণ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত একটি দুর্লভ রত্ন বলিয়াই জানিয়াছিলাম। কিন্তু গত জ্যৈষ্ঠমাসের "সাহিত্য" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের লিখিত "কাব্যে নীতি" নামক প্রবন্ধে "চিত্রাঙ্গদা" সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য পাঠ করিয়া আমাদের উক্ত ধারণার পুনর্ব্বিচার আবশ্যক হইয়াছে। তাঁহার মতে, এই কাব্য "দুর্নীতিমূলক" এবং "অস্বাভাবিক"। ইহা পাঠ করিয়া আমরা বাস্তবিক বিস্মিত হইয়াছি, আমাদের পূর্ব্ব ধারণা আকস্মিক তীব্র আঘাত পাইয়াছে, এবং আমাদিগকে চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছে,—যে "দুর্নীতি" এবং "অস্বাভাবিকতা" দ্বিজেন্দ্র বাবু এই কাব্যে এমন সুস্পষ্ট দেখিয়াছেন, তাহা আমাদের চক্ষে পড়ে নাই কেন? সম্ভবতঃ প্রথম পাঠকালে আমাদের নীতিজ্ঞান তত জাগ্রত ছিল না, এবং কবির রচনার মোহমন্ত্রে আমাদের বিচার-শক্তি অভিভূত বা একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং

"সাহিত্যে"র পাঠকবর্গের সহিত আমরা "চিত্রাঙ্গদা" কাব্য পুনর্ব্বার পাঠ করিব, এবং তৎসম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বধারণার এবং দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতের আলোচনা করিতে চেষ্টা পাইত।

চিত্রাঙ্গদার কথা, কথার ভাণ্ডার মহাভারতে আছে। কথাটি অতি ক্ষুদ্র। মূল মহাভারতে ১৩টি মাত্র শ্লোকে আদ্যন্ত বর্ণিত। ইহাতে ঘটনার বৈচিত্র্য নাই,—অভিনব পাত্র-পাত্রীর সৃষ্টি নাই, মানব-প্রকৃতির বা হৃদয়ের কোন তথ্য বা রহস্য ইহাতে দর্শিত হয় নাই। বাস্তব ঘটনা যেমন ইতিহাসে সাদাসিধা ভাবে সচরাচর বর্ণিত হইয়া থাকে, কথাটি সেইরূপেই লিখিত। "রাজতরঙ্গিণী"র কোন অধ্যায়ের ভিতর ইহা সন্নিবেশিত দেখিলে আমরা আশ্চর্য্য হইতাম না।

কিন্তু রবিবাবুর উদ্ভাবনী অথচ সঙ্গত কল্পনা, আখ্যান-বস্তুটিকে বিচিত্র সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়াছে। মহাভারতে যাহা কেবলমাত্র রেখা বা আভাস, তাহা তিনি ছন্দে এবং বর্ণে পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

মহাভারতের গল্পটি এই :—

অর্জ্জুন যখন মণিপুরে গমন করেন, তখন তথাকার রাজা ছিলেন চিত্র-বাহন; চিত্রাঙ্গদা নামে তাঁহার একটিমাত্র কন্যা ছিল। রাজার কোন অপুত্রক পূর্ব্বপুরুষ পুত্র-লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিলে, মহাদেব প্রীত হইয়া এই বর দেন যে, তাঁহার বংশে পুরুষানুক্রমে একটি করিয়া পুত্র জন্মিবে। কিন্তু চিত্রবাহনের পুত্র না হইয়া কন্যা জন্মিয়াছিল। এই কন্যাই বংশ-রক্ষা করিবে এই ভাবিয়া চিত্রবাহন তাহাকে পুত্রিকা গ্রহণ করেন, এবং পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। চিত্রাঙ্গদা একদিন নগর-মধ্যে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে অর্জ্জুন তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেন, এবং তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য রাজার নিকট প্রস্তাব করিলেন। রাজা অর্জ্জুনের পরিচয় পাইয়া অর্জ্জুনকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন যে, চিত্রাঙ্গদার গর্ভেজাত অর্জ্জুনের ঔরস পুত্র চিত্রবাহনের বংশধর হইবে। অর্জ্জুন তথায় তিন বৎসর কাল বাস করেন, এবং পুত্র জন্মিলে মণিপুর হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

এই সামান্য আখ্যান অবলম্বনে রবিবাবু তাঁহার "চিত্রাঙ্গদা" কাব্য রচনা করিয়াছেন। কাব্যমধ্যে আমরা দুইটি প্রধান পাত্র-পাত্রী দেখিতে পাই—এক অর্জ্জুন অপর চিত্রাঙ্গদা,—অর্জ্জুন মহাভারত কাব্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। তাহার

উপর রং ফলাইতে পারেন, এমন কবি বিরল। অর্জ্জুন-চরিত্রকে যদি কোন পরবর্ত্তী কবি স্পর্শ করিতে সাহস পান, তাহা হইলে তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, সে চরিত্র কবি-সৃষ্টির তুঙ্গ-শৃঙ্গে অবস্থিত, তিনি যেন সেই উজ্জ্বল চরিত্রকে কোনরূপে মলিন না করেন। সুতরাং অর্জ্জুন-চরিত্র-অঙ্কনে বেদ-ব্যাসের উপর কিছু নূতনত্ব আনিতে হইলে তাহা অতি সন্তর্পণে করিতে হইবে,—ইহাতে বলা হইল না অর্জ্জুন-চরিত্র নির্দ্দোষ বা আদর্শ মানব-চরিত্র, অথবা বেদব্যাস অর্জ্জুনকে আদর্শ মানুষ করিয়া গড়িয়াছেন। আমরা ইহাই বলিতে চাই যে, অর্জ্জুনের প্রকৃতি এমন বিচিত্র এবং বহুমুখী—তাঁহার হৃদয়ের প্রবৃত্তি সকল এমন সবল ও জাগ্রত,—তাঁহার চরিত্র এমন সঙ্কীর্ণতার সংস্পর্শ শূন্য—ভাঁড়ামী ও ভীরুতা হইতে মুক্ত যে, তাঁহার পরিচয় পাইবামাত্র পাঠক তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা না করিয়া, না ভালবাসিয়া থাকিতে পারে না। এই কাব্যে রবিবাবু অর্জ্জুনকে সৌন্দর্য্য-মুগ্ধ প্রেমিক করিয়া সাজাইয়াছেন, অথচ বেদব্যাস-সৃষ্ট অর্জ্জুনের মনুষ্য-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন।

চিত্রাঙ্গদা সর্ব্বতোভাবে রবিবাবুর নূতন সৃষ্টি। মহাভারতে চিত্রাঙ্গদার কোন সুস্পষ্টমূর্ত্তি নাই। কোথাও কোন বিষয়ে তাহার কর্ত্তৃত্ব বা বিশেষত্ব দেখি না, এবং পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর মধ্যেও যখন পুনর্ব্বার তাহার সাক্ষাৎ পাই, তখনও তাহার এইরূপই নির্ব্বিশেষত্ব। মহাভারতকার যেন একতাল মাটীর উপর "চিত্রাঙ্গদা" এই কয়টি কথা লিখিয়া গিয়াছেন। রবিবাবু সেই মাটী লইয়া একটি জীবন্ত অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।

A perfect woman nobly planned.

রবিবাবুর চিত্রাঙ্গদা কাব্য বুঝিতে হইলে নায়িকার চরিত্রটি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করা চাই। এ চরিত্রে কিন্তু জটিল কিছুই নাই—ইহা অত্যন্ত সরল এবং সহজে বোধগম্য। কিন্তু ইহার বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি থাকা চাই। সেই জন্য রবিবাবুর কাব্যের গল্প অনুসরণ করিবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহার চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের কল্পনা পাঠকের সম্মুখে ধরিতেছি।

একা চ মম কন্যেয়ং কুলস্যোৎপাদনী ভৃশম্।
পুত্রো মমায়মিতি মে ভাবনা পুরুষর্ষভ ! ॥

চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে মূল মহাভারতের এই সামান্য ইঙ্গিত হইতে, এবং বোধ হয় কাশীরামদাসের "পুত্রবৎ করি :কন্যা করি যে পালন" এই কয়টি কথার ছায়া অবলম্বন করিয়া, রবিবাবু একটি জীবন্ত, বাস্তব, অথচ অপূর্ব্ব পাত্রী সৃষ্টির

করিয়াছেন। বাস্তবিক সাহিত্য-জগতে রবিবাবুর চিত্রাঙ্গদা-চরিত্র একটি বিস্ময়কর অথচ সঙ্গত সুন্দর সৃষ্টি ; মহাভারতে পুত্রবৎ পালিতা কন্যা রবিবাবুর কাব্যে একেবারে প্রকৃত যুবরাজ ; যুবরাজের ন্যায় তাহার শিক্ষা—যুবরাজেরই ন্যায় তাহার কর্ম্মের পরিসর—যুবরাজেরই ন্যায় তাহার স্কন্ধে রাজ্যের কর্ত্তব্যভার। ফলতঃ চিত্রাঙ্গদা নারী হইলেও শিক্ষা এবং ব্যবহারে পুরুষ,—কবি চিত্রাঙ্গদার মুখেই এই কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

তাই পুরুষের বেশে
নিত্য করি রাজকাজ যুবরাজ রূপে,
ফিরি স্বেচ্ছামতে ; নাহি জানি লজ্জা ভয়,
অন্তঃপুরবাস ; নাহি জানি হাব ভাব,
বিলাস-চাতুরী ; শিখিয়াছি ধনুর্ব্বিদ্যা,
শুধু শিখি নাই, দেব ! তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে !

মণিপুরের বনচরদিগের মুখেও কবি অর্জ্জুনের নিকট চিত্রাঙ্গদা যে যুবরাজ— রাজ্যরক্ষক এবং শত্রুজিৎ এই পরিচয় দিয়াছেন। ভীত বনচরদিগের আর্ত্তনাদ শুনিয়া অর্জ্জুন তাহাদের ভয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পারিলেন,—

'উত্তর পর্ব্বত হ'তে আসিছে ছুটিয়া
দস্যুদল, বরষার পার্ব্বত্য বন্যার
মত্ত বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয়।

অর্জ্জুন। এ রাজ্যে রক্ষক কেহ নাই ?

বনচর। রাজকন্যা,
চিত্রাঙ্গদা আছিলেন দুষ্টের দমন ;
তাঁর ভয়ে রাজ্যে নাহি ছিল কোন ভয়,
যমভয় ছাড়া। শুনেছি গেছেন তিনি
তীর্থ-পর্য্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণ ব্রত।

অর্জ্জুন। এ রাজ্যের রক্ষক রমণী ?

বনচর। এক দেহে
তিনি পিতা মাতা অনুরক্ত প্রজাদের।
স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্য্যে যুবরাজ।'

এবং রাজ্যরক্ষা প্রসঙ্গে চিত্রাঙ্গদা আত্মগোপন করিয়া নিজ মুখে যে আত্মপরিচয় দিয়াছে, তাহাতেও ঐ কথা,—

চিত্রাঙ্গদা। 'কোন ভয় নাই প্রভু!
তীর্থযাত্রাকালে, রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী
দিকে, দিকে; বিপদের যত পথ ছিল
বন্ধ ক'রে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি।'

উপরের লিখিত বর্ণনা হইতে আমরা জানিলাম, রবিবাবুর "চিত্রাঙ্গদা" শিক্ষায় এবং কার্য্যে একেবারে পুরুষ; সে যে কেবল অন্তঃপুরবাসিনী নয়, এমন নহে। অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়া যে শিক্ষাগুণে স্ত্রীলোক লজ্জা এবং সঙ্কোচ অর্জ্জন করে, সে শিক্ষা তাহার একেবারে নাই—তাহার জীবনে বা চরিত্রে সে শিক্ষার ছায়াপাতও কখনও ঘটে নাই; সুতরাং তাহার পক্ষে অন্তঃপুরবাসিনীর লজ্জা-সঙ্কোচ অসম্ভব। স্ত্রীজনোচিত সামাজিক এবং পারিবারিক্ শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা এমন পাত্রী আমরা অপরাপর কবির সৃষ্টির মধ্যে কচিৎ দেখিতে পাই। বঙ্কিম বাবুর 'কপালকুণ্ডলা' এবং Shakespear রচিত Tempest নামক নাটকে Miranda (মিরেণ্ডা) চরিত্র পাঠকের মনে পড়িতে পারে। এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা প্রবন্ধের স্থানান্তরে যথা-সময়ে করা যাইবে।

কিন্তু চিত্রাঙ্গদা যে কেবল স্ত্রীজনোচিত শিক্ষা হইতে বঞ্চিতা, তাহা নয়, তাহার বিরুদ্ধ শিক্ষাই পাইয়াছিল,—পুরুষের শিক্ষা পাইয়াছিল, এবং তাহাও যে সে পুরুষের নয়—রাজা বা রাজপুরুষের শিক্ষা পাইয়াছিল। তাহাকে শিখিতে হইয়াছিল লোকশাসন করিতে—সমাজ এবং সাম্রাজ্যে নিজের বলবিক্রম প্রকাশ করিতে, দেশরক্ষা করিতে এবং যুদ্ধ করিতে। প্রকৃতি তাহাকে নারী করিয়া গড়িয়াছিল—শিক্ষা তাহাকে পুরুষ করিয়া তুলিয়াছিল।

কাব্যের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, এই চিত্রাঙ্গদা অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া বনপথে একটি জাগ্রত-পৌরুষ-দীপ্ত পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিল; এই সাক্ষাতেই তাহার জীবনে আমূল বিপ্লব সংঘটিত হইল, এবং কাব্যে নাটকত্বেরও সূত্রপাত হইল। কবি ইহার যে অতুলনীয় সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা প্রথম শ্রেণীর কবিরই সম্ভবপর; তাহা যে কোনও প্রথম শ্রেণীর কবিরই যশঃপ্রভা উজ্জ্বল করিতে পারে।

এই উচ্চ প্রশংসার প্রমাণস্বরূপ এবং কাব্যের আখ্যান গোড়া হইতেই আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিবার নিমিত্ত আমরা নিম্নে কাব্যের সেই অংশ বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম,—

চিত্রাঙ্গদা। একদিন

গিয়েছিনু মৃগ-অন্বেষণে, একাকিনী
ঘন বনে, পূর্ণানদীতীরে। তরুমূলে
বাঁধি' অশ্ব, দুর্গম কুটিল বনপথে
পশিলাম মৃগপদচিহ্ন অনুসরি'।
ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত নিত্য অন্ধকার
লতাগুল্ম-গহন গম্ভীর মহারণ্যে
কিছু দূর অগ্রসরি' দেখিনু সহসা
রুধিয়া সঙ্কীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান
ভূমিতলে, চীরধারী মলিন পুরুষ।
উঠিতে কহিনু তারে অবজ্ঞার স্বরে
স'রে' যেতে—নড়িল না, চাহিল না ফিরে'।
উদ্ধত অধীর রোষে ধনু-অগ্রভাগে
করিনু তাড়না;—সরল সুদীর্ঘ দেহ
মুহূর্ত্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে
সম্মুখে আমার,—ভস্মসুপ্ত অগ্নি যথা
ঘৃতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে ঊর্দ্ধে
চক্ষের নিমেষে। শুধু ক্ষণেকের তরে
চাহিলা আমার মুখপানে,—রোষ-দৃষ্টি
মিশাল পলকে; নাচিল অধরপ্রান্তে
স্নিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদু হাস্যরেখা
বুঝি সে বালক-মূর্ত্তি হেরিয়া আমার।
শিখে' পুরুষের বিদ্যা, পরে' পুরুষের
বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন
ভুলেছিনু যাহা, সেই মুখ চেয়ে', সেই
আপনাতে-আপনি-অটল-মূর্ত্তি-হেরি,'
সেই মুহূর্ত্তেই জানিলাম মনে, নারী
আমি। সেই মুহূর্ত্তেই প্রথম দেখিনু
সম্মুখে পুরুষ মোর।'

এ পুরুষ কে?

সভয়বিস্ময়কণ্ঠে
শুধানু 'কে তুমি?' শুনিনু উত্তর 'আমি
পার্থ, কুরুবংশধর।

কিন্তু পার্থ হইলেও চিত্রাঙ্গদার তাহাতে কি? চিত্রাঙ্গদা কি পার্থের কোন সংবাদ রাখে? পার্থ চিত্রাঙ্গদার অশেষ ভক্তির পাত্র—মানসদেবতা। স্বপ্নেও যাহার দর্শন পাইবার আশা তাহার মনে একদিনও জাগে নাই, তাহাকে হঠাৎ চক্ষুর সম্মুখে পাইয়া চিত্রাঙ্গদা স্তম্ভিত—নির্ব্বাক!

রহিনু দাঁড়ায়ে
চিত্রপ্রায়, ভু'লে' গেনু প্রণাম করিতে।
এই পার্থ? আজন্মের বিস্ময় আমার!
শুনেছিনু বটে, সত্যপালনের তরে
দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ব্রহ্মচর্য্য
পালিছে অর্জ্জুন। এই সেই পার্থবীর!
বাল্য-দুরাশায় কত দিন করিয়াছি
মনে, পার্থকীর্ত্তি করিব নিষ্প্রভ আমি
নিজ ভুজবলে; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য;
পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম
তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়।
হারে মুগ্ধে, কোথায় চলিয়া গেল সেই
স্পর্দ্ধা তোর! যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে
সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি,
শৌর্য্য বীর্য্য যাহা কিছু ধূলায় মিলায়ে
লভিতাম দুর্লভ মরণ, সেই তাঁর
চরণের তলে!

তাহার পর ঘটিল কি?

কি ভাবিতেছিনু, মনে
নাই। দেখিনু চাহিয়া, ধীরে চলি' গেলা
বীর বন-অন্তরালে। উঠিনু চমকি';
সেইক্ষণে জন্মিল চেতনা; আপনারে
দিলাম ধিক্কার শতবার! ছি ছি মূঢ়ে,
না করিলি সম্ভাষণ, না, শুধালি কথা,
না চাহিলি ক্ষমা-ভিক্ষা,—বর্ব্বরের মত
রহিলি দাঁড়ায়ে—হেলা করি' চলি' গেলা
বীর! বাঁচিতাম, সে মুহূর্ত্তে মরিতাম

উপরে উদ্ধৃত শ্লোক-সমূহে কবি অতি বিশদ এবং সুন্দর ভাষায় বুঝাইয়াছেন যে, যে স্বভাববিরুদ্ধ—আরোপিত মিথ্যাজীবন চিত্রাঙ্গদার নৈসর্গিক প্রকৃত জীবনকে চাপিয়া রাখিয়াছিল,—জন্মলব্ধ জীবনের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি এবং বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া তাহাকে অস্বাভাবিক পথে চালিত করিয়াছিল—প্রেতের ন্যায় যে জীবন তাহাকে এতকাল পাইয়াছিল—আজ তাহা হইতে সে মুক্ত! আজ সে খাঁটী পুরুষকে সম্মুখে পাইয়া বুঝিল, সে নিজে ভেজাল—বুঝিল সে পুরুষ নয়—পুরুষ হইতেও পারে না। আজ সে নিজেকে জানিতে পারিল—জানিল সে নারী।

তার পর যে পুরুষ-দর্শনে তাহার আত্মজ্ঞান মনে জাগিয়া উঠিল, তিনি যে সে পুরুষ নন। তিনি অর্জ্জুন—চিত্রাঙ্গদার 'আজন্মের বিস্ময়'—কল্পনা-রাজ্যের অধীশ্বর। এমন অবস্থায় অর্থাৎ যখন অর্জ্জুনের সাক্ষাৎলাভে চিত্রাঙ্গদা একাধারে প্রকৃতপুরুষ এবং আদর্শ পুরুষকে দেখিতে পাইল, তখন যে তাহার সহসা-জাগ্রত চিত্তবৃত্তি সকল দুর্দ্দমনীয় এবং অপ্রতিহত বেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নয়। স্বভাবের অমোঘ নিয়মেই ইহা ঘটিয়াছিল—পুরুষ হইলেও ঘটিত।

কে তাহার কল্পনার বস্তুকে—স্বপ্নের ধনকে নিকটে পাইয়া উদাসীন থাকিতে পারে? এই অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চিত্রাঙ্গদা পরদিন তাহার কপটপুরুষ-জীবনের ছলা-কলা পরিহার করিয়া, মিথ্যা হইতে আপনাকে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত করিয়া, নারীবেশে আপনাকে নারী বলিয়া ব্যক্ত করিয়া অরণ্যের শিবালয়ে অর্জ্জুনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইল, এবং তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। মন্দিরের মধ্যে পরস্পরে কি কথোপকথন হইয়াছিল, তাহা কাব্যে লিখিত হয় নাই—

চিত্রাঙ্গদা। মনে নাই ভাল,
তার পরে কি কহিনু আমি, কি উত্তর
শুনিলাম। আর শুধায়ো না, ভগবন্!
মাথায় পড়িল ভেঙে লজ্জা বজ্ররূপে,
তবু মোরে পারিল না শতধা করিতে—
নারী হয়ে এমনি পুরুষ প্রাণ মোর!
নাহি জানি কেমনে এলেম ঘরে ফিরে'

দুঃস্বপ্ন-বিহ্বল সম! শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্তশূল
'ব্রহ্মচারি-ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।'

অর্থাৎ, চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিল, অর্জ্জুন তাহাতে সম্মত হইলেন না। অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এইরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া চিত্রাঙ্গদা পার্ব্বতীর ন্যায় নিজের রূপের নিন্দা করিল, এবং অন্ততঃ একদিনের তরে অমানুষ রূপ পাইবার নিমিত্ত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল—যাহাতে তপোলব্ধ রূপের প্রভাবে অর্জ্জুনের হৃদয় হরণ করিতে পারে। দেবতারা—মদন ও বসন্ত তপে তুষ্ট হইয়া চিত্রাঙ্গদাকে কেবলমাত্র একদিনের জন্য নয়, বৎসর-কালস্থায়ী মানব-দুর্লভ রূপ প্রদান করিলেন। বসন্তদেব বলিলেন,—

শুধু একদিন নহে,
বসন্তের পুষ্পশোভা, একবর্ষ ধরি'
ঘেরিয়া তোমার তনু রহিবে বিকাশ।

তাহাই হইল; এবং পরদিন চিত্রাঙ্গদা যখন নিজ অঙ্গে কুসুমবৎ সমৃদ্ধ সেই দেবদত্ত অপরূপ রূপের প্রথম বিকাশ, বনস্থিত সরসীর স্বচ্ছ জলে সুন্দর এবং স্বাভাবিক কৌতুহলের সহিত দেখিতেছিল,—তাহার যে চিত্র কবি আঁকিয়াছেন, তাহা যেমন সুন্দর, তেমনই স্বাভাবিক! প্রতিভাশালী কবির চতুর কল্পনা তাহাতে আবার অপূর্ব্ব নাটকত্ব আনিয়া দিয়াছে—সেই মুহূর্ত্তে তাহার সেই রূপ—সেই বিস্মিত কুতূহলী দৃষ্টি দেখিতেছিল, আর এক জন—অর্জ্জুন। এই নাটকত্ব চিত্রের মাধুর্য্যে চন্দ্রকরে কুসুম-সৌরভের ন্যায়, নাতিতীক্ষ্ণ উন্মাদনা মিলিত করিয়াছে।

ইংরেজ কবি Milton রচিত Paradise Lost নামক মহাকাব্যের ৪র্থ সর্গে এইরূপ একটি চিত্র পাঠকের মনে পড়ে কি? সদ্যঃসৃষ্ট খৃষ্টীয় আদিমাতা ঈভ জলমধ্যে নিজ প্রতিবিম্ব দর্শনে, শিশুর ন্যায় সরল-হৃদয়ে তাহাকে আর এক জন ভাবিয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত আনন্দ-কৌতুহলের সহিত জলের নিকট আসিয়া একবার আনতদেহে সেই ছায়া-মূর্ত্তি দেখিতেছেন, আবার পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছেন।

As I bent down to look, just opposite
A shape within the watery gleam appeared
Bending to look on me. I started back,
It started back; but pleased I soon returned

Pleased it returned as soon with
answering looks
Of sympathy and love.

এ চিত্রের সরলতা এবং মাধুর্য্য স্বর্গীয়। এরূপ আর একটি চিত্র পাঠক তিলোত্তমা-সম্ভব-কাব্যে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু বিবিধ-পার্থিব-জ্ঞান-বিশিষ্টা তিলোত্তমায় স্বভাব-সরলতার আরোপে সে চিত্র নিতান্ত অস্বাভাবিক এবং অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের পীড়িত কল্পনা তাহা গ্রহণ করিতে পারে না।

কিন্তু রবি বাবুর এ চিত্রে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত কিছুই নাই। এ দেশে যদি এক জনও পটু চিত্রকর থাকিত, তাহা হইলে এতদিনে কবির এই ছন্দোময়ী কল্পনা পটে ভাষান্তরিত হইয়া কবি, চিত্রকর, এবং বঙ্গদেশকে কলা-জগতে চিরধন্য করিয়া রাখিত। পাঠককে মূলগ্রন্থে সেই অমৃতময়ী রচনার পরিচয় লইতে অনুরোধ করি,—নিম্নে আমরা তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

নিবিড় নির্জ্জন বনে নির্ম্মল সরসী;—
সেথা তরু-অন্তরালে
অপরাহ্ণে বেলাশেষে, ভাবিতেছিলাম
আশৈশব জীবনের কথা;
হেন কালে ঘন তরু-অন্ধকার হ'তে
ধীরে ধীরে বাহিরিয়া, কে আসি দাঁড়াল
সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাপটে;
কি অপূর্ব্ব রূপ! কোমল চরণ-তলে
ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়েছিল?
উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব্ব পর্ব্বতের
শুভ্রশিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি' বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে! নামি' ধীরে সরোবর-তীরে
কৌতুহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছায়া;
উঠিল চমকি'। ক্ষণ পরে মৃদু হাসি'

এলাইয়া দিলা কেশপাশ ; মুক্তকেশ
পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে।
অঞ্চল খসায়ে দিয়ে হেরিল আপন
অনিন্দিত বাহুখানি—পরশের রসে
কোমল কাতর—প্রেমের করুণা মাখা।
নিরখিলা নত করি' শির পরিস্ফুট
দেহ-তটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ।
দেখিলা চাহিয়া, নব গৌর তনুতলে
আরক্তিম আনন্দ আভাস ; সরোবরে
পা দুখানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন
চরণের আভা।—বিস্ময়ের নাই সীমা।
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরক-বয়স
যাপিল নয়ন মুদি',—যে দিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেই দিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবর-জলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিস্ময়ে। ক্ষণ পরে,
কি জানি কি দুঃখে, হাসি মিলাইল মুখে,
ম্লান হ'ল দুটি আঁখি ; বাঁধিয়া তুলিল
কেশপাশ ; অঞ্চলে ঢাকিল দেহখানি ;
নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে' গেল ;
সোনার সায়াহ্ন যথা ম্লান মুখ করি'
আঁধার রজনী পানে ধায় মৃদু পদে।

কিন্তু কিসের জন্য এত দুঃখ? ম্লান আঁখি কেন? এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরে আমরা চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রের রহস্য বুঝিতে পারিব।

পাঠক দেখিয়াছেন, অর্জ্জুনের প্রতি আশৈশব চিত্রাঙ্গদার কি সরল, কি প্রগাঢ়, কি উদার ভক্তি ও অনুরাগ। এ হেন ভক্তির পাত্রকে আয়ত্ত কর নিজের গুণে। তোমার ভক্তি তাহার স্নেহ আনিয়া দিক। তোমার প্রেম তাহার প্রেমকে জাগাইয়া তুলুক। এবং পরস্পরের হৃদয়াভিমুখী বৃত্তি সকল পরস্পরকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধুক। তাহা হইলেই তোমার সেই অমূল্য পবিত্র ভক্তি এবং অনুরাগ সার্থক হইবে।

কিন্তু নিজ-হৃদয়ের পরিচয় দিবার অবসর চিত্রাঙ্গদার কোথায়? অশেষ গুণশালিনী হইয়াও অবসরের অভাবে চিত্রাঙ্গদা নিজের গুণের দ্বারা অর্জ্জুনকে আয়ত্ত করিতে পারিল না, নিজের রূপের দ্বারাও নয়, তাই তাহাকে দেবতার নিকট রূপ ধার করিয়া ছলনা পূর্ব্বক অর্জ্জুনের হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এই ছলনা-অবলম্বনই চিত্রাঙ্গদার জীবনের আলোককে নির্ব্বাপিত করিয়া তাহাকে গভীর দুঃখে নিমগ্ন করিল। উদার এবং মহৎ চরিত্রের পক্ষে কপটতাই সকল দুঃখের উপর দুঃখ—সকল লজ্জার উপর লজ্জা। এবং এ কপটতা আবার কাহার নিকট—যাহার নিকট কায়-মনঃ-প্রাণ-সর্ব্বস্ব অকপটে সমর্পণ করিতে প্রাণ চায়—সমর্পণ করাতেই পরিপূর্ণ সুখ। এ সম্বন্ধে কাব্যের নায়িকার উক্তির মধ্যে আমরা একাধারে মানবহৃদয়, বিজ্ঞান, উচ্চনীতি এবং প্রকৃত কবিত্ব দেখিতে পাই,—

সময় থাকিত যদি একাকিনী আমি
তিলে তিলে হৃদয় তাহার করিতাম
অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার
সহায়তা। সঙ্গিরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সারথি, মৃগয়াতে
রহিতাম অনুচর, শিবিরের দ্বারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
পূজিতাম, ভৃত্যরূপে করিতাম সেবা,
ক্ষত্রিয়ের মহাব্রত আর্ত্তপরিত্রাণে
সখারূপে হইতাম সহায় তাঁহার।
একদিন কৌতূহলে দেখিতেন চাহি,
ভাবিতেন মনে মনে 'এ কোন বালক,
পূর্ব্বজনমের চিরদাস, এ জনমে
সঙ্গ লইয়াছে মোর সুকৃতির মত!'
ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের দ্বার,
চিরস্থান লভিতাম সেথা। জানি আমি
এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে;
যে নারী নির্ব্বাক্ ধৈর্য্যে চির মর্ম্মব্যথা
নিশীথ-নয়নজলে করয়ে পালন,
দিবালোকে ঢেকে রাখে ম্লান হাসিতলে,

আমার কামনা কভু হবে না নিষ্ফল!
আপনারে বারেক দেখাতে পারি যদি
নিশ্চয় সে দিবে ধরা!
হায় হায়
আপনার পরিচয় দেওয়া বহু ধৈর্য্যে
বহুদিনে ঘটে, চিরজীবনের কাজ,
জন্ম-জন্মান্তের ব্রত।

দৈব-প্রসাদ-লব্ধ চিত্রাঙ্গদার এই অলোক-সামান্য রূপ দেখিয়া অর্জ্জুন মুগ্ধ ও বিভ্রান্ত। এবং অবিলম্বে অরণ্যের সেই শিব-মন্দিরে চিত্রাঙ্গদার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার প্রেমপ্রার্থী হইলেন। তথায় তাঁহাদের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা পাঠে পাঠকের "কুমার-সম্ভবে"র পঞ্চম সর্গ মনে পড়িবে ;—

অর্জ্জুন। হায়, কারে করিছে কামনা
জগতের কামনার ধন!—সুদর্শনে,
উদয়-শিখর হতে অস্তাচলভূমি
ভ্রমণ করেছি আমি ; সপ্তদ্বীপ-মাঝে
যেখানে যা কিছু আছে দুর্লভ সুন্দর,
অচিন্ত্য মহান্, সকলি দেখেছি চখে ;
কি চাও, কাহারে চাও, যদি বল মোরে
মোর কাছে পাইবে বারতা।

চিত্রাঙ্গদা। ত্রিভুবনে
পরিচিত তিনি, আমি যাঁরে চাহি।

অর্জ্জুন। হেন
নর কে আছে ধরায়! কার যশোরাশি
অমর-কাঙ্ক্ষিত তব মনোরাজ্যমাঝে
করিয়াছে অধিকার দুর্লভ আসন!
কহ নাম তার—শুনিয়া কৃতার্থ হই।

চিত্রাঙ্গদা। জন্ম তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর—

অর্জ্জুন। মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে
মুখে মুখে কথায় কথায় ; ক্ষণস্থায়ী
বাষ্প যথা ঊষারে ছলনা ক'রে ঢাকে
যতক্ষণ সূর্য্য নাহি ওঠে। হে সরলে,
মিথ্যারে কোরো না উপাসনা, এ দুর্লভ

সৌন্দর্য্য সম্পদে। কহ শুনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
কোন বীর, ধরণীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলে।

চিত্রাঙ্গদা। পরকীর্ত্তি-অসহিষ্ণু কে তুমি সন্ন্যাসী?
কে না জানে কুরুবংশ এ ভুবন মাঝে
রাজবংশচূড়া?

অর্জ্জুন। কুরুবংশ!

চিত্রাঙ্গদা। সেই বংশে
কে আছে অক্ষয়যশ বীরেন্দ্রকেশরী
নাম শুনিয়াছ?

অর্জ্জুন। বল শুনি তব মুখে।

চিত্রাঙ্গদা। অর্জ্জুন, গাণ্ডীবধনু, ভুবনবিজয়ী।
সমস্ত জগৎ হতে সে অক্ষয় নাম,
করিয়া লুণ্ঠন, লুকায়ে রেখেছি যত্নে
কুমারী-হৃদয় পূর্ণ করি'। ব্রহ্মচারী,
কেন এ অধৈর্য্য তব?

অর্জ্জুন। অয়ি বরাঙ্গনে,
সে অর্জ্জুন, সে পাণ্ডব, সে গাণ্ডীবধনু,
চরণে শরণাগত সেই ভাগ্যবান্।
নাম তার, খ্যাতি তার, শৌর্য্য বীর্য্য তার,
মিথ্যা হোক্ সত্য হোক্, যে দুর্লভ লোকে
করেছ তাহারে স্থানদান, সেথা হতে
তারে তারে কোরো না বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য
হৃতস্বর্গ হতভাগ্য সম।

কিন্তু এবার চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনকে ফিরাইয়া দিল। ইহার অর্থ কি? এই প্রত্যাখ্যান বাস্তব, না কেবলমাত্র ভান? প্রশ্নের উত্তর পাঠক চিত্রাঙ্গদার মুখে শুনিবেন,—

চিত্রাঙ্গদা। হে সন্ন্যাসি তুমি পার্থ! ধিক্, পার্থ, ধিক্!
কে আমি, কি আছে মোর, কি দেখেছ তুমি,
কি জান আমারে! কার লাগি আপনারে
হতেছে বিস্মৃত! মুহূর্ত্তেকে সত্য ভঙ্গ
করি, অর্জ্জুনেরে করিতেছ অনর্জ্জুন
কার তরে? মোর তরে নহে। এই দুটি

নীলোৎপল নয়নের তরে ; এই দুটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে, সব্যসাচী
অর্জ্জুন দিয়াছে আসি ধরা, দুই হস্তে
ছিন্ন করি' সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্য্যাদা! কোথায় রহিল প'ড়ে
নারীর সম্মান! হায়, আমারে করিল
অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা
মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ
ক্ষণস্থায়ী! এতক্ষণে পারিনু জানিতে
মিথ্যা খ্যাতি, বীরত্ব তোমার!

যাও যাও ফিরে
যাও, ফিরে যাও বীর। মিথ্যারে কোরো না
উপাসনা। শৌর্য্য বীর্য্য মহত্ত্ব তোমার
দিও না মিথ্যার পদে! যাও, ফিরে যাও!

পাঠক কি ইহার অর্থ বুঝিলেন? যে অর্জ্জুনকে পাইবার নিমিত্ত এত দেব-পূজা প্রভৃতির অয়োজন, এত কঠোর তপস্যা, সে যখন পদপ্রান্তে, তখন তাহাকে এরূপে প্রত্যাখান করার কি কোন উদ্দেশ্য আছে? ইহা কি নারী-জাতির প্রবাদগত অব্যবস্থিতচিত্ততা? বা মুগ্ধ প্রেমিককে আরও দৃঢ়তর রূপে পাশবদ্ধ করিবার নিমিত্ত হৃদয়-হীনার নিষ্ঠুর ছলাকলা? যদি কোন পাঠক এইরূপ মনে করেন, তাহা হইলে তিনি চিত্রাঙ্গদা-চরিত্র কিছুই বুঝিলেন না। ইহার অর্থ আর কিছুই নয়, ইহা একটি মহৎ চরিত্রের অবস্থাবিশেষে স্বাভাবিক বিকাশ। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, দেবতার নিকট প্রার্থিত রূপ পাইয়া আনন্দিত হওয়া দূরে থাকুক, চিত্রাঙ্গদা কাঁদিয়াছিল। সে কি কখনও সেই রূপের ছলনার দ্বারা আয়ত্ত অর্জ্জুনের প্রেম সহসা গ্রহণ করিতে পারে? তাহার মহীয়সী প্রকৃতি কি এই দৈন্যে, এই হীনতায়, এই ছলনার কার্য্যে হঠাৎ সম্মতি দিতে পারে? উপায়ের অনার্য্যতা উপলব্ধি করিয়া তাহার মহৎ হৃদয় নিজেই যে ঠিক সেই কার্য্যসিদ্ধির মুখেই নিজের উদ্দেশ্যের বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা অনেক সময়ে প্রলুব্ধ হইয়া হীন উপায় অবলম্বনে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিবার আয়োজন করি। কিন্তু আমাদের প্রকৃতিতে কিঞ্চিন্মাত্র মহত্ত্ব থাকিলে যে মুহূর্ত্তে সেই উপায়-প্রয়োগের দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির উপক্রম হয়, সেই

বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়। তাহা গ্রহণ করিতে আমাদের মনও চায় না, হাত উঠে না। নিজের প্রকৃতিগত ঔদার্য্যের প্ররোচনায় চিত্রাঙ্গদার প্রথমে তাহাই ঘটিয়াছিল। সে আরও জানিত, তাহার সে রূপ নিজের জন্মলব্ধ রূপ নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা।—তাই সে যখন দেখিল, এই মিথ্যার পদে অর্জ্জুন আপনার শৌর্য্য, বীর্য্য—মহত্ব উৎসর্গ করিতেছে, তখন যে নিজের হৃদয় দিয়া অর্জ্জুনের হৃদয়কে বিচার করিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ এবং মর্ম্মাহত হইয়াছিল। সেই কারণেই এই প্রত্যাখ্যান। এবং চিত্রাঙ্গদার এই অকৃত্রিম সরলতা এবং মহত্ত্ব দেখাইবার জন্য কবি এই দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু অর্জ্জুন যখন পুনর্ব্বার তাহার নিকট আসিয়া তাহার প্রেম যাচ্ঞা করিলেন, তখন অর্জ্জুনগত-হৃদয়াকে পরাজিত হইতে হইল, এবং দুই জনে পরস্পরের প্রেম-বন্ধনে মিলিত হইলেন।

কিন্তু মিলিত হইয়াও মিলন পরিপূর্ণ হইল না। যতদিন তাহার সে দৈবরূপ বর্ত্তমান ছিল, ততদিন চিত্রাঙ্গদা তাহার নিজের প্রকৃত পরিচয় অর্জ্জুনকে দেয় নাই। অর্জ্জুনের নিকট সে কেবল পরিপূর্ণ রূপ—এবং সৌন্দর্য্য—

সে কেবল
মেঘের স্বর্ণছটা, গন্ধ কুসুমের,
তরঙ্গের গতি।

তাই অর্জ্জুনের প্রেমপিপাসা মিটে নাই, এবং তাঁহার ক্ষুব্ধ হৃদয় অপরিতৃপ্তির আকুল আর্ত্তনাদে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল—

অর্জ্জুন। তাহারে যে ভালবাসে
অভাগা সে! প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে
আকাশকুসুম। বুকে রাখিবার ধন
দাও তারে, সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দ্দিনে।

সুতরাং অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদাকে পাইয়াও পান নাই। তাঁহার হৃদয়ে চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে চিরঔৎসুক্য জাগ্রত রহিল। বিশেষতঃ, পরস্পরের নিত্য সঙ্গ-লাভে চিত্রাঙ্গদার অশেষ গুণ, চরিত্রগৌরব এবং মানসিক সৌন্দর্য্য তাঁহার চক্ষে নিত্য নববেশে উন্মেষিত হইতে লাগিল। রূপজ আকর্ষণের উপর শ্রদ্ধা প্রীতি এবং মহৎ হৃদয়ের প্রতি মহৎ হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত মর্য্যাদা, অর্জ্জুনের প্রেমকে নিবিড় হইতে নিবিড়তর করিয়া তুলিল, তাঁহার অপরিতৃপ্ত হৃদয় চিরদিনই চিত্রাঙ্গদার প্রেম-পিপাসার মধুর অথচ তীব্র পীড়নে আকুল, সে হৃদয়ে প্রেমের মৌলিক রহস্য অক্ষুণ্ণভাবে নিত্য বর্ত্তমান।

অর্জ্জুন। কোন গৃহ নাই তব প্রিয়ে, যে ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয় পরিজন?
নিত্য স্নেহ-সেবা দিয়ে যে আনন্দপুরী
রেখেছিলে সুধামগ্ন করে, যেথাকার
প্রদীপ নিবায়ে দিয়ে এসেছ চলিয়া
অরণ্যের মাঝে? আপন শৈশবস্মৃতি
যেথায় কাঁদিতে যায় হেন স্থান নাই?

চিত্রাঙ্গদা। প্রশ্ন কেন? তবে কি আনন্দ মিটে গেছে?
যা' দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়! প্রভাতে এই যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লবপ্রান্তভাগে
একটি শিশির, এর কোন নাম ধাম
আছে? এর কি শুধায় কেহ পরিচয়?
তুমি যারে ভালবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন।

অর্জ্জুন। কিছু
তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে? এক
বিন্দু স্বর্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে' পড়ে'
গেছে?

চিত্রাঙ্গদা। তাই বটে। শুধু নিমেষের তরে
দিয়েছে আপন উজ্জ্বলতা অরণ্যের
কুসুমেরে।

অর্জ্জুন। তাই সদা হারাই হারাই
করে প্রাণ, তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি
মানি। সুদুর্লভে, আরো কাছাকাছি এস!
নামধাম গোত্র গৃহ বাক্য দেহ মনে
সহস্র বন্ধন-পাশে ধরা দাও প্রিয়ে!
চারি পার্শ্ব হ'তে ঘেরি' পরশি' তোমায়,
নির্ভয় নির্ভরে করি বাস! নাম নাই?
তবে কোন্ প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে
হৃদয়-মন্দির মাঝে? গোত্র নাই? তবে
কি মৃণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব?

অর্জ্জুন। বুঝিতে পারিনে
আমি রহস্য তোমার! এতদিন আছি,

তবু যেন পাই নি সন্ধান! তুমি যেন
বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা;
তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার
অন্তরাল থেকে, আমারে করিছ দান
অমূল্য চুম্বন রত্ন, আলিঙ্গন সুধা;
নিজে কিছু চাহ না, লহ না। অঙ্গহীন
ছন্দোহীন প্রেম প্রতিক্ষণে পরিতাপ
জাগায় অন্তরে! তেজস্বিনী, পরিচয়
পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়।
তার কাছে এ সৌন্দর্য্যরাশি, মনে হয়
মৃত্তিকার মূর্ত্তি শুধু, নিপুণ-চিত্রিত
শিল্প-যবনিকা। মাঝে মাঝে মনে হয়
তোমারে তোমার রূপ ধারণ করিতে
পারিছে না আর, কাঁপিতেছে টলমল
করি'! নিত্য দীপ্ত হাসির অন্তরে
ভরা অশ্রু করিতেছে বাস, মাঝে মাঝে
ছল ছল করে' ওঠে, দেখিতে দেখিতে
ফাটিয়া পড়িবে যেন আবরণ টুটি'।
সাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়াকায়া ধরি'; তার পরে
সত্য দেখা দেয়, ভূষণ-বিহীনরূপে
আলো করি' অন্তর বাহির! সেই সত্য
কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে!
আমার সে সত্য তাই লও! শ্রান্তিহীন
সে মিলন চিরদিবসের।—

কবি এইখানে মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ অভিজ্ঞতার পরিচয়-স্বরূপ একটি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। যে সময় কণ্ঠলগ্না অথচ অসম্পূর্ণা অপরিচিতা অজ্ঞাতনাম্নী প্রণয়িনীর জন্য অর্জ্জুনের হৃদয়ে অপরিতৃপ্ত প্রেম-পিপাসা দিনে দিনে বাড়িতেছিল, সেই সময়েই সেই সুদূরবাসিনী জন-শ্রুতিমাত্র লব্ধ-সত্ত্বা রাজপুত্রী চিত্রাঙ্গদার অদ্ভুত বার্ত্তা এবং বিস্ময়কর চরিত্র অর্জ্জুনের কর্ণগোচর করাইলেন, এবং তৎসম্বন্ধে অর্জ্জুনের হৃদয়ে এক অশ্রান্ত কুতূহল জাগাইয়া তুলিলেন। তাহার গুণগ্রামে, তাহার বীরোচিত কার্য্যকলাপে

তাহার প্রজাবাৎসল্যে অর্জ্জুনের চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তাহার প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ জাগিয়া উঠিল। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জ্জুনের হৃদ্গতভাব নাট্য-নিপুণ কবি কি সুন্দর কৌশলেই ব্যক্ত করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদার কথা অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং চিত্রাঙ্গদার মুখেই শুনিতেছেন। এই প্রশ্নোত্তরের অতর্কিত ঘাত প্রতি ঘাতে উভয়ের হৃদয় এবং প্রকৃতি অজানিত ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।—

চিত্রা। কি ভাবিছ নাথ ?
অর্জ্জুন। রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা
কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে।
প্রতিদিন শুনিতেছি শতমুখ হ'তে
তারি কথা, নব নব অপূর্ব্ব কাহিনী ?
চিত্রা। কুৎসিত কুরূপ ! এমন বঙ্কিম ভুরু
নাই তার, এমন নিবিড়-কৃষ্ণ-তারা !
কঠিন সবল বাহু বিঁধিতে শিখেছে
লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতনু, হেন
সুকোমল নাগপাশে।
অর্জ্জুন। কিন্তু শুনিয়াছি,
স্নেহে নারী বীর্য্যে সে পুরুষ।
চিত্রা। ছি ছি, সেই
তার মন্দ ভাগ্য ! নারী যদি নারী হয়
শুধু, শুধু ধরণীর শোভা, শুধু আলো,
শুধু ভালবাসা, শুধু সুমধুর ছলে,
শতরূপ ভঙ্গিমা পলকে পলকে
লুটায়ে জড়ায়ে বেঁকে' বেঁধে' হেসে' কেঁদে'
সেবায় সোহাগে ছেয়ে' চেয়ে থাকে সদা,
তবে তার সার্থক জনম। কি হইবে
কর্ম্মকীর্ত্তি বীর্য্যবল শিক্ষা দীক্ষা তার !
হে পৌরব, কাল যদি দেখিতে তাহারে
এই বন-পথপার্শ্বে, এই পূর্ণাতীরে
ওই দেবালয় মাঝে—হেসে চলে' যেতে।
* * * এস, নাথ, বস। কেন আজি
এত অন্যমন ? কার কথা ভাবিতেছ ?
অর্জ্জুন। ভাবিতেছি বীরাঙ্গনা কিসের লাগিয়া
ধরেছে দুষ্কর ব্রত ? কি অভাব তার ?

চিত্রা। কি অভাব তার ? কি ছিল সে অভাগীর ?
বীর্য্য তার অভ্রভেদী দুর্গ সুদুর্গম
রেখেছিল চতুর্দ্দিকে অবরুদ্ধ করি'
রুদ্যমান রমণী-চিত্তেরে। রমণী ত
সহজেই অন্তরবাসিনী ; সঙ্গোপনে
থাকে আপনাতে ; কে তারে দেখিতে পায়,
হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভায়
প্রকাশ না পায় যদি ! কি অভাব তার !
অরুণ-লাবণ্য-লেখা-চিরনির্ব্বাপিত
উষার মতন, যে রমণী আপনার
শতস্তর তিমিরের তলে বসে' থাকে
বীর্য্যশৈলশৃঙ্গ'পরে নিত্য একাকিনী—
কি অভাব তার। থাক্, থাক্, তার কথা !
পুরুষের শ্রুতি-সুমধুর নহে, তার
ইতিহাস।

অর্জ্জুন। বল বল। শ্রবণ-লালসা
ক্রমশ বাড়িছে মোর। হৃদয় তাহার
করিতেছি অনুভব হৃদয়ের মাঝে।
যেন পান্থ আমি, প্রবেশ করেছি গিয়া
কোন্ অপরূপ দেশে অর্দ্ধ রজনীতে।
নদী গিরি বনভূমি সুপ্তিনিমগন,
শুভ্র সৌধ কিরীটিনী উদার নগরী
ছায়াসম অর্দ্ধস্ফুট দেখা যায়, শুনা
যায় সাগরগর্জ্জন ; প্রভাতপ্রকাশে
বিচিত্র বিস্ময়ে যেন ফুটিবে চৌদিক ;
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎসুকহৃদয়ে
তারি তরে। বল বল শুনি তার কথা !

চিত্রা। কি আর শুনিবে ?

* * * *

অর্জ্জুন। দেখিতে পেতেছি তারে
বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি' অবহেলে,
দক্ষিণেতে ধনুঃশর, হৃষ্ট নগরের
বিজয়লক্ষ্মীর মত, আর্ত্ত প্রজাগণে

সঙ্কীর্ণ দুয়ারে রাজার মহিমা যেথা
নত প্রবেশ করিতে, মাতৃরূপ
ধরি' সেথা, করিছেন দয়া বিতরণ।
সিংহীর মতন, চারি দিকে আপনার
বৎসগণে রয়েছেন আগুলিয়া. শত্রু
কেহ কাছে নাহি আসে ডরে। ফিরিছেন
মুক্তলজ্জা, ভয়হীনা, প্রসন্নহাসিনী,
বীর্য্যসিংহ পরে চড়ি' জগদ্ধাত্রী দয়া।

উপরে উদ্ধৃত অংশ পাঠে পাঠক দেখিবেন, এই উভয় চিত্রাঙ্গদার প্রতি অর্জ্জুনের তদানীন্তন হৃদয় প্রেমের চৌম্বুকাকর্ষণে কেমন কম্পিত—উদ্বেলিত। এবং ঠিক এই সময়েই কবি বর্ষ শেষ করিয়া চিত্রাঙ্গদাকে তাহার দেবদত্ত রূপের মিথ্যা আবরণ হইতে মুক্ত করিলেন। অর্জ্জুনও ঠিক সেই সময়ে জানিতে পারিলেন যে, যেমন সন্ধ্যা-তারা এবং প্রভাত-তারা দুটি পৃথক জ্যোতিষ্ক নয়, বস্তুতঃ এক—সেইরূপ তাঁহার অঙ্কগতা প্রণয়িণী এবং সুদূরবর্ত্তিনী কল্পনার বিষয়ীভূতা অথচ হৃদয়-সন্নিহিতা হৃদয়মথনকারিণী মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা —একই নারী।

অর্জ্জুনের নিকট চিত্রাঙ্গদার নিজের প্রকৃত পরিচয়দানেই গ্রন্থের সমাপ্তি। তাহা যে অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে এবং গম্ভীর ও করুণ সৌন্দর্য্যে পরিপ্লুত, তাহার বর্ণনা আমাদের রূঢ় ভাষায় সম্ভবপর নয়, এবং তাহা হইতে বঞ্চিত করিলে পাঠকের উপর অন্যায় আচরণ করা হয় এই আশঙ্কায় আমরা নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

চিত্রা। প্রভু, মিটিয়াছে সাধ এই সুললিত
সুগঠিত নবনী-কোমল সৌন্দর্য্যের
যত গন্ধ যত মধু ছিল, সকলি কি
করিয়াছ পান! আর কিছু বাকি আছে?
সব হয়ে গেছে শেষ?—হয় নাই প্রভু!
ভাল হোক্, মন্দ হোক্, আরো কিছু বাকি
আছে, সে আজিকে দিব।

* * * *

যে ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু
সে ফুলের মত প্রভু এত সুমধুর,
এত সুকোমল, এত সম্পূর্ণ সুন্দর!

দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য
আছে ; কত দৈন্য আছে ; আছে আজন্মের
কত অতৃপ্ত তিয়াসা ! সংসার-পথের
পান্থ, ধূলিলিপ্ত বাস, বিক্ষত চরণ ;
কোথা পাব কুসুম-লাবণ্য, দু দণ্ডের
জীবনের অকলঙ্ক শোভা ! কিন্তু আছে
অক্ষয় অমর এক রমণী-হৃদয় !

*　　*　　*　　*

হয় ত পড়িবে মনে, সেই একদিন,
সেই সরোবরতীরে, শিবালয়ে, দেখা
দিয়েছিল এক নারী, বহু আবরণে
ভারাক্রান্ত করি' তার রূপহীন তনু।
কি জানি কি বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা,
পুরুষেরে করেছিল পুরুষ-প্রথায়
আরাধনা ; প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে।
ভালই করেছ। সামান্য সে নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অনুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণ কাল।
প্রভু আমি সেই নারী। তবু আমি সেই
নারী নহি ; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
তার পরে পেয়েছিনু বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিনু
শ্রান্ত করি' বীরের হৃদয়, ছলনার
ভারে। সেও আমি নহি।

আমি চিত্রাঙ্গদা।
দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
পূজা করি, রাখিবে মাথায়, সেও আমি
নই, অবহেলা করি' পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তার
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর'
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর' সহচরী,

* * *

আজ
শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা,
রাজেন্দ্র-নন্দিনী।
অর্জ্জুন। প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।

অর্জ্জুনের শেষ কয়টি সামান্য কথা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি, এই মুহূর্ত্ত হইতে চিত্রাঙ্গদার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় গভীর প্রেম আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। যখন তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষা দুইটি হৃদয়প্লাবিনী ধারায় দুই দিকে প্রবাহিত হইতেছিল, তখন সহসা তাহাদের দুই মুখ এক হইয়া একই দিকে দ্বিগুণতর বেগে ধাবিত হইল।

এমন অনেক লোক আছেন, কথায় কথায় যাঁহাদের চোখের পাতা অশ্রুজলে আর্দ্র হয়; কিন্তু এমনও লোক আছেন, যাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইলেও চোখে অশ্রু সহসা দেখা যায় না। জানি না, অর্জ্জুনের শেষ কথাগুলিতে এমন কি রহস্য আছে যে, তাহা পাঠে শেষোক্ত প্রকৃতির লোকও অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারেন না। ইহাতে নির্দ্দোষের প্রতি অন্যায় অত্যাচার নাই—বিরহ নাই—মৃত্যু নাই, কিন্তু তবু কথা কয়টি পাঠে হৃদয় অভিভূত হয়, কণ্ঠস্বরে অস্ফুট ক্রন্দনের বেগ আসিয়া পড়ে। আনন্দ-বিষাদ-মিশ্রিত সে ক্রন্দন!—বিষাদ চিত্রাঙ্গদার বৎসরকালব্যাপী আত্মগোপনজনিত লজ্জা এবং ক্ষোভে; আনন্দ—সে মিথ্যা হইতে লজ্জা হইতে আজ তাহার মুক্তিতে।

আমরা চিত্রাঙ্গদা কাব্য পাঠকের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিলাম। এখন দ্বিজেন্দ্র বাবুর মন্তব্যসমূহের আলোচনা করা যাক্। তৎপূর্ব্বে কিন্তু তিনি কি ভাবে রবি বাবুর কাব্যের গল্পাংশ গ্রহণ করিয়াছেন, দেখিতে হইবে।—তাঁহার প্রবন্ধমধ্যে গল্পটি এই ভাবে বর্ণিত,—

"বনমধ্যে অর্জ্জুনকে দেখিয়া উপযাচিকা হইয়া চিত্রাঙ্গদা তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করেন। অর্জ্জুন অস্বীকৃত হন। তাহার পরে চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্তের কাছে রূপ ধার করেন। অর্জ্জুন তখন সম্মত হন, এবং সেই অনূঢ়া কন্যাকে বর্ষকাল ভোগ করেন।

এই আখ্যানের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া, দ্বিজেন্দ্র বাবুর প্রথম অভিযোগ, কবি অর্জ্জুনকে "জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন।" "আর চিত্রাঙ্গদা! 'বেচারী মা আমার! * * * * এক জন যে সে হিন্দুকুলবধূ "যে অবস্থায় প্রাণ দিত, কিন্তু ধর্ম্ম দিত না, সেই অবস্থা তুমি উপযাচিকা হইয়া গ্রহণ করিলে।"

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, দ্বিজেন্দ্রবাবু ধরিয়া লইয়াছেন যে, অর্জ্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার প্রথম মিলন বিনা বিবাহে নিষ্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু এইরূপ ধরিয়া লইবার কোনও কারণ কাব্যমধ্যে আছে কি? আমারা দেখাইব যে, কাব্য-পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়, এবং বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল। অর্জ্জুন যখন চিত্রাঙ্গদাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহার তখনকার শেষ কথাগুলি স্মরণ করুন,—

ব্রহ্মচারী ব্রতধারী আমি। পতিযোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন সে সময়ে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, এই কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বিবাহে সম্মত হন নাই।

পরে যখন অর্জ্জুন চিত্রাঙ্গদার দেবলব্ধ রূপে মুগ্ধ হইলেন, তখন তাহাকে পাইবার জন্য তিনি হৃদগতভাব এবং অভিলাষ কিরূপে ব্যক্ত করিলেন, দেখা যাক্।

অর্জ্জুন। পূর্ণ তুমি, সর্ব্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য্য
তুমি, এক নারী সকল কর্ম্মের তুমি
মহা অবসান, সকল ধর্ম্মের তুমি
বিশ্রাম-রূপিণী। কেন জানি অকস্মাৎ
তোমারে হেরিয়া বুঝিতে পেরেছি আমি
কি আনন্দকিরণেতে প্রথম প্রত্যূষে
অন্ধকার মহার্ণবে সৃষ্টি-শতদল
দিগ্বিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে
এক মুহূর্ত্তের মাঝে! আর সকলেরে
পলে পলে তিলে তিলে তবে জানা যায়
বহু দিনে;—তোমা পানে যেমনি চেয়েছি
অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে,
তবু পাই নাই শেষ।—কৈলাস-শিখরে
একদা মৃগয়াশ্রান্ত তৃষিত তাপিত
গিয়েছিনু দ্বিপ্রহরে কুসুমবিচিত্র
মানসের তীরে। যেমনি দেখিনু চেয়ে
সেই সুর-সরসীর সলিলের পানে
অমনি পড়িল চোখে অনন্ত অতল।

স্বচ্ছ জল, যত নিম্নে চাই। মধ্যাহ্নের
রবিরশ্মিরেখাগুলি স্বর্ণনলিনীর
সুবর্ণ মৃণাল সাথে মিশি' নেমে গেছে
অগাধ অসীমে ; কাঁপিতেছে আঁকি বাঁকি
জলের হিল্লোলে, লক্ষ কোটী অগ্নিময়ী
নাগিনীর মত। মনে হল ভগবান্
সূর্যদেব সহস্র অঙ্গুলি নির্দ্দেশিয়া
দিতেছেন দেখায়ে, জন্মশ্রান্ত কর্ম্মক্লান্ত
মর্ত্ত্যজনে, কোথা আছে সুন্দর মরণ
অনন্ত শীতল। সেই স্বচ্ছ অতলতা
দেখিছি তোমার মাঝে। চারি দিক হতে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক আলোক মাঝে
কীর্ত্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্ব্বাপন।

ইহাতে কি কামান্ধ রূপোন্মত্ত প্রেমিকের ইন্দ্রিয়বিকার বা উপভোগ-লালসা ব্যক্ত হইয়াছে? না, একনিষ্ঠ প্রেমের মধুর, পবিত্র এবং পাবন উন্মাদনা বীণাঝঙ্কারে ধ্বনিত হইতেছে? এই কয়েকটি ছত্রে প্রেমের যে উচ্চ স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সাহিত্যে দুর্লভ। ইহার তুল্যদরের কবিতা Shellyতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং তাঁহার রচিত Epipsychidion প্রমুখ অতুলনীয় কবিতাসমূহের মধ্যেই এইরূপ আত্মবিলোপী প্রেম এবং প্রেম-সর্ব্বস্ব জীবন গীত হইয়াছে।

বিবাহ যে হইয়াছিল, তাহা পাত্র এবং পাত্রীর চরিত্র-গৌরবও আমাদিগকে স্পষ্ট বলিয়া দিতেছে।

তাহা ছাড়া দ্বিজেন্দ্রবাবু কি ভুলিয়া গিয়াছেন যে, সে সময়ে গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রচলিত ছিল? এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে গান্ধর্ব্ব বিবাহই প্রশস্ত ছিল। সে বিবাহ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত পরস্পরের প্রতি আসক্তি ব্যতিরেকে অন্য কোন উপকরণের প্রয়োজন ছিল না। যখন অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা পরস্পরের প্রতি এইরূপ প্রবলভাবে আকৃষ্ট, তখন তাঁহারা বিবাহের এমন শাস্ত্রসম্মত, সহজ ও সমীচীন উপায় থাকিতে তাহা হইতে আপনাদিগকে স্বেচ্ছাক্রমে বঞ্চিত করিলেন, এ কল্পনা উৎকট—অসঙ্গত—এবং অস্বাভাবিক। স্বীকার করি,

পাত্রপাত্রী, উভয়ের চরিত্রগৌরব, কুলশীল, এবং শাস্ত্রবিধান, সমস্তই কি অভ্রান্ত-ভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে না যে, অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা পরস্পরে গান্ধর্ব্ব বিবাহে মিলিত হইয়াছিলেন? মহাভারতে এই চিত্রাঙ্গদা উপাখ্যানের অব্যবহিত পূর্ব্বে "উলূপ্যর্জ্জুনসমাগমঃ" নামক অধ্যায় আছে। সে অধ্যায়ে অর্জ্জুন এবং উলূপীর যৌন-মিলন বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কোথাও গান্ধর্ব্ব বিবাহের উল্লেখ নাই; অথচ ঐ অধ্যায়েই উলূপী সাধ্বী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং মহাভারতের পরবর্ত্তী অংশে উলূপী অর্জ্জুনের স্ত্রী বলিয়া পরিচিত। ইহাতে আমরা কি বুঝিব? আমরা কি বুঝিব না যে, অর্জ্জুন ও উলূপীর গান্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়াছিল? তাহা যদি হয়, কি কারণে এই "চিত্রাঙ্গদা" কাব্যে আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদার গান্ধর্ব্ব বিবাহ হয় নাই? এ সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহের ক্ষীণ ছায়াও কখন পড়ে নাই। আমরা বরাবরই বুঝিয়াছি, এবং উপযুক্ত পাঠকমাত্রকেই বুঝিতে হইবে যে, চিত্রাঙ্গদা ও অর্জ্জুনের মিলন বিবাহ-নিষ্পন্ন দাম্পত্য-মিলন। তাহা যদি হইল, তবে অর্জ্জুন এক জন কুমারীর ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া এক বৎসরকাল তাহাকে পশুবৎ সম্ভোগ করিলেন, দ্বিজেন্দ্র বাবুর এ অভিযোগ দাঁড়ায় কোথায়?

দ্বিজেন্দ্র বাবুর আর এক অভিযোগ চিত্রাঙ্গদা উপযাচিকা হইয়া অর্জ্জুনের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। প্রবন্ধের পূর্ব্বাংশে যে অবস্থায় এবং যে কারণপরম্পরার সংযোগে চিত্রাঙ্গদা এইরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল, আমরা তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করিয়াছি। আমরা দেখাইয়াছি যে, চিত্রাঙ্গদার এবংবিধ আচরণ স্বাভাবিক এবং অনিবার্য্য। অন্তঃপুরবাসিনীর লজ্জা-সঙ্কোচ-শিক্ষা চিত্রাঙ্গদা কখনও পায় নাই—বরং তাহার চরিত্র পুরুষের ন্যায়ই গঠিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহার সে চরিত্রে রবিবাবু যদি শুদ্ধান্ত-চারিণীর লজ্জা সঙ্কোচের আরোপ করিতেন, তাহা হইলে, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক, অসঙ্গত ও অসত্য হইত। Shakespere কল্পিত অন্তঃপুর-শিক্ষা-বঞ্চিতা Miranda চরিত্রে আমরা এইরূপ লজ্জা সঙ্কোচের অভাব দেখিতে পাই। Ferdinandএর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই Miranda পিতৃসন্নিধানে অসঙ্কোচে বলিয়া উঠিল,—

This
Is the third man that e'er I saw; the first that e'er I Sighed for:

এবং পরে সেই অপরিচিত পুরুষের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া এই বলিয়া আত্ম-

I am your wife, if you will marry me ;
If not, I'll die your mid : to be your fellow
You may deny me ; but I'll be your servant
Whether you will or not.

এ দিকে আবার দেখুন, যখন নারদ উমার সমক্ষে হিমালয়ের নিকট উমার বিবাহপ্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তখন কালিদাস উমার তদানীন্তন ভাব কিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কালিদাস দেখাইয়াছেন, উমা তখন ভান করিতেছেন, যেন বিবাহের কথা উমার কর্ণেও প্রবেশ করে নাই, তিনি যেন অন্য চিন্তায় নিমগ্না,—

"লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী।"

Shakespere যদি বনবিহঙ্গিনী mirandaকে লোকালয়বাসিনী, সামাজিক-শিক্ষাপ্রাপ্তা উমার ন্যায় ছলনা-পরা করিতেন, তাহা হইলে তাহা একেবারে অসঙ্গত হইত। আমাদের হৃদয়ও তাহা কোনও মতে গ্রহণ করিতে পারিত না, এবং উমার মুখে mirandaর স্বাভাবিক সরল লজ্জাহীন হৃদয়াভিব্যক্তি নিতান্ত অস্বাভাবিক শুনাইত।

এই উপযাচিকার ভাব, যাহা দ্বিজেন্দ্র বাবুর নৈতিক সত্তাকে এত বিচলিত করিয়াছে, তাহা ত মহাভারতের বর্ণিত যুগের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে বড়ই প্রবল ছিল। মনোগত ভাব প্রকাশে তাহাদের কোন রূপই সংযম দেখা যায় না। কোন পুরুষের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইলে তাহা তাহারা স্পষ্ট প্রকাশ করিত—রাখিয়া ঢাকিয়া বলিত না। তাহা ত হইবেই। যখন যৌন-মিলনের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ-পদ্ধতি রূপ এমন প্রশস্ত রাজপথ পড়িয়া ছিল, তখন রাখা-ঢাকার প্রয়োজন কোথা? রাখিলে ঢাকিলে যে গান্ধর্ব্ব বিবাহই ঘটে না।

দ্বিজেন্দ্র বাবু ভক্তি-শ্রদ্ধা-গদ-গদ-কণ্ঠে বলিয়াছেন, "লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম সব দেশেই নারীজাতির সম্পত্তি।"—সকল দেশের হউক না হউক—সকল কালের ত নয়-ই। এই মহাভারতের কালের নয়। "দৃষ্টান্ত চাই?" উলূপীর আখ্যান দেখুন না! অথবা নাগকন্যা উলূপীকে ছাড়িয়া দিন। দময়ন্তী ত আদর্শ নারী—সেই দময়ন্তী বিবাহের পূর্ব্বে নল রাজার সাক্ষাৎ পাইয়া—অথবা তাঁহাকে তখন নলরাজা বলিয়া না জানিয়া—সেই অপরিচিত

কস্ত্বং সর্ব্বানবদ্যাঙ্গ মম হৃচ্ছয়-বর্দ্ধন।

হে সুন্দর! আমার কাম প্রবৃত্তির উত্তেজক, কে তুমি? হায়! "নারী জাতির সম্পত্তি লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম"! হায় দ্বিজেন্দ্র বাবুর নারীনিষ্ঠা! ভাগ্যে রবি বাবু "ব্যাসদেবের ধাপে নামেন নাই।"

দ্বিজেন্দ্র বাবুর আর এক অভিযোগ এই যে, যতদিন চিত্রাঙ্গদার দেবলব্ধ রূপ বর্ত্তমান ছিল, ততদিন অর্জ্জুন এবং চিত্রাঙ্গদা পরস্পরের সম্ভোগে অন্ধ—উন্মত্ত। "দ্বিধা নাই—সঙ্কোচ নাই—ধর্ম্ম নাই—কেবল নিত্য ভোগ—ভোগ।" কিন্তু যদি স্বীকার কর, উঁহাদের বিবাহ হইয়াছিল, তাহা হইলে এই অভিযোগের সারবত্তা কোথায়? দ্বিতীয়তঃ, আমরা ত কাব্যের কোথাও দ্বিজেন্দ্র বাবুর কথিত এই নির্লজ্জ উপভোগ বা তাহার অধিকতর নির্লজ্জ বর্ণনা দেখিলাম না। বাস্তবিক, এই অভিযোগে আমরা যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়াছি। আমাদের বোধ হয়, দ্বিজেন্দ্র বাবু যখন তাঁহার এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন, তখন কাব্যখানি তাঁহার সম্মুখে ছিল না। তিনি বহু পূর্ব্বকালের পাঠের স্মৃতি বা বিস্মৃতির উপর নির্ভর করিয়াই এইরূপ লিখিয়া থাকিবেন। কাব্যপাঠে এই এক বৎসর কাল ধরিয়া আমরা চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ে নিত্যবর্দ্ধনশীল শোকেরই পরিচয় পাই। আমরা দেখিতে পাই, তাহার হৃদয়রুদ্ধ নির্ব্বাক বিষাদ সমস্ত জীবনকে তিক্ত করিয়া তুলিতেছে। চিত্রাঙ্গদার দুঃখ নহে যে, "হায়! আমি স্বয়ং যদি সুরূপা হইতাম, তাহা হইলে আরও উপভোগ করিতাম।" দ্বিজেন্দ্র বাবু যখন সমস্ত কাব্যখানি ভুল বুঝিয়াছেন, তখন যে তিনি উহাই চিত্রাঙ্গদার দুঃখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই।

চিত্রাঙ্গদার দুঃখ এই,—অর্জ্জুনের যে অপরিসীম প্রেম সে লাভ করিয়াছে, এবং উচ্ছল, উদ্বেলিত, সাগরতরঙ্গের ন্যায় যে প্রেমের অমৃতময় উচ্ছ্বাস প্রতিদিন তাহার হৃদয়ে আসিয়া পড়িতেছে, সে প্রেম তাহার রূপ-জন্যও নয়, গুণ-জন্যও নয়। অর্জ্জুন তাহাকে ভালবাসিতেছেন কিসের জন্য? যে সৌন্দর্য্য, যে রূপ তাহার নিজের নয়, যাহা তাহার ছদ্মবেশমাত্র, সেই জন্য। এই ছলনার দুর্বিষহ লজ্জা "তিরশ্চীন-মলাত-শল্যবৎ"—জ্বলন্ত-অঙ্গার-নির্ম্মিত বক্র শেলের ন্যায় চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ে আমূল প্রোথিত থাকিলেও, অম্লানবদনে তাহাকে বহিতে এবং সহিতে হইয়াছিল।

সে দেহও তাহার বিদ্বেষের কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য অর্জ্জুনের সহস্র আদর, প্রথম মিলনের উন্মাদনী স্মৃতি—সকলই চিত্রাঙ্গদার নিকট বিষাক্ত। সে সমুদায় মূলে তাহার এই দেহস্থিত মায়ালাবণ্য-সঞ্জাত বলিয়া চিত্রাঙ্গদা তাহাদিগকে নিজের সম্পত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই। সেই জন্য কাব্যের যেখানেই চিত্রাঙ্গদা এ মায়া-লাবণ্যের এবং তজ্জনিত অর্জ্জুনের প্রেমের উল্লেখ করিয়াছে, সেইখানেই তাহার কথাগুলি শ্লেষ এবং বক্রোক্তির মিশ্রণে তিক্ত-মধুর। এবং তাহাতে চিত্রাঙ্গদার হৃদয়ের তদানীন্তন অবস্থা কেমন সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে!

অন্তরের এই নিষ্ঠুর দাবদগ্ধ স্মৃতি—হৃদয়ের এই বিষদিগ্ধ ক্রূর অনুভূতি কিরূপ প্রখর এবং গভীর, পাঠককে তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য কবি সৃষ্টিকারিণী কল্পনা-বলে চিত্রাঙ্গদার সেই মায়া-লাবণ্যকে অমানুষ-বিদ্বেষ-সৃষ্ট সত্তা দিয়া রাক্ষসীর ন্যায় তাহাকে অর্জ্জুন এবং চিত্রাঙ্গদার মাঝখানে দাঁড় করাইয়াছেন।

* * * মীনকেতু,
কোন্ মহারাক্ষসীরে দিয়াছ বাঁধিয়া
অঙ্গ-সহচরী করি ছায়ার মতন—
কি অভিসম্পাত! চিরন্তন তৃষ্ণাতুর
লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আসিল চুম্বন,
সে করিল পান! সেই প্রেমদৃষ্টিপাত—
এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে অঙ্গেতে পড়ে
সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেখে যায়
বাসনার রাঙ্গা চিহ্নরেখা,—সেই দৃষ্টি
রবিরশ্মিসম চিররাত্রিতাপসিনী
কুমারীহৃদয়পদ্মপানে ছুটে এল,
সে তাহারে লইল ভুলায়ে!

* * *

বিদ্যুৎবেদনা সহ হতেছে চেতনা
অন্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতীন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে
স্বহস্তে সাজায়ে সযতনে, প্রতিদিন

বাসরশয্যায়; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি'
প্রতি ক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষু মেলি'
তাহার আদর। ওগো দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর!

এই অসহ্য লজ্জা এবং দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য চিত্রাঙ্গদা কন্দর্পকে তাহার প্রদত্ত রূপ ফিরাইয়া লইতে আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিয়াছিল, এবং সে সৌন্দর্য্য হারাইবার ফলস্বরূপ অর্জ্জুনেরও প্রেম হারাইবার বিপৎপাতকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল।

চিত্রাঙ্গদা। সেও ভাল! এই ছদ্মরূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে! সেই রূপ মোর
করিব প্রকাশ; ভাল যদি নাই লাগে,
ঘৃণা করে চলে' যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি, আমি র'ব!
সেও ভাল ইন্দ্রসখা!

কাব্যের ঠিক মর্ম্মস্থানে চিত্রাঙ্গদার এই মর্ম্মান্তিক দুঃখস্রোত গভীর আবর্ত্তে পরিণত হইয়াছে। নাটকের এই অংশে তাহার মহান হৃদয়ের গভীর বিষাদ Tragedy of a soulএ পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া কেহ কি দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতের অনুমোদনে বলিতে পারেন যে, রবি বাবু চিত্রাঙ্গদাকে নির্লজ্জা কুলটা এবং অর্জ্জুনকে জঘন্য পশু করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন? দ্বিজেন্দ্র বাবু যদি এইরূপ একটি বাস্তব চিত্র দেখিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে অধিক দুর যাইতে হইবে না। পূজাস্পদ কাশীরাম দাসের কৃত মহাভারতে, সুভদ্রাহরণের পূর্ব্বে, অর্জ্জুন এবং সুভদ্রার যে আলাপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান লইতে আমরা দ্বিজেন্দ্র বাবুকে অনুরোধ করি। সেই বর্ণনায় তিনি দেখিতে পাইবেন, যে অর্জ্জুন—যিনি "রাজপুত্র, পঞ্চ-পাণ্ডবের এক জন, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার সারথ্য করিবেন, যিনি এত জিতেন্দ্রিয় যে উর্ব্বশীরও প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন", সেই অর্জ্জুন জঘন্য পশু নয় ত কি? "বঙ্গের" উক্ত "কবিবরে"র হাতে পড়িয়া কামান্ধ অর্জ্জুন বলপূর্ব্বক কুমারীর ধর্ম্মনাশে উদ্যত! অনূঢ়া হইয়াও অর্দ্ধরাত্রে তিনি উক্ত "কবিবরে"র কল্যাণে সুপ্ত অর্জ্জুনের শয়নগৃহে অভিসার করিয়াছিলেন। ভদ্রলোকের পাঠ্য এই "সাহিত্য" পত্রে আমরা পূজ্যপাদ

কাশীরাম দাসের বিরচিত মহাভারতের সে অংশ উদ্ধৃত করিবার সাহস পাইলাম না।

দ্বিজেন্দ্র বাবু Courtshipএর উপর একেবারে খড়্গহস্ত। সমালোচ্য কাব্যে রবি বাবু Courtshipএর অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছেন, এবং ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"Courtship না হইলে প্রেম হয়?" ইহার উত্তরে আমরা মুক্তকণ্ঠে অসঙ্কোচে বলি,—না—Courtship না হইলে প্রেম হয় না—প্রেম অসম্ভব। পাঠক আমাদিগকে ভুল বুঝিবেন না—আমরা এমন বলিতেছি না যে, Courtship না হইলে বিবাহ হয় না—বিবাহ Courtship ভিন্নও হয়, প্রেম ভিন্নও হয়। কিন্তু Courtship ভিন্ন প্রেম জন্মিতে পারে না।

আমরা বাঙ্গালী—আমাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। সে বিবাহের পূর্ব্বে Courtship ঘটে না। কিন্তু বাল্যবিবাহেও দাম্পত্য প্রেম জন্মিবার আগে Courtship আবশ্যক, এবং হইয়া থাকে—তবে তাহা বিবাহের পূর্ব্বে নয়।

Courtship কথাটা ইংরাজী হইলেও পদার্থটি আর কিছুই নয়—আমরা যাহাকে পূর্ব্বরাগ বলি। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাইবার জন্য আলাপ এবং সঙ্গলাভকে স্থূলতঃ Courtship বলা যাইতে পারে।

আমাদের মধ্যে বিবাহকালে বর কন্যাকে বলিয়া থাকে,—

যদস্তি হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদস্তি হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।

কিন্তু ইহাও মন্ত্রবলে হইবার নহে, ইহারও আয়োজন চাই। কে এমন অন্ধ দুর্ভাগ্য আছে যে, আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে এই প্রেমের ভূমিকার সুন্দর এবং কবিত্বপূর্ণ আয়োজন দেখে নাই? দ্বিজেন্দ্র বাবু নীতির দোহাই দিয়া রবি বাবুর যে সকল নির্দ্দোষ ও পবিত্র গানের নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি এই পূর্ব্বরাগের মাধুরীতে পূর্ণ।

আমাদের গুরুজনভূয়িষ্ঠ একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবারের মধ্যে অপর সকলের অজানিত ভাবে নববধূর স্বামীর নিকট লাজসঙ্কুচিত ধীরপদক্ষেপে গমন—দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া অভিসারই নয় বলিলাম,—নব-বিবাহিত পাত্র পাত্রীর পরস্পরকে "চুরি করিয়া" বা অপাঙ্গে দর্শন, পূর্ব্বরাগের এ সমস্ত মধুময় লক্ষণ রবি বাবুর সেই সকল অতুলনীয় গীতগুলির মধ্যে "পঞ্চম রাগিণী"তে নিত্য গুঞ্জরিত।

আমাদের এমন আশা আছে যে, দ্বিজেন্দ্র বাবুর আপত্তি সত্ত্বেও এই নির্দ্দোষ এবং মনোমুগ্ধকর Courtship শীঘ্র সমাজ হইতে বিচ্যুত হইবে না, এবং দ্বিজেন্দ্র বাবুর নিন্দা সত্ত্বেও রবি বাবুর এই গানগুলি যতদিন বাঙ্গালা

হইবে। তা' ছাড়া গানের উপর দ্বিজেন্দ্রবাবু এত চটিলে চটিলেন কেন? দ্বিজেন্দ্র বাবু কি ভুলিয়া গিয়াছেন, "কানু বিনা গীত নাই"—আর সে গীত—

উপসংহারে জিজ্ঞাসা করি, তর্কের অনুরোধে যদিও আমরা ধরিয়া লই, Courtship আমাদের সমাজে অপ্রচলিত, তাই বলিয়া উহা অস্বাভাবিক কেন? Give a dog a bad name and hang it, নীতি-কুশলী দ্বিজেন্দ্র বাবু এই উদার নীতি অবলম্বন করিয়াছেন কি?

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যে কিন্তু এই Courtship-চিত্র বিরল নয়। রবি বাবুর বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তাঁহার রচিত ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্যে এই Courtshipএর যে মধুর চিত্র চিরকালের জন্য আঁকিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের সাহিত্যে অতুলনীয়। জর্ম্মনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি তাহার সৌন্দর্য্যে, "চাপলায় প্রণোদিতঃ" হইয়া যে অনুপম চতুষ্পদী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য-সাহিত্যাভিজ্ঞ শকুন্তলার পাঠকমাত্রই অবগত আছেন। কিন্তু বোধ হয়, কালিদাসের সমসাময়িক পণ্ডিত মহাশয় এই Courtshipএর অবতারণা সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি এবং নিন্দা দিঙ্‌নাগাচার্য্য করিয়াছিলেন।

শকুন্তলার এই Courtship চিত্রে দ্বিজেন্দ্র বাবুর আপত্তিকর আর একটি বিষয় দেখিতে পাই। চিত্রাঙ্গদা-চরিত্রে যে উপযাচিকার ভাব দ্বিজেন্দ্র বাবুর রোষের কারণ হইয়াছে, ঋষিপালিতা আশ্রমবাসিনী শকুন্তলার চরিত্রে তাহারও যেন কিছু কিছু ছায়া দেখা যায়। দুষ্মন্ত-দর্শনে মদনতাপপীড়িতা শকুন্তলা যখন তন্নিবন্ধন অসুস্থদেহা হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহার সখীদ্বয় তাঁহার জীবনরক্ষার জন্য (প্রেম এমনই সান্নিপাতিক ব্যাপার!) রাজার সহিত তাহার আশু সম্মিলনের উপায়স্বরূপ শকুন্তলাকে রাজার নিকট স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে পরামর্শ দেন, এবং রাজাকে একখানি মদনলেখ লিখিতে বলেন। পাঠককে কি বলিতে হইবে, শকুন্তলা সে হৃদয়গ্রাহী পরামর্শ সহর্ষচিত্তে এবং আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন? তখনও কিন্তু রাজা তাঁহার মনোভাব মুখে বা পত্রে ঘুণাক্ষরে ব্যক্ত করেন নাই। তবে শকুন্তলার ন্যায় তাঁহারও আকার ইঙ্গিতে আধিব্যাধির লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছিল—অন্ততঃ অভিজ্ঞ এবং ভুক্তভোগী ব্যক্তিদিগের চোখে। শকুন্তলা রাজাকে যে প্রেমপত্র লিখিলেন, তাহা এই,—

"তুজ্ঝ ণ আণে হিঅঅং মম উণ মঅণোদিবাঅ রত্তিঞ্চ।
ণিক্কিব দাবই বলিঅং তুঅহুত্তমণোরহাইং অঙ্গাইং।"

'নিষ্ঠুর! তোমার হৃদয় কিরূপ জানি না, কিন্তু তোমার সহিত সঙ্গমোৎসুক আমার এই দেহকে কন্দর্প দিবারাত্রি সন্তপ্ত করিতেছে।" এখানে দেখিতেছি, "লজ্জা, সঙ্কোচ, সম্ভ্রম নারীজাতির সম্পত্তি" নয়, পুরুষেরই সম্পত্তি। না জানি আমাদের পূর্ব্বকথিত দিঙ্‌নাগাচার্য্য মহাশয় ইহার কতই নিন্দা করিয়াছিলেন।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

কোজাগর-পূর্ণিমা।

—:০:—

আকাশ উঠেছে হাসি' জ্যোৎস্না-স্বপনে,
স্বর্ণাভ রজত-রশ্মি পড়িছে গলিয়া,
গ্রামে গ্রামে সুধামন্ত্রে উঠে শঙ্খনাদ !
শিহরে শেফালি হর্ষে, কোমল পবনে
মরমের মধু গন্ধ উঠে উছলিয়া—
দেখ দেখ দিগ্বলয়ে পূর্ণিমার চাঁদ !

পদ্মপুকুরের জল করে ঝিকিমিকি,
ছেয়ে গেছে নীল নীর কুমুদে কুমুদে !
চিত্রসম তালীবন স্তব্ধ চন্দ্রালোকে !
ঝিল্লীর নূপুর বাজে রিণিকি ঝিনিকি,
কমল প্রেমের স্বপ্ন দেখে আঁখি মুদে,
বিরহিণী চক্রবাকী ডাকি' উঠে শোকে !

অযুত রজতফুলে দুলে কাশবন,
মরি ! মরি ! কি আহ্লাদে চামর ঢুলায় ;
জোনাকীর লক্ষ দীপ জ্বলে অন্ধকারে !
ঝলে নারিকেল-কুঞ্জে চাঁদের কিরণ,
তরুচ্ছায়া-আলিম্পন চিত্রিত ধূলায়,
মুখরিত দশ দিশি পাপিয়া-ঝঙ্কারে !

ধরে না সোনার ধান ধরার আঁচলে—
হিরণ্য-হিল্লোল বহি' যায় মাঠে মাঠে !
দূরে কুহেলির স্তরে নেমে আসে ঘুম !
বাজে রাখালের বেণু বৃদ্ধ-বটতলে,
লোকযাত্রা নাহি আজ স্তব্ধ পল্লীবাটে,
বাতাসে সোনার ধান বাজে ঝুম্-ঝুম্ !

অয়ি বধূ, অয়ি শুভে, মুগ্ধে, সুলোচনা,
অয়ি গৃহকুঞ্জবন-আনন্দবল্লরী!
ক্ষেম ক্ষৌমবাস, শঙ্খ মঙ্গল-সিন্দূরে
ধরেছ লক্ষ্মীর রূপ, আজি পদ্মাসনা
আসিবেন গৃহে তব বিশ্ব আলো করি'—
তাই বৈকুণ্ঠের শোভা ফুটে মর্ত্ত্যপুরে!

লক্ষ্মীর চরণলেখা লেখা গৃহদ্বারে,
সুচিত্রিত গৃহতল শুভ্র আলিম্পনে,
ধূপ চন্দনের গন্ধে আমোদিত দিশি!
নানা নৈবেদ্যের ভার শোভে ভারে ভারে,
গন্ধপুষ্প গঙ্গাজল বিচিত্র রচনে
একাধারে শোভা সহ পুণ্য আছে মিশি'!

সাজাও সাজাও সতী, লক্ষ্মীর আসন,
সোনার ধানের শীষ রাখ পদ্ম সহ,
রাখ' রাখ' শাঁখা, মালা, আরসী, সিন্দূর,
আলতা, কড়ির ঝাঁপি, নূতন বসন;
জ্বাল' জ্বাল' ঘৃতদীপ—লহ' তুলি' লহ
গৃহের মঙ্গল-শঙ্খ অধরে মধুর!

বাজাও বাজাও শঙ্খ মেঘমন্দ্র রোলে,
মৃত্যুসুপ্ত এ শ্মশানে জাগুক চেতনা!
ফুটুক আত্মার মাঝে মহা-জাগরণ!
কাঁপুক সর্ব্বাঙ্গ-মন উৎসাহ-হিল্লোলে—
লক্ষবক্ষে অতি দৃপ্ত শক্তি-উন্মাদনা,
ঘুচুক ঘুচুক মৃত্যু-বন্ধন-ক্রন্দন!

খুলে যাক্, খুলে যাক্ বৈকুণ্ঠের দ্বার!
এস মা ত্রিলোক-লক্ষ্মী! অমৃত-মূরতি!
সন্তানের হৃদি-পদ্মে রাখ পা দু'খানি!
উঠুক অনন্ত ভরি' ওঙ্কার-ঝঙ্কার!
মন্দিরে মন্দিরে হোক তোমার আরতি;
অভয়া! অভয় দে মা, তুলি' পদ্মপাণি! *

শ্রীমুনীন্দ্রনাথ ঘোষ।

চোরের রোজনাম্‌চা।

—:০:—

বুধবার—২রা। আমি তস্কর। অতিশয় হেয়। কিন্তু আমি চোর কেন, এখনও তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই!

গত কল্য সন্ধ্যাকালে আমার মাতুলের বাড়ীতে আমি সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলাম। সপ্তাহের মধ্যে দুই তিন দিন আমি মামার বাড়ীতেই সান্ধ্যভোজন করি।—মাতুলানীর মৃত্যুর পর হইতে মাতুলের পক্ষে নিঃসঙ্গ সন্ধ্যা বড়ই কষ্টদায়ক হইয়াছে।—গত সন্ধ্যায় আমাদের ভোজ্য ছিল,—রুটী, সুপ, আমার—লুণ্ঠনের প্রত্যেক ঘটনা এখন আমার মনে পড়িতেছে!—রুটী, সুপ,—মাংসের কাট্‌লেট্,—ঠিক কাট্‌লেট্ কি? আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না!—আলুভাজা, কচি সীম ও 'রক্‌ফরে'র পনীর,—হাঁ, 'রক্‌ফরে'র পনীর;—কি আশ্চর্য্য!

ভোজন শেষ হইলে মাতুল বলিলেন, "গ্যাস্তঁ, তুমি বেশ খাইয়াছ ত?"

আমি উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে হাঁ, আমি রাক্ষসের মত খাইয়াছি।"

"ভাল, ভাল, যখন এত বেশী খাইয়া ফেলিয়াছ, তখন আমি তোমাকে একটি চুরুট খাইতে দিব। আসল হাভানা চুরুট।"

মাতুল টেবিল হইতে উঠিয়া সেই অদ্ভুত চুরুটের সন্ধানে গমন করিলেন। সেই সময়ে আমিও উঠিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলাম।

বৈঠকখানায় আমি দুই তিন মিনিট অপেক্ষা করিলাম। মাতুল তখনও ফিরিলেন না। আমি পায়চারী করিতে লাগিলাম। সহসা আলমারীর সর্ব্বোচ্চ তাকের এক কোণে একখানি অতি বৃহৎ পুস্তকে আমার দৃষ্টি পড়িল। আজ ত্রিশ বৎসর আমার জন্ম হইয়াছে, এবং আমি মাতুলের সহিত পরিচিত হইয়াছি, কিন্তু কখনও সেই পুস্তকখানির প্রতি দৃষ্টিপাতও করি নাই।

মানব-জীবনে নিত্য কত আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া থাকে। নতুবা আমার ওই পুস্তকখানি নাবাইয়া খুলিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইবে কেন?

পুস্তকখানি শিকার-কাহিনী।—"জলাভূমিতে টেরিয়ার কুকুরের ব্যবহার।"—খুব সম্ভবতঃ আমার অনুতপ্ত হৃদয়ই আমার স্মরণশক্তিকে প্রখরতর করিয়াছে। নচেৎ এই বৃহৎ পুস্তকের দীর্ঘ নামও ঠিক কিরূপে আমার স্মরণ রহিয়াছে?—এই পুস্তকের ৩৯২ পৃষ্ঠা খুলিলাম। এত পৃষ্ঠা থাকিতে

৩৯২ পৃষ্ঠাই কেন খুলিলাম ? দৈবনির্ব্বন্ধ ! এই ৩৯২ পৃষ্ঠায়—ঠিক বলিতে হইলে—৩৯২ ও ৩৯৩ পৃষ্ঠার মধ্যস্থলে আমি দেখিলাম যে, একখানি এক সহস্র টাকার নোট চারপাট করা রহিয়াছে ! ঠিক এক সহস্র টাকার নোট কেন ? অভূতপূর্ব্ব অদৃষ্ট !

আমার মনের ভিতর তখন যে কি ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহা আমিই এখন জানি না। কিন্তু সেই নীল কাগজখানি লইয়া আমি ক্ষিপ্রহস্তে আমার কোটের বামপার্শ্বের অভ্যন্তরস্থ পকেটে রাখিলাম, এবং পুস্তকখানিকে যথাস্থানে রাখিয়া দিলাম। তাহার পর স্থিরচিত্তে বৈঠকখানায় আগুনের নিকট যাইয়া বসিলাম। মাতুলের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরেই মাতুল গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার এক হস্তে লণ্ঠন—বৈঠকখানায় তখনও আলো দেওয়া হয় নাই,—এবং অপর হস্তে সেই অপরূপ চুরুটের বাক্স। আমি একটি চুরুট লইলাম। চুরুটটি ধরাইয়াই মাতুলকে বলিলাম, "মামা ! অতি সুন্দর চুরুট !"

অন্য দিনের ন্যায় গল্পগুজবে সন্ধ্যা কাটিয়া গেল। এক মুহূর্ত্তের জন্যও অপহৃত নোটটি ফিরাইয়া দিবার ইচ্ছা আমার মনে উদিত হইল না। রাত্রি দশটার সময় আমার পাপের জন্মস্থান পরিত্যাগ করিলাম। আমার কোটের বামপার্শ্বের পকেটে এক সহস্র টাকার নোট চারপাট করাই রহিল !

নিজগৃহে ফিরিয়া সেই অপহৃত কাগজের টুকরাটি স্পর্শ করিতেও আমার সাহস হইল না। ভয় হইল, উহা আমার হস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। সুতরাং কাগজখানি আমার পকেটেই পড়িয়া রহিল। আমি শয়ন করিলাম। নিদ্রা দুঃস্বপ্নপূর্ণ ! অনুতাপ !

অদ্য আমার হৃদয় বিষম ভারাক্রান্ত ! এক সহস্র টাকার ভার ! কি দুর্ব্বিষহ !

আমি তস্কর। সকলের ঘৃণার্হ।

বৃহস্পতিবার—৩রা। কিছুক্ষণ হইল, মনের ভারটা একটু লঘু হইয়াছে। এক সহস্র টাকার ভার ! এক্ষণে কেবল নয় শত আটানব্বই টাকা আট আনা। কারণ,—

প্রাতরাশের পরেই ময়দানে হাওয়া খাইতে গিয়া মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি পালাইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু মাতুল ধরিয়া ফেলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছ ?" আমি অস্থিরভাবে বলিলাম, "বিশেষ কোথাও নহে।"

"তবে আমার সহিত আইস।"

ঠিক এই সময়ে খুব বৃষ্টি আসিল। আমরা একখানি ঠিকা গাড়ীতে চড়িলাম। যথাস্থানে—কোথায় তাহা জানিবার আবশ্যক কি?—পঁহুছিয়া মাতুল ভাড়া দিতে চাহিলেন।—আমরা দুই জনে কোথাও যাইলে মাতুলই ভাড়া দিয়া থাকেন। ঈশ্বর তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ দিয়াছেন।—তৎক্ষণাৎ আমার মনে হইল যে, আমি আমার মাতুলের—আমার সহৃদয় মাতুলের—এক সহস্র টাকার নোট চুরি করিয়াছি। আমি এই সামান্য গাড়ী ভাড়াটা নিজেই দিব।

গাড়োয়ানকে আমি এক টাকা আট আনা দিলাম। মাতুল অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! তুমি আজ ভাড়া দিলে? গুপ্তধন পাইয়াছ না কি?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "না, মামা না, তাসখেলায় জিতিয়াছি। বুঝিলেন?"

মাতুল অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। আমিও কতকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিতে লাগিলাম। এক টাকা আট আনার ভার কমিয়া গেল। যদিও যৎকিঞ্চিৎ!

শুক্রবার—৪ঠা। অপেক্ষাকৃত ভাল। আমার অপরাধের ভার কমিয়া আসিতেছে। এক্ষণে কেবল নয় শত পঞ্চান্ন টাকা বারো আনা।

প্রাতে পুনরায় মাতুলের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তখন বেলা সাড়ে এগারটা।

"মামা! আপনি আজ কোথায় প্রাতরাশ করিবেন?"

"ভোজনাগারে; গ্যাস্ত! তুমি আমার সঙ্গে যাইবে?"

"নিশ্চয়, কিন্তু আজ আমি আপনাকে খাওয়াইব।"

মাতুল বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন! বলিলেন, "তুমি কি আবার তাসখেলায় জিতিয়াছ? তোমার অদৃষ্ট ত খুব প্রসন্ন!"

সুতরাং আমি প্রিয় মাতুলকে আজ খাওয়াইলাম। বিয়াল্লিশ টাকা বারো আনা খরচ হইল। যাহা হউক, এক সহস্র টাকা চুরি করিয়া পরে বিয়াল্লিশ টাকা মাতুলের জন্য খরচ করা ত সামান্য কথা!

শনিবার—৫ই। বেলা আট ঘটিকায় শয্যাত্যাগ করিয়া সেই নীল কাগজখানিকে পকেট হইতে বাহির করিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু সাহস হইল না। ইহা নিশ্চিত যে, আমি উহাকে যথাস্থানে পুনরায় প্রত্যর্পণ করিতে পারিব

না। আমার দোষ স্পষ্টভাবে স্বীকার করা ত আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আমার হৃদয় সর্ব্বদা অনুতপ্ত। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে নয়।

মাতুল পাইপে ধূমপান করিতে ভালবাসিতেন। সেদিন দোকানে একটি মনোহর পাইপ দেখিয়া আসিয়াছি। মূল্য পঁচাত্তর টাকা। এমন কিছু মহার্ঘ্য নহে। আমি সেটি তাঁহাকে উপহার দিব। তিনি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইবেন, এবং আমার মনের ভারও আট শত আশী টাকা বারো আনায় পরিণত হইবে।

রবিবার—৬ই। মাতুলের গৃহে আজ মধ্যাহ্ন-ভোজন করিলাম। মাতুল আমাকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। সেই পাইপ তাহার কারণ। বলিলেন, "তাসখেলায় এত লাভ করিয়াছ যে, আমায় এরূপ দুর্ল্লভ উপহার দিতেছ?"

আমি বিনীতভাবে বলিলাম, "মাতুল! আপনি ত আমার প্রতি চিরদিনই সদয়। আমার সুদিন আপনিও উপভোগ করুন।"

কিন্তু অনুতাপ দূর হইতেছে না। শীতঋতু আগতপ্রায়। মাতুলকে একটি উপযুক্ত ছাতা উপহার দিলে হয় না? খুব ভাল ছাতাই দিতে হইবে। অবশ্য, দণ্ডটি রৌপ্যের হইবে।

সোমবার—৭ই। ভার কমিয়া আসিতেছে। ছাতাটির মূল্য তেত্রিশ টাকা।

মঙ্গলবার—৮ই। অপরাধ ক্রমশঃ অপনেয়। মাতুলকে স্বর্ণমণ্ডিত আর্শী চিরুণী উপহার দিয়াছি। বক্রী—দুই শত সাতাশ টাকা।

বুধবার—৯ই। আমি প্রায় নিষ্কণ্টক। আমার অনুতাপ ক্রমশঃ অদৃশ্য হইতেছে। মাতুলকে একটি উত্তম দূরবীন দিয়াছি। মূল্য পঁয়ষট্টি টাকা।

মাতুল আমায় সাবধান করিয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন, "তুমি তাসখেলায় বড়ই লাভ করিতেছ, দেখিতেছি। কিন্তু সাবধান! সহসা অদৃষ্ট বাম হইতে পারে।"

বৃহস্পতিবার—১০ই। প্রায়শ্চিত্ত—বাইশ টাকা। (মাতুলের জন্য রসিয়ান্ চর্ম্মের রাইটিং কেস্।)

শুক্রবার—১১ই। ঐ—পঁচাত্তর টাকা—মাতুলকে—চীনামাটীর বাসন উপহার দিয়াছি।

শনিবার—১২ই। ঐ—বিশ টাকা। (মাতুলের সহিত থিয়েটারে গিয়াছিলাম।)

রবিবার—১৩ই। ঐ—চল্লিশ টাকা। (দামী ফুলা এক জোড়া) মাতুল

"তোমাকে আর কি ধন্যবাদ দিব? খেলায় যদি কোনরূপ দাবী আসে, আমায় জানাইও। তোমায় ভাবিতে হইবে না।"

হায় মাতুল! আপনি ত আমার অনুতাপ-দগ্ধ হৃদয়ের প্রায়শ্চিত্তের কাহিনী জানেন না!

কিন্তু আমার শ্বাসপ্রক্রিয়ার কষ্টের লাঘব হইয়াছে। কেবলমাত্র পাঁচ টাকা এখনও—

সোমবার—১৪ই। প্রায়শ্চিত্ত ও ঋণপরিশোধ—মাতুলকে তাঁহার একখানি বড় ফটো করাইয়া দিয়াছি।

আজ মুক্তি। এখনও যদি মাতুল না সন্তুষ্ট হন, তবেই বিষম বিপদ। কিন্তু আমার হৃদয় ভারশূন্য। আর আমি অপরাধী নহি। সত্য বটে, এখনও কয়েক আনা অবশিষ্ট রহিয়াছে, কিন্তু বোধ হয় আমি তাহা নির্ভাবনায় রাখিতে পারি। উঃ! কি অনুতাপ ও মনঃকষ্টই ভোগ করিয়াছি!

মঙ্গলবার—১৫ই। গত কল্য মাতুলালয়ে সান্ধ্যভোজন করিয়াছি। মাতুল তাসখেলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। আমি বলিলাম, "কাল হইতে বড় সুবিধা দেখিতেছি না।" আমি আর কি উত্তর করিব? মাতুল প্রত্যহ আমার উপহারের প্রতীক্ষা করেন। কিন্তু আমি সমুদায় (অবশ্য কয়েক আনা ব্যতিরেকে) পরিশোধ করিয়াছি। সুতরাং আর কেন উপহার দিব? মাতুল বলিলেন, "দেখিলে ত, এক্ষণে অদৃষ্টের গতি অন্যরূপ।"

বুধবার—১৬ই। হা অদৃষ্ট! সত্যই তাহার গতি অন্যরূপ!

অদ্য প্রাতে পোষাক পরিবার সময় আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমি মাতুলের হাজার টাকা অপহরণ করিয়াছিলাম। কিন্তু মাতুলকে আমি সেই মূল্যের বস্তু উপহার দিয়াছি। সুতরাং সেই "জলাভূমিতে টেরিয়ার কুকুরের ব্যবহার" নামক পুস্তকের মধ্যস্থিত নীলবর্ণের কাগজখানি এখন আমারই।

আমি তৎক্ষণাৎ কোট বাহির করিলাম। কোটের অভ্যন্তরস্থ বামপার্শ্বের পকেট হইতে সেই নীল কাগজখানিও বাহির করিলাম,—একখানি ঘোড়-দৌড়ের বিজ্ঞাপন! বহু পুরাতন, অনাবশ্যক, তুচ্ছ কাগজ! অদৃষ্টের বিড়ম্বনা!

মূর্খ আমি! সন্ধ্যার অন্ধকারে মাতুলের বৈঠকখানায় সেই কাগজখানিকে ঠিক নোট মনে করিয়াছিলাম। আমি অনুতাপে দগ্ধ হইয়াছি! এক্ষণে

বৃহস্পতিবার—১৭ই। মাতুলকে একখানি পত্র লিখিয়াছি,—

"প্রিয় মাতুল,—কাল খেলায় অনেক হারিয়াছি। আপনার প্রতিজ্ঞা আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। যদি আপনি আমায় এক হাজার টাকা পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি যারপরনাই উপকৃত হইব। অগ্রেই আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।—স্নেহের গ্যাস্ত।

পুঃ—যদি দুই সহস্র পাঠাইতে পারেন, তাহা হইলে অধিকতর উপকৃত হইব।" *

শ্রীশিশিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রামায়ণের সমাজ।

শাস্ত্রানুশাসন।

রামায়ণে স্মৃতিশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। সেই ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারেই তৎকালীন সমাজ পরিচালিত হইত। ঐ স্মৃতিশাস্ত্র কাহার রচিত, রামায়ণে তাহার উল্লেখ নাই। অনেকেরই মত, মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র রামায়ণের পরবর্ত্তী সময়ে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই মত সমীচীন। রামায়ণে যে ধর্ম্মশাস্ত্র স্মৃতিনামে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা তৎকালীন সমাজের স্মৃতিতেই বিরাজিত ছিল। এবং সেই জন্যই ধর্ম্মশাস্ত্র স্মৃতি-নামে পরিচিত। পরবর্ত্তী কালে তাহা সংগৃহীত হইয়াছিল, এবং গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়া সংহিতা নামে পরিচিত হইয়াছে।

পাপের পরিহার ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠাই সমাজ-অনুমোদিত ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সুতরাং সমাজে পাপ বা পঙ্কিলতা প্রবেশ করিলেই ধর্ম্মানুশাসন রচিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা যায়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশাসনগুলির আলোচনা করিলে, সমাজে প্রচলিত নীতির পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজে প্রচলিত কার্য্যসমূহের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াই সমাজের নেতৃগণ এই সকল অনুশাসনের রচনা করিতেন। রামায়ণের সমাজে কিরূপ নীতির প্রতিষ্ঠা ছিল, রামায়ণ হইতে তাহার আলোচনা করা যাউক।

ভরত মাতুলালয় হইতে আগমন করিয়া যখন শুনিলেন যে, রাম বনে গিয়াছেন, তখন তিনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

কচ্চিন্ন ব্রাহ্মণধনং হৃতং রামেণ কস্যচিৎ।
কচ্চিন্নাঢ্যো দরিদ্রো বা তেনাপাপো বিহিংসিতঃ ॥ ৪৪
কচ্চিন্ন পরদারান্ বা রাজপুত্রোঽভিমন্যতে।
কস্মাৎ স দণ্ডকারণ্যে ভ্রাতা রামো বিবাসিতঃ ॥ ৪৫

অযোধ্যা ; ৭২ম সর্গ।

ভরতের এই উক্তি হইতে তৎকালীন ব্যবস্থা-শাস্ত্রের কয়েকটি দণ্ড-ব্যবস্থা আমরা জানিতে পারি।

ইহা হইতে অনুমান করা যায়, তখন ব্রাহ্মণের ধনাপহরণ, নিষ্পাপ, ধনাঢ্য অথবা দরিদ্রের হিংসা, পরস্ত্রী-গমন প্রভৃতি অপরাধের জন্য নির্ব্বাসন দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

অতঃপর ভরতের সহিত রাম-জননী কৌশল্যার সাক্ষাৎ হইলে, ভরত রাম-বনবাস যে তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে, তাহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তৎকাল-নিষিদ্ধ বিবিধ অবৈধ কার্য্যের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—আর্য্যে! রাম যদি আমার জ্ঞাতসারে বনে প্রেরিত হইয়া থাকেন, তবে এই সকল অধর্ম্ম ও পাপ যেন আমাকে স্পর্শ করে। নিম্নে ভরত-কথিত এই সকল অধর্ম্ম ও অবৈধ কার্য্যের উল্লেখ করা গেল।

পাদ দ্বারা শয়ানা গাভীকে তাড়না, পাপী ব্যক্তির কার্য্যস্বীকার, সূর্য্যাভিমুখে মলমূত্রত্যাগ, কর্ম্মান্তে ভৃত্যকে বেতন না দেওয়া, পুত্রবৎ পালনকারী রাজার বিদ্রোহাচরণ, ষষ্ঠাংশ কর লইয়াও প্রজাপালন না করা, যজ্ঞের প্রতিশ্রুত দক্ষিণা প্রদান না করা, গুরুর উপদেশ ভুলিয়া যাওয়া, বৃথা ছাগমাংস, পায়স ও কৃশর ভক্ষণ, গুরুজনের অবজ্ঞা, পদ দ্বারা গো-শরীর-স্পর্শ, গুরুনিন্দা, মিত্রদ্রোহিতা, পরনিন্দা-কথন, প্রত্যুপকার না করা, সকল প্রাণীর বিদ্বেষ-ভাজন হওয়া, দারা, পুত্র ও ভৃত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়াও নিজে উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করা, অনুরূপা স্ত্রী-লাভে বঞ্চিত হওয়া, ধর্ম্মকর্ম্মে অক্ষম হওয়া, পুত্রহীন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, পত্নীগর্ভ-সম্ভূত পুত্রের মুখ দর্শন করিতে না পারা, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, লাক্ষা, মধু, মাংস লৌহ ও বিষ বিক্রয় করিয়া পোষ্য প্রতিপালন করা, রাজমন্ত্রী বালক ও

বৃদ্ধদিগকে হত্যা করা, অনুগত ভৃত্যকে পরিত্যাগ করা, যুদ্ধে পলায়নকালে নিহত হওয়া, ছিন্নবস্ত্র-পরিহিত ও নরকপালধারী হইয়া ভিক্ষা করা, সর্ব্বদা মদ্য, স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত থাকা, কাম ও ক্রোধে অভিভূত হওয়া, অপাত্রে দান করা, স্বধর্ম্মে আসক্তি-হীনতা, প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে শয্যায় শয়ন করা, গৃহ দগ্ধ করা, গুরুপত্নী-গমন, দেবতা ও পিতৃগণের প্রতি অভক্তি, পিতামাতার শুশ্রূষা না করা, মাতৃ-শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মান্তরে লিপ্ত থাকা, দীনভাবাপন্ন যাচকের আশা বিফল করা, ছলপূর্ব্বক রতিকার্য্য সমাধান, ঋতুস্নাতা ও ঋতু-রক্ষার্থ অনুরোধ-কারিণী সতী স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষা না করা, ব্রাহ্মণের বংশহীনতা, বালবৎসা গাভীর দোহন, ব্রাহ্মণের নিমিত্ত কল্পিত পূজার বিঘ্নকারী হওয়া, ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরস্ত্রী-সেবা, বিষ-মিশ্রিত জল ও অন্ন প্রদান করা, পানীয় সত্ত্বেও তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিকে বঞ্চনা করা, আরাধ্য দেবতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাহার গুণকীর্ত্তন করিয়া পরস্পর কলহ করা, বিবাদ-ভঞ্জনে সমর্থ ব্যক্তির বিবাদ ভঞ্জন না করিয়া তাহা দর্শন করা, দরিদ্রের বহুভৃত্য-শালী হওয়া,—ইত্যাদি।

অতি প্রাচীন কালে, যখন প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহের জন্য মুদ্রা প্রচলিত ছিল না, তখন আর্য্যগণ গোধন দ্বারা বিনিময় কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ইউরোপীয় সভ্যতার লীলাভূমি রোম প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যদেশেও গো অর্থের প্রয়োজন সিদ্ধ করিত। ক্রমে সেই সকল দেশে গো-শব্দই মুদ্রায় পরিণত হইয়াছে। (১) রামায়ণী যুগে আর্য্যসমাজে মুদ্রা প্রচলিত ছিল; কিন্তু তখনও মুদ্রার ন্যায় ধেনুও ব্যবহৃত হইত। অতিথি-সৎকারে অর্ঘ্য, উদক ও মুদ্রার সহিত গো উপঢৌকন প্রদত্ত হইত। (২) ব্রাহ্মণকে অর্ঘ্যদানের সহিত কোটী

---

(১) গো প্রভৃতি পশু লাটিন ভাষায় Pecudes বাচ্যে অভিহিত হইত। Pecudesই মুদ্রার প্রয়োজন পূরণ করিত। Pecudes ক্রমে ইংরাজী Pecuniary শব্দে পরিণত হইয়া গরুর অভাবে money অর্থে প্রযোজ্য হইয়াছে। এখন Pecuniary 'গাভী-সম্বন্ধীয়' অর্থের দ্যোতন না করিয়া 'মুদ্রা-সম্বন্ধীয়' অর্থই প্রকাশ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের কোনও কোনও স্থলে এখনও অর্থের পরিবর্ত্তে গো বিনিময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সাঁওতাল পরগণায় গো-বিনিময়ে বিবাহাদি হয়, পাঁচ সাতটি গাভীর বিনিময়ে বিবাহ সম্পাদিত হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধে গোদান অর্থের অপ্রাচুর্য্য হেতুই ব্যবস্থিত হইয়াছিল। এখন গোদান-গ্রহণ ভারতীয় সমাজের কোনও কোনও অংশে হেয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

(২) অতিথিকে গো-উপহারে অভ্যর্থনা করা হইত। অনেক পাশ্চাত্য ও এতদ্দেশীয় পণ্ডিত এই প্রসঙ্গে অনেক অলীক কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা ভরদ্বাজ-আশ্রমে

কোটী গো দান করা হইত। সুতরাং গোজাতি সমাজে অত্যধিক সম্মান লাভ করিবে, ইহা বিচিত্র কি ? প্রাচীন সমাজনেতা মহর্ষিগণ এই জন্যই গো-রক্ষার্থ বিবিধ ব্যবস্থার বিধান করিয়াছিলেন। পাদ দ্বারা শয়ানা গাভীকে তাড়না করা, পাদ দ্বারা গো-শরীর স্পর্শ করা, বালবৎসা গাভী দোহন করা প্রভৃতিও এই জন্য পাপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই ব্যবস্থা গোকুল-রক্ষার ও তাহার সম্মানবৃদ্ধির উপায়মাত্র। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজেও এই ব্যবস্থা সম্মানিত হইয়া থাকে।

পাপীকে সমাজের সংস্পর্শে আনিলে সমাজ কলঙ্কিত হইতে পারে। তাই পাপীর দাসত্ব সমাজ-বিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকিবে।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে ব্যবহার-বৈষম্য লক্ষিত হইলে সে পরিবার অচিরাৎ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয় ; সমাজ তাই পরিবার-পরিচালককে আত্মসুখ অন্বেষণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ভৃত্য যে অন্ন আহার করিবে, আপনাকেও সেই অন্নে তৃপ্তিলাভ করিতে হইবে, এই ব্যবস্থা সমাজ-রক্ষারই উপায়মাত্র। এখন এই উদার ব্যবস্থা পদ-দলিত হইতেছে।

মধু, মাংস, লাক্ষা, লৌহ ও বিষের বিক্রেতা সমাজে নিন্দনীয় ছিল। মধু (মদ্য), মাংস ও বিষের বিক্রেতা এখনও সমাজে পতিত। এই তিন পদার্থ অতি প্রাচীনকাল হইতে সমাজে নিন্দনীয় হইয়া আসিতেছে। লৌহ ও লাক্ষা সমাজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। অথচ, ইহাদের বিক্রেতারা সমাজে হেয় হইয়াছিল। ইহার কারণ কি ?

প্রাচীনকালেও ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার আরাধনা প্রচলিত ছিল ! কেহ গৃহদেবতার, কেহ বনদেবতার, কেহ সূর্য্যের, কেহ অগ্নির, কেহ রুদ্রের, কেহ ব্রহ্মের পূজা করিতেন। এবং সম্ভবতঃ স্ব স্ব আরাধ্য দেবতার

উপনীত হইলে মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহাদিগকে অর্ঘ্য, উদক ও গো উপঢৌকন দিয়া অর্চ্চনা করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থলে কেহ 'বৃষ প্রদান করিয়াছিলেন' ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ অন্য অর্থেরও কল্পনা করিয়াছেন। এই বিসংবাদ-নিষ্পত্তির জন্য আমরা এ স্থলে মূল উদ্ধৃত করিলাম।—

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রস্য ধীমতঃ।
উপানয়ত ধর্ম্মাত্মা গামর্ঘ্যমুদকং ততঃ ॥ ১৭
নানাবিধানন্ন-রসান্ বন্যমূলফলাশ্রয়ান্।
তেভ্যো দদৌ তপ্ততপা বাসঞ্চৈবাভ্যকল্পয়ৎ ॥ ১৮

—অযোধ্যা, ৫৪।

শ্রেষ্ঠতা কীর্ত্তন করিতে যাইয়া অন্যের উপাস্য দেবতার নিন্দা করিতেন, এবং তাহার ফলে পরিশেষে ঘোর আত্মকলহের সৃষ্টি হইত। সমাজে এইরূপ কলহ ও দেব-নিন্দার সৃষ্টি দেখিয়াই সমাজপণ্ডিতগণ তাহা নিবারণের জন্য অনুশাসনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহা হইতেই ভরত-কথিত "আরাধ্য দেবতার প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হইয়া তাহার গুণকীর্ত্তন করিয়া পরস্পর কলহ করা" দূষণীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। "দরিদ্রের বহুভৃত্য-শালিত্ব" যে দোষ, তাহা অর্থনীতিরও অনুমোদিত। ভরত-কথিত এই সকল অবৈধ কার্য্যগুলির আলোচনা করিলে ইহাই বুঝা যায় যে, সমাজের রক্ষা ও তাহা উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এই সকল বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

জীব-বস্তু।

২

জীবাণুও জড়াণুর বিকার বলিয়া এক্ষণে স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অণুর কেন্দ্র-বিন্দুকে আশ্রয় করিয়া যে সকল পরমাণু নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে, তাহাদিগের সংখ্যা, অবস্থান ও বেগের উপর অণুর বিশেষত্ব নির্ভর করে; তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। সম্ভবতঃ তাহা হইতেই বিভাগ ও পুষ্টি, এই দুইটি ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়া জড়াণুকে জীবাণুতে পরিণত করে। জড়াণু যে জীবাণুতে নিয়তই পরিণত হইতেছে, ইহা ত এক্রূপ প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ। উদ্ভিদ্‌গণ মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে জড়াণু গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে জীবাণুতে পরিণত করিয়া নিজ-দেহের সহিত মিলাইয়া লয়; তাহাতেই তাহাদিগের দেহ-পোষণ হয়। জন্তুগণের এই শক্তি লুপ্ত হইয়াছে; কিন্তু উদ্ভিদের ব্যবহার-দৃষ্টে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, জড়াণু জীবাণুতে পরিণত হয়। আর যখন জীবদেহের পচন-ক্রিয়া স্মরণ করা যায়, তখন ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, জীবাণু জড়াণুতে পরিণত হয়। ইহাও আমরা নিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি।

তার পর, আর এক কথা। জীবাণু নিত্য হইলে এইরূপে তাহার ধ্বংস হইত না। যাহা নিত্য, তাহার উৎপত্তিও নাই, নাশও নাই। জীবাণু যখন

তখন তাহা নিত্য নহে, জন্য। যাহা নষ্ট হয়, তাহা জন্য; এ বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না।

দেহের যে বিশেষত্বের উপর জীবন-ব্যাপার নির্ভর করিতেছে, তাহা জড়-সংঘাতে সর্ব্বদাই প্রতিহত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত অঙ্গারিকাম্ল নিশ্বাস ত্যাগ করিলে জীবন-ব্যাপার স্তম্ভিত হয়, পরে বিনষ্টও হইতে পারে। গুরুতর আঘাতে অণুসংস্থান কম্পিত করিয়া দিলেও জীবনের ক্রিয়া রুদ্ধ অথবা চির-তরে নষ্ট হইয়া যায়। এ সকল হইতেও অনুমিত হইতে পারে যে, জীব-লক্ষণ নিত্য নহে, জন্য। কোনও কোনও উদ্ভিদের বীজকে অত্যন্ত অধিক তাপযোগে এরূপ বিশ্লিষ্ট অথবা স্তম্ভিত করা যায় যে, উহার জীবনী-শক্তি কিছুই থাকে না। কিন্তু দীর্ঘকাল এই অবস্থায় থাকার পর উহার অণু পরমাণু সকল পুনরায় এরূপ ভাবে সজ্জিত হয় যে, তখন উহাতে জীবনের লক্ষণ পুনরাবৃত্ত হইয়া থাকে। তাপ ঐ বীজের কি করিয়াছিল? অণু-পরমাণুর অবস্থান পরিবর্ত্তিত করা ভিন্ন আর কিছুই ত বুঝা যায় না। সুতরাং স্তম্ভিত জীবন-ব্যাপার পুনরাবৃত্ত হইবার পূর্ব্ব সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত হইতেছে, ইহা স্বীকার করা সঙ্গত বোধ হয়।

জীবদেহ জড় হইতে উৎপন্ন হইবার সন্তোষজনক প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই। কিন্তু জীবাণু যে জড়াণু হইতে বিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা ক্রমেই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে। জীবদেহও জড় হইতে উৎপন্ন, ইহাও কালসহকারে প্রমাণিত হইবে, এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ উপস্থিত হইয়াছে। যাহা হউক, সে সকল বিষয়ে এক্ষণে চিন্তা করা অনাবশ্যক। এ স্থলে ইহা স্মরণ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জড়াণুও বিভক্ত হয়, জীবাণুও বিভক্ত হয়; জড়াণুও অন্য জড়াণুকে আকৃষ্ট করিয়া তাহার সহিত মিলিত হয়, জীবাণুও তদ্রূপই করে। কিন্তু উভয়ের ফল বিভিন্নপ্রকার, এইমাত্র। একের ফল বিভাগমাত্র, অপরের ফল বংশবৃদ্ধি। কারণ, প্রাথমিক জীব কোষবিভাগ দ্বারাই বংশবৃদ্ধি করিত। একের ফল মিশ্রণ, অপরের ফল পুষ্টি; কারণ, জীবগণ আহার গ্রহণ করিয়া দেহ-পোষণ করে। উভয় স্থলেই ক্রিয়া এক-শ্রেণীরই, কিন্তু ফল ভিন্নপ্রকার।

এইরূপে জীবাণু জাত হইয়াছিল, এবং বোধ হয়, এখনও হইতেছে। কিন্তু প্রাচীনকালে যে শ্রেণীর জীবাণু উৎপন্ন হইয়াছে, এখন বোধ হয় তদ্রূপ হইতে পারে না। যাহা হউক, এই জীবাণু সকল একত্রিত ও বিশেষভাবে সম্বদ্ধ হওয়ায় ক্রমে জীব-বস্তুর বিবিধ বিকার উপস্থিত হইয়াছে। ইহাই

বিবর্ত্তনবাদের ভিত্তি। বিবিধ জীবাণু একত্র জলীয় পদার্থে ভাসমান থাকিয়া ক্রমে বহিরাবরণের দ্বারা বেষ্টিত হয়; তাহাতেই জীবকোষের উৎপত্তি। প্রাথমিক অবস্থায় ইহার অভ্যন্তরস্থ জীব-বস্তু প্রায় সমভাবাপন্নই থাকে; কেবল একটি বিশেষ স্থানে এক গোলাকার বৃত্তের ন্যায় ক্ষুদ্র একটি অণু-পুঞ্জ গঠিত হয়। ইহাকে কেন্দ্রবিন্দু (১) বলে। কিন্তু ইহা কেন্দ্রস্থলে না থাকিতেও পারে। ইহার মধ্যে তদ্রূপ আরও ক্ষুদ্র একটি বিন্দু উৎপন্ন হয়। ইহাকে মধ্যবিন্দু (২) বলে। কোষের অন্য স্থানে ক্রমে জীববস্তু আরও বিবর্ত্তিত হইয়া মধ্যবিন্দু অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহদাকার কতিপয় বিন্দু গঠিত করে। ইহাদিগকে প্লস্তিদ (৩) বলা যাইতে পারে। এইরূপে জীববস্তু ক্রমে ঘনীভূত ও বিবর্ত্তিত হইতে হইতে মধ্যসোম, (৪) ক্ষুদ্রসোম, (৫) সিটোপ্লাসোম (৬) প্রভৃতি জাত হয়। তখন সমভাবাপন্ন জৈবকোষ ক্রমে অসমভাবাপন্ন হইয়া উঠে। কিন্তু ইহার বহিরাবরণ পূর্ব্বের ন্যায়ই কোষের সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দেয়।

এই সকল বিন্দু ও সোমের মধ্যে কেন্দ্রবিন্দু ও মধ্যসোম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রবিন্দুই জীবের বংশপরম্পরাগত ধর্ম্ম বহন করিয়া জীবের বিশেষত্ব ও বংশানুক্রম স্থির রাখিয়াছে। অপত্য-গঠনে ইহারই বিশেষ কার্য্যকারিতা। ইহার মধ্যে সূক্ষ্ম আঁসবৎ রঞ্জনশীল (৭) সূত্র আছে। বিন্দু বিন্দু জীবাণু সকল একত্রিত হইয়া মালার ন্যায় উহাকে রচনা করিয়াছে। এই সকল বিশেষভাবাপন্ন জীবাণুই দেহের ভিন্ন ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট স্থান গঠন করে। উহার কোনও এক নির্দ্দিষ্ট অণুকে যদ্যপি চিহ্ন দিয়া রাখিতে পারা যাইত, তবে দেখা যাইত যে, উহা বংশপরম্পরায় দেহের নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিতেছে। এ নিমিত্ত উহাদিগের প্রত্যেককে Unit বলে। স্ত্রী-কোষের ও পুং-কোষের Unit সকল একত্রিত হইলে, উহারা মিলিয়া মিশিয়া এমনভাবে যুক্ত ও সজ্জিত হয় যে, অপত্যের দেহগঠন, নির্দ্দিষ্ট-জাতীয়

(১) Nuclus

(২) Nucleolus.

(৩) Plastid

(৪) Centrosome

(৫) Microsoma

(৬) Cytoplaom

(৭) Chromosome

জীবে নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সিদ্ধ হয়; এবং ঐ সকল Unit নির্দ্দিষ্ট দেহাংশে আসিয়া উপস্থিত হয়। পিতার পায়ে এক স্থানে একটি জট আছে, পুত্রের পায়েরও ঠিক সেই স্থানে জট উৎপন্ন হইল। এরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। উক্ত মিশ্রণ-কার্য্য (maturation) বংশপরম্পরাগত ধর্ম্মের নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী। স্ত্রীকোষ ও পুং-কোষের কেন্দ্রবিন্দুদ্বয়ই মিলিত হইয়া ক্রমে বিভক্ত ও বিভিন্নভাবে সজ্জিত হইতে হইতে অপত্যের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত করে। যে সকল জীবের স্ত্রীপুং-ভেদ (৮) হয় নাই, অথবা যাহাদিগের অপত্যোৎপাদনে যুক্তকোষের প্রয়োজন হয় না, (৯) তাহাদিগের একটি কেন্দ্রবিন্দুই দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দ্বিখণ্ডিত কোষের দুই অংশে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং প্রত্যেক কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণজীব গঠিত করে। ফলতঃ, কেন্দ্রবিন্দুই কোষের অধিপতি; কোষের অবশিষ্ট অংশ কেবল উহারই প্রয়োজন সিদ্ধ করে। জীব বলিতে ঐ কেন্দ্রবিন্দুকে বুঝিলে কিছুই অসঙ্গত হয় না। কেন্দ্রবিন্দুহীন কোষ কিছুই নহে। তবে কেন্দ্রবিন্দু আপনার কার্য্যসাধনে মধ্যসোমের দ্বারাই বিশেষরূপে উপকৃত হয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীশশধর রায়।

মূলতান।

আমরা অপরাহ্ন ৪-২০ মিনিটের সময় মুলতান ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। এ স্থান আমাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত; সেই জন্য এখানকার কমিশেরিয়েট বিভাগের জনৈক কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রাধাকিশোর কুণ্ডু মহাশয়ের নামে একখানি অনুরোধপত্র আনিয়াছিলাম। আমরা তাঁহার গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা কালীবাড়ীতে থাকাই উত্তম বিবেচনা করিয়া শকটারোহণে কালীবাড়ীতে উপনীত হইলাম। ইতিমধ্যে কুণ্ডু মহাশয় জানি না কিরূপে সংবাদ পাইয়া আমাদের নিকট আসিলেন, এবং তাঁহার বাসায় যাইবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেন। দেখিতে দেখিতে আরও কয়েক জন বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয় আসিয়া তাঁহাদের বাসায় আমাদিগকে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে

(৮) Unisexeral

(৯) Parthanogenetic

লাগিলেন। আমরা তাঁহাদের এইরূপ স্বজাতি-প্রীতি ও যত্ন-চেষ্টার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। তাঁহারা লাইব্রেরী-গৃহটি খুলিয়া, আমাদের থাকিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

প্রাচীন ইতিবৃত্ত।

মূলতান দেখিবার জন্য আমাদের এতই ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল যে, অনশন ও রাত্রিজাগরণ-জনিত ক্লেশও আমরা বিস্মৃত হইয়াছিলাম। বাসস্থানে দ্রব্যজাত রাখিয়াই আমরা নগর দেখিতে বাহির হইলাম। মূলতান পঞ্জাব প্রদেশের একটি প্রধান নগর, এবং উক্ত জেলার বিচার-সদর। ইহা অত্যন্ত প্রাচীন নগর। কথিত আছে যে, দৈত্যকুলোদ্ভূত হিরণ্যকশিপুর পিতা কশ্যপ এই নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তখন ইহার নাম ছিল কশ্যপপুর। এখন এখানে প্রাচীন কশ্যপপুরের কোনও নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকাল হইতেই এই নগরের প্রাচীন ইতিবৃত্ত জানিতে পারা যায়। তিনি মালবজাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মূলতান অধিকার করিয়াছিলেন। পাঠান, মোগল ও শিখ প্রভৃতি নানা জাতির অধীনে বহুকাল থাকিয়া ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইহা ইংরেজের অধিকারে আসিয়াছে। ইংরেজাধিকৃত হইবার পর হইতেই এ নগরের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। আমরা প্রথমে ক্যাণ্টনমেণ্ট দেখিতে যাই। উহা নগরাংশ হইতে প্রায় ৩।০ মাইল দূরে অবস্থিত। মূলতান, নগর ও ছাউনী, এই দুই ভাগে বিভক্ত। নগরাংশ অপেক্ষা ছাউনীভাগ পরিষ্কৃত; অধিবাসী অধিকাংশ বাঙ্গালী ছাউনীতেই বাস করিয়া থাকেন। নগরের এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আদালতের প্রধান উকীল।

মূলতান নগরটি চন্দ্রভাগা, ইরাবতী ও বিতস্তার সঙ্গমের দেড় ক্রোশ পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। এ স্থানে একটি দুর্গ ছিল; অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। নগরের তিন দিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত;—কেবলমাত্র দক্ষিণাংশে ইরাবতী নদীর প্রাচীন খাত নগর ও দুর্গের অভ্যন্তর দিয়া ক্ষীণ-ধারায় মন্থর-গমনে প্রবাহিত হইতেছে। মূলতানের আশে পাশে অনেক দেব-মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। আমরা প্রহ্লাদপুরী দেখিবার জন্য উৎসুকমনে তথায় উপনীত হইলাম। একটি সুবিশাল মন্দিরের মধ্যে হরিভক্ত প্রহ্লাদ, হিরণ্যকশিপু ও নৃসিংহমূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভক্তির ভাব

উচ্ছ্সিত হইয়া উঠিল। হৃদয়ের দৃঢ়তা ও একাগ্রতা থাকিলেই যে সাধকেরা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, প্রহ্লাদের জীবনে তাহা পূর্ণরূপে বুঝিতে পারা যায়। যেখানে হিন্দুর দেব-মন্দির, প্রায় সেইখানেই মুসলমানের কোনও মস্‌জিদ বা সমাধিমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের বাড়ীর, অযোধ্যায় রামের জন্মভূমির ও অন্যান্য দেবস্থানের মস্‌জিদই তাহার উদাহরণস্থল। প্রহ্লাদপুরীর মন্দির-সন্নিকটেও একটি মুসলমানের সমাধি আছে; উহা 'বাতুল হক সাহেব ফকীরের সমাধি' নামে পরিচিত। একদা মুসলমানগণ প্রহ্লাদপুরীর নিকটে প্রহ্লাদ-মন্দিরের অপেক্ষা একটি উচ্চ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিতে গিয়া হিন্দু পাণ্ডাগণের ক্রোধভাজন হইয়াছিলেন। এমন কি, তাহা লইয়া উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল দাঙ্গাও ঘটে। রাজকীয় বিচারে মুসলমানগণ পরাজিত হওয়াতে উক্ত মস্‌জিদ আর নির্ম্মিত হইতে পারে নাই।

আমরা সানন্দে প্রহ্লাদপুরী দর্শন করিয়া যোগমায়ার মন্দির দেখিতে যাই। সে দিন একাদশী। হিন্দু নরনারীগণ দলে দলে মন্দিরে উপনীত হইতে লাগিলেন। নানাজাতীয় ভিন্নধর্ম্মীয় ভীষণ অত্যাচারের মধ্যেও হিন্দুধর্ম্মের এইরূপ অক্ষয় স্থিতির কথা চিন্তা করিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। নানাপ্রকার অন্ধকারের মধ্যেও হিন্দুধর্ম্ম এখনও স্বীয় গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় চিরদীপ্তিশালী, ইহা কি হিন্দুধর্ম্মের গৌরব-গরিমা-জ্ঞাপক নহে? মন্দিরটি ও তন্মধ্যস্থ প্রকোষ্ঠটি অতীব মনোহর। এখানে দিবারাত্র দীপশিখা প্রজ্বলিত থাকে। এখানে সূর্য্যকুণ্ড প্রভৃতি আরও কতিপয় হিন্দুতীর্থ বিদ্যমান।

নানা কথা।

আমরা এখানকার বাজার দেখিয়া পরিতোষলাভ করিয়াছিলাম। রাজা পথগুলি বিশেষ প্রশস্ত না হইলেও পরিচ্ছন্ন। বিবিধ রেশমী ও পশমী বসনের জাঁকজমক-পূর্ণ দোকানগুলি দর্শকদিগের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। ফল মূলের দোকানেরও অভাব নাই। এখানকার স্ফটিকবৎ শুভ্র মিছরী ও বিলাতী পোর্টমেণ্টোর মত টিনের বড় বাক্সগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ। আমরা শৈশব হইতেই মূলতানী হিঙ্গের কথা শুনিয়া আসিতেছি; তজ্জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া নানা স্থানে হিঙ্গের কারখানা দেখিবার উদ্দেশে ভ্রমণ করিলাম; কিন্তু নগরের উপকণ্ঠে বা নগরমধ্যে কোনও স্থানেই তাহা

দেখিতে পাইলাম না। প্রকৃতপক্ষে মূলতানে হিঙ্গ প্রস্তুত হয় না। এখান হইতে বহু দূরে সিন্ধুপ্রদেশে ও বেলুচিস্থানের কোনও কোনও অংশে হিঙ্গ উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে সেখান হইতে তাহা মূলতানে আসিত, এবং এ স্থান হইতে নানা স্থানে রপ্তানী হইত বলিয়া 'মুলতানী হিঙ্গ' নামে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে এখানে হিঙ্গের বিস্তৃত কারবার ছিল। বন্যার সময় মুলতান নগরে জল প্রবেশ করে বলিয়া এখানকার স্থানে স্থানে বাঁধ দৃষ্ট হইল। গ্রীষ্মকালে এখানে দারুণ উত্তাপ হয় বলিয়া, এখানকার অনেক ধনী ব্যক্তি গোলাপের পাপ্‌ড়ীর উপর সূক্ষ্ম চাদর বিস্তৃত করিয়া আরামে শয়ন করিয়া থাকেন!

মূলতান হইতে ৬৪ মাইল দূরে বহাবলপুরে নবাবের বাড়ী। তাঁহার প্রধান তহশীল কাছারী মূলতানেই স্থাপিত। নবাবের কাছারী ও হাঁসপাতাল দেখিবার যোগ্য। কমিশনার আফিস, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ আফিস, একটি বৃহৎ ও সুন্দর উদ্যান ও তন্মধ্যস্থ লাইব্রেরি-গৃহটি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলাম। এখানকার প্রধান অট্টালিকা-সমূহের মধ্যে আরবদেশবাসী মুসলমান সাধু বহাউদ্দীন ও রুবস্‌উল্‌ আলমের সমাধিমন্দির বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য, এবং পর্য্যটকমাত্রেরই অবশ্যদর্শনীয়। ১৮৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নিকটবর্ত্তী দুর্গের বারুদখানায় আগুন লাগায় ঐ সমাধি-মন্দিরের কতক অংশ ও আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত প্রহ্লাদপুরীর প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের কতক অংশ উড়িয়া গিয়াছে। দুর্গের মধ্যস্থলে সূর্য্যদেবের সুবৃহৎ মন্দিরটি অবস্থিত। হিন্দু-ধর্ম্মদ্বেষী মোগল-সম্রাট আওরঙ্গজেব উহা ধ্বংস করিয়া তদুপরি মস্‌জিদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। যখন শিখদের প্রাধান্য হয়, তখন সেই জুম্মা মস্‌জিদ বারুদখানা রূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সে সময়ে আগুন লাগায় উহার অধি-কাংশ নষ্ট হইয়া যায়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মূলরাজ যখন বিদ্রোহী হন, সে সময়ে ভান্স এগনিউ ও লেফ্‌টনাণ্ট এণ্ডার্সন নামে দুই জন ইংরেজ সেনানী নিহত হওয়ায় তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা করিবার নিমিত্ত দুর্গমধ্যে ৭০ ফিট উচ্চ একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। সহরের পূর্ব্বভাগে হিন্দুশাসনকর্ত্তাদিগের সময়ে নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ আমখাস্‌ (দরবার-গৃহ) এক্ষণে তহশীল কার্য্যালয়ে পরিণত হইয়াছে।

জলবায়ু।

মূলতান উষ্ণপ্রধান স্থান। দ্বিপ্রহরের সময় কাহার সাধ্য নগরের বাহির হয়।

এ অঞ্চলে একটি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে যে, ধূলি, ভিক্ষুক ও কবর, এই তিনটি মূলতানের বিশেষত্ব; প্রকৃতপক্ষেও তাহাই দেখিলাম। নগরের এমন অংশ অতি বিরল, যে স্থানে কোনও না কোনও কবর নাই। রাস্তায় ধূলি এত বেশী যে, পদে পদে ধূলিধূসরিত হইতে হয়। লাহোর ও করাচী বন্দরের সহিত ইহা রেলওয়ে লাইন দ্বারা সংযোজিত থাকায়, দিন দিনই এই নগরীর নানারূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। কান্দারহারবাসী বণিকগণ এখানে আগমন করিয়া ক্রয় বিক্রয়াদি করিয়া থাকে। মূলতানে যে কয়েকটি বাঙ্গালী বাবু আছেন, তাঁহারা সকলেই একান্ত ভদ্র; প্রায় প্রতিদিবসই আসিয়া আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই সঙ্গীত-প্রিয়, এবং কেহ কেহ সঙ্গীত-কলা-বিশারদও ছিলেন। আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া সঙ্গীতশ্রবণের জন্য গিয়া যারপরনাই প্রীত হইয়া ফিরিয়া আসিতাম। ইঁহাদের সহিত আমাদের এরূপ সৌহার্দ্দ্য হইয়াছিল যে, মূলতান-পরিত্যাগ-সময়ে অশ্রুজল মোচন না করিয়া আসিতে পারি নাই। সেই সুদূর দেশের বিদায়-কালীন শোকদৃশ্যটি আজ কতকাল পরে এখনও মনে পড়িয়া চিত্ত ব্যথিত করিতেছে। এখন তাঁহারাই বা কোথায়, আর আমরাই বা কোথায়! কিন্তু তবু যেন মানসচক্ষে মূলতান ষ্টেশনের সেই জনতার মধ্যে স্নেহপরিপূর্ণ মধুর মুখ কয়খানি,—বাঙ্গালী-সুলভ হৃদয়ভরা প্রীতিরাশির সহিত বিদায়ের অশ্রুভরা সম্ভাষণ দেখিতে পাইতেছি। ইহাকেই না মায়ার বন্ধন বলে? যখন গাড়ী ছাড়িয়া দিল, মুগ্ধের মত জানালার ভিতর দিয়া বন্ধুদের পানে চাহিয়া রহিলাম; তাঁহারাও যতক্ষণ পর্য্যন্ত গাড়ী দেখা যাইতেছিল, ততক্ষণ আমাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। বিরহ-কাতর ব্যথিত নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রুবারি ঝরিয়া পড়িল। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, চারি দিকে ম্লান অন্ধকাররাশি পুঞ্জীভূত হইয়া আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল—আকাশের তারাসুন্দরীরা নয়ন তুলিয়া আমাদের দিকে চাহিতে-ছিলেন। সেই অন্ধকার ভেদ করিয়া বাষ্পীয় শকট কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মূলতান হইতে ৬৪ মাইল দূরবর্ত্তী বহাবলপুর নামক স্থানে উপনীত হইল।

বহাবলপুরে এক জন নবাব আছেন; ইঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনি-লাম। ইনি বাঙ্গালীর প্রতি বড় প্রীত নন। বিশেষতঃ, এখানে থাকার নানা অসুবিধার কথা শুনিয়া আমরা আর এখানে অবতরণ না করিয়া, বরাবর

দর্শনাভিলাষে রুক জংশন নামক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। রুক জংশন হইতে এক রাস্তা করাচীতে এবং অপরটি কোয়েটা গিয়াছে; রুক জংশনে বহুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এ স্থানের দৃশ্যাবলী নয়নানন্দদায়ক নহে। ষ্টেশনটি এক উচ্চ টিলার উপরে অবস্থিত। সমতল ক্ষেত্রে যে স্থানে আমরা বাসা করিয়াছিলাম (মোসাফিরখানা), সেই স্থান হইতে রেল যাতায়াত দেখা বড়ই কৌতুকজনক। শুনিলাম, রুক জংশন ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের বহু অর্থব্যয় ও প্রভূত পরিশ্রমের ফল।

রুক জংশনে আমার সহিস, পাচক ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যকে রাখিয়া অপর এক-জন আত্মীয় ও সহচরের সহিত কোয়েটার অভিমুখে রাত্রি ১২টা কি ১টার সময় রওনা হইলাম। রাত্রে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়াছিল। আমাদের ট্রেনের অগ্রে ও পশ্চাতে দুইখানি এঞ্জিন ছিল। ট্রেনে এক জন Engineer, কতকগুলি কুলী ও যন্ত্রতন্ত্র থাকে। পার্ব্বত্য দস্যুর আক্রমণ হইতে ট্রেণ রক্ষা করিবার জন্য কয়েক জন সশস্ত্র সৈন্য প্রত্যেক ট্রেনে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

প্রাতে দেখিতে পাইলাম, আমরা পাহাড়ের বাম পার্শ্ব দিয়া যাইতেছি। আমাদের বাম ভাগেই 'সেটা' নদী। রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায় নদী খরতর-বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ট্রেনের অন্যান্য অভিজ্ঞ লোকের নিকট শুনিলাম, বৃষ্টি না হইলে নদীটি শুষ্ক থাকে। আমরা নদীর অপরপার্শ্বস্থ পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। এখান হইতে নদীর অপর পার্শ্বস্থ পাহাড়ের সৌন্দর্য্য অত্যন্ত মনোরম। গাড়ী চলিতে চলিতে হঠাৎ এক স্থানে দাঁড়াইল, এবং সৈনিকগণ ও কুলীরা মিলিত হইয়া কোলাহল করিতে লাগিল। আমরাও নামিয়া জনৈক সৈনিককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এবং একটু অগ্রবর্ত্তী হইয়া দেখিতে পাইলাম যে, দু' তিনখানা বড় পাথর পাহাড় হইতে বৃষ্টির বেগে খসিয়া পড়িয়া রাস্তা বন্ধ করি-য়াছে। ঐ সৈনিকগণ ও কুলীগণ পাথর সরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রথম শ্রেণীর কয়েক জন ইংরেজ আরোহী গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কুলীদের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে ঐ কয়খানা পাথর স্থানান্তরিত করিয়া লাইন পরিষ্কার করিয়া দিলেন। যে স্থলে পাথর ভাঙ্গা হইল, তাহার পরেই প্রায় ৫০।৬০ হাত দীর্ঘ কাঠের সেতু, তৎপরেই টনেল। আমাদের ট্রেন ধীরে ধীরে পুল পার হইল; টনে-

আবার কি ঘটিল, তাহা দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলাম, এবং দেখিলাম, পাহাড়ের পার্শ্ব দিয়া যে লাইন গিয়াছে, তাহার অপর পার্শ্বের অর্থাৎ নদীর দিকের লাইনটার নীচের মাটী ধসিয়া যাওয়ায় গাড়ী আবার দাঁড়াইয়াছে। পুনঃ পুনঃ whistle দেওয়ায় ষ্টেশন হইতে ট্রলীতে কতকগুলি কুলী আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং আমাদের গাড়ীর পথে এঞ্জিনিয়ারের উপদেশ-মত সত্বর কতকগুলি পাথরের কুচি সেই লাইনের নীচে ভরিয়া দিয়া গেল। তৎপরে ষ্টেশন হইতে একখানি ছোট এঞ্জিন আসিয়া ঐ ভগ্ন স্থানে লাইনের উপর দিয়া বারকতক যাতায়াত করিল;—পাথরের কুচিগুলি মাটীতে বসিয়া গেল। তখন আমাদের এঞ্জিনখানি আমাদের গাড়ী সহ ধীরে ধীরে ঐ স্থান পার হইয়া গেল। বেলা প্রায় তিনটার সময় হইতেই অত্যন্ত শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল। সেদিন Christmas Eveএর পূর্ব্ব দিন। আমরা ক্রমে যতই উর্দ্ধ দিকে যাইতে আরম্ভ করিলাম, শীতও ততই অধিক বোধ হইতে লাগিল। বেলা চারিটার সময় হইতেই তুষার (Snow) পড়িতে আরম্ভ হইল। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গে যেমন মাঘমাসে কোনও কোনও দিকে নীহারপাত হইতে থাকে, তদ্রূপ কুয়াশা ঘন হইয়া নীহার-পাত হইলেই Snow পড়া বলে। আমরা একটা ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, প্ল্যাটফরমের উপরে জিনিস ঢাকা ত্রিপলের উপরিভাগে কতকগুলি তুষার পড়িয়া বরফ হইয়া আছে। আমরা যাইয়া সহাস্যে সকৌতুকে কৌতূহলবশতঃ উহার কতকগুলা একটা ঘটীর মধ্যে ভরিয়া আনিয়া আমাদের হুঁকায় জলের পরিবর্ত্তে উহা ভরিয়া ধূম্রপান করিলাম। গাড়ী অনেকক্ষণ অপেক্ষা করায় এবং Timetable দৃষ্টে কোয়েটা পঁহুছিতে অনেক বিলম্ব হইবে বুঝিয়া, এ স্থানে এতক্ষণ গৌণের কারণ জানিবার জন্য ষ্টেশনমাষ্টার (এক জন ইউরোপীয়ান) জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "Look, Soldiers coming. Train must detain here for them, see what happened in their fate". আমরাও দেখিলাম, বহু দূরে প্রায় দশ বার জন দেশীয় সিপাহী বন্দুক হস্তে আসিতেছে। খুব snow পড়িতেছিল বলিয়া স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। আমরা দেখিতে পাইতেছিলাম যে, ক্রমেই যেন লোকসংখ্যা কমিতেছে। কেন যে সংখ্যা কম দেখিতেছিলাম, তাহার কারণ বুঝিতে পারিতেছিলাম না। প্রায় এক ঘণ্টার

দুই চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়াই তাহার হাতে ধরিয়া (যেন তাহাকে সাহায্য করিয়া) আমাদের গাড়ীতেই উঠাইয়া দিবামাত্র Train ছাড়িয়া দিল। ঐ সৈন্য বেঞ্চের উপর যেন মৃতবৎ পড়িয়া গেল। তাহার হস্তস্থিত বন্দুক ষ্টেশনমাষ্টার নিজেই গাড়ীতে রাখিয়া দিলেন। সিপাহী অস্পষ্টভাবে তাহার অদৃষ্টে ধিক্কার দিতে লাগিল। আমরা বুঝিতে পারিলাম, সিপাহী লক্ষ্ণৌ অঞ্চলের অধিবাসী। আমি অগ্রবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করায় সিপাহী বলিল, "বাবু! আমাকে বাঁচাও।" ইহা বলিয়াই সে ক্রন্দন করিতে লাগিল। ক্রমশঃই যেন তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছিল। তখন আমরা সকলে চেষ্টা করিয়া তাহার পরিহিত পোষাক প্রভৃতি খুলিয়া আমাদের সঙ্গের কম্বল প্রভৃতি শীতবস্ত্র দ্বারা তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া তাহার নিকট কাঙ্গারা ধরিলাম। কাঙ্গারা একটি বেতের ছাউনি বিশিষ্ট মাটীর হাঁড়ী; তাহাতে আগুন থাকে। ঐ হাঁড়ীটা ইচ্ছা করিলে কোটের মধ্যে রাখিয়া বক্ষে অগ্নির উত্তাপ লওয়া যাইতে পারে। ইহা পিণ্ডি হইতে আনিয়াছিলাম। আমার সঙ্গী ডাক্তার বাবু দুই আউন্স ব্রাণ্ডী পান করাইয়া দিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে সিপাহী উঠিয়া বসিয়া তাহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। সে বলিল, আমরা তাহার দেশীয় লোক বলিয়া প্লাটফরমে আমাদিগকে দেখিয়াই তাহার মনে আনন্দ ও কেমন একটা অলৌকিক ভাবের উদয় হওয়ায় তাহার শরীর আরও অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। সিপাহী আমাদিগকে দেখিয়াই সাহায্যপ্রার্থনায় কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বাক্‌রোধ হওয়ায় বলিতে পারে নাই। সিপাহী বলিল, "আমরা সরকারী কার্য্যোপলক্ষে উচ্চ পাহাড়ে ছিলাম। বরফ পড়িয়া অত্যন্ত শীতের প্রাদুর্ভাব হইল। তাই আমাদের কাপ্তেন নীচে নামিবার জন্য উপদেশ দিয়া আমাদিগকে বিদায় দিয়াছেন। আমরা সদলে নীচে আসিতেছিলাম। রাস্তা ভুলিয়া বিপথে গিয়া আমরা বিপন্ন হইয়াছিলাম। আমরা ৫০।৬০ জন ছিলাম; কিন্তু অনেকেই শীতে চলিতে অশক্ত হইয়া পড়িয়া গেল। তখন অবশিষ্ট সকলে দৌড়িয়া রাস্তা অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। প্রাতে গাড়ীর শব্দ শুনিতে পাইয়া অত্যন্ত উৎসাহে ১৫।১৬ জন একত্র আসিতেছিলাম। ক্রমে ষ্টেশন নিকটবর্ত্তী হইলে কেহ কাহারও অপেক্ষা না করিয়া পথ-বিপথ না বাছিতে ছুটিতে লাগিলাম। পরে আমি একাকী আসিয়া

কখন গাড়ীতে উঠিয়াছি, তাহাও মনে নাই। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে।" আমরা আমাদের সঙ্গে যাহা কিছু খাদ্য ছিল, তাহা সিপাহীকে খাইতে দিলাম। সে কত কথাই যে বলিল, তাহা বর্ণনাতীত। আমরা সুদুর বঙ্গদেশের এক প্রান্তের অধিবাসী, আর লক্ষ্ণৌ তাহার বাড়ী; তবু সে আমাদিগকে একদেশবাসী অর্থাৎ ভারতবাসী বলিয়া কতই না আনন্দ প্রকাশ করিতেছিল!

আমরা ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। চারি দিকে পর্ব্বতশ্রেণী, উপত্যকার মধ্য দিয়া অগণিত স্রোতস্বিনীকুল কুলুকুলুরবে বহিয়া চলিয়াছে। ট্রেণ কখনও উর্দ্ধে, কখনও নিম্নে, কখনও বা পর্ব্বতের পার্শ্ব দিয়া, কখনও বা নদীর উপরিস্থিত সেতুর উপর দিয়া, কখনও বা টনেল (সুড়ঙ্গ) দিয়া ভুজঙ্গের মত আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে লাগিল। আমরা নৈসর্গিক শোভা দেখিতে দেখিতে উৎফুল্লমনে ও বিপদাশঙ্কায় শঙ্কিতচিত্তে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তচলশায়ী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ম্লান-লোহিত জ্যোতি তরুশিরে লতাপল্লবে ও দূরবর্ত্তী পর্ব্বতশেখরে নিপতিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতে লাগিল। বহু শ্বেতবর্ণ পর্ব্বত আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। হঠাৎ জব্বলপুরের নর্ম্মদার শ্বেত পাহাড় বলিয়া ভ্রম হয়! এই তুষারাবৃত পাহাড়গুলি দূর হইতে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। যতই গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই দেখিলাম যে, পর্ব্বতের উপত্যকা, মাঠ, পথ বরফে শুভ্রাকৃতি ধারণ করিতেছে! দূর হইতে বিশাল সমুদ্রের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এক ইঞ্চি হইতে প্রায় এক ফুট পুরু বরফে ঢাকা রেলপথ দিয়া ট্রেন 'চড় চড়' শব্দে চলিতে লাগিল।

আজ ২৫শে ডিসেম্বর। বড় দিন। আরোহীদের মধ্যে কয়েক জন গোরা সৈনিক সুরাদেবীর সেবা করিয়া একেবারে মত্ত হইয়া উঠিল, এবং পরবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিয়া স্তূপাকার বরফের উপর দিয়া দৌড়াদৌড়ি, ধরাধরি ও মারামারি করিয়া দানবিক আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

আমরা রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকার সময় কোয়েটায় উপনীত হইলাম। পথে পূর্ব্ববর্ণিত দুর্ঘটনা না ঘটিলে সন্ধ্যার সময়েই পঁহুছিতে পারিতাম।

শ্রীধরণীকান্ত লাহিড়ী।

অংশীদার।

উমাকান্ত যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে এন্ট্রান্স-ক্লাসে পড়িত, সেই সময় রাধাচরণ বাবুর দ্বিতীয়া কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়। রাধাচরণ বাবু বড়লোক ; কয়লার ব্যবসায়ে তাঁহার বিলক্ষণ দশ টাকা আয় ছিল। উমাকান্ত দরিদ্র কেরাণীর পুত্র ; দেখিতে অতি সুশ্রী ও বুদ্ধিমান বলিয়া রাধাচরণ বাবু অনেক টাকা খরচ করিয়া তাহাকেই কন্যাদান করেন। যখন উমাকান্তের বিবাহ হয়, তখন অনেকেই রাধাচরণ বাবুকে বলিয়াছিলেন যে, আপনি "যে টাকা ব্যয় করিলেন, সেই টাকাতে অনায়াসে বি. এ কিংবা এম. এ জামাতা আনিতে পারিতেন।" কিন্তু রাধাচরণ বাবু এ সকল সৎপরামর্শে কর্ণপাত করিতেন না। বন্ধুগণের কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্যে বলিতেন, "যদি আমার শরতের কপালে সুখ থাকে, তাহা হইলে ঐ জামাতা হইতেই সে সুখী হইবে।"

যথাসময়ে উমাকান্ত প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। উমাকান্ত পাশ হওয়াতে তাহার পিতামাতার যত না আনন্দ হইয়াছিল, রাধাচরণ বাবুর ও তাঁহার পত্নীর ততোধিক আনন্দ হইল। জামাতা পাশ হইয়াছেন শুনিয়া রাধাচরণ বাবুর পত্নী কালীঘাটে বিশেষ সমারোহসহকারে পূজা দিলেন। একদিন রাধাচরণ বাবুর বাটীতে ভোজ হইল। প্রায় দুই তিন শত ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া কর্ত্তা বিবিধ আহার্য্য ও পানীয়ে সকলকে পরিতুষ্ট করিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন পাশ-করা ছেলের বাজার এত সস্তা হয় নাই। তখন একটা পাশ করিয়া লোকে অনায়াসে একটা পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকুরী যোগাড় করিতে পারিত। এমন কি, তখন যদি কেহ একটা পাশ করিয়া বিদেশে যাইত, তাহা হইলে এক শত টাকা বেতনের একটা কর্ম্ম যোগাড় করাও তাহার পক্ষে কঠিন হইত না।

উমাকান্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে রাধাচরণ বাবু তাহাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে এল্. এ. পড়িতে অনুরোধ করিলেন, এবং জামাতার অধ্যয়নের যাবতীয় ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করিতে সম্মত হইলেন। উমাকান্ত শ্বশুর মহাশয়ের প্রস্তাবে আনন্দিত হইল বটে, কিন্তু পিতার সম্মতির অপেক্ষায় শ্বশুরকে কোনও কথা বলিতে পারিল না। শ্বশুরের প্রস্তাব শুনিয়া বলিল

আমার ত প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িবার বিশেষ ইচ্ছা; তবে একবার বাবার মত জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উমাকান্তের পিতা দরিদ্র কেরাণী ছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, উমাকান্ত যদি পরীক্ষায় পাশ হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি তাহাকে আর না পড়াইয়া একটা চাকুরীতে বসাইয়া দিবেন। পাশ-করা ছেলে অনায়াসে একটা ৫০৲।৬০৲ টাকার চাকুরী পাইবে। তাহা হইলে তাঁহার সাংসারিক কষ্ট অনেকটা কমিয়া যাইবে। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, উমাকান্তের এল্. এ পড়িবার ইচ্ছা হইয়াছে, এবং তাহার শ্বশুর তাহার অধ্যয়নের ব্যয়ভারবহনে উদ্যত হইয়াছেন, তখন আর উমাকান্তের কলেজে পড়ায় তিনি কোনও আপত্তি করিলেন না। মনে করিলেন, যদি উমাকান্ত এল্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা হইলে সে একেবারে অধিক বেতনের একটা চাকুরী পাইতে পারে। এই আশাতেই তিনি উমাকান্তকে এল্. এ পড়িবার অনুমতি প্রদান করিলেন। উমাকান্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িতে লাগিল। রাধাচরণ বাবু তাহার কলেজের বেতন, পুস্তকের মূল্য ও জলখাবারের টাকা পর্য্যন্ত দিতে লাগিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজে এল্ এ. ক্লাসে মাসিক বারো টাকা বেতন দিতে হইত। কিন্তু মুসলমান ছাত্রদিগকে অত অধিক বেতন দিতে হইত না; কারণ, মহাত্মা মহম্মদ মহসীন মুসলমান-বালকগণের বিদ্যা-শিক্ষার সুবিধার জন্য গবর্মেণ্টের হস্তে যে প্রভূত সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার আয় হইতেই মুসলমান-বালকগণের বিদ্যা-শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। সেই জন্য প্রেসিডেন্সি কলেজে অনেক দরিদ্র মুসলমান-সন্তানও অধ্যয়ন করিত।

উমাকান্ত যে ক্লাসে অধ্যয়ন করিত, সেই ক্লাসে চারি পাঁচ জন মুসলমান ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে এক জনের নাম জহরুদ্দীন আহম্মদ। জহরুদ্দীন দরিদ্রের পুত্র হইলেও, তাহার হৃদয় বড় উদার ছিল। তাহার স্বভাব-সিদ্ধ উদারতা-গুণে সে ক্লাসের সকল ছাত্রেরই প্রীতিভাজন হইয়াছিল। উমাকান্ত দরিদ্রের পুত্র বলিয়া জহরুদ্দীনের সহিত তাহার বিশেষ সম্প্রীতি ছিল। উমাকান্ত যে সকল হিন্দু ছাত্রের সহিত একত্র অধ্যয়ন করিত, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ধনবানের পুত্র; উমাকান্ত সহজে তাহাদের সহিত মিশিতে চাহিত

৩

একদিন জহুরুদ্দীন উমাকান্তের বাসায় বেড়াইতে গিয়া কথায় কথায় বলিল, "আমার বাল্যকাল হইতেই ব্যবসায় করিবার বড়ই ইচ্ছা ; লেখাপড়া শিখিয়া চাকুরী করিব, এরূপ সঙ্কল্প আমার কখনই নাই। কিন্তু আমি দরিদ্র ; ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে হইলে মূলধন আবশ্যক। আমি অনেক দিনের চেষ্টায় এক শত টাকা সঞ্চয় করিয়াছি। যদি আর এক শত টাকা কোথাও যোগাড় করিতে পারি, তাহা হইলে দুই শত টাকা লইয়াই একটা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইব, ইচ্ছা করিয়াছি।"

উমাকান্ত বন্ধুর কথা শুনিয়া বলিল, "দুই শত টাকা মূলধন লইয়া কি ব্যবসা করিবে ? দুই শত টাকায় কলিকাতা সহরে একখানা মুদীর দোকানও হয় না।"

"আমি দোকান করিব না। আমাদের দেশের চিকনের কাজ বড় প্রসিদ্ধ। আমাদের ও অন্য স্থলের অনেক মুসলমান চিকনের কাজ করিয়া বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতেছে ; দ্বিতল বাটী, বাগান, পুষ্করিণী করিয়াছে। লেখাপড়া না শিখিয়াও অনেকে এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া 'দশ জনের এক জন' হইয়াছে। দুই তিন শত টাকা মূলধন হইলেই চিকনের কাজ আরম্ভ করিতে পারা যায়।"

"চিকনের কাজটা কি ?"

"খুব মিহি মলমলের উপরে সূচের কাজ করা। আমাদের দেশের প্রায় সকল মুসলমান-রমণীই চিকনের কাজ জানে। পাইকারেরা মলমল কিনিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে দিয়া আসে। গৃহস্থ-রমণীরা অবকাশ-কালে সেই মলমলের উপর সূতা দিয়া নানাপ্রকার ফুল কাটিয়া রাখে। পাইকারেরা সেই সকল কারুকার্য্য-সংবলিত বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় অত্যন্ত অধিক মূল্যে বিক্রয় করে। আমাদের দেশের অনেক মুসলমান অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে গমন পূর্ব্বক চিকনের ব্যবসা করিয়া থাকে। ঐ সকল দেশে চিকনের কাজের সমাদর অত্যন্ত অধিক। প্রথমে চল্লিশ বা পঞ্চাশ টাকার মলমল কিনিয়া মফস্বলে মুসলমানদিগের বাটীতে গিয়া দিয়া আসিতে হয়। আর যাহারা চিকনের কাজ করে, তাহাদিগকে বায়না বা দাদন-স্বরূপ কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক অগ্রিম দিতে হয়। এক শত বা দেড় শত টাকা হইলেই দাদনের পক্ষে যথেষ্ট।"

সে দিন এই পর্য্যন্তই কথাবার্তা হইল। জহুরুদ্দীন কিয়ৎকাল অন্যান্য

ইহার পর একদিন উমাকান্ত শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া পত্নী শরৎশশীর নিকট কথায় কথায় জহুরুদ্দীনের সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিল। বলিল, "আমাদের এক জন মুসলমান সহাধ্যায়ীর নিকট শুনিলাম যে, দুই শত টাকা মূলধনে এক প্রকার ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে পারা যায়। সে ব্যবসায়ে শতকরা এক শত টাকা লাভ হয়। সে বলিল যে, অন্ততঃ দুই শত টাকা হইলে এই ব্যবসায় আরম্ভ করা যায়। অনেক কষ্টে সে এক শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছে; যদি আর এক শত টাকা কোথাও যোগাড় করিতে পারে, তাহা হইলেই সে এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে।"

শরৎশশী বলিল, "ব্যবসা করিবে, লেখাপড়া করিবে না?"

"সে বলে যে, অর্থোপার্জ্জন গরীব লোকের প্রথম কর্ত্তব্য; বিদ্যাশিক্ষা তাহার পরে। আমাদের মত দরিদ্রের লেখাপড়া-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য একটা চাকুরী যোগাড় করা। যদি ব্যবসায়ে সেই টাকাই উপার্জ্জন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে লেখাপড়া কে শিখিতে চায়? আর লেখা পড়ার চর্চ্চা ত বাড়ীতে বসিয়াও হইতে পারে। তাহার মত স্বতন্ত্র।"

"কথাটা একপ্রকার ঠিকই বলিয়াছে, কিন্তু লেখাপড়া ছাড়াটা ভাল নহে।"

পরদিন উমাকান্ত যখন শ্বশুরালয়ে আহারাদি করিয়া কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, সেই সময় শরৎশশী একতাড়া নোট আনিয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, "তোমার বন্ধুকে এই টাকা দিয়া বলিও যে, এ টাকা তাহাকে দিতেছি, কিন্তু ঋণ দিতেছি না। যদি সে আমাকে তাহার বখরাদার করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে আমি তাহাকে এই টাকা দিব, নচেৎ নহে। ব্যবসায়ে যদি তাহার ক্ষতি হয়, তাহা হইলে আমার টাকা যাইবে; কিন্তু যদি লাভ হয়, তাহা হইলে আমাকে লাভের অংশ-স্বরূপ একখানা চিকণের কাজ করা কাপড় দিতে হইবে।"

উমাকান্ত জানিত যে, তাহার পত্নীর হাতে টাকা আছে। ধনবানের কন্যার হাতে দুই শত বা চারি শত টাকা থাকা অসম্ভব নহে। কিন্তু শরৎশশী যে সহসা একেবারে এক শত টাকা বাহির করিয়া দিবে, তাহা উমাকান্ত স্বপ্নেও ভাবে নাই। উমাকান্ত বুঝিল যে, তাহার বন্ধুর উপকারার্থই শরৎশশী এই টাকাটা বাহির করিয়া দিল; উহা প্রকৃতপক্ষে ঋণ অথবা ব্যবসায়ের মূল-ধনের অংশ নহে।

সে দিন জহুরুদ্দীন কলেজে যায় নাই। অপরাহ্নে উমাকান্ত জহু

রুদ্দীনের বাসায় গিয়া তাহাকে শরতের কথা বলিয়া এক শত টাকা প্রদান করিল। শরৎশশী যে একখানা চিকনের কাজকরা বস্ত্র পাইলেই জহুরুদ্দীনকে ঋণমুক্ত বলিয়া মনে করিবে, সে কথা বলিতেও ভুলিল না।

টাকা পাইয়া, বিশেষতঃ শরৎশশীর মহানুভবতা স্মরণ করিয়া, জহুরুদ্দীন বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইল। সে মুখের কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেও পারিল না। অশ্রুপূর্ণ-লোচনে নীরবে উমাকান্তের দিকে চাহিয়া রহিল।

৪

শ্রীরামপুরের প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র বাটীতে এক বিগত-যৌবনা রমণী অপরাহ্নকালে বসিয়া বাটনা বাটিতেছিলেন। এমন সময় দুইটি বালক বিদ্যালয় হইতে বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। একটি বালকের বয়স প্রায় পনের বৎসর, অপরটির বয়স প্রায় দশ বৎসর। বালকেরা বাটীতে প্রবেশ করিয়া যথাস্থানে পুস্তকাদি রক্ষা করিয়া জননীর নিকট গমন করিল। ছোট—শ্যামাকান্ত বলিল, "মা খিদে পেয়েছে।"

জননী বলিলেন, "বাটনার হাত ধুয়ে মুড়ি দিতেছি।"

শ্যামাকান্ত ম্লানমুখে জননীর নিকটে বসিয়া রহিল। তাহার অগ্রজ রমাকান্ত বলিল, "মা! বাবা আজ কেমন আছেন?"

"সেই একই রকম।"

"খুকী কোথায়?"

"ওঁর কাছে বসে আছে।"

এই বলিয়া রমণী কার্য্য শেষ করিয়া রন্ধনশালা হইতে একটি ছোট পিত্তলের ঘড়া আনিয়া তাহা হইতে পুত্রদ্বয়কে কিছু কিছু মুড়ি দিলেন। বালকদ্বয় মুড়ি খাইতে খাইতে কক্ষমধ্যে পিতার নিকট গমন করিল।

পাঠকগণ! ঐ রমণীকে চিনিতে পারিলেন কি? ইনি লক্ষপতি রাধাচরণ বাবুর আদরের কন্যা শরৎশশী। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর প্রায় ষোল বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। রাধাচরণ বাবু কয়লার ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া অবশেষে দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাজনেরা তাঁহার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইয়াছে। রাধাচরণ বাবু অদৃষ্টের এই দারুণ পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারিলেন না—অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হইল।

রাধাচরণ বাবুর মৃত্যুর অল্পদিন পরেই উমাকান্ত পিতৃহীন হইলেন।

তাঁহার আর লেখা পড়া হইল না। তিনি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া চাকুরীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে চল্লিশ টাকা বেতনে একটা সওদাগরি আফিসে তিনি একটি চাকুরী পাইলেন। শরৎশশী স্বামিগৃহে আসিয়া স্বামীর কষ্টার্জ্জিত অর্থে কোনও প্রকারে কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি যে ধনবানের কন্যা, এ কথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া দরিদ্র কেরাণীর সংসারে লক্ষ্মী-রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। উমাকান্তের জননী পতি বর্ত্তমানেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; উমাকান্ত চল্লিশ টাকাতেই দুইটি শিশুপুত্র ও পত্নীকে লইয়া কোনও মতে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে তিন চারি বৎসর কাটিয়া গেল। উমাকান্তের বেতন চল্লিশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা হইল। যে মাসে তাঁহার বেতনবৃদ্ধি হইল, সেই মাসেই তাঁহার একটি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। শরৎশশী কন্যার নাম রাখিলেন,—উৎপলবাসিনী।

উমাকান্ত ও শরৎশশী উভয়েই ক্রমে ক্রমে পিতৃশোক বিস্মৃত হইলেন, এবং পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। উৎপলের বয়স যখন পাঁচ বৎসর, সেই সময় উমাকান্ত সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। প্রায় তিন মাস শয্যাগত থাকিতে হইল। শরৎশশী আপনার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া স্বামীর চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। তিন চারি মাস পরে উমাকান্ত কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মানসিক জড়তার সঞ্চার হইল। তিনি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আফিসের বড় সাহেব তাঁহার পীড়ার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন, এবং তাঁহাকে নগদ এক সহস্র টাকা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

কলিকাতায় বাস ব্যয়সাপেক্ষ বলিয়া শরৎশশী কলিকাতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীরামপুরে উমাকান্তের এক জন হিতৈষী অভিভাবক বাস করিতেন। তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া শরৎশশী শ্রীরামপুরে মাসিক দুই টাকা ভাড়ায় একটি বাড়ীর কিয়দংশ ভাড়া লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র দুইটি কয়েক জন ভদ্র-লোকের অনুগ্রহে স্থানীয় বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে অধ্যয়ন করিতে লাগিল।

করিলেন, কিন্তু কোনও উপকার দেখিতে পাইলেন না। তিনি কুলি নির্ম্মাণ, কাপড়ে ফুল তোলা প্রভৃতি সামান্য সামান্য শিল্পকার্য্যে যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে ও অবশিষ্ট পাঁচ শত টাকার সুদে কোনরূপে অতিকষ্টে সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

৫

একদিন প্রাতঃকালে কলিকাতার কলুটোলার প্রসিদ্ধ হকিম অর্থাৎ মুসলমান-চিকিৎসক সৈয়দ কাসিম আলির আবাসে এক বালক উপস্থিত হইয়া সসঙ্কোচে এক জন ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিল, "হকিম সাহেব কোথা?"

সে বলিল, "উপর যাও।"

বালক রমাকান্ত। রমাকান্ত দ্বিতলে একটি সুসজ্জিত অনতিবৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ছয় সাত জন মুসলমান ভদ্রলোকে বেষ্টিত হইয়া বৃদ্ধ হকিম কাসিম আলি সাহেব বসিয়া আছেন। তিনি বালককে দেখিয়াই বলিলেন, "কি চাও বেটা?"

"আমি শ্রীরামপুর হইতে হকিম সাহেবের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি, আমার পিতা পীড়িত।"

সহৃদয় চিকিৎসক বালককে নিকটে ডাকিয়া বসাইলেন, এবং সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার পিতার কি হইয়াছে?"

রমাকান্ত ধীরে ধীরে পিতার পীড়ার বিবরণ বলিতে লাগিল। বৃদ্ধ হকিম নীরবে সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "তোমার পিতার পীড়া বড় কঠিন। আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প; খোদা যদি দয়া করেন, তাহা হইলেই তিনি ভাল হইবেন। কিন্তু রোগী শ্রীরামপুরে থাকিলে আমি কিরূপে তাঁহার চিকিৎসা করিব? তাঁহাকে কলিকাতায় আনিতে পারিবে না? এই বৃদ্ধবয়সে আমার পক্ষে শ্রীরামপুরে গমন অসম্ভব।"

হকিম সাহেবের কথা শুনিয়া রমাকান্ত ধীরে ধীরে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে আপনাদের সাংসারিক দুঃখের কথা বর্ণনা করিতে লাগিল। শুনিয়া বৃদ্ধের নয়ন হইতে বারিধারা পতিত হইতে লাগিল। তিনি সমস্ত শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক বলিলেন, "খোদা দিয়াছিলেন, তিনিই লইয়াছেন; তাঁহার মর্জ্জি হইলে আবার তোমাদের দুঃখ দূর হইবে। বাবা! আমি তোমার পিতাকে বিনামূল্যে ঔষধ দিব, কিন্তু তাঁহাকে কলিকাতায় আনি-

"আমার নাম শ্রীরমাকান্ত মিত্র।"

সমবেত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে এক জন তন্ময়চিত্তে রমাকান্তের কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনি বালকের নাম শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পিতার নাম কি?"

"শ্রীউমাকান্ত মিত্র।"

তিনি অনেকক্ষণ নীরবে থকিয়া অবশেষে রমাকান্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবা! তোমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। তোমার জননী যেরূপ পতিপ্রাণা, তাহাতে খোদা কখনই তাঁহাকে চিরকাল এরূপ কষ্টে রাখিবেন না। হকিম সাহেব দয়া করিয়া বিনামূল্যে তোমার পিতাকে ঔষধ দিতে সম্মত হইয়াছেন। আমি তোমাদের থাকিবার জন্য আমার বাসার একটা অংশ কিছু দিনের জন্য ছাড়িয়া দিতে পারি। তুমি শ্রীরামপুরে গিয়া তোমার জনক-জননীকে জিজ্ঞাসা কর; যদি তাঁহাদের মত হয়, তাহা হইলে যত শীঘ্র পার, তাঁহাদিগকে কলিকাতায় লইয়া এস। যদি এখানে আসা তোমাদের মত হয়, তাহা হইলে হকিম সাহেবকে পত্র লিখিও।"

রমাকান্ত হকিমসাহেব ও এই ভদ্রলোকের কথায় আশ্বস্ত হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। রমাকান্ত প্রস্থান করিলে পর সেই ভদ্রলোক হকিম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বালকের পিতার আরোগ্য হইবার কি কোনও সম্ভাবনাই নাই?"

হকিম সাহেব বলিলেন, "ঔষধসেবনে অনেক বিলম্বে আরোগ্য হইলেও হইতে পারেন। তবে সহসা দারুণ শোক অথবা অত্যন্ত আনন্দ উপস্থিত হইলে এক মুহূর্ত্তেই এই রোগ ভাল হয়,—তাহাও দেখিয়াছি। সকলই খোদার ইচ্ছা।"

৬

রমাকান্ত শ্রীরামপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জননীকে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিল। শরৎশশী কয়েক জন প্রতিবেশীর সহিত পরামর্শ করিয়া কলিকাতায় গমনই শ্রেয়ঃ বলিয়া স্থির করিলেন। রমাকান্ত হকিম সাহেবকে পত্র দ্বারা আপনাদের কলিকাতা-গমনের সংবাদ জানাইল, এবং পরবর্ত্তী রবিবারে তাহারা কলিকাতায় যাইবে, পত্রে তাহাও জ্ঞাপন করিল।

সাহেবের বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল। রমাকান্ত গাড়ীর কোচবাক্স হইতে অবতরণ করিয়া হকিম সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। তাহার জনক-জননী, ভ্রাতা ও ভগিনী গাড়ীর ভিতরে বসিয়া রহিলেন। তিনি চারি মিনিট পরে রমাকান্ত এক জন ভৃত্যের সহিত বাহির হইয়া আসিল। রমাকান্ত পুনরায় গাড়ীর কোচবাক্সে আরোহণ করিল, এবং সেই ভৃত্য গাড়ীর পশ্চাতে উঠিয়া কোচম্যানকে গাড়ী চালাইতে বলিল, এবং কোথায় যাইতে হইবে, বলিয়া দিল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

কয়েক মিনিট পরে গাড়ী এক সুদৃশ্য, অনতিবৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল; ভৃত্য কোচম্যানকে গাড়ী থামাইতে বলিল। রমাকান্ত কোচবাক্স হইতে অবতরণ করিলে ভৃত্য বলিল, "এই বাড়ী; আপনারা ভিতরে যান। আমি এক ঘণ্টা পরে পুনরায় আসিব।" এই বলিয়াই সে প্রস্থান করিল।

রমাকান্ত গাড়ীর দ্বার খুলিয়া সকলকে অবতরণ করিতে বলিল। সকলে গাড়ী হইতে অবতরণ করিবামাত্র এক জন দ্বারবান সসম্ভ্রমে সকলকে অভিবাদন করিল, এবং কোচম্যানকে গাড়ীর ভাড়া দিয়া গাড়ীর ছাদ হইতে একটা তোরঙ্গ ও একটা শয্যা—দরিদ্র গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব নামাইয়া লইল। শরৎশশী স্বামী ও পুত্রকন্যাদিগকে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র দুই জন পরিচারিকা, এক জন পাচিকা ও এক জন ভৃত্য আসিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিল। পরিচারিকারা সকলকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে গমন করিল।

আজন্ম দারিদ্র্যের ক্রোড়ে পালিত বালকবালিকারা সুন্দর গৃহ ও গৃহসজ্জা দর্শন করিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইল। শরৎশশী ধনবানের কন্যা; তাঁহার মনে পড়িল, বাল্যকালে তিনি এইরূপ অট্টালিকায়, এইরূপ সজ্জিত গৃহে বিচরণ করিতেন। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পরিচারিকার অনুসরণে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। উমাকান্ত উদাসীন; তাঁহার কোনও দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই; তিনি যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় কন্যার হাত ধরিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এক জন পরিচারিকা শরৎশশীকে বলিল, "মা, আমরা তোমাদের দাসী; এইটা ভাঁড়ার-ঘর, এইটা রান্নাঘর, এই নাইবার ঘর। উপরে তোমাদের শয়নঘর।"

শরৎশশীর যেন সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কোন্ মহানুভব

করিলেন, তাহা জানিবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। এক জন পরিচারিকা রমাকান্ত, শ্যামাকান্ত ও উৎপলকে নানাবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন ও ফল মূল দিয়া জলযোগ করিতে বলিল।

তাহারা জলযোগ করিতেছে, এমন সময়ে বাহির হইতে এক জন রমাকান্তের নাম ধরিয়া বারংবার আহ্বান করিতে লাগিল। রমাকান্ত একটা মিষ্টান্ন হাতে লইয়াই বাহিরে গমন করিল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে প্রত্যাগমন করিয়া বলিল, "মা, হকিম সাহেব ও বাড়ীওয়ালা মুসলমান ভদ্রলোকটি বাবাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন যে, বাটীর ভিতরে আসিয়া বাবাকে দেখিবেন।"

শরৎশশী বলিলেন "আমি আড়ালে সরিয়া যাইতেছি, তুমি তাঁহাদিগকে এইখানে লইয়া এস।"

জননীর কথা শুনিয়া রমাকান্ত বাহিরে গমন করিল, এবং হকিম সাহেব ও সেই মুসলমান ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। উমাকান্ত তখন বারাণ্ডার রেলিং ধরিয়া পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়াছিলেন।

আগন্তুকদিগকে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শরৎশশী সন্নিহিত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া উপকারী মহাত্মবযুগলকে দর্শন করিতে লাগিলেন। আগন্তুক মুসলমান ভদ্রলোক তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি উমাকান্তকে দর্শন করিয়াই দ্রুতপদে তাঁহার নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "উমাকান্ত! আমাকে চিনিতে পার?"

উমাকান্ত সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, "জহুরুদ্দীন আহম্মদ!" জহুরুদ্দীন উমাকান্তের সেই সহপাঠী বাল্যবন্ধু। জহুরুদ্দীন তখন শরৎশশীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বিবি! তোমার অনুগ্রহেই আজ আমি ধনবান্ সওদাগর হইয়াছি। উমাকান্তের হাতে তুমি যে টাকা দিয়াছিলে, সেই এক শত টাকা ও আমার এক শত টাকা, এই দুই শত টাকা লইয়া আমি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিলাম। প্রথম দশ বৎসর ব্যবসায়ে কিছুই করিতে পারি নাই; কিন্তু তাহাতে আমি নিরুদ্যম হই নাই। অবশেষে খোদা আমার প্রতি সদয় হইলেন। আমার ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি হইতে লাগিল। প্রথমে ব্যবসায়ে

বখরাদারকে লাভ দিতে না পারিলে স্বভাবতঃই লজ্জা হইয়া থাকে। অবশেষে যখন আমার অবস্থার উন্নতি হইল, তখন তোমাদের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু কেহই কোনও সংবাদ বলিতে পারিল না। আমার ব্যবসায়ের লভ্যাংশ হইতে আমি চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে একখানি বাড়ী করিয়াছি। তোমার জন্যও চল্লিশ হাজার টাকা দিয়া এই বাড়ী খরিদ করিয়াছি। তুমি আমার ব্যবসায়ের বখরাদার, লাভের অর্দ্ধাংশ তোমার প্রাপ্য, তাহা আমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হই নাই। আমি প্রায় পাঁচ বৎসর দেশে ছিলাম না। দক্ষিণ আমেরিকা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। প্রায় এক বৎসর হইল, কলিকাতায় আসিয়াছি। সে দিন হকিম সাহেবের বাড়ীতে রমাকান্তকে দেখিয়া আমার মন বড়ই চঞ্চল হইল। উহার মুখ দেখিয়া উমাকান্তের মুখ মনে পড়িয়া গেল। অবশেষে পরিচয় লইয়া আমার সংশয় দূর করিলাম। এখন তোমার হিসাবে ব্যাঙ্কে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা গচ্ছিত আছে; ইহা ছাড়া আমাদের ব্যবসায়েও বাৎসরিক প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয় আছে। এ আয়েরও অর্দ্ধেক তোমার। আর অধিক কি বলিব, এখন হকিম সাহেব উমাকান্তকে নীরোগ করিলেই আমাদের আনন্দ ষোলকলায় পূর্ণ হয়।"

হকিম সাহেব প্রথমাবধি উমাকান্তের মুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহার মুখভাব দর্শন করিতেছিলেন। তিনি জহুরুদ্দীনের কথা শুনিয়া বলিলেন, "খোদা দয়া করিয়াছেন! উমাকান্ত বাবুর মানসিক জড়তা দূর হইতেছে। ঔষধ অনাবশ্যক। উনি এক সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবেন।"

তখন শরৎশশী অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া সকলের সম্মুখে আগমন করিলেন, এবং কি জানি কাহাকে গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিলেন।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

'চিত্রাঙ্গদা'র আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা।

"চিত্রাঙ্গদা" কাব্যখানি সুনীতি কি দুর্নীতির প্রচার করিতেছে, নায়িকা অজাতোপযমা নবযৌবনা চিত্রাঙ্গদা সলজ্জা কি নির্লজ্জা, নায়ক মাতুলীকন্যা-

রুচি সু কি কু, এই সব কথা লইয়া কয়েক মাস ধরিয়া সাহিত্যের আসরে একটা ঘোঁট চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথের যশঃ-সূর্য্যের কালমেঘরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাহিত্য'-আকাশে উদিত।

জড়জগতে চন্দ্র-সূর্য্য একত্র প্রকাশ পায় না। উভয়ের বিরোধ ঘটিবে আশঙ্কা করিয়াই বোধ হয় বিধাতা কাল বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। The greater light to rule the day and the lesser light to rule the night এই বিধানে সংসার সুশৃঙ্খলায় চলিতেছে। কিন্তু কাব্য-জগতে এ বিধান না থাকাতে রবি শশী (দ্বিজেন্দ্র) এক সঙ্গেই উদিত; ফল ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এখন উপায় কি? সাহিত্যসালিশীগণ যদি বিধাতার বিধানের নজীরে নিষ্পত্তি করিয়া দেন যে, এক জন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে উপাসনায় প্রভাতকাল, ছাত্রমণ্ডলীকে শিক্ষাদানে দিবামানের অধিকাংশ সময়, এবং সভাসমিতিতে প্রবন্ধপাঠে অপরাহ্লকাল কাটাইয়া to rule the day নিযুক্ত থাকুন, এবং অপর জন Evening clubএ সান্ধ্য মজলিস করিয়া, স্বরচিত গান গাহিয়া, এবং রাত্রিকালে স্বরচিত নাটকের অভিনয় দেখিয়া to rule the night নিযুক্ত থাকুন, সে নিষ্পত্তিও যে বাদী প্রতিবাদী গ্রাহ্য করিবেন, এমন ত বোধ হয় না।

তবে কি বিবাদ-মীমাংসার কোনও পথ নাই? আছে। অশ্লীলতার 'চার্জ্জ' আমাদের সাহিত্যে নূতন নহে। ইহা অতি পুরাতন, সনাতন বলিলেও চলে। অনেক ইংরেজী-নবীশ ত ঐ অজুহাতে বাঙ্গালা-সাহিত্যের নামেই নাক তোলেন ও কাণে আঙ্গুল দেন। রুচিবাগীশদিগের মতে সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্য তথা শাক্তশৈবগণের তন্ত্রশাস্ত্রাদি এই অশ্লীলতাবিষে জর্জ্জরিত। রুচিবায়ু অনেকটা শুচিবায়ুর মত। একবার আক্রমণ করিলে আর নিস্তার নাই, ক্রমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে হয়। শুচিবায়ুর প্রাবল্য ঘটিলে গঙ্গাজল ছিটান ভিন্ন উপায় নাই। রুচিবায়ুর প্রাবল্য ঘটিলে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আশ্রয় লইলে সব ল্যাঠা চুকিয়া যায়। উভয়ই পতিতপাবনী। এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কল্যাণে পঞ্চ-মকার, পরকীয়া-প্রীতি, রাসলীলা, সকলই উদ্ধারলাভ করিয়াছে। এই saving sprinkle with the holy water of allegory প্রয়োগে চিত্রাঙ্গদার কাব্য-সৌন্দর্য্য পুনরুজ্জীবিত করা যায় না কি? চেষ্টা করিয়া দেখা যা'ক্। 'যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ?'

বাস্তবিক, ভাবকের চোখে দেখিলে কাব্যখানি (সোনার তরীর ন্যায়)

একটা বিরাট্ (হেঁয়ালি নহে) রূপক, যাহাকে ইংরাজীতে বলে allegory। কাব্যের ঘটনাস্থল মণিপুর টীকেন্দ্রজিতের লীলাভূমি আসামের সন্নিহিত স্থানবিশেষ নহে, ইহা বহুরত্নরাজিশোভিত বিশাল জগৎ, যাহাকে সংস্কৃতভাষায় 'বসুধা' বা 'বসুন্ধরা' বলে। অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদা উনবিংশ শতাব্দীর সাধারণ বাঙ্গালী-দম্পতী। বাল্যবিবাহের পর কি ক্রম অবলম্বন করিয়া দাম্পত্যপ্রেম পূর্ণপরিণতি লাভ করে, তাহাই কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। অল্পে অল্পে বুঝাইতেছি।

প্রথমেই দেখুন,—চিত্রাঙ্গদা চিত্রবাহনের কন্যা। চিত্রবাহন বাঙ্গালী পিতা; কখনও গরুর গাড়ী, কখনও পাল্কী, কখনও কেরাঞ্চি, কখনও ট্রাম, কখনও রেলগাড়ী, কখনও ষ্টীমার, কখনও (রেঙ্গুন যাইতে) জাহাজ চড়েন। চাক্‌রে বাঙ্গালী সৌখীন, কেরাণীগিরি বা মাষ্টারী করিলেও এক পা হাঁটেন না; এইখানে চিত্র-বাহন নামের সার্থকতা। কন্যাকে আঁতুড়ঘর হইতে রঙ্গ বেরঙ্গের সিল্কের পেনী, ফ্রক, বডিস্, জ্যাকেট, শেমিজ, গাউন, পার্শী শাড়ী, বোম্বাই শাড়ী, বেণারসী শাড়ী প্রভৃতি পরাইয়া সৌখীন করিয়া তোলেন। সুতরাং তাঁহারও চিত্রাঙ্গদা নাম সার্থক।

তাহার পর, চিত্রাঙ্গদা চিত্রবাহনের একমাত্র সন্তান। চিত্রবাহনের পুত্র নাই। আজকাল বাঙ্গালীর ঘরে প্রায়ই সুপুত্র দেখা যায় না। অনেক পিতাই পুত্রের দুঃশীলতায় মরমে মরিয়া প্রার্থনা করেন, পুত্রে কাজ নাই; কন্যাই ভাল। কন্যার মায়া দয়া থাকে; পুত্র বিবাহ করিলেই পর হইয়া যায়। সেই জন্য আদর্শ (ideal) পিতা চিত্রবাহন অপুত্রক। 'অজাত-মৃত-মূর্খাণাং বরমাদ্যৌ ন চান্তিমঃ।' ইহা অপেক্ষা দৌহিত্রের হাতে পিণ্ডের আশা করাই ভাল।

চিত্রবাহন চিত্রাঙ্গদাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছেন। করিবেন না? মনুর উপদেশই যে 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।' অন্যার্থঃ, কাশীদাস,—'পুত্রবৎ করি কন্যা করিবে পালন।' আদর্শ বাঙ্গালী পিতা কন্যাকে স্কুলে পাঠান, পুঁতুল খেলা ছাড়াইয়া স্বাস্থ্যের জন্য ছেলেদের সঙ্গে হুটাহুটি ছুটাছুটি খেলান, ইতিহাস ভূগোল পড়ান, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়াইয়া তাহার প্রকৃতি পুরুষের ন্যায় পরুষ করিয়া তোলেন। সবই কাব্যে বর্ণিত চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে ঠিক ঠিক মিলিতেছে।

অর্জ্জুন আদর্শ বাঙ্গালী বর (বীর নহেন)। অর্জ্জুনের জন্যই তাঁহার

তাহার পর কাব্যের প্রথম স্তর, অরণ্যে চিত্রাঙ্গদার অর্জ্জুনের দর্শনলাভ ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তাঁহার প্রত্যাখ্যান। এ স্থলে বাল্যে শুভব্রাহ্মবিবাহবদ্ধ বর-বধূর প্রথম আলাপ রূপক-রূপে (allegorically) বর্ণিত। বঙ্গীয় বর ছাত্র অর্থাৎ ব্রহ্মচারী অবস্থায় বিবাহ করে, তখন সে অনাসক্তচিত্তে স্কুলের পড়া মুখস্থ করিতেছে, বালিকাবধূর আত্মসমর্পণ তখন তাহার নিকট 'অরণ্যে রোদন'। (কবি কেমন সুকৌশলে অরণ্যে এই দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন।) তখন সেই চেলীর পুঁটুলির ভিতর এমন কিছুই রূপ রস গন্ধ থাকে না যে, যোগিবর তাহা দ্বারা আকৃষ্ট হইবেন। তখন তাহার অবয়বে কোনও স্ত্রীচিহ্ন প্রকটিত হয় নাই; কাযেই কবির কথায় সে 'বালকমূর্ত্তি।' শরীরতত্ত্বও নাকি এ কথায় সায় দেয়।

বালিকা হইলেও তাহার পক্ষে এরূপ আত্মসমর্পণ স্বাভাবিক ও শোভন। চিত্রাঙ্গদা যে পার্থকে বাল্যাবধি ধ্যানজ্ঞান করিয়াছেন, তিনিই, সেই মানসদেবতাই, আদর্শপুরুষরূপে সম্মুখে উপস্থিত। হিন্দুকন্যাগণ বাল্যকাল হইতেই পতিলাভের জন্য শিবপূজা করে; বাল্যকাল হইতেই পতির মানসী মূর্ত্তি পূজা করে, পতিকে পরমদেবতা বলিয়া জানে; তাহার শিক্ষাই এইরূপ, সে হিন্দুর মেয়ে। শুভদৃষ্টির সময়েই সে আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলে [বর কিন্তু—'শুধু ক্ষণেকের তরে চাহিলা মুখপানে, নাচিল অধরপ্রান্তে স্নিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃদু হাস্যরেখা, বুঝি সে বালকমূর্ত্তি হেরিয়া'।] ইহা যদি নির্লজ্জার ব্যবহার হয়, তবে ভগবান্ করুন, যেন এই নির্লজ্জতা হিন্দুকন্যার চিরভূষণ হয়। আদর্শ সতী সাবিত্রী, দময়ন্তী যাহা করিয়াছিলেন, তাহাই আর্য্যাচার। তদতিরিক্ত যাহা, তাহাই ম্লেচ্ছাচার। [এটুকু প্রবন্ধলেখকের উচ্ছ্বাস, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অঙ্গীভূত নহে।]

তাহার পর, কাব্যের দ্বিতীয় স্তর। বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই কন্যার নারীভাব জাগিয়া উঠে, বরের মন না পাইয়া মরমে মরিয়া যায়, আর আকুল-হৃদয়ে প্রার্থনা করে, 'ঠাকুর, রূপ দাও, যেন বরকে আপন করিয়া নারীজন্ম সার্থক করিতে পারি।' ঘরে ঘরে এই লীলা; কবির উদ্ভট সৃষ্টি নহে, তবে রূপকটা কবিপ্রতিভা-প্রসূত। মদন ও বসন্ত প্রার্থনা পূর্ণ করেন। যথা-সময়ে শেলী-বায়রণ-পড়া বঙ্গীয় বরের কাছে যৌবন রূপের ডালি ধরে, নারীর প্রথম যৌবনের সেই স্বপ্নময় মোহময় আকর্ষণে অর্জ্জুনের ব্রহ্মচর্য্যব্রতভঙ্গ হয়, পাঠাভ্যাসে বিঘ্ন জন্মে, রূপজ প্রীতির বন্যায় তাঁহার হৃদয়-নদীর দুই কূল

ভাঙ্গিয়া যায়, এবং সেই স্রোতে তাঁহার সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা ভাসিয়া যায় (ও তিনি যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল হইতে আরম্ভ করেন—অতি প্রত্যক্ষ ঘটনা।) নারীর এই বয়ঃসন্ধিকাল, 'শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল' লইয়া সমগ্র বৈষ্ণব-সাহিত্য মস্‌গুল।* কুরূপা চিত্রাঙ্গদাকেও তখন সুরূপা দেখায়। অবশ্য মদনের এই দান দিবামানস্থায়ী বা বর্ষস্থায়ী নহে। ইহাও একটা রূপক, যতক্ষণ ভোগকাল, ততক্ষণ ইহার স্থিতি। [বাস্তবিক, কাল একটা নির্দ্দিষ্ট জিনিস নহে, ইহা মানসিক অবস্থা দ্বারা পরিমিত ; প্রেমিকের চক্ষে কখনও বা 'in a minute there are many days', কখনও বা 'অবিদিতগতযামা রাত্রিরেবং ব্যরংসীৎ', 'অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্' ইত্যাদি ইত্যাদি।]

এই মিলনের স্থান শিবমন্দির। শিবমন্দির অবশ্য একটা রূপক। হিন্দুবিবাহে যে একটা নিরাবিল পবিত্রতা, একটা নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা, একটা মঙ্গলজ্যোতিঃ আছে, শিবমন্দির তাহাই সূচিত করিতেছে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পূর্ব্বরাগ ও প্রথম মিলন পবিত্র তপোবনে, আবার শেষ মিলনও পবিত্র তপোবনে। দুর্গেশনন্দিনী ও জগৎসিংহের প্রথম সাক্ষাৎকার শিবমন্দিরে। [ইংরেজ-নারীর প্রথম প্রেমসঞ্চার বল-রুমে ঘটিয়া থাকে, টীকা অনাবশ্যক।] শিবমন্দিরে মিলন, বিষ্ণুমন্দিরে নহে ; কেন না, শিবপূজা করিয়াই বালিকারা অভীষ্ট বর পায়, ভগবান্ একলিঙ্গেশ্বর বিবাহের প্রকৃত ঘটক।

তাহার পর, কাব্যের তৃতীয় স্তর। যুবতীর রূপযৌবন চিরদিন থাকে না, রূপতৃষ্ণার নেশা ছুটিলে অতৃপ্তি আসে। অর্জ্জুনের সেই দশা ঘটিল। ইহারই ঝঙ্কার পুরুষকবি হেমচন্দ্রের 'এই কি আমার সেই জীবনতোষিণী ?'-তে শুনিতে পাই। যদি স্ত্রীকবি কনকতারা, রজতধারা, বা ঐরূপ আর কেহ নারীর আত্মধিক্কার লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে চিত্রের অন্য দিক্‌টাও দেখিতে পাইতাম। [সুরেন্দ্রনাথ হয় ত বলিবেন, hermmaphrodite কবি হইলে দোতরফাই গাহিতে পারেন।] অর্জ্জুন এখন বুঝিয়াছেন, রূপের অতিরিক্ত একটা কিছু চাই, নতুবা মনকে বাঁধা যায় না, 'বুকে রাখিবার ধন

---

* আধুনিক কাব্যে বৈষ্ণব সাহিত্যের লালসাটুকু আছে, ভক্তিটুকু নাই। ইহাও একটা 'চার্জ্জ'। কিন্তু দোষ কি একা রবীন্দ্রনাথের ? 'এই সেই নবদ্বীপে'র কবি কি নেড়ানেড়ীর

দাও তারে', 'শুধু শোভা, শুধু আলো, শুধু ভালবাসা'য় পেট ভরে না। চিত্রাঙ্গদাও বুঝিয়াছে, রূপের রজ্জুতে বাঁধিয়া সুখ নাই, সেও রূপের অতিরিক্ত একটা কিছুর জোরে পুরুষের হৃদয় বাঁধিতে চাহে। এই আত্মধিক্কার বুদ্ধিমতী বঙ্গনারীমাত্রই অনুভব করেন—'আমার রূপযৌবন যতদিন, পতির ভালবাসা'ও ততদিন ; তিনি আমাকে ভালবাসেন না, আমার রূপযৌবনকে ভালবাসেন।' কবে তিনি 'আমাকে' ভালবাসিবেন, ইহাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা। ইহাই প্রকৃত আত্মার মিলন। দেহের মিলন ইহার নিম্ন সোপান। পীরিতি-লতা অন্যান্য লতার ন্যায় রূপকাঠী অবলম্বনে বাড়িতে থাকে, তখন রূপ-কাঠীই তাহার মরণকাঠী জীবনকাঠী ; কিন্তু তাহার পর মাচায় বা গৃহের চালে ছড়াইয়া পড়ে, তখন সেই ফলফুলশোভিতা শাখা-প্রশাখাযুক্তা লতা প্রৌঢ়া সন্তানবতী গৃহিণীরূপে গৃহ আলোকিত করে। মূল গল্পে (মহাভারতে) চিত্রাঙ্গদার সন্তান-জন্মের পরই অর্জ্জুন তাঁহাকে ছাড়িয়া যান ; কেন না, সচরাচর দেখা যায়,সন্তান-লাভের পরই বাঙ্গালীরমণীর রূপ ঝরিয়া যায় (সুরুচির খাতিরে গ্রাম্যপ্রবাদবাক্য উল্লেখ করিতে পারিলাম না), রেশমের গুটী কাটিয়া সুঁয়া পোকা বাহির হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কল্পনা অনেক উচ্চে। তিনি রূপজ মোহের ঊর্দ্ধে যে আর একটা গাঢ়তর দাম্পত্য-প্রেম আছে, তাহা দেখাইয়াছেন। ইহাই কাব্যের চতুর্থ স্তর।

কিছু দিন হইতেই অর্জ্জুন রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গুণের ব্যাখ্যান লোকমুখে শুনিতেছেন। 'স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্য্যে যুবরাজ।' 'কর্ম্মকীর্ত্তি বীর্য্যবল শিক্ষা দীক্ষা তাঁর।' 'বীর্য্যসিংহ পরে চড়ি জগদ্ধাত্রী দয়া।' অর্জ্জুন এই গুণবতী নারীর প্রতি আগ্রহান্বিত, তিনি জানেন না, ইনিই তাঁহার সহচরী। রূপে তৃপ্তি হয় নাই, তিনি আজ গুণের কাঙ্গালী। তাঁহার হৃদয় রূপরজ্জুর বন্ধনে বাঁধা না থাকিয়া গুণের বন্ধন চাহে। সমস্তটাই রূপক।

জনশ্রুতি=পাড়াপড়্সীর প্রশংসা, পুরনারীগণের ব্যাখ্যান। 'আহা বৌটি যেন লক্ষ্মী, মুখে কথা নাই, যেন দশ হাতে গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করে, এমন কর্ম্মিষ্ঠা বধূ আজকালকার দিনে দেখা যায় না' ইত্যাদি। বাঙ্গালীর মেয়ের বীর্য্য কিছু আর প্রমীলা বা নৃমুণ্ডমালিনীর মত লড়াই ফতে করিতে ধাবিত হইবে না। তাঁহার অশ্রান্ত শ্রমশীলতাই 'কর্ম্মকীর্ত্তি বীর্য্যবল।' তিনি হিন্দুর আরাধ্যা শক্তিরূপিণী জগদ্ধাত্রী দেবী। এই গৃহ-'রাজ্যের রক্ষক রমণী।' একাধারে পুরুষের বীর্য্য, নারীর কোমলতা, ইহাই হিন্দু স্ত্রীতে

দেখিতে পাই। (বঙ্কিমচন্দ্রের প্রফুল্লকে দেখুন) কিন্তু অর্জ্জুন (বর) প্রথমে বুঝিতে পারেন না যে, এই বিচিত্র-কর্ম্মকুশলা চিত্রাঙ্গদা তাঁহার সহচরী হইতে অভিন্ন। একান্নবর্ত্তী হিন্দু-পরিবারে যে প্রেমপ্রতিমা 'অর্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে সুপ্তছনে শয্যাগৃহে' আসিয়া স্বামীর সহিত মিলিত হয়েন, যাঁহার রূপরশ্মি কেবল নিশাকালেই চন্দ্রতারার ন্যায়, মল্লিকা শেফালিকার ন্যায় ফুটিয়া উঠিয়া 'শুধু আলো, শুধু শোভা, শুধু ভালবাসা' ঢালিয়া দেয়, তাহার ভিতরে যে এত গুণ আছে, তাহা নবীনবয়সে যুবক পতি কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। এসেন্স দেলখোসের সৌরভে যে ক্ষারগোময়ের গন্ধ ঢাকা আছে, খস্‌খস্ সাবানের কৃপায় যে হাঁড়ীর কালী ধুইয়া গিয়াছে, চম্পককলি অঙ্গুলিগুলি যে সারাদিন সংসারের যাঁতা ঘোরাইয়াছে, তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারেন না। তাহার পর, যখন রূপতৃষ্ণার ঘোর কাটিয়া যায়, গুণের জন্য আকুলতা আসে, তখন বুঝেন যে, উভয় মূর্ত্তিই এক। এইখানেই গ্রন্থের সমাপ্তি। তখন Courtshipএর পালা সমাপ্ত। সেই দিন হইতে বর-বধূ গৃহী ও গৃহিণী হইলেন। এই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অবসানে আমিও অর্জ্জুনের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া বলি,—'আজ ধন্য আমি।'

সমালোচনার পূর্ব্বে সমালোচ্য পুস্তকখানি একবার পাঠ করা আবশ্যক, এরূপ একটা কুসংস্কার (superstition) অনেকের আছে। কিন্তু আশা করি, আমার পাঠকবর্গ মার্জ্জিতরুচি, তাঁহাদের এরূপ prejudice নাই। গ্রন্থপাঠ না করিয়াও উৎকৃষ্ট সমালোচনা লিখিতে পারেন, বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমালোচকের অভাব নাই। বিশেষতঃ,* যখন শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের প্রবন্ধে জানিলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যখানি পাঠ করিয়াও ভুল করিয়াছেন, বা ভুলিয়া গিয়াছেন, তখন কাব্যপাঠ না করাই নিরাপদ, ভুল হইবার সম্ভাবনা একেবারেই থাকিবে না। তবে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, পাকা সমালোচক সেন মহাশয় যেরূপ নিপুণতার সহিত প্রায় সমস্ত কাব্যখানিই পুনর্মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে কাব্য-পাঠের পরিশ্রম-স্বীকার আর আবশ্যক হইতেছে না। উপসংহারে বলিয়া রাখি, এই প্রবন্ধের উৎকট মৌলিকতার জন্য কাব্যপ্রণেতা ও পূর্ব্ববর্ত্তী সমালোচক-গণ দায়ী নহেন। তবে ইহা নিরবচ্ছিন্ন খেয়াল কি ইহাতে সত্যের কোনও ভিত্তি আছে, সে বিচারের ভার পাঠকের উপর।

সহযোগী সাহিত্য।

বুদ্ধাস্থি।

গত সেপ্টেম্বর মাসের 'ইণ্ডিয়ান রিভিউ' নামক পত্রে প্রত্নতত্ত্ববিৎ-স্বাক্ষরিত একটি প্রবন্ধে নবাবিষ্কৃত বুদ্ধাস্থি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আলোচিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহাশয় লিখিয়াছেন যে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত পেশোয়ার অঞ্চলে সম্প্রতি যে বুদ্ধাস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কার। গত ত্রিশ বা ততোধিক কালের মধ্যে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্ত্তৃক এরূপ উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার আর হয় নাই। এই আবিষ্কারে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ জয়যুক্ত হইয়াছে। এই আবিষ্কার-সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ পাঠ করিলে, এই আবিষ্কারের গৌরব বিশেষরূপে অনুভব করা যায়। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে মুঁসে ফুঁচে নামক জনৈক ফরাসী পণ্ডিত সীমান্তপ্রদেশে পর্যটন করিতেছিলেন। ঐ সময় পেশোয়ার সহর হইতে অর্দ্ধ-মাইল দূরে এক [illegible] তিনি দুইটি অদ্ভুত স্তূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন। ঐ স্তূপ দুইটি দেখিয়া তাঁহার কৌতূহল অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, ভারতীয় প্রত্ন-তত্ত্বানুসন্ধান-বিভাগের ডিরেক্টর শ্রীযুত মার্শাল ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার স্পুনার দুই বৎসর পূর্ব্বে ঐ স্তূপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করেন। তাঁহারা অত্যন্ত অধ্যবসায়-সহকারে ঐ স্তূপ খনিত করিতে থাকেন। ঐ দুইটি স্তূপের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর, সেটি খনিত করিয়া ডাক্তার স্পুনার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক কোনও পদার্থই প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু ক্ষুদ্রতর স্তূপটি খনিত করিয়া তাঁহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। এইটি খনিত করিয়া তিনি একটি বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ মন্দিরটির এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তার ২ শত ৮৫ ফিটের কম নহে। তাহার পর আরও গভীরতর খাত খনিত করিয়া, প্রস্তরভেদ করিয়া, তিনি ইষ্টকরচিত গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পান। উহাতেও চূর্ণকাম ও পঙ্কের কার্য্যের চিহ্ন বর্ত্তমান। তাহাতে মধ্যে মধ্যে সমাহিত বুদ্ধের মূর্ত্তি অবস্থিত, এবং অনেকগুলি চতুষ্কোণ স্তম্ভ বিরাজমান দেখিতে পাইলেন। এই স্থানে তিনি এক শত নানা কারুকার্য্যে খচিত চতুষ্কোণ মৃন্ময় পাত্র পাইয়াছিলেন। উহাদের আকৃতি অনেকটা প্রাচীন ব্যাবিলন সহরে প্রচলিত প্লেকের (plaque) মত। উহার পালিশ কাঁচের মত। তাহার উপর প্রাচীন বৌদ্ধ খরোষ্ঠী অক্ষরে কি লেখা আছে। অক্ষরগুলি এখনও পড়া হয় নাই। আরও অধিক দূর খনিত করিয়া তিনি একটি সুবিস্তৃত চত্বর প্রাপ্ত হন। উহার চারি দিকে সোপানশ্রেণী বিরাজমান। ইহার ভিতর সুড়ঙ্গ করিয়া তিনি সেই স্তূপের মধ্যপ্রদেশে উপনীত হন। তথায় সমাধিমন্দিরে তিনি একখানি প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রস্তরখানি পাইবার জন্যই তিনি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছিলেন। তথায় তিনি দেখিলেন যে, সেই সমাধিমন্দিরের ছাদ পতিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ গৃহেরই একটি কোণে ছাদ হইতে পতিত একখানি প্রস্তর-আঘাতে অংশতঃ ভগ্ন সেই অভীপ্সিত বস্তু তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

মরিচা ধরিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা দৈর্ঘ্যে সাত ইঞ্চি, প্রস্থে পাঁচ ইঞ্চি; বর্ত্তমান যুগে সুন্দরীগণ পাউডার মাখিবার যে পাফ-বাক্স ব্যবহার করেন, খৃষ্ট জন্মিবার সময় গ্রীকমহিলাগণ সেরূপ অলঙ্কারের বাক্স ব্যবহার করিতেন, সেইরূপ একটি বাক্স আধারের মধ্যে পাওয়া গেল। বিশেষ পরিষ্কৃত করিয়া খরোষ্ট্রী অক্ষরে কি লেখা আছে, তাহাও পঠিত হইল। ইহার উপরিভাগে বুদ্ধদেবের উপবিষ্ট মূর্ত্তি, এবং উভয় পার্শ্বে দুইটি বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি: সম্ভবতঃ উহা ব্রহ্মা ও ইন্দ্রেরই প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহাদের পদতলে লিখিত আছে—'সর্ব্বাস্তিবাদিন সম্প্রদায়ের গুরুদিগের পদে প্রণাম'। ঐ বাক্সের উপরিভাগে একটি প্রস্ফুটিত কমল বিদ্যমান; সম্ভবতঃ, ঐ কমলের মধ্যভাগেই এই তিনটি পিত্তল-মূর্ত্তি বসান ছিল। পাউডার বাক্সের ডালা যেরূপ ভাবে খোলা হয়, এই বাক্সের ডালাটিও ঠিক সেইরূপ ভাবে খোলা যায়। বাক্সের চারি পাশে অনেকগুলি রাজহংস, পুষ্পমালা ও কণিষ্কের নাম ক্ষোদিত রহিয়াছে। সর্ব্বনিম্নে লিখিত আছে:—'মহাসেনদেইয়ের বিহারের (লিঙ্গরমার কণিষ্কের মন্দির) প্রধান ইঞ্জিনিয়ার 'আগিসালাস'।' ইহা হইতে ঠিক হইয়াছে যে, বাক্সটি গ্রীক-কারিগর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। প্রত্নতত্ত্ববিৎও ঠিক ঐ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমাদের মতে, কেবল নাম দেখিয়াই ঐ বাক্সের নির্ম্মাতাকে গ্রীক বলিয়া সিদ্ধান্ত করা নিরাপদ নহে। প্রথমতঃ, ঐ অক্ষর এখন অত্যন্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। অনেক অক্ষর এখনও পড়া যায় নাই। তাহার উপর পরিষ্কৃত করিতে যাইয়া অনেক অক্ষর নষ্ট, অপরিষ্কৃত ও বিকৃত হইয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ, নির্ম্মাতা যখন নিজে তাঁহার অন্য কোনও পরিচয় দেয় নাই,—তখন নামের একটু সামঞ্জস্য পাইয়াই উহা গ্রীকের প্রস্তুত, এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার প্রকৃষ্ট কারণ দেখা যায় না। এই পাত্রের ভিতর স্ফটিকাধারে তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দগ্ধ অস্থি রক্ষিত ছিল। ঐ অস্থি তিনখানি বুদ্ধদেবের অস্থি।

হুয়েন সিয়াঙের বিবরণ-পাঠে জানিতে পারা যায় যে, উত্তরভারতে কণিষ্ক মহাপ্রতাপশালী নরপতি ছিলেন; পেশোয়ারেই তাঁহার রাজধানী ছিল। এই রাজধানীর অনতিদূরে তিনি বুদ্ধাস্থি রাখিবার জন্য একটি বিহার বা মন্দির নির্ম্মিত করেন। হুয়েন সিয়াঙের বিবরণ-পাঠে জানা যায় যে, কণিষ্ক যে স্থানে নূতন স্তূপ নির্ম্মিত করেন, সেই স্থানে পূর্ব্ব হইতে একটি স্তূপ ছিল। চীনপরিব্রাজকের সময়ে ঐ দুইটি স্তূপই বর্ত্তমান ছিল, এবং লোকে রোগমুক্ত হইবার মানসে ঐ স্থানে যাইত। কণিষ্ক ঐ স্থানে যে স্তূপ দেখিয়াছিলেন, কোনও সময় সেই স্তূপ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন। সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে অশোক এই স্থানে বুদ্ধাস্থি বিতরিত করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মের দিক ভিন্ন অন্য দিক দিয়া বিবেচনা করিলেও, এই আবিষ্কার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, চীনপরিব্রাজকের কথা কিম্বদন্তীর উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। ইহা ভিন্ন বৌদ্ধ শ্রমণগণ সুদূর এসিয়া মাইনর পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতেন, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্ট জন্মিবার ১২০ বৎসর পরে কণিষ্ক রাজ্য করিয়া গিয়াছেন। খোতান অঞ্চলে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত করিয়াছিলেন, চীন ও পার্থিয়ার সম্রাট্‌গণকে তিনি যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ জাপান ও চীনে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম-বিস্তারের সহায়তা করিয়াছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রেনান খৃষ্টের সমকালে এসিয়া মাইনর, ব্যাবিলন ও জুডিয়ায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ছিল বলিয়া যে অনুমান করিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। প্রত্নতত্ত্ববিৎ এইরূপ অনেক কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু ভারতের অতীত গৌরব-কাহিনী যে অন্ধকারে ডুবিয়াছে, এইরূপ আবিষ্কারের ক্ষীণালোকে তাহা সম্যক্ উদ্ভাসিত হইবে কি?

ক্ষুদ্র-জীব।

—— ঃ০ঃ ——

জগৎ চৈতন্যময়। এখানে অচেতন কিছুই নাই। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"; সুতরাং সবই চেতন। আধুনিক বিজ্ঞানও ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছে। (১) জগতে সকলই অণু, পরমাণু, পরংপরমাণুর (২) সমষ্টি। এ সকল কি? ইহারা জ্ঞানচৈতন্যের অবস্থান্তরমাত্র। (৩) এ কথা এ দেশে বহুপুরাতন।

সকলই যদি চেতন হইল, সকলই যদি জ্ঞানময় হইল, তবে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবেরও যে জ্ঞান থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। জ্ঞান-বিরহিত চৈতন্য হইতেই পারে না। যেখানে চৈতন্য, সেইখানেই জ্ঞান; পরিস্ফুট হউক, আচ্ছন্ন হউক, জ্ঞান থাকিবেই। চৈতন্যই জগতে একমাত্র সত্তা; তিনি সত্য, তিনি জ্ঞান, তিনি অনন্ত, তিনি আনন্দ; সুতরাং চৈতন্য জ্ঞানময়। জীব যত ক্ষুদ্রই হউক, তাহার জ্ঞান থাকিবেই।

জগতে ক্ষুদ্র-জীবের (Microbe) সংখ্যা অগণ্য। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্রজীব বর্ত্তমান। ইহারা দ্বিবিধ; কতকগুলিকে উদ্ভিদ ও অপর-গুলিকে জন্তু বলা যায়। ইহাদিগের মধ্যেও কেহ ছোট, কেহ বড়; কিন্তু সকলেই এত ছোট যে, অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ না করিলে দেখাই যায় না। ইহাদিগের অনেকের আয়তন মনে ধারণা করা অসম্ভব। সূচির ছিদ্র কত ক্ষুদ্র; তাহার মধ্য দিয়াই এক সঙ্গে যাহারা লক্ষ লক্ষ গলিয়া যাইতে পারে, তাহাদিগের আয়তন কি মনে কল্পনা করা যায়? ইহাদিগের মধ্যে অনেক জীব এইরূপ আয়তনের। (৪) এত ক্ষুদ্র-দেহেও জীবন-ধারণ ও বংশ-রক্ষণোপযোগী সমস্ত অঙ্গই আছে। ইহারা কেহ বা এককোষিক, অপরে বহু-কৌষিক। যাহারা বহুকৌষিক, তাহাদিগের দেহকোষও বংশরক্ষক (৫)

---

(১) The modern conception of matter tends to make the whole world alive.—T. A. Thomson.

(২) ion.

(৩) For that reason we regard matter, or the electrons of which matter is composed, as Mind-Stuff.—Origin of Life. p. 338.

(৪) * * They are so small that millions of them may swim through the eye of a needle.—Micro-organism, p. 34. (Griffiths)

(৫) যে কোষ দেহগঠন করে, তাহা দেহরক্ষক (Somatic) কোষ; আর যাহাতে বংশ-

কোষের গঠনও জটিল। এত জটিলতা ঐ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দেহে! তার পর অনেকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল অতি পরিস্ফুট, উদর বিলক্ষণ ভোজনপটু, মুখ (এই ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের দিনেও) প্রায় সর্ব্বগ্রাসী। (১) এত ক্ষুদ্র দেহে এ সকল পৃথক্‌রূপে অবস্থিত! স্থান কৈ? থাকে কোথায়? ভগবানের কি আশ্চর্য্য কৌশল! তিনি এই সকল অতীব ক্ষুদ্র জীবকেও কিরূপভাবে নানাবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সুসজ্জিত করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

আবার ইহাদিগের মধ্যেও জাতিভেদ আছে; সকলে একজাতীয় নহে। উহারা উদ্ভিদ ও জন্তুর ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। ইহারা এত দূর জাত্যভিমানী যে, একজাতীয়েরা অপরজাতীয়ের সহিত একত্র বাস কিংবা পান-ভোজন করিতে সম্মত হয় না। একখানি কাচের রেকাবে বিভিন্নজাতীয় ক্ষুদ্র জীবকে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত (culture) করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহারা পৃথক পৃথক জাতি পৃথক পৃথক স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে। এক স্থানে আনিয়া দিলেও সরিয়া গিয়া পৃথক স্থানে অবস্থিতি করে। ইহাদিগের মধ্যে গোরা আদ্‌মী কালা আদ্‌মীর প্রভেদ আছে কি না, জানি না। কিন্তু পরস্পরের সম্প্রীতিটা উহাদিগের অপেক্ষা কোনও অংশেই ন্যূন নহে। যাক্, সে কথা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ইহারা নিজ নিজ জাতি চিনিয়া লয় কেমন করিয়া? ইহারা নিশ্চয়ই আপন জাতি চিনে; নতুবা নিজজাতীয়ে ও পরজাতীয়ে প্রভেদ করিতেই পারিত না। এত ক্ষুদ্রেরও আত্মপরিচয় আছে!

তাহার পর, ইহাদিগের আর এক অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা অত্যন্ত উদর-পরায়ণ; সর্ব্বদাই আহারান্বেষণ করে; তথাপি শাস্ত্র-বহির্ভূত খাদ্যে ইহাদিগের মতি নাই। ইহাদিগের স্মৃতিশাস্ত্রে যেরূপ আহার যে জাতীয়ের পক্ষে বিধিবদ্ধ আছে, ইহারা কদাচ তাহা লঙ্ঘন করে না। যদি মানব-জাতীয় কোনও দুষ্ট বৈজ্ঞানিক গোপনে ইহাদিগকে খাদ্যের সহিত অখাদ্য মিশ্রিত করিয়া দেয়, উহারা তৎক্ষণাৎ তাহা ধরিয়া ফেলে; এবং অখাদ্য স্পর্শও করে না; কেবল নিজের খাদ্যটি গ্রহণ করে। উহারা যে বুঝিতে না পারিয়া অখাদ্য গ্রহণ করিয়া পরে তাহা ত্যাগ করে, এমন নহে। উহারা প্রথম হইতে বুঝিতেই পারে, সেই হেতু অখাদ্য স্পর্শই করে না। অ্যালবুমেন (Albumen) ও পাথর কয়লার চূর্ণ এক সঙ্গে

মিশাইয়া দিলে, কয়লার চূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া অ্যাল্‌বুমেনই আহার করে। যা পায় তা খায়,—এ কথা মানব-শিশুর প্রতি প্রযোজ্য হইলেও, উহাদিগের প্রতি প্রযোজ্য নহে। উহারা স্ব স্ব আহার বাছিয়া লইতে পারে। (১) এ শক্তি কি ?

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ইহাদিগের আত্মপরিচয় আছে। এখন দেখিতেছি, ইহাদিগের বস্তুজ্ঞানও আছে। কিন্তু ইহাদিগের রণ-নীতির কথা মনে করিলে একবারে বিস্মিত হইতে হয়। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে, গোপনে অপর জীবদেহে প্রবেশ করিবার সুবিধা এমন কাহারও নাই। চিরাতীত কাল হইতেই ইহারা এই ব্যবসায় করিয়া আসিতেছে ; ইহারা গোপনে জীবদেহে প্রবেশ করে, তখন বুঝাই যায় না। তা'র পর, ক্রমে ক্রমে আশ্রয়-দাতার প্রাণ সংশয়াপন্ন করিয়া তুলে। মানবজাতির মধ্যে ইহাদিগের উপমেয় আছে কি না, তাহা বলা বিপজ্জনক ; এখন ত বলিবই না। কিন্তু ইহারা একবার জীবদেহে প্রবেশ করিতে পারিলে আর নিস্তার নাই। তবে ভাল মন্দ সকলের মধ্যেই আছে। কেহ নিরীহ আশ্রয়দাতার কোনও অপকার করে না ; অথবা অপরের আশ্রয় গ্রহণই করে না। কিন্তু অনেকেই অপর জীবদেহে নানাবিধ পীড়ার উৎপাদন করে। ইহাদিগকে মারাত্মক বলা যায়। ম্যালেরিয়া জ্বর, যাহাতে বাঙ্গালী জাতিকে প্রায় নির্ম্মূল করিতে বসিয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্র জীবেরই কর্ম্ম। নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, খক্‌খক্ কাশি (whooping cough) হাম, বসন্ত, উপদংশ, মেহ, প্লেগ, ডিপ্‌থিরিয়া, কুষ্ঠ, ধনুষ্টঙ্কার ইত্যাদি নানাবিধ পীড়া, এই সকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র জীবেরই কর্ম্ম। ইহারা দেহমধ্যে প্রবেশ করিবার পর, ক্রমে আপন ধ্বংসক্রিয়া বিকাশ করে। কিন্তু দেহরক্ষক রক্তকীটগণ (Phagocytes) সহজে তাহা করিতে দেয় না। উহারাও ক্ষুদ্র, এবং উহারাও কীট। কীট হইল ত কি ? সহজে আপন আবাসভূমি আগন্তুককে বিধ্বস্ত করিতে দিবে, এত দূর কাপুরুষতা কীটেরও নাই। রক্তকীটগণ প্রাণান্ত সংগ্রাম করে। যদি পরাস্ত হয়, আগন্তুকগণ দেহকে যমালয়ে প্রেরণ করে। আর যদি প্রবিষ্ট ক্ষুদ্র কীটগণই পরাস্ত হয়, তবে দেহ রোগমুক্ত হয়। এ কথা চিকিৎসা-শাস্ত্রের। ইহাতে আমাদিগের

---

(১) Microbes are capable of discriminating between bits of albumen and particles of coal. * * * They do not feed blindly upon every substance

তাদৃশ প্রয়োজন নাই। কিন্তু ক্ষুদ্র কীটগণের রণ-নীতির প্রতি লক্ষ্য করুন। উহারা প্রত্যেকেই সেনা ও সেনাপতি। শত্রুহস্তে কাহারও নিধন হইলে, অপরে তৎক্ষণেই তাহার স্থান অধিকার করে। (১) রক্তকীটগণ যতই অধিক সংখ্যায় ইহাদিগকে আক্রমণ করে, ইহারাও রণস্থলেই বংশবৃদ্ধি করিয়া (২) ততই অধিক সংখ্যায় রক্তকীটগণকে আক্রমণ করে। ক্ষুদ্র কীটগণ রক্তকীটের দেহসংলগ্ন হইয়া এমনই অঁকড়াইয়া ধরে যে, একেবারে প্রাণান্ত না হইলে আক্রান্তকে কখনই ছাড়ে না। রক্তকীট ও ক্ষুদ্রকীটের সংগ্রাম অতি ভীষণ। একের জয়ে রোগমুক্তি, অপরের জয়ে মৃত্যু।

এই সকল ক্ষুদ্র কীটের দেহ ও মনের কথা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ইহাদিগেরও মানসিক শক্তি আছে, মানসিক ক্রিয়া আছে। ইহারা ভাল আহার, মন্দ আহার বাছিয়া লইতে পারে ; নিজ জাতি অপর জাতি বুঝিতে পারে। নিজ-জাতীয়ের সঙ্গে আনন্দ-উৎসব, ক্রীড়া-কৌতুক করে ; (৩) অপর-জাতীয়ের সহিত মেশামেশি করেই না। ইহারা আহারান্বেষণের নিমিত্ত অপর জীব-দেহে প্রবিষ্ট হইয়া রক্তকীটগণের সহিত তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত হয়, এবং তাহাতে যেরূপ বিক্রম, দৃঢ়তা ও প্রাণান্ত-পণ প্রদর্শন করে, তাহা লর্ড কিচেনারেরও অনুকরণীয়। এ সকল গুণের উপর ইহাদিগের একতা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত গুণ কি? ইহা কি আধ্যাত্মিক গুণ নহে? আমি বলি ইহা তাহাই। ৪) অন্ততঃ, ইহা যে ঐরূপ গুণের পূর্ব্বাভাস, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যদি করেন, তবে অদ্যকার মত তাঁহাকে আমি আর কিছুই বলিব না।

শ্রীশশধর রায়।

---

(১) ক্ষুদ্র-জীব একটি হইতে অহোরাত্রিতে ৮০,০০,০০০ লক্ষ উৎপন্ন হয়। কেহ বা তাহারও অধিক।

(২) আমি অণুবীক্ষণের মধ্যে জল-বিন্দুতে কয়েকটি ক্ষুদ্র কীট দেখিয়াছি। তাহারা পরস্পর দৌড়াদৌড়ি ও তাড়াহুড়া করিতেছিল ; আর ঘোড়দৌড় খেলার মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া চক্র দিতেছিল।

(৩) They (microbes) exercise a choice and as Dr. G. J. Romanes F. & S. has observed, the power of choice may be regarded as the criterion of Psychic faculties.—Ibid p. 120.

(৪) অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া (Reflexation) হইলেও ইহাই আধ্যাত্মিক ভাবের পূর্ব্বগামী অবস্থা।

রঙ্গা ও হীরা।

পঞ্চনদ প্রদেশে সাধু-সন্ন্যাসীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। সেখানে প্রাচীন-যুগের সুপ্রসিদ্ধ যোগী গোরক্ষনাথের অনেক ভক্ত বাস করেন। "যোগী টিলা" নামক পাহাড়ের উপর গোরক্ষনাথ দেবের একটি মঠ আছে। এই মঠে এক জন মোহান্ত ও অনেক সাধু-সন্ন্যাসী বাস করেন। পঞ্জাবের আদম-সুমারি রিপোর্ট পাঠে জানিতে পারা যায়, যোগীটিলার এই মোহান্তের অনেক শিষ্য আফগানরাজ্যে বাস করেন। তাঁহারা সকলেই হিন্দু। যোগীটিলার যোগীদিগকে মুসলমানেরা পর্য্যন্ত যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া থাকেন।

যে সকল পর্য্যটক যোগীটিলার পাহাড়ে ভ্রমণ করিতে যান, তাঁহারা একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের উপর কতকগুলি কড়ি ও গুড় প্রভৃতি সিন্নীর উপকরণ দেখিতে পান। স্থানীয় ভক্তেরা রঙ্গা নামক এক জন পরলোকগত সাধুর আত্মার প্রীত্যর্থ সময়ে সময়ে এই স্থানে সিন্নী দিয়া যান। প্রেমিক সাধু রঙ্গার কাহিনী অতীব হৃদয়-স্পর্শী ও সকরুণ; কাব্যে তাহা স্থান পাইবার যোগ্য। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে এ পর্য্যন্ত এই অপরূপ কাহিনীর কোনও আলোচনা দেখিতে পাই নাই।

প্রেমিক সাধু রঙ্গা যৌবনকালে একদিন শুনিতে পান, হীরানাম্নী একটি পল্লী-যুবতী রূপে ও গুণে অতুলনীয়া। পল্লী-অঞ্চলের কবি ও গায়কগণের মুখে হীরার রূপ-গুণ-সম্বন্ধীয় নানাবিধ গান শুনিয়া রঙ্গা তাহার প্রেমে আকৃষ্ট হইলেন, এবং হীরার পিতৃগৃহে ছদ্মবেশে রাখালী চাকরী গ্রহণ করিলেন। রঙ্গা তখন নবীন যুবক। তিনি বড় সুপুরুষ ছিলেন; হীরা তাঁহার রূপ-গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার প্রণয়ে মুগ্ধ হইল।

অল্পদিন পরে হীরার ভ্রাতৃবধূ বুঝিতে পারিল, হীরা তাহাদের বাড়ীর রাখালের প্রেমে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। গুপ্তপ্রেম অনেক সময়েই গোপনে থাকে না। হীরার ভ্রাতৃবধূর সন্দেহ ক্রমে প্রতীতিতে পরিণত হইল। সে তাহার শ্বশুরকে সকল কথা বলিয়া রঙ্গাকে পদচ্যুত ও গৃহ হইতে বিতাড়িত করিল। তখন পর্য্যন্ত হীরার বিবাহ হয় নাই; কলঙ্কগোপনের জন্য হীরার পিতা আর একটি যুবকের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন।

অবমানিত রঞ্জা মনের দুঃখে সংসার ত্যাগ করিয়া যোগী হইলেন। কিন্তু হীরার আশা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। হীরার নিকট বিদায়-গ্রহণের সময় তাহাকে বলিয়া চলিলেন, "তোমার বিরহে আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না; আবার তোমার সহিত আমার মিলন হইবে।"

যোগিবেশধারী রঞ্জা নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে যোগীটিলায় উপস্থিত হইলেন, এবং আমরা ইতিপূর্ব্বে যে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছি, তাহার উপর বসিয়া মধুর-স্বরে বাঁশী বাজাইতে লাগিলেন। বাঁশী কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার নিদারুণ বিরহ-বেদনা পরিব্যক্ত করিতেছিল; তাহাতে কত বিষাদ, কত ব্যাকুলতা, কত দীর্ঘশ্বাস, তাহা যে সেই বংশীর ধ্বনি শুনিল, সেই বুঝিতে পারিল।

এই বংশীর ধ্বনি যোগীটিলার মোহান্ত সুবিখ্যাত গোরক্ষনাথ দেবের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি মঠের বাহিরে আসিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"কে তুমি এখানে বসিয়া বাঁশী বাজাইতেছ? তোমার বংশীর স্বরে অনুমান হইতেছে, তুমি কোনও সংসার-বিরাগী যোগী; যদি তুমি সত্যই যোগী হও, তাহা হইলে তুমি অনায়াসে আমার মঠে প্রবেশ করিতে পার; আর যদি তুমি যোগী না হও, তাহা হইলে কোন্ সাহসে আমার মঠের নিকটে আসিয়া বাঁশী বাজাইতেছ?"

রঞ্জা গোরক্ষনাথ দেবের কথা শুনিয়া বাঁশী ফেলিয়া দিয়া যুক্তপাণি হইয়া ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন; তাহার পর মাথা তুলিয়া যোগিবরকে বলিলেন, "প্রভু, আমি এখনও যোগাশ্রম অবলম্বন করি নাই; কিন্তু সংসারে আর আমার স্পৃহা নাই। যদি আপনি আমাকে কৃপা করেন, তাহা হইলে আপনার শ্রীচরণাশ্রয়ে থাকিয়া যোগ-সাধনায় কালযাপন করি।"

যোগী গোরক্ষনাথ রঞ্জার মনোহর রূপ, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ও ভক্তিপূর্ণ ভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং তাঁহার হৃদয়ে তৎপ্রতি বাৎসল্য-রসের সঞ্চার হইল। তিনি রঞ্জাকে মঠে গ্রহণ করিয়া কিছুকাল শিষ্যের কর্ত্তব্য শিক্ষা দান করিলেন। যোগী গোরক্ষনাথ, "কাণ্-ফট্" যোগি-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি রঞ্জার কাণ ফুঁড়াইয়া তাহাকে যথারীতি স্বীয় সম্প্রদায়ে দীক্ষিত করিলেন।

গোরক্ষনাথ দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়শিষ্য রঞ্জা সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক ও

করিলেন। রঞ্জা অনেক ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে তাঁহার গুপ্তপ্রেমের কাহিনী সবিস্তার গুরুর কর্ণগোচর করিলেন, এবং বলিলেন, "গুরুদেব আপনি আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমি প্রিয়তমা হীরার সহিত মিলিত হইতে পারি, নতুবা আমি এই দুঃসহ বিরহভার বহন করিতে পারিব না।" রঞ্জা গুরুর পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিলেন। গোরক্ষনাথ বলিলেন, "তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

রঞ্জা গুরুর আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া হৃষ্টচিত্তে মঠ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং কিছু দূরে নদীতীরে আসিয়া ধুনীর আগুন জ্বালিলেন। এই নদীর অপর তীরে হীরার পিত্রালয়। রঞ্জা সেই স্থানে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই চতুর্দ্দিকে সংবাদ প্রচারিত হইল যে, নদীতীরে এক জন সাধু আসিয়া তপস্যা করিতেছেন; তাঁহার যেমন অপরূপ রূপ, তেমনই অলৌকিক যোগ-শক্তি। এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশে কোথাও সাধু-সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইলে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহাকে মনের দুঃখ-বেদনা জানাইবার নিমিত্ত, তাঁহার নিকট নিত্য বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে; যোগি-সন্ন্যাসীর নিকট এ দেশের শুদ্ধান্ত-বাসিনী পুরনারীবর্গেরও বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা নাই। রঞ্জার অলৌকিক শক্তির কথা শুনিয়া বহু পল্লী হইতে পুরনারীগণ সেই নবীন সন্ন্যাসীকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন তাঁহার আশ্রমে সমাগত হইতে লাগিলেন।

ক্রমে হীরার কর্ণেও এই সংবাদ প্রবেশ করিল। তাহার সন্দেহ হইল, হয় ত এই যোগীই তাহার প্রিয়তম রঞ্জা। একদিন সে তাহার ভ্রাতৃবধূর অনুমতি লইয়া যোগি-সন্দর্শনে যাত্রা করিল। সে নদী পার হইয়া রঞ্জার আশ্রমে আসিয়া জটাজূট-ধারী বিভূতি-বিভূষিত রঞ্জাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল। রঞ্জার সহিত গোপনে তাহার পরামর্শ হইয়া গেল যে, রঞ্জা প্রত্যহ রাত্রে নদী পার হইয়া তাহার গৃহে যাইবেন।

তাহার পর হইতে রঞ্জা প্রতিরাত্রে তাঁহার প্রিয়তমার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন; সুদীর্ঘ বিরহের পর পুনর্ব্বার উভয়ের মিলন হইল; উভয়ের সময় পরমানন্দে অতিবাহিত হইতে লাগিল। রঞ্জা প্রত্যহই প্রিয়তমার নিকট যাইবার সময় একটি পাত্রে মাছের ঝোল লইয়া গিয়া

একদিন বর্ষার রাত্রে নদীতে প্রবল বন্যা উপস্থিত হওয়ায় রঞ্জা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও মাছ পাইলেন না; প্রিয়তমার নিকট শূন্যহস্তে যাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না; তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজের উরু হইতে কিয়দংশ মাংস কাটিয়া লইয়া তাহাই রন্ধন করিলেন, এবং পাত্রপূর্ণ মাংস লইয়া প্রিয়তমা-সম্ভাষণে যাত্রা করিলেন।

রাত্রে আহারের সময় হীরা সেই মাংস মুখে দিয়া রঞ্জাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"এ কিসের মাংস? ইহা ত মাছ নয়, শশকমাংস বা মেষমাংসও নয়; তুমি আমার জন্য এ কিসের মাংস আনিয়াছ? আমি এ মাংস খাইতে পারিতেছি না।"

রঞ্জা কোনও কথা না বলিয়া মৃদুহাস্যে তাঁহার উরুদেশের ক্ষত হীরাকে প্রদর্শন করিলেন। হীরা সেই ক্ষত দেখিয়া সকলই বুঝিতে পারিল। তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না; তাহার প্রতি রঞ্জার প্রেমের প্রগাঢ়তা দেখিয়া তাহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সে রঞ্জার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল, "প্রিয়তম তুমি আমাকে কত ভালবাস, তাহার পরিচয় পাইলাম; কিন্তু আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি, সে পরিচয় তুমি আজও পাও নাই; এখন হইতে পাইবে। আর তোমাকে কষ্ট করিয়া অন্ধকার রাত্রে নদী পার হইয়া আসিতে হইবে না। ভবিষ্যতে এই সুবিস্তীর্ণ নদী আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাইতে সমর্থ হইবে না; কাল হইতে প্রতিরাত্রে আমি একটি বড় ঘড়ার উপর ভর দিয়া নদী পার হইয়া সেখানে তোমার সহিত মিলিত হইব।"

তাহার পর হীরা প্রতিরাত্রে একটি সুবৃহৎ ঘড়া লইয়া গোপনে গৃহত্যাগ করিত, এবং সেই ঘড়া জলে ভাসাইয়া তাহার উপর ভর দিয়া সন্তরণপূর্ব্বক নদীর অপর পারে উঠিত। অন্ধকার রাত্রি, কোনও দিকে জন মানবের সাড়া শব্দ নাই, আকাশ নিবিড় মেঘে সমাচ্ছন্ন, মুষল-ধারে বারিবর্ষণ হইতেছে, এক হাত দূরের বস্তু দেখা যায় না; বর্ষার নদী উভয় কূল প্লাবিত করিয়া মহাবেগে প্রবাহিত হইতেছে,—হীরার সে দিকে লক্ষ্য থাকিত না; জল হউক, ঝড় হউক, সৃষ্টি রসাতলে যাউক, হীরা প্রতিরাত্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঘড়াটি কক্ষে লইয়া নদীবক্ষে ঝম্পপ্রদান করিত, এবং রঞ্জার পর্ণ কুটীরের আলোক দেখিয়া নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেও যথাস্থানে

এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। গুপ্তপ্রেমের কথা গোপন থাকিবার নহে। হীরার ভ্রাতৃবধূ তাহার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিত; এবং কয়েক দিবসের মধ্যেই বুঝিতে পারিল, হীরা তাহার গুপ্ত প্রণয়ীর নিকট যাইবার জন্য ঘড়ায় ভর দিয়া নিশীথ রাত্রে নদী পার হয়। হীরার ভ্রাতৃবধূ তাহার এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল-দানের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। অবশেষে একদিন সন্ধ্যার পর, হীরার ঘড়াটি যেখানে থাকিত, সেই স্থানে সেই ঘড়ার অনুরূপ একটি মৃৎকলস রাখিয়া ঘড়াটি স্থানান্তরিত করিল। এই কলসটি কাঁচা মাটীতে নির্ম্মিত, পোড়ান নহে।

হীরা অন্যান্য দিনের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট সময়ে সেই মৃৎকলসটি লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। সেই কলসটি যে পিত্তল-নির্ম্মিত কলস নহে, অন্ধকারে তাহা সে বুঝিতে পারিল না; প্রণয়ীর সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষায় সে এরূপ ব্যাকুল হইয়াছিল যে, তাহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছিল; নতুবা কাঁচা মাটীর কলসীকে পিতলের কলসী বলিয়া তাহার ভ্রম হইবে কেন? বোধ হয়, অবৈধ প্রেমের আকর্ষণ মানব-হৃদয়ে চিরকালই এইরূপ প্রবল; এই জন্যই বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের সর্পে রজ্জুভ্রম হইয়াছিল, নদীবক্ষে প্রবাহিত বিগলিতপ্রায় মৃতদেহ কাষ্ঠখণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল।

হীরা সেই মৃৎকলসে ভর দিয়া নদী পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল; জল-সংস্পর্শে অল্পক্ষণের মধ্যেই কলসের মৃত্তিকা গলিয়া গেল, এবং অর্দ্ধ পথ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই কলস জলমগ্ন হইল! হীরা বিপদ বুঝিয়া অর্দ্ধ-মগ্ন অবস্থায় কাতরস্বরে নদীগর্ভ হইতে তাহার প্রিয়তমের নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, বিপদে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য অনুরোধ করিল। সেই ঘোর অন্ধকারপূর্ণ রজনীতে নিস্তব্ধ নদীবক্ষ হইতে উত্থিত আর্ত্তনাদ নদীর অপর তীরে কুটীরবাসী রঙ্গার কর্ণে প্রবেশ করিল। হীরা নদীবক্ষে কোনরূপে বিপন্ন হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া রঙ্গা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি কুটীর ত্যাগ করিয়া দ্রুতবেগে নদীতীরে উপস্থিত হইলেন, এবং নদীগর্ভে লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক হীরার আর্ত্তনাদ লক্ষ্য করিয়া সন্তরণ করিতে লাগিলেন। রঙ্গা ডাকিলেন, "হীরা, হীরা তুমি কোথায়?" হীরা ডুবিতেছিল। প্রাণপণে সে একবার জলের উপর ভাসিয়া উঠিল, কাতরকণ্ঠে বলিল, "আমি গভীর জলে ডুবিয়া মরি, আমাকে রক্ষা কর।" রঙ্গা সবেগে সন্তরণ করিয়া হীরার নিকট আসিতে লাগিলেন, কিন্তু সেই অন্ধকারে হীরাকে আর

দেখিতে পাইলেন না। হীরার দেহ অবশ হইয়াছিল, সে গভীর জলে নিমগ্ন হইল। রঞ্জা আবার ডাকিলেন "হীরা, হীরা!" কিন্তু এবার আর কেহ তাঁহার আহ্বানের উত্তর দিল না। রঞ্জা উন্মত্তপ্রায় হইয়া হীরার সন্ধানে ডুব দিলেন, আর উঠিলেন না। এইরূপে হতভাগ্য প্রেমিকযুগলের ইহজীবনের অবসান হইল।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

জটিল চিঠি।

ধন্য ধন্য হে অজ্ঞেয় প্রিয় বন্ধুবর!
পেলেম বুঝি তোমারি এ পত্র;
নাম ঠিকানা লিখেছ যে খামে—কি সুন্দর,
কিন্তু বুঝা যায় না একটি ছত্র।
বোধ হচ্ছে দিয়েছ তুমি আমায় পত্রখানি,
তাহার কারণ,—ডাকে এল হাতে;
পেয়েছি ঠিক্ আগষ্ট মাসের বিশে, সেটা জানি,
কারণ, পোষ্টের ছাপ রয়েছে তাতে।
সই করেছ তেজে, যেন কেউটে আস্‌ছে তেড়ে,
ভয়েতে প্রাণ ধড়ে থাক্‌তে চায় না;
কি বীভৎস হিজি বিজি—ফাঁস টেনেছ বেড়ে,
তোমার নামটি না হয়ে সে যায় না!
কাব্যের চেয়ে মিষ্টি চিঠি—কাব্য পড়া যায় যে,
ভাল কাব্য বুঝা কঠিন বটে;
এ চিঠি সে কাব্যের সেরা—আঁখর চেনা দায় যে,
হাজার ধর চোখের সন্নিকটে।
চশমা নিয়ে, আইগ্লাস দিয়ে, অণুবীক্ষণ এনে,
বুঝ্‌তে নার্‌লেম তোমার লেখাটা কি?
দেখ্‌লাম রৌদ্রে, জ্যোচ্ছনাতে, বিজলী-বাতি টেনে,
এখন কেবল রঞ্জেন-রে-টা বাকি!
কি বিচিত্র তোমার পত্র! সন্ধ্যাবেলা এসে,
কাড়াকাড়ি করেন বন্ধুগুলি;—

পরস্পরে তর্ক তুলি' বিবাদ করেন শেষে—
শুনান তোমায় কতই মধুর বুলি।
বৈজ্ঞানিক এ পত্র দেখে স্পষ্ট বল্লেন,—হেন
সজীব জড়ের স্পন্দন-রেখা আঁকা,
রাসায়নিক বিস্ফোরকের গন্ধ পেয়ে যেন,
ফেরৎ দিলে মুখটি করে বাঁকা।
এঞ্জিনিয়ার বল্লেন দেখে,—"অস্পষ্ট এ প্ল্যানটি!"
"প্রেস্ক্রিপ্‌শন্ এ"—ডাক্তার বল্লেন কেশে;
রুদ্ধস্বরে বল্লেন কবি,—"নায়িকার এ গানটি
চোখের জলে কতক গেছে ভেসে!"
ফটোগ্রাফার বল্লেন দেখে,—"বেজায় 'ফেডেড্' এ যে,
আঁক্‌তে গেলে পেন্টার চাই যে পাকা!"
উকীল নিয়ে বল্লেন,—"জবাব দিচ্ছি আমি তেজে!"
পড়তে গিয়ে লাগ্‌ল ভ্যাবাচাকা!
বিদ্যাভূষণ বল্লেন,—"এ যে পালি ভাষার ছায়া!"
জ্যোতিষী কন,—"মঙ্গল গ্রহের ভাষা!"
চিঠি দেখে যে বর্ণকে বলেন 'ক'-এর কায়া,
পাল্টে তাকেই 'হ' যে বলেন খাসা!
এই রকমে বিদ্যা জাহির কচ্চেন সবাই যার যে,
সরল পথের দিক্ দিয়ে কেউ জান না;
তোমার জটিল চিঠি হ'তে বুঝছি এখন সার যে,—
হৃদয়খানি খুলতে কেহই চান্ না।

শ্রীরসময় লাহা।

মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা।

প্রবাসী। আশ্বিন। এবারকার 'প্রবাসী'র প্রথমেই 'কুম্ভকর্ণের যুদ্ধ' নামক একখানি চিত্র,—বীভৎস, রুদ্র, ভয়ঙ্কর! কুম্ভকর্ণের কল্পনাই বটে! উদ্ভটের এমন উদাহরণ সচরাচর বিরল, তাহা আমরাও স্বীকার করিব। 'প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতি'কে জিজ্ঞাসা

করিতে ইচ্ছা হয়,—'আর কত দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী?' শ্রীযুত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য' নামক নক্সাটি সুন্দর, সরস; তীব্র শ্লেষের তূণ। 'সংকল্প ও সমালোচনে' বৈচিত্র্য আছে, কিন্তু ভাষায় উদ্দাম যথেচ্ছাচারের প্রচণ্ড তাণ্ডব। স্বরলিপির গানে 'শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' ইতি 'লেবেল' না দেখিলে রচনাটিকে কোনও অনুকারীর রচিত 'হনুকরণ' বা হেঁয়ালি বলিয়াই মনে হইত। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়ের 'বাংগলা সংখ্যাবাচক শব্দ' একে শব্দ-তত্ত্ব, তাহার উপর দন্ত-প্যাটেন্ট বানান! সোনায় সোহাগা!—'অধ্বর্য্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ।' যোগেশ বাবুর নাম শুনিয়া পড়িবার লোভ হয়, কিন্তু তত্ত্বের ঘোর-ঘটার সঙ্গে নবোদ্ভাবিত বানানের সংযোগ—'পবনাগ্নিসমাগম' দেখিয়া সাধারণ পাঠক পশ্চাদ্গামী হইবেন।—এরূপ প্রবন্ধ পরিষৎ-পত্রে শোভা পায়,—পাঁচ ফুলের সাজিতে কঠোর শব্দতত্ত্ব, নালিতা, চিরেতা, শেঁকো প্রভৃতি খাপ্ খায় না। 'এক' 'বহু' হইয়াছিলেন বটে। প্রবাসীও কি সেই আদর্শে কখনও 'কৃষিগেজেট', কখনও সংবাদপত্র, কখনও 'প্রত্নকম্র-নন্দিনী'র রূপ ধারণ করেন? শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'দর্শন—হিন্দু ও গ্রীক' উল্লেখযোগ্য। শ্রীমহেশচন্দ্র ঘোষ প্রবাসীর আসরে 'অবিদ্যা'র বিশ্লেষণ করিতেছেন। শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য 'গোপীচাঁদের মাতা'র পরিচয় দিয়াছেন। সে পরিচয়ে বাঙ্গালী গৌরবান্বিত হইবেন। শ্রীশতদল-বাসিনী বিশ্বাসের 'আসামের অধিবাসিগণ' সুখপাঠ্য। বারাণসী-প্রবাসী ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় নামক যুবক-মহাজনের আদর্শে আপনার নামের পূর্ব্ববর্ত্তিনী 'শ্রী'কে মণিকর্ণিকায় বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ধন্যবাদ! 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'; ইশা-অনুসরণ ছিল, চারু-অনুসরণ হইল!—সে যাহা হউক, শ্রী-হীন ললিত বাবুর 'বুদ্ধের সমসাময়িক কোশল ও মগধ রাজা' উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক নিবন্ধ। কিন্তু লেখকের ভাষায় সংস্কৃতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব—প্রায় তারাশঙ্করের কাদম্বরী। আর একটু ছাঁকিয়া না লইলে এ ভাষা কখনও বাঙ্গালায় পরিণত হইবে না। কিন্তু লেখকের গবেষণা প্রশংসনীয়। শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক জন লেখক 'কলিকাতার নৈতিক অবস্থা'র যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে অনেক পতিতা, পলায়িতা, হতভাগিনী প্রভৃতির কাহিনী দেখিলাম। সুধীর যে ধীরচিত্তে কলিকাতার এই কেচ্ছা সংগ্রহ করিয়া 'প্রবাসী' নামক মুটের মাথায় দিয়া রাজপথে বাহির হইয়াছেন, তাহা দেখিয়া কোন 'বীর হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে সংগ্রামে?' কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—এ কেচ্ছাগুলি ভদ্রসমাজচারী মাসিকে ছাপিয়া লাভ কি? আর ঘটনাগুলি কি সম্পূর্ণ সত্য? সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। ২নং পাপের চিত্রে সুধীরচন্দ্র 'খালি বাড়ীর কাহিনী' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ৩নং পাপের আলেখ্যে সুধীরচন্দ্র লিখিয়াছেন,—'একদিন কলিকাতার কোন আফিসের এক কর্ম্মচারী আফিসেই নিজ পরিবারের কোন সংবাদ পাইয়া কোন প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানে চলিয়া যান। সেখানে আপন স্ত্রীকে কোন অজ্ঞাত যুবকের সহিত অসংযতভাবে মিশিতে দেখিয়া তাঁহার অঞ্চল হইতে সিন্দুক বাক্সের চাবির গোছা খুলিয়া এবং ৫ বৎসরের শিশু পুত্রকে ছিনাইয়া লইয়া স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া গৃহে চলিয়া যান। স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ সেইখানেই লোপ পায়। স্ত্রী এখন প্রকাশ্যে গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। তীর্থস্থান সকলের বাসাবাড়ীতে এইরূপ অসংযতভাবে মিশিবার যথেষ্ট সুযোগ থাকায় তৃষিত লোকেরা এই সকল স্থলে যে বাসনা পরিতৃপ্ত করে, তাহা সহজেই বুঝা

যায়।' লেখকের মতে এই কর্ম্মচারী হিন্দু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোধ করি, 'চাবির গোছা' ও 'শিশুপুত্র'কে লইয়া এই 'আফিসের কর্ম্মচারী' সুধীরচন্দ্রের সমাজেই প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিনাইয়া ফলাইয়া এই সকল কেচ্ছা পত্রস্থ করিলে 'প্রবাসী'র গ্রাহক বাড়বে, সে বিষয়েও আমাদের সংশয় নাই। কিন্তু ইহা কি ভদ্রসমাজের যোগ্য? ইহাও যে 'কলিকাতার নৈতিক অবস্থা'র ও রাজধানীর অন্য তীর্থের নৈতিক দুর্দ্দশার পরিচয় দিতেছে, সম্পাদক ও সুধীরচন্দ্র তাহা ভুলিয়া গিয়াছেন। উলঙ্গ কামের আশীর্ব্বাদে সুধীরচন্দ্র 'ভাবে' কুবের, কিন্তু ভাষায় একটু দীন। সুধীরচন্দ্র লিখিয়াছেন,—'অবস্থা ত' বর্ণনা করিলাম; এখন ইহা নিরাকরণের উপায় কি?' আপাততঃ 'নিরাকরণে'র উপায় 'প্রবাসী'র স্কন্ধে স্থিতি। তার পর, সুধীরচন্দ্র অভিধান খুলিয়া 'নিরাকরণে'র 'নিরাকরণ' করিতে থাকুন। সুধীরচন্দ্র অনেক সংস্কৃত বচন তুলিয়াছেন; কিন্তু লিখিয়াছেন,—'কামানাং উপভোগেন'! স্বরবর্ণ পরে থাকিলে 'ম্' স্থানে অনুস্বার হয় না,—ইঙ্গ-বাণীর বরপুত্র রামানন্দ বাবুর খাতিরেও নয়,—দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা সুধীরচন্দ্র হয় ভুলিয়া গিয়াছেন, নয় কখনও জানিবার অবকাশ পান নাই। তিনি লেখেন 'ভতৃহরি'; 'ভর্ত্তৃহরি' তাঁহার পছন্দ হয় না! তবে তাঁহার পক্ষসমর্থনেও বলা যায়, কলিকাতার নৈতিক অবস্থার সন্ধানে ফিরিবার সময় ব্যাকরণ ও অভিধান বগলে করিয়া ঘোরা যায় না! শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রত্যাগমন' নামক জাপানী গল্পটি মনোরম। সৌভাগ্যক্রমে শিক্ষানবীশ অনুবাদক ভাষা যোড়াস'াকোর ছাঁচে ঢালিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হফ্‌ম্যান ও ইংলণ্ডে রসায়নশিক্ষা' উল্লেখযোগ্য। এক রাশি কবিতার মধ্যে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক অনূদিত জালালউদ্দীন রুমির কবিতার অনুবাদই উল্লেখযোগ্য। শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামীর সঙ্কলিত 'বাদশাহী কুচ্' উপভোগ্য। লেখকের ভাষার আধ-আধ অস্পষ্টভাব, দেখিতেছি, অঙ্গারের মলিনতার ন্যায় চিরস্থায়ী। 'হস্তীর কর্ণের দুই দিকে মহার্ঘ বৃহৎ সুগোল মুক্তাগুচ্ছ ও তাহার গলদেশে স্বর্ণঘণ্টা বিলম্বিত থাকিত।' তাহার—কাহার? মুক্তাগুচ্ছের গলায় অবশ্য স্বর্ণঘণ্টা ঝুলিতে পারে না। কেন না, মুক্তার, বা তাহার গুচ্ছের গলা এ পর্য্যন্ত নরলোকের গোচর হয় নাই! অনর্থক 'তাহার' ব্যবহার করিয়া গোস্বামী মহাশয় মুক্তাগুচ্ছের গলায় ঘণ্টা ও ভাষার গলায় জগদ্দল পাথর ঝুলাইয়া দিয়াছেন! 'শ্রীঃ' স্বাক্ষর করিয়া যিনি 'মহাদেবের শ্মশ্রুমুণ্ডনে' 'সাহিত্য'-সম্পাদককে গালি দিয়াছেন, তাঁহার স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার বাস্তবিকই উপভোগ্য। তাঁহার মতে, 'শিব-তাণ্ডব' চিত্র সম্বন্ধে আমরা 'সাহিত্যে' যাহা লিখিয়াছি, তাহা 'সমালোচনা নয়, সদালোচনাও নয়, কিন্তু কুৎসা জল্পনা।' তাহা ছদ্মবেশীর মতে সমালোচনা না হইতে পারে, সদালোচনাও না হয় 'প্রবাসী' ও তস্য মুরুব্বীদিগের একচেটে; কিন্তু 'কুৎসা' কাহাকে বলে, তাহা এই আত্মগোপনকারীর জানা আছে কি? যাহাদের আত্মপ্রকাশ করিবার সাহস নাই, মুখোস পরিয়া ভাড়াটিয়া গুপ্ত-ঘাতকের মত যাহারা পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করে, তাহারা কৃপার পাত্র নয়, ঘৃণার পাত্র। এই ছদ্মবেশী কাপুরুষ লিখিয়াছেন,—'সমালোচক * * * ইতর ভাষায় গালি দিয়াছেন।' প্রথমে বলিলেন, 'সমালোচনা নয়, সদালোচনাও নয়।' আবার বলিতেছেন,—'সমালোচক'! উভয় উক্তিতে চমৎকার সামঞ্জস্য! তাহার পর বক্তব্য এই যে, 'ইতর ভাষা' সম্বন্ধে ছদ্মবেশী এমনতর 'ন্যাকা' সাজিলেন কেন? সে ভাষায় তিনি যে সিদ্ধহস্ত, তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছেন? শুধু ভাষা নয়, ভাবও যে তদ্রূপ! তিনি নিজেও কুমারটুলী অঞ্চলের কুম্ভকার-সম্প্রদায়ের প্রসাদেই প্রতিবাদের ভাষা সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহাও ত এই প্রতিবাদেই সুপ্রকাশ! অথচ 'ইতর ভাষা' সম্বন্ধে তাঁহার এমন 'অধ্যারোপ'—বস্তুতে অবস্তুর আরোপ—'রজ্জুতে সর্প-ভ্রম' ঘটিল কেন? কস্তূরী-মৃগ যেমন মৃগনাভির গন্ধে উন্মত্ত হইয়া চারি দিকে ছুটিতে থাকে, আপনার নাভিরন্ধ্রেই যে সেই গন্ধের কারণ বিদ্যমান, তাহা বুঝিতে পারে না, দেখিতেছি, এই ছদ্মবেশীর অবস্থাও সেইরূপ!—ভারত-শিল্প ও দেব-মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার অধিকার কেবল ঠাকুরবাড়ীর পটুয়া, পরিকর ও মুরুব্বীদিগকে ও তাঁহাদের বাহন 'প্রবাসী'কে কোন্ কর্ণওয়ালিস দলীল লিখিয়া দশশালা বন্দোবস্ত

করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু দেখিতেছি, সে অধিকার চিরস্থায়ী স্বত্বে পরিণত হইয়াছে! লেখকের মতে, আমাদের পক্ষে তাহার আলোচনা 'অনধিকারচর্চ্চা'। আর নির্লজ্জ স্তাবকদিগের তাহা 'স্বাধিকার'! কেন না, তাঁহারা মাইকেল এঞ্জিলো, র‍্যাফেল ও রস্কিনের অবতার! 'প্রাক্তনজন্মবিদ্যা'র ন্যায় শিল্প-বিদ্যাও তাঁহাদের ক্রীতদাসী! এ বিষয়ে তাঁহাদের 'অশিক্ষিত-পটুত্ব'! 'শ্রীঃ' বলেন,—আমরা দেবাদিদেব মহাদেবকে 'হাড়গিলা' বলিয়াছি!—শান্তং পাপম্,—প্রতিহতমমঙ্গলম্।' দেবাদিদেব মহাদেবকে কোনও হিন্দু 'হাড়গিলা' বলিতে পারে না। আমিও বলি নাই। আমি নন্দলালের তুলিকার বরপুত্র জীববিশেষকে উক্ত পক্ষীর সহিত তুলিত করিয়াছিলাম। 'শ্রীঃ' সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহা 'দেবাদিদেব মহাদেবে' আরোপ করিয়াছেন! কিন্তু 'মিছা কথা ছেঁচা জল কতক্ষণ রয়?'—'শ্রীঃ' হয় শঙ্করাচার্য্য, নয় কুক্কুটমিশ্র শর্ম্মা—যিনি 'বেদান্তশাস্ত্রানি দিনত্রয়ং, আত্রায় চ তর্কবাদান্' তর্কক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই 'এক-রত্তি' প্রতিবাদে তিনি নিজের বিদ্যার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার বহর দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। 'পুরাণ, উপপুরাণ, কাব্য, সাহিত্য,'—এমন কি, 'রূপমালা, স্তবমালা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও শিল্পশাস্ত্র'—সব এই অজ্ঞাতকুলশীল কুক্কুটমিশ্র শর্ম্মার মস্তিষ্কে—যদি থাকে —'মরীনৃতাতে!' আমাদের অত বিদ্যা নাই। মহাদেবের শ্মশ্রু ছিল কি না, আমরা পরে তাহার আলোচনা করিব। তাহা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু গোঁপ ছিল কি না? থাকিলে সে গোঁপ কোথায় গেল?—উপসংহারে 'প্রবাসী'র সম্পাদক 'টিপ্পনী' করিয়াছেন,—'যাঁহারা শ্রীযুত নন্দলাল বসু মহাশয়ের এই চিত্রখানির উৎকর্ষ বুঝিতে চান, তাঁহারা সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউয়ে ভগিনী নিবেদিতা ও ডাক্তার কুমারস্বামীর তৎসম্বন্ধে মন্তব্য পাঠ করুন। কিন্তু যদি কেহ তাঁহাদের ইংরাজী বুঝিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া original হইতেই হইবে।' অর্থাৎ, যাহারা 'ভারতীয় চিত্র-কলা-পদ্ধতি'র রসগ্রহণে অক্ষম, তাহারা ইংরাজী জানে না! আর যাহারা ভগিনী নিবেদিতা ও কুমারস্বামীর মতগুলি নির্বিচারে শিরোধার্য্য করিতে না পারে, তাহারা মূর্খ! ছাত্রজীবনে বরং এরূপ বিদ্যার 'গুমোর' শোভা পাইতে পারে, কিন্তু এখন পর-ব্রহ্মের দিকে পা,—'গঙ্গার দিকে পা' তাঁহার পক্ষে খাটে না,—'পলিতচ্ছদ্মনা' জরা বলিতেছে,—'শেষের সে দিন মন কররে স্মরণ!—এখনও সেই ময়ূর-প্রকৃতি কি শোভা পায়? না হয় দু' পাতা ইংরাজীই পড়িয়াছেন,—কিন্তু যা পড়েন নাই, তা যে সমুদ্রের ন্যায় বিশাল! বিড়ালাক্ষী ভারতী আমাকে দয়া করেন নাই বলিয়া আপনি ইঙ্গিতে উপহাস করিয়াছেন। কিন্তু নিজের ধর্ম্ম, নিজের শাস্ত্র, নিজের দর্শন, নিজের তন্ত্র, নিজের সাহিত্য,—কি পড়িতে পারিয়াছি? সে দুঃখ রাখিবারই যে স্থান নাই! সুতরাং আপনার 'খোঁটা' শিরোধার্য্য করিলাম। কিন্তু আপনি 'স্বদেশী' বক্তৃতায় গোলদীঘী ও বীডন-বাগান প্রতিধ্বনি প্রতিধ্বনিত করেন, এখনও গোরার ভাবে এত মসগুল। ভ্রাতৃভাবে ভোর, অথচ ধরাকে—সরাও নয়—মধুপর্কের বাটী অপেক্ষাও ক্ষুদ্র জ্ঞান করেন! ছি!—ইংরাজীতেই ছাপা হউক, আর ভিক্রতেই লেখা হউক,—হাঁ করিয়া কিছু গিলিবেন না। একটু ভাবিয়া দেখিবেন,—গ্রহণীয় কি না। ভগবান সেই জন্যই স্কন্ধের উপর মুণ্ডটি বসাইয়া দিয়াছেন। চক্ষু দুটি কেবল বুজিবার জন্য নয়, দেখিবার জন্য। নিজেও দেখিতে শিখুন। কেবল কুমারস্বামী, নিবেদিতা প্রভৃতি পরের চক্ষু দিয়া জগতে,—অন্ততঃ আমাদের হিন্দু-জগতে শনির দৃষ্টি দিবেন না। হিন্দুর পয়সায় 'প্রবাসী' পুষ্ট হইতেছে,—চিত্রচ্ছলেও তাহাদের দেবতাকে বিকৃত করিয়া 'এক ঢিলে দুই পাখী' মারিবেন না। স্বীকার করিতেছি, আমরা ইংরাজী জানি না,—গোরাং-বাণীতে মূর্খ; এবং নিবেদিতা ও কুমারস্বামীকেও গুরু বলিয়া মানি না; কিন্তু যাহা জানি, অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনাকে তাহা নিবেদন করিলাম।

যশোর যুদ্ধ।

[সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত নিখিলনাথ রায় বি. এল্., সম্পাদিত "প্রতাপাদিত্য" নামক উপাদেয় গ্রন্থের অন্তর্গত ঘটক-কারিকা অবলম্বনে এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছে। ইহা তৃতীয় যুদ্ধ, এবং ত্রিদিবসব্যাপী। আমি যুদ্ধের বর্ণনা অন্যরূপ করিয়াছি, কিন্তু প্রত্যেক যুদ্ধের প্রত্যেক কলাকল যথাযথ রাখিয়াছি। যাঁহারা ঐতিহাসিক প্রতাপকে দেখিতে চাহেন, তাঁহারা নিখিল বাবুর উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিবেন। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ হইয়াছিল।—লেখক।]

১

কি সংবাদ—কি সংবাদ—জিজ্ঞাসিছে পরস্পর,
অতীব ব্যাকুল দৃষ্টি, অতীব কাতর স্বর।
সারা নিশা—সারা নিশা নৈর্ঋতে দিগন্ত-কোলে
আলোক-ঝলক-জ্বালা উঠেছিল জ্ব'লে জ্ব'লে!
সারা নিশা—সারা নিশা—গভীর কামান-ধ্বনি
আছাড়ি' ফাটিতেছিল গৃহচূড়া গণি' গণি'!
প্রভাত না হ'তে হ'তে জিজ্ঞাসিছে পরস্পর,
কি—সংবাদ—কি সংবাদ—অতীব কাতর স্বর।

২

প্রভাত-মধ্যাহ্ন গেল, ধীরে অপরাহ্ন আসে;
বাল-বৃদ্ধ পথ চাহি', নারীগণ দ্বার-পাশে।
দেশে নাহি যুবা কেহ, কে আনিবে সুসংবাদ—
কে আনিবে জয়ধ্বজা, সম্রাটের আশীর্ব্বাদ!
"খোল দ্বার, দুর্গরক্ষি! উঠ—উঠ—দুর্গশিরে,
দেখ দেখ,—না না, দেখ, কেহ কি আসিছে ফিরে?
শুনিছ কি তূর্য্যনাদ? দেখিছ কি শুভ্র কেতু?
দেখিছ অরণ্য-প্রান্তে যমুনার দীর্ঘ সেতু?"

৩

আসে এক অশ্বারোহী—ছুটে অশ্ব উল্কা হেন,
ভূমে পদ স্পর্শে কি না, দেহ—দীর্ঘ গ্রীবা যেন!

সর্ব্ব অঙ্গে স্বেদপুঞ্জ, নিশ্বাসিছে ধূমরাশি,
থামিল, কাঁপিল, ভূমে পড়িল তোরণে আসি'।
চকিতে নামিল যুবা ছিন্নকেতু বাম করে,
"কি সংবাদ"—সর্ব্বকণ্ঠে জিজ্ঞাসে কাতর-স্বরে।
কি বলিবে—কি বলিবে, কথা না খুঁজিয়া পায়,
কভু মৃত অশ্ব-পানে, কভু ভূমি-পানে চায়।

৪

ক্ষতদেহ, নতদৃষ্টি, যুবক জনতা-মাঝ,
শত দিকে শত কণ্ঠে—"কোথা—কোথা মহারাজ!
কোথা পুত্র—কোথা ভ্রাতা—কোথা বন্ধু—কোথা—পতি!
কোথা পিতা?" মাতৃকক্ষে শিশুরা কাতর অতি!
"কেন তারা ফিরিছে না? হয় নি কি রণশেষ?
বল—বল বিবরিয়া সম্রাটের কি আদেশ!
সৈন্য চাই?—অস্ত্র চাই?—অশ্ব চাই?—অর্থ চাই?
পীড়িত?—না ভীত তুমি?—পলায়ে এসেছ তাই?"

৫

আসিল নগরপাল, সস্নেহে ধরিয়া কর,
যুবকে লইয়া গেল শূন্য দুর্গ-অভ্যন্তর।
বসিল প্রবীণ-বৃদ্ধ—সবে যথাযথ স্থানে;
কত না উদ্যমে যুবা কহিল কাতর-প্রাণে—
"বন্দী আজ মহারাজ!" চকিত—বিস্মিত ভীত!
"না না—না না, সত্য কহ, চাহ যদি নিজ-হিত।"
ধীরে ধীরে, ক্রমে উচ্চে—ক্রমে বেড়ি' চারিধার,
সমস্ত নগরময় কি ভীষণ হাহাকার!

৬

"কুমার উদয়াদিত্য?" "হত তিনি কাল রণে!"
"সেনাপতি সূর্য্যকান্ত?" "হত সর্ব্ব সৈন্য সনে!"
"প্রতাপ, মদন, রঘু?" "তাঁহারা সকলে হত!
সব আশা—সব গর্ব্ব—মহারাজ-সনে গত!"

"না যুবক! মিথ্যা কথা! যাত্রাকালে মহারাজ
দেছেন নগর-ভার, আমরা রক্ষিব আজ!—
আমরা রক্ষিব দেশ, মুকুটে সাম্রাজ্যে বরি'!
বৃদ্ধ হই—ক্ষুদ্র হই, মৃত্যুরে নাহিক ডরি।"

৭

"হে দেব কেশব ভট্ট! পিতৃ-পিতামহগণ!
আমার জীবনে ইহা নহে ত প্রথম রণ।
মৌতলার জয়দীপ্তি—এ জয়-পতাকা ধরি'.
আমি ল'য়ে এসেছিনু মহারাজে অগ্রসরি'।
মথিয়া আজিম-সৈন্য, দলি' শঠ ভবেশ্বরে,
এসেছিনু জয়গর্ব্বে এ জয়-পতাকা করে।
ভ্রাতৃহীন, বন্ধুহীন, খিন্নদেহ, শূন্যপ্রাণ—
আসিয়াছি; রাখ আজ ছিন্ন পতাকার মান!"

৮

কহিল কেশব ভট্ট,—"নহি রে পাষাণ-হিয়া,
করিনি র্ভৎসনা তোরে, বল বৎস, বিবরিয়া!"
কহিল নগরপাল,—সপ্তপুত্রে নিঃসন্তান—
"হইয়াছে পরাজয়, হয় নি ত অপমান?"
কহিলেক দুর্গরক্ষী,—"আমি এই দুর্গস্বামী,
কে বা পুত্র—কে বা পৌত্র! এ দুর্গ রক্ষিব আমি।"
জননী বালকগণে পাঠাইল বীরবেশে,
দাঁড়াইল রচি' ব্যূহ নগর-তোরণে এসে।

৯

কহে যুবা,—"মানসিংহ—বাঙ্গালার সুবেদার,
হিন্দু নামে পরিচয়, হিন্দু-বিন্দু নাহি যার—
যবন-শ্যালকপুত্র, যবন-শ্যালক যিনি,
মৌতলায় দিলা হানা ল'য়ে সেনা অক্ষৌহিণী।
দ্বাবিংশ আমীর সঙ্গে, আর সঙ্গে কচুরায়,
গৃহভেদী, ছিদ্রান্বেষী, বিক্রীত যবন-পায়।

আত্মসুখী, মহাপাপী, মাতৃবক্ষ পদে দলি'
চায়—ঘৃণ্য অধীনতা—সম্পদ সম্ভ্রম বলি'।

১০

"প্রথম দিবস যুদ্ধে—মানসিংহ, কচুরায়
অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ রচি' আক্রমিল মৌতলায়।
ভীষণ গরুড়-ব্যূহ রচিয়া নয়ন-পলে
দাঁড়ালেন মহারাজ—সব্যসাচী, রণস্থলে।
বামে রুডা, সূর্য্যকান্ত, দক্ষিণে প্রতাপ, সুখ;
পশ্চাতে উদয়াদিত্য—অভিমন্যু হাস্যমুখ!
দক্ষিণে মদন মল্ল, বামে রঘু ভল্ল ধরি';
গর্জ্জিলেন মহারাজ,—'জয় মা যশোরেশ্বরি!'

১১

"বাজিল সমর-বাদ্য, ছুটিল সুতীক্ষ্ণ শর,
ছুটিল বন্দুক গুলি, ছুটে গোলা ভয়ঙ্কর!
ধূমাচ্ছন্ন রণস্থল, ছুটে রুডা দীপ্তরাগ,—
সম্মুখে দক্ষিণে ঘুরি' আক্রমিল পৃষ্ঠভাগ।
ছুটিল আমীরগণ, ফিরিল বিপক্ষ-গতি;
পুরোভাগ আক্রমিল সূর্য্যকান্ত ক্ষিপ্র অতি!
খড়্গে খড়্গ, ভল্লে ভল্ল, অশ্বে অশ্ব, গজে গজ,
আকাশ আচ্ছন্ন ধূমে, রক্তময় পৃথ্বী-রজ।

১২

"ছুটে মধ্যে 'রুদ্রকান্ত' শুণ্ড তুলি' হুহুঙ্কারি'—
ধূসর প্রলয়মেঘে বিশ্বজয়ী বজ্রধারী!
দক্ষিণে বিক্রমে রঘু, মদন আক্রমে বাম,
ছুটিছে—ফাটিছে গোলা বজ্রনাদে অবিশ্রাম!
ছুটিছে প্রতাপসিংহ পরিরক্ষি' পৃষ্ঠদেশ;
ভগ্ন 'ক্রমে' করে সুখা নবসৈন্য-সমাবেশ।
উদিছে উদয়াদিত্য যথায় নিবিড় রণ;

১৩

"সহসা বিপক্ষ-পক্ষে উঠে উচ্চ হাহাকার,—
'হত সেনাপতি গাজি!' ল'য়ে চর্ম্ম-তরবার,
লুকায়ে কামান-ধূমে ছুটিল পার্ব্বত্য সেনা,
গভীর বর্ষায় যেন পদ্মার সমল ফেনা!
একত্র, স্বতন্ত্র কভু, সম্মুখে, কভু বা দূরে;
পদাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত, খড়্গাঘাত ফিরে-ঘুরে।
মদন হানিল দর্পী মানসিংহে বারবার—
ছিন্ন গজ, ভূমিতলে বাঙ্গালার সুবেদার!

১৪

"মামুদ, আমীর, কচু—চঞ্চল বিহ্বল ত্রাসে,
রক্ষিবারে মানসিংহে ছুটিতেছে ঊর্দ্ধশ্বাসে!
ছুটে রুডা, সূর্য্যকান্ত, মিলিতে মদন-সাথে;
জর্জ্জর বিপক্ষ-সেনা প্রতাপের অস্ত্রাঘাতে।
পলাইল মানসিংহ, ছাড়ি' পঞ্চ ক্রোশ স্থান;
বাজিল বিজয়-বাদ্য—দিবা হ'লো অবসান।
আহতে পাঠায়ে গৃহে, দাহ করি' মৃত-জনে,
স্থানে স্থানে রাখি' রক্ষী, গেলা সবে ফুল্লমনে।"

১৫

কহিল কেশব ভট্ট,—"তুমি বৎস ভাগ্যবান!
স্বচক্ষে দেখেছ তুমি ভারতের উপাখ্যান।
ধন্য মাতর্বঙ্গভূমি! সুধন্য প্রতাপাদিত্য!
অধীনতা-মহাপাপ যাঁর নামে ক্ষয় নিত্য!
দেশভক্তি-বীজমন্ত্র রোপিলেন যিনি আজ—
দেহে বটে বন্দী তিনি, হৃদয়ে রাজাধিরাজ!
বাঙ্গালী বলিয়া গর্ব্বে—সাহসে একতা-বলে
আবার দাঁড়াব মোরা এ ছিন্ন-পতাকা-তলে!"

১৬

"দ্বিতীয় দিবস-যুদ্ধে প্রত্যুষে ঈশ্বরীপুরে
বিরচিল মানসিংহ চক্রব্যূহ ক্রোশ যুড়ে।

সার্দ্ধ লক্ষাধিক সেনা, দ্বাদশ আমীরে আর ;
তুরঙ্গ-বাহিনী সহ মামুদ রক্ষিছে দ্বার।
রচিলেন মহারাজ ত্বরিতে মকর-ব্যূহ।
দক্ষিণ নয়নে রুডা, অক্ষে সূর্য্যকান্ত গুহ ;
প্রতাপ মদন পক্ষে ; বক্ত্রে রঘু, পুচ্ছে সুখ ;
বক্ষে পুত্র, স্কন্ধে পিতা ;—তপন উদয়োন্মুখ।

১৭

"নমি' নবোদিত সূর্য্যে, রঘুরে ইঙ্গিত করি,
গর্জ্জিলেন মহারাজ,—'জয় মা যশোরেশ্বরি!'
বাজিল সমর-বাদ্য, গর্জ্জিল সৈনিকগণ,
ছুটিল সুতীক্ষ্ণ শর, বাধিল তুমুল রণ।
ছুটিছে—টুটিছে গোলা, ধূমে ধরা অন্ধকার,
দীর্ঘ-অসি-করে রঘু আক্রমিল ব্যূহদ্বার।
আবার হটিছে পিছে, পুনঃ আক্রমিছে বলে,
বার বার—একবার—ব্যূহদ্বার যদি টলে!

১৮

"পশ্চাতে প্রতাপ-সিংহ ল'য়ে রথ, ল'য়ে রথী,
রঘুরে আচ্ছাদি'—শর নিক্ষেপে মামুদ প্রতি।
কাঁপিতেছে ব্যূহদ্বার, রঘু লভিতেছে স্থান ;
রক্ষিতে মামুদে, দ্রুত মানসিংহ আগুয়ান ;
বর্ষিছে অজস্র শর প্রতাপে জর্জ্জর করি'।
রক্ষিতে প্রতাপে আসে সূর্য্যকান্ত অগ্রসরি'।
দক্ষিণ আক্রমে রুডা, মদন আক্রমে বাম,
ছুটিছে—ফাটিছে গোলা বজ্রনাদে অবিশ্রাম।

১৯

"প্রতাপ পড়িল রথে ; রঘু প্রবেশিল ব্যূহ ;
পার্শ্ব ভেদি' আসে রুডা, দ্বারে সূর্য্যকান্ত গুহ।
মামুদে বধিয়া রুডা, ধায় মানসিংহ প্রতি ;
ছুটিছে রুডার পিছে কুমার তড়িত-গতি।

রক্ষিবারে মানসিংহে ছুটিছে আমীরগণ ;
প্রবেশিছে ব্যূহমধ্যে বঙ্গসেনা অগণন।
বামে অবরুদ্ধ কচু যুঝিছে মদন-সাথ ;
গজে রথে ভগ্নপার্শ্ব মথিছেন বঙ্গনাথ।

২০

"আক্রমিল মানসিংহে রঘু রুডা দুই দিকে।—
নির্দ্দয় বিজয়-লক্ষ্মী চেয়ে আছে অনিমিখে!
যুঝিছে বিপক্ষ-সেনা, যুঝিছে আমীরগণ ;
যুঝে রঘু, যুঝে রুডা, যুঝে সূর্য্য প্রাণপণ।
স্তব্ধ গুলি, স্তব্ধ গোলা, সুধু চর্ম্ম-তরবার,
তোমর, মুদ্গর, ভল্ল,—বক্ষে বক্ষে, 'মার মার!'
পড়িল আমীরগণ ; পড়িল অসংখ্য সেনা ;
পড়িল ভূতলে রঘু ;—তবু তট ভাঙ্গিছে না!

২১

"সন্ধ্যা সমাগত হেরি', মাত্র অর্দ্ধ সেনা নিয়া,
পলাইল মানসিংহ অরণ্য-আঁধার দিয়া।
বাজিল বিজয়-বাদ্য—মুরজ, ঝাঁঝর, ঝাঁঝ।
প্রতাপে রঘুরে চাহি' কহিলেন মহারাজ,—
'এই ভাগ্য—বীরভাগ্য—চাহে বীর প্রতিদিন,
স্বর্গ যার কাছে তুচ্ছ, কাল যার পদে লীন!'
আহতে পাঠায়ে গৃহে, দাহ করি' মৃত-জনে,
স্থানে স্থানে রাখি' রক্ষী, গেলা সবে ফুল্লমনে।"

২২

উঠিল কেশব ভট্ট করি' জয়-জয়-নাদ—
"জনম-ভূমির তরে কার না মরিতে সাধ?
দিয়া এই তুচ্ছ দেহ, দিয়া এই তুচ্ছ প্রাণ—"
গর্জ্জিয়া উঠিল সভ্য,—"রাখিব মায়ের মান।"
কহিল নগরপাল,—"বৃথা দুঃখ, বৃথা শোক!
ভাঙ্গিছে—ভাঙ্গুক বক্ষঃ, প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ় হোক!
কত দূরে মানসিংহ—কত দূরে কচুরায়?
বল বৎস, শীঘ্র বল, সময় বহিয়া যায়।"

২৩

"তৃতীয় দিবস-যুদ্ধে পদ্মব্যূহ বিরচিয়া,
যশোর-প্রান্তরে আসি' অর্দ্ধলক্ষ সেনা নিয়া
দাঁড়াইল মানসিংহ ; কচুরায় পুরোভাগে।
নির্ম্মেঘ গগনে সূর্য্য উদিতেছে রক্তরাগে।
রচিলেন মহারাজ সূচীব্যূহ তীক্ষ্মমুখ,—
মুখে রুডা, পরে সূর্য্য ; পশ্চাতে মদন, সুখ।
কুমারে রাখিয়া পার্শ্বে, বসি' রুদ্রকান্ত'পরি,
গর্জ্জিলেন মহারাজ,—'জয় মা যশোরেশ্বরি !'

২৪

"বিমুখ যশোরেশ্বরী !' গরজিল কচুরায় ;
বিস্মিত বঙ্গজসেনা, পরস্পর মুখ চায় !
বিলম্বে অধীর রুডা, মহারাজ ক্রুদ্ধ অতি,
ছুটিল মন্দির-মুখে সূর্য্যকান্ত দ্রুতগতি।
কহিলেক মানসিংহ,—'কর রণ-পরিহার,
চল দিল্লীশ্বর-আগে, করিতেছি অঙ্গীকার,—
ক্ষমিব সকল দোষ, দিব চক্রপাল করি'।'
গরজিল কচুরায়,—'বিমুখ যশোরেশ্বরী !'

২৫

"কহিলেন মহারাজ,—'ধিক স্বার্থপরতায়!
কেমনে ভুলিলে তুমি অনারণ্যে, মান্ধাতায় ?
জন্মিয়া ইক্ষ্বাকুবংশে—যে বংশে জন্মিলা রাম,—
যাঁর পদরজে আজ এ ভারত পুণ্যধাম !—
ভুলি' সে দীলিপ, রঘু, ভরত, লক্ষ্মণ বলী—
বিদেশী—বিধর্ম্মি-পদে দেছ পুণ্য জলাঞ্জলি !
এসেছ দাসত্ব-গর্ব্বে,—ম্লেচ্ছ-পদরজ-ভালে,
স্বদেশী—স্বধর্ম্মী জনে বাঁধিতে দাসত্ব-জালে !

২৬

'আর এই কচুরায়—কাপুরুষ, নীচচেতা —
মাতৃহত্যা-প্রেতযজ্ঞে তোমার প্রধান নেতা,—

আছে মাত্র স্বার্থজ্ঞান, নাহিক সম্মান-বোধ,
ছলে বা পরের বলে, চাহে পিতৃহত্যা-শোধ!
লুটিতে পরের পদে নাহি লজ্জা, ঘৃণা তার,
তবু নাহি আহ্বানিবে দ্বন্দ্বযুদ্ধে একবার!
হউক জঘন্য-ঘৃণ্য, তবু সে বাঁচিতে চায়!'
'বিমুখ যশোরেশ্বরী!'—গরজিল কচুরায়।

২৭

"হানিলেন মহারাজ রোষে ভল্ল লক্ষ্য করি';
হত অশ্ব, লম্ফ দিয়া কচুরায় গেল সরি'।
'আরে ভীরু কাপুরুষ!—কত দিন জীবে আর
এস তবে মানসিংহ! দ্বন্দ্বযুদ্ধে একবার।
বিদেশীর প্রিয় ভৃত্য! স্বদেশীর চির-ভয়!
অস্ত্রে অস্ত্রে, বক্ষে বক্ষে, হোক শেষ পরিচয়।'
দাঁড়া'ল দু'পক্ষ-সেনা দু'ধারে কাতার দিয়া;
নির্ব্বাক, সাগ্রহ-দৃষ্টি, দুরু দুরু কাঁপে হিয়া।

২৮

বাণেতে ঠেকিছে বাণ, গুলিতে ঠেকিছে গুলি,
গজ আক্রমিছে গজে হুহুঙ্কারি' শুণ্ড তুলি'।
এই বসে, এই উঠে, এই ছুটে, এই থামে,
হেলিছে—দুলিছে কভু, ঘুরিছে দক্ষিণে বামে।
এই কাছে—দন্তে দন্তে, শুণ্ডে শুণ্ডে আকর্ষণ;
ওই দূরে—ফুৎকারিয়া শুণ্ড তুলি' গরজন।
হটিছে—আসিছে ছুটে,—সশৃঙ্খল শুণ্ডাঘাত—
ভগ্ন দন্ত, ছিন্ন তুণ্ড, সর্ব্ব অঙ্গে রক্তপাত।

২৯

ওই দূরে—পরস্পরে হানিছে সুতীক্ষ্ণ তীর,
জর্জ্জর নিষাদী, নাগ; জর্জ্জর উভয় বীর।
এই কাছে শূল শেল—ছিন্ন ধনু চূর্ণ ঢাল,
বিচূর্ণ আমাড়ি-দণ্ড, ছিন্ন ভিন্ন লৌহজাল।
হানিতেছে অর্দ্ধচন্দ্র, সূচীমুখ, খরশান,—

ঝর ঝর ঝরে রক্ত, ঝর ঝর ঝরে স্বেদ ;
'রুদ্রকান্ত'—দন্তাঘাতে গজ-কক্ষ করে ভেদ।

৩০

"আছাড়ি' পড়িল ভূমে মানসিংহ অচেতন।
'জয়—জয় বঙ্গনাথ!' গরজিল সেনাগণ।
নামি' ভূমে মহারাজ, রুদ্রকান্ত-ক্ষতদেহে
আদরে বুলান হাত, কত না আদরে স্নেহে!
'জয়—জয় মানসিংহ!'—গগনে মধ্যাহ্ন-রবি ;—
আহ্বানিল অসিযুদ্ধে আবার চেতনা লভি'।
দাঁড়াল দু'পক্ষ সেনা দু'ধারে কাতার দিয়া,
নির্ব্বাক, সাগ্রহ-দৃষ্টি,—দুরু দুরু কাঁপে হিয়া।

৩১

"কহেন মধ্যস্থ দ্বিজ,—'শুন যুগ্ম ধর্ম্মবীর!
হবে এই অসি-যুদ্ধে জয়-পরাজয় স্থির।
লবে সমদীর্ঘ অসি, লবে সমদীর্ঘ ঢাল ;
বিরাম বিশ্রাম নাই, নাই ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কাল।
নিঃসংশয় নাহি হয় এই রণ যতক্ষণ—
কেহ নিজ ক্ষত-অঙ্গে নাহি দিবে বিলেপন।
নিষিদ্ধ ইঙ্গিত বাক্, রবে সেনা স্থির ধীর।
ধর্ম্ম সাক্ষী, সূর্য্য সাক্ষী।' নমিলা উভয়ে শির।

৩২

"চক্র রচি' অস্ত্র দেখি' করি' দোঁহে সম্বর্দ্ধনা,
অসিতে স্পর্শিল অসি, ঝকিল তড়িত-কণা।
আক্রমিছে মানসিংহ পলে পলে প্রতিবার,
দুরন্ত দুর্দ্ধর্ষ বেগ—বিলম্ব সহে না আর।
সদর্পে সমস্ত বলে ভূতলে পাড়িতে চায় ;
ঘুরিছে—ফিরিছে অসি—সূর্য্যকরে চমকায়।
করিছেন আত্মরক্ষা সন্তর্পণে মহারাজ,
হস্ত হ'তে চর্ম্ম অসি পড়ে বুঝি খসি' আজ!

৩৩

"আক্রমিল মানসিংহ, ক্রমে রুদ্র— রুদ্রতর।
'ওই ভ্রম!—মহারাজ কেন আজ অতৎপর?'
বিমর্ষ বঙ্গজ-সেনা, বিপক্ষ উৎফুল্লমতি!
মানসিংহ-বর্ম্ম ভেদি' ঝরে রক্ত ধীরে অতি!
'মহারাজ স্থির-দৃষ্টি!' বঙ্গসেনা হর্ষযুত,
দেখিছে—প্রথম রক্ত—বিজয়ের অগ্রদূত!
চমকিল মানসিংহ, নিরখিল বক্ষবাস,
চাহি' মহারাজ পানে, হাসিল উপেক্ষা-হাস।

৩৪

"সাবধান মানসিংহ, বুঝিল আপন বলে,
আপনারে রক্ষা করি' আক্রমে কৌশলে ছলে।
বুঝিলেন মহারাজ, না দিয়া বিশ্রামক্ষণ,
সম্মুখে—দক্ষিণে—বামে করিলেন আক্রমণ।
অসিতে তড়িৎ স্ফুরে, ঘুরে চর্ম্ম বর্ম্ম বেড়ি',
কোথা যোদ্ধা—প্রতিযোদ্ধা—সুধু অসি চর্ম্ম হেরি!
পরিক্রমে—অতিক্রমে—পরাক্রমে দুই বীরে,
ক্রমে হটি' মানসিংহ, উপনীত চক্রতীরে।

৩৫

"সর্ব্বশক্তি-পরাক্রমে শেষ ভীম আক্রমণ।—
লক্ষ্যভ্রষ্ট মানসিংহ, ভূমিতলে অচেতন!
লম্ফ দিয়া মহারাজ মানসিংহ-বক্ষে বসি',
জানু'পরে দিয়া ভর, ক্ষিপ্রকরে তুলি' অসি—
অলক্ষ্যে পশ্চাতে আসি' কচুরায়—পাপরাহু,
পলকে ছেদিল সেই উত্থিত দক্ষিণ বাহু!
অচেতন মহারাজ,—পলকে লুকাল পাপী।
'নারকী!—নরক-কীট!'—ব্রহ্মাণ্ড উঠিল কাঁপি'!

৩৬

"নারকী!—নরক-কীট!'—লম্ফে লম্ফে হুঙ্কারিয়া,
ছুটিছে কুমার অশ্বে, দুই পার্শ্ব আক্রমিয়া।

দলি' অশ্বে, বিঁধি' ভল্লে. দীর্ঘ অসি পড়ে উঠে—
ছুটে শূন্যে ছিন্ন বাহু, ছিন্ন মুণ্ড পড়ে লুটে।
জর্জ্জর—ছুটিছে অশ্ব—সর্ব্বাঙ্গে ঝরিছে ফেনা।
হটিতে হটিতে ক্রমে, একত্র বিপক্ষসেনা;
ঘেরিতেছে ক্রমে ক্রমে, নাহি দৃষ্টি, নাহি জ্ঞান!
প্রাণপণে যুঝে রুডা রক্ষিতে কুমার-প্রাণ।

৩৭

"উদ্ধারিতে রাজদেহ, মদন উন্মত্তপ্রায়,
ছুটিছে. ঘুরিছে অসি, করি' পথ অসিঘায়।
প্রতিবাধা, প্রতিবিঘ্ন পদাঘাতে করি' চূর।—
এখনো র'য়েছে বেলা, চক্র ওই নহে দূর!
উঠিছে. পড়িছে অসি, হুঙ্কারিছে 'মার-মার'!
কাতারে কাতারে সেনা আক্রমিছে বার বার।
উঠিতেছে জয়নাদ—মানসিংহ সচেতন।
মদনে রক্ষিতে সুখা যুঝিতেছে প্রাণপণ।

৩৮

"বাজিছে দামামা. ভেরী;—সূর্য্যকান্ত নিরুপায়
সেনা না আজ্ঞা শুনে, ব্যূহ নাহি রচা যায়!
প্রতি সেনা ক্রোধে মত্ত. করি' ভর নিজ বলে.
যুঝিতেছে—বধিতেছে—পড়িতেছে ধরাতলে!
কেহ ছুটে রুডা-পিছে. সুখা-পিছে কেহ ধায়!
হটিতেছে মানসিংহ—পরাজয়-ছলনায়।
সূর্য্যকান্ত মুছে অশ্রু.—কেহ না দেখিছে ফিরে;
মিলিতেছে মানসিংহ, কচুরায় সহ ধীরে।

৩৯

"দিয়া দুর্গরক্ষাভার, সূর্য্যকান্ত দ্রুতগতি,
ল'য়ে অবশিষ্ট সেনা, অবশিষ্ট রথ-রথী,
পড়িল মিলন-মধ্যে।—সহস্রে সহস্রে বধি',
একবার ভগ্নছত্র একত্রিতে পারে যদি!

বৃথা আশা! অবরোধ আঘাতে আঘাতে টলে।
ডুবিল উদয়াদিত্য! গেল সূর্য্য অস্তাচলে!
পড়িল মদন, রুড়া! ক্রমে সুখা, সেনা লীন!
বন্দী মৃতকল্প প্রভু!—বঙ্গ আজ পরাধীন!

৪০

"আছে মাত্র এই কেতু—অতি দূরগতস্মৃতি,—
বাঙ্গালার বীরগর্ব্ব—বাঙ্গালীর দেশপ্রীতি!
নিষ্কলঙ্ক গাঢ় তপ্ত হৃদি-রক্তে সুরঞ্জিত!
প্রতি চিহ্নে—ছিন্ন অংশে—সহস্র মহিমা-গীত!
প্রতি চিহ্নে—ছিন্ন অংশে—কত ধ্যান, কত জ্ঞান,
কত ত্যাগ, অনুরাগ—দেখ আজ দীপ্যমান!
বিজয়ে করিছে হেয়—পরাজয়-পুণ্যরাগে!
লহ সেই কীর্ত্তিকেতু!—দুর্ভাগ্য বিদায় মাগে।"

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

টীকা।

মহারাজ, সম্রাট, বঙ্গনাথ ইত্যাদি—যশোরাধিপতি প্রতাপাদিত্য। (গুহ, বঙ্গজ কায়স্থ। দ্বাদশ ভৌমিকের এক জন।) মৃত্যুকালে বয়ঃক্রম সম্ভবতঃ ৪৫ বৎসর।

কুমার উদয়াদিত্য—প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠপুত্র। মৃত্যুকালে বয়ঃক্রম ১৮ বৎসর।

মুকুট—প্রতাপাদিত্যের কনিষ্ঠ পুত্র। (অন্যমতে পৌত্র।)

কচুরায়—অন্য নাম রাঘব রায়। প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। বসন্ত রায় প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক নিহত হয়েন; এবং কচুরায় বাদশাহের নিকট প্রতাপাদিত্যের অত্যাচারের কথা জানাইলে, বাদশাহ তাঁহার দমনের জন্য মানসিংহ প্রভৃতিকে প্রেরণ করেন।

মানসিংহ—জয়পুরাধিপতি। ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহ-দমনার্থ বাদশাহ জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক বাঙ্গালার সুবেদার-পদে দ্বিতীয়বার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ভবেশ্বর—বর্ত্তমান চাঁদড়া-বংশের আদিপুরুষ। (রায়, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ।)

প্রথম যুদ্ধ—রামরাম বসুর প্রণীত 'প্রতাপাদিত্যে' লিখিত হইয়াছে যে,—অবরাম খাঁ বাহাদুর নামক এক জন পঞ্চহাজারী মন্সবদার প্রথমে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন; এবং প্রতাপের সহিত যুদ্ধে নিহত হয়েন। নিখিল বাবু অনুমান করেন,—তাঁহার নাম শেখ এব্রাহিম। ঘটক-কারিকায় এই যুদ্ধের উল্লেখ নাই। কিন্তু আমি ইহাই প্রথম যুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

দ্বিতীয় যুদ্ধ—জাহাঙ্গীর সেনাপতি আজিম খাঁকে সৈন্য সহ প্রেরণ করিলে, প্রতাপাদিত্য রাত্রিকালে নিঃশব্দে আক্রমণ করিয়া ২০ হাজার সৈন্য সহ আজিম খাঁকে বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন।

ঘটক-কারিকার মতে, ইহা প্রথম যুদ্ধ; এবং আমি দ্বিতীয় যুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। নিখিল বাবু বলেন,—আজিম খাঁর সহিত যুদ্ধে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত হইতে হয়। ঐ যুদ্ধে ভবেশ্বর রায় আজিম খাঁর সাহায্য করিয়াছিলেন; এবং আজিম খাঁ প্রতাপের রাজ্য হইতে চারিটি পরগণা বিচ্ছিন্ন করিয়া পুরস্কারস্বরূপ ভবেশ্বরকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ঘটক-কারিকার মতে,—আজিম খাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া দিল্লীশ্বর পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য সহ বাইশ জন আমীরকে প্রেরণ করিলে, প্রতাপাদিত্য ও সূর্য্যকান্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ প্রহরের মধ্যে সমস্ত সৈন্য সহ আমীরদিগকে বধ করিয়াছিলেন। নিখিল বাবু স্থির করিয়াছেন, এবং ভারতচন্দ্রে দৃষ্ট হয় যে, বাইশ জন আমীর মানসিংহেরই সহিত আসিয়াছিলেন। আমিও এই মত গ্রহণ করিয়াছি।

ঘটক-কারিকায় এই নামগুলির উল্লেখ আছে,—

কেশবভট্ট—রাজভাট।

রাজা সূর্য্যকান্ত গুহ—প্রধান সেনাপতি।

প্রতাপসিংহ দত্ত—রথিপতি।

রঘু (পদবী নাই)—পূর্ব্বদেশীয় সৈন্যের অধিপতি।

সুখা (ঐ)—গুপ্ত-সেনাপতি।

মদন মল্ল বা মাল—ঢালিপতি।

রুডা—ফিরিঙ্গী সেনাপতি।

আমাড়ী—আচ্ছাদিত হাওদা। (ভারতচন্দ্র।)

ধনুর্ব্বেদ-সংহিতায় নিম্নলিখিত অস্ত্রের এইরূপ ব্যবহার দৃষ্ট হয়,—

অর্দ্ধচন্দ্র—গ্রীবা, মস্তক, ধনু প্রভৃতি ছেদন করিবার অস্ত্র।

সূচীমুখ—বর্ম্মভেদাস্ত্র।

ভল্ল—হৃদয়ভেদাস্ত্র।

সর্পী—যে তরবারি এমন স্থিতিস্থাপক যে, কটিবন্ধ-রূপে পরিণত হইতে পারে।

রুদ্রকান্ত—রাজহস্তী। (লেখক কর্তৃক কল্পিত।)

ক্রম—শ্রেণী। *

কোয়েটা।

অন্ধকারময়ী রজনীতে শীতের প্রকোপে কম্পান্বিত-কলেবরে একখানা ফেটিং গাড়ী করিয়া কমিশেরিয়েটের বড় বাবু শ্রীযুত চন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাসায় চলিলাম। সেখানে পঁহুছিয়া জানিতে পারিলাম যে, চন্দ্রবাবু নিমন্ত্রণোপলক্ষে অন্যত্র গমন করিয়াছেন, বহির্বাটীর দ্বার রুদ্ধ। ভৃত্য বাড়ীতে

* ১৩১৬, ২৬শে অগ্রহায়ণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৭ম মাসিক অধিবেশনে পঠিত

সংবাদ দিল। কিন্তু জানি না, কিরূপে তাঁহার সুশীলা সহধর্ম্মিণী তত্ত্ব পাইয়াছিলেন। আমরা কোথায় যাইব, এবং নিশীথে এইরূপ অপিরিচিত স্থানে কি করা কর্ত্তব্য, এই চিন্তারও পূর্ব্বে উক্ত পুণ্যবতী মহিলা আমাদিগের বৈঠকখানায় অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কোয়েটাতে প্রত্যেক গৃহেই আগুন জ্বালিবার চিম্‌নী আছে। আমাদিগকে শীতে অভিভূত জানিয়া অগ্নিরও বন্দোবস্ত হইল। অতিথিবৎসলা হিন্দু মহিলা প্রভূত ক্লেশ স্বীকার করিয়া এত রাত্রিতে স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া আমাদিগকে ভোজন করাইয়াছিলেন। এইরূপ বুদ্ধিমতী ও পরোপকারিণী রমণী ভ্রমণপথে অতি অল্পই দেখিয়াছি। আমরা ভোজনান্তে শয়নের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময়ে চন্দ্রনাথ বাবু বাসায় আসিলেন, এবং আমাদের পরিচয়াদি গ্রহণপূর্ব্বক বিশেষরূপে আপ্যায়িত করিলেন।

আমরা শয়নকালে প্রয়োজনীয় মনে করিয়া ঘটিতে ও বাল্‌তীতে জল রাখিয়া দিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! রাত্রিশেষে জল আনিতে গিয়া দেখি, জল বরফে পরিণত হইয়াছে! পরদিন বেলা প্রায় আট ঘটিকার সময় সূর্য্যদেবের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। এখানে সূর্য্যঠাকুরের 'নাইকো জারিজুরি'। আমরা কোনও প্রয়োজনবশতঃ বাজারে বাহির হইয়াছিলাম। দেখিলাম, পথ, ঘাট, ঘরের ছাদ—সমুদয়ই বরফাবৃত। আমাদিগকে স্তূপাকার বরফের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে হইয়াছিল। অপরাহ্নে চন্দ্রবাবু ও অক্ষয়বাবু নামধেয় অপর এক জন ভদ্রমহোদয়ের সহিত আফিস, ছাউনী ও নগর পরিভ্রমণ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই বরফ—বরফ—বরফ! রাত্রিকালে এ স্থানের আরও দুই তিন জন বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়ের সহিত আলাপাদি হইল—তাঁহাদের প্রত্যেকের ভদ্রোচিত ব্যবহারে যারপরনাই সুখী হইলাম।

কোয়েটা অর্থে দুর্গ। খিলাতের আমীর এই দুর্গটি ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে অর্পণ করিয়াছেন। কোয়েটা অতি অল্পদিনের নগর। এখনও ইহা পূর্ণ নাগরিক সৌন্দর্য্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। আজি পর্য্যন্তও ইহা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ নহে। সময়ে সময়ে অসভ্য পার্ব্বত্য অধিবাসিবৃন্দ আসিয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা করিয়া থাকে। সেদিন ছাউনীর মধ্যগত কোনও আফিসের দুই জন প্রহরীকে মৃতাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েক জন পাহাড়িয়া কচ ষ্টেশনের সমস্ত অফিসারদিগকে খুন করিয়া

চলিয়া গিয়াছে। রাত্রিতে প্রায় সকলেই শিয়রে পিস্তল রাখিয়া নিদ্রা যায়। এখানে এক জন মুন্সেফ ও তাঁহার অধীনে অপর কয়েক জন বিচারক আছেন। এজেণ্ট-গভর্ণরই এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা। তিনি কাহারও ধার ধারেন না। তাঁহাকে একরূপ 'হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি "ফ্রন্টিয়ার ল" নামক আইনানুসারে বিচার করিয়া থাকেন। আদালত, ফৌজদারী ইত্যাদি যাবতীয় মোকদ্দমার আপীলই তাঁহার দরবারে হইয়া থাকে। ইহাঁর অনুমত্যনুসারে ফাঁসী হয়। কোনও আদালতেই উকীল মোক্তারের কারবার নাই। উকীল মোক্তার আনিতে এজেণ্ট সাহেবের ইচ্ছাও নাই।

আমরা শুনিলাম যে, সীমান্ত প্রদেশে শাস্তিও অতিশয় গুরুতর। আমাদের দেশে খুন করিলে হন্তার ফাঁসী হইয়া থাকে। কিন্তু পেশোয়ার ও কোয়েটাতে হত্যাকারীর সঙ্গে সঙ্গে তাহার সহায়তাকারীরও ফাঁসী হইয়া থাকে। এত দূর কঠোর শাসন ও দণ্ডপ্রথা প্রচলিত থাকিলেও পার্ব্বত্য অধিবাসীরা দৌরাত্ম্য করিতে নিবৃত্ত হইতেছে না। কাবুল যাইবার পথে "খাইবার পাস" পেশোয়ারের দিকে, এবং "বোলান পাস" কোয়েটার দিকে।

কোয়েটা ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। বর্ত্তমান সময়ে ইহা ব্রিটিশ বেলুচিস্থানের অন্তর্ভুক্ত একটি বিখ্যাত নগর, এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মধ্যে ইহাই এখন ইংরেজ সৈন্যের প্রধান ছাউনীরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কোয়েটার প্রাচীন রেসিডেন্সী ধ্বংস করিয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট উক্ত স্থানে নূতন রেসিডেন্সী, এবং তাহার নিকটে নানাবিধ আফিস, আদালত প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কোয়েটার ক্লবসৌধটি দেখিতে বেশ সুন্দর। উহার মধ্যে পুস্তকাগার, বিলিয়ার্ড খেলিবার কক্ষ ও অন্যান্য আবশ্যক আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানোপযোগী কোনও উপকরণেরই অভাব নাই। কোয়েটার চতুর্দ্দিকে ছোট ছোট গিরিশৃঙ্গস্থ দুর্গগুলি ব্রিটিশসিংহের অধিকারভুক্ত। এখানকার ইংরেজ কর্ম্মচারিগণ সকলেই বিশেষ ভদ্র, এবং আমাদের এই ভ্রমণ-ব্যাপারে তাঁহারা আমাদিগকে বিশেষ উৎসাহিত করিয়াছিলেন। আরও কতকগুলি দুর্গ আছে। কোয়েটার দুর্গে ব্রিটিশ-সৈন্যগণের যেরূপ সর্ব্ববিধ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা আছে, ভারতের অন্য কোথাও সেরূপ নাই। এই সুদূরবর্ত্তী সীমান্ত-প্রদেশে

সৈন্যগণের সুখ-স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত ইংরেজ-রাজের সর্ব্বপ্রকারের সুবন্দোবস্ত বিশেষরূপ প্রশংসনীয়।

কোয়েটার মধ্যগত বোটন ষ্টেশন হইতে একটি শাখা-রেলপথ বিস্তৃত হইয়া চামান পর্য্যন্ত গিয়াছে—উহাই গুলেস্তান হইয়া কান্দাহারে লইয়া যাইবার প্রস্তাব হইতেছে। কান্দাহারের সহিত কোয়েটা রেলপথে সংযোজিত হইলে, এই নগর শিল্প-বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতিশালী হইয়া উঠিবে। কোয়েটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য রমণীয় হইলেও, শীতের অত্যধিক প্রকোপবশতঃ নবাগত আগন্তুকের বিশেষ উপভোগ্য নহে। এখানকার রাস্তা-ঘাট পরিষ্কৃত—পরিচ্ছন্ন। সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় পরিশোভিত থাকায় পর্ব্বতপদ-বর্ত্তিনী এই নগরী দূর হইতে বড়ই সুন্দর দেখায়। তুষারাবৃত স্মিতশুভ্র গিরিশ্রেণী এখানকার এক বিশেষ সৌন্দর্য্য। বাঙ্গালীর সংখ্যা এখানে নিতান্ত অল্প।

শ্রীধরণীকান্ত লাহিড়ী।

প্রায়শ্চিত্ত।

যখন রল্‌ফের সহিত এসবি গ্রামের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বালিকা কারেণের বিবাহ হইয়া গেল, তখন প্রতিবেশিবর্গ একটা ভাবী বিপদের সূচনা আশঙ্কা করিয়া ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। গ্রামে ত সুপাত্রের অভাব ছিল না—সুন্দর স্বাস্থ্যবান্ অবস্থাপন্ন সকল পাত্রই আনন্দের সহিত কারেণের পাণিগ্রহণে উৎসুক ছিল। তাহাদিগকে একেবারে উপেক্ষা করিয়া, বনবাসী কাঠুরিয়া রল্‌ফকে বিবাহ করিতে কারেণের এত আগ্রহ হইল কেন, ইহা ভাবিয়া প্রতিবেশিবর্গ অত্যধিক বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিল।

কারেণের পিতা বা মাতা কেহই জীবিত ছিল না। সে তাহার পিতৃব্যের সংসারে গলগ্রহের মত হইয়া উঠিয়াছিল—তাই তাহার বিবাহে পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নী একটা মুক্তির আভাস পাইয়া সানন্দে সম্মতি দান করিল। আর রল্‌ফের সুগঠিত বলিষ্ঠ দেহ, নয়নের স্নিগ্ধ-ঔজ্জ্বল্য গ্রামের অন্য পুরুষ অপেক্ষা সহজেই কারেণের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়াছিল। রল্‌ফের প্রকৃতি কিছু উগ্র ছিল; কিন্তু কারেণের বিশ্বাস ছিল, তাহার প্রেমের অনাবিল ধারায় সে উগ্রতার তাপ শান্ত হইবে। সেই জন্যই প্রতিবেশিনীবর্গের বিদ্রূপ ও বিরাগের

মধ্যেও একটি সুন্দর প্রভাতে স্বামীর হাত ধরিয়া স্বামীর বনভবনে যাইবার সময় তাহার হৃদয়ে এতটুকু দ্বিধা বা আশঙ্কার ছায়া পড়ে নাই!

রল্‌ফ কাঠুরিয়ার কাজ করে। লোকালয়ের বাহিরে বনের মধ্যে ক্ষুদ্রতর কুটীরের নিকটে মনুষ্যবাসভূমি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অপরের সহিত রল্‌ফের বড় একটা বনিবনাও ছিল না—মদ্যপ রল্‌ফের অশান্ত উগ্র-প্রকৃতির কাছে অপরে ঘেঁসিতে চাহিত না। এই রল্‌ফের হাত ধরিয়া, এই রল্‌ফের প্রেমের উপর অথও নির্ভর স্থাপন করিয়া কারেণ স্বামিগৃহে পদার্পণ করিল!

তখন গ্রীষ্মকাল। নির্জন বনের মধ্যে জীবন বড় মধুময়। রল্‌ফ সারাদিন বনে বনে কাঠ কাটিয়া বেড়ায়; কারেণ এধার-ওধার ঘুরিয়া ফলমূল কুড়ায়—কখনও বা ছায়া-ঘেরা কুটীরের সম্মুখে বসিয়া জামা-কাপড় শেল্লাই করে; কোনদিন দূর হইতে রল্‌ফের কুঠারের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, কোন দিন বা তাহা শুনাও যায় না! তার পর ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হইয়া আসে—কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া, স্বামীর জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া, স্বামীর প্রতীক্ষায় কারেণ পরিচ্ছন্ন প্রাঙ্গণতলে বসিয়া থাকে—গাছের আড়ালে, রাঙ্গা মেঘের মধ্যে স্নিগ্ধ সূর্য্য হারাইয়া যায়—আর চারিধার চন্দ্রের রজতরশ্মি-ধারায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে! রল্‌ফ আসিয়া কাঠের বোঝা নামাইয়া কারেণকে বুকের মধ্যে টানিয়া লয়—তাহার সুন্দর ছোট মুখখানিতে চুম্বন করে! জগতে কারেণের আর কিছুরই অভাব থাকে না।

গ্রীষ্ম যায়—শরৎ আসে। বিহ্বল পবন মাতোয়ারা হইয়া উঠে—গাছের ডাল নাড়া দিয়া হো হো করিয়া বিকট হাসিতে সকলের ত্রাস জাগাইয়া তুলে—দিনগুলিও ক্রমে হ্রস্ব ও নীরস হইয়া পড়ে—ক্রমে হিমের প্রবলতায় কারেণ অগ্নিকুণ্ডের পাশে আশ্রয় লয়—এবং রাত্রে কম্পিতদেহে শয্যায় কারেণের চোখে যখন কিছুতে ঘুম আসে না, বাহিরে তখন বায়ু যেন গর্জ্জাইতে থাকে, এবং কারেণের মন কি এক ভয়ে যেন আকুল হইয়া উঠে!

২

রল্‌ফের মনেও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে! তাহার মুখে এখন আর সে সহজ হাসি নাই; দিনান্তে কাজের শেষে সে যখন গৃহে আসে, স্ত্রীর জন্য সে হাসি-আনন্দটুকু আর সে লইয়া আসে না। এখন তার মুখ গম্ভীর, কারেণ যাচিয়া আদর লইতে গিয়া প্রায়ই নিরাশ হয়।

কারেণের মনে সুখ নাই, তার সে উজ্জ্বল বর্ণ কালি হইয়া গিয়াছে। দ্বারপ্রান্তে বসিয়া পাখীর মতই অসঙ্কোচে সে কত গান গাহিত—শৈশবের সে মধুর গানগুলি এখন আর সে গাহিতে পারে না। কে যেন বক্ষে আঘাত করে! কে যেন কণ্ঠ চাপিয়া ধরে! কি এ যন্ত্রণা—কি এ দুঃখ! কারেণ ভাবে—বৃথা এ জীবন! কখনও ভাবে—কোথাও পলাইয়া যায়! কিন্তু কোথায় যাইবে? পিতৃব্যের গৃহ মনে পড়ে—সহস্র অযত্ন অনাদরের মধ্যেও শৈশবের সে গৃহ আজ স্বর্গেরই মত তার স্নিগ্ধ মনোরম মনে হয়! কিন্তু সে যে বহু দূরে—পথও দুর্গম—শীতও প্রচণ্ড—কাজেই কারেণের মনের সাধ মনে রহিয়া গেল। কারেণের কোথাও আর যাওয়া হইল না।

নববর্ষের সন্ধ্যায় কারেণের একটি কন্যা জন্মিল। কারেণ চোখের জল মুছিয়া কন্যার মুখে চুম্বন করিল। কন্যার আগমনে রল্‌ফ কিন্তু বিরক্ত হইল। যদি পুত্র হইত, তাহা হইলে কি হইত বলা যায় না—কিন্তু এ যে কন্যা! সে কি শুধু এই অপদার্থ নারীগুলার জন্য খাটিয়া মরিবে, আর ইহারা আরামে বসিয়া তাহার শ্রমলব্ধ আহার্য্যের অংশ গ্রহণ করিবে? স্ত্রীটাই ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল—তাহার উপর আবার একটা কন্যা! রল্‌ফ উগ্র-স্বরে স্ত্রীকে কহিল,—"শেষে একটা কন্যা প্রসব করিয়া বসিলে?"

বেচারী কারেণ চক্ষু মুদিল। সেও কি বিধাতার নিকট কায়মনোবাক্যে একটি পুত্রের জন্যই প্রার্থনা করে নাই? কিন্তু হায় এ যে কন্যা! নিতান্তই দুর্ভাগিনী সে! নিতান্ত উপায়হীনা, অসহায়া!—মেয়েটি তখন এক মাসের হইয়াছে। রল্‌ফ সকালে বাজারে গিয়াছিল—রাত্রে আর গৃহে ফিরে নাই; সারারাত্রি কারেণ চিন্তাক্লিষ্টমনে মেয়েটিকে বুকের মধ্যে লইয়া তাহারই পথ চাহিয়া বসিয়াছিল। বাহিরে ক্ষুধিত নেকড়ের ভীষণ চীৎকার, ভিতরে কম্পিতচিত্তে বসিয়া কারেণ একাকিনী!

সে বৎসর শীতও প্রচণ্ড ছিল, এবং এই ক্ষুধিত পশুগুলা অনশনের জ্বালায় কাতর হইয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতেও শঙ্কিত হইত না!

কারেণ বসিয়া বসিয়া স্বামীর নিকট কত নিরাশ্রয় পথিকের করুণ কাহিনী শুনিয়াছে! এই দারুণ শীতে গৃহহারা পথহারা পথিক বরফের মধ্যে অবশ-তনু লইয়া ক্ষুধাতুর অবস্থায় নেকড়ে বাঘের মুখের গ্রাস হইয়াছে। শিশুর কলহাস্যমুখরিত কত কুটীর শিশুহারা হইয়াছে। সুখশয্যা-শায়িত কত দম্পতী নেকড়ের নিষ্ঠুর গ্রাসে প্রাণ হারাইয়াছে! তাই একাকিনী শিশু-সঙ্গিনী

কারেণ স্বামীর অনুপস্থিতিতে সারারাত্রি কি কষ্ট ভোগ করিয়াছে! অবশেষে ভোরের আলো ফুটিয়া উঠিল! তুষারাবৃত বনের উপর সূর্য্যের রশ্মি ছড়াইয়া পড়িল, কারেণের মনে জীবনের আশা আবার জাগিয়া উঠিল!

দিবা দ্বিপ্রহরে রল্‌ফ গৃহে ফিরিল। কারণ, সারারাত্রি ধরিয়া সে বদ্-সঙ্গীদিগের সহিত বসিয়া মদ্যপান করিয়াছে; মেজাজটা তার অত্যন্ত রুক্ষ ছিল। সে আসিয়া দেখে, একটা কোণে বসিয়া কারেণ শিশুকে দুগ্ধপান করাইতেছে; শিশুর কপালে শীর্ণ হাতখানি বুলাইতেছে। কারেণ চাহিয়াই দেখিল, স্বামীর কি এ রুক্ষ শুষ্ক মূর্ত্তি! মুখে না আছে একটা কোমল লালিত্য, একটা দানবী হিংসায় রল্‌ফের চোখ দুটা যেন জ্বলিতেছিল। কারেণ ভয়ে সঙ্কুচিতা হইয়া কন্যাকে পার্শ্বের বিছানায় শোয়াইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল!

রল্‌ফের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। এই পুতুলের মত কার্য্যে অপটু মেয়েটা এত অসার, এত কুৎসিত! রল্‌ফ গর্জ্জিয়া উঠিল,—"কি? সমস্ত দিন তুমি বসে থাক্‌বে, আর কোলে ঐ মেয়েটা! আর কোনও কাজ নাই তোমার! নেকড়েও তোমাকে গ্রাস করে না কেন? যাও, আমার জন্য খাবার নিয়ে এস, না হ'লে এখনই ঐ মেয়ে শুদ্ধ তোমাকে বরফের মধ্যে তাড়িয়ে দেব! যাও, এখনই যাও, দাঁড়ালে হবে না।"

আহারাদি শেষ করিয়া স্কন্ধে কুঠার লইয়া রল্‌ফ্ বনে বাহির হইয়া গেল। কারেণ রুদ্ধ বেদনায় গৃহের কোণে বসিয়া রহিল। আহার করিল না। আহারে তাহার রুচি নাই, জীবনেও তাহার ঘৃণা জন্মিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল, কি করিয়া মরা যায়; দুর্ব্বিষহ জীবনভার বহিবার ক্ষমতা যে তার নাই! আর যে সহ্য হয় না! ঐ ক্ষুধার্ত্ত নেকড়েগুলি,—একবার তাহাদের সম্মুখে গিয়া ডাকি,—'তোরা আয় আয়, আমার এ ব্যর্থ জীবনটা লইয়া তোদেরও ক্ষুধার শান্তি হোক্, কারেণেরও শান্তি হোক্!' কিন্তু ঐ মেয়েটি! আহা সুন্দর মুখখানি, মিটিমিটি দৃষ্টিটুকুতে কতখানি নির্ভরতা, কতখানি আশ্বাস, ছোট হাতটি নাড়িয়া চাড়িয়া মায়ের আদর কুড়াইতে চায়; আহা! শিশু জানে না, তার মায়ের শক্তি কতটুকু! বুকের মধ্যে চাপিয়া তার কচি রাঙ্গা ঠোঁটে অজস্র চুমো ছাড়া তার হতভাগিনী মায়ের দিবার আর কিছু নাই। ছোট বেলাটুকু নিমেষেই ফুরাইয়া গেল। চোখের জল মুছিয়া কারেণ দীপটি জ্বালিল। ধীরে ধীরে সেটি জানালার কাছে রাখিয়া দিল। তাহারই ক্ষীণ আলোক-রেখাপাতে পথ চিনিয়া স্বামী গৃহে ফিরিবে। ঘুমে

কারেণের চোখ ঢুলিয়া আসিতেছিল—শিশুটিকে বুকের মধ্যে চাপিয়া কারেণ ঘুমাইয়া পড়িল।

সহসা দ্বার খুলিয়া গেল! কন্‌কনে বাতাস কারেণের হাড় অবধি কাঁপাইয়া তুলিল। কারেণ উঠিয়া বসিয়া চোখ মুছিয়া দেখে, রল্‌ফ। মূর্ত্তি তার আরও ভীষণ, আরো কঠোর! রল্‌ফ্‌ কুঠার ভূমিতে ফেলিয়া দিল। কাঠ কাটিতে গিয়া আজ তাহার একটা আঙ্গুলের কিয়দংশ ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, এখনও ক্ষত-স্থানে জ্বালা ছিল! রাগের মাত্রাও তাই বাড়িয়াছিল। রলফ্‌ কহিল,—"কি, আর কোনও কাজ নাই, শুধু ঘুম, আর ঐ মেয়ে—মেয়ে—মেয়ে! কষ্ট করিয়া একটুক্‌রা রুটী যদি আমি সংগ্রহ করি, তাহাতে আবার তুমি ভাগ বসাইতে চাও; বাহির হইয়া যাও, এ ঘরে আর এক দণ্ডও নয়! নিজে রোজগার করিয়া লইয়া এস, আমি আর পারিব না।—"

ভীতকম্পিত-কণ্ঠে কারেণ কহিল, "—কিন্তু—কিন্তু রলফ্‌, আমি আজ কিছুই ত খাই নাই—" রলফ্‌ কহিল,—"কোনও কথা শুনিতে চাহি না, খাও বা না খাও, এ ঘরে থাকা হইবে না; যাও!—"

কারেণ কাঁদিয়া ফেলিল,—"রল্‌ফ্‌, রলফ্‌ আমাকে তাড়াইয়া দিবে? তুমি জানো, এ রাত্রে বনে বাহির হইলে নেকড়ে এখনি আমাকে ছিঁড়িয়া ফেলিবে! আরো জান, আমার শরীর এখনও অসুস্থ; চলিতে পারি না—দুর্ব্বল আমি, তার পর আমি চলিয়া গেলে, তোমার মেয়ের অবস্থা কি হবে?"

রলফ্‌ কহিল,—"কি? তুমি মনে করেছ, আমি ঐ মেয়েটিকে নিয়ে বসে থাকব! কখনও না! ওকে নিয়ে তুমি চলে যাও! কারও এখানে স্থান নাই তোমাদের! এস, চলে এস!" রলফ্‌ কারেণের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিল! "নাও, তোমার মেয়েকে নাও।" কারেণ মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া লইল। রলফ্‌ কারেণের হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে দূরে বাহির করিয়া দিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিল।

ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাসে কারেণ দাঁড়াইতে পারিতেছিল না। তুষারের কণাগুলি তার মুখে চোখে বার বার উড়িয়া পড়িতেছিল। কারেণ প্রাণপণ-বলে কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল,—"রলফ্‌—রলফ্‌—আজ রাত্রিটা থাকিতে দাও! কাল সকালে চলিয়া যাইব! আজ রাত্রি—রাত্রিটা শুধু! স্ত্রী-কন্যাকে এমন ভাবে হত্যা করো না। রলফ্‌—রলফ্‌—"

কারেণ বসিয়া পড়িল। তাহার হাত-পা অবশ হইয়া পড়িয়াছিল। রলফ্ দ্বার বন্ধ করিয়া অগ্নির সমক্ষে আসিয়া বসিল। পকেট হইতে ছোট শিশি বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থ লোহিত তরল পদার্থটুকু গলাধঃকরণ করিল। তাহার পর একটা পাইপ ধরাইয়া নিজের মনে কহিল,—"আঃ! একটা রাত্রি আরামে কাটাইব! অসুখ—অসুখ—চারিধারে একটা নিরানন্দ ঘিরিয়া ছিল!"

বাহিরে বায়ু গর্জ্জিতেছিল! তুষারের টুক্‌রাগুলা দরজা জানালায় টিক্‌টাক্ করিয়া আসিয়া ঘা দিতেছিল। অদূরস্থ ক্ষুধিত নেকড়ের ভীষণ চীৎকার স্পষ্ট স্পষ্টতর শুনা যাইতেছিল!

রলফ্ একটা বোতলের ছিপি খুলিতে খুলিতে বলিল,—"আঃ—চারিধারে আজ যেন আনন্দের উৎসব!"

৩

পরের বৎসর—তেমনই প্রচণ্ড শীত। ঘরের বাহির হওয়া যায় না! অনশনে নেকড়ের গ্রাসে গ্রামের লোক প্রাণ হারাইতেছে।

প্রত্যেক নেকড়ের মাথার উপর রীতিমত পুরস্কার ঘোষণা হইয়াছে! শিকারীর দল বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়—শীত-জর্জ্জর নিস্তব্ধ রাত্রে তাদের বংশীধ্বনি ও কুকুরের উল্লাস-চীৎকার এই ভীষণতার মধ্যেও একটু বৈচিত্র্য সম্পাদন করে!

রল্‌ফের বাটীর পাশ দিয়া তারা চলিয়া যায়—পুরাণো কাহিনী তাদের মনে পড়ে, তাদের কঠোর প্রাণও একটু শিহরিয়া উঠে!

কারেণ ও তাহার কন্যার অন্তর্দ্ধানের সহিত গ্রামের লোক রল্‌ফের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়াছিল! রল্‌ফ বলে,—"গ্রামে ফিরিয়া সে দেখে, বাড়ীতে কেহ নাই, খুঁজিতে খুঁজিতে পথে সে রক্তমাখা বস্ত্রখণ্ড ও কয়েকটুকরা অস্থি দেখিতে পায়। তাহা দেখিয়াই ব্যাপার বুঝিতে পারে—কারেণ হয় ত বনে রল্‌ফের সন্ধানেই বাহির হইয়াছিল। তাহার পর নেকড়ের গ্রাসে—হায়! হায় কি দুরদৃষ্ট রল্‌ফের!"

গ্রামের লোক তাহার কথা বিশ্বাস করে না! তারা ভাবে, রল্‌ফই তাহাদিগকে হত্যা করিয়া পথে তাদের অস্থি ও বস্ত্র ফেলিয়া দিয়াছে!

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। রল্‌ফ আগুনের কাছে বসিয়া হাত-পা গরম করিতেছিল। সহসা সে শুনিল, দ্বারে কে করাঘাত করিতেছে।

কোনও পথহারা পথিক আর কি! তাহার জন্য রল্‌ফ বিশ্রাম-সুখ নষ্ট করিতে পারে না। আবার কে না দ্বারে ঘা দিতেছে? আবার! আবার!

রল্‌ফ দ্বারের দিকে চাহিয়া কহিল,—"দাও ঘা, যত ইচ্ছা দাও—আমার বাড়ী আমার নিজের জন্য—বরফমাখা ভিখারীদের জন্য নয়।"

কিন্তু, নারীকণ্ঠে কে ঐ ডাকে না! বেশ সুস্পষ্ট মিষ্ট স্বর!

"রল্‌ফ্, রল্‌ফ্, দ্বার খোল! শীঘ্র খোল বড় দরকার।"

এ কি, তাহার নাম ধরিয়া ডাকে যে! রল্‌ফ ভাবিল, কে এ নারী? কি চায়? একাকিনী অসহায় অবস্থায় এই ভীষণ সন্ধ্যায় নারী পথে বাহির হইয়াছে! আবার রল্‌ফের বাটীতে আশ্রয় চায়! বিস্ময়ের কথা ত! এ কি তাহারই কোনও সেকালের প্রেমার্থিনী! প্রেম-অভিব্যক্তির পক্ষে কাল ও স্থান খুব উপযুক্ত বটে! এই প্রচণ্ড শীত! এই ভীষণ সন্ধ্যা!—কি এ প্রহেলিকা!

রল্‌ফ ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া দেখিল,—সম্মুখে গরম কাপড়ে আপাদমস্তক আবৃতা, মুক্তকুন্তলা, অপূর্ব্বোজ্জ্বলা কিশোরী মূর্ত্তি!—কেশদাম আগুল্‌ফ-লুণ্ঠিত!—এই ঘনতুষারপাতের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলেও কি অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী!

রল্‌ফ অনেকক্ষণ স্থিরনয়নে দেখিতে লাগিল—পরে কহিল,—"তুমি কি আশ্রয় চাও? কিন্তু এই ভীষণ রাত্রে একাকিনী বাহির হইয়াছ! বড় দুঃসাহস তোমার! শুন নেকড়ের চীৎকার।" কিশোরী মৃদুকণ্ঠে কহিল,—"দুঃসাহস নয়! এই বনেই আমি থাকি! রাত্রি ভীষণ বটে; কিন্তু আমার কর্ত্তব্যও কঠোর! আমি তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি! এখন এস রল্‌ফ, এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব নয়।"

রল্‌ফের সমস্ত দেহের মধ্য দিয়া ভয়ের একটা বিদ্যুৎশিখা যেন বহিয়া গেল। জীবনে বোধ হয় আজ প্রথম রল্‌ফ ভয় কি, তাহা অনুভব করিল!

রল্‌ফ্ কহিল, "কিন্তু—"

"চুপ্!" কিশোরী কহিল,—"কিন্তু না! এস—এখনই—!"

রল্‌ফের 'না' বলিবার শক্তি ছিল না! সে যেন যন্ত্রচালিতের মত হইয়া পড়িয়াছিল! রল্‌ফ আর দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করিয়া কিশোরীর অনুসরণ করিল।

বনের মধ্যে ঝড় বহিতেছে! গাছপালা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে! তাহার উপর এই ঠাণ্ডা বাতাস হাড়ে গিয়া বিঁধিতেছিল।

রল্‌ফ্‌ কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল,—"উঃ কি শীত!"

কিশোরী রল্‌ফের দিকে ফিরিয়া চাহিল, কহিল,—"হাঁ খুব শীত! যে দিন কারেণকে তার শিশুর সহিত গৃহের বাহিরে তুমি তাড়াইয়া দিয়াছিলে, সে দিনও ঠিক এমনই শীত ছিল!"

রল্‌ফের দেহ কম্পিত হইল! এ অপরিচিতা, কারেণের কথা কি করিয়া জানিল! কিছুক্ষণের জন্য কাহারও মুখে আর কথা নাই। পায়ের কাছে বরফ পড়িয়া গুঁড়া হইয়া যাইতেছে! দূরে হঠাৎ নেকড়ের চীৎকার শুনা গেল। রল্‌ফ কহিল,—"ঐ নেকড়ে! আমি যদি আমার বন্দুক বা কুঠার লইয়া আসিতাম! শেষে নেকড়ের মুখে পড়িব কি?"

কিশোরী আবার কহিল, "সে দিনও নেকড়েগুলা এমনই ক্ষুধিত ছিল, তাদের দংশন এমনই ভীষণ ছিল, যে দিন কারেণ ও তার কন্যাটি প্রাণ হারায়!"

রল্‌ফ্‌ চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে তুমি বল—!"

কিশোরী গম্ভীরকণ্ঠে কহিল,—"এখনি জানিতে পারিবে, ব্যস্ত হইও না।"

আবার দুজনে চলিতে লাগিল। বাতাস আরও গর্জ্জন করিতে লাগিল, শীত আরও প্রচণ্ড হইল। রল্‌ফের দেহ অবশ হইয়া আসিল। পরে নাক মুখ দিয়া টস্‌ টস্‌ করিয়া দু ফোঁটা রক্ত পড়িল।

রল্‌ফ বরফের উপরে বসিয়া পড়িল। রুদ্ধস্বরে কহিল, "আমাকে মারিয়া ফেল, আর আমি হাঁটিতে পারি না—"

হঠাৎ রল্‌ফ চাহিয়া দেখিল এ সেই স্থান! এইখানে কারেণের রক্তমাখা বস্ত্রখণ্ড সে কুড়াইয়া পাইয়াছিল! এত তুষারপাতেও যেন সে রক্তের দাগ মুছিয়া যায় নাই, ঐ না ওখানের বরফটা এখনো লাল টক্‌টক্‌ করিতেছে! উঃ!

কিশোরী কহিল,—"রলফ, মনে পড়ে?"

রল্‌ফ দেখিল, সেই অন্ধকারের মধ্যে কিশোরীর চোখ দুটি যেন তারার মত জ্বলিতেছে, জানু পর্য্যন্ত কেশের উপর যেন স্বর্ণ ঝরিতেছে!

রল্‌ফ কহিল, "কি?"

কিশোরী কহিল, "এই স্থান মনে পড়ে?"

রল্‌ফ চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে তুমি? বল বল,—তুমি দানবী, না দেবী, না উন্মাদিনী! কি তুমি চাও? কেন তুমি আমাকে এখানে টানিয়া আনিলে? তুমি কি জানো না এখনই প্রচণ্ড শীতে কিম্বা নেকড়ের গ্রাসে প্রাণ

হারাইব? আঃ! এই ভয়ঙ্কর স্থানে ভয়ঙ্কর সময়ে এখনও তোমার মুখে হাসি? ও! কে তুমি, নিষ্ঠুর নারী, তুমি!"

কিশোরী গম্ভীরকণ্ঠে কহিল,—তাহার কণ্ঠস্বরে গভীর বিষাদ জড়িত ছিল,—"ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে, এই স্থানে, এমনই অসহায় অবস্থায়, এমনই ভাবে কারেণ কি প্রাণ হারায় নাই? রল্‌ফ! তুমি তার কথা এত শীঘ্র ভুলিয়া গেলে! আহা বেচারী কারেণ!"

রল্‌ফের আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। সে কিশোরীর হাত ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। কিশোরী কোথা লুকাইয়াছে! সে কি তবে ছায়া-মূর্ত্তি! কি এ বিভীষিকা! রল্‌ফের মস্তক তখন বরফের উপর লুণ্ঠিত হইতেছে। কাতর মৃদুকণ্ঠে রল্‌ফ কহিল, "তুমি কে, তা বলিলে না—"

রল্‌ফ শুনিল, দূর হইতে ক্ষীণ অথচ স্পষ্টকণ্ঠে কে কহিল,—"আমি নিয়তি; স্বর্গ হইতে দেবতারা আমাকে পাঠাইয়াছেন! তুমি যে কর্ম্ম করেছ, তারই প্রতিফল দিবার জন্য আমি আসিয়াছিলাম! তোমার কর্ম্মের ফল তুমি ভোগ কর! রল্‌ফ! পাপ ক'রে কেউ এ বিধাতার রাজ্যে পরিত্রাণ পায় না। নির্দ্দোষ বা দুর্জ্জনের উপর অত্যাচার করেও পরিত্রাণ নাই! কেহ শীঘ্র তার ফল ভোগ করে, কেহ বা দু' দিন পরে; আজ তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল! ঐ শোন নেকড়ের চীৎকার! আরও কাছে, দেখ দূরে ছায়ার মত কি সব ছুটিয়া আসিতেছে! আমি আসি!"

রল্‌ফ আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, "রক্ষা কর, রক্ষা কর, দেবী বা দানবী যে হও, আমাকে রক্ষা কর!"

কেহ সাড়া দিল না। সেই অসীম ভীষণ প্রান্তরমধ্যে রল্‌ফ একাকী, অসহায়! বরফের উপর পায়ের শব্দ শুনা যাইতেছে; ক্ষিপ্রগতিতে ছুটিয়া আসিতেছে। ঝোপের আশে পাশে অসংখ্য চোখ জ্বলিতেছে—কি ও! মৃত্যু আজ এত ভীষণ! অঙ্গে সহস্র ছুরিকার মত কি বিঁধিল। রল্‌ফ চক্ষু মুদিল। স্বর্গে মর্ত্ত্যে তাহার জন্য আজ একবিন্দু করুণা নাই! একবার রল্‌ফ চোখ মেলিয়া আকাশের পানে চাহিল, তারাগুলা যেন তার এই নিষ্ঠুর মৃত্যু দেখিয়া হাসিতেছে!

দিনের আলোকে গ্রামের লোকে দেখিল, বরফের উপর কতকগুলা অস্থিখণ্ড ও একটা রক্তাক্ত জামা পড়িয়া রহিয়াছে। এ জামা রল্‌ফের না? কিন্তু বন্দুক বা কুঠার ফেলিয়া রল্‌ফ

অনুতাপের জ্বালায়, না স্বপ্নের তাড়নায় জীবনভার তার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল! কে উত্তর দিবে? রল্‌ফের মৃত্যুর কারণ কি, আজ কে তাহা বলিয়া দিবে? কেহ জানিল না! মূক বনানী আপনার গোপন রহস্য মানুষের কাছে ভাঙ্গিল না! শুধু পত্রমর্ম্মরে মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা ভাবিয়া একবার শিহরিয়া উঠিল! *

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সুখের ভ্রমণ।

—:০:—

মহামায়ার বিদায়-দশমীর সঙ্গে সঙ্গেই আমরাও পল্লী-জননীর নিকট বিদায় লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। হৃদয়ের সমস্ত আশা, সমস্ত উদ্যম, সমস্ত ঔৎসুক্য উদ্বুদ্ধ করিয়া, মহাকাব্যের রসাস্বাদের জন্য উন্মুখ করিয়া রাখিলাম। ই. বি. এস্ রেলওয়ের নৈহাটী ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠিলাম,—গাড়ীও ছাড়িল। দেখিতে দেখিতে ট্রেণ বৃহৎ অজগর সর্পের ন্যায় হেলিতে দুলিতে, লোকালয় ত্যাগ করিয়া, উন্মুক্ত শ্যামল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িল। দুই দিকে অনন্ত হরিৎ-সমুদ্র। দূরে দূরে, যত দূরে দৃষ্টি চলে,—তত দূর পর্য্যন্ত কেবল হরিৎসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে; আর তাহার স্বর্ণশীর্ষগুলি—যেন হরিৎসমুদ্রের স্বর্ণময় ফেনরাশি—নিরন্তর উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিতেছে! সকল ক্ষেত্রেই প্রায় ধান জাগিয়া উঠিয়াছে; মাঝে মাঝে দুই একখানি ক্ষেত্রে লাঙ্গল দেওয়া হইয়াছে। দূরে—অতি-দূরে অনন্ত নীলাকাশ স্নেহ-বিগলিতহৃদয়ে যেন মস্তক অবনত করিয়া কন্যা ধরিত্রীর শ্যামল লাবণ্যময় মুখখানি চুম্বন করিতেছে; আজ সত্য সত্যই "হরিতে মিশেছে নীল অতি পরিপাটী!"

এইরূপে যতই পল্লীমাতার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম, ততই সহরের চাকচিক্যময় আবরণ দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল;—আর অপূর্ব্ব শান্তি হৃদয় অধিকার করিল। সত্য সত্যই আমরা সহরে থাকিয়া দেখিবার কিছুই দেখিতে পাই না। পল্লীই প্রকৃতির লীলানিকেতন।

---

* নরওয়ের গল্পের মর্ম্ম অনুবাদ।

ক্রমে সন্ধ্যার অস্ফুট অন্ধকার জগতের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল; গোষ্ঠ হইতে ধেনুর পাল "আঁকা-বাঁকা ক্ষেত্রপথে" গ্রামাভিমুখে ফিরিতে লাগিল;—সঙ্গে দুই এক জন চাষী। প্রাচীন কালের সেই সরল সুন্দর ছবি! পূর্ব্বের সেই সরল তালপত্রের ছাতা মাথায়, পরিধানে পাঁচহাতি ধুতি, পল্লীর "অসভ্য" চাষী কেমন সহাস্যমুখে দিনের শেষে গৃহে ফিরিতেছে; তাহারা মোটা ভাত-কাপড়ে হৃদয়ে যেটুকু আনন্দ পায়, বিলাসের শত উপকরণ সত্ত্বেও আমরা তাহার অণুমাত্র পাই না! তাহারা অল্পে সন্তুষ্ট। আমাদের যতই সুখের সামগ্রী বাড়িতেছে,—আমাদের দুঃখের মাত্রাও সঙ্গে সঙ্গে ততই বাড়িয়া উঠিতেছে।

রাত্রে 'আসাম মেল' ধরিলাম;—ঘণ্টা পড়িল,—ট্রেনও ছাড়িল। সেই গভীর অন্ধকার রাত্রে দিগন্ত কম্পিত করিয়া ট্রেন ছুটিল। চারি দিকে নির্জ্জন মাঠ, ঘাট, বাট অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। অন্ধকারে দূরের গাছপালা জমাট কালো স্তূপের মত বোধ হইতে লাগিল;—সারাদিনের অবসাদে ঘুমাইয়া পড়িলাম;—ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি, পূর্ব্ব দিকে অন্ধকার শতধা বিদীর্ণ! উষার আরক্তিম লাবণ্যরাশি প্রাচীর ললাট আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে। যখন অরুণদেব সুবর্ণ-রথে পূর্ব্বাশার দ্বারে দেখা দিলেন,—তখন আমাদের ট্রেন রঙ্গপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘণ্টা পড়িল,—ট্রেন ছাড়িল। এই স্থান হইতে আর একটি নূতন সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইল। এখানকার প্রধান বিশেষত্ব দেখিলাম, সটির গাছ;—আর একরূপ কলাফুলের ন্যায় লম্বা লম্বা গাছ। সটি হইতে 'পালো' প্রস্তুত হয়; আর দ্বিতীয় প্রকার গাছ হইতে 'শীতল পাটী' প্রস্তুত করে। দ্বিতীয় গাছের নাম 'পাটিদই'। এই দুই প্রকার গাছ রেলের দুই পার্শ্বে অপর্য্যাপ্তপরিমাণে জন্মিয়াছে। আর দেখিলাম, সংখ্যাতীত—স্থলপদ্ম। রেলের দুই পার্শ্বে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছ ফুলভারে অবনত হইয়া পড়িয়াছে। আর দুই দিকে অবারিত উন্মুক্ত প্রান্তর। সেই অনন্ত বিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে সুপারি গাছের বাগান,—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাঁশের ঝাড়; আর তাহারই মধ্যে মধ্যে বিক্ষিপ্ত কুটীরমালা। প্রায় প্রত্যেক কুটীরের উপরই অন্ততঃ চার পাঁচটা দিশি কুমড়া শোভা পাইতেছে। কোথাও গ্রামের বালকদল মনের আনন্দে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে;—কেহ বা পরিষ্কার অঙ্গনে বালসূর্য্যের হৈমকিরণে বসিয়া আছে! কোথাও বা পল্লীর স্বভাবসরল রমণীগণ শূন্য কুম্ভকক্ষে খাল

বা বিল হইতে জল আনিবার জন্য গমন করিতেছে; কেহ বা পূর্ণকুম্ভ লইয়া আপনার কুটীরে ফিরিতেছে; কেহ বা সখী-দর্শনে আপ্যায়িত হইয়া তাহার সহিত আলাপ করিতেছে। সভ্যতাসুলভ লজ্জা তাহারা জানে না,—সর্ব্বদাই আপনার মনে স্বামিপুত্রাদির সেবা করিয়া সংসারের সমস্ত নির্ম্মল সুখটুকু আপনার করিয়া রাখিয়াছে। বিলাসের উপকরণ এখনও তাহাদের সংসারে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

প্রায় সাড়ে দশটার সময় ট্রেন ধুবড়ীতে পঁহুছিল। পার্শ্বেই ব্রহ্মপুত্রবক্ষে ষ্টীমার। দেখিতে দেখিতে ট্রেনের আরোহীরা ষ্টীমারে উঠিল। আরোহিগণ ষ্টীমার ছাড়িবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কেহ বা ইতিমধ্যে স্নানাদি কার্য্য সারিয়া লইলেন। প্রায় সাড়ে এগারটার সময় ষ্টীমার বাঁশী দিল। অমনই সঙ্গে সঙ্গে মুটের চীৎকার, খালাসীর উচ্চকণ্ঠ, আরোহীদিগের কলরব, ষ্টীমারের বাঁশীর ধ্বনি, সমস্ত একত্র সম্মিলিত হইয়া এক বিকট শব্দের সৃষ্টি করিল। ষ্টীমারের সিঁড়ি উঠিল, ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ষ্টীমারখানি বিশাল ব্রহ্মপুত্রের বক্ষে আসিয়া পড়িল। দুই কূলের উন্নত তরুশ্রেণী একখানি ক্ষুদ্র ছবির মত মনে হইতে লাগিল। "দুকূলহারা, বাঁধনহারা" ব্রহ্মপুত্র আপনার মনে কোন্ আনন্দের সন্ধানে ছুটিয়াছে, আর তাহারই বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া, উচ্ছলিত তরঙ্গ মথিত করিয়া, বাষ্পীয় পোত আপনার ঈপ্সিত বন্দরের অভিমুখে ছুটিয়াছে। যেন একখানি সচল ক্ষুদ্র গ্রাম আপনার সমস্ত অধিবাসীকে লইয়া, নদবক্ষে ভাসিতে ভাসিতে, প্রত্যেক তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে ঈষৎ আন্দোলিত হইতে হইতে চলিয়াছে। বিশাল ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে প্রকাণ্ড ষ্টীমারখানি একলা ছুটিয়াছে। দূরে উভয় কূলের শ্যামল বৃক্ষশ্রেণী একখানি হরিৎপটের মত আকাশে মিলাইয়া গিয়াছে। নদসৈকতে শুভ্র বালুকারাশি দূর দিক্‌চক্রবাল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। আর নদের অনন্ত জলরাশি, যত দূর পর্য্যন্ত দৃষ্টি চলে, তত দূর পর্য্যন্ত শান্ত, স্তব্ধ। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, নদের উভয় কূলে দিগন্ত-প্রসারিত শ্যামল শৈলশ্রেণী তরঙ্গায়িত হইয়া রহিয়াছে। এ নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিলাম। হৃদয় ভরিয়া গেল!—নয়ন অপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করিল।

এইবার ষ্টীমারে ভোজনের ব্যবস্থার কথা না বলিয়া থাকিতে পারা যায় না। এই বাষ্পপোতে গমনাগমনের এক প্রধান কষ্ট—হিন্দু-আরোহীর

আহারের কোনও ব্যবস্থা নাই। ইংরাজদিগের জন্য "কোপ্তা-কোর্ম্মা-কারি-কাটলেট্" প্রভৃতি আহারের বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়া থাকে। কিন্তু নগণ্য 'নেটিভে'র পক্ষে চিপীটকই চূড়ান্ত আয়োজন। ইংরাজি-ভাবাপন্ন বা এ কালের সাম্যবাদী ও উদারমতি (Liberal) বাঙ্গালী-ভায়ারা অবশ্য বট্লারের প্রসাদে পরিতুষ্ট হন; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা উচ্ছিষ্টের সারাংশমাত্র। এই আশঙ্কায় অনেক নিষ্ঠাবান্ মুসলমানও ঐ মহাপ্রসাদে সঙ্কুচিত হয়েন। আহারের এই আয়োজনের আন্দোলনে আমাদের সহযাত্রী জনৈক হিন্দু বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ গল্প করিলেন,—তিনি যখন প্রথমে আসামে চাকরীর চেষ্টায় আইসেন, তখন তাঁহার সহিত আরও চারি জন ভদ্রলোক ছিলেন; তন্মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ, তিন জন কায়স্থ ও অপর এক জন অন্যজাতীয়। আমাদের সহযাত্রী ব্রাহ্মণ বড়ই নিষ্ঠাবান্, অর্থাৎ আজকালকার ভাষায় সঙ্কীর্ণমতি (Conservative), সুতরাং অপর সকলে তাঁহাকে আহারের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, সকলে যাহা করিবেন, তিনিও তাহাই করিতে বাধ্য। শেষে স্থির হইল,—"বট্লারে"র আশ্রয় লওয়া হইবে। যখন স্নানাদি সারিয়া সকলে আহারের জন্য গমন করিলেন, তখন সে আয়োজন দেখিয়া আমাদের সহযাত্রী ব্রাহ্মণের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল! একখানি প্রকাণ্ড তামার থালার উপর পাঁচ জনের অন্ন এক সঙ্গে;—মধ্যে সঝোল অর্দ্ধচর্ব্বিত মাংসহীন দুই একখানি মুরগীর হাড়! তিনি ত এই বিকট বন্দোবস্ত দেখিয়া আর ঘরে ঢুকিতে পারিলেন না, সেই স্থান হইতে সর্ব্ববর্ণমিলনকারী, "বোক্ড়া"-অন্নযুক্ত, শ্বেতকায়-চর্ব্বিত, স্বাদহীন, মাংসহীন ব্যঞ্জনকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু হায়, তাঁহার বন্ধুগণ অম্লানবদনে সেই উচ্ছিষ্টান্ন উদরসাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহার নিকট হইতে Diner charge স্বরূপ অর্দ্ধমুদ্রা প্রণামী আদায় করিলেন! সেই অবধি তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আর কখনও ষ্টীমারের অন্ন স্পর্শ করিবেন না! আমরাও এখনও সঙ্কীর্ণতার বাহিরে অগ্রসর হইতে শিখি নাই, এখনও আমাদের মনের মলিনতা ঘুচে নাই; অগত্যা প্রায় অনাহারে থাকিতে হইল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের ন্যায় সঙ্কীর্ণমতি (Conservative) অসভ্যের সংখ্যাই অধিক!

বাষ্পপোত আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিল;—সঙ্গে সঙ্গে দিনমণিও সায়াহ্নে ক্লান্তদেহে পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িলেন! ধীরে

ধীরে গোধূলির স্বপ্নময় ভাবাবেশে দিগন্ত হিল্লোলিত হইয়া উঠিল! বর্ণ-বৈচিত্র্যময়ী সন্ধ্যার লাবণ্যরাশি গগনের প্রান্তদেশ হইতে ব্রহ্মপুত্রের সলিলগর্ভে গলিয়া পড়িতে লাগিল;—সেই স্বর্ণসুষমাস্পর্শে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমগগনচারী বারিরাশি অতৃপ্ত তৃষ্ণায় সেই গলিত সুবর্ণধারা পান করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সে চিত্তবিনোদন মোহন দৃশ্য দিগন্তের কোলে মিলাইয়া গেল! এই শোভা দেখিতে দেখিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম;—মনে নাই। যখন ঘুম ভাঙ্গিল,—তখন খালাসীর চীৎকার, ষ্টীমারের ঘন ঘন বংশীবাদন, একত্র এক অদ্ভুত বিপ্লব ঘটাইল। ষ্টীমার গৌহাটী-ঘাটে পঁহুছিয়াছে।—আমরাও সত্বর অবতরণ করিয়া বাসায় উপস্থিত হইলাম। তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা।

গৌহাটীর প্রাচীন ইতিহাস।

গৌহাটীকে আসামীরা বলে গুয়াহাটী। অতিপ্রাচীন কালে ইহাই কামরূপের রাজধানী ছিল। তখন ইহার নাম ছিল,—"প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর"। নাম দেখিয়া মনে হয়, এখানে জ্যোতিষবিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা ছিল। এই কামরূপ রাজ্যে দানব, কিরাত, সেন, পাল, সিংহ প্রভৃতি বহুজাতীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। আসামবুরঞ্জীতে * দেখিতে পাওয়া যায়, অতি প্রাচীনকালে এই রাজ্যে দানব ও কিরাতবংশীয় নরপতিগণের প্রভুত্ব ছিল। এই শেষোক্ত নৃপতিগণ অতিশয় মদ্যপায়ী, মাংসলোভী, অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন। প্রকৃতিমণ্ডলী নানা রূপে উৎপীড়িত হইয়া, এক জন বিষ্ণুভক্ত রাজার নিমিত্ত দেবতার নিকট প্রার্থনা করেন। সেই সূত্রে বিদেহ বা উত্তর বিহার হইতে নরকাসুর নামক এক জন বিষ্ণুভক্ত রাজা আসিয়া, কিরাতবংশ নির্ম্মূল করেন, এবং স্বয়ং দেশের রাজা হইয়া প্রাগজ্যোতিষপুরে (আধুনিক গৌহাটী) রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন; নানা দেশ জয় করিয়া, নানাদেশীয় নৃপতিগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। এইরূপ দেশজয়ব্যাপারে তিনি ১৬০০০ রমণীকে বন্দী করিয়া আনিয়া আপনার রাজধানীতে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সেই ১৬০০০ আর্ত্তা রমণীর করুণ ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে কামরূপে গমন করিয়া নরকাসুরকে

---

* বুরঞ্জী—ইতিহাস।

বধ করেন, এবং সেই রমণীমণ্ডলী অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন। অধিবাসীদের বিশ্বাস, গৌহাটী ও অশ্বক্রান্তা পর্ব্বতে নরকাসুরের ও শ্রীকৃষ্ণের অনেক চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। *

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে যে বিদ্যাচর্চ্চা হইত, তাহারও উল্লেখ অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমান, ষোড়শ শতাব্দীতে কামরূপে নরনারায়ণ নামে এক জন বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। তিনি নবদ্বীপ হইতে অনেক পণ্ডিত আনাইয়া আপনার রাজধানীতে বাস করান। ইঁহার রাজ্যকালে "রত্নমালা ব্যাকরণ" রচিত হয়। এই সময়ে রাজধানীতে জ্যোতিষেরও চর্চ্চা হইত। নরনারায়ণও অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন; সুতরাং রাজ্যেও তখন ধর্ম্মপরায়ণ প্রজার অভাব ছিল না। † রাজধানীর বিদ্যাচর্চ্চা ও পণ্ডিত-মণ্ডলীর অস্তিত্ব বিষয়ে বহুল প্রবাদ প্রচলিত আছে।

আধুনিক অবস্থা।

এখন গৌহাটী একটি সহর, এবং আসাম গবর্মেণ্টের "হেড কোয়র্টার"। সভ্যতার সমস্ত উপকরণই আছে।—কাছারি, পুলিশ, ডাকবাঙ্গলা, হাঁসপাতাল, স্কুল, কলেজ, পুস্তকাগার, মিশনারী, গির্জ্জা, মুসলমানদের মসজিদ, হিন্দুর দেবালয়, কলের জল, আবার গোয়ালার দুধ, সুকুমারমতি হিন্দুবালিকাগণের মাথা খাইবার জন্য Missionary স্কুল ইত্যাদি, বড় সহর ও সভ্যতার সকল উপকরণই আছে। তদুপরি বালিকাদের শিক্ষার জন্য আর একটি ব্রাহ্মবিদ্যালয় স্থাপিত দেখিলাম। এত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও যেন গৌহাটীকে একটা বড় সভ্য সহর বলিয়া মনে হয় না। ইহাতে বিলাস ও লজ্জাহীনতার সঙ্গে এখনও একটু সরমের ভাব ও প্রকৃত হিন্দুত্বের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এক জন নব্যশিক্ষিত বাবু সমাজের বন্ধন, সুনীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া, আপনাকে বিলাস ও স্বেচ্ছাচারিতার স্রোতে ভাসাইবার সময় যেমন প্রথম প্রথম আপনার সহধর্ম্মিণীকে আপনার বশে আনিতে কষ্ট পান!—আমাদের গৌহাটী নগরীর অবস্থাও তদ্রূপ! এত সভ্যতার উপকরণ থাকা সত্ত্বেও, প্রকাণ্ড সহরের সে তাড়াতাড়ি, হুড়োহুড়ি, হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকির ভাব নাই; দিবারাত্র সে উচ্চ কলরব,

---

* আসাম-বুরঞ্জী ;—পৃঃ ৮।

† আসাম

লোকজনের অবিশ্রাম যাতায়াত, গাড়ী ঘোড়ার উৎপাত নাই। এই অবস্থাই বেশ ভাল লাগে। তাহার উপর ইহার চারি দিকে উন্নত অম্বরচুম্বি-শৈলশ্রেণী। সহরের চারি দিকে এই শ্যামল শৈলশোভা নগরটিকে মনোরম করিয়া রাখিয়াছে। এখানকার বিশেষত্ব এই যে, ইঁটের পাকা বাড়ী অতি অল্পই আছে। গৌহাটী সহরের মধ্যে পাকা বাড়ী দুই তিনটির অধিক নহে। কাছারী, ডাকবাঙ্গলা প্রভৃতি সরকারী মহলে ইটের গাঁথনি ও "করোকেট" নির্ম্মিত ছাতযুক্ত বাড়ী ও মধ্যে মধ্যে খড়ের চালযুক্ত গৃহও আছে। কিন্তু নগরের সাধারণ অধিবাসীর বাসভবন ও দোকানগুলি প্রায় অধিকাংশই চালাঘর। আমাদের দেশের "সর" গাছের ন্যায় এ দেশে "খাগড়া" গাছ প্রচুরপরিমাণে জন্মে; এই খাগড়া-গাছের ডাঁটাগুলি ঘনভাবে বসাইয়া, তদুপরি কাদা দিয়া লেপিয়া, দেওয়াল প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত গৃহনির্ম্মাণে দড়ির ব্যবহার নাই। এ দেশে বেত প্রচুরপরিমাণে জন্মে। বেতের দ্বারাই সমস্ত দড়ির কাজ সম্পন্ন হয়।

অধিবাসীর মধ্যে প্রবাসী বাঙ্গালীদিগকে অধিক বিলাসী বলিয়া মনে হয়; এবং তাঁহাদের মধ্যে সমাজবন্ধনও দৃঢ় নহে। এক কথায় প্রায় অধিকাংশই ব্রাহ্মভাবাপন্ন; চাকরী বা ব্যবসায়ের নিমিত্ত এ দেশে অধিকাংশ বাঙ্গালীর আগমন। এদেশবাসীরা সকলেই অতিশয় বিনয়ী, স্বধর্ম্মে আস্থাবান, এবং দেশীয় আচারে অনুরক্ত। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের অধিকাংশই বড় সুন্দরী, এবং "পর্দ্দানশিনী" ব্যবস্থা যেন কিছু অধিক। মুসলমানেরা অন্যধর্ম্মীদিগকে যেমন "কাফের" আখ্যা প্রদান করেন, আসামীরাও তেমনই বিদেশিমাত্রকেই "বাঙ্গাল" বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখেন;—বাঙ্গালী, বেহারী, মারাঠী, মাড়ওয়ারী, এমন কি, সভ্যশিরোমণি ইংরাজগণকেও ইঁহারা "বাঙ্গালী" বলিতে দ্বিধা করেন না, এবং সকলকেই একটু ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আমাদের স্পৃষ্ট জলও ইঁহারা ব্যবহার করিবেন না; এমন কি, আপনাদের ও আমাদের অন্ন এক সঙ্গে পাক করিবেন না। আপনাদের রন্ধনশালা হইতে আমাদিগকে অন্ন দিবেন না। আমাদের উপর এরূপ ঘৃণার ভাব কোথা হইতে আসিল?

স্বচ্ছতোয় ব্রহ্মপুত্র নদ গৌহাটীর পার্শ্বদেশ দিয়া নির্ম্মলপ্রবাহে বহিয়া যাইতেছে। সহরের মধ্যে তেমন বন জঙ্গল নাই; সুতরাং সহরের স্বাস্থ্য খুবই ভাল। সকল অধিবাসীই হৃষ্টপুষ্ট, প্রফুল্ল। এখন ব্রহ্মপুত্র আপনার

গর্ভে নামিয়া গিয়াছে, সুতরাং কোনও আশঙ্কার কারণ নাই। কিন্তু যখন ঈষৎ স্ফীত হইয়া উঠে, তখন গৌহাটীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইবার সম্ভাবনা। ব্রহ্মপুত্রের মধ্যদেশে একটি কাষ্ঠখণ্ড প্রোথিত করিয়া, তাহাতে জলের চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

কামরূপের তীর্থ-দেবালয়।

গৌহাটীর উত্তর পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রের উচ্চ তীরদেশে মহাদেব শুক্রেশ্বরের মন্দির। এই মহাদেবের নাম দেখিলাম দুই প্রকার;—দেশীয় অধিবাসিগণ ইহাঁকে "শুক্লেশ্বর" বলিয়া থাকে। কিন্তু আসাম--বুরঞ্জীতে "শুক্রেশ্বর" লিখিত আছে।* ইহার প্রকৃত মীমাংসা আমাদের দ্বারা সম্ভবে না; যদি কেহ যথার্থ তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে পারেন, তবে অনেকের দ্বিধা দূর হয়। কোন্ সময়ে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার সঠিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা সুকঠিন; তবে আধুনিক ইষ্টক-নির্ম্মিত মন্দির ১৭৪৬ খৃঃ-অব্দে কামরূপের নরপতি প্রমত্তসিংহ কর্ত্তৃক সংস্কৃত হয়। †

ইদানীং দেবালয়-প্রাঙ্গনে, মহাদেবের মন্দির ও পাণ্ডাদের দুই একখানি কুটীর ভিন্ন আর কিছুই নাই। মন্দিরের মধ্যদেশে একটি অন্ধকারময় গুহা; তাহারই ভিতর ঠাকুরের প্রস্তরময় লিঙ্গ বিরাজমান। এখানকার দেবালয়ের বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক মন্দিরেই অন্ধকারাবৃত গহ্বরমধ্যে দেবতার স্থান। এখানকার দেবালয়ের মধ্যে কামাখ্যা ও উমানন্দই প্রধান, তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দেবালয় ও দেবমূর্ত্তিও আছে।

এখানকার বন্দোবস্ত অতি সামান্য। একটি সাধারণ দেবমন্দিরের মত প্রাতে পূজা ও দ্বিপ্রহরে ভোগারতি, এবং সন্ধ্যার সময় আরতি প্রভৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকে। দুই তিন জন পূজারী আছেন। এই শুক্রেশ্বর বা শুক্লেশ্বর মন্দিরের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, সন্ধ্যার অব্যবহিত পর হইতেই প্রায় রাত্রি সাড়ে দশটা এগারটা পর্য্যন্ত এখানে কীর্ত্তন হইয়া থাকে। এ হরি-কীর্ত্তনে খোল করতাল নাই, কেবলমাত্র করতালের আকার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইখানি পিত্তল বা কাঁসার নির্ম্মিত যন্ত্রই এই কীর্ত্তনের একমাত্র বাদ্য। স্থানীয় ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ ও অভ্যাগত নানা লোকের একত্র সম্মিলনে

* আসাম-বুরঞ্জী; পৃঃ ১০৮।

† আসাম-বুরঞ্জী; পৃঃ ১০৮।

এই কীর্ত্তন বড়ই গম্ভীর হইয়া উঠে, এবং নিস্তব্ধ নিশীথে কীর্ত্তনের উচ্চ সুর দিগন্ত কম্পিত করিয়া উত্থিত হয়। বিশেষতঃ পৌর্ণমাসী-রজনীতে ইহার অধিকতর স্ফূর্ত্তি হয়, এবং নির্ম্মল জ্যোৎস্নাবিধৌত, শ্যামলশষ্পাচ্ছাদিত দেবাঙ্গনে এই পুরাতন কীর্ত্তনের সুরও জমাট হইয়া উঠে, যেন নবীন মূর্চ্ছনায় প্রাণময় হইয়া জগতের শ্রবণপথে মঙ্গল ও শান্তির বার্ত্তা বহন করিয়া আনে।

এই শুক্রেশ্বর বা শুক্লেশ্বর দেবালয়ের পশ্চাতে, ব্রহ্মপুত্রের গর্ভের কিছু উর্দ্ধে, তীরস্থ পর্ব্বতগাত্রমধ্যে এক বিরাট জনার্দ্দনমূর্ত্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। পদ্মাসনমূর্ত্তিই প্রায় চারি পাঁচ হাত দীর্ঘ। এ মূর্ত্তিটি দেখিয়া মনে হয়, ইহা বৌদ্ধযুগের বা তাহার অব্যবহিত কালে নির্ম্মিত! জনার্দ্দনের দুইটি হাত বাদ দিলে ইহাঁকে বুদ্ধমূর্ত্তি বলিলে কাহারও ভ্রম জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা আজকাল পুরাতন বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি যেরূপ দেখিতে পাই, এ মূর্ত্তিটিও অনেকাংশে ঠিক তদ্রূপ। সেই কুণ্ডলীকৃত কেশপাশ মস্তকের চতুর্দ্দিকে ঝুলিয়া পড়িতেছে,—সেই ঈষৎমুদিত নয়নদ্বয় যেন কোন্ শান্তির বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে। কর্ণদ্বয় দীর্ঘ, প্রায় স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত অবনত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুইটি কুণ্ডল। কণ্ঠদেশে তিন সার রুদ্রাক্ষের মালা। তিনটি হাত বর্ত্তমান। বাম দিকের নিম্নদেশের হাতটি ভগ্ন। অঙ্গের অন্যান্য স্থানে কিঞ্চিৎ ভগ্নচিহ্ন; প্রশান্ত, দিব্য বদনে নাসিকাহীনতা মূর্ত্তিটিকে বড়ই নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিয়াছে। এই সকল উপদ্রব, অত্যাচার কালাপাহাড়ের। এইরূপ কত অমূল্য সম্পত্তি যে মুসলমানের অত্যাচারে কলঙ্কিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

উমানন্দ।

ব্রহ্মপুত্রবক্ষে, একটি ক্ষুদ্র দ্বীপস্থিত শৈলশীর্ষে উমানন্দ প্রতিষ্ঠিত। আমরা শুক্রেশ্বর বা শুক্লেশ্বর দর্শনের পরদিন প্রাতঃকালে উপানন্দ-দর্শন-মানসে বহির্গত হইলাম। ব্রহ্মপুত্রের ঘাটে সঙ্কীর্ণ ডোঙ্গাগুলি প্রভাতের তরঙ্গহিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে। আমরা এইরূপ একখানি ডোঙ্গা লইয়া উপানন্দ-দর্শনে যাত্রা করিলাম। ডোঙ্গায় যিনি একবার চলিয়াছেন, তিনিই জানেন, ইহাতে যাতায়াত কিরূপ কষ্টকর ও সঙ্কটময়। একটু নড়িয়াছ কি, অমনই ডোঙ্গা উল্টাইয়া গিয়াছে! কষ্টে সৃষ্টে নিস্তরঙ্গ

বাঁধিয়া, দ্বীপে অবতরণ করিয়া প্রস্তরময় সোপান বাহিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। খুব অল্প উঠিয়াই মন্দির পাইলাম। এখানেও দুই চারি জন মাত্র পূজারী আছেন;—তাঁহারাই ঠাকুরের তত্ত্বাবধারণ করেন। মন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশ করিবামাত্রই সম্মুখে প্রকাণ্ড "নাটমন্দির" দৃষ্টিগোচর হয়। উচ্চ উচ্চ স্তম্ভের উপর "করোগেট"-নির্ম্মিত ছাদ। চারি দিকে চুণকামকরা প্রাচীর। নাটমন্দিরের এক কোণে একটি প্রকাণ্ড ভেরীসদৃশ বাদ্যযন্ত্র। যখন উমানন্দ মহাদেবের পূজা ও ভোগ হয়, তখন এই বাদ্য বাজান হইয়া থাকে। আমরা যখন মন্দিরে উপনীত হইলাম, তখন মহাদেবের পূজা হইতেছিল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পূজান্তে ঠাকুরদর্শন-মানসে মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এখানেও গহ্বরমধ্যে দেবতার আসন। লাল, নীল, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণ, নানাজাতীয় পুষ্পরাশি মহাদেবের প্রস্তরময় লিঙ্গের উপর বিক্ষিপ্ত। গহ্বরমধ্যে একখানি লম্বা প্রস্তরখণ্ড;—এবং কিঞ্চিৎ উপরে মহাদেবের ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি বিরাজমান। দেবের পঞ্চ মুখ, দশ হস্ত। আমরা মহাদেবকে পঞ্চানন বলিয়া জানি, কিন্তু দশভুজ বলিয়া তাঁহার কোথাও উল্লেখ বা বর্ণনা আছে কি না, বলিতে পারি না। অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিতকেও এ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; তাঁহারাও ইহার উত্তর দিতে পারেন নাই।

পূর্ব্বে উমানন্দের মন্দির কিরূপ ছিল,—জানিবার উপায় নাই। আধুনিক মন্দির ও নাটমন্দির ইত্যাদি প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে আসামের রাজা শিবসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। চারি দিকে আমলকী, আম ও অন্যান্য বৃক্ষের হরিতশ্রী।

উমানন্দের বিষয়ে অনেক প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে সত্যের আবিষ্কার করা সুকঠিন। তবে এই দেবপূজা দানব বা কিরাতবংশীয় নৃপতিগণের সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। কারণ, এখনও শিবরাত্রির দিন যেরূপ নৃশংসভাবে ছাগশিশুগুলিকে বধ করা হয়, কোনও হৃদয়বান্ ব্যক্তি তাহা শুনিলে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিবেন না। প্রথমতঃ, মহাদেবের নিকট বলিদান বিধিসঙ্গত নহে। তদুপরি ইহা বলিদান নহে, নৃশংসভাবে নিরীহ জীবের প্রাণনাশ। শিবরাত্রির দিন রাত্রিকালে পূজাদির পর বলিদানের পরিবর্ত্তে ছাগশিশুগুলির ঘাড় মোচড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলা হয়। এরূপ হৃদয়-হীনতার পরিচায়ক পূজা—বিশেষতঃ শিবপূজা

কামাখ্যা।

কামাখ্যা হিন্দুর অন্যতম পবিত্র তীর্থ। কত শত সাধক প্রতিনিয়ত এই মহাতীর্থ-সন্দর্শন-মানসে সমুৎসুক হইয়া দেশদেশান্তর হইতে, বহু অর্থব্যয়ে এই স্থানে আসিয়া থাকেন। জগজ্জননী ভগবতীর অঙ্গবিশেষ এই স্থলে নিপতিত হওয়ায়, ইহা পীঠশ্রেষ্ঠ বলিয়া চিরদিন প্রসিদ্ধ।

কামাখ্যা-দর্শনাভিলাষী তীর্থযাত্রিগণ উমানন্দ, উর্ব্বশী, ব্রহ্মকুণ্ড, পাণ্ডুনাথ ও গৌরীশিখর—এই পঞ্চতীর্থে স্নানপূজাদি সমাপনান্তে পীঠ-দর্শন ও অর্চ্চন করিতে গিয়া থাকেন। উক্ত পঞ্চতীর্থের মধ্যে উমানন্দেরই প্রসিদ্ধি অধিক। মহাতীর্থ বারাণসীতে অন্নপূর্ণ-দর্শনের সঙ্গে বিশ্বেশ্বর দর্শন না করিলে যেমন অন্নপূর্ণা-দর্শন নিষ্ফল হয়, পীঠ-দর্শনের পূর্ব্বে উমানন্দ দর্শন না করিলে কামাখ্যা-দর্শনও সেইরূপ বিফল হইয়া থাকে।

আমারা সেদিন দুই বন্ধুতে মিলিয়া, কামাখ্যা-দর্শনের জন্য বহির্গত হইলাম। গৌহাটী সহর হইতে নীলাচল প্রায় দেড় মাইল হইবে। এই নীলাচলের শীর্ষদেশেই কামাখ্যাদেবীর মন্দির। প্রত্যুষে আমরা বাহির হইয়াছিলাম; রৌদ্রের প্রখরতা বাড়িবার পূর্ব্বেই আমরা পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া উপনীত হইলাম। উচ্চ পর্ব্বতের গাত্রে প্রস্তরময় পার্ব্বত্য পথ অজগর সর্পের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। তখন কেবলমাত্র প্রভাত হইয়াছে। অরুণদেব পূর্ব্বাশার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। উষাসতী নাথের আগমনে-হর্ষে বিভোর হইয়া কুহেলিকা-অবগুণ্ঠন সরাইয়া, সোনার হাসি হাসিলেন, অমনই দেখিতে দেখিতে সে হাস্যচ্ছটায় বনের করবী, কাঞ্চন, কুন্দ, কহ্লার, সকলেই হাসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বিহঙ্গমগণ কানন-সভায় উষার জাগরণবার্ত্তা গায়িতে লাগিল। সে "পাখীডাকা", "ছায়া-ঢাকা" শৈলমার্গে অস্ফুট আনন্দকাকলীর সহিত হৃদয়ের সমস্ত সুর এককালে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে! দুই দিকে অনন্ত শ্যামল শৈলবনভূমি,—মধ্যে প্রস্তরময় পার্ব্বত্য পথ! কোথাও নারিকেল, দেবদারু প্রভৃতি উন্নত তরুরাজি, কোথাও আম, পনস প্রভৃতি বৃহৎকায় পাদপপুঞ্জ, কোথাও অনন্ত বংশবিতান ও করবীকুঞ্জে, কোথাও বকুলবীথিকা ও বটচ্ছায়াশীতল শ্যামতৃণাচ্ছাদিত ভূমিখণ্ড। কোথাও বা লতাগুল্মাচ্ছাদিত, "বকুলকুঞ্জ-কিশলয়কৃত অন্ধকার" সান্দ্র হইয়া রহিয়াছে,—কোথাও বা মনোহর আরণ্য কুসুম পুঞ্জীকৃত হইয়া বিজন কাননের সৌন্দর্য্যরাশি ফুটাইয়া

তুলিয়াছে; কোথাও বা দীর্ঘ দেবদারু ললিতা-লতিকাকে আদর করিতেছে, মাথায় তুলিয়াছে;—আর তলদেশে বিস্মিত ধুস্তর বিস্ফারিতনেত্রে তাহাদের কঠোরে কোমলে অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিতেছে! পর্ব্বতের সর্ব্বত্র শ্যাম সৌন্দর্য্য উথলিয়া পড়িতেছে। পর্ব্বতগাত্রে দাঁড়াইয়া শ্যামল বনরাজির অনন্ত, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিলে অনন্তের আভাস পাওয়া যায়। তখন এই ক্ষুদ্র সংসারে আর মন আকৃষ্ট থাকিতে চায় না; সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া বিহঙ্গের ন্যায় উধাও হইয়া উড়িতে চায়। গভীরা ত্রিযামার ঘোর সূচীভেদ্য অন্ধকারে কালী করালীর ভীমা মূর্ত্তি দেখিতে পাই;—আবার যখন প্রভাতে বনকুঞ্জে বিহগকুল মধুর স্বরে কূজন করিয়া উঠে, যখন আবার সেই শ্যামলক্ষেত্রে শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত বর্ণের প্রসূনপুঞ্জ ফুটিয়া উঠে, নির্ঝরের শ্রুতি-মধুর ঝর-ঝর শব্দে বনানী মুখরিত হইয়া উঠে, তখন কালী করালীর ভীমা ভৈরবী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে স্নেহময়ী, হাস্যময়ী মাতৃমূর্ত্তির উদয় হয়; তরুরাজি মস্তক অবনত করিয়া মায়ের সেবার জন্য সুমিষ্ট ফলভার উৎসর্গ করে; পুষ্পতরু আপনার সমস্ত সৌন্দর্য্যরাশি মায়ের চরণে অর্পণ করে; প্রফুল্ল বিহঙ্গগণ দিগন্তে মাতৃগান গায়িয়া বেড়ায়! তাহাদের সে বন্দনগীতি পর্ব্বতকন্দরে, শ্যামল বনকুঞ্জে, দুর শৈলশৃঙ্গে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে।

আমরা পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া মহাদেবীর দর্শনাশায় শৈলশীর্ষে উঠিতে লাগিলাম। পথটি নিতান্ত খাড়াই নহে, সমস্তটিই প্রায় গড়াইয়া নামিয়াছে, তবে এক স্থানে অত্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিয়াছে;—এই খাড়াইএর পাদদেশে পাহাড়ের গায়ে একটি প্রকাণ্ড গণেশমূর্ত্তি ক্ষোদিত করা হইয়াছে। সিন্দূররাগরঞ্জিত সিদ্ধিদাতা, বাহন মূষিকের পৃষ্ঠে আপনার বিরাট দেহ স্থাপন করিয়া উপবিষ্ট। মূর্ত্তিটি প্রায় চারি হাত দীর্ঘ। ইহার তলদেশে এক জন ব্রাহ্মণ পূজারী বসিয়া যাত্রীদিগের নিকট হইতে মায়ের পূজার পূর্ব্বে ছেলের পূজার জন্য কিছু ভিক্ষা করিতেছে। তাহার কিছু নিম্নেই পর্ব্বতগাত্রে মহাকালের ভীমা মূর্ত্তি। পদ দুইখানি দুই দিকে ভীমভাবে ছড়াইয়া, হস্তে তীক্ষ্ণ অস্ত্র ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা। এ সকল মূর্ত্তি পর্ব্বতের গা কাটিয়া ক্ষোদিত হইয়াছে।

খাড়াই অংশটি খুবই খাড়াই বটে;—পথে আমাদের দুইবার বিশ্রাম করিতে হইয়াছিল। প্রবাদ যে, আসামদেশের রাণী একবার কামাখ্যা দর্শন

করিতে আসিয়া, এই স্থানটি উঠিতে আপনার মেখলা সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন। সেই জন্য এখনও এই খাড়াইটিকে লোকে বলে,—"মেখা-উজান!" * এইটি উত্তীর্ণ হইলে আর খাড়াই নাই, সমস্ত পথই প্রায় সমতল। এই দীর্ঘ পার্ব্বত্যপথ অতিক্রম করিয়া প্রায় সাড়ে আটটা, নয়টার সময় আমরা দেবীর মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম,—যাত্রীর সংখ্যা খুব বেশী নহে। তবে পাণ্ডারা বলিল,—আজকাল প্রত্যহই অল্পবিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়। অম্বুবাচীতে এখানে মেলা হয়, এবং এই সময়ে কামাখ্যা-দর্শন-মানসে কত শত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু কত দূর দূরান্তর হইতে বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া এখানে আগমন করেন। এখানে একটি ক্ষুদ্র জলাশয় আছে; নাম "সৌভাগ্যকুণ্ড"; ইহা কামাখ্যা দেবীর ক্রীড়াসরোবর বলিয়া প্রসিদ্ধ।—প্রথমে এই জলাশয়ে স্নানতর্পণাদি করিয়া, পরে কামাখ্যাদেবীকে দর্শন করিতে হয়। আমরা সভ্য বাঙ্গালী,—তাহার জল দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া ফিরিয়া আসিব;—বাস্তবিক, এই ক্ষুদ্র জলাশয়ের বারিরাশি নিতান্তই আবিল ও দুর্গন্ধময় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এ স্থানের পাণ্ডাপুত্রগণ এই পূতিগন্ধময় জলে কত লাফালাফি করিতেছে, কিন্তু তাহাদের স্বাস্থ্যের রক্তিম জ্যোতিঃ একটুও ত মলিন হয় নাই! রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। হৃষ্টপুষ্ট অঙ্গ, সহাস্য বদন, গৌরবর্ণ। স্বাভাবিক সরলতা, কোমলতা ও লাবণ্যে ইহাদিগকে যেন দেবশিশু বলিয়া ভ্রম হয়। কিরূপে তাহাদের এরূপ স্বাস্থ্য আছে,—সন্তানপালিনী জননীই জানেন!

কামাখ্যার কথা বলিতে গেলে, প্রথমতঃ, এখানকার পাণ্ডাদের বিষয়ে দুই এক কথা না বলিয়া থাকা যায় না;—এমন সৎ পাণ্ডা অন্য কোনও তীর্থে আছে কি না সন্দেহ। কবি বলিয়াছেন,—

"——দক্ষিণে বামে, সমুখে পিছনে যত
লাগিল পাণ্ডা;—নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত!"

কিন্তু এখানে এ উক্তি একেবারে নিরর্থক! এমন শান্ত, অনত্যাচারী, সহজে সন্তুষ্ট পাণ্ডা, বোধ হয়, অন্য কোনও তীর্থে নাই। সকল তীর্থেই

* এ দেশে মেখলা প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয় না। মেখলার সংস্কৃত অর্থ চন্দ্রহার। কিন্তু এ দেশে উহা একপ্রকার ঘাগরা বিশেষ। স্ত্রীলোকেরা আপনাদের বস্ত্রের অভ্যন্তর দেশে 'বালিশের ওয়াড়ে'র মত একটা পরিচ্ছদ কোমরে আঁটিয়া পরিধান করেন; এবং ইহা প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে। ইহাই এ দেশের মেখলা।

পাণ্ডারা যাত্রীদের গলায় ছুরি বসাইতে পারিলে ছাড়ে না। কিন্তু কামাখ্যার পাণ্ডাদের মত নিরীহ পাণ্ডা দেখিতে পাওয়া সুকঠিন। যাত্রীদের ইচ্ছামত পূজাতেই ইঁহারা সন্তুষ্ট ; শুধু সন্তুষ্ট নহেন,—ধনী দরিদ্র নির্ব্বিচারে সকলকে সমভাবে আদর যত্ন করিয়া থাকেন। ইঁহারা সুন্দররূপে যাত্রীকে দেবীর দর্শন, স্পর্শন ও অর্চ্চন করাইয়া, নিজ ভবনে আনিয়া, সযত্নে আহারাদির দ্বারা পরিতুষ্ট করেন। উৎকৃষ্ট অন্ন, আমিষ ও নিরামিষ নানা সুস্বাদ ব্যঞ্জন,—অবশেষে, খাঁটী দুধ, লুচি, হালুয়া, পরমান্ন ইত্যাদি চর্ব্ব্য চোষ্য, লেহ্য, পেয়, বিবিধ খাদ্যে সকলকে সমভাবে ভোজন করাইয়া, শেষে ইঁহারা আপনারা আহারাদি করিয়া থাকেন।

কামাখ্যার মন্দিরে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়। প্রথমেই কামাখ্যা দেবীর ধাতুময়ী প্রতিমা। সিংহের উপর শিব শবাকারে শয়ান ; তাঁহার নাভি-সরোবর হইতে একটি পদ্মের মৃণাল উঠিয়া শীর্ষদেশে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম ধারণ করিয়া আছে ; এই পদ্মের উপর ষড়াননা, দ্বাদশভুজা, কামাখ্যা দেবী সমাসীনা। এই স্থানে অন্যান্য আরও অনেক দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। নানাপুষ্পগন্ধামোদিত, ধূপ-ধূনার সুবাসে পরিপ্লাবিত মন্দিরের মধ্যে একটি এমন দিব্য গাম্ভীর্য্যময় পবিত্রতা বিরাজ করিতেছে যে, ভক্ত বা অভক্তের হৃদয়ও স্বতঃই ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া উঠে, আর অজ্ঞাতসারে মস্তক অবনত হইয়া মহামায়ার চরণে প্রণত হয়। এই মূর্ত্তির আসনের পশ্চাতে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরমধ্যে যোনিপীঠ দর্শন করিতে হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কামরূপের সকল মন্দিরই এইরূপ গহ্বর-বিশিষ্ট। এ স্থানটি দিবালোকেও ঘোরতমসাচ্ছন্ন ; দীপালোক ভিন্ন তথায় গমন করিবার উপায় নাই। গহ্বর-মধ্যে বড় বড় মৃণ্ময় দীপ প্রজ্জলিত রহিয়াছে। এ স্থানে দেবীর কোনরূপ মূর্ত্তিময়ী প্রতিমা নাই ; কেবল অবিরামসলিলোদগারি-গহ্বর-বিশিষ্ট শিলাখণ্ড আছে। পাণ্ডাগণ এই শিলাখণ্ডে সিন্দুর বিলেপন করিয়া দেবপ্রভা সমুজ্জ্বল করেন, এবং সেই গহ্বরেই যোনিমুদ্রাজ্ঞানে যাত্রিগণ অঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন কামাখ্যা শৈলে বিস্তর তীর্থ ও দেবালয় আছে। তন্মধ্যে ভগবতী ভুবনেশ্বরীর ও দশমহাবিদ্যার পীঠাস্থানেরই প্রসিদ্ধি অধিক। এখানে "কুমারী"-পূজা দেবী পূজার প্রধান অঙ্গ। দলে দলে শিশু হইতে দ্বাদশবর্ষবয়স্কা কুমারীগণ চতুর্দ্দিকে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে ;—তাহাদের

সারল্য-লাবণ্যময় মুখ হইতে যেন দিব্য আভা বিকীর্ণ হইতেছে। সকলেই প্রায় নিরাভরণা। কেবল কণ্ঠে এক একগাছি মুক্তার মালা। এ মুক্তা মূল্যবান মুক্তা নহে। ইহারা লাল নীল বর্ণের বড় বড় ফকীরী মুক্তার মালা গাঁথিয়া, এবং মালার মধ্যদেশে সুবর্ণের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটি পদক সংযোজিত করিয়া কণ্ঠে ধারণ করে;—ইহার নাম—"মণিমালা"। এই মণিমালা ও হাতে রৌপ্যনির্ম্মিত বলয় ভিন্ন সাধারণতঃ আর কোনও অলঙ্কার নাই;—কিন্তু এই নিরলঙ্কার মূর্ত্তিই লাবণ্যময়। কি সুন্দর সরলতার ছবি! দেখিলেই মনে হয়,—"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম্"।

আমরা দ্বিপ্রহরে পাণ্ডার গৃহে প্রসাদ পাইয়া, রৌদ্রের তেজ একটু কমিলে, পাহাড়ের চারি দিকে ভ্রমণ করিবার জন্য বহির্গত হইলাম। পাণ্ডাদের গৃহে এক জন মহামনা ভদ্রলোকের সহিত আমাদের আলাপ হয়;—তিনি শিলংএ চাকরী করেন, নাম—শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু। এমন সরলস্বভাব, উদারমতি সাধু ব্যক্তি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। বালকের সরলতা, রমণীর হৃদয়, পুরুষের তেজস্বিতা সমভাবে তাঁহার চরিত্রে পরিস্ফুট। এমন মাতৃভক্ত সন্তান সচরাচর বিরল। তাঁহার সাহচর্য্যে আমাদের পর্ব্বত-প্রদক্ষিণ সুখকর হইয়াছিল। সকলে ভুবনেশ্বরীর মন্দির-সন্নিহিত শৈলে উঠিয়া অপার আনন্দ ও শান্তির সাগরে নিমগ্ন হইলাম। এই স্থানে স্বামী অভয়ানন্দ নামক এক জন মহাপুরুষ আশ্রয় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন;—কিসে কামাখ্যা-যাত্রীর সকল অসুবিধা দূর হয়, এই চিন্তাও ঈশ্বর-চিন্তার সহিত তুল্যরূপে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে! কেবল চিন্তাই নহে;—ইনি কামাখ্যা শৈলের উপর "ধর্ম্মশালা" নামক এক প্রকাণ্ড আশ্রম নির্ম্মাণ করিতেছেন। ধর্ম্মশালা প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। মধ্যে মধ্যে নানা দেশে ভিক্ষার্থ বহির্গত হন; যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন, সে সমস্তই এই লোকহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয় করিয়া থাকেন। দেশের অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় আছে। কিছু দিন অসুস্থতানিবন্ধন বহির্গত হইতে পারেন নাই,—সেই জন্য আশ্রম অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে! দেশের সকল হৃদয়বান ব্যক্তিরই এই লোকহিতকর কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। এই আশ্রম নির্ম্মিত হইলে অসংখ্য যাত্রী

ভুবনেশ্বরী নীলাচলের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। সেই উচ্চ শৈলশীর্ষ হইতে নিম্নে গৌহাটী নগরীকে একখানি দূরপ্রসারিত প্রকাণ্ড মানচিত্র বলিয়া মনে হয়। শ্যামল শস্যক্ষেত্র, ঘর বাড়ী, হরিত তরুলতাদি ও সুদূর-বিস্তৃত পথগুলির একত্র সমাবেশে যেন একটি প্রকৃত মানচিত্র বলিয়া ভ্রম জন্মে। নিম্নে ব্রহ্মপুত্র নদ একটি সঙ্কীর্ণ খালের মত বহিয়া যাইতেছে; বক্ষঃস্থিত তরণীগুলি মোচার খোলার মত ধীরে ধীরে ভাসিয়া যাইতেছে; দূরে দুইটি দীর্ঘ পার্ব্বত্য পথ,—শ্যামলতৃণাচ্ছাদিত ভূমির মধ্য দিয়া বিরাট তৃষিত জিহ্বার ন্যায় ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে। এই পুণ্যভূমির উদাত্ত সৌন্দর্য্যে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়।

এই পর্ব্বতের উপর প্রায় পাঁচ ছয় শত ঘর লোকের বাস। এখানকার অধিবাসী কেবল ব্রাহ্মণ পাণ্ডা ও মালী। সকলেই স্বাস্থ্যবান ও সুখী। ব্রাহ্মণসন্তানগণের শিক্ষার জন্য গবর্মেণ্টের অনুগ্রহে এখানে একটি উচ্চ-প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; সম্প্রতি সংস্কৃত-ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য চতুষ্পাঠীও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই দূর পার্ব্বত্য রাজ্যেও বিলাসের উপকরণ অল্পে অল্পে প্রবেশ লাভ করিতেছে। কামাখ্যার নাটমন্দিরে একটি থিয়েটারের ষ্টেজ বাঁধা রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে এখানে অভিনয় হইয়া থাকে। যাত্রা, দেশের গান, কথকতা ছাড়িয়া এখানকার অধিবাসীরাও পাশ্চাত্য মোহে মুগ্ধ হইয়াছেন।

এখানে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা মধ্যে মধ্যে আগমন করিয়া থাকেন; তিনি এখানকার দুই একটি মন্দিরের জীর্ণসংস্কারও করিয়া দিয়াছেন। গত বৎসর তিনি এই স্থানে মধ্যে মধ্যে বাস করিবার অভিপ্রায়ে শৈলের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গে একটি বাসভবন নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন; ঘরের উপর "করোগেটে"র ছাদও উঠিয়াছিল; কিন্তু নির্ম্মাণের অব্যবহিত পরেই ছাদের এক অংশ ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতে উড়িয়া গিয়া ব্রহ্মপুত্রগর্ভে পতিত হয়। এখন সেই ভবন ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে; তিনি আর তাহার নির্ম্মাণের যত্ন করেন নাই।

এইরূপে পাহাড়ের চারি দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আমরাও পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে দূর ব্রহ্মপুত্রবক্ষে রক্তিম রবি ডুবিয়া গেল; পাহাড়ের ঘনবনাচ্ছন্ন দেশ অস্ফুট অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়িল; কিন্তু তখনও শৈলশীর্ষে অস্তগত ভাস্কর শেষ কনককিরণমালা খেলা করিতেছিল। নীচে অস্ফুট অন্ধকার,

উপরে শ্যাম শৈলশীর্ষ কনক-কিরণে উজ্জ্বল, আর বনভূমি সন্ধ্যার শান্ত অন্ধকারে ও গভীর নিস্তব্ধতায় মানবহৃদয়ে পবিত্রতার সহিত ভক্তির উদ্রেক করিয়া দিতেছিল। ঝিল্লীকণ্ঠনিঃসৃত অবিরাম উচ্চ ঝঙ্কারে বনভূমির গাম্ভীর্য্য অধিকতর গভীর হইয়া উঠিতেছিল। সেই শান্ত, স্তব্ধ সন্ধ্যায় ভক্তহৃদয়ে স্বতঃই ভক্তির উদয় হয়; ঈষৎভীতিমিশ্রিত ভক্তিরসে হৃদয় আপ্লুত হইয়া উঠে। চারি দিকে ঘন নিবিড় বনানী পল্লবঘন বৃক্ষরাজির অন্তরে অন্তরে, পর্ব্বতের প্রতি কন্দরে কন্দরে, গভীর তমসাকে যেন জড়াইয়া ধরিতেছিল। বিহঙ্গমগণ নীরব। কেবল ঝিল্লীকুলের ঝঙ্কারে সেই গভীর নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ হইতেছিল! সন্ধ্যার এই অনির্ব্বচনীয় বিশাল গাম্ভীর্য্যে প্রকৃতির শ্যামল অঙ্গে স্তূপীকৃত গুল্মরাজিতে রোমাঞ্চ ফুটিয়া উঠিতেছিল! ক্রমে আমরা প্রান্তরে আসিয়া পড়িলাম। ঝিল্লীমুখর ক্ষেত্রপথে বাসায় ফিরিলাম।

বশিষ্ঠ।

কামাখ্যা হইতে ফিরিয়া এক দিন বিশ্রাম করিলাম। তৎপরদিন অতি প্রত্যূষে বশিষ্ঠ আশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করা গেল। এখানকার লোকের বিশ্বাস যে, মহর্ষি বশিষ্ঠদেব এই স্থানে মহাসমাধি লাভ করিয়াছিলেন।

গৌহাটী সহর হইতে বশিষ্ঠাশ্রম সাত মাইল। বিস্তৃত মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া "লোকালবোর্ড"-নির্ম্মিত পথ দূরে ধূমাকার পাহাড়ের কোলে মিলাইয়া গিয়াছে। সত্য সত্যই "অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণী হইয়া অনন্তকাল পড়িয়াছিল", এ রাজপথও সেইরূপ কাহার শাপে, উদ্ধারের শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় অলসভাবে পড়িয়া রহিয়াছে! বুঝি চিরদিনই এইরূপ ভাবেই পড়িয়া থাকিবে! এ দীর্ঘ পথে কত চরণচিহ্ন পড়িতেছে, মুছিতেছে; অবিশ্রাম চিহ্ন পড়িতেছে, আবার নূতন পদস্পর্শে পুরাতন পদচিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে।

এখন প্রাতে এখানে প্রায়ই কুয়াসা হইয়া থাকে। আজ এই শীতের প্রথম-হিমানী-সম্পাতে প্রকৃতি অবগুণ্ঠনাবৃতা নববধূটীর মত কমনীয় রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রভাত হইয়া গেল, তবু অরুণোদয় হইল না! প্রায় যখন সাতটা, তখন দেখি, ঊর্দ্ধাকাশে তেজোহীন রবি 'ঘোলাটে' মেঘের উপর মন্দ মন্দ কিরণ বর্ষণ করিতেছেন। দেখিতে দেখিতে কুয়াসা কাটিয়া গেল; চারি দিকের গিরি, বন ও ক্ষেত্রগুলি স্বভাবসৌন্দর্য্যে বিকশিত হইয়া উঠিল। চারি দিকে আলে আলে রবিরশ্মি পতিত হইয়া শ্যামল

সৌন্দর্য্যকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। কিন্তু তখনও শাদা মেঘের 'শালপাতা খাওয়া' শেষ হইল না; তখনও তাহারা খণ্ডে খণ্ডে সবুজ পাহাড়ের গা জড়াইয়া পড়িয়া রহিল। কিন্তু অধিকক্ষণ তাহাদের সাহসে কুলাইল না; ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে, দেখিতে দেখিতে, শাদা মেঘগুলি উড়িয়া উড়িয়া, দিগন্তের কোলে মিলাইয়া গেল!

তখন চারি দিকে দূরবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রগুলি সোনার রৌদ্র মাখিয়া হাসিতেছিল। পথের দুই পার্শ্বে শ্যামলশস্যতরঙ্গ দূর গগনের কোলে মিলাইয়া, আপনার স্পর্শে আকাশপ্রান্ত শ্যামল করিয়া দিয়াছে। এখনও সমস্ত ক্ষেত্রে ধান পাকিয়া উঠে নাই। কোথাও শ্যামল ধান্যশীর্ষ মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান; কোথাও বা শস্যের স্বর্ণশীর্ষগুলি অবনত হইয়া বায়ুভরে ঈষৎ আন্দোলিত হইতেছে। এরূপ 'হরিতে হিরণে' অপূর্ব্ব মিলন দেখিয়া হৃদয় ভাবাবেশে উচ্ছলিত হইয়া উঠে। বাস্তবিক, এতদিন পুস্তকের পৃষ্ঠায় পড়িয়া, কল্পনালোকে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছিলাম; কিন্তু আজ সত্য সত্যই প্রকৃতির লীলানিকেতনে দেখিলাম,—'মধুর মহিমা হরিতে হিরণে।' কোথাও বা ধান্য কর্ত্তিত হইয়া চাষীর আঙ্গিনায় স্তূপাকারে শোভা পাইতেছে। ক্ষেত্রে যেন সুখের হাট ভাঙ্গিয়াছে। মহাপূজার সময় ঠাকুরের অঙ্গনে কি সৌন্দর্য্য! চন্দ্রাতপের নিম্নে কি জমাট প্রাণময়ী শান্তি! যেন নিত্যসুখময় হাস্যে দিগদিগন্ত উদ্ভাসিত! কিন্তু বিজয়াদশমীর পর যেমন নির্জ্জন, নিরানন্দ প্রাঙ্গনে দেবীর শূন্য সিংহাসন পড়িয়া থাকে, আর সানাইএর প্রাণস্পর্শী সুর কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রোতার শ্রবণপথে করুণ বিষাদ বহিয়া আনে, আজ ক্ষেত্রেরও সেই দশা! সে লাবণ্য নাই, সে সৌন্দর্য্য নাই, সে শোভা নাই, সে বিরাট সদাব্রতের হাস্যোজ্জ্বল মূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইয়াছে। কিন্তু ক্ষেত্রভবনে কমলার বিরাট সিংহাসন পড়িয়া রহিয়াছে; আর উদাস দক্ষিণ বাতাস উদাসভাবে বিশ্বের শ্রবণপথে বিষাদের সুর গাহিয়া যাইতেছে।

এইরূপে দুই পার্শ্বে প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে সরল পথ অতিক্রম করিয়া পার্ব্বত্য কাননপথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। পথের উভয় পার্শ্বে অপর্য্যাপ্ত লজ্জাবতী লতা জন্মিয়াছে। তৃণময় ভূমিখণ্ডের পরিবর্ত্তে লজ্জাবতীর দ্বারা শ্যামীকৃত ভূখণ্ডে নব শোভার বিকাশ হইয়াছে। এই পার্ব্বত্য কাননপথ দিয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই আশ্রমে উপস্থিত হইলাম। কিছু দূর হইতে নাগেশ্বর-বীথিকার মধ্যদেশ হইতে

আসিয়া আঘাত করিল। নিস্তব্ধ অরণ্যে এরূপ উচ্চ রোল শুনিয়া প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিলাম, কিন্তু যখন প্রকৃত বস্তু নিরীক্ষণ করিলাম, তখন সেই বিস্ময়ের সহিত প্রাণের সমস্ত আবেগ হৃদয়দ্বারে আঘাত করিল। দেখিলাম, —দূর পার্ব্বত্য বনদেশের মধ্য দিয়া, অলসভাবে বহিয়া আসিয়া একটি নির্ঝরিণী ভীমবেগে আশ্রমের সন্নিধানে নিম্নে পতিত হইতেছে। তাহারই এই ঘোর গম্ভীর ধ্বনি! উচ্চ নাগেশ্বর পাদপপুঞ্জ দীর্ঘ শীর্ষ উচ্ছ্রিত করিয়া নির্ঝরিণীর উপর ঘন পল্লবরাশির চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া দিয়াছে; শৈবালরাশি নির্ঝরিণীর গতির জন্য কঠিন প্রস্তরগাত্রে কোমল শয্যা বিছাইয়া রাখিয়াছে; আর তীরস্থিত তরুরাজি হৃদয়ের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া, আপনাদের বিচ্ছিন্ন মূলগুলি দ্বারা কঠিন প্রস্তরখণ্ডকে সযত্নে আঁকড়িয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপে বন্য পুষ্পের মালা পরিয়া মুক্ত পর্ব্বত ও নির্জ্জন অরণ্যের মধ্য দিয়া ধীরভাবে আপনার আনন্দে নির্ঝরিণী বহিয়া যাইতেছে। যেন পাপ-তাপে অনুতপ্ত মানবের সমাগম পরিহার করিবার জন্যই বিরলে বনের ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছে; আর ধীর-মন্থরগামিনী সহসা অবিরাম অজস্রধারায় নিম্নে নিপতিত হইয়া যেন মর্ত্ত্যভূমে বিশ্ব-নিয়ন্তার অপার করুণা-বর্ষণের পরিচয় দিতেছে! কি অপরূপ নয়নাভিরাম স্থান!—চতুর্দ্দিকে উচ্চ শৈলশ্রেণী —তাহার নীরস অঙ্গে সরস তরুরাজি—নিথর নিস্তব্ধতা, নীরব ভীষণতা!— কেবল মধ্যে মধ্যে বনচারী বিহঙ্গের কাকলী, আর জলপ্রপাতের অবিরাম ঝম্‌ঝম্‌ রব সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে;—আর এই গম্ভীর, শান্ত, কমনীয়, রমণীয়, শান্তিপূর্ণ দেবদেশে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রম! আশ্রমের উপযোগী স্থান বটে! যেন শান্ত পবিত্রতা ও ঐশী মহিমার তীর্থভূমি!

এখানে একটি শিবের মন্দির আছে। মন্দিরটির জীর্ণসংস্কার হইতেছে। মন্দিরের মধ্যে পূর্ব্বকথিতরূপ গহ্বরের মধ্যে নানাপুষ্পাবৃত একখানি শিলাখণ্ডই লিঙ্গ বলিয়া পূজিত। এখানে দুই ঘর ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোনও লোকের বসতি নাই। গিরিসানুদেশে এই নির্জ্জন বনভূমি কোন অমরার ছবি হৃদয়ে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান! এখানে পাপ তাপ ও ক্ষুদ্র স্বার্থ-চিন্তা হৃদয় হইতে চলিয়া যায়, কেবল এক উদার আনন্দের সন্ধানে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে! *

শ্রীযোগেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

* চুঁচুড়া [illegible] সমিতির [illegible] অধিবেশনে পঠিত।

সহযোগী সাহিত্য।

মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য।

'আউটলুক' মার্কিন দেশের সাপ্তাহিকপত্র। ইহার একটি মাসিক সংস্করণও প্রকাশিত হইয়া থাকে। গত অক্টোবর সংখ্যায় একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে 'আদর্শ নগরীর আদর্শ মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে আলোচনা আছে। লেখক নিউইয়র্কের চিকিৎসাগারের একটি দৃশ্য লইয়া প্রবন্ধটি আরম্ভ করিয়াছেন। দুগ্ধপোষ্য শিশু ক্রোড়ে লইয়া সহস্র সহস্র প্রসূতি এইরূপ চিকিৎসাগারের নিত্য অতিথি হইয়া থাকেন। লেখক বলেন, নগরে বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাবই এই অবস্থার কারণ।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন,—'সহরের মধ্যে এইরূপে যে শত সহস্র শিশু অনর্থক অকালমৃত্যুর কবলগ্রস্ত হয়, এ দৃশ্য অবিচলিতচিত্তে আর দেখা যায় না। শিশু-জীবনের এরূপ অবসান একটি সহরের পক্ষে অত্যন্ত কলঙ্কের কথা। * * * কেন না, সহরের অবস্থা গতিকেই শিশু ভাল দুগ্ধ পায় না। শিশুর জন্য শুদ্ধ পবিত্র দুগ্ধের সংস্থান সেই জন্য মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য। অতএব, প্রত্যেক আদর্শ সহরে ভাল দুগ্ধ যোগান দিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত।'

আরও অনেক আনুষঙ্গিক কথার আলোচনা করিয়া প্রবন্ধকার বলিতেছেন,—'প্রত্যেক সহরে লোকসংখ্যার আতিশয্য হেতু সেই সহরের মিউনিসিপালিটীর অনেক কর্ত্তব্য পালন করা উচিত। সেই সকল কর্ত্তব্য ব্যবসায়বুদ্ধির নৃশংসতায়, বা সমাজের দয়ার অনৈশ্চিত্যে ভাসাইয়া দেওয়া উচিত নয়। সহরের লোকের একত্রাবস্থানের দুইটি কারণ বিদ্যমান;—১ম, যাতায়াতের অসুবিধা; ২য়, কর্ম্মস্থলের কেন্দ্রীকরণ। এই জন্য যাতায়াতের যাহাতে সকল সৌকর্য্য সাধিত হয়, মিউনিসিপালিটীর তাহা করা উচিত. এবং ব্যবসায়স্থল বা কর্ম্মস্থল যাহাতে ছড়াইয়া পড়ে, তাহারও ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

'আদর্শ নগরীর পক্ষে মানুষের দয়ার উপর বা লোকহিতানুষ্ঠানপ্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকা অত্যন্ত অবিধেয়। রোগীর হাঁসপাতালের সঙ্গে সঙ্গে খঞ্জ ও বধিরের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা উচিত। স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের আহার ও ভ্রমণের যাহাতে সুবিধা হয়, তাহাও দেখা উচিত, এবং সহরের সর্ব্বপ্রকার আহার্য্যের তত্ত্বাবধান করা উচিত।

'খেলা ধূলা কেবল যে আমোদের জন্য, তাহা নহে। ইহা অত্যাবশ্যক। সেই জন্য খেলিবার মাঠ ও বেড়াইবার পার্কও যথাযোগ্য প্রস্তুত রাখা উচিত। কেবল লাইব্রেরী করিয়া কর্ত্তব্য শেষ হয় না। নাটক, সঙ্গীত, শিল্প-চিত্রাগার, পশুশালা, সমস্ত সৌষ্ঠবশালী করিয়া রাখা উচিত। বয়োবৃদ্ধের শিক্ষার ও আমোদের জন্য যথাযোগ্য সমিতি ও সভা সংস্থাপনের সহায়তা করা উচিত।

'আদর্শ নগরীর পুলিসের কর্ত্তব্য অপরাধী গ্রেপ্তার করিয়াই শেষ হয় না, ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। রাজপথের জনসমাগমের নিয়ন্ত্রণ, দুর্ব্বল ও রোগীর পরিচর্য্যা, বিদেশীকে পথ-প্রদর্শন পুলিসের অবশ্য-করণীয়।' প্রবন্ধকার বলিয়াছেন,—'It cannot have an oligarchical or inefficient government'। আদর্শ নগরীর সাম্প্রদায়িক শাসন বা অকর্ম্মণ্য পরিচালন শোভা পায় না। লেখক শেষে বলিয়াছেন,—আদর্শ নগরীর স্বায়ত্তশাসন থাকা উচিত।

মার্কিন দেশের ইহাই আদর্শ নগরী। রচেষ্টার, নিউইয়র্ক প্রভৃতি সহর আদর্শে উপনীত হইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছে। নিউইয়র্কে শিশুর মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইতেছে।

স্কুলপাঠ্য পুস্তকে কলিকাতা 'প্রাসাদপুরী' বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। কলিকাতা নিউইয়র্ক বা ওয়াশিংটনের সমকক্ষ না হউক, পৃথিবীর মধ্যে নিতান্ত তুচ্ছ নগরীও নহে। ইহার কিঞ্চিদধিক ৭ লক্ষ অধিবাসী বাৎসরিক ৭০ লক্ষ টাকার অধিক টেক্স যোগাইতেছে। এখানকার শিশুদিগের মৃত্যুর সংখ্যা কাহারও অগোচর নাই। বসন্ত, ওলাউঠা, প্লেগ, বেরিবেরির নাম করিলেই যথেষ্ট হইবে। এখানে অন্ধ বা বধিরের জন্য কয়টি স্কুল আছে? গয়লার দুধে কয় জন বিরক্ত নয়? পার্কের অব্যবস্থায় কয় জন ভোগে না? এখানে সন্ধ্যার সময় ধূলায় ও ধোঁয়ায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়; উষাকালে ড্রেণের গন্ধে ও ময়লার ছড়াছড়িতে প্রাণান্ত ঘটে। এখানে পুলিস পথ দেখাইবার বদলে রুল দেখাইয়া থাকে। আমরা মার্কিন দেশের বিপরীত দিকে থাকি; তাই বোধ হয় অবস্থাও এত বিপরীত। তুলনায় সমালোচনা করিলে মনে হয়, কোথায় অযোধ্যার রঘু, আর কোথায় বাঁশবনের ঘুঘু!

বরোদা রাজ্যে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন।

গত ডিসেম্বর মাসের 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্রের লেখনীপ্রসূত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। বলিতে পারি না, ইহাই দত্তজ মহাশয়ের শেষ রচনা কি না। কিন্তু প্রকাশিত রচনাবলীর শেষপ্রকাশিত রচনা বটে। প্রবন্ধের বিষয়,—'বরোদা রাজ্যে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসন'। এই প্রবন্ধের বিষয় বরোদা-রাজ্য-সম্পর্কিত হইলেও, ইহা সমুদয় ভারতের শাসনপ্রণালীর সমালোচনা বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারে। সেই জন্য এই প্রবন্ধের সারসঙ্কলন করিলাম।

'স্বায়ত্তশাসন প্রাচ্য দেশের স্বভাবজ বনলতা। কিন্তু পুরাকাল হইতেই ইহার অবয়ব প্রতীচ্য ভূখণ্ডের স্বায়ত্তশাসনের অবয়ব হইতে বিভিন্ন।

গ্রীক ও রোমক জাতিদিগের মধ্যে নগর বা মহানগরই লৌকিক ক্ষমতা বা লৌকিক অনুষ্ঠানের লীলাভূমি ছিল। আবার রোমক সাম্রাজ্যের পরিধির বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে স্বায়ত্তশাসনও রোম হইতে সাম্রাজ্যময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মধ্যযুগে মহানগরীর অধিবাসিবৃন্দই স্বেচ্ছাচারী ব্যারণদিগকে (ভূস্বামী) দমন করিয়া রাখিত। কিন্তু তখন গ্রামবাসীরা ক্রীতদাসের অবস্থাপন্ন ছিল। আধুনিক কালের ভূস্বামীদিগের ক্ষমতা রাজার হস্তগত হইবার পরবর্ত্তী যুগে, ব্যবসায় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল বা শ্রমশিল্পের উন্নতিস্থলের অধিবাসিবৃন্দই রাজক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করিবার ও নিয়মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস করিয়া আসিয়াছেন।

কিন্তু ভারতবর্ষে ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য তেমন বড় সহরের সৃষ্টি হয় নাই। অপর পক্ষে সাধারণ অধিবাসিগণের কৃষিই প্রধান উপজীবা থাকাতে, স্বায়ত্তশাসন গ্রামে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাধারণ প্রজা রাজাকে সাম্রাজ্য-শাসনে অসীম ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করে নাই, এবং রাজাও সাধারণকে গ্রাম্য-শাসন-যন্ত্র-পরিচালনের ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করেন নাই। কোনও এক কেন্দ্রীভূত শাসনপ্রণালী গঠিত হইয়া উঠে নাই বটে, কিন্তু প্রত্যেক গ্রাম প্রজাতন্ত্রের আধার ছিল, এবং আপনাকে আপনই পরিচালিত করিত।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ইতিহাসে এই কথার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। ইউরোপের পাশ্চাত্য জাতিরা ভারতবাসী অপেক্ষা জাতীয় একতা ও জাতীয় জীবনের অধিকতর রসাস্বাদন করিয়াছে; কিন্তু ভারতের কৃষকসম্প্রদায় অবধি ইউরোপের গ্রামবাসী অপেক্ষা সামাজিক অধিকারে অধিকতররূপে অধিকারী হইয়া, গ্রামাজীবনে অধিকতর কর্তৃত্ব লাভ করিয়া আসিয়াছে। ফ্রান্সে ও প্রুসিয়ায় কৃষকসম্প্রদায়ের শত বৎসরের পূর্ব্বতন অবস্থা ক্রীতদাসের অবস্থা অপেক্ষা ভাল ছিল না।

ভারতে ইংরাজ-রাজত্ব-স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের শাসনপ্রণালী ভারতের শাসন-প্রণালীর স্থান অধিকার করিল। শাসনক্ষমতা সমস্ত কেন্দ্রাভিমুখী হইল, এবং গ্রাম্যশাসন-প্রণালী নষ্ট হইতে লাগিল। গ্রাম আর নিজের পুলিস যোগাইল না, পঞ্চায়েত আর রাজস্ব আদায় করিল না, গ্রামের মাতব্বরেরা আর দেওয়ানী বা ফৌজদারী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিল না; গ্রামের পথ ঘাটে আর গ্রামবাসীর স্বার্থ রহিল না। গ্রামের পাঠশালা অযত্নে বিনষ্ট হইতে লাগিল; গ্রামবাসীর দয়ার স্রোত শুষ্ক হইতে লাগিল; এবং সমস্ত গ্রামবাসীর সহানুভূতি ও সমবেদনা নষ্ট হইতে লাগিল। পক্ষান্তরে, অপর পক্ষে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইল; একমাত্র সরকারই শান্তিরক্ষার ভার লইলেন, রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন, মামলা মোকর্দ্দমার বিচার করিতে লাগিলেন, শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন, এবং পথ ঘাট প্রস্তুত করিয়া দিলেন। লোকেও দেখিল, সমস্ত সমাজের কার্য্যকারিণী-শক্তি যখন একই কেন্দ্রে সন্নিবিষ্ট, তখন সেই কেন্দ্রে যাহাতে লৌকিক ক্ষমতা বর্দ্ধিত হয়, তাহারাও তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিন্তু ভাবা উচিত যে, ভারতবাসীর ইতিহাস বা প্রকৃতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে গেলে গ্রাম্যশাসনপ্রণালী একেবারে উঠাইয়া দেওয়া উচিত নহে। এখনও বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রামের সঙ্ঘ বজায় রাখিবার উপায় আছে, এবং ভারতের শাসনকর্ত্তৃগণ অনেকেই স্বীকার করেন যে, গ্রাম্য সঙ্ঘ বা সমাজ যদি সঞ্জীবিত ও শক্তিশালী হইয়া উঠে, তাহা বাঞ্ছনীয়।

সাধারণতঃ এইরূপ প্রস্তাব হয় যে, কয়েকটি বাছা বাছা গ্রামে রাজকর্ম্মচারিগণের তত্ত্বাবধানে আবার গ্রাম্যশাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া দেখা উচিত। কিন্তু এই প্রস্তাবের মূলে ভ্রম আছে। পরখ করিবার জন্য বাছা বাছা গ্রামে শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলে কোনও সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারা যাইবে না। এই পরীক্ষা যদি সফল হয়, তাহাদের সাফল্যে অন্য গ্রামের অবস্থা উপযোগিতা নির্ণীত হইতে পারিবে না। আর যদি এই চেষ্টা বিফল হয়, তাহা হইলে, সেই বিফলতায় সাধারণ অনুপযোগিতা ও প্রমাণিত হইবে না। মন্দের আরও সম্ভাবনা আছে। ঐ যে তত্ত্বাবধান, তাহাই সাফল্যের অন্তরায় হইয়া সমস্ত শ্রম বিফলতায় পরিণত

করিবে। আমরা কেয়ারী করিয়া ফুলভোগ করিতে চাই না; যুগযুগান্তর হইতে যে মাটীতে ইহা ফলিয়া আসিতেছে, আমরা তাহাতে বীজ ছড়াইয়া দিতে ও তাহার ফল দেখিতে চাই।

আর যদি বাছাই করিয়া লইতেই হয়, তবে একটী মহকুমায় একটি থানা বা তালুকের অন্তর্গত সমস্ত গ্রাম লইয়া কার্য্যারম্ভ করা উচিত, এবং সেই সমস্ত গ্রামে পঞ্চায়েতের সৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। এই সকল পঞ্চায়েত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ক্ষমতা লাভ করুক। কতক নির্দ্দিষ্ট আয় ব্যয়ের অধিকারী হউক, এবং তহশীলদারকে সাধারণ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে দেওয়া হউক। আমাদের তহশীলদারেরা (এ দিকে ডেপুটী বাবু) সময় সময় এক একটি ক্ষুদ্র নবাব। আমরা তাঁহাদিগকে কেবল সমালোচনা করিতে, দোষ বাহির করিতে শিখাইয়াছি; একটা কিছু গড়িয়া পিটিয়া খাড়া করিতে শিখাই নাই। সোজাসুজি ভাবে তাহাদের বলিতে হইবে যে, দোষ বাহির করা তাহাদের কাজ নহে; দোষের সংস্কারই তাহাদের কর্ত্তব্য; পঞ্চায়েতের অকৃতকারিতা প্রমাণ করা কাজ নহে, তাহাদের সফল করিয়া তোলাই কাজ। এইরূপ করিতে গেলেই গ্রাম্য দলাদলি অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে; কতক কেলেঙ্কারী ঘটিবেই ঘটিবে, কতক চেষ্টা নিষ্ফলা হইবেই। কিন্তু যদি সমস্ত থানায় বা তালুকে সকল পঞ্চায়েত অকৃতকার্য্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, সেই তহশীলদারই অকর্ম্মণ্য। তাহাকে তাড়াও, তাহার স্থলাভিষিক্তের হস্তে সফলকাম হইবে।'০

আমি এই সকল পঞ্চায়েতকে কতক দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার করিবার ক্ষমতা দিতে চাই। পাঁচ দশ টাকা জরিমানার ক্ষমতা দেওয়া চাই। এই সকল গ্রাম্য আদালতে উকীল থাকা উচিত নহে। পক্ষগণ আপন আপন সাক্ষী লইয়া আসিবে; এবং শমনজারী বা পরওয়ানা জারীর অপেক্ষা থাকিবে না। একখানি রেজেষ্ট্রী বহি ছাড়া অপর কোনওরূপ নথি বা কাগজাতের ফিরিস্তি বাড়ান উচিত নহে। আপীল থাকা উচিত নহে। তবে কেবল কোনও কোনও মামলায়, অত্যন্ত অবিচার ঘটলে, মহকুমার কর্ত্তার ইচ্ছানুযায়ী পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবে।

নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষার ভার এই সকল পঞ্চায়েত গ্রহণ করিতে পারেন। এই শিক্ষা দিবার জন্য কৃষকশ্রেণীর যাহাতে সুবিধা হয়, সেইরূপ নিয়মাবলী প্রণয়ন করা উচিত। ফসল কাটিবার সময় বা বীজরোপণের সময় ছুটী দেওয়া উচিত। হয় ত শিক্ষা-বিভাগ এইরূপ সামান্য শিক্ষা-পদ্ধতির সারল্যে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিবে। কিন্তু যদি পঞ্চায়েত দ্বারা নিম্নপ্রাথমিক শিক্ষা সম্ভব হয়, তবে এইরূপ পাঠশালায় যাহাতে শিক্ষা-বিভাগের উপর প্রভুত্ব চলিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।

স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দ যে সেস্ দেন, তাহার সমস্ত না হউক, কতক অংশ এই সকল পঞ্চায়েতের হস্তে ন্যস্ত করা আবশ্যক। হয় ত টাকাটা অতি অল্প হইবে; হয় ত গ্রাম পিছু বৎসরে এক শত টাকা পড়িবে; কিন্তু বোধ হয়, এই টাকাতেই গ্রামের পথ ঘাট নালা পুষ্করিণী বজায় রাখা চলিবে। এতদ্ব্যতীত ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে সাময়িক দান আবশ্যক। গ্রামের পূর্ত্তকার্য্যের ভার পঞ্চায়েতেই লওয়া উচিত। কণ্ট্রাক্টর ডাকিবার আবশ্যক নাই, প্ল্যান আঁকিবার, হিসাব খতাইবার, হিসাব মিলাইবার, বা সরকারী পূর্ত্তবিভাগের তদ্বিরাদি করিবার কোনও আবশ্যক নাই। পঞ্চায়েতের সকল সভ্যের সহি করা এক ফর্দ্দ হিসাব থাকিলেই যথেষ্ট, এবং সরকারী কালেক্টর গ্রাম দেখিতে যাইয়া সেই ফর্দ্দ দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, টাকাটার সদ্ব্যয় হইয়াছে কি না।'

রমেশ বাবু দেখাইয়াছেন যে, বরোদা রাজ্যে ঠিক ঐরূপ আদর্শে গ্রাম্য স্বায়ত্তশাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তিনি বলেন, এইরূপে প্রাচীন ডালে নূতন শাসনপ্রণালীর কলম লাগাইয়াছে। গত চারি বৎসর এইরূপ পরীক্ষা করিয়া তিনি অনেক সুফল লাভ করিয়াছেন, এবং তাঁহার বিশ্বাস যে, এই পদ্ধতিতে বরোদার গ্রাম্য জীবন নবশক্তিসম্পন্ন ও স্বাস্থ্য সুখের অধিকারী হইয়া উঠিবে।

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, সমগ্র দেশের পক্ষে ও শাসনকার্য্যে এইরূপ পদ্ধতির প্রবর্ত্তনে অনেক লাভ হয়। সমাজ এইরূপে স্বাবলম্বী হয়, পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচিয়া যায়। শাসক-সম্প্রদায়ের সহিত সাধারণের ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া উঠে, —পুলিস বা কলেক্টারের হাতে সকল কার্য্যের ভার দিতে হয় না, বা তাঁহাদের মারফত সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হয় না। আর যদি সুনিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধির নির্ব্বাচন দ্বারা এইরূপ গ্রাম্য পঞ্চায়েত গঠিত হইতে থাকে, তবে ক্ষুদ্র নবাবদিগের অত্যাচার হইতে গ্রামবাসী রক্ষা পায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধ বিসংবাদে আদালতে দৌড়িতে হয় না। গ্রামের মাতব্বরের নিষ্পত্তি বা আপোষ নিষ্পত্তি ব্যতীত অপরের নিষ্পত্তির অপেক্ষা রাখিতে হয় না। এক কথায়, ক্ষুদ্র গ্রামটিতে সাধারণের বেদনাবোধে সাধারণের মঙ্গলবোধে যে সমাজতন্ত্র গঠিত হইয়া উঠে, যে আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্বের ভিত্তি গঠিত হইয়া উঠে। গ্রামবাসী তখন আর সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে না, বা মহাজনের নিকট মাথা বিকাইয়া নষ্ট হয় না।

রমেশচন্দ্র এই সারবান প্রবন্ধের উপসংহারে যে কয়টি কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার জীবনব্যাপিনী অভিজ্ঞতার ও শাসনকার্য্যে দূরদর্শিতার ফলে তাঁহার লেখনী হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। আমরা তাঁহার কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

To associate the people in the work of administration in all stages, from the village to the province makes them feel that *the government is their own*, and secures their help both in the affecting progres and in repressing crime. And to place them face to face with responsible work, is the best method of silencing reckless criticism and enlisting active co-operation.

অর্থাৎ, গ্রাম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাদেশিক শাসন-যন্ত্রের সকল ব্যাপারে সাধারণের সাহচর্য্য লও; দেখিবে, জনসাধারণ শাসন-যন্ত্র তাহাদের নিজস্ব বলিয়া বোধ করিবে; তাহাদের সাহায্যে উন্নতিও লক্ষ্য হইবে; সমাজদ্রোহিতাও কমিয়া যাইবে। সমাজের সাধারণকে দায়িত্ববোধ করিতে দাও; দেখিবে, উদ্দেশ্যহীন সমালোচনা তিরোহিত হইবে; সাহচর্য্যের আগ্রহে সমস্তই সুশৃঙ্খল হইয়া উঠিবে।

শেষের সে দিন।

লালিকা। *

মনে কর, শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ছাঁদ!
তুমি রইবে চুপটি করে', অন্যে কর্‌বে সিংহনাদ!
অন্যে মেঠাই-মণ্ডা খাবে,
তুমি খেতে নাহি পাবে;
শমন এসে বলবে হেসে', —"এখন কোথা যা'বে চাঁদ?
ঘুঘু দেখেছ তো শুধু, এখন তবে দেখো ফাঁদ!"

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

বাবা।

ইংরাজের সম্পর্ক স্বামী স্ত্রী লইয়া, আর বাঙ্গালীর সম্পর্ক বাপ মা লইয়া। মিষ্টার ও মিসেস মাত্রে ইংরাজের পরিবার পর্য্যবসিত। কিন্তু বাঙ্গালীর পরিবার এত অল্প পরিসরে বদ্ধ নয়, বিশাল বটবৃক্ষের ন্যায় নানা সম্পর্কের জটায় জটিল। হিন্দু পরিবার নানা জটিলতায় জড়িত থাকিয়া একান্নভুক্ত সকলকে পুণ্য-ছায়া দান করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিতে চায়; কিন্তু ইংরাজ-পরিবার ক্ষুদ্র ফুলগাছের মত কিছু কাল সৌরভ বিতরণ করিয়া পরে ঝরিয়া পড়ে। বঙ্গীয় পরিবারের শিকড় কত ঊর্দ্ধতন পুরুষে গিয়া পঁহুছে, এবং তাহার শাখা প্রশাখা কত শত অধস্তন পুরুষে গিয়া এক মহা বিশালতা প্রাপ্ত হয়। তাই এই বিশাল পরিবারের কারণে বাঙ্গলায় কুল লইয়া সমাজ বা দল। কিন্তু সমাজ বা দল হইতে কুলের উৎপত্তি হয় নাই। জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর তত্ত্ব পাঠানকে সেই জন্য আমরা 'সামাজিক' বলি। ভাবিয়া দেখুন, প্রধানতঃ পঞ্চ ব্রাহ্মণ পঞ্চ কায়স্থ হইতে আজ লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণ, লক্ষ লক্ষ কায়স্থের সৃষ্টি হইয়া এক বাঙ্গালী জাতি হইয়া পড়িল। আমাদের সংসারে কুলের বন্ধন, আর বিলাতী সংসারে 'কুলাপ' (club) বা দলের বন্ধন। ইংরাজের সংসারে ভালবাসার পুষ্পসৌরভ আছে, কিন্তু ভক্তি শ্রদ্ধা প্রভৃতি

---

* প্রসিদ্ধ লেখক ও কবি শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মতে Parodyর অনুবাদে 'লালিকা'ই সঙ্গত শব্দ।

মহত্ত্বের নিবিড় ছায়া নাই। আমাদের সংসার বিরাট বনস্পতির ন্যায় অনেকের আশ্রয়দাতা। কত আত্মীয়, কত কুটুম্ব, কত সম্পর্কীয়, কত আশ্রিত ইহার সুশীতল ছায়ায় পথিকের ন্যায় নিত্য আশ্রয় লাভ করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাপ মা লইয়াই বাঙ্গালীর সম্পর্ক। বস্তুতঃ হিন্দুসংসারে পিতাই সর্ব্বেসর্ব্বা বা সর্ব্বপ্রধান। এখানে পিতারই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব। পিতার আসন এখানে সকলের উচ্চে। 'খাৎ পিতা উচ্চতরস্তস্থ'। এখানে রাম-চন্দ্র পিতৃসত্যপালনের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এখানকার সমস্ত সম্পর্ক সেই সমুচ্চ পিতৃস্থান হইতে প্রবাহিত। পিতারই উপর সমস্ত সংসারের ভার ন্যস্ত বলিয়াই পিতা 'কর্ত্তা' নামে এখানে অভিহিত হয়েন। হিন্দু-পরিবারে যখন পিতা শত শত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া এক দেবরাজের ন্যায় শোভা প্রাপ্ত হন, তখন সে শোভার তুলনা হয় না।

বস্তুতই সংসারে সকল সম্পর্কের কেন্দ্র পিতা। পিতা হইতে উর্দ্ধে যাও, পিতামহ, প্রপিতামহ, বৃদ্ধপ্রপিতামহ, পিতৃপুরুষ প্রভৃতি সকলের মধ্যেই পিতৃত্ব বিরাজমান। তাই কেহই পিতৃশব্দ-বিরহিত নহেন। * আবার পিতা হইতে নিম্নস্তরে আইস, দেখিবে, ছোট ছোট ছেলেদের পর্য্যন্ত 'বাবা' বলে, জামাতাকে সম্বোধন করিবে 'বাবা' বলিয়া। সংসারে কোথায় বা পিতৃনাম ধ্বনিত নয়?

বাঙ্গলায় সাধু ভাষায় আমরা 'পিতা' বলি, কিন্তু সচরাচর 'বাবা' নামেই আমরা পিতাকে ডাকিয়া থাকি। 'বাবা' কখনও কখনও 'বাপা'ও লিখিত হয়; বাবা ও বাপা একই কথা। যেমন ভারতচন্দ্রে আছে,—'শুন বাপা মহাশয়!' 'বাবা'ই পিতৃনামকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়াছে। বাবা নাম যে কত ভাবে কত রূপে বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই। 'বাবা' শব্দ ভয়ে ভক্তিতে, 'বাবা' পূজা অর্চ্চনায়, 'বাবা' আদরে স্নেহে, 'বাবা' শোকে দুঃখে, যন্ত্রণায় কষ্টে, হাস্য পরিহাসে; কোথায় না 'বাবা' প্রযুক্ত হয়? আমরা ভয় পাইলে 'বাবা গো' বলিয়া উঠি, শোকে দুঃখে যন্ত্রণায় বাবা গো বলিয়া কাঁদি, আবার সখার সহিত হাস্যপরিহাসকালে 'হ্যাঁ বাবা' ইত্যাদি বাক্যে রসোপভোগ করি। মহাত্মা সাধুকে বাবা বলিয়া ডাকি, পূজ্য ব্যক্তিকে

* ইংরাজীতে তাহাই father, grandfather, great grandfather, forefathers ইত্যাদি।

বাবা বলি. যেমন 'বাবাঠাকুর'। দেবতাকে 'বাবা' বলি, যেমন 'বাবা বৈদ্য-নাথ'। আবার স্নেহের পাত্র শিশুকেও বাবা বলিয়া আদর করি।

কিন্তু 'বাবা' ও 'পিতা' কি একই শব্দ? বাবা কি পিতা হইতে আসিয়াছে? 'বাবা' পিতা অপেক্ষা অনেক ব্যাপক ভাবে প্রযুক্ত হয়। জন্মদাতা ও পালনকর্ত্তা, এই দুই জনের প্রতিই পিতৃশব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে। কিন্তু পিতাকে, পুত্রকে, শ্বশুরকে, জামাতাকে, বৃদ্ধ ও শিশুকে অকাতরে বাবা বলা যায়। আমরা পিতাকে পিতা ও বাবা দুই বলিতে পারি. কিন্তু ছেলেকে কি পিতা বলা যায়? তবে 'বাবা' বলিতে কোনও বাধা নাই। বস্তুতঃ বাবা ও পিতা উভয়ে পৃথক শব্দ, সেই জন্য উহাদের প্রয়োগেও পার্থক্য। উহাদের মূল এক নহে। উহারা দুই স্বতন্ত্র শব্দ, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমের ন্যায় কেবল পিতৃতীর্থে মিলিত হইয়া বিস্তার ও মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে। যেমন এক দিকে 'পিতা'র সখা শব্দ Father, Pater প্রভৃতি শব্দ আর্য্যভাষাসমূহে দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ 'বাবা'রও সখা শব্দ Babe, papa, ফাফা, pope, প্রভৃতি নানা শব্দ অন্যান্য আর্য্য ভাষায় দেখা যায়। 'বাবা', 'পাপা' প্রভৃতি শব্দগুলি শিশুদিগের মুখে সহজেই উচ্চারিত হয় বলিয়া গৃহের অন্দরে উহাদিগের আদর বেশী। ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে 'পিতা' হইতে 'বাবা' আসা সুকঠিন। যদি পিতৃশব্দকে 'বাবা', 'ফাফা' ও পাপা প্রভৃতির মূল বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ইংরাজী 'পাপা'কে সংস্কৃত 'পিতা'র জ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং 'বাবা'কে 'পাপা'রই অনুজ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ, পিতৃশব্দের পা ধাতুর সহিত 'বাবা' অপেক্ষা 'পাপা'রই বেশী সাদৃশ্য। কিন্তু 'পাপা' হইতে 'বাবা' আসা অসম্ভব। ইংরাজ-আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে বাবা ও 'বাবা'র সংক্ষিপ্ত 'বাপ' শব্দ ভারতে প্রচলিত। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে গুরু নানক তাঁহার শবদে বলিয়া গিয়াছেন—

> "বিন্ গুর্ পূরে নাহ্ উধার।
> বাবা নানক আখোয়া এই বিচার॥"

পূর্ণ গুরু ভিন্ন কাহারও উদ্ধার নাই, বাবা নানক বিচার পূর্ব্বক ইহা বলিতেছেন।

গুরু নানকের প্রায় সমসাময়িক দাক্ষিণাত্যের ভক্ত কবি নামদেবও গাহিয়াছেন,—

"তারূলে রামা তারূলে
বাথ বিঠলা বাহ দে।"

উদ্ধার কর আমায় উদ্ধার কর হে পিতা বিঠলদেব,
আমাকে হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক তুলিয়া লও।

প্রকৃতপক্ষে 'বাবা' শব্দ বহু প্রাচীন। উহা সংস্কৃত শিবের নাম 'ভব' শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। ভব শব্দের মূল ধাতু উৎপত্তিবাচক ভূ ধাতু। সংসারের মূলে যেমন পিতা, তেমনই জগৎসংসারের মূলে পিতৃস্থানীয় শিব। তাই মঙ্গলকারী শিবের অন্যতম নাম উৎপত্তিবাচক 'ভব'। শিব যে জগতের পিতৃস্থানীয়, তাহা কবি কালিদাস রঘুবংশের প্রথম শ্লোকেই ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন,—

"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ।"

'ভব' শিবের একটি প্রচলিত নাম। তাই বঙ্গের কবি ভারতচন্দ্র অন্নপূর্ণা-মাহাত্ম্যে গাহিয়াছেন,—

"জয় জগদীশ্বর জয় জগদম্বে
ভব ভবরাণী ভব অবলম্বে।"

রামায়ণেও আছে, "ভবাঙ্গপতিতং তোয়ম্"।* এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক স্থলে শিব অর্থে 'ভব' শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। সংসারের পিতৃস্থানীয় শিবেরও নাম যেমন ভব, তেমনই পুত্রস্থানীয় ভবসংসারেরও নাম ভব। এই 'ভব' শব্দ অপভ্রষ্টাকারে 'বাবা' হইয়াছে। তাই পিতাও বাবা; আবার পুত্রের নাম বাবা। 'ভব'র 'ভ' 'ব' হইয়া লোকমুখে বাবা দাঁড়াইয়াছে। সংস্কৃত শব্দের 'ভ' সহজেই প্রাকৃত ভাষায় 'ব' হইয়া থাকে। তাহার নিদর্শন, 'ভগ্নী'র ভ 'ব' হইয়া হিন্দীতে 'বহিন' হইয়াছে। 'ভাল'কে পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা 'বাল' বলিবে। সংস্কৃত ভব শব্দ প্রথমে ভারতীয় প্রাকৃত ভাষাসমূহে 'বাবা', এবং ক্রমে হয় ত দেশ দেশান্তরে ভাষায় চুঁয়াইয়া চুঁয়াইয়া 'ফাফা' 'পাপা' ইত্যাদি নানা আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। একটি শব্দ রূপান্তরিত হইবার কালে শব্দমধ্যস্থ প ফ ব ভ এই অক্ষরগুলি পরস্পর পরস্পরের স্থান অধিকার করে। যেমন 'বলবান' শব্দের 'ব' 'প' হইয়া 'পালবান' হইয়াছে। এইরূপে 'বাবা' যে ক্রমে 'পাপা' হইতে পারে, তাহা আশ্চর্য্য কি? এক্ষণে পাঠকের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, শিবের

* রামায়ণ; বালকাণ্ড; ২৭ শ্লোক।

অন্য নাম ছাড়িয়া সংসারে ভব নামের এত আদর হইল কেন? তাহার কারণ এই যে, 'ভব' নামটি গৃহে বা সংসারে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। সংস্কৃতে 'ভব' শব্দের এক অর্থ সংসার ও আর এক অর্থ উৎপত্তি; তাই উহা পিতার যোগ্য আসনে বসিবার অধিকার পাইয়াছে। সংসারের উৎপত্তির মূলে পিতা। তাই উৎপত্তি ও সংসারবাচক শিবের 'ভব' নামটি ক্রমে প্রধানভাবে পিতৃবাচক হইয়া উঠিয়াছে।

হিন্দুর মতে, পুরুষমাত্রই শিবের রূপ ও স্ত্রীমাত্রই পার্ব্বতী বা শক্তিরূপা। তাই শুদ্ধ পিতা কেন, পুরুষমাত্রই সাধারণতঃ শিবের বাবা নামের অধিকারী। হিন্দু-পুরাণে শিব আদর্শ গৃহী, আবার আদর্শ সন্ন্যাসী; তাই গৃহের পিতাও বাবা, আবার গৃহহীন সন্ন্যাসীও বাবা। শিব একাধারে সুন্দর ও জঘন্য, রুদ্রও করুণ, জ্ঞানী ও পাগল। শিবের মত সর্ব্বরসের আধার আদর্শ পুরুষ আর কে আছেন? তাই শিবনাম 'ভব' হইতে প্রসূত 'বাবা' শব্দ এত বিশ্বব্যাপকভাবে নানা অর্থে নানা রসে ব্যবহৃত হয়।

এই 'বাবা' অপেক্ষাকৃত কোমলাকার ধারণ করিয়া কোমলাঙ্গী যুবতী-দিগের বিবি নাম হইয়াছে। যেমন 'দাদা' হইতে 'দিদি' হইয়াছে। বঙ্গ-ভাষায় সুন্দরীদিগের উদ্দেশেই 'বিবি' ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পশ্চিম প্রদেশে কন্যামাত্রকেই 'বিবি' বলিয়া থাকে। এই 'বিবি' হইতে ইংরাজী wife শব্দ আসিয়াছে। এই wife সাক্ষাৎসম্বন্ধে জর্ম্মন ভাষার wib শব্দ হইতে আসিয়াছে। পাঠক দেখুন, 'বিবি'তে wibএ কোনও পার্থক্য আছে কি না। আমরা যেমন শিশুকে 'বাবা' বলি, ইংরাজীতেও সেইরূপ শিশুকে Babe বা Baby বলে। বাবা ও Babe একই কথা। সচরাচর সকলের ধারণা 'বাবা' পিতৃশব্দের অপভ্রংশ; এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া, আশা করি, পাঠকবর্গ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারতী।—অগ্রহায়ণ। সর্ব্বপ্রথমে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঙ্কিত 'লীলাকমল' নামক একখানি চিত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে এ সংখ্যায় চিত্র-কূটের ব্যাখ্যা নাই। মল্লিনাথ মহাশয়েরা কি শ্রান্ত হইয়াছেন? সে যাহা হউক, 'লীলাকমল' নাম দেখিয়াই অনুমান করিতে হইতেছে,—চিত্রে অঙ্কিত নীল থোকার আধারটি কমল, অন্ততঃ কোনও পুষ্প-বিশেষ। 'ভারতীয় চিত্রকলা'র মূলসূত্রই বোধ করি এই যে, এমন বস্তু আঁকিবে, বা এমন বিকৃত করিয়া আঁকিবে যে, স্বাভাবিক বস্তুর সহিত তাহার কোনও সৌসাদৃশ্য না থাকে;—লোকে চিনিতে না পারে! এই বিরাট ফুলের কিঞ্জল্কের উপর নীল থোকা নাচিতেছে। এই থোকাই বোধ করি 'যিনি কৃষ্ণ'! কিন্তু হায় 'তিনি তা' নাই; সে অভাব মল্লিনাথদিগকেই পূর্ণ করিতে হইবে। ইহাও যদি চিত্র হয়, তাহা হইলে কালীঘাটের প্রত্যেক পটুয়া র‍্যাফেল, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করিব। 'লীলাকমলে'র সার্থকতা কি, তাহাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। 'লীলাকমল' কাহাকে বলে, তাহা না জানিয়াই অশেষ-সেমুষী-সম্রাট অবনীন্দ্রনাথ এই পটখানির নামকরণ করিয়া থাকিবেন। কুমারে পড়িয়াছি—'লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী।' সে কি এই লীলাকমল? পার্ব্বতী যখন 'লীলাকমলে'র পত্রগুলি গণিতেছিলেন, ভাগ্যে তখন অবনীন্দ্রনাথের থোকা তাঁহার অঙ্গুলি-চম্পক কামড়াইয়া ধরে নাই!—দুর্ভাগ্য এই যে, এই 'লীলাকমলে'র আদর্শেই বাঙ্গালার ভাবী চিত্রকরগণ অনুপ্রাণিত হইতেছেন। পানের দোকানে ও পুরাতন পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় 'ভারতীয় চিত্রকলা'র যে আদর্শ দেখা যায়, অবনীন্দ্রনাথের 'লীলাকমল' সৌন্দর্য্যে, কল্পনায়, বা বমনোদ্দীপক বর্ণবিন্যাসে তাহা-দের অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহে। আশা করি, ভবিষ্যতে 'স্বদেশী' দেশলাইয়ের বাক্সের উপর এই অদ্ভুত, মৌলিক ও উদ্ভট পটগুলি চরম চরিতার্থতা লাভ করিবে। 'ভারতী'র চিত্রশালার আর একখানি চিত্র,—শ্রীযুত অসিতকুমার হালদারের অঙ্কিত 'মূল' চিত্র হইতে 'নকলিত'—যশোদা। মাতৃক্রোড়ে শিশু সুপ্তিসুখে মগ্ন। মাতার বক্ষোবাস অর্দ্ধোন্মুক্ত, একটি স্তন উদ্‌ঘাটিত। বোধ করি চিত্রকর এই অনাবৃত স্তনেই মাতৃত্বের আভাস সূচিত করিয়া-ছেন। মাতৃত্ব-কল্পনার নূতন পথ বটে। এই নারীমূর্ত্তি 'কামিনী' হইতে পারে, 'হরিদাসী' হইলেও কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু 'ভারতী' বা চিত্রকর ইহার নাম রাখিয়াছেন—যশোদা। যশোদার পাইজোর-পরা পদের ভঙ্গীটুকু অস্বাভাবিক। কিন্তু এই স্বভাববিরোধিতাই তথাকথিত 'ভারতীয় চিত্রকলা'র প্রাণ। শিশুর মুখে নারীর অনিমেষ দৃষ্টি চিত্রে বেশ ফুটিয়াছে। 'ভারতী'র প্রবন্ধ-পর্য্যায়ে সর্ব্বপ্রথমেই ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর রচিত 'পোংগল উৎসব'। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী সম্প্রতি লোকান্তরিত হইয়াছেন। ভগবান তাঁহার আত্মার কল্যাণ করুন। মহাভারতীর জীবন রহস্য-যবনিকায় সমাচ্ছন্ন। কালে সে যবনিকা অন্তরিত হইতে পারে। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। সাহিত্যের সেবাই ইদানীং তাঁহার জীবনের ব্রত হইয়াছিল। শ্রীযুত কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারীর '[illegible]' [illegible]

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্কলিত 'কোচিন চীন' উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত ইন্দুমাধব মল্লিক 'আমাদের দেশের আহার ও শিক্ষা সম্বন্ধে দু একটি কথা'য় বাঙ্গালী ছাত্রদিগকে আহার সম্বন্ধে যে বিধান দিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। 'বাদাম, পেস্তা, ছানা, ও ক্ষীরে' সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করা যায়, তাহা 'পাকরাজেশ্বরে'র মারফৎ ইতিপূর্ব্বেই অনেকের কর্ণগোচর হইয়াছে। কিন্তু তাহা 'সুপচ্য (?) ও 'সস্তা' হইতে পারে, তাহা এই নূতন শুনিলাম। ইন্দু বাবুর মতে, বিস্‌কুট ও মোহনভোগ লঘু আহার। কবিরাজ মহাশয়েরা যাহাকে বিরুদ্ধ আহার বলেন, ইন্দুবাবুকে যেন তাহারই পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয়। সে যাহা হউক,—আমরা অনধিকারচর্চ্চা করিব না। যাঁহারা বিশেষবিৎ, তাঁহারা ইন্দুবাবুর এই 'খানার ফর্দ্দে'র আলোচনা করুন। ইন্দুবাবু ডাক্তার, তিনি তাঁহার ছাগল ল্যাজের দিকে কাটুন,—কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা এই, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে "কে? এই পোলাও, ঘি-ভাত, খিচুড়ী, ছানা, মাখন, ক্ষীর, সর, ননী, পেস্তা, বাদাম, কিসমিস, ফল-মূল, মৎস্য, মাংস, ডিম, গজা, খাজা ও মোহনভোগের সংস্থান সাধারণ বাঙ্গালী ছাত্রের পক্ষে সম্ভব কি? ইন্দু বাবু লিখিয়াছেন,—

'মোটামুটি আমি খরচেরও একটা হিসাব দিতেছি। প্রাতে ডিম রুটী মাখন বা তদ্-পরিবর্ত্তে নিরামিষ কোনও খাবার যথা লুচী গজা সন্দেশ ইত্যাদিতে চার পয়সা :—

দুপুরবেলাকার ভোজনে—কম পরিমাণে পোলাও বা খিচুড়ি—মাছ ভাজা, ডিম ভাজা, রুটী মাংস বা আলু মাংস কিম্বা মাংসের পরিবর্ত্তে মাছ ডিম ইত্যাতে দুই আনা বা দশ পয়সা :—

বৈকালে ফল ও মিষ্ট বা রুটী ও মাখন বা চিড়া নারিকেল মুড়ির মোয়া ইত্যাদি চার পয়সা ;—

রাত্রেও দুপুরের মত খাইতে দুই আনা বা তিন আনা।'

পড়িয়া আমরা হাস্যসংবরণ করিতে পারি নাই। এত অল্প ব্যয়ে এমনতর খাদ্যের সংস্থান হয় না। তিনি 'দুপুরবেলাকার ভোজনে'র যে 'মেনু' দিয়াছেন, তাহা দুই আনা বা দশ পয়সার ব্যাপার নহে। ইন্দু বাবু যদি মাসিক দশ টাকায় এইরূপ আহারের ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাহা হইলে, বাঙ্গালার ছাত্র-সম্প্রদায়, তাহাদের পিতৃ-সম্প্রদায়, খুল্লতাত ও জ্যেষ্ঠতাত ও তদ্রূপ অন্যান্য স্বজনগণ সম্প্রদায়, মাষ্টার ও কেরাণী সম্প্রদায়, —এমন কি, চচ্চড়ি-পীড়িত, বোগড়া-চাল-শঙ্কিত, ডাল নামক-বন্যা-প্লাবিত সমগ্র ক্ষুধিত সম্প্রদায় ইন্দু বাবুর রন্ধনশালার দ্বারে শিবিরসন্নিবেশ করিবে, এবং দশ পয়সায় অন্ততঃ এক বেলা পরিতোষপূর্ব্বক 'পোলাও বা খিচুড়ী, মাছ ভাজা, ডিম ভাজা, রুটী-মাংস বা আলু-মাংস' ভোজন করিয়া দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। তবে যাহারা প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইন্দু বাবুর আহারের ব্যবস্থার অনুসরণ করিবে, চিকিৎসার খাতে তাহাদের আর কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হইতে পারে।—ইন্দু বাবু এই ভাবে এতই বিভোর হইয়াছেন যে, ঠিক দিতেও ভুলিয়া গিয়াছেন। যথা, প্রাতে প্রথম দফা,—এক আনা; দ্বিতীয় দফা,—দশ পয়সা; বৈকালে এক আনা; রাত্রে তিন আনা, মোট সাড়ে সাত আনা। ইন্দু বাবু ইহাও কমাইয়া 'ঊর্দ্ধ মাত্রায় ছয় আনা'য় পরিণত করিয়াছেন! ছয় আনায় তাঁহার ফর্দ্দের অর্দ্ধেকও অতিক্রম করা যায় না, ইন্দু বাবু মাধববাবুর বাজারে প্রবেশ করিলেই তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইবেন। 'ভারতী'র আর কোনও প্রবন্ধই উল্লেখযোগ্য নহে। সাহিত্যের আসরে 'ভারতী'র বীণায় আজ কাল খেলো টপ্পার জংলা সুরই শুনিতে পাই।—'খেয়ালে'র অবশ্য কোনও কালেই অভাব হয় না;—আজ কাল উদ্ভট চিত্রে ও তথাকথিত ডেঁপো-সমালোচনায় খেয়ালের প্রভাব কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত হইয়া উঠিতেছে।

সম্মার্জ্জনী।

১

উদ্যানের মালিকের তীক্ষ্ণদৃষ্টি না থাকিলে, গাছে কাঁটাল পাকিলে তলায় শৃগালের দৌরাত্ম্য বাড়িয়া থাকে। নাবালক শৈলেন্দ্রনাথ বয়ঃসন্ধি পার হইয়া সাবালকত্বের পর্য্যায়ে উন্নীত হইবার পূর্ব্বেই বন্ধু অথবা মোসাহেবরূপী জম্বুকের দল তাহাকে চারি দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে শৈলেন্দ্রনাথের পিতৃপরিত্যক্ত জমীদারীর মোটা আয়ের প্রতি বন্ধুবর্গেরই তেমন প্রত্যক্ষ লুব্ধদৃষ্টি ছিল না। বরং পাছে জমীদারীর হিসাবপত্র, আয়-ব্যয়-তালিকার ভীষণ, নীরস, জটিল ও দুর্ব্বোধ সমস্যার সমাধানে কোমলমতি বন্ধুবৎসল শৈলেন্দ্রনাথের তরল মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায়, এই আশঙ্কা সহচর-প্রধান ভূতনাথের বিলক্ষণ প্রবল হইয়াছিল। বন্ধুকে এই ঘোর বিপদ হইতে ত্রাণ করিবার অভিপ্রায়ে ভূতনাথ শৈলেন্দ্রের বৈঠকখানায় একটা গানের আখ্ড়া স্থাপন করিয়াছিল।

ছাই কাজ! কাজ ত দরিদ্রের জন্য, উদরান্নলালায়িত কেরাণীর নিমিত্ত! মূর্খ, দরিদ্র প্রজা রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, অনশনে অথবা অর্দ্ধাশনে ক্ষেত্রে সোনা ফলাইবে, আর বুদ্ধিমান জমীদার ঘরে বসিয়া নিজ প্রাপ্য গণ্ডা কড়া ক্রান্তিতে হিসাব করিয়া লইবেন! ইহাই ত দুনিয়ার চিরন্তন প্রথা! দরিদ্র বোঝা বহিয়া বেড়াইবে, তাহাই তাহার বিধিলিপি। যে ঐশ্বর্য্যবান্, সে কেন এমন দুষ্কর্ম্ম করিতে যাইবে? শৈলেন্দ্রনাথ বন্ধুর এই অমূল্য উপদেশের জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

গানের আখড়ার কার্য্য পূর্ণ উৎসাহে চলিতে লাগিল। উষার প্রথম আলোক-বিকাশের সহিত তবলায় চাঁটী পড়িত, হারমোনিয়মের সুরের সঙ্গে সঙ্গে ললিত, ভৈঁরো, ভৈরবী প্রভৃতি রাগরাগিণীর বিচিত্র আলাপ আরম্ভ হইত। রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে সঙ্গীতশালার কার্য্য কখনও সমাপ্ত হইত না। বাড়ীর লোক ত দূরের কথা, পল্লীর অধিবাসিগণ-পর্য্যন্ত এই নবপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতালয়ের বিকট চীৎকারে, বিশেষতঃ ভূতনাথের সাধা গলার বিচিত্র

রাগিণী-আলাপে, সঙ্গীতের গমক, মিড় ও মূর্চ্ছনার দৌরাত্ম্যে বিলক্ষণ ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু প্রকাশ্যে কাহারও কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার শক্তি ছিল না। স্বয়ং নবীন জমীদার মহাশয় আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট সভ্য! প্রতিবাদ করিবে কে?

ভূতনাথের প্রেমে শৈলেন্দ্র আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছিল। একে বাল্যবন্ধু, তাহাতে সে সঙ্গীত শাস্ত্রের এক জন মস্ত ওস্তাদ। বহু পুণ্যফলে এমন বন্ধুরত্ন মিলে। শৈলেন্দ্রনাথের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তাই এমন বন্ধু মিলিয়াছিল। ভূতনাথের এমনই প্রভাব যে, সে যাহা বলিত, অথবা করিত, শৈলেন্দ্রের নিকট তাহা অতীব শোভন ও চমৎকার বলিয়া বোধ হইত! বন্ধুর মস্তকের সম্মুখভাগে তরঙ্গায়িত দীর্ঘ কেশরাশির শোভা দর্শন করিয়া মুগ্ধ শৈলেন্দ্র কেশপ্রসাধনে মনোনিবেশ করিয়াছিল। নরসুন্দরের ক্ষুরচালন-নৈপুণ্যে কিশোর ভূতনাথের ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ-শ্মশ্রু উদ্গত হইয়াছিল; তাই শৈলেন্দ্রও পরামাণিকের শরণ লইয়াছিল।

সর্ব্ব বিষয়ে ভূতনাথের অনুকরণ করায় শৈলেন্দ্রনাথের বন্ধুপ্রীতি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু আত্মীয়গণ তাহার ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইলেন। পল্লীর নিন্দুকেরা মধ্যাহ্নে জটলা করিবার অবসর পাইল। শৈলেন্দ্র তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইল না। ভূতনাথ ত আর ষোড়শী যুবতী নহে যে, তাহার সহিত অবাধ প্রেম অথবা নিবিড় ঘনিষ্ঠতা একটা গুরুতর অপরাধ!

২

স্কন্ধদেশে অপদেবতার আবির্ভাব হইলে, তাহাকে তাড়াইবার নানাবিধ প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে। ভূত নামাইবার জন্য রোঝার প্রয়োজন। আত্মীয়বর্গ মুষ্টিযোগপ্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। যথাসময়ে ত্রয়োদশ-বর্ষীয়া সুন্দরী বধূ ঘরে আসিল। হেমলতার সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া অনেকে ভাবিল, অপদেবতার দৌরাত্ম্য এবার কমিবে। কিন্তু হায়! "মরিয়া না মরে রাম, এ কেমন বৈরী!"—ভূত নামিল না। গীতবাদ্য, আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে লাগিল; কোনও ব্যতিক্রম ঘটিল না।

প্রভাতী চা-পান শেষ করিয়া শৈলেন্দ্রনাথ সবে আসরে বসিয়াছে, এমন সময় শুভ্রকেশ বৃদ্ধ ম্যানেজার কাগজের তাড়া লইয়া মনিবের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। তখনও আসর তেমন জমে নাই।

অসময়ে অরসিক ও ঘোরতর অর্ব্বাচীন বৃদ্ধকে দেখিয়া বন্ধুবর্গের নাসিকা কুঞ্চিত হইল। শৈলেন্দ্রনাথ বিরক্ত হইল।

বিনীতভাবে সপ্রতিভ ম্যানেজার বলিলেন, "আপনার একটু সময় হবে কি? এই কাগজগুলি যদি একবার দেখিতেন! চর মুকুন্দপুরের—"

"আঃ! আপনি জ্বালাতন করে তুল্‌লেন দেখ্‌ছি। আমি কতবার বলেছি, ও সব বাজে কাজে আমার মন দিবার আদৌ অবসর নাই, তবু আপনি শুন্‌বেন না।"

ভূতনাথ তখন হারমোনিয়মে সুর দিয়া মৃদুকণ্ঠে গাহিয়া উঠিল,—

"বাজে কাজে মিন্‌সেকে আর যেতে দেবো না!"

কুণ্ঠিতভাবে ম্যানেজার বলিলেন, "আজ্ঞে, রসিক বাবুর কাছে এই তালুকটা বন্ধক আছে। সুদে আসলে প্রায় ত্রিশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। সম্পত্তিটাতে লাভও তেমনি নাই। বিক্রয় করিয়া দেনাটা শোধ—"

"থামুন্ মহাশয়, আপনি আমায় দু দণ্ড বিশ্রাম করিতেও দিবেন না? এখন যান্। ও সব দেখ্‌বার বা বুঝ্‌বার আমার কোনও দরকারই নাই। মা আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন গে। ভাল কথা, আমাকে এক শ'—নিদেন পক্ষে গোটা পঞ্চাশেক টাকা এখনই পাঠিয়ে দেবেন।"

"তা দিচ্ছি. কিন্তু—"

ভূতনাথ অন্তরার পর্দ্দাটা বাজাইয়া লইয়া বলিল, "শৈল, বাঁয়াটা একবার নাও দেখি।"

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন। ভূতনাথ নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া হারমোনিয়মে ঝঙ্কার দিল,—

"পা পা, রে রে, মা মা, গা ধা।"

নিরুপায় বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণমনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিবার সময় তিনি শুনিলেন, বাবুর বাঁয়া সোৎসাহে বলিতেছে,—"তেরে কেটে ধিন্‌তা, তিন্‌তা ঘিন্‌তা!"

ম্যানেজার অবনতমস্তকে নীচে নামিয়া গেলেন।

৩

রিম্ রিম্ ঝম্ ঝম্ শব্দে তখনও বারিপাত হইতেছিল। আষাঢ়ের ছিদ্র-শূন্য মেঘজালে আকাশ আচ্ছন্ন। ...

করিতেছিল। ভ্রাতার আগমনপ্রতীক্ষায় কুসুম তখনও বসিয়াছিল। বাদলার দিনে শৈলেন্দ্র খিচুড়ী খাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিল। তাহাকে না খাওয়াইয়া ভগিনী ত বিশ্রাম করিতে পারে না!

রাত্রি অধিক হইল, এবং খিচুড়ী জুড়াইয়া যায় দেখিয়া, ভ্রাতাকে ডাকিবার জন্য সে ভৃত্য রাধুকে পাঠাইয়া দিয়াছিল।

কিয়ৎকাল পরে রাধু আসিয়া সংবাদ দিল, "বাবু একটু পরে আসিতেছেন।"

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, "আর বাবুর লেজুড়—সেই মোসাহেবটি?"

"তিনিও আস্‌ছেন।"

"তুই আবার যা, এবার সঙ্গে করে নিয়ে আয়। খিচুড়ী যে জুড়িয়ে গেল। ভাল আপদ্ এসে জুটেছে যা হোক্! এ ভূত নেমেও নামে না! বউ, তুই কোনও কাজের ন'স্। তিন বছরে ভূত ছাড়াতে পাল্লি নে?"

হেমলতা পান সাজিতেছিল। লজ্জায় সে মুখ নত করিল।

হায়! রোঝা যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়াইবে, তাহাকেই যে ভূতে পাইয়াছে!

দিদিমণির প্রদত্ত নূতন উপাধির শুভ সংবাদটা ভৃত্য জনান্তিকে ভূতনাথকে জানাইয়া দিল। এই অনাহূত অভ্যাগতটির উপর তাহার একটা মর্ম্মান্তিক আক্রোশ ছিল; তাহার সোনারচাঁদ মনিবকে ঐ হতভাগাই ত যাদু করিয়া রাখিয়াছে! অন্ধকারে সে যদি উপসর্গটাকে একবার একা পাইত!

বন্ধুযুগল আহারার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। পাশাপাশি উভয়ের আহারের স্থান হইয়াছিল। ইদানীং ভূতনাথ গৃহ ছাড়িয়া বন্ধুর আলয়ে দুই বেলা আহার ও শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিল। শৈলেন্দ্র সহচরের এতটা আত্মত্যাগে অত্যন্ত কৃতার্থ হইয়াছিল।

ভৃত্যের শ্লেষাত্মক বাক্যে ভূতনাথের আত্মাভিমান বোধ হয় আহত হইয়াছিল। রহিয়া রহিয়া কথাটা সম্ভবতঃ তাহার হৃদয়ে বেদনার মত বাজিতেছিল। ঘন দুধের বাটীতে কদলী ও আম্ররস মিশ্রিত করিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে ভূতনাথ বলিল, "দেখ শৈল! তোমাদের বাড়ীতে খাই বলিয়া অনেকে অনেক রকম মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন। যদি তোমার কোনও আপত্তি থাকে বল, কাল থেকে আর এখানে খাইব না।"

শৈলেন্দ্র সবিস্ময়ে বলিল, "ও আবার কি কথা ভাই? আমার আবার আপত্তি কিসের?"

কুসুম বুঝিল, সে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল, ভূতনাথ রাধুর নিকট তাহা শুনিয়াছে। সে বলিল, "খাওয়ার জন্য তোমাকে ত কেউ কিছু কখনও বলে নাই। তবে তুমি শৈলর সঙ্গে যে রকম ভাবে বেড়াও, তাতে অনেকে অনেক কথা বল্‌তে পারে।"

ভূতনাথ শৈলেন্দ্রের সম্পর্কে কুসুমকে দিদি বলিয়া ডাকিত। সে গ্রীবা উন্নত করিয়া বলিল, "কেন দিদি, আমি কি শৈলর খোসামোদ করি?"

কুসুম মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা তুমি কর আর না কর, বড়লোকের সঙ্গে গরীবের ছেলে যদি দিনরাত বেড়ায়, লোকে তাকে মোসাহেব বলে।"

"আমাকে এ কথা কেউ বল্‌তে পারে না, কেউ তা বল্‌তে সাহস করে না।"

কুসুম গম্ভীরভাবে বলিল, "নিশ্চয় বলে, এই ধর না—আমিই তোমাকে শৈলেন্দ্রের মোসাহেব বলি।"

ভূতনাথের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার মুখের উপর কেহ যে তাহাকে শৈলেন্দ্রের মোসাহেব বলিয়া ডাকিবে, সে কখনও স্বপ্নেও তাহা ভাবে নাই!

শৈলেন্দ্র এতক্ষণ নীরবে ভোজন করিতেছিল। অগ্নিসংস্পর্শমাত্রেই বারুদ যেমন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, দিদির শেষ কথায় তাহার শিরায় শিরায় আগুন তেমনই সহসা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। ক্রোধে আত্মবিস্মৃত শৈলেন্দ্র গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কেন তুমি ভূতোকে অমন কথা বল্‌বে? তোমার বল্‌বার কি অধিকার আছে? তুমি কে? খবরদার, আর কখনও অমন কথা বলো না।"

কুসুমের প্রফুল্ল আননে সহসা কেহ যেন কালিমারাশি ঢালিয়া দিয়া গেল। বজ্রাহত পথিকের ন্যায় কয়েক মুহূর্ত্ত নিশ্চলভাবে সে সেইখানে বসিয়া রহিল। সূতিকাগার হইতে এতকাল পর্য্যন্ত যাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, স্তন্যদানে যাহাকে সন্তানের ন্যায় পালন করিয়াছে, সেই পুত্রতুল্য কনিষ্ঠ সহোদরের মুখে এত বড় মর্ম্মভেদী তিরস্কার! সে যে বড় মুখ করিয়া সকলকে বলিত, শৈলেন্দ্র আর যাহার সঙ্গে যেমনই ব্যবহার করুক না কেন, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কখনও সে কোনও কথা

বলিবে না। আজ সকলের সম্মুখে তাহার সে বিশ্বাস এমন করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল! ভ্রাতার নির্ম্মম বাণী তাহার হৃদয়ে তীক্ষ্ণমুখ বিষাক্ত সায়কের ন্যায় বিদ্ধ হইতে লাগিল। যন্ত্রণায়, দুঃখে কুসুমের নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল। অসীম ধৈর্য্যবলে ভগিনী প্রবাহিতপ্রায় অশ্রুস্রোত রুদ্ধ করিল। তার পর ধীরে ধীরে দ্বারপার্শ্ব হইতে উঠিয়া স্খলিতচরণে কক্ষান্তরে গমন করিল। শয্যার উপর বেপমানা দেহলতা রক্ষা করিয়া শরাহতা কুরঙ্গীর ন্যায় সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

মাতা বলিলেন, "শৈল, তুই হয়েছিস্ কি? আজ কাকে কি বল্‌লি বাবা?"

"বেশ করেছি, বলেছি। আমার খুসী। তুমি বেশী বকিও না।"

পরদিন প্রভাতে একখানি বিষাদ-প্রতিমা মন্থরগমনে গাড়ীতে আরোহণ করিল। রাধু ম্লানমুখে শৈলেন্দ্রকে জানাইল, দিদিমণি শ্বশুরালয়ে যাইতেছেন।

ভূতনাথ বলিল, "তুই তাওয়া দিয়ে আর এক ছিলিম তামাক সাজ।"

শৈলেন্দ্র গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল।

গাড়ীর খড়খড়ি তুলিয়া কুসুমের অশ্রু-সজল নয়নযুগল বাহিরের বারান্দার উপর কাহার পরিচিত স্নেহমূর্ত্তির অন্বেষণ করিতেছিল! অভিমান কি স্নেহকে জয় করিতে পারিয়াছিল?

৪

উপর্য্যুপরি দুই রাত্রি রঙ্গালয়ে প্রায় সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়া শৈলেন্দ্রের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছিল। তাহার উপর গত রজনীতে অবৈতনিক থিয়েটারের ড্রেস-রিহার্সাল উপলক্ষে তাহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। কয় দিনের অত্যাচারে শৈলেন্দ্রের শরীর এমন অপটু হইল যে, আজ আর সে কোনও মতেই শয্যাত্যাগ করিতে পারিল না।

অনাহারে সমস্ত দিন সে বাহিরের ঘরে পড়িয়াছিল। কোনও কার্য্যেই আজ তাহার উৎসাহমাত্র ছিল না। শয্যার উপর এ-পাশ ও-পাশ করিতে করিতে শৈলেন্দ্রের তন্দ্রার আবির্ভাব হইল।

সহসা শরীরমধ্যে একটা যন্ত্রণা অনুভব করিয়া শৈলেন্দ্র উঠিয়া বসিল। কিন্তু সে মস্তক তুলিয়া বসিতে পারিল না। উপাধানের উপর তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা ঢলিয়া পড়িল। আজ তাহার এ কি হইল! সমস্ত শরীরে

ফাল্গুনের অন্তিম দিবালোক প্রাচীর-বিলম্বিত একখানি অর্দ্ধনগ্ন নারীচিত্রের উপর পড়িয়া নৃত্য করিতেছিল। পছন্দ করিয়া শৈলেন্দ্র চিত্রখানি সম্প্রতি কিনিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু সে দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না।

শৈলেন্দ্র গৃহের চারি দিকে চাহিল। ইহারা সব গেল কোথায়? ভূতনাথই বা কোথায় গেল? সে ত কোনও দিন এ সময় অনুপস্থিত থাকে না!

দরজা খুলিয়া গেল। বন্ধুবর কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ওঃ! মনে পড়িয়াছে, আজ যে অভিনয়ের দিন। শৈলেন্দ্রের স্মৃতিশক্তি এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে?

ভূতনাথ বলিল, "তুমি এখনও শুয়ে যে? আজ হরিবাবুর বাড়ীতে থিয়েটার, তুমি যাবে না? সকলে তোমায় খুঁজিতেছে।"

শৈলেন্দ্র বলিল, "শরীরটা বড় খারাপ। তুমি শীঘ্র এক গেলাস জল দাও। তৃষ্ণায় গলা শুকাইয়া গিয়াছে।

ভূতনাথ সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি শৈল! তোমার চোখ্ এত লাল কেন?"

"বড় জ্বর, শরীরে ভয়ানক বেদনা।"

ভূতনাথ থমকিয়া দাঁড়াইল। শঙ্কাকম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, "জ্বর? বল কি? সময়টা বড় খারাপ। এখন জ্বর হওয়া—ও কি? তোমার গায়ে ও সব কি?"

শৈলেন্দ্র বলিল, "বোধ হয় মশা কামড়াইয়াছে। কেন, তোমার ভয় হইতেছে না কি?"

একখানি কৌচের উপর বসিয়া পড়িয়া ভূতনাথ বলিল, "না, তা নয়, তবে কি না—"

"এ দিকে এস না ভাই, আমার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও।"

ভূতনাথ বলিল, "আমায় এখনই যেতে হবে। তুমি যেতে পারবে না, আখড়ার সকলকে তা জানাতে হবে। আজ অভিনয়টা সুবিধার হবে বলে বোধ হয় না।"

শৈলেন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমার অসুখ হয়ে সব নষ্ট হ'ল দেখ্‌ছি।"

"তবে আমি এখন চল্‌লুম্। তারা এতক্ষণ বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বোধ হয়।"

"ঐ কাপড়ে যাবে না কি? আমার সিল্কের পঞ্জাবী ও চাদরটা নিয়ে যাও। সবে কাল বাহির করিয়াছি, ময়লা হয় নাই।"

ভূতনাথ সংক্ষেপে বলিল, "থাক্, দরকার নাই, ইহাতেই চলিবে।"

বেশবিন্যাসে বন্ধুর সহসা এতখানি বৈরাগ্যদর্শনে শৈলেন্দ্র একটু বিস্মিত হইল। এ যাবৎ কোথাও যাইতে হইলে সে সর্ব্বদাই শৈলেন্দ্রের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ব্যবহার করিত। কিন্তু আজ সে এত উদাসীন কেন?

ভূতনাথ দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

৫

বিয়াল্লিশ দিন ধরিয়া জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে ঘোরতর, শ্রান্তিহীন সংগ্রামের পর মৃত্যুই শেষে পরাজিত হইল। কিন্তু যাইবার সময় বিজিত শত্রু শৈলেন্দ্রের দেহে তাহার তীব্র, ভীষণ আক্রমণের স্মৃতিচিহ্ন রাখিয়া গেল।

সে সংগ্রাম কি বীভৎস, কি ভয়ঙ্কর! প্রলয়-ঝটিকাপূর্ণ গাঢ় অন্ধকার-রাশি ভেদ করিয়া প্রতিযোগিদ্বয়ের কি দ্রুত অভিযান! মৃত্যুর শ্বাসরোধকারী বিভীষণ আক্রমণ, কঠোর লৌহহস্তের নিদারুণ নিষ্পেষণ—জীবন-বহ্নির অন্তিম শিখা নির্ব্বাপিতপ্রায়! সহসা দিগন্ত আলোকিত করিয়া এ কি আলোকদীপ্তি! বজ্রাহত দৈত্যের ন্যায় করাল মৃত্যু আর্ত্ত চীৎকারে মহাশূন্য আলোড়িত করিয়া পলায়ন করিল; নিবিড় তিমিরজাল অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত হইল। জীবনস্রোত ক্ষীণধারায় শিরায় শিরায় আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল। কি বিচিত্র স্বপ্ন, কি মধুর জাগরণ!

শৈলেন্দ্র ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলিত করিল। পার্শ্বে ও কে? কাহার স্নেহকাতর করুণ নয়নযুগলের নির্নিমেষ দৃষ্টি ব্যগ্রভাবে তাহার পানে নিবদ্ধ? কাহার কোমল করতল সন্তর্পণে সর্ব্বাঙ্গে ঔষধ লেপন করিতেছে? শিয়রে ও কোন্ দেবীর মূর্ত্তি? নিশ্চল, নির্ব্বাক, স্নেহাতুর লোচনে আশঙ্কা ও উদ্বেগের কি গাঢ় ছায়া! পদতলে অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা কে তুমি? আশঙ্কার ম্লান রেখা মুখকমলের প্রফুল্ল হাসিটুকু মুছিয়া দিয়াছে; নয়নে মুক্তা দুলিতেছে!

ডাক্তার বলিয়া গেলেন, আর ভয় নাই।

"মা, শৈল জাগিয়াছে, একটু গরম দুধ নিয়ে এস। বৌ, তুমি যাও, ভাত খাওগে। আমি এখানে আছি।"

শৈলেন্দ্র দিদির দিকে চাহিল। সে স্নেহ-শীতল আননে অভিমান, ক্ষোভ বা বিরক্তির চিহ্নমাত্র নাই! তাহার নির্ম্মম ব্যবহারে অপমানিতা, লাঞ্ছিতা ভগিনী বিদীর্ণহৃদয়ে পতিগৃহে ফিরিয়া গিয়াছিল। এক বৎসরের মধ্যে সে আর ভ্রমেও পিত্রালয়ে আসিবার নাম করে নাই। গাড়ী কতবার ফিরিয়া

আসিয়াছে। কিন্তু আজ? সংক্রামকব্যাধিগ্রস্ত, অপমানকারী, নির্দ্দয় ভ্রাতার রোগশয্যার পার্শ্বে অসঙ্কোচে বসিয়া সেবা করিতেছে। মৃত্যুর সহিত চল্লিশ দিন অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করিয়াছে! এতটুকু মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত নাই?

শৈলেন্দ্রের মানস-চক্ষুর উপর অতীত উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাত হইল। ভগিনীর সেবাপরায়ণা মাতৃমূর্ত্তি, অপূর্ব্ব ত্যাগস্বীকার, অকুণ্ঠিত শুশ্রূষা ও স্নেহব্যাকুল নয়নের কাতর দৃষ্টি তাহার মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত করিতে লাগিল। দুই বিন্দু অশ্রু তাহার শুষ্ক নয়নে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কত দিন সে কাঁদে নাই—কাঁদিতে পারে নাই! বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "দিদি! দিদি!"

কুসুম পরমস্নেহে ভ্রাতার মস্তকে ধীরে ধীরে হস্তসঞ্চালন করিয়া বলিল, "কি দাদা, বড় কষ্ট হচ্ছে?"

ক্ষীণস্বরে শৈলেন্দ্র বলিল, "না, কষ্ট আর নাই। তোমাদের পুণ্য-স্পর্শে রোগের যন্ত্রণা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু—"

"থাক্, এখন বেশী কথা কহিও না। এই দুধটুকু খেয়ে চুপ করে শুয়ে থাক।"

মাতার হস্ত হইতে পাত্রটি লইয়া কুসুম ভ্রাতাকে শিশুর ন্যায় দুগ্ধ পান করাইল।

এ দিক ও দিক চাহিয়া শৈলেন্দ্র বলিল, "মা, ভুতো কোথায়? সে এখানে আসে ত?"

মাতা বলিলেন, "না, বাবা; ডাক্তার এ ঘরে সবাইকে আস্‌তে বারণ করে দিয়েছেন। তাই সে আস্‌তে পারে নি বোধ হয়।"

শৈলেন্দ্র নয়ন নিমীলিত করিল। তাহার এ ব্যাধি ঘোরতর সংক্রামক; তাহার শয়নকক্ষ মৃত্যুর ভীষণ নিশ্বাসে পরিপূর্ণ। ধ্রুব মৃত্যুর মুখে সাধ করিয়া কে আত্মবিসর্জ্জন করিতে চায়? কিন্তু মাতা, ভগিনী, পত্নী? তাঁহারা ত মুহূর্ত্তের জন্য তাহাকে পরিত্যাগ করেন নাই? মহাকালের বিভীষিকা নিমেষের জন্যও ত তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই!

হায়, মূর্খ! মাতার অসীম স্নেহ, ভগিনীর অগাধ ভালবাসা ও পত্নীর অনন্ত প্রেমের সহিত কাহার তুলনা করিতেছ?

শৈলেন্দ্র কম্পিতস্বরে বলিল, "মা পায়ের ধুলা মাথায় দাও। দিদি আমায় ক্ষমা করিবে?"

মাত্র [illegible] কণ্ঠে ভগিনী বলিল, "লক্ষ্মী ভাই আমার, এখন একটু ঘুমাও।"

৬

আরোগ্যস্নান করিলেও শৈলেন্দ্রনাথ শারীরিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ তখনও ভাল করিয়া হাঁটিতে পারিত না। প্রভাতে বসিয়া ভ্রাতা ভগিনীতে নানা বিষয়ের আলোচনা হইতেছিল। সহসা অন্তঃপুরের প্রাঙ্গনে একটা গোলযোগ শুনিয়া উভয়ে চমকিয়া উঠিল।

শ্যামাঝির কণ্ঠস্বর নয়?

"পোড়ারমুখো মিন্‌সে, মরবার আর জায়গা পাও নি?"

"ঝাঁটা মেরে বার ক'রে দে ঝি, এত বড় স্পর্দ্ধা!"

এ কি? হেমলতার কণ্ঠস্বর যে!

কুসুম দ্রুতবেগে বারান্দার অভিমুখে দৌড়িল। বধূ হেমলতা সিক্ত-বসনে কলতলায় দাঁড়াইয়াছিল। তাহার সুগৌর মুখমণ্ডল ক্রোধে, ঘৃণায় লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল; সর্ব্বদেহ থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। শ্যামা দাসীর এক হস্তে সম্মার্জ্জনী। অপর হস্তে সে এক ব্যক্তির চাদর দৃঢ়-মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়াছিল।

শ্যামা সগর্জ্জনে বলিল, "ভদ্রলোকের—বন্ধুর বাড়ীর ভিতর ঢুকে বউঝিদের লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা?—"

কুসুম বলিল, "কি হয়েছে ঝি? ও কে?"

"আবার কে? আমাদের বাবুর বন্ধু গো বন্ধু! সেই ভূতো! বউদিদি নাইছিলেন, আর ঐ হতভাগা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল। ও মা কি আস্পর্দ্ধার কথা গো! বুকের পাটাটা একবার দেখ দেখি।"

কুসুমের মুখমণ্ডল অন্ধকার হইয়া গেল। "বলিস্ কি শ্যামা? শীঘ্র দরোয়ানকে ডাক্। কি সর্ব্বনেশে কথা!"

শৈলেন্দ্র ভগিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়াছিল। সমস্ত ঘটনা দেখিয়া তাহার দুর্ব্বল হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত লাগিল। বারান্দার রেলিং ধরিয়া সে পতনবেগ সংবরণ করিল। ক্রোধে, দুঃখে, ক্ষোভে, অনুশোচনায় তাহার হৃদয় মথিত হইতে লাগিল।

তীব্রস্বরে শৈলেন্দ্র হাঁকিল, "দরোয়ান!"

চকিতে চাদর ছাড়াইয়া লইয়া ভুতনাথ পশ্চাৎ ফিরিল। পলায়নের পূর্ব্বেই শ্যামার উদ্যত সম্মার্জ্জনী সশব্দে তাহার পৃষ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিল। মুক্তকচ্ছ ভুতনাথ প্রহৃত কুক্কুরের ন্যায় রুদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

প্রাচীন গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতি।

আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ; (ক) জাতি-বৈচিত্র্য ; (খ) বিভিন্ন কেন্দ্রসমূহ—স্পার্টা ও এথেন্স ; (গ) কালভেদে শিক্ষাপদ্ধতির প্রভেদ —এথেন্সের তিন যুগ ; (ঘ) শিক্ষাজগতের প্রকৃত ঘটনাসমূহ।

গ্রীক-সভ্যতা যত দিন স্বাধীনভাবে বিকাশ ও বিস্তৃতি লাভ করিতেছিল, তত দিন দেশ, কাল ও অবস্থা অনুসারে তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতির যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, এই নিবন্ধে কেবলমাত্র সেই সকল পরিবর্ত্তনের বিবরণ প্রদত্ত করা হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনসমূহের বর্ণনায় প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ের বিশেষ উল্লেখ করিতে হইয়াছে ;—(১) ডোরীয় জাতির স্থিতিশীল বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি, এবং (২) আইওনীয় জাতির পরিবর্ত্তনশীল শিক্ষাপদ্ধতি। ডোরীয় জাতির শিক্ষাপদ্ধতি স্পার্টা নগরে বিকাশ লাভ করিয়াছিল। এ জন্য স্পার্টার সভ্যতা ও শিক্ষানীতি আলোচিত হইয়াছে। আইওনীয় জাতির শিক্ষাপদ্ধতি এথেন্স নগরে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। এ জন্য গ্রীক-শিক্ষাপদ্ধতির ইতিহাসে এথেন্সের সভ্যতা ও শিক্ষানীতি আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, কেবলমাত্র জাতিগত বৈচিত্র্যের জন্য শিক্ষার বৈচিত্র্য ঘটিয়াছিল, এমন নহে। সময়ের পরিবর্ত্তনে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল ; শিক্ষাপদ্ধতিও রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই রূপান্তর স্পার্টার ডোরীয় সমাজকে বিশেষ স্পর্শ করে নাই। এথেন্সেই শিক্ষাপদ্ধতির ক্রমিক বিকাশ ও অবস্থান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। এই জন্য এথেন্সের সভ্যতা ও শিক্ষাপদ্ধতির ক্রমবিকাশের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইয়াছে।

যে সকল বিষয় আলোচিত হয় নাই ;
(ক) শিক্ষা সম্বন্ধে রাষ্ট্রনীতিকদিগের মত, এবং বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদের প্রতিষ্ঠাতাদিগের শিক্ষা-বিজ্ঞানসমূহ।

এইরূপ বিভিন্ন শিক্ষাপদ্ধতিসমূহের চিত্র প্রদান করিবার জন্য সমাজে বাস্তবিক পক্ষে যেরূপভাবে শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইত, তাহারই বর্ণনা করা হইয়াছে। স্পার্টায় ও এথেন্সে ভিন্ন ভিন্ন যুগে শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের যেরূপ মনোযোগ ছিল, শিক্ষক ও সমাজের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, শিক্ষার্থীদের যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল, রাষ্ট্রের সহিত শিক্ষাব্যবস্থার যেরূপ সংস্রব ছিল, কেবলমাত্র সেইরূপ অবস্থারই প্রকৃত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। রাষ্ট্রনৈতিক-

গণ অথবা ব্যবস্থাপক-সভার প্রধান প্রধান সচিবেরা শিক্ষার উদ্দেশ্য, উপকরণ ও প্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ মত প্রকাশ করিতেন, অথবা সক্রেটীস, প্লেটো, এ্যারিষ্টটল প্রভৃতি পণ্ডিত দার্শনিকগণ রাষ্ট্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন, শিক্ষাপদ্ধতির যেরূপ আদর্শের উল্লেখ করেন, তাহার কোনও বিবরণ প্রদত্ত হয় নাই। ইঁহাদের দার্শনিক মতবাদসমূহের বিশদ বিবরণ দান না করিয়া, ইহাঁরা শিক্ষকতার কার্য্য কিরূপ করিতেন, স্ব স্ব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতৃরূপে যে ভাবে বিদ্যাদান ও শিক্ষার বিস্তার করিতেন, প্রকৃতপ্রস্তাবে শিষ্যদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিতেন, এই নিবন্ধে তাহাই আলোচিত হইয়াছে।

(খ) নব্য গ্রীক সভ্যতা ও নব শিক্ষাপদ্ধতির কেন্দ্রসমূহ ; (১) নবপ্রতিষ্ঠিত আলেক্‌জান্দ্রিয়া ; (২) নবভাবাপন্ন এথেন্স ; (৩) গ্রীক-ভাবাপন্ন রোম।

এতদ্ব্যতীত দিগ্বিজয়ী আলেক্‌জান্দারের উত্তরাধিকারীরা এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশসমূহ করতলগত করিয়া সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনমন্দিরস্বরূপ, সভ্যতা-বিস্তারের কেন্দ্র নগরসমূহ স্থাপনপূর্ব্বক মানবসমাজকে গ্রীকসভ্যতার দ্বারা রঞ্জিত করিবার যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেই জগদ্বিস্তৃত গ্রীক-সভ্যতার আধিপত্যকালে শিক্ষাপদ্ধতির কিরূপে পরিবর্ত্তন হয়, তাহারও কোনও চিত্র প্রদান করা হয় নাই। নূতন নূতন শক্তিসমূহের সংস্পর্শে ও নূতন নূতন ঘটনাবলীর প্রভাবে গ্রীকসভ্যতা নূতন রূপ ধারণ করে, এবং ইহার কেন্দ্র প্রাচীন গ্রীস পরিত্যাগ করিয়া এসিয়া ও আফ্রিকার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। অধিকন্তু অল্পকালের মধ্যেই রোমান সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়া ম্যাসিদনীয় সাম্রাজ্যের প্রদেশসমূহ গ্রাস করিয়া গ্রীকসভ্যতা-বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল ; এবং রোমীয় প্রণালীতে গ্রীকসভ্যতা রোমীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিল। সুতরাং খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে রোমীয় সভ্যতার অবসাদ-কাল পর্য্যন্ত গ্রীকসভ্যতা নিজের পবিত্রতা ও স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ম্যাসিদনীয় ও রোমীয় রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই ম্যাসিদনীয় গ্রীকসভ্যতার প্রধান কেন্দ্র নীলনদতটবর্ত্তী আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগর ও রোমীয় গ্রীকসভ্যতার প্রধান কেন্দ্র নগর-সাম্রাজ্ঞী রোম। এইরূপ অবস্থা-বিপর্য্যয়ের নিমিত্ত প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগরও ম্যাসিদনীয় ও রোমীয় ভাব ধারণ করিয়াছিল।

গ্রীকসভ্যতার নবযুগ ; (১) ক্ষুদ্র নগরগত জীবনের পরিবর্ত্তে, রাজতন্ত্র সভ্যতার প্রবর্ত্তনের প্রভাবে ক্রমশঃ সমাজে বিশ্বজনীনতার প্রবেশ।

নবভাবাপন্ন এথেন্স, নবপ্রতিষ্ঠিত আলেক্জান্দ্রিয়া, অথবা গ্রীকভাবাপন্ন রোম, কোনও কেন্দ্রই প্রকৃত প্রাচীন গ্রীসের নিদর্শন নহে। সুতরাং প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতির ইতিহাসে ইহাদের কোনও স্থান নাই। এই নবযুগে গ্রীকদিগের স্বাধীনতা নষ্ট হওয়ায় নবপ্রবর্ত্তিত বিজাতীয় রাজতন্ত্রের অধীনতায় তাহাদের স্বাভাবিক জাতীয় জীবনের গতিরোধ হইয়াছিল। পুরাতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাজ্য-সমূহের পরিবর্ত্তে নূতন-নূতন-শাসনপ্রণালী-বিশিষ্ট বিভিন্ন প্রদেশ-রাজ্য, সাম্রাজ্য, যুক্তরাজ্যসমূহ পুরাতন জাতীয় ভাবের বিনাশ সাধন করিয়া অভিনব জাতীয়তা ও নূতন রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্নভাষাভাষী বিভিন্ন দেশবাসীদিগের আবাসভূমি হইয়াছিল। নিজ নিজ পল্লী, জনপদ, বা নগরের চতুঃসীমায় আবদ্ধ না থাকিয়া লোকে নূতন নূতন দেশ ভ্রমণ করিয়া নূতন নূতন সমাজ, নুতন নুতন আচার ব্যবহার ও নূতন নূতন ধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া প্রশস্তমনা ও উদারচেতা হইতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের অধিবাসিবৃন্দ ও রাজন্যবর্গের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইয়া পরস্পরের মধ্যে সখ্য, ঐক্য ও সহানুভূতি বর্দ্ধিত করিয়াছিল। সর্ব্বত্র বিচারালয়ে ও রাজদরবারে গ্রীকভাষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় বহু দেশে এক ভাষার প্রচলন হইয়াছিল, এবং শিল্প-বাণিজ্য-বিস্তারের ফলে, ভাব ও কর্ম্মের আদান প্রদান সুসাধ্য হওয়ায়, বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন স্থানে সভ্যতা-বিস্তারের নূতন নূতন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইরূপ নানা উপায়ে ব্যাপকতা ও বিশ্বজনীনতার পুষ্টি সাধিত হইয়াছিল।

(২) পুরাতন রাষ্ট্রগত সভ্যতার বিলোপের ফলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ।

এইরূপ অবস্থা-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত তাহাদের চিন্তাজগতেও যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। স্বরাজ্যের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে জীবনগঠনের সুযোগসমূহ নষ্ট হওয়ায় তাহাদের চিন্তা ও কর্ম্মসমূহ রাষ্ট্রীয় জীবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং নৈতিক জগতের ভারকেন্দ্র স্থানভ্রষ্ট হইয়া জীবনের নুতন আদর্শ, ভাব ও কর্ম্মের নুতন লক্ষ্য, নূতন প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াছিল। কর্ম্মঠ, উৎসাহী, সামরিকশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা স্বদেশে উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র না পাইয়া দূর বিদেশে গমন পূর্ব্বক স্বকীয় প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির বিকাশ-

সাধনোপযোগী জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল। ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণ রাষ্ট্র-বিচারালয় মন্ত্রণাসভা প্রভৃতি সামাজিক কর্ম্মক্ষেত্রসমূহ ত্যাগ করিয় নিভৃত স্থানে শিষ্যপরিবৃত হইয়া নিজ নিজ শক্তি অনুসারে বিদ্যালয় ও আলোচনা-সঙ্ঘ প্রভৃতি চিন্তার কেন্দ্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা স্থিরপ্রতিষ্ঠ হইল। যে স্বাধীন চিন্তা বহুদিন হইতে গ্রীকসমাজে প্রবর্ত্তিত হইতেছিল, তাহা নূতন ঘটনাবলীর প্রাদুর্ভাবে স্বাভাবিকরূপে, অবারিতভাবে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। জেনো ও এপিকুরাস ও তাহাদের মতাবলম্বী সম্প্রদায়েরা রাষ্ট্রীয় জীবনের পুষ্টিতে ব্যক্তির সম্পূর্ণতা লাভ হয়, এই মতবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়া রাষ্ট্র ও সমাজবিচ্যুত পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব-বিকাশের স্বাধীন আদর্শ ও উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

গ্রীকজীবন এইরূপে ব্যাপকতা, বিশ্বজনীনতা ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার দ্বারা অনুরঞ্জিত হইয়া সাহিত্য, কলা, রীতিনীতি প্রভৃতি সভ্যতার বিবিধ অঙ্গের রূপান্তর সৃষ্টি করিল।

(৩) সঙ্কলন, অনুবাদ, সমালোচনা ও তুলনাসিদ্ধ বিজ্ঞানের যুগ।

গ্রীক, মিশরীয়, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদসমূহের সঙ্ঘর্ষণে চিন্তা-প্রণালীর নূতন সংঘর্ষণের সুবিধা জন্মিল। বহুবিধ তথ্য সংগৃহীত হইতে লাগিল। প্রাকৃতিক ও মানবীয়, উভয় জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী ও কার্য্যসমূহের বিবরণ প্রস্তুত হইতে লাগিল। সাহিত্যসেবী ও বিদ্যানুরাগী নরপতিরা জ্ঞানানুশীলন ও বিদ্যাচর্চ্চার জন্য গৃহপ্রতিষ্ঠা, ভূমিসম্পত্তি-দান, অর্থসাহায্য প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে পণ্ডিতদিগের কার্য্যের সহায় হইয়া, পণ্ডিতসম্মিলনী, সমালোচনা-সমিতি, মিউজিয়ম্, পুস্তকাগার, বিজ্ঞানমন্দির প্রভৃতি বিদ্বৎ-সঙ্ঘ-গঠনের সুবিধা করিয়া দিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে বিচিত্র পদার্থ ও দ্রব্যসমূহ বিদ্বৎ-সমিতিতে আনীত হইয়া আলোচিত হইতে লাগিল। বিবিধ অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থসমূহের ভাবও সুধীমণ্ডলীতে প্রচারিত হইয়া বিবিদষা বর্দ্ধিত করিল। নানা দিকে নানা বিষয় লইয়া চিন্তা, গবেষণা, আলোচনা, তর্ক, বাদানুবাদ, ব্যাখ্যা প্রভৃতি চলিতে লাগিল। শিষ্যেরা গুরুদিগের মতবাদসমূহের টীকা টিপ্পনী লিখিতে লাগিলেন। বিচিত্র তথ্য-সংগ্রহের ফলে তুলনা ও শ্রেণীবিভাগ-প্রণালী

বিষয়েরই নিয়মসমূহ, ক্রমান্বয় ও পারম্পর্য্যের প্রণালী ও কার্য্য কারণ-সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। পরস্পরের তুলনা ও তারতম্যের ফলে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মতবাদ চিন্তাপ্রণালীসমূহের স্থান, ক্রম ও পর্য্যায় নির্ণীত হইতে লাগিল। মতসমূহ শ্রেণীবদ্ধ ও শৃঙ্খলীকৃত হইয়া প্রকৃত বিজ্ঞানের রূপ ধারণ করিল।

বাস্তবিক পক্ষে এক বৈজ্ঞানিক যুগ উপস্থিত হইয়া গণিত, জ্যোতিষ, দর্শন, জ্যামিতি, ভূগোল, ইতিবৃত্ত প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। এই তর্ক ও যুক্তিমূলক সমালোচনার যুগে ধর্ম্মতত্ত্ব ও সাহিত্যও তুলনাসিদ্ধ বিজ্ঞান হইয়া পড়িল। চিন্তাশক্তি নূতন পথে ধাবিত হইল। লোকে মৌলিক কাব্যাদির রচনা পরিত্যাগ করিয়া সঙ্কলন, অনুবাদ ও সমালোচনা প্রভৃতি দ্বারা গদ্যসাহিত্য পুষ্ট করিতে লাগিল বিদ্যাবিস্তারের জন্য অল্পমূল্যে পুস্তকসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল। লিখন-প্রণালীও রচনাকৌশলের অপেক্ষা সরল ও সুবোধ্য ভাষায় ভাবপ্রকাশের প্রতি লোকের দৃষ্টি পতিত হইল। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ বাগ্মিতা শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক অনুসন্ধান, দার্শনিক বিশ্লেষণ ও ঐতিহাসিক গবেষণা ও ধর্ম্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি গভীর বিষয়ে মন নিবিষ্ট করিলেন।

নব্য শিক্ষাপদ্ধতি : (১) শারীরিক শিক্ষার লোপ ; (২) রাষ্ট্রনৈতিক বাগ্মিতা শিক্ষার লোপ ;
(৩) সরকার-পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ; (৪) প্রাচীন গ্রীসের বিদ্যালয়সমূহও
হতপ্রভ ও লুপ্তকীর্ত্তি।

সুতরাং এই যুগের শিক্ষাপদ্ধতি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের শিক্ষাপদ্ধতি অপেক্ষা স্বতন্ত্র। শারীরিক ও সামরিক শিক্ষা ক্রমশঃ অবনত ও লুপ্তপ্রায় হইয়া মানসিক শিক্ষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিল। সমাজের প্রথম হইতে মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধানের জন্য যে প্রয়াস ছিল, এত দিনে তাহা বিফল হইল। অধিকন্তু রাষ্ট্রনৈতিক বাগ্মিতা ও সমালোচনা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে সৃষ্টি, স্থিতি, জীব, ধর্ম্মবিজ্ঞান, গণিত, দর্শন প্রভৃতি জগতের গভীর বিষয়গুলি মানসিক শিক্ষার বিষয় হইল। ক্রমশঃ বিদ্যালয়-সমূহ সরকারের ব্যয়ে ও সরকারের কর্ত্তৃত্বাধীনে ও পরিদর্শনে পরিচালিত হইতে লাগিল। রাজশক্তির প্রভাবে নূতন আলেক্‌জান্দ্রিয়া পুরাতন এথেন্সকে হতপ্রভ ও হীনবীর্য্য করিল। রোমনগরী সাম্রাজ্য নীতির দ্বারা বিজিত

প্রদেশসমূহের কীর্ত্তি-কলাপ ধ্বংস করিয়া গ্রীকসভ্যতার দ্বারা নিজের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবার জন্য আপনাকে গ্রীকসভ্যতার রাজধানী ও প্রধান কেন্দ্র রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এই যুগে এথেন্স চিন্তাজগতে যে সামান্য প্রতিপত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা আলেক্জান্দ্রিয়ার নব্য চিন্তাপদ্ধতির অনুকরণের ফল স্বকীয় বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে কেবলমাত্র ষ্টেট-পরিচালিত প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয় রূপে সম্রাট্‌দিগের বদান্যতায় নির্ভর করিয়া ইহার শেষ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। এইরূপে প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা প্রথমতঃ স্বকীয় বিশেষত্ব, এবং দ্বিতীয়তঃ নিজ বাসভূমি হারাইয়া সম্পূর্ণ নূতন সভ্যতা-সৃষ্টির উপকরণ হইল।

(গ) হোমর-বর্ণিত গ্রীক জাতির শৈশবাবস্থা ; (১) সমাজিক জীবনের সরলতা ;
(২) সমাজের উপকার-সাধন—এক লক্ষ্য ; (৩) শিক্ষার উদ্দেশ্য—শারীরিক উৎকর্ষসাধন ও
আলোচনা-শক্তির বিকাশ।

এই নূতন সভ্যতার মধ্যে যেমন প্রাচীন গ্রীকদিগের বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না, তেমনই হোমরীয় কবি-সম্প্রদায়ের কাব্যগ্রন্থসমূহে গ্রীকসমাজের যে অবস্থার বর্ণনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে গ্রীকদিগের স্বতন্ত্র সভ্যতার বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। এই জন্য হোমর-বর্ণিত গ্রীকজাতির শৈশবাবস্থার বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয় নাই। হোমরের মহাকাব্যসমূহে যে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাকে বর্ত্তমান জগতের আর্য্যভাষাভাষী জাতিসমূহের সাধারণ পূর্ব্বপুরুষগণের চিত্র বলা যাইতে পারে। তথাপি গ্রীকপ্রদেশ ও উপনিবেশসমূহে রচিত ও গীত হওয়ায় এই সমুদয় কাব্যে গ্রীক জাতীয় প্রকৃতির আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। রাজার নিম্নে চিকিৎসক, কথক ও গণক সমাজের প্রধান ব্যক্তি। তখন সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। লিখনপদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় নাই। তখন দেশে দেশে চারণগণ পুরাকাহিনী গান করিয়া বেড়াইত। বিবিধ শিল্প তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। সমাজ ও রাষ্ট্রে জটিলতা প্রবেশ করে নাই। সর্ব্বদা জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত থাকিয়া ও কর্ম্মঠ জীবন গঠন করিয়া শত্রুদিগকে পরাস্ত করাই সমাজের প্রধান কার্য্য ও উদ্দেশ্য ছিল। শারীরিক শক্তি ও সাহসিকতাই তখন প্রধান গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত। আত্মশক্তিতে সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস জন্মাইয়া সকলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে

পারাই বীরত্ব ছিল। এই জন্য অবস্থার উপযোগী আলোচনা ও বিচার-শক্তিই মানসিক উৎকর্ষের লক্ষণ ছিল। সুতরাং (১) উপযুক্ত সময়ে কর্ম্ম করা, এবং (২) উপযুক্ত বিষয়ে যথোচিত পরামর্শ দান করাই হোমরীয় গ্রীকদিগের শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য ছিল। এ জন্য বিশেষ কোনও বিদ্যালয় বা শিক্ষাদাতার আবশ্যকতা ছিল না। রাষ্ট্র-শাসনের জন্য যে সাধারণ সভা ছিল, তাহাতে মতামত প্রকাশ করিতে যাইয়া রাষ্ট্রের মঙ্গলবিধায়ক পরামর্শ-প্রদান, এবং কর্ত্তব্য-সাধনের শিক্ষা লাভ হইত। শিক্ষার আদর্শ প্রকৃত কর্ম্মবীর ও যোদ্ধার সৃষ্টি। সুতরাং শিক্ষালয় মানবসমাজের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র।

সুতরাং রাষ্ট্রীয়-জীবনের বিকাশ, শরীরের পুষ্টি ও মানসিক উৎকর্ষ-সাধনই হোমরীয় শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান আদর্শ। গ্রীসের চরমোৎকর্ষের সময়েও এই সকল আদর্শের পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। অতএব যে সকল ভাব, আদর্শ ও প্রণালী পরিপুষ্ট গ্রীকসভ্যতার অঙ্গ ছিল, হোমরীয় যুগে সেই সকল সভ্যতা-গঠনোপযোগী উপকরণসমূহের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে। হোমরীয় কবিগণ যে সকল প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সমুদয়ই পরবর্ত্তী যুগসমূহে ভিন্ন ভিন্ন কারণে পুষ্টি-লাভ করিয়া গ্রীকসভ্যতার বিকাশ-সাধনের সহায়তা করিয়াছিল। এই যুগের (১) কর্ম্মশিক্ষা ও (২) আলোচনাশিক্ষা পরবর্ত্তী কালের গ্রীসের সর্ব্বত্র প্রচলিত শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের দ্বিবিধ বিভাগ—(১) ব্যায়াম-শিক্ষা, (২) সঙ্গীত (সাহিত্য) শিক্ষার মৌলিক কারণ।

প্রাচীন গ্রীসের জাতীয় শিক্ষা-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা;

শিক্ষার উদ্দেশ্য,—রাষ্ট্রের উন্নতিবিধান।

স্বাধীনভাবে বিকশিত গ্রীকশিক্ষাপদ্ধতির পৌর্ব্বাপর্য্য ও প্রকৃতি বিশেষ-ভাবে আলোচনা করিলে এই জ্ঞান জন্মে যে, প্রাচীন গ্রীকেরা রাষ্ট্রের কর্ম্মে সহায়তা করিবার উপযুক্ত হইবার জন্যই শিক্ষার আদর করিত। রাষ্ট্রের উন্নতিই শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল। এই লক্ষ্যের দ্বারাই শিক্ষালাভের সময়-বিভাগ, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ, শিক্ষার উপকরণ, বিদ্যালয়ের শাসন প্রভৃতি নির্দ্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইত। স্পার্টার রাষ্ট্রই একমাত্র শিক্ষালয় ও শিক্ষা-দাতা ছিল। এথেন্সে যদিও কার্য্যতঃ শিক্ষাবিস্তার সরকারের অধীন ছিল না বটে, প্লেটো, য়্যারিষ্টটল প্রভৃতি প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ স্পার্টার শিক্ষা-পদ্ধতিই আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি বলিয়া বিবেচনা করিতেন। বিদ্যালয়সমূহ ব্যক্তি-

গত সম্পত্তি ছিল বটে, এবং শিক্ষার ব্যয় পারিবারিকভাবে নির্ব্বাহিত হইত বটে, কিন্তু শিক্ষার্থীদিগের চরিত্র-গঠন ও সংযম-পালন সম্বন্ধে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকদিগকে রাষ্ট্রের নিয়মানুসারে চলিতে হইত। তদ্ব্যতীত পঠদশার অধিকাংশ কালই সমরশিক্ষা ও আইন শিক্ষায় ব্যয়িত হইত। সুতরাং কি স্পার্টা, কি এথেন্স, উভয় প্রদেশে রাষ্ট্রই শিক্ষাপদ্ধতির নিয়ন্তা ছিল, বলা যাইতে পারে। ব্যক্তির উপর রাষ্ট্রের আধিপত্য যতই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল, ততই এথেন্সের জাতীয়-জীবনে অবসাদ উপস্থিত হইতেছিল। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ ও স্বাধীনতা-প্রিয়তার বৃদ্ধির সহিত প্রাচীন গ্রীসের পুরাতন রাষ্ট্রগত সভ্যতার ক্রমিক লোপ হইয়াছিল।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ। (১) ব্যায়াম; (২) সঙ্গীত; (৩) ধর্ম্ম; (৪) নীতি।

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। (১) শারীরিক উৎকর্ষ সাধনোপযোগী ব্যায়ামশিক্ষা। স্পার্টায় এই শিক্ষাই প্রাধান্য লাভ করিয়া অপরবিধ শিক্ষার উন্নতির কণ্টক হইয়াছিল। এথেন্সের শিক্ষাপদ্ধতিতে ইহার বিশিষ্ট স্থান ছিল, এবং এথেন্সের পণ্ডিতেরাও ইহার আদর করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবিধ ব্যায়ামের অনুশীলন হইত। তদ্ব্যতীত যে বয়সে সমরশিক্ষাই প্রধান শিক্ষার স্থান অধিকার করিত, সেই সময়েও এই শারীরিক উৎকর্ষের প্রতি স্বভাবতঃই বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। (২) মানসিক-উৎকর্ষসাধনোপযোগী সঙ্গীতশিক্ষা। স্পার্টায় সঙ্গীত-চর্চ্চার উন্নতি হয় নাই। এথেন্সে বিবিধ দেশের সঙ্গীতজ্ঞ আসিয়া ইহার যথেষ্ট উৎকর্ষসাধন করিয়াছিল। সঙ্গীতবিদ্যা বলিলে সর্ব্ববিধ কলাবিদ্যা বুঝাইত। প্রথম হইতেই এথেন্সে কাব্যসাহিত্যের অনুশীলন হইত। ক্রমশঃ এই সাহিত্যশিক্ষার ব্যবস্থায় গণিত, জ্যোতিষ, ভাষা, ন্যায়, দর্শন, নীতি, জড়বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিদ্যাই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ধর্ম্মশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। জাতীয় সাহিত্যের মধ্যেই নীতি ও দেবতত্ত্ববিষয়ক যে সকল তথ্য পাওয়া যাইত, তাহাই তাহাদের ধর্ম্মশিক্ষার একমাত্র উপায় ছিল। তদ্ব্যতীত রঙ্গমঞ্চের অভিনয়, সাধারণ অট্টালিকাসমূহের প্রাচীরে ক্ষোদিত দেবদেবীর মূর্ত্তিসমূহ, দেবমন্দিরসমূহের প্রতিষ্ঠিত মর্ম্মর ও প্রস্তরমূর্ত্তিসমূহ, এবং বিশেষ বিশেষ তিথি উপলক্ষে বিবিধ যাগ-যজ্ঞসমূহ দেখিয়া, তাহাদের ধর্ম্মভাব উদ্বুদ্ধ হইত। সমাজে ও রাষ্ট্রে

হিতবিধায়ক বিবিধ কার্য্য করিতে করিতে তাহাদের নৈতিক জীবনের বিকাশ হইত। নৈতিক চরিত্রগঠনের প্রতি পরিবার ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারী-দিগের বিশেষ মনোযোগ ছিল।

শিক্ষার উপকরণ।

স্পার্টায় শিক্ষার বিশেষ কোনও উপকরণের প্রয়োজন হয় নাই। কোনও বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে হয় নাই। কোনও পুস্তকের আবশ্যকতা ছিল না। হাতে গণনা করিয়া গণিত শিক্ষা করা হইত। কোরামে দলবদ্ধ হইয়া নৃত্যগীতাদি শিক্ষা করিতে হইত। সুতরাং বাদ্য-যন্ত্রের প্রয়োজন বোধ হইত না। এথেন্সে এ সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। পুস্তক ও চিত্রবিদ্যার উপযোগী যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইত। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিক্ষার্থীদিগের উপবেশনের উপযুক্ত বেঞ্চ, টুল প্রভৃতি সরঞ্জামেরও অভাব ছিল না। সঙ্গীত-শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

শিক্ষার্থিগণ ; (১) কেবলমাত্র পুরুষজাতি।

স্পার্টায় বালিকাদিগকে বালকগণের ন্যায় শিক্ষালাভ করিতে হইত। কিন্তু এথেন্সে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি হয় নাই। পেরিক্লিসের যুগে কতিপয় বিদুষী রমণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে, থুসিদিদিসের কন্যা তাঁহার রচিত ইতিহাস সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা প্রবেশলাভ করে নাই।

(২) কেবলমাত্র স্বাধীন জাতি।

গ্রীসের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্কীর্ণতার অন্যতর লক্ষণ,—দাসদিগের শিক্ষা-লাভে অনধিকার। স্পার্টার হীলট জাতির কথা দূরে থাকুক, স্বাধীনতাপ্রিয় এথেন্সের অত্যুন্নত সময়েও দাসেরা শারীরিক কার্য্যের ও শিল্পবাণিজ্যের উপযোগী বলিয়া শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইয়াছিল। কেবলমাত্র স্বাধীন জাতিরই শিক্ষায় অধিকার, দাসজাতির মানসিক উৎকর্ষে কোনও অধিকারই নাই—এথেন্সের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিতেরাও অম্লানবদনে এই তথ্য প্রকাশ করিতেন।

শিক্ষার সময়-বিভাগ।

পঠদ্দশা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। (১) গৃহশিক্ষা,—সপ্ত বর্ষ পর্য্যন্ত পরিবারের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা। (২) নিম্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষা,—সপ্ত হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্ত। (৩) উচ্চশিক্ষা,—চতুর্দ্দশ হইতে অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত

কলেজের শিক্ষা। প্রধানতঃ সমরশিক্ষাই প্রথমাবস্থায় এই শিক্ষার অঙ্গ ছিল; পরে সোফিষ্টদিগের প্রভাবে সাধারণ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিম্ন শিক্ষার পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়াছিল। স্পার্টার দ্বিতীয় অবস্থা বহুকালব্যাপী ছিল। অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বালকবালিকাদিগকে সাধারণ আয়তনে বাস করিতে হইত। এবং ত্রিংশবর্ষবয়ঃক্রমকালে তৃতীয় অবস্থার শেষ হইত। বলা বাহুল্য, স্পার্টার শিক্ষাবিভাগে সামরিক-শিক্ষারই ক্রমিক বিকাশ ও উন্নতি হইত।

প্রাচীন গ্রীসের বিশেষত্ব; রাষ্ট্রের সামাজিক-জীবন-বিকাশেই ব্যক্তিগত জীবনের সম্পূর্ণতা ও সার্থকতা।

যে সমাজের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অনুসরণ করিয়া শিক্ষা-পদ্ধতির রূপান্তর-পরিগ্রহ প্রদর্শিত হইল, সেই সমাজের প্রকৃত জীবনীশক্তি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে নিহিত ছিল। রাষ্ট্রের উন্নতি অবনতিতেই জাতীয় উন্নতি, অবনতি সাধিত হইত। রাষ্ট্রের পুষ্টিসাধনই প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের লক্ষ্য ছিল। রাষ্ট্রীয় জীবনেই সকলে নিজ নিজ সত্তা অনুভব করিত। তাহাদের কোনও রাষ্ট্রবিচ্যুত ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র জীবন ছিল না। রাষ্ট্রের সামাজিক জীবনপ্রবাহের মধ্যে নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব বিসর্জ্জন করিয়া জাতীয় উন্নতি-সাধন করাই প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাহাদের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য, বিধি নিষেধ, সমস্তই রাষ্ট্রের মঙ্গলের দ্বারা পরিচালিত হইত। তাহারা শিক্ষালাভ করিত সমাজের উপকারের জন্য। তাহারা সাহিত্য চর্চ্চা করিত, সঙ্গীত শিক্ষা করিত, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে সহায়তা করিবার জন্য। শিল্পী, কবি, গায়ক, লেখক, ভাস্কর, যোদ্ধা, পণ্ডিত প্রভৃতি সকলেই সাধারণ তন্ত্রের বিবিধ উপকারসাধন করিবার জন্য নিজ নিজ শক্তির প্রয়োগ করিত; এবং ইহাকে বিচিত্র উপায়ে সুসজ্জিত ও ভূষিত করিবার উপযোগিতা লাভ করিবার জন্যই নিজ নিজ বিশেষ শক্তির বিকাশের জ[illegible] চেষ্টিত হইত। সাধারণের কর্ম্মে সময় দান করিতে না পারিলে, অথবা এতদুপ-যোগী শক্তির অভাব বোধ করিলে, তাহারা জীবন ব্যর্থ হইল মনে করিত।

বস্তুতঃ রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন করিতে যাইয়াই তাহারা ন্যায় শাস্ত্র, শব্দ শাস্ত্র, গদ্য সাহিত্য, সমালোচনা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিদ্যার অধিকারী হইয়াছিল। তাহাদের ওজস্বিতা, তাহাদের শিল্পনৈপুণ্য, তাহাদের কলাবিদ্যা, তাহাদের কারুকার্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়ই রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া বিকাশ প্রাপ্ত

হইয়াছিল। রাষ্ট্র তাহাদের ধর্ম্ম, সমাজ, ব্যবসায়, সাহিত্য, চিন্তা-পদ্ধতি প্রভৃতি জীবনেরসকল বিভাগই নিয়ন্ত্রিত করিত। ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রের নিয়ম-পালনই চরম লক্ষ্য মনে করিয়া জীবনের সার্থকতা উপলব্ধি করিত।

এই সভ্যতার মৌলিক কারণ— তাহাদের বিচিত্র সৌন্দর্য্যবোধ—স্বাতন্ত্র্যের বিনাশ

এইরূপে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনসমূহ বিশাল সামাজিক জীবনের মধ্যে নিমজ্জিত করাই তাহাদের নীতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল; তাহার প্রাধন কারণ এই যে, তাহারা সকল বিষয়ে সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্যের আদর করিত। এই সৌন্দর্য্যলিপ্সা তাহাদের শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বাহ্য-সুন্দর ও অন্তঃসুন্দর ব্যক্তিগঠনের উপায় উদ্ভাবন করাইয়াছিল। এই সামঞ্জস্য ও সৌষ্ঠবপ্রিয়তাই তাহাদিগকে মন্দিরপ্রতিষ্ঠায়, মূর্ত্তি-গঠনে, চিত্রকর্ম্মে ও বিবিধ স্থাপত্য কার্য্যে অনুপ্রাণিত করিত। এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা সঙ্গীতচর্চ্চা করিত। এই জন্যই মানব-শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মানব-চিত্তের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। এই জন্যই তাহারা ব্যক্তির জীবনের সকল কার্য্য ও চিন্তাসমূহকে এক কেন্দ্রে পরিচালিত করিয়া পরস্পরের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-ভাব প্রদানপূর্ব্বক জীবনের সামঞ্জস্যও শৃঙ্খলা আনয়ন করিবার চেষ্টা করিত। সঙ্গীত বিদ্যাকে অন্তরঙ্গের ব্যায়াম মনে করিয়া ইহার দ্বারা চিত্তের অসামঞ্জস্য ও বৈসাদৃশ্য দুরীভূত করিয়া সৌন্দর্য্য ও রমণীয়তা প্রদান করিতে উৎকণ্ঠিত হইত। এই সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাই তাহাদের রাষ্ট্রীয় সামাজিক-জীবন-প্রিয়তার মূল। এই জন্যই তাহারা সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ জীবন-সমূহকে রাষ্ট্রের সাধারণ জীবনের এক লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত করিয়া পরস্পরের মধ্যে ঐক্য, সামঞ্জস্য ও অঙ্গাঙ্গিভাব আনয়নের প্রয়াসী হইত। ইহার ফলে তাহারা রাষ্ট্রের সাধারণ উন্নতিতেই আপন আপন সম্পূর্ণতা উপলব্ধি করিত।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

মাদুরা।

আমরা মাদুরা নগরে তিন দিন অবস্থান করিয়া নগর দর্শন করিয়াছিলাম। দাক্ষিণাত্যের মধ্যে প্রধান ও বৃহৎ নগর। সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহার উচ্চতা ৪৪০ ফিট। লোকসংখ্যা ১০৫,৯৮৪। প্রাচীনকালে ইহা বহু দিন পর্য্যন্ত পাণ্ড্যবংশীয় নরপতিগণের রাজধানী ছিল।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে বংশশেখর এই নগরে তামিল চতুষ্পাঠীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাহা অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া মাদুরা নগরকে তামিল ভাষার কেন্দ্রস্থল করিয়া গিয়াছে। ভৈগৈ নদীর তীরে মাদুরা নগরী অবস্থিত। গ্রীক্ ও রোম্যান্ লেখকগণের পুস্তকেও এই ভৈগৈ নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নদীগর্ভে যে সমুদয় প্রাচীন রোমীয় ও গ্রীসীয় মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া অনুমান হয় যে, প্রাচীন সময়েও সুদুর পাশ্চাত্য দেশের সহিত দাক্ষিণাত্যবাসীদের বাণিজ্যাদি নির্ব্বাহিত হইত।

মাদুরা ষ্টেশনের অতি নিকটে একটি ডাকবাঙ্গলো আছে। সেখানে এককালে চারি জন লোক থাকিতে পারে। এ স্থানে যাতায়তের জন্য ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ী, ঝট্কা, গো-যান প্রভৃতি পাওয়া যায়। নগরের সমুদয় দ্রষ্টব্য পদার্থ তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইবার জন্য এখানে 'গাইড' (Guide) পাওয়া যায়। ইহাদিগকে প্রতি দিন ৩৲ তিন টাকা পরিশ্রমিক দিতে হয়। কৃষি ও সুকুমার শিল্পকলার জন্য মাদুরা ভারত-বিখ্যাত। এখানে মস্‌লিনের উপর স্বর্ণ ও রৌপ্য তারের কারু অতিশয় সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন হয়। মাদুরার কাষ্ঠের ও পিত্তলের নানারূপ কারু ভারতীয় সূক্ষ্ম-শিল্পের ও ভারতীয় শিল্পীর অপূর্ব্ব কলা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ এই সকল কারুর সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়া থাকেন। এখানকার কর্ম্মকারগণের স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুও বিশেষ প্রশংসনীয়। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধান্য ও কদলীই প্রধান।

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ও রবিবার এখানে হাট বসে। মাদুরার 'চৈত্র মেলা' বিশেষ বিখ্যাত। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে এই মেলা হয়। পৌষ ও মাঘ মাসে যে মেলা বসে, তাহাতেও দাক্ষিণাত্যের নানা জেলার অধিবাসিবৃন্দ সমবেত হন।

দেবমন্দিরের কথা।

মাদুরার সর্ব্বপ্রধান দেব-মন্দির রেলওয়ে-ষ্টেশনের প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। এই দেবালয়টি দুই ভাবে বিভক্ত। পূর্ব্বদিকবর্ত্তী মন্দিরে মীনাক্ষী :(পার্ব্বতী) দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, এবং পশ্চিম দিকের মন্দিরে "সুন্দরেশ্বর" নামক শিবমূর্ত্তি বিরাজমান। জনপ্রবাদ এইরূপ যে, রঘুকুল-তিলক শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে এই সুন্দরেশ্বর মহাদেবের পূজা করিয়াছিলেন। মীনাক্ষী দেবীর মন্দিরের তোরণ দিয়া এই মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের নিকটে একটি 'মণ্ডপম্' আছে। তাহার নাম 'অষ্যলক্ষ্মীমণ্ডপম্'। এই 'মণ্ডপমে' অষ্টৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী অষ্ট লক্ষ্মীর আটটি বিভিন্ন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মণ্ডপমের উপরিভাগে নানাপ্রকার দেব দেবীর মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। তন্মধ্যে ভগবতীর জন্ম, শিবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ, কার্ত্তিকেয়ের (সুব্রহ্মণ্য) জন্ম, মহাদেবের রাজত্বগ্রহণ; ইত্যাদি বহু পৌরাণিক চিত্র অতি সুন্দর। মণ্ডপমের শেষাংশে একটি দ্বার। দ্বারের বাম পার্শ্বে গণেশের বিশাল মূর্ত্তি বিরাজিত। তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে দেব-সেনাপতি ষড়ানন কার্ত্তিকেয়ের মূর্ত্তি। এই দ্বার অতিক্রম করিয়া একটি বারান্দায় প্রবেশ করিতে হয়। সেখানে মহাদেবের শবর-মূর্ত্তি ও ভগবতীর শবরী-মূর্ত্তি অঙ্কিত। এই দরদালানটি অতিক্রম করিয়া যে বৃহৎ মণ্ডপমে প্রবেশ করা যায়, উহা মিনাক্ষীনায়ক নামধারী নায়ক রাজাদের প্রধান অমাত্য কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহা মন্দিরস্থ হস্তীর অবাসস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মন্দির হইতে বাহির হইলেই সম্মুখে একটী পিত্তলনির্ম্মিত দ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বারটি অত্রত্য 'শিবগঙ্গা'র জমীদার মহাশয় দান করিয়াছেন। এই মন্দিরে প্রতিদিন আরতির পূর্ব্বে দশ হাজার তেলের বাতি প্রতি রাত্রিতেই দেওয়া হয়। আর পর্ব্বোপলক্ষে একলক্ষ দীপ জ্বলে। দ্বারের নিকটস্থ দীপাধারে প্রদীপ জ্বলে। এই দ্বারের পর একটি অন্ধকার মণ্ডপম্। সেই মণ্ডপে মহাদেবের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন বহু মূর্ত্তি ক্ষোদিত আছে। এই মণ্ডপমের সন্নিকটেই পট্টমোরাই বা স্বর্ণ-পদ্ম পুষ্করিণী। ইংরেজেরা ইহাকে Golden-Lotus tank বলেন। এই জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে প্রাচীর। তাহাতে মহাদেবের মাহাত্ম্যপ্রকাশক অলৌকিক লীলা অঙ্কিত আছে। এই সরোবরের বাম পার্শ্ব দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই সুবর্ণমণ্ডিত মন্দির-

মধ্যে ও প্রাচীর-গাত্রে শিব, গণেশ, কার্ত্তিক ইত্যাদি বহু দেব দেবীর সুন্দর সুগঠিত মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। এ স্থানের 'শতস্তম্ভ-মণ্ডপম্' অবশ্য-দর্শনীয়। মণ্ডপমের এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র প্রাচীরে বেষ্টিত স্থানে নবগ্রহের মূর্ত্তি। মধ্যে তেজঃপুঞ্জ দিবাকরের মূর্ত্তি ও তাহার চারি দিকে অষ্টগ্রহের মূর্ত্তি ক্ষোদিত। এই স্থানের মন্দির, মণ্ডপম্ ইত্যাদি পরম রমণীয় ও কারুকার্য্য-খচিত। ভাষার এমন শক্তি নাই যে, তাহার যথাযথ বর্ণনা করিয়া স্বাভাবিক চিত্র পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে পারি। পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তিও মণ্ডপের এক স্থানে ক্ষোদিত দেখিলাম।

ঐতিহাসিক তত্ত্ব।

মাদুরার ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবধানযোগ্য। পাণ্ড্য রাজাদের পরে মাদুরা যোড়শ শতাব্দীতে বিজয়নগরের হিন্দু নরপতিগণের অধিকৃত হয়। তাঁহারা নায়কবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ নায়ককে মাদুরার শাসনকর্ত্তার পদে বরণ করিয়া মাদুরায় প্রেরণ করেন। এই বিশ্বনাথই নায়ক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইহাঁর বংশধর ত্রিমালা নায়ক (১৬২৩—৫৭) মাদুরা নগরীতে সুন্দর নয়নাভিরাম সৌধমালায় সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় রাজ্য নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে চান্দসাহেব মাদুরা অধিকার করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে কর্ণাটিকের নবাব ইংরেজদের হস্তে মাদুরা সমর্পণ করেন।

যাঁহারা মাদুরার দৃষ্টিরম্য মন্দিরসমূহের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের হৃদয় যে কত মহান্ ও কবিত্বময় ছিল, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়! দূর হইতে ইহাদের অম্বরবিচুম্বিনী চূড়া সকল দৃষ্টি-পথে পতিত হইলে হৃদয়ে আনন্দের অপূর্ব্ব বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া থাকে।

তিরুমলের 'ছত্রী' বা 'পড়ুমণ্ডপ' মাদুরার সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর কীর্ত্তি। এই ছত্রী উপাস্যদেব সুন্দরেশ্বরের উদ্দেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিরুমল নায়ক ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। মাদুরায় কিংবদন্তী যে, সুন্দরেশ্বর দেব ভক্ত তিরুমলকে বৎসরে দশ দিবস করিয়া দর্শন দিতেন। চারি সারি স্তম্ভের উপর ছাদ। এই স্তম্ভাবলীর মধ্যবর্ত্তী পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে নায়ক-বংশোদ্ভব দশ জন রাজার প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিত। তিরুমল নায়কের মূর্ত্তির মস্তকের উপর চাঁদোয়া। তাঁহার বাম পার্শ্বে তদীয় সহধর্ম্মিণী তাঞ্জোর-রাজকুমারীর মূর্ত্তি। রেলওয়ে ষ্টেশনের প্রায়

দেড় মাইল পশ্চিমে তিরুমলয় নায়কের রাজপ্রাসাদ এখনও বিদ্যমান আছে। রাজপ্রাসাদের স্তম্ভ প্রভৃতি গ্রাণাইট প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে এ স্থানে জজ-আদালত ও গবর্মেণ্টের অন্যান্য আফিস হইয়াছে ভৈগৈ নদীর তীরে নগরের দক্ষিণে একটি অট্টালিকা দেখিলাম। ইহার নাম তমকাম। তিরুমলয় নায়ক ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এ স্থানে রোম দেশের (Gladiator) গ্ল্যাডিয়েটার ক্রীড়ার ন্যায় বন্য হিংস্র জন্তুর সহিত অস্ত্র-ক্রীড়কগণের যুদ্ধ হইত। বর্ত্তমান সময়ে এই অট্টালিকায় স্থানীয় কালেক্টার বাস করেন।

ষ্টেশনের তিন মাইল উত্তরে একটি 'তিপ্পাকুলাম' (পুষ্করিণী) আছে। এই জলাশয়ের মধ্যস্থলে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির ও তাহার চারি ধারে চারিটি প্রস্তরনির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্দর স্তম্ভ। এই পুষ্করিণী রাজভবন হইতে পূর্ব্ব-উত্তরে দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। ইহার প্রত্যেক দিক্ ১২০০ গজ দীর্ঘ। চতুর্দ্দিকে উৎকৃষ্ট গ্রাণাইট প্রস্তরে গঠিত সোপানাবলী। সর্ব্বোপরি গ্রাণাইট-প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি কলস। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে মনোহর উপদ্বীপ। সেই উপদ্বীপের চারি দিকও প্রস্তরে মণ্ডিত। দ্বীপের মধ্যস্থলে সুন্দর দেব-মন্দির। তাহার চারি কোণেও চারিটি ক্ষুদ্র, সুন্দর, শিল্পচাতুর্য্যময় দেব-মন্দির। এই দেবনিকেতন দুই মহল। মধ্যস্থলে পথ। তাহার উভয় পার্শ্বে নানাবর্ণ লতাগুল্ম। মন্দিরের উৎসবের সময় একদিন এই দেবালয় ও পুষ্করিণীর চারি দিকে এক লক্ষ প্রদীপ জ্বলিয়া থাকে। সে সময়ে পুষ্করিণীর নির্ম্মল সলিলপ্রবাহে দীপরাজির উজ্জ্বলালোক প্রতিফলিত হইয়া অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়। সে দিন প্রদোষসময়ে সুন্দরলিঙ্গ দেব মীনাক্ষীদেবীর সহিত সমাগত হইয়া তরীতে আরোহণ করিয়া এই তেপ্পাকুলমের বক্ষে বিহার করিয়া থাকেন। তখন পুষ্করণীর চারি তীরে সুবিশাল জন-সঙ্ঘ আনন্দ-ধ্বনি করিতে থাকে।

নানা কথা।

বৈশাখ মাসের শুক্লা পঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত মাদুরার সর্ব্বপ্রধান উৎসব হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র আসিয়া পূর্ণিমা তিথিতে এই সুন্দরেশ্বর শিবলিঙ্গের অর্চ্চনা করিতেন। সেই হইতে প্রতিবৎসর দ্বাদশদিবসব্যাপী উৎসব হইয়া আসিতেছে। স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস এই যে, পূর্ণিমা তিথিতে সুন্দরলিঙ্গের অর্চ্চনা

করিলে সংবৎসর অর্চ্চনার সুফল-লাভ হয়। এই উৎসবে প্রায় ত্রিশ চল্লিশ হাজার দর্শকের সমাগম হইয়া থাকে।

সহস্রস্তম্ভ-মণ্ডপের নিকটস্থ যে মণ্ডপে সুন্দরলিঙ্গ দেবের বসন্তোৎসব হয়, তাহার নাম বসন্ত-মণ্ডপ। ইহা মহারাজা তিরুমল নায়ক কুড়ি লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মণ্ডপটি দৈর্ঘ্যে ১০০ গজ ও প্রস্থে ২০ গজ। ইহার ছাদ ১২০ এক শত কুড়িটি প্রস্তর-স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত। প্রত্যেক স্তম্ভ ২০ ফিট উচ্চ। এই মণ্ডপের মধ্যে সলিলরাশি প্রবাহিত করিবার জন্য পয়ঃপ্রণালী আছে। যখন বৈশাখ মাসে শুক্লাপঞ্চমী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত দশদিবসব্যাপী উৎসব হয়, তখন ঐ পয়ঃপ্রণালী জলে পূর্ণ থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, ইহার উদ্দেশ্য,—শৈত্যবিধান।

দেবতার অলঙ্কার ও দেবালয়ের তৈজসপত্র প্রভৃতি দর্শনীয়। তৈজসপত্রের মূল্য পঞ্চাশ হাজার ও মণিমুক্তাদির মূল্য আনুমানিক দেড় লক্ষ টাকার অধিক। আমরা পূর্ব্বে যে তেপ্পাকুলামের উল্লেখ করিয়াছি, সেখান হইতে পাঁচ মাইল দূরে তিরুপরঙ্কুন্দ্রম্ সেকন্থ মলয়ের পার্শ্বদেশে এক শৈব-মন্দির আছে। ইহাও সুন্দর। ঝট্‌কায় ও গো-যান-যোগে এই স্থানে যাইতে হয়। স্থানটি নির্জ্জন।

পৌরাণিক তত্ত্ব।

স্থলপুরাণে এ স্থানের সুন্দরেশ্বর শিবলিঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে,—একদা দেবরাজ ইন্দ্র দেবনর্ত্তকীগণে পরিবৃত হইয়া অভিনিবেশ-সহকারে তাহাদের নৃত্যগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে দেবগুরু বৃহস্পতি তথায় উপনীত হন। দেবরাজ তৌর্য্যত্রিকে এমন মগ্ন ও তন্ময় হইয়া ছিলেন যে, বৃহস্পতিকে উপযুক্ত অভিবাদন ও সম্ভাষণাদি করিতে বিস্মৃত হইলেন। ইহাতে দেবগুরু আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিলেন, এবং দেবসভা হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক তপস্যার্থ গমন করিলেন। ইন্দ্র যথাসময়ে এই সংবাদ পিতামহ ব্রহ্মার গোচর করিলেন। পরে দেবরাজ পিতামহের উপদেশে ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরাকে দেবগুরুর পদে অভিষিক্ত করিলেন। এই ত্রিশিরা দৈত্যকুলের দৌহিত্র ছিলেন। তিনি আহুতি-প্রদানকালে গোপনে স্বীয় মাতামহ-কুলের মঙ্গলেচ্ছায় আহুতি প্রদান করিতেন। প্রকাশ্যে দেবতাগণের হিতাকাঙ্ক্ষী হইলেও গুপ্তভাবে তিনি দৈত্যকুলের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। ক্রমে ত্রিশিরার দৈত্যকুলপ্রীতি

প্রকাশিত হইয়া পড়িল। দেবরাজ ক্রোধবশে ত্রিশিরার মস্তক ছেদন করিলেন। ত্রিশিরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই জন্য ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইলেন। পরে দেবগণের সাহায্যে ইন্দ্র সেই পাপকে চারি ভাগ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন। তদবধি পৃথিবীতে উদ্ভিদে নির্য্যাস, রমণীর রজ, সলিলে ফেন ও ধরণীগর্ভে ক্ষারমৃত্তিকা অর্থাৎ সাজিমাটীর উৎপত্তি হইল।

এ দিকে ত্রিশিরার মৃত্যুতে ত্বষ্টা নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি বহু ক্লেশস্বীকার করিয়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। তাহার ফলে তাঁহার বৃত্র নামক এক মহাবলশালী পুত্র জন্মিল। কালে এই বৃত্র স্বর্গরাজ্য অধিকার করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে পাতালে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। পরে ইন্দ্র বহু যন্ত্রণাভোগের পরে, ভোগাবসানে মহামুনি দধীচির অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া বৃত্রকে সংহার করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গরাজ্য অধিকার করিলেন। বৃত্র-বধে পুনর্ব্বার দেবরাজকে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইতে হইল। তিনি নিরুপায় হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং স্বকীয় পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় জানিতে চাহিলেন। বৃহস্পতি তাঁহাকে পৃথিবী-পর্য্যটনের পরামর্শ দিলেন। দেবরাজ বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া কদম্ব-বনে উপস্থিত হইলেন। কদম্ব-বনে পদার্পণ করিবামাত্র তিনি ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন, এবং বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, এক পার্শ্বে এক অনাদি শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। দেবরাজ সেই মুহূর্ত্তেই বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া লিঙ্গ-মূর্ত্তির জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন, এবং লিঙ্গের সুন্দরেশ্বর নাম রাখিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব ইন্দ্রের অর্চ্চনায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিলেন। দেবরাজও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন, এবং যাহাতে প্রত্যহ তাঁহার পূজা করিতে পারেন, এই বর প্রার্থনা করিলেন। মহাদেব বলিলেন যে, "স্বর্গ এখন অরাজক; রাজ্যত্যাগ করিয়া প্রতিদিবস তাঁহার পূজা করিবার প্রয়োজন নাই। বৎসরান্তে প্রত্যেক বৈশাখী পূর্ণিমায় স্বর্গ হইতে আসিয়া পূজা করিলেই তুমি সমগ্র বৎসরের পূজার ফল লাভ করিবে।" তদবধি প্রত্যেক বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই মন্দিরে উৎসব হইয়া থাকে। সুন্দরেশ্বরের ইহাই পৌরাণিক ইতিবৃত্ত।

নগরের কথা।

বর্ত্তমান সময়ে মাদুরা এই জেলার প্রধান নগর। মাদুরায় সমুদয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণ বাস করেন। এই নগরেই জেলার সমস্ত অফিস আদালত বিদ্যমান। এ স্থানের ভাষা তামিল। এখানকার নব-নির্ম্মিত জেলখানা, সিবিল ও প্রসূতি-হাঁসপাতাল, জেলা-স্কুল ও আমেরিকান্ প্রোটেষ্ট্যাণ্ট মিশন বোর্ডিং বিদ্যালয় দেখিবার উপযুক্ত।

এ নগরের বায়ু শুষ্ক, উষ্ণ ও সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তনশীল। শীতকালেও মাদুরা অঞ্চলে দারুণ গ্রীষ্ম অনুভূত হয়। জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। জ্বরের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত অধিক। মধ্যে মধ্যে রামেশ্বরের যাত্রীদিগের জনতায় বিসূচিকারও প্রাদুর্ভাব হয়। মাদুরায় বর্ষারই প্রকোপ অধিক। ইংরাজ-শাসনে মাদুরার অনেক উন্নতি হইয়াছে। তিরুমলয় নায়কের ভগ্ন প্রাসাদ গবমেণ্ট নিজব্যয়ে সংস্কৃত করিয়া তন্মধ্যে রাজকীয় আফিস ইত্যাদি স্থাপন করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানগণ মাদুরা নগর আক্রমণ করিয়া সুন্দরেশ্বর দেবের মন্দিরের বহির্ভাগ ধ্বংস করিয়াছিল। তাহারা এই মন্দিরের চতুর্দ্দশটি চূড়া, গোপুর ও অন্যান্য মন্দির ইত্যাদি নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ববিৎ মহানুভব ফার্গুসন সেই ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন।

প্রাচীন বটবৃক্ষ।

এখানকার জজের বাঙ্গলোর হাতায় একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ আছে। তাহা দর্শন-যোগ্য। এই বৃহদায়তন বটের মূলদেশের বেড় প্রায় ৭০ ফিট। শাখা প্রশাখা ১৮০ ফিট পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

নাট্যাভিনয়।

এখানে প্রায় প্রত্যেক রাত্রিতেই নাট্যাভিনয় হইয়া থাকে। আমরা এক দিন অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রথম শ্রেণীর মূল্য আট আনা; দ্বিতীয় শ্রেণীর মূল্য ছয় আনা। আমাদের দেশের থিয়েটারের ন্যায়, দৃশ্যপট ও রঙ্গালয় সুসজ্জিত। এখানে পুরুষেরাই স্ত্রী-ভূমিকার অভিনয় করিয়া থাকে। রীতিমত ঐক্যতান-বাদনের পরে অভিনয় আরম্ভ হইল। দেখিলাম, রাজা, বিদূষক, রাণী, ভৃত্যবর্গ, এমন কি, রাস্তার মুটে মজুর পর্য্যন্ত গান করিতেছে। কথার অপেক্ষা গানই অধিক শুনিলাম। অনবরত দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত

বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদের গাইড্ মহাশয়কে নাটকীয় ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাদিগকে বলিলেন যে,—“এক রাজা বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার উপযুক্ত পুত্রের বিবাহের জন্য এক সুন্দরী রাজকুমারীর সহিত পুত্রের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন। পরিশেষে নিজেই সেই রূপসী রাজকন্যার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার সঙ্কল্প করেন। রাজকুমারের বিবাহের সম্বন্ধ যে স্থির করিয়াছিলেন, তাহা তিনি রাজধানীতে প্রকাশ করেন নাই। এ দিকে রাজকুমারী বিবাহসময়ে এই বৃদ্ধ নরপতিকে দেখিয়া তাঁহার গলে মাল্য অর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। ক্রমশঃ পিতার এইরূপ কুৎসিত আচরণের কাহিনী রাজকুমারের কর্ণগোচর হইল। রাজকুমার তখন অনন্যোপায় হইয়া কপোতের দ্বারা রাজকুমারীর নিকট পত্র প্রেরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন এই পত্রিকা-প্রেরণের উদ্যোগ চলিতেছিল, তখন আমিরা ট্রেণের সময় নিকটবর্ত্তী দেখিয়া ষ্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলাম। যদিও আমরা তামিল অভিনেতাদিগের অভিনয়ের এক বর্ণও বুঝিতে পারি নাই, তথাপি বলিতে পারি, প্রত্যেক অভিনেতার একই প্রকারের একঘেয়ে সুরের গানগুলি কর্ণপীড়ার উৎপাদন করিতেছিল।

আমরা রাত্রিযোগে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের উদ্দেশে মাদুরা নগরী পরিত্যাগ করিলাম। যিনি একবার মাদুরার দেবমন্দির ও সহস্রমণ্ডপ প্রভৃতির ভাস্কর-শিল্প ও চিত্র-চাতুর্য্য অবলোকন করিয়াছেন, তিনি জীবনে তাহা কখনও ভুলিতে পারিবেন না। লেখনীর এমন সাধ্য নাই যে, ভাষায় সেই অপূর্ব্ব শিল্পচাতুর্য্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি করিতে পারে। হায়! একদিন সোনার ভারতে সবই ছিল; কিন্তু আমরা কর্ম্মদোষে সে সব হারাইয়াছি। প্রাচীন ভারতের শিল্পচাতুর্য্যাদি দর্শন করিলে, হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ ও নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। নায়ক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ নায়কের সহকারী আর্য্য নায়কের প্রতিষ্ঠিত যে সহস্রমণ্ডপের কথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, বর্ত্তমান সময়ে উহাতে ৯৯৭টি স্তম্ভ বিদ্যমান আছে।

রেলপথ হইবার পর মাদুরার বাণিজ্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন সমগ্র দক্ষিণভারত ও সিংহল পর্য্যন্ত ইহার বাণিজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে চাউল, তামাক, কার্পাসবস্ত্র, সোরা, লবণ, নোনা মাছ, গন্ধদ্রব্য ও নানাবিধ মশলাই প্রধান।

মাদুরার অধিবাসিগণ সকলেই বিশুদ্ধ তামিল ভাষায় কথোপকথন করিয়া থাকে।

দেবার্চ্চনা সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, সর্ব্বপ্রথমে শিবগঙ্গাতীর্থের সলিল স্পর্শ করিয়া বিশ্বেশ্বর সুন্দরলিঙ্গের ও মীনাক্ষী দেবীর পূজা করিতে হয়। তাহার পর যাত্রীরা সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ, বসন্ত মণ্ডপ ইত্যাদি দর্শন করেন। মাদুরায় বাঙ্গালী যাত্রীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। এখানে অসংখ্য ছত্র ও হোটেল আছে। সুতরাং যাত্রীদিগকে আবাস ও আহারাদির কোনওরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

শ্রীধরণীকান্ত লাহিড়ী।

সহযোগী সাহিত্য।

কুমেরু প্রদেশ।

লেফ্‌টেন্যাণ্ট স্যাকল্‌টনের কাহিনী।

বিগত ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর সংখ্যক "রিভিউ অফ্‌ রিভিউ" পত্রে লেফ্‌টেন্যাণ্ট স্যাকল্‌টনের দক্ষিণমেরু-আবিষ্কারকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। "সাহিত্যে"র পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত সেই জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটির মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইল।

বিগত অক্টোবর মাসে পতাকাচিত্রিত, টেমস্‌-বক্ষোবিহারী একখানি ক্ষুদ্রায়তন সমুদ্রপোত দর্শন করিবার জন্য নদীতীরে প্রায় ত্রিশ সহস্র দর্শক সমবেত হইয়াছিলেন। ক্ষুদ্র পোতখানিতে আরোহণ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা প্রত্যেকেই এক শিলিং বা বারো আনা দর্শনীস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। পোতখানি আয়তনে ক্ষুদ্র; উহার আবাস-কক্ষগুলি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। কতিপয় উদ্ভিন্নযৌবন সারমেয়, একখানি হিমানী-উল্লঙ্ঘনোপযোগী চক্রবিহীন শকট (স্লেজ্‌) এবং একজোড়া বিনামা ব্যতীত দর্শনযোগ্য কিছুই তরণীতে ছিল না। কিন্তু চুম্বক যেমন অয়স্কান্ত মণিকে আকর্ষণ করে, এই ক্ষুদ্র পোতখানি তেমনই ইংরাজমাত্রকেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। তরণীখানির নাম 'নিমরড্‌'। এই পোতাশ্রয়ে লেফ্‌টেন্যাণ্ট স্যাকল্‌টন্‌ ও তদীয় সহচরবর্গ কুমেরুর জনহীন, ভীষণ, দুর্গম হিমসমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। একনিষ্ঠ কর্ম্মী, বীরহৃদয়, বন্ধুবৎসল আবিষ্কারকদিগকে দক্ষিণ মেরুর দ্বারপ্রান্তে পঁহুছিয়া দিয়াছিল বলিয়া 'নিমরড্‌' ইংরাজদিগের পবিত্র তীর্থ-স্থলরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

শুধু পোত-দর্শনের জন্যই যখন সহস্র সহস্র দর্শকের এরূপ প্রগাঢ় আগ্রহ দেখা যায়, না জানি লেফ্টেন্যাণ্ট স্যাকল্টনের বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য ও তাঁহার রচিত গ্রন্থ পাঠ করিবার নিমিত্ত কত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির কত গভীরতর আগ্রহ জন্মিবে।

লেফ্টেনাণ্ট স্যাকলটনের রচিত এই উপাদেয় গ্রন্থখানি মানবোচিত কীর্ত্তি-কলাপে পরিপূর্ণ। ইহাতে অলৌকিক কাহিনীর কোনও বর্ণনা নাই। দৃষ্ট-পদার্থের সমুজ্জ্বল বর্ণনা, উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টার বিবরণ, অথবা আবিষ্কারকেরা গন্তব্যপথে গমনকালে যে সকল বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, কিংবা তাঁহাদের জীবন যে পুনঃ পুনঃ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার বিভীষণ চিত্র ভাষার ঝঙ্কারে বর্ণনার বিচিত্র বর্ণরাগে এই গ্রন্থের কুত্রাপি ফুটিয়া উঠে নাই। নিরবচ্ছিন্ন তুষারমগ্ন কুমেরুর জনহীন প্রদেশে নিঃশঙ্কহৃদয় বীরগণ যে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, অতি সহজ ও সরল ভাষায়, আড়ম্বরহীন ও অতিরঞ্জনশূন্য বর্ণনায় সেই সকল কাহিনী এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। তথাপি এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে শিরায় শিরায় রক্তস্রোত চঞ্চল হয়, এবং ইংরাজমাত্রেরই হৃদয় গর্ব্বে ও পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, অর্দ্ধাশন, অনশন, অথবা নামমাত্র ভক্ষ্য বস্তুতে জীবনরক্ষা করিয়া তুষারঝটিকা-পীড়িত বীরগণ কিরূপে ব্যাদিতমুখ তুষারগহ্বরসমূহ অতিক্রম করিয়াছিলেন, আমাশয় পীড়া অথবা তুষারবাত্যাজনিত দৃষ্টিহীনতা এবং অসংখ্য প্রকার বাধাবিঘ্ন ও শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কিরূপে আবিষ্কারকেরা গন্তব্য স্থানের অভিমুখে দৃঢ়চিত্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এই গ্রন্থে তাহারই কাহিনী অতি সাধারণ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যখন আমরা পাঠ করি, হিমানীমগ্ন প্রাণিবর্জ্জিত বিরাট তুষারক্ষেত্রে উপনীত হইয়া অনশনক্লিষ্ট, শীতজর্জ্জরিতদেহ আবিষ্কারকেরা স্খলিতচরণে কম্পিত-দেহে তত্রত্য লঘুতর বায়ুমণ্ডল হইতে শ্বাসগ্রহণ করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন, তখন সবিস্ময়ে বলিতে ইচ্ছা করে, এত উদ্যম, এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা কিসের জন্য? শুধু দক্ষিণ মেরুর সন্নিকটে বৃটিশ বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিবার জন্যই এত ত্যাগস্বীকার—এত কষ্ট নহে কি?

গ্রন্থখানি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে শুধু যাত্রার আয়োজন ও অনন্তকালব্যাপী তুষাররাজ্যে কিরূপে উপনীত হইয়াছিলেন, আহার

বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে হিমনিবাসে তাঁহারা কিরূপে জীবনযাপন করিয়াছিলেন, এবং ইরবস পর্ব্বত কিরূপে বিজিত হইয়াছিল, তাহার কাহিনী। এই পর্ব্বতে এত কাল পরে এইবার সর্ব্বপ্রথম মনুষ্য-পদচিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে। অধ্যাপক ডেভিড্ চুম্বকমেরুর (Magnetic Pole) কিরূপে আবিষ্কার করেন, তাহারই বর্ণনায় তৃতীয় খণ্ড পূর্ণ। গ্রন্থের পরিশিষ্টে মেরু-আবিষ্কারের অভিযান-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থের যে খণ্ডে দক্ষিণ-মেরু-আবিষ্কার-অভিযানের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, সাধারণ পাঠকের সর্ব্বাগ্রে সেই অংশটুকু পাঠ করিতে আগ্রহ জন্মিবে। সাধারণ দিনলিপির (ডায়েরী) আকারে উহা লিখিত। লেফ্‌টেন্যাণ্ট স্যাকলটন্ দিনের পর দিন এই বিস্ময়োদ্দীপক, বিচিত্র যাত্রার কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। এই বাহুল্যবর্জ্জিত সংক্ষিপ্ত গ্রন্থখানি যে কুমেরু-আবিষ্কারের মহাকাব্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

প্রত্যাবর্ত্তনের দৃঢ় সঙ্কল্প কি প্রশান্তভাবেই তাঁহারা দমন করিয়াছিলেন! তাঁহারা বীরের মত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন বটে কিন্তু গ্রন্থের ভাষায় তাঁহাদের নিদারুণ আশাভঙ্গজনিত ক্ষোভের চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

"৬ই জানুয়ারী—বস্ত্রাবাস ও স্লেজ-শকট সহ এইবার আমাদের শেষ যাত্রা। আগামী কল্য কিছু আহার্য্য সহ বস্ত্রাবাস ত্যাগ করিব, এবং দক্ষিণাভিমুখে যত দূর পারি, অগ্রসর হইয়া পতাকা প্রোথিত করিব। আজ রাত্রিতে আমরা ৮৮°৭ ডিগ্রী দক্ষিণে রহিয়াছি। তুষারঝটিকা প্রবলবেগে বহিতেছে।

"আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া যদি আজ আমাকে আমার হৃদয়ভাব লিপিবদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে আমি কখনই তাহা ভাষার দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিব না। কিন্তু এই গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি, সে বিষয়ে কোনও ক্রটী হয় নাই। আমরা কি করিব, প্রাকৃতিক শক্তি আমাদিগকে আর অগ্রসর হইতে দিতেছে না। আর লিখিতে পারিতেছি না।"

এই লোকবিশ্রুত মেরু-আবিষ্কারের অভিযানে চারি ব্যক্তি ছিলেন। লেফ্‌টেন্যাণ্ট স্যাকলটন দলের নেতা; জে. বি. এডাম্‌স্ তাঁহার সহকারী; তৃতীয় ই. সি. মার্শাল, ইনি ডাক্তার। চতুর্থ, এফ্. ওয়াইল্ড। শুধু কুকুরের উপর নির্ভর না করিয়া আবিষ্কারকেরা শ্লেজগাড়ী টানিবার জন্য সাইবীরীয়ার

টাটু ঘোড়া ব্যবহার করিয়াছিলেন। কুকুর অপেক্ষা টাটুগুলির দ্বারা কার্য্যেরও অনেক সুবিধা হইয়াছিল। যদি শেষ ঘোটকটি তুষারস্তূপের ফাটলের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া না যাইত, তাহা হইলে তাঁহারা দক্ষিণ মেরুতে নিশ্চয়ই উপনীত হইতে পারিতেন। খাদ্যবস্তুর অভাবেই তাঁহারা শেষ লক্ষ্যে পঁহুছিতে পারেন নাই।

মেরু-আবিষ্কারকের কথা বলিলেই মনে হয়, তিনি যেন বহু প্রকারের গরম, মোটা, লোমশ ও পশমী বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু লেফ্‌টেন্যাণ্ট স্যাকল্‌টন ও তদীয় সহচরবর্গের বিষয় পাঠ করিলে জানা যায় যে, তাঁহাদের বেশভূষা সে প্রকারের নহে। তাঁহাদের গাত্রে একটা করিয়া মোটা পশমী শার্ট, একটি ওয়েষ্ট-কোট, এবং একটা গরম কোট। পরিধানে মোটা ট্রাউসার, এবং ঢিলে পাজামা। ইহারই সাহায্যে তাঁহারা প্রধানতঃ শীতনিবারণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত বৃষ্টি ও বাতাস হইতে আত্মরক্ষা করিবার উপযোগী পাতলা গোছের 'ওয়াটার-প্রুফ্' বস্ত্রও এক প্রস্থ তাঁহাদের সহিত ছিল। সমুদ্রগমনোপযোগী নাবিকদিগের ব্যবহার্য্য পরিচ্ছদ ও পশমী মোটা গাত্রবস্ত্র তাঁহারা আদৌ সঙ্গে লয়েন নাই। কেবল হস্তে তাঁহারা পশমী দস্তানা ব্যবহার করিতেন। কয়েক জোড়া করিয়া মোটা পশমী মোজা ও তদুপরি বল্‌গাহরিণের চামড়া দ্বারা নির্ম্মিত জুতা তাঁহাদের পায়ে ছিল। তাঁহাদের পরিচ্ছদও অতি সামান্যই ছিল, এতদ্ব্যতীত অনেক সময়ে একটি-মাত্র পাজামা ও একটি গরম শার্ট পরিয়াই তাঁহারা বরফের উপর দিয়া শ্লেজ-গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতেন। রাত্রিকালে পাজামা পরিয়া পশম দ্বারা আবৃত নিদ্রার উপযোগী বৃহৎ ব্যাগের মধ্যে ঘুমাইতেন।

এই হিমময় ক্ষেত্রে সূর্য্যরশ্মির প্রভাব কিরূপ, তাহা স্যাকল্‌টন্ মহোদয়ের বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায়। অশ্বদেহের যে পার্শ্বে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইত, সেই দিক স্বেদজলে ভিজিয়া যাইত; কিন্তু যে পার্শ্বে সূর্য্যরশ্মি পড়িত না, সে দিকের কেশরাজি পর্য্যন্ত জমিয়া বরফ হইয়া থাকিত। টাটুঘোড়া-দিগের মধ্যে যে অধিক শ্রান্ত ও কার্য্যের অনুপযোগী হইয়া পড়িত, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহাকে বধ করা হইত। কোনও প্রকার প্রাণিভোজী জন্তু সে প্রদেশে ছিল না বলিয়াই আবিষ্কারকেরা মৃতদেহ বরফের উপর ফেলিয়া রাখিয়া অগ্রসর হইতে পারিতেন, এবং প্রত্যাবর্ত্তনের সময় সেই মাংস

দক্ষিণাভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া তাঁহারা বহুকষ্টে দশ সহস্র ফুট উচ্চ এক বিশাল ভূমিতে উপনীত হন। শেষ কয়েক দিবস তাঁহারা প্রবল তুষার-বাত্যায় পীড়িত হইয়াছিলেন। এই মালভূমিতে আরোহণকালে তাঁহাদিগকে একটি চির-নীহারমগ্ন নদীর উপর দিয়া যাইতে হইয়াছিল। আবিষ্কারকেরা অক্ষতদেহে কিরূপে এই বিপদসঙ্কুল তুষার-নদী পার হইলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। লেফ্‌টেন্যাণ্ট স্যাকলটন বলেন যে ভগবানের অনুগ্রহেই তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে এমন ভয়ঙ্কর স্থান উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলেন। এই বরফমগ্ন নদী উত্তীর্ণ হইয়াই স্যাক্‌লটন লিখিয়াছিলেন,—

"বড় বড় 'ফাটল' যুক্ত পঞ্চাশৎক্রোশব্যাপী বরফের উপর দিয়া আমরা ছয় সহস্র ফুট উচ্চ বরফ-নদীর উপরে উঠিয়াছি। এত উচ্চ হিমানীমগ্ন নদী জগতের কুত্রাপি নাই। আর একটি ফাটলযুক্ত ঢালু বরফস্তূপ অতিক্রম করিতে পারিলেই আমরা মালভূমিতে পঁহুছিতে পারিব। ভগবানের অসীম দয়া, আমরা সকলেই এখনও অক্ষতদেহ সুস্থ ও কর্ম্মক্ষম রহিয়াছি।"

বরফ-গুহা অর্থাৎ ফাটলের উপর দিয়া পথ অতিবাহন অতীব ভয়ঙ্কর, এবং বিপজ্জনক ব্যাপার। মিঃ ওয়াইল্‌ড বলেন যে, অর্দ্ধ-বরফ অর্দ্ধ-তুষারে আচ্ছন্ন ভীষণ নদী পার হইবার সময় তাঁহাদের মনে হইতেছিল, যেন তাঁহারা কোনও রেলওয়ে ষ্টেশনের কাচমণ্ডিত ছাদের উপর দিয়া চলিয়াছেন।

"আসন্ন বিপদ জানিয়াও আমাদের হৃদয়ে কোনও প্রকার শঙ্কা উদিত হয় নাই। আমাদের হৃদয় তখন জড়বৎ, আশা-ভয়-শূন্য। বরং অনাবৃতমুখ বড় বড় তুষারগুহা দেখিতে পাইলে আমাদের আনন্দ হইত। তুষারাচ্ছন্ন ফাটল অপেক্ষা উন্মুক্ত, ব্যাদিতমুখ বরফগুহা-সমূহ দেখিলে বরং আশার উদয় হয়।"

তাঁহারা পুনঃ পুনঃ তুহিনাবৃত 'প্রচ্ছন্ন' বিবরে পতিত হইতেন বটে, কিন্তু শ্লেজ-গাড়ীর গুরুত্ব ও তাহার দৃঢ় অশ্বরজ্জুবন্ধনীর সাহায্যে তাঁহারা আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে বহুবার রক্ষা পাইয়াছিলেন। একবার মিঃ ওয়াইল্‌ড অশ্ব ও শকট সহ একটা বরফ-গুহার মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া বন্ধুবর্গ ত্বরিতগতিতে সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, গাড়ীর অগ্রভাগ ও টাটু বরফ-গুহার মধ্যে নিপতিত হইয়াছে। ওয়াইল্‌ড [illegible] এক প্রান্ত আঁকড়িয়া ধরিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন।

টাট্টু টিকে আর দেখা গেল না। ওয়াইল্ডকে তাঁহারা ধরাধরি করিয়া সেই সঙ্কটসঙ্কুল অবস্থা হইতে উদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পায়ের মোজা আর পাওয়া গেল না।

"ওয়াইলড্ এ যাত্রা বড় বাঁচিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া পশ্চাতে আসিতেছিলেন। আমরা তুহিনাবৃত একটা বরফ-গুহা পার হইয়াছিলাম, কিন্তু অশ্বের ভারে উপরের পাতলা তুষারাচ্ছাদন ভাঙ্গিয়া গেল; মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত শেষ হইয়া গেল। আমরা উপুড় হইয়া গুহার অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করিলাম, কিন্তু অশ্বের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। সেই গুহা অতলস্পর্শ বলিয়া আমাদের মনে হইল।"

তাঁহারা যে পথে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই দিক দিয়াই পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ফিরিবার সময় তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, স্লেজ-গাড়ী ও টাটু ঘোড়া সহ তাঁহারা যে সকল বরফ-গুহার উপর দিয়া নিশ্চিন্তভাবে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের উপরিস্থিত পাত্‌লা তুষারাবরণ গাড়ী ও ঘোড়ার ভারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, এবং বিস্তৃত অতলস্পর্শ ফাটলসমূহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। যদি একবার সেই পাত্‌লা তুষারাবরণ ভাঙ্গিয়া যাইত, তাহা হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য হইত! যে দিন পবন অনুকূলভাবে বহিত, সেই দিন স্লেজ-গাড়ীতে পাল তুলিয়া দিয়া তাঁহারা ২৯ মাইল পথ বরফনদী ও বরফ-গুহার উপর দিয়া অতিবাহন করিতেন। ইহার বেশী পথ তাঁহারা কোনও দিন অতিক্রম করিতে পারেন নাই। যে দিন খুব কম হইত, সে দিন তিন মাইল পথ পর্য্যটন করিতেন।

আবিষ্কারকেরা একটা নূতন অদ্রিমালার আবিষ্কার করেন। সে দিন রোজনামচায় এইরূপ লিখিত ছিল ঃ—

"সাধারণভাবে দেখিতে গেলে এই পর্ব্বতসমূহ তেমন সুদৃশ্য নহে। কিন্তু তাহাদের কর্কশ ও রুদ্র মূর্ত্তিতে একটা মহিমশ্রী পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের বিরাট দেহে মনুষ্যপদচিহ্ন কখনও পতিত হয় নাই, এবং শীতজর্জ্জ হিমানী মণ্ডিত এই জনহীন দেশে আমরা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কোনও মানব তাহাদিগকে দেখিয়া নয়ন সার্থক করে নাই।"

দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইবার সময় তাঁহাদের পরস্পরের বাক্যালাপ করিবার আদৌ সুযোগ হয় নাই। কিন্তু প্রত্যাবর্ত্তনকালে,—তখন বায়ু

সেই সময় আহার্য্য-সংক্রান্ত বিষয়েরই আলোচনা হইয়াছিল। কারণ, তখন খাদ্যই একমাত্র আলোচ্য বিষয়। লেফটেনাণ্ট স্যাকলটন লিখিয়াছেন,—

"আমাদের উভয়পার্শ্বস্থ বিরাট, বিশাল, অভ্রভেদী পর্ব্বতমালার বিচিত্র জ্যোতি, অথবা যে সুবিস্তীর্ণ পর্ব্বত-নদীর উপর দিয়া অতিকষ্টে আমরা চলিতেছিলাম, তাহার মহিমশ্রী আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করিতে পারে নাই। মানব যখন ক্ষুধার্ত্ত হয়, এবং আহার্য্য যখন ফুরাইয়া আসে, তখন তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার সে শক্তি থাকে না। মানব তখন বহুপ্রাচীন বর্ব্বর-যুগের লোকের মত শুধু আহারের সন্ধানেই ফেরে। সে সময়ে আমি ভাবিতাম, সভ্যতালোকদীপ্ত বড় বড় নগরের দুর্ভিক্ষপীড়িত দরিদ্র নরনারীর অনশনক্লেশ কি আমাদেরই অনুরূপ? কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, তাহাদের সহিত আমাদের তুলনা হইতে পারে না। কারণ, কোনও খাদ্যদ্রব্য দৃষ্টিগোচর হইলে আমরা ইচ্ছামত তাহার ব্যবহার করিতে পারি। পৃথিবীর কোনও রাজবিধান সে বিষয়ে আমাদের বাধা জন্মাইতে পারে না। কিন্তু নগরবাসী দরিদ্র বুভুক্ষু নরনারীর সে সুবিধা নাই। নগরের দুর্ভিক্ষপীড়িত দুঃখী ক্রমে ক্রমে নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; কিন্তু আমরা তখনও সবল ও কর্ম্মক্ষম।"

পুরোভাগে গমনকালে আবিষ্কারকদিগের মধ্যে নবোদ্ভাবিত আহার্য্য লইয়া বিলক্ষণ বাগ্‌বিতণ্ডা হইত। শীতনিবাসে উপনীত হইলে পর প্রচুরপরিমাণে নানাবিধ খাদ্যের আয়োজন করা যাইবে, এই সকল বিষয় তাঁহারা কেবল কল্পনা করিতেন। লেফ্‌টেন্যাণ্ট স্যাকলটন লিখিয়াছেন,—

"যাঁহারা কখনও দুর্ভিক্ষ ও অনশনজনিত নিদারুণ ক্লেশ অনুভব করেন নাই, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই ব্যবহার অত্যন্ত অসভ্যতা-সূচক বলিয়া বোধ হইবে, এবং আমাদিগকে হয় ত তাঁহারা অত্যন্ত উদরপরায়ণ বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষুধার যন্ত্রণা মানুষকে আদিম কালের অসভ্যতার স্তরে নামাইয়া দেয়। যখন আমরা পরস্পর, কে কিরূপ গুরুতর ভোজন করিয়া লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিব, এই বিষয়ের আলোচনা করিতাম, তখন কাহাকেও তজ্জন্য উপহাস বা বিদ্রূপ করিতাম না। গুরুভোজন সম্বন্ধে আমরা বাস্তবিকই কৃতনিশ্চয় হইয়াছিলাম। যেখানে খাদ্যদ্রব্য সুপ্রতুল, এমন কোনও স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র আমরা কি কি আহার করিব, তাহা আমাদের ডায়েরীর শেষভাগে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।"

কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া ক্রমাগত অর্দ্ধাশনে থাকিয়া পর্য্যটকদিগের ধৈর্য্য শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছিল। তাঁহাদের আহার্য্যবিভাগকালের বিবরণ হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যায়। লেফটেন্যাণ্ট স্যাকলটন বলেন,—

"অনেকক্ষণ ধরিয়া আমরা বিসকুট খাইতাম। যাহাতে উহা শীঘ্র না ফুরাইয়া যায়, সে বিষয়ে সকলেরই ইচ্ছা সমান প্রবল ছিল। শয়নকালে ভোজন করিব বলিয়া আমরা সকলেই অংশের বিসকুট হইতে এক এক টুকরা বাঁচাইবার চেষ্টা করিতাম; কিন্তু তাহা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিয়াছিল। ভোজনকালে যদি কাহারও হস্ত হইতে বিস্কুটের টুকরা নিম্নে পড়িয়া যাইত, আর এক জন তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহা দেখাইয়া দিতেন। বিস্‌কুটের অধিকারীকে উহা কুড়াইয়া লইতে হইত। ক্ষুদ্রতম অংশও নষ্ট হইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না।

"আহার্য্য-পরিবেশনের সময় আমরা পিঠ ফিরাইয়া থাকিতাম। আমাদের ধারণা ছিল, এইরূপ করিলে খাদ্য সকলের ভাগে সমানরূপে পড়িবে। পাচক বিস্‌কুট চারি ভাগে সাজাইয়া রাখিতেন। এক জন যদি বলিয়া উঠিতেন, এক ভাগে বিসকুট কম হইয়াছে, এবং অন্যান্য সকলে যদি তাঁহার বাক্যের অনুমোদন করিতেন, তাহা হইলে, খাদ্যদ্রবাদি পুনরায় বিভক্ত হইত। এইরূপে আমরা সকলেই যখন স্থির করিতাম, এইবার ঠিক ভাগ করা হইয়াছে, তখন আমাদের মধ্যে এক জন পিঠ ফিরাইতেন। তখন এক জন একটা ভাগ দেখাইয়া বলিতেন, 'এটা কাহার?' যিনি পিঠ ফিরাইয়া থাকিতেন, তিনি কিছু দেখিতে পাইতেন না, সুতরাং তিনি এক জনের নাম করিতেন। এইরূপে খাদ্যদ্রব্যাদি প্রত্যহ ভাগ করা হইত। কিন্তু তথাপি আমাদের প্রত্যেকেরই মনে হইত যে, আমার ভাগই কম।"

পাচকের কার্য্য করাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হইয়াছিল। তাঁহার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। বিশেষতঃ, যে দিন হইতে টাটু ঘোড়ার মাংস আমরা ভোজন করিতে লাগিলাম, সে দিন হইতে পাচকের অবস্থা আরও সঙ্কট-সঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। শক্ত মাংস কেহই তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করিতে চাহিতেন না। সুতরাং পাচককে পরিবেশন সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইত। যাহা হউক, মোটের উপর টাটুর মাংস মন্দ

যত দিন মাংস সুপ্রচুর ছিল, ততদিন তাঁহারা পর্য্যটনকালে জমাট কাঁচা মাংস লেহন করিতেন। অবশেষে যখন মাংসের ভাণ্ডার কমিয়া আসিল, তখন কেহই আর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অধিক খাইতে পাইতেন না। লেফ্‌টেন্যাণ্ট স্যাকলটন বলেন যে, যখন তাঁহারা শুধু মাংসভোজনেই জীবনধারণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের শাক শবজী ও অন্যান্য শস্য-সম্ভব আহার্য্যের স্পৃহা বলবতী হইয়াছিল। "বাস্তবিক যখনই আমরা কোনও নির্দ্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য ভোজনে বঞ্চিত হই, তখনই তাহার স্পৃহা বলবতী হয়! প্রকৃতির গতিই এইরূপ।" একদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর একটি পরিশ্রান্ত অশ্বকে গুলি করা হইল। তাহার জীবনীশক্তি ছিল না বলিলেই হয়। প্রত্যাবর্ত্তনকালে ইহারই মাংস ভোজন করিয়াছিলেন বলিয়া আবিষ্কারকেরা আমাশয় রোগে পীড়িত হইয়াছিলেন।

"দন্ত-উৎপাটনোপযোগী কোনও প্রকার যন্ত্র, অথবা কাঁচি তাঁহারা সঙ্গে লইয়া যান নাই। সুতরাং শ্মশ্রুরাজি ছাঁটিয়া ফেলা, অথবা প্রয়োজনমত দন্ত-উৎপাটন কার্য্য একেবারেই স্থগিত ছিল। সুতরাং তাঁহাদের নিশ্বাসের উত্তপ্ত বায়ুর সহিত বাহিরের তুষারশীতল বাতাসের সংমিশ্রণে উৎপন্ন জলকণা গুম্ফ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু বাহিয়া কোটের উপর পড়িত। জলকণা সেই-খানে পড়িয়াই আবার জমিয়া যাইত। তখন কোট খুলিয়া রাখাও বড় কষ্টকর বলিয়া তাঁহাদের বোধ হইত। ওয়াইল্‌ড দন্তরোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। মার্শাল বহু চেষ্টার পর অতিকষ্টে তাঁহার সেই দন্তটি উৎপাটিত করিয়া দেন।

তিন মাস কালের মধ্যে কেবল খৃষ্টজন্মোৎসবের দিন তাঁহারা উদর পুরিয়া আহার করিতে পাইয়াছিলেন।

ডায়েরীর এক স্থলে লিখিত আছে—"মানব-কোলাহল-মুখরিত জগৎ হইতে আমরা বহু দূরে রহিয়াছি। গৃহ ও পরিজনদিগের চিন্তা আজ আমাদের মনে জাগরূক। সর্ব্বদাই তাহাদের কথা মনে পড়িতেছে। তুষারাচ্ছন্ন বরফ-বিবরে পড়িতে পড়িতে কয়েকবার রক্ষা পাইয়াছি। গৃহের ও স্ত্রী পুত্রদিগের সম্বন্ধে চিন্তা সেই সময়ে বাধা পাইয়াছে। এখানকার কার্য্য শেষ হইলেই তাহাদিগকে আমরা দেখিতে পাইব!"

ক্রমাগত তুষারের উপর পর্য্যটনে পাদদেশ বিকল হইয়া পড়িবার

দলের কাহারও না কাহারও পা ধরিয়া যাইত। 'স্লিপিং ব্যাগে'র মধ্য হইতে তিনি শীত-বিবশ চরণখানি বাহির করিয়া অপর এক জন অনুরূপ পীড়িতের শার্টের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দিতেন। এইরূপে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর ও নানারূপ শুশ্রূষায় পা আবার কর্ম্মক্ষম হইত।"

১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে লেফ্‌টেন্যাণ্ট স্যাকলটন লিখিতেছেন,—"আজ আমার জন্মদিন। পাইপে ব্যবহৃত চূর্ণ-তামাক একখানা মোটা কাগজে সিগারেটের আকারে পাকাইয়া এক জন আমাকে উপহার দিলেন। সিগারেটের ধূম বড়ই মিষ্ট লাগিতেছিল।" ২রা ফেব্রুয়ারী আর এক জনের জন্মদিন ছিল। সেদিনকার উৎসব চিনি ও কোকোর দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছিল। ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে খুব ঘটা হইয়াছিল। চীনাম্যান নামক টাটু ঘোড়ার পেটের লিভার সে দিন সকলে ভোজন করিয়াছিলেন! তুষারের স্তূপ খনন করিতে করিতে স্যাকল্‌টন খানিকটা রক্তবর্ণ পদার্থ প্রাপ্ত হন। উহা সেই ঘোটকের রক্ত,—জমিয়া শক্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহারা তৃপ্তির সহিত তাহাও ভোজন করিয়াছিলেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তাঁহারা ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। সেই সময়ে তাঁহারা প্রায়ই স্বপ্ন দেখিতেন যে, নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য তাঁহাদের সম্মুখে সজ্জিত রহিয়াছে। কিন্তু সেই খাদ্য তাঁহারা ভোজন করিতেছেন, এমন স্বপ্ন একদিনও তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটে নাই! তাহা হইলে কতকটা তৃপ্তি হইত বটে।... ... ...

"গত রাত্রিতে রুটী ও মাখনের স্বাদ যেন অনুভব করিয়াছিলাম। যৎসামান্য আহার্য্য ভোজন করিবার সময় আমরা পরস্পরের পানে পুনঃপুনঃ চাহিতাম,—যদি কেহ বিলম্বে আহার শেষ করিতেন, তাহা হইলে আমরা সত্যই ক্ষুণ্ণ হইতাম।"

২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখের ডায়েরীতে দেখা যায়,—"যেরূপ ভীষণ তুষার-ঝটিকা বহিতেছে, তাহাতে সাধারণ ভ্রমণকারী কখনই পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন না। কিন্তু আমাদের প্রয়োজন গুরুতর। আমাদিগকে অগ্রসর হইতেই হইবে। আমাদের আহার্য্য দ্রব্য সম্মুখে, পশ্চাতে মৃত্যু আসিতেছে। এত কৃশ হইয়া পড়িয়াছি যে, যখন বরফের উপর 'স্লিপিং ব্যাগ' রাখিয়া তাহাতে শয়ন করি, তখন আমাদের দেহস্থ অস্থিপঞ্জর ব্যথিত হইয়া উঠে। ব্যাগের মধ্যস্থ লোমও অনেক ঝরিয়া গিয়াছে। আজ রাত্রিতে কয়েক

টুকরা বসাযুক্ত মাংস সিদ্ধ করিয়া তাহাই আহার করা গেল। খাইয়া বড় তৃপ্তিবোধ হইল। এত শীত যে, আর লিখিতে পারিতেছি না। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমরা ক্রমশঃ নিকটে আসিতেছি।"

পর দিবস তাঁহারা অপর চারি ব্যক্তির পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন। তাঁহাদের সমভিব্যাহারে কয়েকটি কুকুরও ছিল। তাঁহাদের নির্দ্দেশমত এই দল, হিম-নিবাসের কয়েক মাইল দক্ষিণে এক স্থানে তাঁহাদের জন্য আহার্য্য প্রভৃতি রাখিয়া গিয়াছিল। পদচিহ্ন তাঁহাদেরই। তথায় তাঁহারা একটা ছিন্ন সিগারেট, চকোলেটের তিনটি ভগ্নাংশ ও এক টুকরা বিসকুট দেখিতে পাইলেন। খানিক এ দিক ও দিক অনুসন্ধানের পর তাঁহারা আর কিছু না পাইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

"আমার দুরদৃষ্ট, তাই শুধু এক টুকরা বিসকুট পাইলাম। এ জন্য সহসা আমার ভয়ানক ক্রোধ হইল। কিন্তু এই ক্রোধ অহেতুক। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায়, আমরা কত নিম্ন স্তরে অবতীর্ণ হইয়াছি, প্রাচীন কালের আদিম অসভ্যদের সহিত আমাদের কি পার্থক্য? এক টুকরা খাদ্যের জন্য আমাদের বিচারশক্তিও লোপ পাইতে বসিয়াছে। আমাদের খাদ্য-দ্রব্য প্রায় নিঃশেষ হইয়াছে। আমরা যদি 'ব্লক্-ডিপো'তে না পঁহুছিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের আর কোনও আশাই নাই।"

তাহার পর তাঁহারা অবিশ্রান্ত পর্য্যটন করিয়া অবশেষে নিরাপদে ডিপোয় পঁহুছিয়াছিলেন।

লেফ্টেন্যাণ্ট স্যাকলটন কিরূপ ভাবে এই অভিযানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তিনি তাহার ইতিহাস গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে কিরূপ অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছিল, দুই চারি ছত্রে তিনি তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। অবশেষে যখন তিনি সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, সেই সময়ে অনেকে তাঁহাকে অর্থসাহায্যদানে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু সকলের নিকট হইতে যথাসময়ে অর্থ আদায় হইল না। অবশেষে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড গবর্মেণ্ট তাঁহাকে যথাক্রমে ৭৫০০০্ ও ১৫,০০০্ সহস্র মুদ্রা দান করেন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে এক কপর্দ্দকও সাহায্য করেন নাই। কিন্তু তিনি ফিরিয়া আসিলে পর বৃটিশ গবর্মেণ্ট

অভিযান আমারই চেষ্টা ও নেতৃত্বে হইয়াছে। আমি কোনও সমিতির শাসনাধীন হই নাই। সমস্ত বিষয়ের আয়োজন ও কার্য্য-পরিচালন আমার নির্দ্দেশ অনুসারেই হইয়াছিল। এ জন্য কোনও কার্য্যে বিলম্ব ঘটে নাই।" জন আঙ্গেল জেম্‌স্‌ একবার বলিয়াছিলেন,—যদি কোনও সমিতির নির্দ্দেশ অনুসারে "নোয়া" অর্ণবযান নির্ম্মাণ করিতেন, তবে তাহা কোনও কালে সম্পন্ন হইত না! লেফ্‌টেনাণ্ট স্যাকলটন তাঁহারই মতাবলম্বী।

অভিযানের রসদ-সংগ্রহ ও খাদ্যদ্রব্যাদি যথাস্থানে প্রেরণই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য। স্যাকলটন বলেন,—"বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও বিশেষ সাবধানতার সহিত যত্নপূর্ব্বক যদি খাদ্যদ্রব্যের নির্ব্বাচন ও সংগ্রহ করা যায়, তবে শরীরে কোনও প্রকার পীড়া জন্মিতে পারে না, এবং খাদ্যদ্রব্যও নষ্ট হইয়া যায় না। এ বিষয়ে আমরা বিশেষ সফলকাম হইয়াছিলাম। কারণ, যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আমরা সঙ্গে আনিয়াছিলাম, তাহা আহার করিয়া কোনও দিন আমাদের কোনও প্রকার পীড়া জন্মে নাই। কয়েক বার সামান্য সর্দ্দি ছাড়া, হিমনিবাসে অবস্থানকালে আমাদের কোনও প্রকার পীড়া হয় নাই।

মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন হইতে পারে, স্যাকলটন সে সমুদয়ই সঙ্গে লইয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত দ্রব্যের তালিকা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক;—অন্যান্য দ্রব্যের সহিত সূচ, কীলক, রেমিংটন টাইপ-রাইটার, জামা শেলাইয়ের কল, গ্রামোফোন, অক্ষরসমেত ক্ষুদ্র মুদ্রাযন্ত্র, রোলার, কাগজ প্রভৃতি পুস্তকমুদ্রণোপযোগী সমস্ত দ্রব্যই তিনি সঙ্গে লইয়াছিলেন। হকি খেলিবার যষ্টি ও ফুটবলও ছিল!

লেফটেনাণ্ট স্যাকলটন নৌবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে কতিপয় মূল্যবান যন্ত্র ও মানচিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল।

"আমি 'রয়াল সোসাইটী'র নিকট হইতে 'Eschen Magnectic' যন্ত্রসমূহ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত আবেদন করিয়াছিলাম। কিন্তু উক্ত সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে সেই সমুদয় যন্ত্র দিতে পারিলেন না। ইতিপূর্ব্বেই তাঁহারা অপর এক ভদ্রলোককে উহা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। সেই ভদ্রলোক তখন সরে নগরে আয়স্কান্তিক (Magnetic) পরীক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।"

ইংলণ্ডের জনসাধারণ যদিও "নিমরড" পোতের প্রতি আসুরক্তি প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অভিযানের সাফল্যের সহিত এই পোতের সংস্রব অত্যন্ত সামান্য। নিউজীলণ্ড হইতে হিমনিবাসে পঁহুছাইয়া দেওয়া ব্যতীত আবিষ্কারকদিগের অন্য কোনও কার্য্যে "নিমরড" ব্যবহৃত হয় নাই। স্যাকলটন স্থলপথে পর্য্যটন করিবেন বলিয়া হিমনিবাসে উপনীত হইয়াই তাহাকে দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। পোত সম্বন্ধে স্যাকল্টন বলেন,—

"পোতখানি অতি পুরাতন ও ক্ষুদ্র। বাষ্পীয় শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইলে ছয় মাইলের অধিক যাইতে পারে না। কিন্তু অন্য দিকে ধরিতে গেলে "নিমরড" অত্যন্ত দৃঢ় ও বরফের উপর দিয়া চালাইবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বাস্তবিক বলিতে কি, প্রথম দর্শনে আমি পোতখানি সম্বন্ধে হতাশ হইয়াছিলাম, এবং আমার বহু কালের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র তরণীতে আরোহণ করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলাম। কিন্তু তখন 'নিমরডে'র অশেষ গুণের কথা জানিতাম না। সুতরাং এই পোত সম্বন্ধে আমার প্রথম ধারণা অত্যন্ত অবৈধ হইয়াছিল, বলিতে হইবে।"

১৯০৮ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে "নিমরড" বন্দর পরিত্যাগ করে। তখন উহাতে অসম্ভবজনতা হইয়াছিল। পথিমধ্যে বহুবার আবিষ্কারকেরা ঝটিকাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াছিলেন। সমুদ্রের জলরাশি পার হইয়া বরফময় স্থানে পঁহুছিবার পূর্ব্বে "নিমরড" জলমগ্ন হইয়া যাইবে, অনেকে এরূপ আশঙ্কাও করিয়াছিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে "নিমরড" সে সমুদয় বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া আবিষ্কারকদিগকে গন্তব্য স্থলে পঁহুছিয়া দিয়াছিল।

পোত হইতে অবতীর্ণ হইয়া হিমনিবাস-নির্দ্ধারণ ও জাহাজ হইতে কয়লা নামাইয়া রাখা তাঁহাদের পক্ষে দুরূহ হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে তৎসমুদয় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল। খাদ্যদ্রব্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভার পোত হইতে আহৃত হইবার অত্যল্প পরেই ভীষণ তুষারঝটিকা প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদিগকে কিছু বিপন্ন করিয়াছিল। অবিশ্রান্ত তুষার পাতে দ্রব্যাদি সমাহিত হইয়াছিল। তাহার পর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও বিশেষ যত্নে তাঁহারা সেই সমস্ত দ্রব্য তুষারসমাধি হইতে উদ্ধার করেন। ইংলণ্ড হইতে অনীত দারুময় গৃহ মনোনীত স্থানে সন্নিবিষ্ট হইল। গৃহের মধ্যে স্থান অতি সংকীর্ণ ছিল বটে, কিন্তু বাহিরের প্রচণ্ড শীত তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে

আবিষ্কার-অভিযানে কুকুরের দ্বারা বিশেষ ফললাভ হয় নাই বলিয়া এবার লেফটেনাণ্ট স্যাকলটন টাটুঘোড়া সঙ্গে লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা ইতস্ততঃ যে সমুদয় খাদ্যদ্রব্য পাইত, তাহাই সাগ্রহে ভক্ষণ করিত বলিয়া চারিটি টাটু শীঘ্রই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল।

"শীতনিবাসে অবস্থানকালে আমাদের সঙ্গে আটটি টাট্টু ছিল। কিন্তু তথায় পঁহুছিবার এক মাসের মধ্যে চারিটি মরিয়া গেল। তুষারঝটিকা-বশতঃ সমুদ্রের লবণাম্বু তীরভূমির ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। টাট্টুগুলি লবণের ঘ্রাণ পাইয়া সময়ে অসময়ে লবণযুক্ত বালুকা ভক্ষণ করিত। সমস্ত টাট্টুই সেই বালুকা ভক্ষণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কতিপয় অশ্ব অত্যন্ত লবণপ্রিয় ছিল। অনেকগুলি টাট্টু অকস্মাৎ পীড়িত হইয়া পড়িল। কয়েকটি মরিয়া গেল। প্রথম টাট্টুর মৃত্যুর পর আমরা উহার মৃতদেহ ব্যবচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলাম যে, তাহার পাকস্থলীতে কয়েক সের বালুকা জমিয়াছে। তখন অন্যান্য টাট্টুর পীড়ার কারণ বুঝিতে পারিলাম।

অধ্যাপক ডেভিড্, শ্রীযুত মসন্ ও ম্যাকের সহিত চুম্বকমেরু-আবিষ্কারে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণ অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। ইঁহারাও অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু সীলমৎস্য প্রায় পাওয়া যাইত বলিয়া তাঁহাদের খাদ্যদ্রব্যের সম্পূর্ণ অভাব ঘটে নাই। বরং অনশনকষ্ট তাঁহাদিগকে কখনও সহ্য করিতে হয় নাই। টাট্টুগুলি লেফটেনাণ্ট স্যাকলটনের জন্য ও কুকুরগুলি অন্য অভিযানের জন্য রাখিয়া তিন জন আবিষ্কারক স্বয়ং শ্লেজগাড়ী টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এ জন্য তাঁহারা প্রত্যহ অধিক পথ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কিন্তু তথাপি ১২৫০ মাইল পথ তাঁহারা দৈনিক ১১ মাইল হিসাবে অতিবাহন করিয়াছিলেন। এই অভিযানকালে তাঁহারা ইংরাজরাজের নামে ভিক্টোরিয়া-ল্যাণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন।

সীলমৎস্য পাক করিবার নিমিত্ত তাঁহারা বহুপ্রকার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু সীলমৎস্য উৎকৃষ্টরূপে পাক করিয়াও কখনও তাঁহারা রসনার তৃপ্তি লাভ করেন নাই। চা অত্যন্ত কড়া হইবে বলিয়া তাঁহারা নূতনের সহিত পূর্ব্বব্যবহৃত চার পাতা ব্যবহার করিতেন। অধ্যাপক ডেভিড লিখিয়াছেন,—"ম্যাকেই প্রথমে এই প্রস্তাব করেন; আমরা কিন্তু তাঁহার এই প্রস্তাবে প্রথমতঃ আস্থা স্থাপন করি নাই। কিন্তু পরিশেষে আমরা আনন্দের সহিত তাঁহার পরীক্ষিত প্রণালীমতে চা প্রস্তুত করিতাম। প্রকৃত-

পক্ষে যে চর্ম্মপেটিকায় চা থাকিত, পরিশেষে তাহাই সিদ্ধ করিয়া তাঁহারা চা পান করিয়াছিলেন!

বরফের উপর সূর্য্যরশ্মিসম্পাতজনিত উত্তাপের তীব্রতায় পর্য্যটনে তাঁহাদের বিশেষ বিঘ্ন জন্মিত। এ জন্য তাঁহারা রাত্রিকালে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহারা অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

আবিষ্কারকেরা দুইটি বৃহৎ বরফ-নদী পার হইয়াছিলেন। উহা অতিক্রম করিয়া অবশেষে তাঁহারা সাত সহস্র ফুট উচ্চ মালভূমিতে উপনীত হন। এই স্থানেই চুম্বক-মেরু অবস্থিত। এই সময়ে তাঁহাদিগকে অর্দ্ধাশনে জীবন-যাপন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু অত উচ্চ স্থানে বরফ দ্রবীভূত হইবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না বলিয়া পথ-অতিবাহনে তাঁহাদের অন্য কোনও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই।

যাহা হউক, অবশেষে তাঁহারা যেখানে চুম্বকমেরু বিদ্যমান আছে অনুমান করিয়াছিলেন, যখন সেইখানে আসিলেন, তখন যন্ত্রযোগে দেখিতে পাইলেন যে, পূর্ব্বাভিমুখে না গিয়া তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম দিকে অধিক অগ্রসর হইয়াছেন। সুতরাং যথাস্থানে পঁহুছিতে তাঁহাদের আরও চারি দিন লাগিবে। যে পরিমাণ আহার্য্য দ্রব্য তাঁহাদের সঙ্গে ছিল, তাহাতে অত দিন চলিতে পারে না। কাজেই প্রাত্যহিক খাদ্যের পরিমাণ ক্রমেই আরও কমাইয়া আনিতে হইল।

অবশেষে তাঁহারা উদ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিলেন। সে সময়ে শ্লেজগাড়ী প্রভৃতি কিছুই তাঁহারা সঙ্গে লয়েন নাই। চুম্বকমেরুর স্থান নিরূপিত হইবার পর কম্পাসের কাঁটা অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িবে বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পথ চিনিবার জন্য তাঁহারা পথিমধ্যে স্ব স্ব ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

দক্ষিণ চুম্বক-মেরু আবিষ্কৃত হইলে পর তাঁহারা মস্তক অনাবৃত করিয়া বৃটিশ পতাকা উড্ডীন করিলেন। ১৬ই জানুয়ারী অপরাহ্ন ৩-৩০ মিনিটের সময় অধ্যাপক ডেভিড লেফটেনাণ্ট স্যাকলটনের উপদেশ অনুসারে এই কথাগুলির আবৃত্তি করিয়াছিলেন;—"বৃটিশ সাম্রাজ্যের নিমিত্ত আমি অদ্য চুম্বক-মেরু-পরিব্যাপ্ত স্থান অধিকার করিলাম।"

অতঃপর আবিষ্কারকেরা নানারূপ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আড্ডায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তথায় "নিমরড" পোত তাঁহাদিগকে তুলিয়া

হিমনিবাস হইতে চুম্বক-মেরুর অবস্থান-স্থান ও তথা হইতে "নিমরড" যেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, এই পথের মোট দুরত্ব ১২৬০ মাইল। তন্মধ্যে সাত শত চল্লিশ মাইল পথ তাঁহারা প্রায় সাত মণ ওজনের মাল টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এক শত বাইশ দিন, অর্থাৎ চারি মাস কাল তাঁহারা পদব্রজে এই সুদীর্ঘ পথ অতিবাহন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পাঁচ দিন তুষারঝটিকাবশতঃ তাঁহারা বস্ত্রাবাসের মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং পাঁচ দিন পর্য্যটনের উপযোগী আহার্য্য প্রস্তুত করিতে লাগিয়াছিল। উচ্চ মালভূমিতে উপনীত হইয়া তাঁহারা প্রচণ্ড শীতে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন। অধ্যাপক ডেভিড বলেন যে, যদি তাঁহাদের সহিত এক দল কর্ম্মক্ষম সারমেয় থাকিত, তাহা হইলে দুই মাস কালের মধ্যে তাঁহারা চুম্বক-মেরু আবিষ্কার করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারিতেন।

শীতনিবাস হইতে ইরিবস পর্ব্বত সকল দেখা যাইত। পর্ব্বতের উজ্জ্বল দীপ্তি প্রায়ই তাঁহারা দেখিতে পাইতেন। মাঝে মাঝে বাস্পস্তম্ভ পর্ব্বতমুখ হইতে বহির্গত হইয়া তিন সহস্র ফুট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উত্থিত হইত। আবিষ্কারকেরা নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি উপনীত হইয়াছিলেন। "আমরা পর্ব্বত-বিবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলাম। গিরিমুখনির্গত বিরাট বাস্পস্তম্ভ পাঁচ শত হইতে হাজার ফুট পর্য্যন্ত উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছিল বলিয়া প্রথমতঃ কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না। কয়েক মুহূর্ত্তব্যাপী হিস্ হিস্ শব্দ গুহার অভ্যন্তর হইতে পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইতেছিল। তাহার পর একটা গুরু গর্জ্জন শ্রুত হইল। অমনই বর্ত্তুলাকার বাষ্পরাশি নিম্ন হইতে উত্থিত হইয়া আগ্নেয়গিরি-বিবর-বিলম্বিত তুষারশুভ্র মেঘমালাকে আরও স্ফীত ও বর্দ্ধিতায়ন করিল। পর্ব্বতোপরি অবস্থানকালে আমরা কয়েকবার এইরূপ বিচিত্র দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলাম। সেই সময়ে দহ্যমান গন্ধকের গন্ধে বাতাস পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অবশেষে মধুর উত্তর-বায়ু সেই বাষ্পময় মেঘরাশিকে উড়াইয়া লইয়া গেল। তখন আগ্নেয়গিরির সমগ্র মুখপ্রদেশ ও নিম্নভাগ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। মসন মাপিয়া দেখিলেন যে, গহ্বরটি নয় শত ফুট গভীর, এবং মুখ-বিবরের বিস্তৃতি প্রায় অর্দ্ধমাইল।"

ইরিবস্ পর্ব্বত প্রায় ১৩,৩৭০ ফুট উচ্চ।

শীতনিবাস পরিত্যাগ করিবার কালে লেফ্‌টেন্যাণ্ট স্যাকলটন তথায়

পনের জন লোকের এক বৎসর কালের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্যাদি রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

"বয়েড অন্তরীপের উপরিস্থিত শীতনিবাসে পনের জন লোকের এক বৎসর কাল চলিতে পারে, এমন দ্রব্যসম্ভার রাখিয়া আসিয়াছি। কুমেরু-প্রদেশে বাস সেরূপ সঙ্কটসঙ্কুল, তাহাতে এই রসদ কোনও ভাবী আবিষ্কারকের আবিষ্ক্রিয়া কার্য্যে বিশেষ সাহায্য করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কুটীরের দ্বার চাবি দ্বারা বদ্ধ, এবং উহার বহির্দ্দেশে চাবি ঝুলাইয়া রাখিয়াছি। একটু অনুসন্ধান করিলেই যে কেহ উহা খুঁজিয়া পাইবেন। কুটীরটিকে আমরা এমন অবস্থায় রাখিয়া আসিয়াছি যে, তুষার-ঝটিকা সহজে তাহার কোনও ক্ষতি করিতে পারিবে না। কুটীরমধ্যে আমি একখানি পত্র লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছি। উহাতে আমার অভিযানের বিবরণ ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা লিখিত আছে। তাহাতে ভাবী আবিষ্কারকের অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।"

বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য বিষয়ের তথ্য নিরূপণ করিবার জন্য তাঁহারা আরও কয়েকটি স্থলে গমন করিয়াছিলেন। সে সমুদয় বিবরণও বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক ও সুখপাঠ্য।

কোকিল।

গাহো কোকিল! কলস্বরে মুখরিত করে' কুঞ্জ-ভবন;
ফোটে যখন কুঞ্জে কুঞ্জে বৃক্ষে বৃক্ষে পুষ্প দলে দলে;
স্বপ্ন-রাজ্য হ'তে যখন ভেসে' আসে স্নিগ্ধ মৃদু পবন;
চন্দ্রালোকে পূর্ণ আকাশ; বসুন্ধরা পূর্ণ পরিমলে!
সুখের দিনের পাখী তুমি, দুখের দিনে কোথায় যাও হে চলে?
ডিম্ব পেড়ে' রাখো তুমি চুরি করে' গিয়ে কাকের বাসায়;
কুঞ্জে এসে, প্রেমের গানে পরে পূর্ণ কর বনস্থলে;
অত্যন্ত দুঃশীল তুমি, অন্য কথা খুঁজে পাইনে ভাষায়,
ভারি রসিক হে বিলাসী পাখী তুমি, করি অনুমান;
বায়স যখন ফোটায় যত্নে তোমার ডিম্ব, তুমি গাহো গান!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

হতাশের আক্ষেপ।

১

তুমি কেন হে সুধাংশু! আবার এ গগনে?
পাপে তাপে মনস্তাপে আমার হৃদয় কাঁপে,
জ্বলে যাই, পুড়ে যাই, ত্রিতাপের দহনে;
তুমি হে সুধাংশুনিধি! এ তব কেমন বিধি?
বিঁধি' বিঁধি' দহ মোরে কৌমুদীর কিরণে।
হেরি তোমা তারাপতি, মনে পড়ে সে মূরতি!
এ শোকাগ্নি নিবাইব কোন্ বারি-বর্ষণে?
তুমি কেন হে সুধাংশু, আবার এ গগনে?

২

বল, বল তারানাথ, এনেছ কি তব সাথ
আমার সে হারানিধি তারাকারা রামারে?
এনেছ নয়নতারা, আমার জীবনতারা,
আমার সে ধ্রুবতারা, শুক্রতারা শ্যামারে?

৩

মুখরিত অলিপুঞ্জে এই করবীর-কুঞ্জে
আমার সে হাস্যময়ী নিত্য হেথা আসিত!
গুঞ্জরিয়া মহানন্দে সেই চরণারবিন্দে
আমার মানস-ভৃঙ্গ মগ্নপ্রাণে বসিত;
তুমি ওহে তারানাথ, হাসিতে গো সারারাত,
আমি হাসিতাম সুখে, তারা মোর হাসিত!

৪

"ঐ শশী ঐখানে", কৌমুদীর বিমানে
ঝল্‌মলে তারারত্ন ছায়াপথ-বিতানে!
নিম্নে মোরা দুই জনে মগ্ন প্রেম-আলাপনে,
এই সে করবী জবা অতসীর উদ্যানে।
বাঁধি আমি পদ্মাসন পূজিতাম সে চরণ;
সম্মুখেতে মা আমার কি বিচিত্র বসনে!

মা আমার সারাৎসার, দয়াময়ী মা আমার,
গৌরী উমা বীজাক্ষরী কি বিচিত্র বরণে!

৫

মা আমার হাস্যময়ী, অতুল আনন্দময়ী,
ষোড়শী-রূপসী-সাজে হেমাম্বর-বসনে!
মুক্তাহার গলে দোলে, লীলাপদ্ম করতলে,
মাথায় মুকুট রাজে, দীপ্ত নানা রতনে!

৬

নিত্যানন্দকরী সে গো, বরাভয়করী সে গো,
যোগানন্দকরী সে গো, ধর্ম্মমোক্ষদায়িকা!
কি সৌন্দর্য্য! অপরূপা. রাজরাজেশ্বরীরূপা
লীলাময়ী ক্রীড়াময়ী আমার সে বালিকা!
গাঁথি মালা ফুল-রত্নে মার কণ্ঠে দি গো যত্নে,
হাসেন মা দয়াময়ী ত্রিভুবনপালিকা!
মা গো আমি অকিঞ্চন, তুই মা অমূল্য ধন,
তবু নিলি উপহার, এ কি লীলা কালিকা!

৭

না জানি কি দৈববলে, জন্ম-জন্ম-পুণ্যফলে,
কোন্ জপে পেয়েছিনু তারা মার দেখা রে!
আমি যে রে কিছু নই, মা মোর করুণাময়ী,
নিজে দিয়েছিল দেখা সেই ইন্দুলেখা রে!

৮

তুমি মম শুভবুদ্ধি, তুমি মম চিত্তশুদ্ধি,
তুমি কামনার নাশ, তুমি শুভ বাসনা!
তুমি জ্ঞান, তুমি যুক্তি, তুমি সিদ্ধি, তুমি মুক্তি,
সাধনা-ব্রতের তুমি একমাত্র পারণা!

৯

তুমি মা কমলারাণী, তুমিই বাণীশা বাণী,
প্রকৃতি-রূপিণী তুমি, তুমি গৌরী অম্বিকা!

সাধকের তুমি শক্তি, সেবকের তুমি ভক্তি,
প্রেমময় হরি তুমি, প্রেমময়ী রাধিকা!

১০

এইরূপে যোড়করে, করুণ করুণ স্বরে,
পূজিতাম পাদপদ্ম ভক্তিভরে ধরিয়া!
কভু কাঁদি, কভু হাসি, আমার সে অশ্রুরাশি,
আপন অঞ্চলে মাতা দিতেন গো মুছিয়া!

১১

কভু আমি বাক্যহারা, পাগল পাগল পারা;
মারো মুখে কথা নাই, নিমীলিত-লোচনা!
হায় সেই রসাস্বাদে, কে সাধিল বাদ বাধে?
কোথায় লুকাল মোর সে অতসী-বরণা!

১২

ত্রিদিব-দেবেন্দ্র হায়! তাঁহার ঘটিল দায়,
অভাগার ভাগ্য হেরি না জানি গো কেমনে!
আমার হেরিয়া সুখ, ফাটিল দেবের বুক,
পাঠাইলা শনৈশ্চরে অভাগার ভবনে!

১৩

নানা রঙ্গে, নানা ছলে, শনৈশ্চর হাসি বলে,
"চল হে যোগেন্দ্র! আজি কর্ম্মনাশাপুলিনে,
বিজন সুন্দর স্থান, তটিনী গাহিছে গান,
পূজিও মায়েরে তথা বসি' মৃগ-অজিনে!"

১৪

না বুঝি দেবের মর্ম্ম, করিলাম কি কুকর্ম্ম,
গেলাম সে নদীতটে কর্ম্মচক্রে পড়িয়া!
পুলিনে কোকিল ছিল, কুহু কুহু কুহরিল,
মোহিনী অপ্সরা এক দেখা দিল হাসিয়া!

১৫

করি' বামা নানা ছাঁদ, পাতিল প্রেমের ফাঁদ,

হইলাম লক্ষ্মীছাড়া, পুণ্যহারা সুখহারা,
সুধা-আশে চপলারে হৃদাকাশে ধরিলাম !
গেল মান, গেল লাজ, বুকেতে বাজিল বাজ,
নয়নে লাগিল ধাঁধাঁ, অন্ধকার হেরিলাম ;
ভাঙ্গি' গেল মেরুদণ্ড, লোকেতে বলিল 'ভণ্ড',
ছিন্ন কদলীর সম লুটাইয়া পড়িলাম !

১৬

হইলাম লক্ষ্মীছাড়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা,
"মা মা" বলি ভাঙ্গা বুকে ত্রিভুবন ঘুরিলাম !
কোন ঠাঁই সুখ নাই, মার দেখা নাহি পাই,
কি ছিলাম কি হ'লাম—ভাবি' শুধু কাঁদিলাম !

১৭

ধরায় লুটায় দেহ, কেহ নাহি করে স্নেহ,
মা বিনা গো সন্তানের দুঃখ কে বা বুঝিবে ?
কে দিবে ক্ষুধার অন্ন ? তৃষিতের বারি জন্য
কে ছুটিবে ? অশ্রুজল অঞ্চলে কে মুছিবে ?

১৮

"কোথা মা. কোথা মা" করি' পোহাই গো বিভাবরী,
গরীবে বিমুখ সবে, নিদ্রা আর আসে না।
"কোথা মা কোথা মা" ভাষে, প্রতিধ্বনি উপহাসে,
ঊষা হাসে, লোকে হাসে, মা আমার হাসে না !

১৯

কোথা মা গো হাস্যময়ী ? কোথা মা কোথা মা তুই ?
তোর সে হাস্যের কাছে সব হাস্য মিছা গো !
তোমার সে মৃদুহাসি, যেন অমৃতের রাশি ;
এদের বিদ্রূপ-হাসি যেন সাপ-বিছা গো !

২০

রবি অস্ত, গেল বেলা ; এ কি মা তোমার খেলা ?

ঘুরিয়া মরেছি ভবে, ছেলে কি আঁধারে রবে ?
দেখা মা প্রদীপ তোর, মা গো তুই কোথা রে ?
ক্ষীণ কণ্ঠ, ক্ষীণ আয়ু, হুহু শব্দে বহে বায়ু,
মরি বুঝি "সংসারের ঝঞ্ঝা-বায়ু-প্রহারে" ;—
দেখা দে মা, দেখা দে মা, মা গো তুই কোথা রে ?

২১

তুমি জ্ঞান, তুমি বুদ্ধি, তুমি শৌচ, তুমি শুদ্ধি,
তোমা ছাড়া হতবুদ্ধি, লুপ্তধৃতি-ধারণা !
বল্ মা আনন্দময়ী, বল্ মা করুণাময়ী,
তোর কি মা! এ জনমে আর দেখা পাব না ?

২২

"এ যন্ত্রণা ছিল ভাল, কেন পুনঃ দেখা হ'ল ?
হেরিয়ে দ্বিগুণ হ'ল নিদারুণ যন্ত্রণা !
এমনি সে পৌর্ণমাসী, ছড়াইছে সুধারাশি,
এই করবীর কুঞ্জে, জীর্ণ-চীর বসনা,
নীরবে দাঁড়াল আসি' হর-হৃদি-বাসনা !

২৩

অই রক্তজবামূলে, মা আমার এলোচুলে,
দর্ দর্ ধারা বহে বিশাল দু' লোচনে,
মলিন পাণ্ডুর মুখ, দীর্ঘশ্বাসে কাঁপে বুক,
পড়েছে কালিমা-রেখা সোনার সে বরণে !
মাথায় মুকুট নাই, রতন-ভূষণ নাই,
রক্তজবা দোলে গলে, নীলোৎপল শ্রবণে !

২৪

আমি চাহি মার পানে, মা চাহেন মোর পানে,
অপমানে অভিমানে মরমেতে মরিয়া !
কতক্ষণে কহে তারা, আধ-পাগলিনী পারা,
"কি ছিলাম, কি হয়েছি—দেখ্ বাছা চাহিয়া।"।

২৫

বিদরিয়া গেল বুক সেই দৃশ্য হেরিয়া!—
ধবল উরস-পরে শোণিতের বিন্দু ঝরে,
উরসে ঝলসে অসি মার বক্ষ বিঁধিয়া!
"তোর আচরণে ঘোর, এই দশা মার তোর!"
অভিমানে অবসাদে মা উঠিলা কাঁদিয়া—
আমি কাঁদিলাম উচ্চে, দু' চরণ ধরিয়া!

২৬

"ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী, ক্ষমা কর জননী!
পুত্রের অশুভ কাজে, মার বুকে এত বাজে?
ক্ষমা কর উমা দেবী, ক্ষম হরঘরণী,
ক্ষমা কর নারায়ণী, ক্ষমা কর ভবানী;
ক্ষমা কর মহামায়া, দয়া কর শিবানী;
ক্ষমা কর নিস্তারিণী, দুঃখ মম নিবারি;
দয়া কর জগদম্বা, মুখ মম নেহারি;
ক্ষমা কর ইচ্ছাময়ী, হৈমবতী, অন্নদা;
দয়া কর মোক্ষময়ী, ভগবতী, শিবদা;
ক্ষমা কর মা সরলা, ক্ষমা কর বগলা,
ক্ষমা কর জগদ্ধাত্রী, দয়া কর কমলা;
ক্ষমা কর ভদ্রকালী, ক্ষমা কর বিজয়া,
দয়া কর দয়াময়ী, ক্ষমা কর অভয়া!"
বলিয়া পাগল-পারা, কাঁদিয়া হইনু সারা,
ধরি' সে রাতুলপদ লুটাইনু ধরণী!

২৭

এ কি লীলা, এ কি রীতি! তোরে হেরে পাই ভীতি!
কোথা রাজরাজেশ্বরী তোর সেই মূরতি?
কোথা সেই কলকণ্ঠে বীণাস্বরা ভারতী?
মালতীমুকুলমালা—মধুকর-আকুলা?

আমার সে হাস্যময়ী, অতুল আনন্দময়ী
হেমাম্বরী, রত্নাকরী মা আমার কোথা গো ?
পায়ে পড়ি, ক্ষম দোষ, এ কি ঘোরতর রোষ !
ছাড় ছল, কাত্যায়নী, দিও না মা ব্যথা গো !

২৮

সে যে মূর্ত্তি চিৎস্বরূপা, যোগানন্দদায়িকা !
তপঃফলকরী সে গো, মহাভয়হরী সে গো,
নিরাময়করী সে গো, ত্রিভুবনপালিকা,
সদানন্দময়ী সে গো, নিত্যশুভময়ী সে গো,
লীলাময়ী ক্রীড়াময়ী আমার সে বালিকা !
চন্দ্রবিম্বাধরী সে গো, রবিবর্ণেশ্বরী সে গো,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ কুসুমের মালিকা !
সে বেশ কোথায় তোর বল্ বল্ কালিকা ?

২৯

এ বেশে যে শক্তি টুটে, প্রাণ আকুলিয়া উঠে,
এ বেশে যে বুক ফাটে লীলাময়ী বালিকা !
ইহা হ'তে ছিল ভাল, করাল-বদন কাল,
চপলা ভৈরবী ভীমা অট্ট-অট্ট-হাসিকা !
অসি-করা ঘূর্ণ-আঁখি ত্রিনয়নী চণ্ডিকা—
এ বেশে যে বুক ফাটে লীলাময়ী বালিকা !"

৩০

এত বলি' মুখ তুলি' দেখিলাম চাহিয়া,—
সর্ব্বনাশ ! হায়, হায়, হুহু করে নিশিবায় !
জবামূলে কেহ নাই !—মা কি গেল ছলিয়া ?
ভূতদল প্রেতদল ব্যঙ্গ করে বসিয়া !

৩১

সারাকুঞ্জ তপাসিনু, যামিনীরে শুধাইনু,
"এই ছিল, কোথা গেল, মা আমার চলিয়া ?"

দু' হস্তে আবরি' মুখ, ভগ্ন আশা, ভগ্ন বুক,
শূন্যমনে ধরাতলে পড়িলাম লুটিয়া !

৩২

"কোথা তারা, কোথা তারা ?" বলিয়ে উন্মাদ-পারা
উঠিয়া ছুটিয়া ধাই "তারা তারা" গাহিয়া,
পল্লীবালদল আসি', গায়ে দিল ধুলারাশি,
উচ্চে করতালি দিল হাসিয়া ও নাচিয়া।

৩৩

হরিদ্বারে হৃষীকেশে, পাগল সন্ন্যাসিবেশে,
গঙ্গাজলে ডুব দিয়া কহিলাম কাঁদিয়া,—
"আয় মা আঁখির তারা, তো বিনে আঁধার ধরা !"
যাত্রীরা কাঁদিয়ে সারা, তীরে সারি বাঁধিয়া !

৩৪

তদবধি ভস্ম মাখি', গেরুয়ায় অঙ্গ ঢাকি',
ঘুরিয়া হতেছি সারা, মা মা রবে ডাকিয়া !
এই ছিল ভাগ্যে লেখা, মা আর দিল না দেখা,
হইনু সর্ব্বস্ব-হারা, শনিচক্রে পড়িয়া !
কি ছিলাম, কি হ'লাম, কি কুক্ষণে ভখিলাম,
কুকর্ম্ম মাখালফলে ভাবিয়া রে অমিয়া !

৩৫

হায় আমি লক্ষ্মীছাড়া, হইয়াছি তারাহারা,
হে সুধাংশু ! তুমি কেন আবার এ গগনে ?
পাপে, তাপে, মনস্তাপে, আমার হৃদয় কাঁপে,
জ্বলে যাই, পুড়ে যাই, ত্রিতাপের দহনে !
হেরি' তব শশী ! মুখ মনে পড়ে সেই মুখ,
এ শোকাগ্নি নিবিবে কি কভু এই জনমে ?
শশধর ! তুমি কেন আবার এ গগনে ?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।

ভারত-মহিলা।—অগ্রহায়ণ। 'ভারত-মহিলা'র ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। এই সংখ্যার প্রথমে শ্রীযুত শিবনাথ শাস্ত্রী 'নবভারতে ভূত ও ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধে ভারতবাসীকে উন্নতির পথ, অগ্রসর হইবার পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুপণ্ডিত, চিন্তাশীল শাস্ত্রী মহাশয় দেশবাসীকে নিম্নশ্রেণীর উদ্ধার, লোকশিক্ষার প্রচার, ধর্ম্ম ও সমাজের সংস্কার, ভেদবুদ্ধির পরিহার করিতে বলিয়াছেন, এবং 'জাতিভেদ' তুলিয়া দিবার পরামর্শ দিয়াছেন।—স্বদেশী আন্দোলনের পরিপুষ্টির পর হইতে ব্রাহ্ম লেখকগণ 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রে হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে আক্রমণ করিতেছেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের নেতা। তিনিও 'জাতিভেদে'র দোষ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, জাতিভেদের জন্যই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে; এবং জাতিভেদ চূর্ণ করিলেই ভারত উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিবে। জাতিভেদ সম্বন্ধে বহু তর্ক হইয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র পরিসরে তাহার অবতারণা অসম্ভবও বটে, অনাবশ্যকও বটে। আমরা বলি, শাস্ত্রী মহাশয় মদ্র দেশ হইতে নীচ জাতির প্রতি উচ্চ জাতির অত্যাচারের যে সকল দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন,—তাহা জাতিভেদের ফল, কি জাতিভেদের 'অপচারে'র ফল, তাহাও ত বিচার্য্য। জাতিভেদহীন ইউরোপেও কি সমাজের নিম্নস্তর এইরূপ বিষম অত্যাচারে জর্জ্জরিত ও বিজাতীয় ঘৃণার ভাজন নহে? শাস্ত্রী মহাশয় যে সমাজের নেতা, জাতিভেদের উচ্ছেদ ও তথাকথিত 'সাম্যে'র প্রতিষ্ঠাই যে সমাজের ভিত্তি,—মূল সূত্র, সেই সমাজেও কি জাতিভেদের সংস্কার এতদিনেও লুপ্ত হইয়াছে? কলিকাতার এক জন মুচী ব্রাহ্মের কন্যার বিবাহকালে কিছু দিন পূর্ব্বে অনেক 'আনুষ্ঠানিক' ব্রাহ্ম কিরূপ ভেদবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন, শিবনাথ বাবু কি তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন? ধনী ও দরিদ্র ব্রাহ্মের মধ্যে যে 'ভেদ' দেখিতে পাই, তাহাও কি জাতিভেদের প্রকারান্তর নহে? ব্রাহ্মসমাজেও বৌদ্ধদিগের মহাযান ও হীনযানের ন্যায় দক্ষিণ ও উত্তর এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, দক্ষিণের অর্থাৎ চৌরঙ্গীবাসী, বিলাসী, বিলাতফেরত, ধর্ম্মহীন ও ধনশালী ব্রাহ্মেরাই এখন ব্রাহ্মসমাজের কুলীন হইয়া উঠিয়াছে, শিবনাথ বাবু কি তাহা জানেন না? যে সমাজে জাতিভেদ নাই, সেই নূতন শিশুসমাজে কোন মনু এই জাতিভেদের বিধান দিলেন? কোন বল্লাল এই কাঞ্চনকৌলীন্যের সৃষ্টি করিলেন? শ্রদ্ধাস্পদ শাস্ত্রী মহাশয়কে আমরা আর একটি প্রশ্ন করিব। জাতিভেদের জন্যই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, ইহা কি ঐতিহাসিক সত্য? শিবনাথ বাবু কি তাহা ঐতিহাসিক প্রমাণে প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন? আমাদের মনে হয়, জাতির অবনতি ও উন্নতির কারণনির্দ্দেশ এত সহজ নহে।—শাস্ত্রী মহাশয় কতকটা কুসংস্কারে অন্ধ হইয়া 'জাতিভেদ'কেই ভারতবাসীর অবনতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেদিন বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও এই পথের পথিক হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকট আমাদের প্রশ্ন এই যে, পৃথিবীর যে সকল দেশে জাতিভেদ ছিল না, তাহাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব্বনাশ হইল কেন? স্বাধীন ভারতবর্ষে যখন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বদ্ধমূল ও প্রভাবশালী ছিল, তখন ভারতবর্ষ বর্ত্তমান যুগের তুলনায় উন্নত ছিল, না অবনত হইয়াছিল? অশোক যখন সমগ্র ভারত একসূত্রে গ্রথিত করিয়া পৃথিবীতে প্রথম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তখন কি ভারতে জাতিভেদ ছিল না?

বৌদ্ধ ও হিন্দু তখন এক পতাকার ছায়ায় স্বধর্ম্মের সেবা করিত। সে রাষ্ট্রীয় উন্নতি কি জাতিভেদের চিতাভস্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল? ইউরোপে যে সকল জাতির মধ্যে জাতিভেদ নাই, যৌন-বিচার নাই, তাহারা পরাধীন হইয়াছিল কেন? ইটালী, গ্রীস প্রভৃতির দাসত্বের কারণ কি? তাহাদের পাস্তাল্ ব্রাহ্মণ ত পারিয়াদের উপর অত্যাচার করিত না? রোমকেরা জাতিভেদ মানিত না। রোমসাম্রাজ্য লুপ্ত হইল কেন? তুর্কীরা জাতিভেদ মানিত না; অন্য-জাতীয়কেও জাতিভুক্ত করিতে পারিত। এখনও পারে। তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধঃপাতের কারণ কি? ভারতবিজয়ী ভারতবাসী মোগল ও পাঠানগণও জাতিভেদ মানিত না। তাহারা সাম্রাজ্য হারাইল কেন? জাতিভেদহীন, সাম্যমন্ত্রবাদী মুসলমানের অবনতির কারণ কি? মিশরের 'ফেল্লাহীন' জাতিভেদের জাঁতায় পিষ্ট নয়, তবু তাহাদের অবস্থা মদ্রবাসী পারিয়াদের অপেক্ষা উন্নত নহে। ইহারই বা কারণ কি? জাপানে জাতিভেদ নাই, জাপান উন্নত হইয়াছে,—ইহাই কি শাস্ত্রী মহাশয়ের এই উপপত্তির কারণ? কিন্তু চীনের সামাজিক অবস্থা জাপানের মত। চীনে জাতিভেদ নাই। তথাপি চীন ছিন্ন ভিন্ন, জাতীয়-জীবনশূন্য ও ধ্বংসোন্মুখ হইল কেন? আফ্রিকায় ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদ নাই। সেই আফ্রিকা ইউরোপের চরণ-পূজায় নিরত হইল কেন? আধুনিক ইউরোপে 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' বা 'জাতিভেদ' নাই; কিন্তু তদপেক্ষা লক্ষগুণে হেয় ও অপকৃষ্ট 'শ্রেণী-ভেদ' আছে। সে ভেদবুদ্ধির তুলনায় ভারতের জাতিভেদকে স্বর্গীয় বলিয়া মনে হয়। ইউরোপে নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী পশুতুল্য। আবার কোটীপতি বণিকও 'অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ' লর্ড-পুত্রের ঘৃণাভাজন। টেবিলে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের বিচার নাই, কিন্তু ধনী দরিদ্রের বিষম বিচার বিদ্যমান! এই জাতিভেদ অবশ্য সুবর্ণ-গত। কিন্তু জন্ম-গত জাতিভেদও ইউরোপে নিতান্ত অল্প নহে। সম্প্রতি আমাদের রাজার দেশে সেই জন্ম-গত দ্বিজাধিকার চূর্ণ করিবার জন্য সমাজের ক্ষাত্র শক্তি, বৈশ্য শক্তি ও শূদ্র শক্তি সমবেত হইয়া বজেট-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে। এখন প্রশ্ন, এই ভেদ-ভিন্ন ইউরোপে রাষ্ট্রীয় শক্তির অভ্যুদয় হইল কেন? নিকৃষ্ট পর্য্যায়ের জাতিভেদের সমর্থক ইউরোপ এসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকার প্রভু হইল কেন? শাস্ত্রী মহাশয় এই সকল জটিল ঐতিহাসিক সমস্যার সিদ্ধান্ত না করিয়াই, জাতিভেদের স্কন্ধে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় অবনতির সমস্ত পাপ-ভারের আরোপ করিয়াছেন! শ্রীযুক্ত পরেশরঞ্জন রায়ের 'শরীর ও ব্যাধি' উল্লেখযোগ্য। শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাস 'স্ত্রীশিক্ষাবিস্তারের উপায়' প্রবন্ধে কেবল কতকগুলি পাঠ্য গ্রন্থের তালিকা নিবিষ্ট করিয়াছেন। প্রথমতঃ, 'পাঠ্য নির্ব্বাচনই' স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের' উপায় নহে। দ্বিতীয়তঃ, লেখিকা পাঠ্যের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাও গড্ডলিকা-প্রবাহের ন্যায় গতানুগতিক। এরূপ অনধিকারচর্চ্চায় কোনও লাভ নাই। 'সহযোগী সাহিত্যে'র 'বৃহৎ পরিবার' উল্লেখযোগ্য।

জাতীয় উৎকর্ষসাধন।

এই গুরুতর বিষয় এত অল্প পরিসরে সম্যক্ আলোচিত হইতে পারে না। ইহার অবতারণামাত্রই আমার উদ্দেশ্য। এই অনুকূল সময়ে এ বিষয়ে জাতীয় দৃষ্টি যথাযোগ্যরূপে আকর্ষণ করিতে পারিলেই কৃতার্থ হই।

মানবসমাজ কি লইয়া বড়াই করিবে? ধন, জন, শক্তি, না আধিপত্য? কিসের গৌরব প্রকৃত গৌরব? কিসের উন্নতি প্রকৃত উন্নতি? ধনে উন্নতি হইলে, ইহুদী জাতির আজ এ অবস্থা দেখিতাম না। জগতে তাহাদিগের মাথা লুকাইবার স্থান পর্য্যন্তও নাই। শক্তি ও আধিপত্যই যদি উন্নতি হইত, তবে রোম আজিও জীবিত থাকিত। প্রচলিত শিক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞান যদি স্থায়ী উন্নতির চিহ্ন হইত, তবে হিন্দুজাতি এরূপ অধঃপতিত হইত না। এ সকল কি উন্নতি নহে? উন্নতি অবশ্যই। কিন্তু বালির উপর জলের লেখা মাত্র। কত সমাজ, কত সাম্রাজ্য জলবুদ্বুদের স্থায় উঠিয়াছে, আবার তখনই অনন্ত কাল-গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।" বাণিজ্যই অর্থাগমের শ্রেষ্ঠ পন্থা। কিন্তু আরবগণের, ফিনিশীয়গণের, স্প্যানিয়ার্ডগণের, ওলন্দাজগণের স্থায় বাণিজ্যের উন্নতি ও প্রসার পুরাকালে আর কে করিয়াছিল? আজি তাহাদের ভাগ্যলিপি পাঠ করুন, বুঝিবেন,—যে লক্ষ্মী বাণিজ্যে বাস করেন, তিনি চঞ্চলা, অতিমাত্র চঞ্চলা, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজতত্ত্ববিৎ ডাক্তার রেণ্ট্ল গভীর মর্ম্মবেদনার সহিত বলিয়াছেন,—"টাকা, টাকা, টাকা, কোম্পানীর ডিভিডেণ্ট শতকরা ২০৲ কুড়ি টাকা, শেয়ারের দাম ক্রমেই চড়িয়া গেল। কিন্তু ফলে লাভ হইল জননহীনতা আর অধঃপতন।" * টাকায় উন্নতি নাই, বাণিজ্যে উন্নতি নাই। অর্থাৎ, অর্থের উন্নতি অতীব ক্ষণস্থায়ী।

শক্তি, আধিপত্য—এ সকলের উন্নতিই বা কি? রোমের স্থায়

* "Hustle, hustle" may allow a company to declare a 20 percent divident and to rush up shares, but it steadily works for sterility and other forms of degeneracy.—*Race Culture. P.* 82.

অতুলনীয় শক্তি প্রাচীন জগতে কাহার ছিল? বর্ত্তমান যুগেও রুশিয়ান কশাকের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষ কে? ইংরাজ জাতিও প্রচুরশক্তিশালী। কিন্তু জীবতত্ত্ববিৎগণ, সমাজ-তত্ত্ববিদ্‌গণ এই জাতির উন্নতির পরিণাম সম্বন্ধে যাহা মীমাংসা করিতেছেন, তাহা খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের আলোচনা হইতেই অবগত হওয়া সঙ্গত, আমার বলিতে সাহস হয় না। জীবরাজ্যে দৈহিক শক্তিই উন্নতির মূল হইলে, দুর্ব্বল, অসহায়, অরক্ষিত-দেহ মানব জগতে জীবশ্রেষ্ঠ হইত না। বিপুল সেনাসজ্জ, ভয়ঙ্কর ধূমোদ্গারী সমরপোত—এ সকল মুহূর্ত্তমধ্যে কালগর্ভে লীন হইতে পারে। পারস্যের ইতিহাস, স্পেনের ইতিহাস, এমন কি বুয়ারদিগের ইতিহাসও এ বিষয়ে মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্থায়ী উন্নতি এ সকলে নাই।

শিক্ষায়, জ্ঞানচর্চ্চায়, প্রাচীন জগতে ও বর্ত্তমান যুগেও প্রাচীন হিন্দু-জাতির তুলনীয় কে? কিন্তু আজি তাহাদিগের কি দশা! এ দিকেও স্থায়ী উন্নতি নাই।

সহজ কথায় বলিব, যে যত উঠিয়াছে, সে তত পড়িয়াছে। কারণ, সে উঠিতে জানে নাই। প্রাচীন জগৎ যাহাকে উঠা বলিয়াছে, তাহা উঠা নহে। তাহা পড়িবার জন্যই উঠা। এতদিন যাহাকে উন্নতির লক্ষণ স্থির করিয়া রাখিয়াছি, তাহা উপরের বার্ণিশ, অচিরেই ফাটিয়া চটিয়া যায়। তথাকথিত উচ্চ সভ্যতা, তথাকথিত শক্তিশালী সাম্রাজ্য, এ সকল বিনষ্ট হইল কেন? ডাক্তার সেলিবির ভাষায় বলিতে গেলে জিজ্ঞাসা করিতে হয়,—Why is it that not enslaved but Imperial peoples degenerate? Why is it that nothing fails like success? * এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিতেছেন যে, সভ্যতা ও সাম্রাজ্য মানুষেই রক্ষা করে। বংশানুক্রমের নিয়ম জ্ঞাত না থাকায় প্রাচীনগণ মানুষ গড়িতে জানেন নাই, তাই অনুপযোগী মানব যুগপরম্পরাগত বাহ্য সভ্যতার ভার বহন করিতে পারে নাই। উহা তাহাদিগের অবনত প্রকৃতির উপযোগী হয় নাই। মানুষ দেহে ও মনে অবসন্ন হইলে বাহিরের উন্নতির চাপ সহিবে কে? †

* Parenthood and Race Culture P. 264.

† I believe then that civilization and Empires have succumbed because they represented only acquired or traditional or educational progress and avia-

বৈজ্ঞানিক আমাকে শিখাইয়া দিলেন,—এইরূপে এইরূপে মানব আকাশ-পথে উড্ডীয়মান হইতে পারে। কিন্তু আমার সে সাহস নাই, আমার সে অধ্যবসায় নাই, আমার সে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নাই, আমি দেহে ও মনে অবনত; আমি কেমন করিয়া উঠিব? উঠিলেও অচিরেই পড়িয়া গিয়া মানবলীলা সংবরণ করিব। আমার উপরেই সব নির্ভর করে। ব্যক্তির উপরেই সব। ব্যক্তি যদি অবনত হইয়া গেল, তবে সামাজিক উৎকর্ষের কোনও অর্থই থাকে না। সমাজের একমাত্র সম্পত্তিই ব্যক্তি; ব্যক্তিই জাতির একমাত্র ধন। রাস্কিন বলিয়াছেন,—there is no wealth but life. ডাক্তার সেলিবি এই কথাকেই অন্য ভাবে বলিতেছেন,—"there is no wealth but mind" ব্যক্তি ভিন্ন সমাজের আর সম্পত্তি নাই। ব্যক্তির সম্বলও দেহ এবং মন। মন দেহেরই বিকাশ, অথবা দেহই মনের বিকাশ, এ তর্কের অবতারণা করিব না। কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, দেহের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ডাক্তার ব্যাষ্টিয়ান্, অধ্যাপক লেব প্রভৃতি মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ দেখাইতেছেন যে, স্নায়ুমণ্ডলীর গঠনের উপর ও জ্ঞাত অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়ার উপরই মন বিশেষরূপে নির্ভর করে।* স্নায়ুমণ্ডলের সর্ব্বোচ্চ পরিণতি মস্তিষ্কে। মস্তিষ্ক হইতে সমস্ত মেরুদণ্ডে বিন্যস্ত হইয়া স্নায়ুমণ্ডল দেহের সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়াছে। বাহ্যজগতের ঘাতপ্রতিঘাত, দেহাভ্যন্তরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া স্নায়ুপথেই মস্তিষ্কে নীত হয়। তথায় উপযুক্ত কেন্দ্রে অনির্ব্বচনীয় উপায়ে ভাবে পরিণত হইয়া আমাদিগের বোধগম্য হইয়া থাকে। সেই ভাবতরঙ্গ মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত হইয়া পেশীসংযোগে কর্ম্মে পরিণত হয়। স্নায়ু দ্বিবিধ; অন্তর্ব্বাহী ও বহির্ব্বাহী।† যে স্নায়ু ঘাতপ্রতিঘাত সকলকে মস্তিষ্কে লইয়া যায়, তাহারা অন্তর্ব্বাহী; আর যে স্নায়ু ঐ সকলকে তথা হইতে পেশীমণ্ডলীতে লইয়া আসে, তাহারা বহির্ব্বাহী। যে সকল ঘাতপ্রতিঘাত, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মস্তিষ্কে নীত হয়, তাহারা তথায় পদাঙ্ক রাখিয়া যায়। ইহাই স্মৃতির মূল। স্মৃতি আত্মবোধের প্রধান লক্ষণ। আর আত্মবোধ হইতেই মনের অনেক ভাব উদ্ভূত হইয়াছে। স্নায়ুমণ্ডলই মনের উপকরণ; অন্ততঃ স্নায়ুমণ্ডলের উত্তেজনাই মনকে বিকশিত করিয়াছে। মস্তিষ্ক পদার্থের ঊর্দ্ধতন ভাগই মানবকে মানব-নামের অধিকারী করিয়াছে। যে জীব স্নায়ুবিধানে উন্নত,

---

* *Brain as an organ of mind, chap. X.*

† *Afferent and Efferent.*

সে মনেও উন্নত। তাই বলিয়াছি, দেহ ও মনে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। দেহ সহ স্নায়ু-বিধানও আমরা বংশ-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছি। সুতরাং মনও বংশপরম্পরাগত। অব্যবহিত হউক, দূরবর্ত্তী হউক, পূর্ব্বপুরুষগণই আমাদিগের মনের নিয়ামক। সদ্যোজাত শিশু শূন্য মন লইয়া জন্মে না। কত যুগযুগান্তরের ছায়া বহন করিয়াই জাত হয়। * সমাজের প্রধান সম্পত্তি ব্যক্তি; ব্যক্তির প্রধান সম্পত্তি মন; আর সেই মন পূর্ব্বপুরুষাগত। সুতরাং মনের উন্নতি-অবনতি ও সমাজের উন্নতি-অবনতি এক সূত্রেই গ্রথিত। † সমাজের উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে মনের উৎকর্ষসাধন করিতে হয়। প্রাচীন সভ্যতা এই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল। রোম, গ্রীস, স্পেন, আরবস্থান, এমন কি, চীন ও ভারতবর্ষও মনের বংশানুক্রমিক উন্নতির দিকে যত্নবান্ হওয়া দূরে থাকুক, তেজস্বী মন ও দৃঢ় একাগ্র হৃদয়কে সামাজিক ও রাজনৈতিক দণ্ডে দণ্ডিত, অবরুদ্ধ, এমন কি, ভস্মীভূত করিতে ক্রটী করে নাই। সবল দেহ ও তেজস্বী মন প্রাচীন যুগে নানাবিধ রূপে নিষ্পিষ্ট হইয়াছে। পর পর বংশ গড়িবে কে? তাই তাহাদিগের সভ্যতা স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ অচিরেই বিনষ্ট হইয়া গেল। অতীতকালেও উন্নতি-অবনতি ব্যক্তির উপর নির্ভর করিয়াছে। ভবিষ্যতেও তেমনই সামাজিক উন্নতি ইহারই উপর নির্ভর করিবে। নতুবা কোনও উন্নতিই স্থায়ী হইবে না। উপযুক্ত পিতা মাতা উপযুক্ত সন্তানলাভ করিলে সমাজ উন্নত হইবে। নচেৎ অন্য উপায় নাই। ব্যক্তি গাছে ফলে না। তাই পিতৃ-মাতৃ-নির্ব্বাচন সামাজিক উন্নতি-অবনতির অর্থাৎ স্থায়ী উন্নতি-অবনতির একমাত্র কারণ। মানবশিশু যে উপকরণ লইয়া জন্মিবে, যেরূপ দেহ ও মন লইয়া মাতৃগর্ভে সংস্থিত হইবে, তাহার নিকট তদতিরিক্ত ফলের আশা করা যায় না। মানুষকে কাদার মত গড়িয়া পিটিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করা যায় না। যে শিশুর যথাযোগ্য উপকরণ নাই, তাহাকে গড়িলে পিটিলেও শঙ্করাচার্য্য হইবে না। শিক্ষা দিলে শিক্ষা বিফল হইবে। শিক্ষার উপযোগিতাই তাহার নাই, সে শিখিবে কেমন করিয়া? সকলকেই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, এ কথা বলিয়া সমাজকে প্রতারিত করা

---

* The tabula fasa of Locke is the last thing in the world to resemble a child's mind. Indeed * * the child's mind is a piece of mosaic—made of ancestral pieces.—*Parenthood* P. 12d.

† *Weismen's Heredity* Vol II P. 22.

অতীব অসঙ্গত! ডাক্তার রেণ্টুল বলিতেছেন,—it is not honest for us to gull the public into believing that these can be really educated ডাক্তার সেলিবী এই কথাই অন্য ভাষায় বলিতেছেন,—it must be maintained that education is limited in its power by the inherent nature of the educated material; it is a process of drawing out and you can not draw out what is not there. অধ্যাপক টম্‌সন্ আরও দৃঢ়তর ভাষায় বলিতেছেন,—the psyehical charectors are inherited in the same way and at the same. rate as the physical. অর্থাৎ, মানবের দেহ যে পরিমাণ বংশপরম্পরাগত, মনও তদ্রূপ। দেহ শুক্র-শোণিতের সংমিশ্রণ-জাত। সুতরাং মনও ঐ সংমিশ্রণেরই ফল। তাই টম্‌সন্ বলেন,—জন্মগত ভাব কিছুতেই যাইবার নহে। * তবে কি আমরা সেই নিশ্চেষ্ট অদৃষ্ট-বাদে আসিয়া উপনীত হইলাম? না, তাহা নহে। শিশু যে উপকরণ লইয়া জন্মিয়াছে, তাহাকে তদুপযোগী পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ফেলিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহার অন্তর্নিহিত নিগূঢ় শক্তি পরিস্ফুট হইবে। হেকেল্ বলেন,—ব্যক্তির প্রবণতা অর্থাৎ ঝোঁক বংশানুগত; কিন্তু কর্ম্মে তাহার বাহ্যবিকাশ হওয়া না হওয়া সাময়িক অবস্থার অধীন। এই সাময়িক অবস্থাই পারিপার্শ্বিক অবস্থা। † শিক্ষা এই পারিপার্শ্বিক অবস্থারই নামান্তরমাত্র। ‡

এই আলোচনা হইতে কি বুঝিলাম? বুঝিলাম,—ব্যক্তি গড়িতে হইলে বংশ চাই; শিখাইতে হইলে যথাযোগ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিধান করা চাই। তাহা হইলে সেই পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপযোগী শিক্ষায় ব্যক্তির অন্তর্নিহিত নিগূঢ় উপকরণকে টানিয়া বাহির করিবে, এবং তাহাই স্থায়িত্ব

---

* Nor from the moment of fertilization can teaching or hygeine or exhortation pick out the particles of evil in that zygote or put one particle of good.—*Thomson's Heredity. P. 507,*

† The character of the inclination was determined long ago by heridity from parents and ancestors, the determination to each particular act is an instance of adaptation to the circumstances of the moment where-in the strongest motive prevails.—*The Riddle of the uuiverse. chap. VII. P. 47.*

‡ "Education the provision of an environment.—*Parenthood* P. 125.

লাভ করিবে। নচেৎ, যাহা তাহার আভ্যন্তরিক উপকরণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না, তাহা বাহির হইতে আনিয়া লেপিয়া দিলে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইবে; সুধু নিষ্ফল নহে, অবনতির বীজ তখনই বপন করা হইবে। ইহাই প্রকৃত আশঙ্কা। *

এক্ষণে সামাজিক উৎকর্ষসাধনের প্রকৃত তথ্য হৃদয়ঙ্গম করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইতে পারে। আমরা দেখিয়াছি যে, আর কিছুতেই স্থায়ী উন্নতির আশা করা যায় না, সকলই দু' দিনেই ফুরাইয়া যায়। কেবল যিনি সকল কর্ম্মের কর্ম্মী, সকল উন্নতি-অবনতির কর্ত্তা, সেই ব্যক্তি যোগ্য হইলেই উন্নতি স্থায়ী হইল, নতুবা নহে। কিন্তু উন্নতি স্থায়ী হইলেও আশঙ্কা দূর হয় না। উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া চাই। এ ক্ষেত্রে দাঁড়াইবার স্থান নাই। উন্নতি বন্ধ হইলেই অবনতির আরম্ভ হইবে। তবে ব্যক্তির উন্নতি কিরূপে সাধিত হইবে? কেবলমাত্র বংশপরম্পরার প্রতি মনোযোগ করিয়া, এবং যথাযোগ্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিধান করিয়া।

কিন্তু মানবের দুর্ভাগ্যবশতঃ এত দিন এ দিকে কেহই লক্ষ্য করেন নাই। মানব গৃহপালিত পশুর উন্নতিবিধান করিতে গিয়া যে সকল নিয়ম স্বয়ং প্রতিপালন করিতেছে, তাহাকে আপনার সম্বন্ধে সেই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দ্রুতগামী অশ্ব চাই, ঘোড়দৌড় জিতিতে হইবে। অশ্ব-ব্যবসায়িগণ কি করিয়া থাকেন? বংশানুক্রমে যে অশ্ব এই কর্ম্মের উপযোগী, তাহাকে আনিয়া, অথবা তাহা দ্বারা অশ্ব-শাবক উৎপন্ন করাইয়া লইয়া, উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করেন। যে-সে অশ্ব আনিয়া তাহাকে দ্রুতগমন শিক্ষা দেওয়াই যায় না। প্রচুরদুগ্ধবতী গাভী চাই। গোপালকগণ কি করিয়া থাকেন? তদ্রূপ গাভীতে বৎস উৎপন্ন করাইয়া লন; তৎপরে তাহাকে উত্তম আহার প্রদান করেন। সুবৃহৎ আম্রফল চাই। তখন মালদহী ফজলীর চারা করিতেই হইবে; যে-সে গাছে তাহা হইবেই না। মানুষ এ সকলই জানে। কিন্তু নিজের সম্বন্ধে তাহা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যায়। ব্যক্তির উৎকর্ষের দিকে একেবারেই লক্ষ্য করে না। যেমন তেমন নরনারী হইলেই হইল। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা, এবং কখনও কখনও পুত্রদায়গ্রস্ত পিতাও কোনও প্রকারে দায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলেই

* There is thus a real risk involved in the accumulation of acquired traditional or educational progress.—*Ibid P. 265.*

কৃতার্থ হন। এরূপ করিলে যথেচ্ছ-পরিণীত নর-নারীর সন্তান-সন্ততি সাধারণতঃ অযোগ্যই হইয়া যাইবে। দৈবাৎ কখনও যোগ্য পুত্রলাভ হইলেও হইতে পারে। তখন সমাজও লাভবান হয়; নচেৎ সাধারণতঃ সমাজ ক্ষতিগ্রস্তই হইয়া থাকে। সমাজস্থ যোগ্য, সুস্থ ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির অপত্য ভিন্ন সমাজের উৎকর্ষসাধন করিবার আর কাহারও অধিকার নাই।* সাময়িক উত্তেজনায় যিনি যতই আস্ফালন করুন, আর কাহারও দ্বারা সমাজের উন্নতিবিধান হইতে পারে না। সুতরাং সমাজের উৎকর্ষ-সাধন করিতে হইলে, আমাদিগের প্রধান কর্ত্তব্য,—কর্ম্ম, দেহ ও মনে উৎকৃষ্ট নর-নারীর যৌন-সম্বন্ধের স্থাপন। মানসিক শক্তিও যে দৈহিক সবলতার ন্যায় বংশানুক্রমে অর্জ্জন করা যাইতে পারে, ইহাই সামাজিক উন্নতির প্রধান আশার স্থল। তাই কোনও বিখ্যাত সমাজ-তত্ত্ববিৎ বলিয়াছেন,—there can be no question that amongst the promises of race-culture is the possibility of breeding such things as talent and the mental energy upon which talent so largely depends. সুস্থ ও সবল দেহ, পবিত্র ও তেজস্বী মন, শান্ত ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ স্বভাব,—এ সকলের অধিকারী ব্যক্তি অল্প সময়ের মধ্যেই সমাজের হিতার্থ যত কর্ম্ম করিতে সক্ষম হন, রুগ্নদেহ, দুর্ব্বল-মন তাহা দীর্ঘকালেও সম্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না। এ নিমিত্ত যিনি সমাজের মঙ্গলসাধন করিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি পরবংশীয়গণের পিতৃত্ব-নির্ব্বাচনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী হইবেন। পিতৃত্ব বলিতে মাতৃত্বকেও বুঝিতে হইবে। উন্নতির প্রধান উপায়,—জ্ঞানপূর্ব্বক বিবাহক্ষেত্রের প্রসার, এবং যথাযোগ্য ব্যক্তির বিবাহ-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা। রুগ্ন, পতিত ব্যক্তিগণের দ্বারা পরবর্ত্তী বংশ গঠিত হইলে সামাজিক অবনতির হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই। যাহারা বংশানুক্রমিক উৎকট পীড়াগ্রস্ত, যাহারা মদ্যপায়ী, এবং সুরাপ্রভাবে যাহাদিগের দেহ ও মন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নরহন্তা, দস্যু, তস্কর, পরস্বাপহারী প্রভৃতি যাহারা সামাজিক অপকর্ম্মসাধনে একান্ত অনুরক্ত, যাহারা অন্ধ, খঞ্জ, বিকৃতচিত্ত, এ সকল ব্যক্তির অপত্যোৎপাদন সামাজিক অবনতির প্রধান হেতু। ইহাদিগের বিবাহ নিষেধ করা বোধ হয় অরণ্যে রোদনের

---

* No race or species, vegetable, animal or human, can maintain much less raise its organic level unless its best be selected for parenthood.—*Ibid P. 264*

ন্যায় নিষ্ফল; কিন্তু ইহারা যাহাতে সন্তান উৎপাদন করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আধুনিক জীবতত্ত্ববিৎগণ ইহাদিগের বন্ধ্যাত্ব-উৎপাদন জন্য sterilization প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন করিয়াছেন। ইহাতে সামান্য অস্ত্রপ্রয়োগ আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু তাহা কষ্টকর নহে। যত দিন সমাজ ঈদৃশ বিধানে সম্মত না হইবে, তত দিন স্থায়ী উন্নতির আশা করা দুরাশামাত্র। সামাজিক উন্নতি ব্যক্তির রক্তমাংসের মধ্যে নিহিত। বাহিরের চাকচিক্য কিছুই নহে। *

বাহিরের চাকচিক্য বলিতে কি বুঝি? আমি ত বর্ত্তমান সভ্যতা বুঝি। নয়ন-মনোহর গগনস্পর্শী সৌধমালা, বৃক্ষ-লতাবিভূষিত প্রশস্ত রাজপথ, বিচিত্র উদ্যান, গাঢ়কৃষ্ণধূমোদ্গারী-বিশাল আগ্নেয় যন্ত্র, মনের ন্যায় বেগগামী বিদ্যুৎপ্রবাহবাহী অদ্ভুত তড়িৎযন্ত্র, মানবের ভাষানুকারী আশ্চর্য্য বাক্‌যন্ত্র, এ সকল কি সভ্যতার পরিচায়ক নহে? অবশ্যই পরিচায়ক। যে সমাজ এ সকল উদ্ভাবিত করিতে পারে, সে সমাজ মনের উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান মানবের সুখবিধানের প্রধান সহায়। বিজ্ঞান ব্রহ্মাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া মানবকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিবার প্রধান উপকরণ। এ সকল আমি কতবার বলিয়াছি। ইহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস আদির চর্চ্চা মানবকে মানব-নামের অধিকারী করে, ইহা সত্য। কিন্তু এ সকল বাহির হইতে কেবলমাত্র অনুকরণ দ্বারা প্রাপ্ত হইলে ফল স্থায়ী হইতে পারে না। সমাজের মধ্য হইতে গড়িয়া উঠা চাই। এ সকলের উপযোগী ব্যক্তি সমাজে জাত হওয়া চাই। সমাজ এ সকল পাইলেই কৃতার্থ হয়, তাহা নহে। সমাজ যন্ত্র চায় না, জীবন চায়। বিজ্ঞান চায় না, ব্যক্তি চায়। তাই সূক্ষ্মদর্শী সেলিবি বলিতেছেন— the products of progress are not mechanisms but men. অযোগ্য মানুষ অনুকরণ করিয়া বাহির হইতে যাহা প্রাপ্ত হইবে, তাহা সে কখনই আত্মসাৎ করিতে পারিবে না। তাহা তাহার নিজস্ব কখনই হইতে পারিবে না। তাহার ভারে সে আপনই চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালে অনেক সমাজ সভ্যতায় অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু সমাজের যাহা প্রধান সম্পৎ, সেই মানুষকে, সেই জন্মগত মানুষকে প্রাপ্ত

* ... will not compensate for racial inherent decadence —

হইবার কৌশল শিক্ষা করে নাই। তাই মানুষের অভাবে কোনও সমাজের সভ্যতাই স্থায়ী হইল না। মানুষ গড়িতেই হইবে। কেমন করিয়া গড়িব? ইহাই মানবের প্রধান আলোচ্য। লোক-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতবর হ্যাডেন্ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—it seems strange that man should study every thing in heaven and earth and largly neglect the study of himself, yet this is what has virtually happened * * * after all we are of more interest to ourselves than any study can be. *

মানুষ সকলই আলোচনা করে, কেবল নিজের বিষয় আলোচনা করে না। আর সময় নাই, মানুষ গড়িতেই হইবে। কিন্তু ইহাও কি সম্ভব? মানুষ কি ইচ্ছামত গড়া যাইতে পারে! মানবশিশু জন্মিবার পর আর ইচ্ছামত গড়িয়া পিটিয়া তোলা যায় না, সত্য। কিন্তু জন্মিবার পূর্ব্বে, যাঁহাকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল নহে। মানবের প্রযত্ন এ ক্ষেত্রে একেবারেই বৃথা হয় না। ইচ্ছামত পুত্রকন্যা-লাভ সহজসাধ্য নহে; কিন্তু বংশানুক্রমের নিয়ম সকল, পরিবর্ত্তনের ও বিবর্ত্তনের † নিয়ম সকল, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য-ভঙ্গের তথ্য সকল স্মরণ রাখিয়া যথাযোগ্য নর-নারীর পবিত্র বিবাহ-বন্ধন স্থাপন করিতে জানিলে, মানব-প্রযত্ন সফলতার দাবী করিতে পারে। কিন্তু এ সকল অবগত হওয়া শ্রমসাধ্য। এ শ্রম স্বীকার করিতেই হইবে। এ শাস্ত্রকে প্রধান আলোচ্য বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিতেই হইবে।

সকলেই জানেন, আমরা বাঙ্গালী জাতি ক্রমশঃ অবনত হইয়া যাইতেছি। বিবাহক্ষেত্র এত সংকীর্ণ আর কাহার হইয়াছে? ফলও হাতে-হাতেই পাইতেছি। কাহারও বিবাহ হইতেই পারিল না; কাহারও বা বিবাহ হইল, অপত্য হইল না। কাহারও সন্তান-সন্ততি প্রায় মরিয়াই গেল। উচ্চ-শ্রেণীস্থ হিন্দু ৪০।৫০ বৎসরের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গেল। মোটের উপর বাঙ্গালী বাড়িতেছে; কিন্তু বাড়িবার হার ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। বাঙ্গালীর সংখ্যা-বৃদ্ধি প্রায় নিম্নশ্রেণীতেই দেখা যায়। সরকারী আদম-সুমারীও এই সকল কথার সমর্থন করে। কেবল নিম্নশ্রেণী হইতে সমাজকে

---

* *Study of man. P. P. XV. XXIV,*

গড়িয়া তুলিলে, সমাজ জনশালী হওয়া সম্ভব, কিন্তু যোগ্য হইবে না। সুতরাং উন্নত হইবে না। কোনও সমাজ-তত্ত্ববিৎ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন,—A nation recruted from slumdom never rises. * আমাদিগেরও বুঝি তাহাই হইতে চলিল।

কিন্তু ইহুদী জাতির লোকতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে মনে আশার সঞ্চার হয়। ইহাদিগের প্রায় সকলই গিয়াছে। দেশ নাই, ঐক্য নাই, শিক্ষা নাই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা একেবারেই নাই। যন্ত্র-বহুল সভ্যতা কিছুমাত্র নাই। কিন্তু ইহাদিগের প্রধান সম্পত্তি এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইহাদিগের ব্যক্তিত্ব অবনত হয় নাই। ইহারা দেহে ও মনে কেমন সুন্দর! ইহাদিগের সুগঠিত দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ নয়নাভিরাম। ইহাদিগের মধ্যে সামাজিক পাপে কলঙ্কিত ব্যক্তির সংখ্যা নগণ্য বলিলেই হয়। উৎকট পীড়াগ্রস্ত, মদ্যপায়ী, নীচপ্রকৃতি ইহুদীর সংখ্যা নিতান্তই অল্প। ইহাদিগের সদ্যোজাত শিশু আকৃতিতে, বক্ষঃপরিমাণে ও গুরুত্বে অনেক জাতিকেই পরাভব করে। ইহাদিগের মধ্যে শিশুমরণ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প। † ইহাদিগের জন-সংখ্যা অধিক বিস্তৃত না হইলেও নিতান্ত অল্প নহে। ইহাদিগের ধৈর্য্য, একাগ্রতা, উদ্যমশীলতা জগতের ঈর্ষ্যাবৃত্তি জাগাইয়া তুলিয়াছে। ইহাদিগের উপর যুগে যুগে কত অত্যাচার, উৎপীড়ন চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহারা পর্ব্বতের ন্যায় অটল। তথাকথিত সভ্যতায় ইহারা পতিত; কিন্তু মানব-সম্পৎ কাহারও অপেক্ষা ইহাদিগের ন্যূন নহে; তাই ইহাদিগের ভবিষ্যতের আশা আছে। ইহার গূঢ় রহস্য কি? যে বিপদরাশি পুনঃপুনঃ ইহাদিগকে নিষ্পিষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহাই ইহাদিগের রক্ষা-কবচস্বরূপ হইয়া যুগে যুগে রক্ষা করিয়াছে। ঐ বিপদরাশিমধ্যে অযোগ্যের স্থান হয় নাই; তাহারা নিষ্পিষ্ট হইয়া কালগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। যাহারা জীবিত আছে, তাহারা বাছা লোক। দৈহিক ও মানসিক বলে যাহারা বলীয়ান ছিল, চরিত্রগুণে যাহারা তেজস্বী ছিল, তাহারাই সহস্র উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও জাতীয় বিজয়-পতাকাস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে। যাহারা বিজয়ী, তাহারাই ইহুদী

---

* Quoted from memory.

† All observers are agreed that infant mortality is at a minimum amongst then Jews; their children are superior in hight and weight and chest

সমাজের যোগ্যতম ব্যক্তি। যোগ্যতমের জয় চির-প্রসিদ্ধ। তাই ইহুদী-সমাজ আজ ব্যক্তিত্বে সৌভাগ্যশালী *। ইহাদিগের বিবাহবন্ধন যোগ্যে যোগ্যে। যে যোগ্যতমেরা রহিয়া গিয়াছে, তাহারাই এখন পর-পর-বংশ গঠিত করিতেছে। তাই বলিয়াছি, ইহাদিগের আশা আছে। বাঙ্গালী হিন্দু জাতির কি আশা নাই?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে পূর্ব্বের কথা স্মরণ করা আবশ্যক। আমরা বলিয়াছি, মানবের মন, স্নায়ুমণ্ডলী ও তাহার শেষ পরিণতির অর্থাৎ মস্তিষ্ক পদার্থের উপর নির্ভর করে। স্নায়ু ও মস্তিষ্কে যে সকল স্নায়ুমণ্ডল অবস্থিত, তাহারা মনোবিকাশের বিশেষ সহায়তা করে। মনের ক্রিয়া দৈহিক আর কোনও যন্ত্রের উপরই সাক্ষাৎস্বরূপে নির্ভর করে না। অন্য যন্ত্রাদি পুষ্ট ও সুস্থ না থাকিলে স্নায়ু-মণ্ডল ক্রিয়া করিতে সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপে অসমর্থ হয়। তাই উহারা যে পরিমাণে স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সহায়তা করে, সেই পরিমাণেই মনের বিকাশের নিমিত্ত আবশ্যক হয়; নতুবা আবশ্যক হইত না। মনের উন্নতিতেই যদি মানুষ মানুষ-নামের যোগ্য হয়, আর স্নায়ুমণ্ডলই যদি মনোবিকাশের একমাত্র যন্ত্র হয়, তবে সেলিবি সত্যই বলিয়াছেন,—the nervous system is the man. মানুষ বলিতে স্নায়ুমণ্ডলকেই—সুতরাং মনকেই সূচিত করে। মনই মানুষ। † এক্ষণে নিম্নতর জীবগণের কথা স্মরণ করুন। প্রথমজ ও কীটশ্রেণী হইতে মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পক্ষী ও স্তন্যপায়ী পর্য্যন্ত, যাহার স্নায়ুমণ্ডল যত প্রকটিত হইয়াছে, মনও তাহার ততই বিকশিত হইয়াছে। প্রথমজ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীতে দেহই প্রধান, মন প্রায় কিছুই নহে। উত্তরোত্তর দেহের প্রাধান্য কমিয়া মনই প্রবল হইয়াছে। মানবের দেহ ত নাই বলিলেই হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, পৃষ্ঠবংশ, পঞ্জর, পাকস্থলী, অন্ত্র, হনু ইত্যাদি অত্যাবশ্যক যন্ত্র সকল ইতর জীবের তুলনায় মানবের কতই অবনতির

* Every measure of persecution practised against them has directly tended towards this very end * * * their unexampled struggle has been a great source of their unexampled strength. The weaklings and the fools being weeded out, intensity and strength of mind became the common heretage of this amazing people.—*Ibid* P. 274.

† Man is above all things mind.—*Ibid* P. 54.

দিকে অগ্রসর হইয়াছে! ইহারা সকলেই ধ্বংসাভিমুখ। * মানবের ক্ষীণ, দুর্ব্বল দেহ জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে কখনই পারিত না। মানবের মনই তাহাকে জীবরাজ্যের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। মানবের মস্তক ও মস্তিষ্কই তাহার প্রধান বিশেষত্ব। অন্যের পক্ষে দেহই প্রধান সম্বল, কিন্তু মানবের মনই প্রধান। তাই মানবসমাজের উন্নতির প্রধান উপায়,—মনের উৎকর্ষ-সাধন; অর্থাৎ স্নায়ুমণ্ডলের উৎকর্ষসাধন। † স্নায়ুমণ্ডলের ক্রিয়াপ্রবণতার বাহ্য লক্ষণ,—ভাব, বুদ্ধি ও উদ্যমশীলতা। সামাজিক প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত, সমাজের হিতার্থ এ সকলের যিনি যত অধিক নিয়োগ করেন, তাঁহার সন্তান-সন্ততি ততই সমাজের উৎকর্ষসাধন করিতে সক্ষম হয়। দেহকে তুচ্ছ করিতেছি না; দেহ পুষ্ট ও সুস্থ থাকিলে স্নায়ুমণ্ডলের, সুতরাং মনের ক্রিয়ার সহায়তা করে। কিন্তু প্রধান লক্ষ্যই মন। যিনি এই পদার্থের অধিকারী, তিনিই পর-পর-বংশের জন্মদান করিবার অধিকারী। মানব-সমাজের স্থায়ী উৎকর্ষসাধন করিতে হইলে, বংশপরম্পরায় মনের উৎকর্ষই সাধন করিতে হয়। ব্যক্তিগত উৎকর্ষ অপেক্ষাকৃত সহজ কথা; কিন্তু জাতীয় উৎকর্ষ, উন্নতমন নর-নারীদিগের যৌন-সম্বন্ধ-স্থাপন ও দুর্ব্বল পতিত-মনদিগের যৌন-সম্বন্ধ-নিষেধ, এই উভয়ের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। এই দুই সংস্কার যুগপৎ সিদ্ধ না হইলে সুফলের আশা নাই।

এক্ষণে পূর্ব্ব প্রশ্নের সদুত্তর বিবেচনা করুন। বাঙ্গালী জাতির কি আশা নাই? বাঙ্গালী দীর্ঘকাল অনেক উৎপীড়ন সহ্য করিয়াছে; তাহাদিগের দেহ ‡ অবসন্ন হইয়াছে; তথা-কথিত সভ্যতার লক্ষণ সকল অনেক তিরোহিত হইয়াছে। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলের শক্তির ও প্রভাবের হ্রাস কোনও অংশেই দেখা যায় না। জাতীয় কর্ম্মে অনভ্যাসবশতঃ অথবা জাতীয় কর্ম্ম স্বায়ত্ত না থাকায় মনে কিঞ্চিৎ জড়তা না আসিয়াছে, এমন নহে। কিন্তু তাহাদিগের ভাব, বুদ্ধি ও উদ্যমশীলতা এখনও বিনষ্ট হয় নাই। ইহুদী জাতির ন্যায় বাঙ্গালী জাতিরও উপকরণ ঠিক আছে, কেবল বিকাশ নাই। নাই বা বলি কেন? যে জাতি এত হীন-অবস্থার মধ্যেও, এত পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রকে, নগেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে, বিদ্যাসাগর ও

* মৎপ্রণীত 'পরবশতা' গ্রন্থে 'মানব দেহের পরিণতি' দ্রষ্টব্য।

† *Descent of Man*. P. 219.220.

অক্ষয়কুমার দত্তকে, মধুসূদন ও হেমচন্দ্রকে, রামতনু ও দেবেন্দ্রনাথকে, রামমোহন ও জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে—কত নাম করিব?—এবং সর্ব্বোপরি চৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হইয়াছে, তাহারা ঐ ত্রিবিধ সম্পদে হীন ত হয়ই নাই, হীনতার বিশেষ কোনও লক্ষণও তাহাদিগের মধ্যে দেখা যাইতেছে না। স্নায়ুমণ্ডলই মানবের প্রকৃত energy; এ জাতির সে energy কত রকমে পরীক্ষা করিতে চাও? তাহার কিয়দংশ গূঢ় হইয়াছিল মাত্র, নষ্ট হয় নাই। ডারউইন্ বলেন,—জনন-হীনতাই জাতীয় বিলোপের প্রধান কারণ। বাঙ্গালীর সে কারণ অদ্যাপিও উপস্থিত হয় নাই। জানি, ইহাদিগের জন্মসংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যুসংখ্যা অধিক। ইহাদিগের সহস্র জনে জন্মের হার ৩৩, মৃত্যুর হার ৩৮ হইয়াছে। জানি, বর্ষে বর্ষে ইহাদিগের মধ্য হইতে ১২ লক্ষ লোক নানাবিধ রোগে মরিয়া যাইতেছে।* কিন্তু আমি সম্প্রতি লোক-পরীক্ষা দ্বারা যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাতে জনন-হীনতার কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। আমি জননশক্তির সম্বন্ধে যে তালিকা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার সারাংশ পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালী জননশক্তিতে হীন, অথবা স্নায়ুবিধানে ক্ষীণ হয় নাই; ভাব, বুদ্ধি ও উদ্যমে অবনত হয় নাই। কতিপয় বৎসর হইল, এই জাতির যে উদ্যমশীলতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা জগতে অতুলনীয়। এত অল্প দিনে এমন প্রকাণ্ড সাহিত্য কোন্ জাতি গড়িতে পারিয়াছে? এত অল্প দিনে শিক্ষা ও শিল্পবাণিজ্যে এত উদ্যমশীলতা কোন্ জাতি দেখাইতে পারিয়াছে? বাঙ্গালীর প্রতিভার পরিচয় আপনাদিগের সমক্ষেই সশরীরে বর্ত্তমান। সুতরাং মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, বাঙ্গালীর জনন-শক্তি ও মন অধঃপতিত হয় নাই। যদি তাহাই হইল, তবে জাতীয়মঙ্গলকামী, (যিনি প্রকৃত ও স্থায়ী মঙ্গল কামনা করেন) তাঁহার নিরাশ হইবার কারণ নাই। তিনি বিবেচনাপূর্ব্বক জীবতত্ত্বের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিয়া, বিশেষতঃ পরিবর্ত্তন ও বংশানুক্রমের নিয়ম সকল স্মরণ রাখিয়া, এই জাতির নরনারীগণকে পবিত্র দাম্পত্যসূত্রে সম্বদ্ধ করিতে জানিলেই, জাতীয় প্রধান উপকরণ, অর্থাৎ

---

* অবশ্য মৃত্যুর হার জন্মের হার অপেক্ষা কমাইতেই হইবে। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির সহিত ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের প্রচারের সহিত, মৃত্যুর হার কমিবেই। নচেৎ জন্মিয়া লাভ নাই। অধিক জন্ম, অধিক মৃত্যু। সুতরাং জন্মের আধিক্যে লাভ নাই, যদি মৃত্যুর সংখ্যার হ্রাস না হয়। ইহা হইলেও। মূল কথাই জননহীনতা।

যথাযোগ্য শিশু লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। সেই ভবিষ্যতের আশাতরু —বঙ্গশিশু—লাভ করিয়া, এবং তাহাকে সুশিক্ষা ও সৎসঙ্গদানে প্রতিপালিত করিয়া, জাতীয় উন্নতির স্থায়িত্ববিধান করিতে সমর্থ হইবেন। সকল কর্ম্মের, সকল উন্নতির একমাত্র কর্ম্মী যিনি, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইবেন। জাতির একমাত্র সম্বলই মানব। ধন, ঐশ্বর্য্য, এ সকল স্থায়ী নহে। যথাযোগ্য মানব না থাকিলে, এ সকলে অধঃপতনের গতিরোধ করিতে পারে না। তাই কত সভ্যতা, কত সাম্রাজ্য জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। প্রাচীনগণ মানব গড়িতে জানেন নাই। বংশ-পরম্পরার দিকে একাগ্র দৃষ্টি রাখিয়া মানব গড়িতেই হইবে। মানবসমাজের কথা ভাবিতে গেলে, যৌনসম্বন্ধের উপযোগিতাই প্রধান বিবেচ্য। যাঁহারা শক্তিশালী, অর্থাৎ মনের বলে বলীয়ান, যাঁহারা সুস্থ ও সমাজের উন্নতিকামী, তাঁহারাই পরবংশ গঠিত করিবেন। তাঁহারাই পবিত্র বিবাহ-বন্ধন আশ্রয় করিয়া স্থায়ী উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করিবেন। যাহারা রুগ্ন, দুর্ব্বলমন ও সমাজদ্রোহী, তাহারা অনুরূপ অপত্যের জন্মদান করিয়া ভবিষ্যৎসমাজকে অধঃপতিত করিবার দাবী রাখিতে পারিবে না। দেহে ও মনে সুস্থ ও সবল নরনারী ভবিষ্যৎ-সমাজ গঠিত করিবেন, অন্যে করিতে পারিবে না; ইহাই জাতীয় উৎকর্ষসাধনের মূলমন্ত্র। এ মন্ত্রে সিদ্ধ হইবার জন্য খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি বহু বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক; কিন্তু আমার সে সময় ও সামর্থ্য নাই। তথাপি এ কথা বলিতে পারি যে, অভিলষিত নরনারী স্বসমাজে সুলভ হয়, ভালই; নচেৎ অন্য সমাজ হইতেও গ্রহণ করা আবশ্যক হইতে পারে। হইতে পারেই বা বলি কেন? সময় সময় তদ্রূপ করা জাতীয় উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক। অধ্যাপক টমসন্ বলিতেছেন,—এইরূপ করিলে সমাজমধ্যে নূতন রক্তের সহিত নবশক্তি সঞ্চারিত হয়। সমাজ যখন অন্তর্জাতীয় বিবাহ দীর্ঘকাল অবলম্বন করে, তাহার পর বহির্জাতীয় বিবাহ প্রয়োজনীয় হয়। এতদুভয় বিবাহপ্রণালী অবলম্বন করিলে জাতীয় চরিত্র যেমন স্থায়িত্ব লাভ করে, তেমনই সেই ভিত্তির উপর কল্যাণকর পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হইবার অবসর পায়। ‡ নচেৎ জাতীয় স্থিতি-

* The establishment of a successful race or stock requires the alternation of periods of inbreeding (endogamy) in which characters are fixed, and periods of out-breeding (exogamy) in which by the introduction of fresh blood new variations are produced.—*Heredity*, P, 537.

স্থাপকতা থাকে না। এ কথা বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশীয়গণের অপ্রীতিকর হইলেও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তিগণ অযোগ্য হইলে কোনও উন্নতিই স্থায়ী হয় না। এ কথা বিস্মৃত হইলে জাতীয় অবনতি নিবারণ করিবার উপায় থাকিবে না। মঙ্গলময়ের ইচ্ছায় এ কথা এতদ্দেশীয়-গণের হৃদয়ে বদ্ধমূল হউক। জীব-বিজ্ঞান এই আশার বাণী লইয়াই আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। অলমতিবিস্তরেণ।

পরিশিষ্ট।

জনন-শক্তির ও আয়ুষ্কালের হ্রাসবৃদ্ধির অবধারণ করিবার নিমিত্ত মোট ১৩৭ জন লোককে জিজ্ঞাসা করা হয়। তন্মধ্যে ১৩১ জন হিন্দু; ৬ জন মুসলমান। সকলে সকল কথা বলিতে পারে নাই। তাহাদিগের উত্তর ৯টি তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাহাতে দেখা গেল যে, চারি পুরুষের মধ্যে শতকরা ২২.০৭ জনের জনন-শক্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং ১৪.৬ জনের হ্রাস হইয়াছে। ৭.৪ জনের জনন-শক্তি অতিমাত্র অব্যবস্থিত। অবশিষ্ট ৫৫.৯৩ জনের জনন-শক্তির সামান্য ইতরবিশেষ হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে হ্রাসবৃদ্ধি বড় বুঝা যায় না। এই সকল তালিকায় কোনও কোনও ব্যক্তির একাধিক স্ত্রীর অপত্যও এক স্ত্রীর অপত্যের ন্যায় গণনা করা হইয়াছে। কাহারও কাহারও বংশে হঠাৎ অপত্যসংখ্যার অত্যন্ত বৃদ্ধি অথবা হ্রাস দেখা যায়, এবং বর্ত্তমান পুরুষে অনেকের সন্তানজননক্ষম বয়স অতীত না হওয়ায় এখনও হ্রাসবৃদ্ধি নিশ্চিতরূপ বলা যায় না। কিন্তু অতীত তিন পুরুষের তুলনায় বোধ হয় জনন-শক্তি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। ইহা দারিদ্র্যের লক্ষণ হইতে পারে; কারণ মোটের উপর গত তিন পুরুষে অর্থাৎ প্রায় ১০০ বৎসরে জনন-শক্তি দ্বিগুণ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যবসায়-ভেদে জনন-শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি বুঝা গেল না। তালিকাগুলির অধিকাংশেই ভদ্রলোকের নাম; সুতরাং উচ্চশ্রেণীর লোকের জনন-শক্তি বর্দ্ধিত হইবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। নিম্নশ্রেণীতে জনন-শক্তির বৃদ্ধি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে আরও অনুসন্ধান আবশ্যক।

চারি পুরুষের আয়ু সম্বন্ধে এই তালিকায় দেখা যাইতেছে যে, প্রতি পুরুষের আয়ুষ্কাল ক্রমে কিছু কিছু কমিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান পুরুষ জীবিত; সুতরাং এই কমা স্থির থাকিবে কি না, বলা যায় না। ঊর্দ্ধতন পুরুষের গড় আয়ু (Mean longivity) প্রপিতামহ-শ্রেণীতে ৭০.৮; পিতামহ

শ্রেণীতে ৬৪'৬; পিতৃ শ্রেণীতে ২৮'৬ জানা গিয়াছে। বর্ত্তমান পুরুষে উপস্থিত গড় আয়ু ৩১'৮। কিন্তু এই শেষোক্ত অঙ্ক গ্রহণীয় নহে। এ বিষয়েও আরও অনুসন্ধান আবশ্যক।

জনন-শক্তি বাড়িতেছে, অথচ আয়ু কমিতেছে; সুতরাং মারাত্মক পীড়ার প্রাদুর্ভাব সূচিত হইতেছে।

এই দুই বিষয়ের তালিকা-সংগ্রহের নিমিত্ত শ্রীযুত ভবানীকান্ত লাহিড়ী, শ্রীযুত ভবানীপ্রসাদ রায় ও শ্রীমান সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রেয়, নগেন্দ্রনাথ মৈত্রেয়, গোপীবন্ধু সান্যাল ও কুমুদনাথ দত্ত মহাশয়দিগের নিকট আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। *

শ্রীশশধর রায়।

হরিহর।

এই গ্রামটির মাঝে লৌহপথ চলিয়াছে;
ধূম উগারিয়া তাহে চলে রথ-সারি।
দুই ধারে সূক্ষ্ম পথ, নিত্য নিত্য অবিরত
চলে তাহে কত কাজে কত নর নারী।
লইয়া খড়ের বোঝা কেহ চ'লে যায় সোজা,
মাছের চুপড়ী মাথে মেছুনীরা যায়;
পুস্তকের গোছা লয়ে বালকেরা বিদ্যালয়ে
আঁকিয়া বাঁকিয়া কত রঙ্গভরে ধায়।

গগনে পূর্ব্বাহ্ন-রবি শোভে ফুল্লমুখচ্ছবি,
তরুলতা উঠে জাগি' অপরূপ গানে;
বাজায়ে কর্ম্মের ছন্দ মহাকাল মৃদু মন্দ
চলিয়াছে কোন্ লক্ষ্যে, কেহ নাহি জানে।
পথ পানে দেখি চেয়ে,— মহাব্যস্ত চলে ধেয়ে
শ্যামবর্ণ যুবা এক আপনার মনে
এ দিক ও দিক চায়, পুনঃ যেন নিরাশায়
আপনার পথে চলে উৎসুকনয়নে।

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ভাগলপুরের অধিবেশনে পঠিত।

একই তৈলাক্ত বাস, অঙ্গে তা'র বার মাস,
ছিঁড়িয়া গিয়াছে উড়ি' অংশ অংশ তা'র ;
তৈলাক্ত মাথার কেশ, তৈলাক্ত মলিন বেশ,
আত্মীয়-স্বজন-ত্যক্ত, শ্রীহীন আকার ।
উচ্চে হাসি' কভু ধায়, আকাশের পানে চায়,
মুখে বলে,—"ওরি মত নীল রঙটি কি ?"
একদিন দেখি' মোরে কহিল,—"কেমন ক'রে,
এক দিলে এক পা'ব ব'লে দাও দিখি !"

কথা কহি' পর'পরে, হেরিয়া ব্যথার স্বরে
কহিল রমণী এক আমারে সম্বোধি',—
"আহা বাবা ! ও পাগল, কি ওরে বুঝাবে বল ?
পাগল হ'য়েছে বহুদিবস অবধি ।
জন্ম ব্রাহ্মণের ঘরে, মা উহার কত ক'রে
লেখাপড়া শিখাইল করিয়া যতন ;
দুটি পাশ ক'রেছিল ; তা'র পরে মা মরিল ;
সেই হ'তে হরিহর হ'য়েছে এমন ।"

সকরুণ স্নেহভরে দুটি ফোঁটা অশ্রু ঝরে,
অঞ্চলে মুছি' তা' নারী ত্যজিল সে স্থান ।
সে পাগল হরিহর উচ্চে হাসি অতঃপর,
ঊর্দ্ধদৃষ্টি দ্রুতপদে করিল প্রয়াণ ।
নারীর সে অশ্রু, আর পাগলের হাসিধার,
মুহূর্ত্তে বায়ুর মাঝে কোথা অন্তর্হিত ;
আমার বক্ষের মাঝে সেই উগ্র হাসি বাজে,
ক্ষণে ক্ষণে চিত্ত মোর করি' সচকিত ।

মাতৃহারা হরিহর ! আয় মোর নেত্র'পর,
বারেক দেখিব তোরে পরাণ ভরিয়া ;
তোর মোহ,—জাগরণ, পরিপূর্ণ ও জীবন,
তুই ধন্য ধরাতলে জনম ধরিয়া ।

মাতৃধ্যানে হ'লি ভোর, ধরার বন্ধন-ডোর
অবাধে কাটিলি তুই রহি এ ধরায় ;
তাই আশা মোহ ভয় চরণে লুটায়ে রয়,
ধ্রুবতারকার পানে হিয়া স্থির চায়।

জানিয়াছি এ সংসার অন্ধকার কারাগার,
মাতার অভয় দৃষ্টি না বিরাজে যা'য় ;
এ মোর জীবনসম, জানি' ব্যর্থ পূজা মম,
জানিয়া মঙ্গল-ঘট মা ঠেলেছে পায়—
কি মোহে নয়ন অন্ধ ! আশা ভয়ে এ কি দ্বন্দ্ব !
ছুটিয়া চ'লেছি কোথা আকুল চঞ্চল।
শিখা' মোরে হরিহর, ত্যজিয়া সংসার-ঘর
কি করিয়া তোর মত হইব পাগল ?

যে নয়নে সাধারণ করে তোরে নিরীক্ষণ,
অসম্বদ্ধ-ভাষাভাষী কাণ্ডজ্ঞানহীন ;
আমি তা' দেখিনি তোরে, দেখেছি নয়ন ভ'রে,
মায়ের সাধকমূর্ত্তি চির-উদাসীন।
দেখিয়াছি কর্ম্মহীন শিবেন্দ্র ভ্রমেন দীন,
বিরাগী অলক্ষ্যজন্মা ত্যজিয়া বিভব ;
ধ্যাননেত্রে আপনার, জননীরে হেরি' আর,
হাসেন মোহন হাস্য ত্রিলোকদুর্লভ।

তোর পুণ্য পদধূলি লইব মাথায় তুলি'
দাঁড়া, দাঁড়া হরিহর ! মা-হারা পাগল !
দুর্দ্দাম দুরন্ত তোর ঝটিকার ছন্দে মোর
বাঁধিব হৃদয়বীণা উদ্দাম-চঞ্চল।
ঝঙ্কারিয়া অবিরাম, গা'ব তাহে মাতৃনাম,
সংসারের মিছা সুর পশিবে না কাণে ;
শুনিয়া সে মোর গান, অমনই খুলি' প্রাণ,
হাসিস্ পাগল ! চাহি' মোর মুখপানে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

মালদহে ইতিহাসচর্চ্চা।

আধুনিক কালে বঙ্গদেশের যে অংশ মালদহ জেলার অন্তর্গত, তাহাই প্রাচীন বঙ্গসমাজের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র ছিল। এই স্থানেই বাঙ্গালী জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ অপূর্ব্ব বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; এই স্থানেই তাঁহাদিগের সভ্যতার চরম বিকাশ সাধিত হইয়াছিল; এবং প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য এই স্থানেই বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

মালদহের সাহিত্যসেবা।

সুতরাং মালদহ জেলাই বর্ত্তমান যুগের সাহিত্যিক আন্দোলনের একটি প্রধান কেন্দ্র হওয়া উচিত। বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ও শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত রাধেশচন্দ্র শেঠ মহাশয়দ্বয় বহুকাল হইতে ব্যক্তিগতভাবে মালদহের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণের সংগ্রহকার্য্যে নিযুক্ত আছেন বটে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত দিন এখানে সমবেত চেষ্টার দ্বারা তথ্যসংগ্রহ ও পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিবার উদ্দেশ্যে কোনও সাহিত্যমণ্ডলী বা অনুসন্ধান-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

"মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি"র "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে"র কর্ম্মে যোগদান।

সম্প্রতি মালদহে "বঙ্গদেশস্থ জাতীয়-শিক্ষাপরিষদে"র প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান করিবার জন্য "মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি" নামক এক শিক্ষাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতির অধীনে মালদহ সহরে ও কতিপয় গ্রামে কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্য্যের দ্বারা জাতীয়-শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত সমিতি সাহিত্যালোচনা ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধান কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এ জন্য সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্য্যতালিকার মধ্যে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে :—

(১) আমাদের দেশের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতির উদ্ধার ও উন্নতির জন্য বিশেষ বিশেষ ছাত্র নিযুক্ত করিয়া অর্থসাহায্যের দ্বারা স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিকতায় উৎসাহ প্রদান করা।

(২) এবং মালদহ জেলার বিশেষ ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া তাহার গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করা—'গম্ভীরা'র গান, বিষহরির গান, পদ, কবিতা প্রভৃতি স্থানীয় লোকসাহিত্যের পুষ্টি সাধন করা।

গম্ভীরোৎসব বিষয়ক প্রবন্ধের-লেখক।

সুতরাং "মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি"কে এক দিক হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মালদহস্থ শাখা-সমিতিরূপে বিবেচনা করা যাইতে পারে। সমিতি ইতিমধ্যে স্থানীয় গম্ভীরা-উৎসব উপলক্ষে রচিত গীতের জন্য মুকদুমপুর 'বোল্‌বাই' সম্প্রদায়কে একটি রৌপ্যপদক প্রদান করিয়াছেন, এবং গম্ভীরার ইতিহাস-সঙ্কলনের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়া একটি প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই প্রবন্ধ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধলেখক শ্রীযুত হরিদাস পালিত মহাশয় এই শিবোৎসবের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিতে যাইয়া প্রকারান্তরে বঙ্গদেশের সমাজ ও ধর্ম্মের ইতিহাসের উপকরণ সঙ্কলন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে বঙ্গদেশের সামাজিক সভ্যতার ইতিহাসের বিশেষ এক অধ্যায় প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

ইঁহার ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও সাহিত্যসেবা।

আমরা এই প্রবন্ধলেখকের সংশ্রবে আসিয়া এক জন প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু সাহিত্যসেবীর সন্ধান পাইয়াছি। এ জন্য ইঁহাকে সাহিত্যসংসারে পরিচিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। ১৩১৫ সনের কার্ত্তিক মাসের "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "উত্তর বঙ্গের পুরাতত্ত্ব-সংগ্রহ" বিষয়ক প্রবন্ধের শেষাংশে লিখিয়াছিলেন,—"সময় নষ্ট করিয়া, পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অস্বাস্থ্যকর উত্তরবঙ্গের নিবিড় অরণ্যপথে ভ্রমণক্লেশ সহ্য করিয়া, নিপুণভাবে তথ্যাবিষ্কারের জন্য এখনও অধিক লেখক অগ্রসর হন নাই। যাঁহারা ইহাতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহারাই নানা বিস্ময়-বিজড়িত পুরাতত্ত্বের সন্ধান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবেন।" আমরা হরিদাস বাবুর যেরূপ পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে আমাদের মনে হয়, অক্ষয়বাবু ইঁহারই ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু সাহিত্যামোদী ব্যক্তির নীরব সত্যানুরাগ ও স্বদেশ-প্রেমের চিত্র কল্পনা করিয়াছিলেন। দারিদ্র্যপীড়িত ও পরিবারভারাক্রান্ত হইয়াও ইতিবৃত্ত-সঙ্কলনের উদ্দেশ্যে বিংশবৎসরাবধি ইনি মালদহের নদী, জঙ্গল, দীঘি, দুর্গ, প্রান্তর, পল্লীসমূহ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছেন; বহুবিধ

প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রা, ইষ্টক প্রভৃতি জাতীয় ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন ; এবং স্থানীয় পল্লীসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া তাহাদের অন্তরের কথা, তাহাদিগের পুরাকাহিনী ও পূর্ব্বপুরুষদিগের বিবরণ চয়ন করিয়াছেন। ঐতিহাসিক স্থান ও উপকরণগুলির সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হইবার জন্য ইনি যেরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অসাধারণ। ইহাঁর মৌলিক অনুসন্ধানসমূহের দ্বারা সাহিত্যিকদিগের ঐতিহাসিক গবেষণায় কথঞ্চিৎ সাহায্য হইলেও হইতে পারে, এই বিশ্বাসে সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশনে ইহাঁর কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিতেছি।

প্রাচীন বঙ্গসমাজের সভ্যতার চিত্র—"মালদহের পল্লীকথা।"

প্রাচীন বঙ্গসমাজের অন্তস্তল স্পর্শ করিতে সমর্থ হইয়া ইনি বিবিধ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের দ্বারা প্রাচীনকালের ও মধ্যযুগের দেশের অবস্থা চিত্রিত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ইনি "মালদহের পল্লীকথা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রায় দুই শত গ্রামের ঐতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শিল্প, নৌবাণিজ্য, ধর্ম্ম, শিক্ষা, আচার, ব্যবহার প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই ইহাঁর পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নদীর গতি-পরিবর্ত্তনের অনুসরণ করিয়া প্রাচীনকালের নরপতিগণ ক্রমশঃ যেরূপ ভাবে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—যেরূপ ভাবে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, বৌদ্ধগৌড়, হিন্দুগৌড়, মুসলমানগৌড় ও বরেন্দ্রভূমি যথাক্রমে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ইহাঁর গ্রন্থে তাহার বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে।

জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর সংগ্রহ।

ইহাঁর ঐতিহাসিক গবেষণা-প্রণালীর বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইনি সকল স্থান স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া পল্লীসমূহ হইতে প্রবাদ, জনশ্রুতি, আখ্যায়িকা ও কাহিনী সংগ্রহ করিয়াছেন। এইরূপে পল্লীসমূহই ইহাঁর ভিতর দিয়া কথা কহিবার ও ইতিহাস লিখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাঁর ইতিহাস কেবলমাত্র পল্লী-বিষয়ক নহে—ইহা প্রকৃতপ্রস্তাবে পল্লী-রচিত, এবং পল্লী-কল্পিত। ইনি নীরব পল্লীর মুখে ভাষা প্রদান করিয়া পুরাতন আচার, পুরাতন শিল্প-বাণিজ্য ও পুরাতন শিক্ষাপদ্ধতির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া সত্য সত্যই পল্লীর কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

এরূপ অনুসন্ধান-প্রসূত ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা।

বঙ্গসাহিত্যে এই বিচিত্র ঐতিহাসিক গবেষণা-প্রণালীর সমাদর বাঞ্ছনীয়। আমাদের দেশে এইরূপ পল্লীবাসি-কল্পিত, জনশ্রুতি ও প্রবাদমূলক ইতিহাসের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। আখ্যায়িকা ও পুরাকাহিনীর এবংবিধ মৌলিক অনুসন্ধান-প্রসূত ইতিহাস রচিত না হইলে আমাদের দেশের ইতিহাস কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না।

আমাদের দেশের ইতিহাসের অসম্পূর্ণতা ;

(১) তথ্য-সমূহের অর্থগ্রহণে দুরূহতা।

নানা কারণে আমাদের দেশের ইতিহাস অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, যে সমুদায় ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত বা আবিষ্কৃত হয়, অনেক স্থলে তাহাদের প্রকৃত মর্ম্ম ও ভাব হৃদয়ঙ্গম করা সুসাধ্য হয় না। সাধারণতঃ বিপক্ষীয়েরা অথবা বিদেশীয়েরা আমাদিগের ইতিহাসের উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া তাঁহারা এ দেশের কোনও অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন না। বিভিন্নজাতীয়ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ এ দেশের জাতীয় জীবনের মধ্যে এই সমুদায় তথ্যের স্থান নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? এতদ্ব্যতীত জীবিতাবস্থায় সমাজের যে যে ভাবভঙ্গী বর্ত্তমান ছিল, অন্যান্য সমাজের সহিত যে সূত্রে ইহা সম্বদ্ধ ছিল, বর্ত্তমান কালে তাহার কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না বলিয়া স্বদেশীয় ঐতিহাসিকদিগেরও অনেক সময়ে সূত্র হারাইয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং যে কারণেই হউক, তথ্যসমূহের যথার্থ মূল্যনির্দ্ধারণ ও ইহাদের সহিত প্রকৃত পরিচয় ও সহানুভূতির অভাবেই প্রধানতঃ আমাদের ইতিহাসের অসম্পূর্ণতা সাধিত হইয়াছে।

(২) তথ্য-সংগ্রহপ্রণালীর দোষ।

দ্বিতীয়তঃ, তথ্য-সংগ্রহ বিষয়েও আমাদের অনেক অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণ কেবলমাত্র রাজদরবারের ও রাজপরিবারের কার্য্যকলাপ ও পরিবর্ত্তনের মধ্যেই ইতিহাসের উপলব্ধি করিয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদের দৃষ্টি কেবলমাত্র সরকারী চিঠি, দলিল-পত্র, যুদ্ধের বৃত্তান্ত, ও সৈন্যের গমনাগমনের পথের বিবরণেই আকৃষ্ট হয়। তাঁহারা রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, সাহিত্য, সভ্যতা, শিক্ষাপদ্ধতি, ধর্ম্ম, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি সমাজের প্রকৃত অভিব্যক্তির সহিত পরিচিত নহেন। বিশেষতঃ,

প্রকৃতিপুঞ্জের অবস্থার বিবরণ-বিবর্জ্জিত এই রাষ্ট্রীয় ইতিহাসসমূহ কেবলমাত্র বিজেতৃগণের দ্বারাই রচিত হইয়াছে। এ দেশে কোনও যুগে কেহ জাতীয় ইতিহাস লিখিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। সুতরাং ঐতিহাসিক তথ্য ও উপকরণ সংগ্রহের জন্য ঐতিহাসিকদিগকে প্রধানতঃ রাজদরবার-সংসৃষ্ট লেখকগণের উপরই নির্ভর করিতে হয়।

ধর্ম্মবিপর্য্যয়ে তথ্যসমূহের জটিলতা।

এতদ্ব্যতীত আর এক কারণে তথ্যসংগ্রহ বিষয়ে এ দেশে বিশেষ দুর্য্যোগে পড়িতে হয়। এখানে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, অভ্যুদয় ও অবনতি সাধিত হইয়াছে বলিয়া রীতি, নীতি, ব্যবহার, সাহিত্য, কলা, স্থাপত্য প্রভৃতিকে দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। এ জন্য জাতীয় সভ্যতার বিকাশের মধ্যে ইহাদের কাল ও স্থানের নিরূপণ অনেক সময়ে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

জনশ্রুতির ঐতিহাসিক মূল্য—জনসাধারণ-রচিত ইতিহাস।

যে দেশে কোনও বিশেষ ব্যক্তি, স্থান, ঘটনা, আচারের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সাধারণতঃ সমসাময়িক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এবং যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার মধ্যেও আবার ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপদ্ধতির-চিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই দেশে প্রকৃত ইতিহাসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রবাদ ও জনশ্রুতিসমূহের আশ্রয়-গ্রহণ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এমন অবস্থায় সামান্য সামান্য আখ্যায়িকারও ঐতিহাসিক মূল্য আছে। বর্ত্তমান লোকসমাজ পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছে, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, তাঁহাদিগকে যে ভাবে সম্মান করে, এই সকল কিংবদন্তী ও প্রচলিত ধারণার মধ্য হইতে সকল দেশের ঐতিহাসিকই ইতিহাস-রচনার উপাদান সংগ্রহ করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগকে প্রধানতঃ রাজসভার কবি অথবা রাজধর্ম্মাবলম্বী লেখক-সম্প্রদায়ের আংশিক বিবরণের মধ্য হইতেই পিতৃপুরুষদিগের সমাজ-জীবন নিরীক্ষণ করিতে হইবে, তাঁহাদিগের পক্ষে পল্লীর কথা, পল্লীকাহিনী, ও পল্লী-কল্পিত ইতিবৃত্তের অনুসন্ধানে বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। কোনও কোনও স্থলে তথ্যসমূহ ভ্রমপূর্ণ হইলেও, এরূপ চেষ্টায় ইতিহাসের অন্য এক দিকের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। ইতিবৃত্তের সম্পূর্ণ নূতন এক দৃশ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে, এবং নূতন উপায়ে ইতিহাসের আলোচনা আরব্ধ হইয়া

ইতিহাসকে নূতন ভাবে রঞ্জিত করিয়া বর্ত্তমান ইতিহাসের রূপ-পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে। ইহাতে প্রচলিত ইতিহাসরচনাপদ্ধতি নূতন পদ্ধতির আলোক প্রাপ্ত হইবে; এবং পরস্পরের সহায়তায় দেশের ইতিহাস ক্রমশঃ সম্পূর্ণতা ও বৈজ্ঞানিকতার দিকে অগ্রসর হইবে।

ইতিহাসের নূতন উপকরণ—পল্লীসমাজে প্রচলিত প্রবাদ, জনসাধারণের কল্পনা।

সুতরাং ঐতিহাসিকদিগকে এখন হইতে নূতন উপায়ে উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টিত হইতে হইবে। আমাদের দেশের ইতিহাসালোচনার প্রথমাবস্থায় বিদেশীয় ঐতিহাসিকদিগের পুস্তকের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করাই ঐতিহাসিকদিগের উদ্দেশ্য ছিল। ক্রমশঃ প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রা, তাম্রশাসন, সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনা করিয়া ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দার্শনিক প্রণালীতে রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে ঐতিহাসিক প্রবন্ধাদি রচিত হইতেছে। এই সকল উপকরণের মধ্যে পল্লীসমাজে সংগৃহীত প্রবাদ, কাহিনী ও জনশ্রুতিসমূহ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। ভারতবর্ষে সভ্যতা পল্লীজীবনেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। যদিও বর্ত্তমানকালে পল্লী-সমূহ জীবন হারাইয়া নূতন ভাব ও শক্তিসমূহের মধ্যে গৌরবের স্থান প্রাপ্ত হয় না, তথাপি ইহাদের মধ্যেই পুরাতন আদর্শ স্থায়িরূপে নিহিত রহিয়াছে, এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। আধুনিক রুচির বিরুদ্ধ হইলেও, যাহারা এক্ষণে নিরক্ষর, অসভ্য, অথবা বিকাশহীন fossilএর ন্যায় সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে, বনে, জঙ্গলে, অথবা সামান্য গ্রামে বাস করে, তাহাদের উৎসব, পূজা, কথাবার্ত্তা, চালচলন, আদর্শ, নিষ্ঠা সমুদয়ই পুরাতন জীবন্ত সভ্যতার সাক্ষী, এবং তাহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সুতরাং পল্লীর প্রবাদসমূহ অতীত সম্বন্ধে যে সাক্ষ্যদান করিবে, তাহাতেই অতীতের ইতিহাস অনেক পরিমাণে পরিস্কৃত হইয়া আসিবে। এই জনশ্রুতি প্রভৃতির সহিত পুঁথির তথ্য, তাম্রশাসনের প্রমাণ মিলাইয়া দিতে পারিলেই এই সমুদয় ঐতিহাসিক উপকরণসমূহও সজীবতা লাভ করিবে।

নূতন আলোচনার ফল—প্রকৃত জাতীয় ইতিহাসের সৃষ্টি।

আমাদের ঐতিহাসিক চিন্তা-প্রণালীকে এখন হইতে ক্রমশঃ জনশ্রুতি, প্রবাদ, আখ্যায়িকা, কথকতা প্রভৃতি প্রচলিত কাহিনীসমূহের বিবরণ

সংগ্রহের দিকে চালিত করিতে হইবে। এইরূপে এক দিকে সামাজিক সভ্যতার ইতিহাস রচিত হইয়া রাষ্ট্রীয় সভ্যতার ইতিহাসের সহিত যুক্ত হইলে ইতিহাস সম্পূর্ণ হইবে, এবং কেবলমাত্র রাজদরবারের ইতিহাসের পরিবর্ত্তে সাধারণ জনসমাজের কার্য্যকলাপের বিবরণ পাওয়া যাইবে; এবং অপর দিকে জনসাধারণের ইতিহাস সম্বন্ধে যেরূপ ধারণা আছে, তাহার চিত্র পাওয়া যাইবে। এই উপায়ে প্রকৃত জাতীয় ইতিহাস রচিত হইতে পারিবে—কেন না, ইহা প্রথমতঃ সমাজ-বিষয়ক, এবং দ্বিতীয়তঃ সমাজ-কথিত ও সমাজ-কল্পিত।*

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ।
'মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতি'র সম্পাদক।

গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ইতিহাস।

বিশ বৎসর হইতে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ইতিহাস-সংগ্রহে আমি আমার ক্ষুদ্র-জীবন উৎসর্গ করিয়াছি; এবং সেই কাল হইতে আমি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপাদি ও নদী প্রভৃতির বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রায় দুই শত প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাহার বিশেষ বিবরণ পুস্তকাকারে লিখিত হইতেছে। যে সমুদয় প্রাচীন পুঁথি ও গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (পাড়ুয়া) সম্বন্ধে যে সমুদয় তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির হস্তে প্রদান করিতেছি। এক্ষণে এই শিক্ষা-সমিতির তত্ত্বাবধানে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করি।

গৌড় ও পাণ্ডুয়ার প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক চর্চ্চার ফল।

বাঙ্গলার বহু স্থানের ইতিহাস আছে, গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ইতিহাস নাই। কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাস গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ব্যতীত লিখিত হইতে পারে না।

---

* ভাগলপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে পঠিত।

হরিদাস বাবুর জীবনব্যাপী পরিশ্রমের ফলে যাহা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, আমরা তাহা সমগ্র বঙ্গের সাধারণ সম্পত্তি মনে করি। সুতরাং সামান্য হইলেও ইহা সাহিত্য-সম্মিলনের অগ্রাহ্য নহে। ইহার অনুসন্ধানের ফলসমূহ ব্যবহার করিয়া বিদ্বৎসমিতি দেশের ইতিহাসরচনায় সহায়তা প্রাপ্ত হইতে পারেন, এই আশায় ইহাঁর কার্য্যের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। দেশের উপযুক্ত ব্যক্তিগণের সাহায্য ও উপদেশ প্রার্থনা করিয়া ইনি সম্প্রতি মালদহ জাতীয়-শিক্ষা-সমিতির নিকট যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা 'গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ইতিহাস' নামে স্বতন্ত্র মুদ্রিত হইল।

আমি মালদহের প্রত্যেক পল্লীর ধ্বংসস্তূপাদি-সমাকীর্ণ বন, শুষ্ক নদী প্রভৃতির প্রাচীন গতির পরিচয়-প্রাপ্তির আশায় প্রায় সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়া যে ফল লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমি বুঝিয়াছি, গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ইতিহাসপ্রণয়ন অসম্ভব নহে। এবং যে সমুদয় প্রাচীন পুঁথি প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্দ্বারা আমার উক্ত ইতিহাসের সঙ্কলনে যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে। এই কয় বৎসরের পরিশ্রমে ও গ্রন্থাদি-পাঠে, এবং প্রাচীন গৃহাদির ও দেবমূর্ত্তি প্রভৃতির বিবিধ তথ্য অবগত হইয়া আমার মনে এই ধারণা হইয়াছে যে, গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ইতিহাস একদিন ঐতিহাসিকগণের নিকট উপস্থিত করিতে পারিব।

আশা।

বিবিধ তাম্রপট্ট ও শিলালিপির দ্বারা প্রাচীন বঙ্গের প্রধান রাজধানীর বিশেষ বিবরণ ও রাজধানীর ক্রমশঃ স্থান-পরিবর্ত্তনের পর্য্যায় দ্বারা ঐতিহাসিকগণের নিকট বিবিধ নূতন ও প্রয়োজনীয় সত্যপ্রকাশের আশা আছে। কতিপয় ঐতিহাসিক মহোদয়গণ গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে গোলাম হোসেন অগ্রগণ্য। মহাত্মা হণ্টার প্রমুখ ঐতিহাসিকগণও গৌড়াদির ইতিহাস-সঙ্কলনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহারা মুসলমান লেখকগণের লিখিত বিবরণ অবলম্বনে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দেশের সমুদয় স্থান পরিদর্শন করিয়া প্রত্যেক বিষয় ও স্থানের বিবরণ ও প্রবাদবাক্য অবলম্বনে ইতিহাস লিখিতে প্রয়াস পান নাই। পূজনীয় রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই অভাব মোচন করিতে প্রবৃত্ত আছেন, এবং শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় মালদহের বহু স্থান পরিভ্রমণ করিয়া বহু ছায়া-চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন।

কি উপায়ে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

চিকিৎসা ব্যবসায় উপলক্ষে মালদহের বহু স্থানে আমাকে গমনাগমন করিতে হয়, এবং আমি অবকাশমত দেশের ইতিহাস-সংগ্রহের জন্য প্রায়ই স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া থাকি। আমার পক্ষে দেশের জনগণের সহিত মেশামিশি যত দূর সম্ভব, সাধারণ ভ্রমণকারীদিগের পক্ষে সে প্রকার সম্ভবপর নহে। সংসারনির্ব্বাহের পক্ষে চিকিৎসা ব্যবসায় আমার পক্ষে যে প্রকার আবশ্যক, সেই প্রকার গৌড়ের ইতিহাস ও বিবরণের সংগ্রহও আবশ্যক। যাঁহাদের নিকট প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি বা গৌড়সম্বন্ধীয় কোনও দ্রব্যাদি

কিংবা দলিলাদি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাঁহাদিগকে অধিকাংশ সময়েই দাতব্য ভাবে চিকিৎসা করিয়া তাঁহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছি। ভ্রমণ ও ঐতিহাসিক বিবরণ-সংগ্রহের জন্য মধ্যে মধ্যে অরণ্যমধ্যস্থ কোচ, পলিহা প্রভৃতি অসভ্য অথচ সরল সত্যবাদী জনগণের সহবাসে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। এই সূত্রে তাঁহাদের গোশালে, তৃণশয্যায়, বিনা প্রদীপে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছে। কখনও কখনও অনাহারে বিনা জলপানে দিন কাটাইতে হইয়াছে। বনমধ্যে মশকের উপদ্রব যথেষ্ট; ভীষণ মশার দংশন হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঘুঁটে ও তুষের ধোঁয়ার মধ্যে বসিয়া সরল কৃষকগণের সহিত বিবিধ সুখদুঃখের কথার মধ্য দিয়া, দেশের ইতিহাস-সংগ্রহে অগ্রসর হওয়া যায়। তাহাদের সহিত মিশিতে না পারিলে তাহারা আগন্তুকের সহিত মন-প্রাণ খুলিয়া কোনও কথাই বলিতে চাহে না। দিবসে তাহাদের সহিত আলাপের সম্ভাবনা নাই। কারণ, তখন তাহারা আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। রাত্রে তাহাদের অবকাশ হয়। সুতরাং সেই সময়েই তাহাদের সুখদুঃখের কথা শুনিবার সুবিধা হয়। ক্রমে ক্রমে তাহারা দেশের বংশপরম্পরাগত প্রবাদ অবলম্বনে যে সমুদায় কথা বলিয়া থাকে, তাহা ঐতিহাসিক হিসাবে অমূল্য। তাহারা দেশের পুরাতন রাজধানীর কথা, শিল্পবাণিজ্যের কথা, নদীর কথা, দেবতার কথা, দেশাচার, কুলাচার প্রভৃতির কথা সরলমনে বলিয়া থাকে। তাহারা কৃষিকর্ম্মোপলক্ষে কোথায় কি পাইয়া থাকে, কোথায় কি দেখিয়াছে, কি প্রাচীন দ্রব্যাদি তাহারা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা সরলভাবে সরলপ্রাণে যাহা বলে, নবাগত ভ্রমণকারিগণ সহস্র চেষ্টাতেও তাহা অবগত হইতে পারেন না। দেশের লোকে কি ব্রত করে, কি ব্রতকথা বলে, কোন্ কোন্ দেবতার পূজা করে, এবং তাহাদের পূজাপদ্ধতিই বা কি প্রকার, তাহা তাহাদের সহিত না মিশিলে, তাহাদের সহিত এক না হইলে কখনই অবগত হওয়া যায় না। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও গৌড়ভূমি অরণ্যময়; সুতরাং যাহারা সেই বনভূমি পরিষ্কার করিয়া কৃষিকর্ম্ম করিতেছে সেই নিরক্ষর কৃষকগণ প্রায়ই নূতন নূতন ঐতিহাসিক দ্রব্য—দেবমূর্ত্তি, প্রস্তরফলক, সে কালের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি, প্রাচীন রাজমার্গ, অলঙ্কার প্রভৃতির সন্ধান পাইয়া থাকে। সুতরাং আমি তাহাদের নিকট হইতে ঐ প্রকার ঐতিহাসিক উপকরণ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। এই উদ্দেশ্যে আমি পাণ্ডুয়া নামক স্থানে [illegible]

বনে ভ্রমণ করিয়া নূতন নূতন বহু বিষয় অবগত হইতেছি। ইহাতে গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ইতিহাস-রচনায় যথেষ্ট সাহায্য হইবে। আমি এমন অনেক দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইয়াছি যে, তদ্দ্বারা ঐতিহাসিকগণ যথেষ্ট উপকার প্রাপ্ত হইবেন। বনভূমিমধ্যস্থ বৌদ্ধস্তূপ, বৌদ্ধদেবমূর্ত্তি ও হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি ও আরবী অক্ষরে ক্ষোদিত কবরপীঠ ইত্যাদির বিস্তীর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। দেশের প্রাচীন বীর রাজা প্রজার কথা, যুদ্ধবিগ্রহের কথা অবগত হইয়াছি।

পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানের জমীদারগণের সাহায্য।

পাণ্ডুয়ার জমীদার শ্রীযুত মমজ্জেদার রহমান সাহেবের পিতা শ্রীযুত মওয়াহেদর রহমান পাণ্ডুয়ার প্রাচীন বিবরণ, প্রাচীন দলিলাদি ও বংশাবলী প্রদান করিয়া বাদশাহী আমলের ইতিহাস-প্রণয়নে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। আমি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে বাধ্য। তিনি পাণ্ডুয়ার বাইশ-হাজারীর যে বিস্তীর্ণ পরিচয় দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের প্রাচীন মতাবলীগণের হস্তলিখিত পুস্তকাদি হইতে যে সমুদয় বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

আভ্যন্তরীণ সর্ব্ববিধ অবস্থা।

প্রাচীনকালে ও বর্ত্তমানকালে দেশের অবস্থা কি প্রকার ছিল ও আছে, তাহা আমরা কৃষকগণের নিকটই প্রাপ্ত হই। কোন গ্রাম হইতে কি কারণে তাহারা বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে, কোন্ কোন্ বিপদে তাহারা ক্লেশ ভোগ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা তাহারা না বলিলে আর কে বলিবে? কি প্রকারে কোন্ স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা তাহারা বংশাবলীক্রমে গল্পসূত্রে শুনিয়া আসিতেছে। যে যে সংস্কার তাহাদের মধ্যে চলিতেছে, তাহা তাহারা না বলিলে আমরা কোথায় পাইব? পূর্ব্বে কৃষকগণ কোন্ ধর্ম্মে অবস্থান করিত, এবং কি করিয়া তাহাদের ধর্ম্মান্তর-গ্রহণ হইয়াছে, তাহা তাহাদের গল্পেই ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

পোষাক পরিচ্ছদ।

সে কালে, এমন কি, শত বৎসর পূর্ব্বে লোকেরা বড় বড় পাগড়ী মাথায় পরিয়া, মুসলমানী পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া, কটিদেশে তরবারী ঝুলাইয়া থাকিত। হুক্কা ব্যবহার এ দেশে প্রচলিত ছিল।

বিদ্যালয়।

প্রাচীন কালে পাঠশালা ছিল। তাহা প্রাতে ও অপরাহ্নে চলিত। ব্যাঙ-কাহিনী, কপিলা-মঙ্গল, সন্ন্যাস ও লেখ-মল্লিকা, খড়ি-প্রকরণ শিক্ষা দেওয়া হইত।

ভাষা ও অক্ষর।

অক্ষর অন্য প্রকারের ছিল। হস্ত-লিখিত পুঁথিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। —ভাষা পালি ও প্রাকৃত মিশ্রিত-মৈথিলী।

সাহিত্যচর্চ্চা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, রসায়ন, উদ্ভিদ-বিদ্যা।

বৈদ্যগণ রসায়ন-বিদ্যায় যথেষ্ট মনোযোগ করিতেন। চক্রপাণি দত্ত প্রমুখ কতিপয় বৈদ্য গৌড়নগরে রাজ-বৈদ্য ছিলেন। তাঁহারা উদ্ভিদ-বিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। এ দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জ্যোতিষ-চর্চ্চা করিতেন।

গৌড়নগরাদিতে সাধারণের চিকিৎসার জন্য বৌদ্ধযুগ হইতেই দাতব্য চিকিৎসাগার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বহু তাম্রশাসনপটে তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন পুঁথিতেও তাহার উল্লেখ আছে। "সিংহলদ্বীপী" নামক সিংহলী বৈদ্যগ্রন্থে সে কালের ঔষধাদি প্রস্তুতের নূতন প্রণালী বর্ণিত আছে। উহা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি।

সূর্য্যপূজক মকগণ ও সূর্য্যপূজক শাকদ্বিপিগণ এ দেশে অস্ত্র-চিকিৎসার উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা Bandage বাঁধিতে জানিতেন। dislocation reduce করিতে ও ভগ্নাস্থি সংযোগ করিতে তাঁহারা পটু ছিলেন। গৌড়নগরে ভৈষজ্য-গুণ-সমন্বিত উদ্ভিদাদির উদ্যান ছিল।

সূর্য্যপূজকগণ কুষ্ঠব্যাধির চিকিৎসক "পৌণ্ড্রার্কশাখা"র অধীন ছিলেন। সম্ভবতঃ কুষ্ঠাশ্রমও ছিল।

ধর্ম্মভাব।

এ দেশে মহাপ্রভুর আগমনের পূর্ব্বে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল। গম্ভীরা-উৎসব বৌদ্ধতান্ত্রিকতা-মূলক শৈব-তান্ত্রিকতা। গম্ভীরা-উৎসব, "রথায়" জীতুলা (জীমূতবাহনের পূজা) এ দেশে বহুকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

নাকা, নাকাধ্যক্ষ, কারাগার, সুবন্দিগণের অবস্থা।

পুলিস-ষ্টেশনকে নাকা বলিত। অদ্যাপি দেশের লোক নাকা অর্থে

পুলিস-ষ্টেশন বুঝে। পূর্ব্বে "দোষাদ" নাকাধ্যক্ষ ছিলেন। "চোরচক্রবর্ত্তী" নামক পুঁথিতে নাকাধ্যক্ষ ও চৌকিদারগণের ও বিচারপ্রণালীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

পিয়ান্দবাটী (পিয়াজবাড়ী) নামক স্থানে ভীষণ কারালয় ছিল। এবং গঙ্গাতীরেও কারাগার ছিল। সনাতন যে কারাগারে বন্দী ছিলেন, তথায় ও অন্যান্য কারাগারে অপরাধিগণকে পায়ে বেড়ী ও তোকদরী গলে দিয়া রাখা হইত। শৌচকার্য্য কারাগারের বাহিরে হইত। কয়েদী-গণকে স্নানের জন্য গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হইত। "চৈতন্য-চরিতামৃতে" তাহার পরিচয় আছে। তৎকালে বন্দিগণের প্রতি কঠোর নিয়মের ব্যবস্থা ছিল।

গৌড়নগরবাসীর আর্থিক অবস্থা।

সেকালে গৌড়নগরে স্বর্ণ-রজতাদির পাত্র ভোজবাড়ীতে যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত। গৌড়নগরের ধনিগণ প্রভূতপরিমাণে মূল্যবান্ পাথর ও স্বর্ণের অধিকারী ছিলেন। বৈদেশিকগণের সহিত রেশম কার্পাসের সুজনী প্রভৃতির ব্যবসায় ছিল বলিয়া প্রত্যেক সামান্য গৃহস্থও যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইত। দেশের তাঁতীগণ ধনী ছিল। নৌশিল্পে—পোতাদি-নির্ম্মাণের দ্বারা গৌড়-নগরে যথেষ্ট অর্থাগম হইত।

বিভিন্ন দেশের সহিত সম্বন্ধ।

মুর্শিদাবাদ, বেহার, রাজমহল, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, বিক্রমপুর, সপ্তগ্রাম, উৎকল প্রভৃতির সহিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের যে ঐতিহাসিক সম্বন্ধ ছিল, তাহা হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথিগুলি যত্নসহকারে পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারি। আচার, ব্যবহার, দেবদেবীর পূজা, ব্রত ও ব্রতকথা অবলম্বনে কোন্ দেশের সহিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বা গৌড়ের সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল, তাহা অবগত হইতে পারি। আরব, পারস, গ্রীসাদির সহিত যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের সম্বন্ধ ছিল, তাহা বাণিজ্য-দ্রব্যাদির আমদানী ও রপ্তানীর বিবরণের দ্বারা অবগত হইতে পারি। দেবদেবীর মূর্ত্তি ও পূজাপদ্ধতির দ্বারা আমরা বিভিন্ন দেশের সহিত সম্বন্ধ ছিল, তাহাও অবগত হই। প্রাচীন পুঁথিগুলি পাঠে এই বিষয়ে যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বাণিজ্য ও নৌ-ব্যবহার।

সে কালে বাণিজ্য-সূত্রে এ দেশের বণিকগণ যে সিংহলাদি ভারতীয়

দ্বীপে গমন করিতেন, এবং আরবাদি দেশেও যাতায়াত করিতেন, তাহার উত্তম দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। আজিও সেই প্রাচীন মুসলমান বাদশাহী আমলের বণিকবংশের কয়েক জন জীবিত আছেন। তাঁহাদের নিকট আমরা বিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হই। এই সূত্রে আমি তাঁহাদের পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছি।

সে কালের শিল্পজাত দ্রব্যাদির সন্ধান অবগত হইয়াছি। যথাসময়ে তাহার বিবরণ ও ছায়া-চিত্র প্রদান করিলে সাধারণের চিত্তবিনোদন সম্ভব। আজিও সেকালের ব্যবহৃত ঘটী, বাটী, খাট, অলঙ্কার ও বস্ত্রাদির আদর্শ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

প্রাচীন মুদ্রা।

আজিও মালদহবাসিগণের গৃহে যত্নসহকারে রক্ষিত প্রাচীনকালের স্বর্ণ-রজতমুদ্রা যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। কার্ব্বনপেপার দ্বারা তাহার প্রতিলিপি যথেষ্ট সংগ্রহ করিয়াছি। *মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার ক্ষমতা না থাকায় তাহার প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া থাকি, এবং পাঠোদ্ধার করিয়া যত্নসহকারে রক্ষা করিতেছি; ভবিষ্যতে আরও মুদ্রা-সংগ্রহের সম্ভাবনা আছে।

অক্ষরক্ষোদিত প্রস্তরফলক।

বৌদ্ধ ও হিন্দুসময়ের অক্ষরমালা-ক্ষোদিত প্রস্তরফলক মুসলমান শাসন-কালে গুপ্তভাবে রক্ষিত হইয়াছিল। আমরা তাহার প্রতিলিপি ও বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

আজিও মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে, ইষ্টকস্তূপ হইতে, আমরা গৌড়াদির ঐতিহাসিক বিবরণের সাহায্যোপযোগী প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হইতে পারি।

মূর্ত্তি—শিল্পকলা।

আমরা বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালের বিবিধ দেব-দেবী, নরনারী ও পশুপক্ষীর মূর্ত্তির সন্ধান পাইয়াছি। সে কালের গুলি-গোলা, অস্ত্র-শস্ত্রাদির বিবরণের দ্বারা আমাদের ইতিহাস-প্রণয়নের সাহায্য হইতেছে। আমরা সম্প্রতি মজুমনগর হইতে যে বিষ্ণুমূর্ত্তি * প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এই প্রবন্ধের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। ভবিষ্যতে আরও প্রদান করিতে পারিব, আশা রাখি। কোন্ যুগে কোন্ প্রকার মূর্ত্তি কি ভাবে ক্ষোদিত হইত, তাহার ধারাবাহিক বিবরণও প্রদান করিবার আশা আছে।

প্রাচীন নদী ও নদী-প্রবাহের দিক্‌নির্ণয়।

গৌড়নগরের বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনাদি স্থানের মধ্য দিয়া কোন কোন নদী

প্রবাহিত হইত, তাহার বিষয় আমরা বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করিয়াছি, এবং করিতেছি। কোন্ স্থানে কতিপয় নদী মিলিত হইত, কোন্ নদী সেই কালে বাণিজ্যপোত বহন করিত, কোন্ কোন্ নদীতীরে কোন্ কোন্ নগর, উপনগর ও বাণিজ্যপ্রধান বন্দর ছিল, তাহার নাম সংগ্রহ করিয়াছি।

কোন্ বন্দরে কোন্ কোন্ দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় হইত, সেই সেই বাণিজ্যদ্রব্যসম্ভার দেশের কোন্ প্রদেশ হইতে আনীত হইত, সেই দ্রব্যাদির তৎকালে কি প্রকার মূল্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, এবং কোন্ দ্রব্যের কি প্রকার ব্যবহার হইত, এই সমুদয়ের বিবরণও সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

প্রাচীন নদী, বিল, খাল প্রভৃতির বিবরণ ও তাহার গতির অনুসন্ধানের জন্য আমি বর্ষাকালে নৌকারোহণে বহু স্থানে নদীর জলস্রোতের সন্ধানে ভ্রমণ করিয়া যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা আনুমানিক মানচিত্রে সূচিত করিয়াছি। দেশে কত নদী ছিল, কত শাখানদী ছিল, কত কেদারবাহিনী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী ও জলপ্রবাহ ছিল, তাহার তালিকাও প্রস্তুত করিয়াছি।

কতিপয় প্রাচীন নদীর বিশেষ নাম।

গাঙ্গিনাক্, তঙ্গন, পুনর্ভবা, জলঙ্গী, ঢাকাই নদী কোন্ যুগে কোন্ স্থান দিয়া প্রবাহিত হইত, তাহারও চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। কোন্ সময়ে কোন্ পথে নদীপ্রবাহ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ অবগত হইবার প্রয়াস পাইয়াছি।

প্রাচীন সেতু ও দুর্গ।

কোন্ নদীর উপর কোন্ স্থানে প্রাচীনকালে সেতু নির্ম্মিত ছিল, তাহা কি প্রকার, তাহার গঠন কি প্রকার ছিল, তাহার সন্ধান করিতে হইয়াছে। কোন্ নদীর তীরে, কোন্ স্থানে কি প্রকার দুর্গ ছিল, তাহার চিহ্ন অনুসরণ করিয়া, স্থাননির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি।

সে কালে কি নিয়মে কি প্রকার দুর্গ নির্ম্মিত হইত, তাহার বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, ফটো-ক্যামেরার অভাবে তাহার ছায়াচিত্র গ্রহণ করিতে পারি নাই।

প্রধান রাজমার্গ।

সে কালে কোতুয়াল গড়, সরাণ, পুস্তকের আইল, কড়ির আইল, মুণ্ডকাটীর আইল, বুড়ার গড়, বুদ্ধ গড়, লাল বাজারের রাস্তা প্রভৃতির বিস্তীর্ণ বিবরণ সংগৃহীত করিয়াছে। কোন্ রাস্তা দিয়া কোথায় গমনাগমন করিত

কোন্ রাস্তার উপর কোন্ দুর্গ ছিল, তাহার সন্ধানও করিতে হইয়াছে। কানকামরা, জগদল, একডালা, চৌদার, বুলবুল প্রভৃতি প্রাচীন দুর্গের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি। কোন্ রাজার সময়ে কোন্ দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সন্ধান করিবার চেষ্টা পাইয়াছি।

সমরক্ষেত্র, যুদ্ধ ব্যাপার, লোকক্ষয়, যুদ্ধপ্রণালী ও যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রাদি।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, গৌড় ও বরেন্দ্রভূমির মধ্যে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে যে সমুদায় যুদ্ধবিগ্রহাদি হইয়াছিল, তাহার বিবরণ ও স্থাননির্দ্দেশোপযোগী যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি।

চৌদোয়ার, একডালা, দখলদরজা, সাগরদীঘি, চণ্ডীপুর, জগদল, ঘোড়বল্লারভিটা, ভিকৃরা, বুলবুলী প্রভৃতি স্থানে যে সমুদয় যুদ্ধাভিনয় হইয়াছিল, সেই সকল যুদ্ধব্যাপারের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। কোন্ যুদ্ধে কত নরহত্যা হইয়াছে, সেই সময়ে কি প্রকার যুদ্ধপ্রণালী প্রচলিত ছিল, কি প্রকার সেনাসমাবেশ হইত—তাহার বিষয় ও যুদ্ধে যে প্রকার অস্ত্রশস্ত্রাদির ব্যবহার হইত, সেই সমুদয়ের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

গৃহাদি-নির্ম্মাণপ্রণালী।

সে কালে বৌদ্ধযুগ হইতে মুসলমান শাসন পর্য্যন্ত যে প্রকার গৃহাদি নির্ম্মিত হইত, তাহার পরিচয়লাভ অসম্ভব নহে। সে কালে ক্ষুদ্র-কক্ষ-বিশিষ্ট বাঙ্গলো ঘরের ন্যায় পাকা ঘরের পরিচয় পাওয়া যায়। কোন্ কোন্ যুগে কি প্রকারের ইষ্টক, প্রস্তরাদি ও তাহার সংযোগ-দ্রব্যাদির ব্যবহার হইত, তাহার বিষয়েও যথেষ্ট আলোচনা করিয়া যে মন্তব্যে উপনীত হইয়াছি, তাহার দ্বারাই যুগবিভাগ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

গৃহাভ্যন্তরের চিত্রাঙ্কনপ্রণালী।

বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান শাসনকালে, ইষ্টক ও প্রস্তরগৃহে কি চিত্র অঙ্কিত হইত, এবং সেই চিত্রের পর্য্যায় কি প্রকার, তাহারও আবিষ্কার হইয়াছে। সময়ভেদে ও রুচিভেদে অঙ্কিত চিত্রাদির বিভিন্নতা সম্বন্ধে বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে।

মৃত্তিকা ও প্রস্তর-নির্ম্মিত নল।

সে কালে মৃত্তিকা ও প্রস্তরনির্ম্মিত নলের ব্যবহার দেখিতে পাই। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (পাণ্ডুয়া) সাতাইশঘরা, আদিনা, বেগমমহল প্রভৃতি স্থানে

আমরা যথেষ্ট বায়ু ও জলপ্রবাহের নলের ব্যবহার দেখিতে পাই। তাহার আদর্শও আমাদের সংগৃহীত আছে।

প্রাচীন শিল্প।

কি নিয়মে গৃহের নানা প্রকার খিলান প্রস্তুত হইত, তাহাতে key-stone-এর ব্যবহার হইত কি না, তাহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। তাহার চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছি। প্রস্তরে চিত্রাদি অঙ্কিত হইত। দ্বার, বাতায়ন, রন্ধনশালা, নৃত্যমন্দিরাদির পরিচয় প্রাপ্ত হই। বৌদ্ধগণ কি প্রকার চিত্র ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করিত, হিন্দুগণ তাহার কি প্রকার পরিবর্ত্তন করিয়াছিল, মুসলমানগণ তাহাদের শিল্পকলা কি প্রকার পছন্দ করিত, কোন্ সময়ের চিত্র শ্রেষ্ঠ, কোন্ শিল্পে কি প্রকার কবিত্ব বর্ত্তমান, কোন্ সময়ে স্থাপত্য-বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, কোন্ সময় শিল্পকলার অধঃপতনের কাল, তাহাও নির্ণীত হইয়াছে।

অস্ত্রশস্ত্রাদির নির্ম্মাণ।

সে কালে লৌহনির্ম্মিত শস্ত্রাদির পাইন ধরান হইত। কর্ম্মকারগণ কোন্ ধাতুর মিশ্রণে (alloy) কোন্ কোন্ দ্রব্য প্রস্তুত করিত। কি প্রকার পিত্তলের ও লৌহের অস্ত্র প্রস্তুত হইত। তাহার ছাঁচ (model) কি প্রকার ছিল।

কাষ্ঠের দ্রব্যাদি ও নৌকা।

সে সময়ে কোন্ কোন্ কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত। কোন্ কাষ্ঠে কোন্ কোন্ দ্রব্য নির্ম্মাণ করিত। খেলনার নৌকা, ক্ষুদ্র নৌকা, বাণিজ্যনৌকা, যুদ্ধ-নৌকা কত প্রকার হইত, এবং তাহার কি প্রকার ব্যবহার হইত। বাণিজ্য-নৌকা সহস্রাধিক মণ ভারবাহী ছিল। সুদৃঢ় যুদ্ধনৌকা নির্ম্মিত হইত। প্রমোদনৌকার আকার ও সাজসজ্জা কি প্রকার ছিল।

মৃত্তিকা-পর্য্যায়।

কূপখননকালে স্তরে স্তরে সজ্জিত মৃত্তিকা দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়, কোন্ স্থানে নদীপ্রবাহ ছিল। কোন্ উজ্জ্বল রক্তমৃত্তিকা নদীপ্রবাহে কর্ত্তিত হইয়াছিল, কোথায় কোন্ মৃত্তিকার নিম্নে জলজ-জীব ও উদ্ভিদাদির fossil প্রাপ্ত হওয়া যায়। কোন সময়ে সেই সেই fossil ভূপৃষ্ঠে থাকা সম্ভব, কোন্ স্তর কীদৃশ স্থূল। সেই স্তরের মৃত্তিকা কত দূর বিস্তৃত রহিয়াছে। মালদহের বহু স্থানে কূপখননকালে আমি যত্নসহকারে এই সমুদয়ের পর্য্যালোচনা করিয়াছি।

কতিপয় ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম ও নগরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(১) মোড়গ্রাম-ধ্বংস—পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত। ইহা বৌদ্ধযুগ হইতে বিখ্যাত। বুদ্ধ, ধর্ম্মরাজ, শিব, বিষ্ণু ও বিবিধ দেবমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে; দুই শত প্রাচীন পুষ্করিণী ও পাকা রাস্তা বিদ্যমান আছে। নগরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও বনভূমিতে পরিণত হইয়াছে। বুড়া শিবের মন্দির, চড়কপূজা, তোলাপীরের দরগা ও মসজীদ।

(২) মাধুইপুর-ধ্বংস—মোড়গ্রামের সমসাময়িক প্রাচীন নগর। এই স্থানে একটি দুর্গ ছিল। বৌদ্ধ মন্দির, ভিক্ষুর আশ্রম। ধর্ম্মরাজঠাকুর, বাসুকী, লক্ষ্মী, হনুমান, বৌদ্ধস্তূপ, ব্রহ্মলিঙ্গ, নবগ্রহ, দেবদেবীমূর্ত্তি যথেষ্ট বর্ত্তমান। ন্যাংশপীর নামক বিখ্যাত মুসলমান যোগীর আস্তানা বর্ত্তমান আছে।

(৩) শান্তিপুর, তালবেতাল, উজ্জ্বলনগর, ভাটিয়র, গোদার বাঁক (ধ্বংস)—মোড়গ্রামের সমসাময়িক উপনগর—তালবেতালের মঠ,—সর্ব্বমঙ্গলাদেবী। উজ্জ্বলনগর,—রাজধানী,—দুর্গ, বন্দর, সত্যরাজার বাড়ী—সত্যরাজা বৌদ্ধ ছিলেন। দেবদেবীমূর্ত্তি, জৈনসনাতনের আবাসবাটী ও কীর্ত্তি।

ভাটরা—বিষ্ণু, বুদ্ধ, শক্তিমূর্ত্তি বর্ত্তমান। গোদারবাঁক—মনসার গীতার নটগোদার বাড়ী, মনসার বেদী।

(৪) সূর্য্যপুর— সম্ভবতঃ এই স্থানে পৌণ্ড্রক সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুবৃহৎ সূর্য্যমূর্ত্তি ও বুদ্ধমূর্ত্তি বর্ত্তমান—প্রাচীন স্থান, ধ্বংসপূর্ণ ও অরণ্যময়। যোগীভিটা,—বিহার ও জৈনগণের আশ্রম ছিল।

(৫) সাধৈল সাকরমা—সাধৈল—জিন বা (জৈনাশ্রম) প্রাচীন নগর, সাকরমা মুসলমান সাকার মল্লিকের গৃহ, মসজিদ, কবর (জিন্দাপাথার) ইমানবাটীর চিহ্ন। অনেকে সাকরমাকে সাকর মল্লিকপুর বলেন। সাকার মল্লিক সুলতান হোসেন শাহের পূর্ব্বে সমর-মন্ত্রী ছিলেন। লোকে ভ্রমবশতঃ বৈষ্ণব সনাতনের গৃহ বলে।

(৬) পুরাতন মালদহ—শর্ব্বরি, মকুর্ত্তিপুর, অহৎপুর—প্রাচীন স্থান, বণিকগণের ব্যবসায়ের স্থান। বন্দর, মসজিদ, জৈনাশ্রম, দেবদেবীর মূর্ত্তি। দশশালা বন্দোবস্তের সময় সদর আইনের কাছারী হইয়াছিল।

(৭) ভবানীপুর প্রাচীন পদ্মাতীরবর্ত্তী স্থান। ভবানী ঠাকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তথায় ভবানী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান। অতিথি ও পান্থশালা বিদ্যমান ছিল। বাণিজ্যপ্রধান স্থান।

(৮) ত্রিপুরাস্থর—ভবানী ঠাকুরের স্ত্রী ত্রিপুরাসুন্দরী ত্রিপুরেশ্বর নামক শ্বেত প্রস্তরের সুবৃহৎ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন; অদ্যাপি ইহা বর্ত্তমান। লিঙ্গটি অতি সুন্দর। বন্দর।

(৯) মধুপুর—কালীদেবী বিখ্যাত। এই স্থানে মিথিলাদেশস্থ ব্রাহ্মণ-গণের বাসস্থান ছিল। টোল ও পণ্ডিতগণের বাস ছিল।

(১০) জাগলপড়ী—সুবৃহৎ নগর ছিল; পদ্মাস্রোতে ধ্বংস হইয়াছে। তথায় অদ্যাপি ইষ্টক প্রস্তর দৃষ্ট হয়; গৃহভিত্তি সাত হাত প্রস্থ। সম্ভবতঃ এই স্থানে একডালা দুর্গের ন্যায় একটি দুর্গ ছিল। জাগনমুনির (জৈন বা বৌদ্ধ) বাসস্থান। অদ্যাপি তাঁহার পূজা হইয়া থাকে।

(১১) খালিমপুর—সম্ভবতঃ "শুভস্থলী" নামক গ্রাম ছিল। এই স্থানে প্রাচীনকালে দেবমন্দির, বৌদ্ধ দেবালয়, ব্রাহ্মণ, জৈন, বৌদ্ধগণের বাসের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বর্গীয় বটব্যাল মহাশয়কে আমি ধর্ম্মপাল দেবের তাম্রশাসনপত্র প্রদান করি। এই গ্রামের সীমান্তে নান্নুরায়ের মন্দির ছিল। নান্নুরায় সম্ভবতঃ নুন্দনারায়ণ (বুদ্ধনারায়ণ)।

(১২) জামবাড়ী—সুলতান হোসেন শাহের সভায় এক জন কবি এই স্থানে বাস করিতেন; তাঁহার নাম আবদর রহমন আলী; তিনি বহু কবিত্ব-পূর্ণ গ্রন্থের রচনা করেন। প্রাচীন মসজিদাদি বর্ত্তমান।

(১৩) গোহালবাড়ী—বোগদাদ হইতে কয়েকখানি বাণিজ্য-পোত গৌড়ে আইসে; সেই বাণিজ্য-পোতের বণিক "চম্মন আলী" বোগদাদী এ দেশে আগমন করেন। তিনি নমাজ (উপাসনা) কালে সন্ধ্যার প্রাক্কালে উক্ত স্থানে অবতরণ করেন; এবং গৌড় নগরের শোভা ও পোতাশ্রয়ে পোতাধিক্য-দর্শনে মোহিত হন। চম্মন আলীর বংশধরগণের মধ্যে এক ব্যক্তি অদ্যাপি জীবিত আছেন। তাঁহার গৃহে সেই মহাজনের "পাগড়ী" ও পিত্তলের খাট বর্ত্তমান আছে।

এই গ্রামে রেশম-রঞ্জকগণের বাসস্থান ছিল। তাহাদিগকে "রেজা" বা রংরেজা বলিত; অদ্যাপি মৃত্তিকার নিম্নে তাহাদের "উনান" দেখিতে পাওয়া যায়।

ভবানী-মূর্ত্তি, অল্প দিবস হইল, পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারকালে বহির্গত হইয়াছে।

(১৪) যাদুনগর—মুসলমান শাসনকালে বিখ্যাত হইয়াছিল; বহুপূর্ব্ব হইতে এই স্থানের "কাগচিরা"গণ কাগজ প্রস্তুত করিত। দেশী কাগজের

নাম "বাঁশপাতা কাগজ"। গৌড়ের বাদশাহী দরবার যাদুনগরের কাগজ ব্যবহৃত হইত। হরি কাগচিরের কাগজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল।

(১৫) পিছলী—বৌদ্ধযুগে এই স্থানে রাজধানী ছিল; এবং গৌড় নগর নামে খ্যাত হইত। এই স্থানে পিত্তলময় ও তাম্রনির্ম্মিত বিবিধ আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত হইত। "অমৃতি" নামক জলপাত্র এই নগরের "অমরতী" নামক স্থানে প্রস্তুত হইত। কড়ির দর্পণ, লণ্ঠন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইত।

হরিপুর (হরিকুটী)—পিছলীর সন্নিকটবর্ত্তী শ্রেষ্ঠপল্লী; কান্যকুব্জাগত বৈদিক ব্রাহ্মণ আদিশূর কর্ত্তৃক এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মপুরী—অমরতীর দক্ষিণ-পশ্চিম—গঙ্গাতীরে; এই স্থানে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণের বাস ছিল।

(১৬) আরাপুর (অর্হৎপুর)—প্রাচীন স্থান—বৌদ্ধ বিহার ও আশ্রম ছিল।

(১৭) কাঞ্চন ও সুবর্ণনগর—কাঞ্চন-সোনা—ধনী বণিকগণের নিবাস। এই স্থানে সুবৃহৎ অর্ণবপোত নির্ম্মিত হইত। বাদশাহী আমলে এই স্থানে 'খেলনার নাও' নামক বিবিধ প্রকারের প্রমোদ-তরণী নির্ম্মিত হইত।

(১৮) চণ্ডীপুর—মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল। হিন্দুগৌড় নামে বখ্‌তিয়ার খিলিজী রাজমহল হইতে চৌদয়ার নামক স্থান দিয়া হিন্দু গৌড়ের উত্তরদিকস্থ "চণ্ডীদ্বার" নামক দ্বার দিয়া প্রবেশপূর্ব্বক গৌড় অধিকার করেন। "অর্দ্ধনারীশ্বর" নামক হরগৌরী মূর্ত্তি এই স্থানের নিকটবর্ত্তী গৌরীপুরে ছিল।

(১৯) সাগর দীঘী ও ফুলবাড়ীগড়—এই স্থানের সুন্দর প্রাসাদে সুলতান হোসেন শাহ বাদশাহের বন্ধু জোয়ানপুরের বাদশা "হোসেন শাহ" শেষজীবনে অবস্থান করিতেন। মকদুমসা ফকীরের কবর ও ইমামবাড়ী ছিল।

(২০) চিরাই বাড়ী—মুসলমান গৌড় নগরে, পূর্ব্বদিকস্থ পোত-নির্ম্মাণ-স্থান। এই স্থানের "করাতী"গণ নৌ-নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠে করাত দ্বারা তক্তা প্রস্তুত করিত; সহস্র সহস্র নৌশিল্পীর বাস ছিল।

(২১) বটৌরা ও বটৌরী—আদিশূরানীত ব্রাহ্মণগণের বাস ছিল। এই স্থানে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদদেশে "বটগ্রামীর কা * * * শ্রীজীবদেবস্য" অঙ্কিত দেখা গিয়াছে।

(২২) কনকপুর—কনকপুর মৌজায় পীরেশ্বর মন্দির (monument)

অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বাইসগজী নামক স্থানে বাদশাহী আমলে অন্দরমহল ছিল। তাহার নিকট "খিড়কী" নামক স্থানে গঙ্গানদীর তীরে গুপ্তঘর ছিল বলিয়া প্রকাশ।

(২৩) কামঠ (কামঠী—কনোজাগত ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান—গঙ্গাতীরে—ছিল। এক্ষণে সেই স্থান গঙ্গাপ্রবাহে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে।

(২৪) পাণ্ডুয়া (Parua)—প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর; এই স্থানে নূর কুতুব আমলের সমাধি ও মসজিদ বর্ত্তমান।

আদিনা—পূর্ব্বে বৌদ্ধ বিহার ছিল, তৎপরে হিন্দু দেবালয় হয়; শেষে আদিনা মসজিদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

(২৫) গোয়ালদহ পল্লী গোয়ালপাড়া (আভীর) এই স্থানে মহারাজ অশোকের ভ্রাতা বীতাশোক গোপ-হস্তে নিহত হন।

(২৬) ভিখ্‌রা—এই স্থানে ভিক্ষুগণের আশ্রম ছিল,—সম্ভবতঃ অশোকের সময়ে এই স্থানে বহু জৈন নিহত হয়; ভগবান বুদ্ধদেব এই স্থানের সন্নিকটে তিন মাস ধরিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন।

(২৭) মজুমনগর—এই স্থানে তাম্রনির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়াছি।

(২৮) হোমন দির্ঘ—প্রকাশ যে, কান্যকুজাগত ব্রাহ্মণগণ এই স্থানে আদিশূরের যজ্ঞ করেন।

(২৯) সাতাইশ ঘড়া—চারিটি ইষ্টকনির্ম্মিত সুদৃঢ় গড়ের মধ্যে রাজপ্রাসাদ ছিল। বহুসংখ্যক প্রাচীন গৃহাদির চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

(৩০) বরেন্দ্র—বরেন্দ্র নগরের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; এই বরেন্দ্র নগরের নামে বরেন্দ্রভূমি বিখ্যাত হইয়াছে। বরেন্দ্র নগর হইতে একটি পাকা রাস্তা পাঁড়ুয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে।

(৩১) পৌস্তন—ভঙ্গন নদী হইতে পুনর্ভবা পর্য্যন্ত উন্নত রাজমার্গ বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পথ দিয়া বখ্‌তিয়র তিব্বত গিয়াছিলেন।

শঙ্করাচার্য্য এই রাস্তা দিয়া ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিয়া কাশ্মীরে গমন করেন। এই স্থানের দুর্গ-সন্নিকটে কতিপয় বিখ্যাত যুদ্ধ ঘটিয়াছিল; "মণ্ডকাটির পাথার" একটি যুদ্ধস্থান।

(৩২) জগদলা—প্রাচীন দুর্গ ছিল। জগদলা বিখ্যাত স্থান। জগদলা দুর্গে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল।

প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি-সংগ্রহের উপায়।—আমরা সাধ্যমত বিবিধ উপায়ে

এ যাবৎ প্রাচীন হস্তলিপি ও পুঁথি সংগ্রহ করিতেছি, কিন্তু মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে পারিলে যথেষ্ট পুঁথি সংগৃহীত হইতে পারে।

অর্থাভাব ও ফটো-ক্যামেরার অভাব - দরিদ্রতানিবন্ধন; প্রাচীন ধ্বংসস্তূপাকীর্ণ নগর উপনগরের বিবরণ-সংগ্রহে বাধা ঘটিতেছে।

হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকাদির সংগ্রহেও অর্থের প্রয়োজন।

লোকাভাব (কর্ম্মীর অভাব)—আমাদের অবলম্বিত উপায়ে দেশের বিবরণ-সংগ্রহে সাহায্যকারী জনগণের একান্ত অভাব। জেলায় অনেক জমীদার আছেন। দেশের লুপ্ত-বিবরণ-সংগ্রহে তাঁহারা একান্ত উদাসীন। কেবলমাত্র শ্রীযুত কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমীদার মহাশয় এ কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন।

বিদ্বৎ-সমিতির যোগদান ও কর্ম্মে উৎসাহ-প্রদান।—আমাদিগের এই সমুদয় কার্য্যে সাহিত্যসেবিগণের উৎসাহ ও যোগদান প্রার্থনীয়। তাঁহারা আমাদিগকে উৎসাহ প্রদান করিলে আমরা বিবিধ লুপ্ত বিবরণ ও লুপ্তপ্রায় প্রাচীন গ্রন্থাদির সংগ্রহ করিতে পারি। ফটোক্যামেরার অভাবে আমাদের বিবরণ-সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইতেছে। আমাদের প্রার্থনা,—সাহিত্যিকগণ ও অনুসন্ধানকারিগণ আমাদের কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করুন; তাহা হইলে বিবিধ নূতন নূতন তথ্য সংগৃহীত হইতে পারিবে।

পরিশিষ্ট।

মজুমনগরের বিষ্ণুমূর্ত্তি।—কয়েক মাস গত হইল, পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত (পঃ রুকণপুর) মজুমনগর নামক স্থানে কৃষিকার্য্যোপলক্ষে হলপ্রবাহকালে এক জন মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে উক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। শ্রীযুত ভূষণচন্দ্র মৈত্র নায়েব মহাশয়ের প্রজা উক্ত মূর্ত্তি ও আরও কতিপয় মূর্ত্তি (পিত্তলনির্ম্মিত) নায়েব মহাশয়কে প্রদান করে। নায়েব মহাশয় ঐতিহাসিক তথ্যের সংগ্রহে আমার বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। তিনি উক্ত মূর্ত্তিটি আমার প্রার্থনা-মত আমাকে প্রদান করেন।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন দেশে এক সময়ে এই প্রকার দেবমূর্ত্তির বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়াই বোধ হয়। আমি এই প্রকারের কতিপয় মূর্ত্তি মালদহের স্থানে স্থানে দেখিয়াছি। বর্দ্ধমান জেলার কুচুট গ্রামে পুষ্করিণীখননকালে এই* প্রকারের কতিপয় প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। আমি যে র্ত্তিটি

প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা তাম্রনির্ম্মিত, এবং ভোলাহাটের সুবৃহৎ সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তির ক্ষুদ্র সংস্করণমাত্র।

বটগ্রামের ও মাধাইপুর মোরগ্রামের বিষ্ণুমূর্ত্তির তুলনায় এই ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটি শিল্পকার্য্যে অতুলনীয়। পালবংশীয় রাজগণের সময়ে এই প্রকারের বিষ্ণুমূর্ত্তির প্রচলন ছিল বলিয়াই অনেকে অনুমান করেন। ভোলাহাটের প্রস্তরময় বিষ্ণুমূর্ত্তিটি যে কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহা নির্ণীত হয় নাই।

শ্রীহরিদাস পালিত।

জাতীয়-বিদ্যালয়-সমিতি; ধরমপুর; মালদহ।

ফুল।

হৃদয়-লতায় শুভ্র ফুটিয়াছে ফুল,
তোমার পরশে সদা সৌরভে আকুল;
ভক্তির মলয়-বায়ু বহে অনুকূলে,
চরণের রেণু মাখি' আনন্দতে দুলে;
মধুময় জীবনের চির উষা জাগে,
ভাব দল পল্লবিত নব অনুরাগে;
গীতিময়ী বাণী তব বিহগ-ঝঙ্কার,
সারাক্ষণ অনাহত বাজে অনিবার;
প্রসাদ সুগন্ধ সদা করিছে বহন,
পাপের অনলে যেন না হয় দহন।
পুষ্পরেণু ধরে হৃদে তোমার আদেশ,
মলিনতা কীট কভু না করে প্রবেশ।
তব স্নেহ-বৃন্ত এরে ধরে যদি রাখে,
শান্তি উপবনে তবে সদা ফুটে থাকে।

শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ধূমকেতু।

গত ৭ই মাঘ (২০শে জানুআরি) হইতে সপ্তাহকাল কত লোক সন্ধ্যার পর পশ্চিম-আকাশ একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়াছে, যেন ধূমকেতু না দেখিলে মানব-জনম বিফল হইত। অপূর্ব্বত্বই কি চিত্ত-আকর্ষণের হেতু?

কেহ বলে ঝাঁটা তারা, কেহ বলে ধূমকেতু।

প্রাচীনেরা কেতু বলিতেন, ধূম-কেতুও বলিতেন। আকাশে ধূমবৎ অস্পষ্ট, শুভ্র মেঘবৎ দীপ্তিময় যে পতাকা, তাহার নাম ধূম-কেতু রাখাই ঠিক। সংস্কৃত জ্যোতিষসংহিতায় নাম কেতু ও শিখী। শিখা, চূল, জটা, পুচ্ছ, যে নামই দেওয়া হউক, ইহাই ধূমকেতুর বিশেষ অঙ্গ। শিখা, শির, এবং শিরে তারকা,—এই তিন অঙ্গ লক্ষ্য হইয়া থাকে। পাঁজীতে রাহু-কেতুর প্রতিমূর্ত্তি থাকে। রাহু ছিন্ন-মস্তক, কেতু সর্পাকার। প্রাচীন কালে সাধারণ লোকে মনে করিত, রাহু নামক অসুর সূর্য্যকে গ্রাস করিতে সর্বদা উদ্যত। বোধ হয় এই বিশ্বাসের মূল ধূমকেতু। ধূমকেতুর শির সূর্য্যাভি-মুখে থাকে, যেন সূর্য্যের পশ্চাতে ধাবিত হয়। উহার সর্পবৎ বক্র পুচ্ছ কেতুর সর্পাকার কল্পনার মূল। রাহু নামক এক অসুরের শিরের নাম রাহু ও অধোভাগের নাম কেতু হইয়াছিল। শির ও পুচ্ছ ধূমকেতুর দুই অঙ্গ।

৭ই মাঘ যে ধূমকেতু আমরা দেখিয়াছি (১ম পটে ৫ম চিত্র), সেটা কি প্রাচীনেরাও দেখিয়াছিলেন? সন্ধ্যার পর মাথার উপরে যে কাল-পুরুষ নক্ষত্র দেখিতেছি, যাহা লক্ষ্য করিয়া বেদের ঋষি হইতে পুরাণের কবি কত আখ্যান রচনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রাচীন পিতামহগণের দৃশ্য হইত, আমাদেরও হইতেছে। সেই অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, সেই মৃগশিরা, আর্দ্রা পুনর্বসু আজি যেমন, পূর্ব্বকালেও তেমন দিব্যজ্যোতিঃ খণ্ডাকারে স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠিত ছিল। রক্তাঙ্গ মঙ্গল, নীলরশ্মি শনি, শুক্লদেহ শুক্র এবং বৃহত্তেজ বৃহস্পতি এ বৎসর আকাশের যেখানে যেখানে দেখিতেছি, পূর্ব্ব-বৎসর সেখানে সেখানে দেখি নাই (২য় পট)। কিন্তু অবয়ব স্পষ্ট না হইলেও যাহার চলন চিনি, তাহাকে দূর হইতেও চিনিতে পারি। বৎসরের অধিকাংশ রাত্রে এই সকল গ্রহ দৃষ্টিসূত্রে গাঁথিয়া রাখিতে পারি। তথাপি দুই এক মাসের অদর্শনে প্রাচীন মানব ইহাদিগকে ভুলিয়া যাইত উষার

বেলা যে শুক্র তারা পূর্ব্ব দিকে উদিত হয়, সায়ংসন্ধ্যায় সেই কি পশ্চিম আকাশে ঘুরিয়া আসে? ভোরের তারা সন্ধ্যার তারা একই কি?

বরাহ লিখিয়াছেন, তিনি গর্গ-প্রোক্ত, তথা পরাশর, অসিত, দেবল, এবং অন্য বহু ঋষির কৃত গ্রন্থ দেখিয়া কেতুর চরিত বলিতেছেন। কিন্তু—

দর্শনমস্তময়ো বা ন গণিতবিধিনাস্য শক্যতে জ্ঞাতুম্।

গণিতবিধানে কেতুর দর্শন কিংবা অদর্শন জানিতে পারা যায় না। অর্থাৎ কখন্ কেতু দেখা যাইবে, কখন্ যাইবে না, তাহা বলিতে পারা যায় না। গ্রহগণের দর্শন অদর্শন বলিতে পারা যায়।

যদি কেতুর উদয় বা অস্ত বলিতে না পারা যায়, তবে একই কেতু পুনঃ-পুনঃ আসে, কি কেতু অনেক আছে, তাহার নিশ্চয় হয় না। এই কারণে পূর্ব্বকালে কেহ বলিতেন, কেতু এক শত, কেহ বলিতেন, এক সহস্র।

অনুমানের কথা থাক। প্রাচীনেরা অনেক কেতু দেখিয়াছিলেন, অনেক পুঁথী লিখিয়াছিলেন। কেতুর শিখা, কেতুর বর্ণ, পূর্বপশ্চিমাদি দিকে দর্শন ও অদর্শন, গ্রহ কিংবা নক্ষত্রের নিকটে দর্শন ও অদর্শন, গ্রহ কিংবা নক্ষত্রের সহিত স্পর্শন—এই পাঁচ বিষয় লক্ষ্য করিতেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, কোন কেতু মুক্তাহার-রূপ, কোন কেতু বংশগুল্মাকার, কোন কেতু চামররূপ, কোন কেতু দর্পণবৎ বৃত্তাকার, ইত্যাদি; কোন কেতু শিখাযুক্ত, কোনটা শিখাহীন, কোনটার শিখা ঋজু, কোনটার বক্র ইত্যাদি; কোন কেতুর শিখা এক, কোনটার দুই, কোনটার তিন; কোনটার তারা আছে কোনটার নাই, কোনটার তারা অস্পষ্ট, কোনটার বিপুল; কোনটা লোহিত বর্ণ, কোনটা তুষারতুল্য, কোনটা শশিবৎ প্রভ, কোনটা আধূম্র, ইত্যাদি; কোনটা আকাশের ত্রিভাগ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিল, কোনটা সপ্তর্ষির নিকটে, কোনটা কৃত্তিকার নিকটে, কোনটা অর্দ্ধরাত্রে, কোনটা মাত্র এক রাত্রি দেখা গিয়াছিল।

এ সমস্ত উক্তি কত শত বৎসর কেতু দেখার ফল? গত দুই সহস্র বৎসরে প্রায় পাঁচ শত কেতু শুধু চোখে দেখা গিয়াছে। গড়ে প্রতি চারি বর্ষে একটা। বরাহের সময়ের পূর্ব্বে কত শত বর্ষে সহস্র কেতু দৃশ্য হইয়াছিল?

কিন্তু কোন্ শকে বা কল্যব্দে কোথায় কিরূপ কেতু দৃশ্য হইয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। চীনারা আশিয়াবাসী, আমরাও

আশিয়াবাসী। কিন্তু চীনারা কেতুর কোষ্ঠীপত্র রাখিয়াছে, আমাদের পিতামহগণ রাখেন নাই, কিম্বা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। জয়দেব লিখিয়াছেন, 'ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।' তাঁহার জীবনকালে ধূমকেতু নিশ্চয় দৃশ্য হইয়াছিল। কিন্তু কোন্ শকে? কালিদাসের 'ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ' উপমার লক্ষ্য কোন্ শকের কেতু?

আমরা এখন খেদ করিতেছি; জিজ্ঞাসিতেছি, কোন্ শকে কিরূপ কেতু দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আমরাও কি লিখিয়া রাখিতেছি, কোন্ শকের কোন্ দিন আকাশের কোথায়, কত বড়, কেমন কেতু দেখিয়াছি? স্মৃতির ভরসা করিয়া আমরা কত-না বিড়ম্বিত হই? ৫২ বৎসর পূর্ব্বের, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসের ধূমকেতু বর্ত্তমান লোকের বৃদ্ধেরা দেখিয়াছিলেন, অন্নের স্মরণ থাকিতে পারে। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাসের বিশাল কেতু অনেকের মনে থাকিতে পারে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের আশ্বিন মাস হইতে চারি পাঁচ মাস যে বৃহৎ কেতুর উদয় হইত, তাহা না ভুলিবার কথা। বৎসর তিন পূর্ব্বে (খ্রীঃ ১৯০৭, আগষ্ট) রাত্রি ৩টার সময় একটা ছোট কেতু দিনকতক দেখা গিয়াছিল। কিন্তু অসময় বলিয়া অনেকের ভাগ্যে দর্শন ঘটে নাই। এই যে সে দিন একটা দেখা গেল, তাহারও সংবাদ অনেকের কর্ণে পহুঁছে নাই। এক বৎসরে দুই তিনটা কেতু শুধু চোখে দেখার সম্ভাবনা নাই। এ বৎসর সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। চৈত্রমাসে এবং পুনর্ব্বার বৈশাখ মাসে একটা দেখিবার আশা আছে। চর্মচক্ষে অল্প কেতু দৃশ্য হয়, দুরবীক্ষণের কাচচক্ষে বহু কেতু জ্যোতিষীর নয়ন-পথের পথিক হইতেছে। এমন বৎসর যায় না, যে বৎসর একটাও হয় না।

সে কালে ধূমকেতুর গতি গণিতের গম্য হইত না। এ কালে তিন দিনের (তিন বারের) স্থিতি পাইলে তাহার গতি ও মার্গ গণিতে পারা যায়। পাশ্চাত্য জ্যোতিষী কেপলার গ্রহগতি আলোচনা করিয়া গ্রহপথ বৃত্ত কল্পনা ছাড়িয়া দীর্ঘবৃত্ত বলিয়া অনুমান করেন। নিউটন সপ্রমাণ করেন, গ্রহমার্গের উক্ত আকার মাধ্যাকর্ষণের ফল। কেতুগুলাও মাধ্যাকর্ষণের অধীন কি না, এ প্রশ্ন সহজে মনে আসিল। খ্রীঃ ১৬৮০ অব্দের কেতু দেখিয়া নিউটন তাহার পথ নির্ণয় করেন। দুই বৎসর পরে, খ্রীঃ ১৬৮২ অব্দে আর একটা কেতু দেখা যায়। নিউটনের সাহায্যে হেলি তাহার পথ এবং গতিবিধি নিরূপণ করেন। হেলি যে কেতুর মার্গ ও গতিক্রম নিরূপণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম হেলির কেতু হইয়াছে।

বিশ্বজগতে কি হয়, কি হয় না, কি আছে, কি নাই, তাহা বিশ্ব-রচয়িতাই জানেন। তথাপি অন্তহীন আকাশে প্রায় একই পথে দুই পাঁচটা কেতুর বিচরণ অসম্ভব মনে হয়। খ্রীঃ ১৬৮২ অব্দের কেতুর পথ নির্দেশের পর হেলি দেখিলেন, খ্রীঃ ১৬০৭ অব্দে কেপলার যে কেতুর স্থিতি ও গতি দেখিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার পথ এবং ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের কেতুর পথ প্রায় এক। এক মার্গে দুইটা কেতু ধাবিত হইবার সম্ভাবনা নাই বিবেচনা করিয়া হেলি বলিলেন, বস্তুতঃ একটা কেতুই ৭৫॥০ বৎসর পরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। তাহা হইলে ৭৫॥০ বৎসর পূর্বেও তাহা দৃশ্য হইয়াছিল। বাস্তবিক ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দে, এবং ইহারও ৭৫॥০ বৎসর পূর্ব্বে ১৪৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গণিতাগত সময়ে কেতু দেখা গিয়াছিল। চারিবার প্রত্যাবর্তন যখন মিলিয়াছে, ভবিষ্যতেও মিলিবে। হেলি বলিলেন,—দেখিবে, ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে আবার দেখা যাইবে। সত্য সত্য সে বারেও দেখা গিয়াছিল। ইহার পর ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দেও ঠিক আসিয়াছিল, এবং এ বৎসরও ঠিক আসিয়াছে। সূর্য্যের আকর্ষণ ব্যতীত বৃহস্পতি ও শনির আকর্ষণে হেলির কেতুর প্রদক্ষিণ কাল ৭৬ বৎসরের কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক হয়। জ্যোতির্বিদগণ সূক্ষ্ম গণনা করিয়া খ্রীঃ পূর্ব্ব ২৪০ অব্দ হইতে এ বৎসর পর্য্যন্ত ২৯ বার ঐ কেতুর উদয়ের দিনক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, এবং সে কাল ইতিহাসে লিখিত কালের সহিত মিলিয়াছে।

গ্রহনক্ষত্রাদির যে স্থান, তাহার নাম দিব্যস্থান। যে চক্ষে সে স্থান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে দিব্যচক্ষু বলা অন্যায় হইবে না। হেলি দিব্যকেতুর স্থান প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে দিব্যচক্ষু দিয়া গিয়াছেন। তদবধি প্রায় দুই শত কেতুর মার্গ ও গতি গণিত হইয়াছে। দেখা যায়, অনেক কেতু তিন চারি পাঁচ সাত বর্ষ অন্তরে, কোন কোনটা শতাধিক বর্ষ অন্তরে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের কেতু সাত আট শত বৎসর পরে, এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের কেতু দুই সহস্র বৎসর পরে আসিবার কথা!*

* আশ্চর্য্যের কথা, পরাশর লিখিয়াছেন, 'জল নামক কেতু ১৩।১৪।১৮ বর্ষ অন্তর দেখা যায়। ইহার আকার সিংহ-লাঙ্গুলের তুল্য।' সে কালে তবে কেতুর প্রত্যাবর্ত্তন-সম্ভাবনা স্বীকৃত হইয়াছিল। জ্যোতিষ-সংহিতাদিতে কেতুর যে বর্ণনা আছে, তাহা তন্ন তন্ন বিচার করিলে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' গ্রন্থে কেতু

সম-স্থূল বেত্র বাঁকাইয়া গোল করিলে বৃত্ত পাই। সেই বৃত্তের দুই বিপরীত প্রান্ত ধরিয়া টানিলে দীর্ঘ বৃত্ত, প্রাচীন ভাষায় প্রতিবৃত্ত (ellipse) হয়। গ্রহগণের মার্গ প্রায় বৃত্ত, অথবা প্রায় প্রতিবৃত্ত। অনেক কেতুর পথ প্রতিবৃত্ত। এই সকল কেতু অল্প বা অধিক কালের পর আবার আসে। হেলির কেতুর পথ প্রতিবৃত্ত। বেত বাঁকাইয়া মুখ বিস্তৃত করিয়া ধরিলে যে আকার হয়, তাহাকে ফটা (parabola) বলা যাউক। সর্পফণা, সুন্দর দন্ত ও নখের আকার ফটা। যে কেতুর পথ ফটাকার, সে কেতু আর আসে না। গত মাঘের কেতু এইরূপ। বৃত্তের মধ্যস্থল হইতে পরিধির অন্তর সমান; কিন্তু প্রতিবৃত্তের সমান নয় এবং ফটার মধ্য নাই বলা চলে। প্রতিবৃত্ত ও ফটার মহৎ ব্যাসে কীল (focus)। এই কীলে সূর্য্য অবস্থিত। গ্রহগণের প্রতিবৃত্তের কীলে সূর্য্য, কেতুগণের পথের কীলেও সূর্য্য। সূর্য্যের নিকটতম স্থানের নাম নীচ এবং দূরতম স্থানের নাম উচ্চ। যখন কেতু তাহার পথের নীচস্থানে আসিতে থাকে, তখন তাঁহা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। সেই সময়ে তাহা আমাদের দৃষ্টিপথে আসিবার সম্ভাবনা ঘটে।

পৃথিবী হইতে রবি নয় কোটী ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রহ ও ধূমকেতুর অন্তর মাপিতে হইলে এই রব্যন্তরকে গজ-কাঠি করা হইয়া থাকে। যত কেতুর পথ গণিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন কোনটা রবির সন্নিকট-বর্ত্তী হইয়াছিল; এমন কি ৬০ লক্ষ মাইলেরও অল্প দূরে আসিয়াছিল। অধিকাংশ কেতু পৃথিবীর পথের ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা গিয়াছে। কএকটা কেতু পৃথিবীর পথের বাহিরে অথচ নিকটে থাকিলে দৃশ্য হইয়াছে।

কেতুর নীচস্থান এ দিকে ও দিকে, ঊর্দ্ধে অধোদিকে, প্রায় সব দিকেই আছে। পৃথিবীর কক্ষাক্ষেত্র কাটিয়া কেতুর কক্ষাক্ষেত্র। গ্রহগণের কক্ষাক্ষেত্রও এইরূপ। কিন্তু গ্রহগণের কক্ষাক্ষেত্রের পরস্পর কোণ অত্যল্প, কেতুগণের কক্ষাক্ষেত্রের কোণ ৯০ অংশ পর্য্যন্ত হইতে পারে। হেলির কেতুর কক্ষাকোণ ১৮ অংশ, মাঘের কেতুর কক্ষাকোণ ৪২ অংশ। এই কারণে কেতু উত্তর কিংবা দক্ষিণ দিকেও দেখা যাইতে পারে।

অনেক কেতু গ্রহদিগের ন্যায় পশ্চিম হইতে পূর্ব্বমুখে ভ্রমণ করে। কএকটা বিপরীতগামী; পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যায়। হেলির কেতু পশ্চিম-মুখী। এখানে পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন-গতির কথা হইতেছে না। সে গতিবশতঃ গ্রহ-কেতু কেন, নক্ষত্রসমূহও প্রত্যহ পশ্চিমে অস্তগত হইয়া থাকে।

কেতুর গতি চিন্তা করিলে মনে হয়, যেন দূরদূরান্তর হইতে তাহা সূর্য্যের দিকে লোষ্ট্রবৎ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। শূন্যে লোষ্ট্র উৎক্ষিপ্ত হইলে তাহা বক্রপথে — ফটাপথে ভূতলে পতিত হয়। নিক্ষিপ্ত কেতু সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়া স্বস্থানে পড়িতেছে। কিন্তু কি ভীষণ বেগে ছুটিতেছে! কক্ষাপথে পৃথিবী প্রত্যহ ষোল লক্ষ মাইল পথ চলিতেছে। ইহাই ত ভীষণ বেগ! কিন্তু গত মাঘের কেতু তাহার নীচস্থানে (৬ই মাঘ) এক দিনে সাত কোটী মাইল ছুটিয়া গিয়াছিল। চারি দিন পূর্ব্বে ও পরে প্রত্যহ ছয় কোটী মাইল বেগ ছিল। এই কারণে দিন কএক দেখা দিয়া সে কেতু কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। হেলির কেতুর বেগও অল্প নয়। নীচ স্থানে—যে স্থানে বেগ চরম হয়, সে স্থানে (৭ই বৈশাখ) প্রত্যহ পঞ্চাশ লক্ষ মাইল বেগে ছুটিবে। উহার আঠাইশ দিন পূর্ব্বে ও পরেও বেগ চল্লিশ লক্ষ মাইল থাকিবে। এই কেতুর পথ দীর্ঘপ্রতিবৃত্ত বলিয়া আমরা কিছুদিন উহা দেখিতে পাইব।

কেতুর এই ভীষণ বেগ শুনিলে মনে হয় যেন কেতু দুই চারি হাত লম্বা। কিন্তু যেটা কেবল দূরবীক্ষণে দৃশ্য হইয়া থাকে, তাহারও শির লক্ষাধিক মাইল! ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের কেতুর শির বিস্তারে দেড় লক্ষ মাইল ছিল। শির অপেক্ষা শিখা বৃহৎ হইয়া থাকে। এই কেতুর শিখা দশ কোটী মাইল দীর্ঘ হইয়াছিল। শিরের নিকট শিখার বিস্তার দুই লক্ষ মাইল,প্রান্তে কোটী মাইল! মনে রাখিতে হইবে, অর্থাৎ এমন বিশাল যে, ৮০০০ সূর্য্য জটার মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে পারিত! এক এক সূর্য্য আমাদের পৃথিবীর তের লক্ষের দেহের সমান। কিন্তু যে শিখী বিশাল, সেও ভারে অল্প। কারণ, তাহার স্পর্শনে, ঘর্ষণে, বা আকর্ষণে পৃথিবী বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। অতএব শিখা অতিশয় তরল। অন্য প্রমাণও আছে। শির যত ঘন, শিখা তত নহে। কিন্তু শিরেরও আচ্ছাদন ঘটিলে আকাশের ক্ষুদ্র তারাও অধিক অস্পষ্ট হয় না। শিখার আচ্ছাদনে তারার দীপ্তিহ্রাস হয় না। অথচ ক্ষিতিজের নিকটবর্ত্তী তারা ভূবায়ুর আবরণ হেতু অস্পষ্ট অদৃশ্য হয়। অতএব শিখা ভূবায়ু অপেক্ষাও তরল।

কিন্তু তরল হইলেও তাহাতে কণা থাকিতে পারে। অগ্নির ধূম তরল বটে, কিন্তু তাহাতে অঙ্গারকণা থাকে। মেঘ তরল, কিন্তু তাহাতে জল-কণা কিম্বা তুষারকণা থাকে। সেইরূপ কেতু তরল বোধ হইলেও তাহাতে কঠিন কিম্বা দ্রব কণা থাকিতে পারে। ঝড়ের সময় বালুকা ও প্রস্তরকণা উড়িতে থাকে। কে জানে কেতুর কণা বালুকার কি লোহার?

গ্রহের দীপ্তির কারণ রবি-রশ্মি। রবি হইতে কেতু যত দূরে যাইতে থাকে, তাহার দীপ্তিও হ্রাস পায়, এবং কেতু ক্রমশঃ অদৃশ্য হয়। ইহাতে বোধ হয় কেতুর দীপ্তির কারণ রবি-কর। কিন্তু রবিই এক কারণ হইলে যে অনুপাতে গ্রহদিগের দীপ্তি হ্রাস পায়, কেতুর অন্তর বৃদ্ধিতে সে অনুপাতে হ্রাস পাইত। পুনশ্চ বর্ণলেখা-যন্ত্রে—যে যন্ত্রে রশ্মিবিশ্লেষণ দ্বারা রশ্মির উৎপত্তি বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে দেখিলে বোধ হয়, কেতুর স্বকীয় দীপ্তি আছে। রবি-রশ্মির কারণ রবিতেজঃ, দীপরশ্মির কারণ তৈলাদির দহন, কেতুর দীপ্তির কারণ তাহাতে বর্ত্তমান আছে। এক এক কেতুর দীপ্তি অকস্মাৎ বৃদ্ধি অকস্মাৎ হ্রাস পায়। বর্ণলেখা-যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতিষিগণ অনুমান করেন, ধূমকেতুতে একটা বাষ্প—যেমন কেরোসীন তেলের বাষ্প বিদ্যমান আছে। অতএব বাষ্পপরিব্যাপ্ত-লোষ্ট্রকণা-সমষ্টিতে কেতুর বিশাল বপু নির্ম্মিত।

এইখানে প্রসঙ্গান্তরে আসিতে হইতেছে। রাত্রে আকাশের দিকে তাকাইলে উল্কাপতন দেখিতে পাওয়া যায়। উল্কার আকারে-প্রকারে নানা ভেদ আছে। অধিকাংশ অন্তরীক্ষে নিমেষমাত্র দীপ্তিশালী হইয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হয়। এক একটা এত বড় যে, ভস্মীভূত না হইয়া ভূতলে পতিত হয়। কলিকাতার জাদুঘরে অনেক উল্কাপিণ্ড (অশনি) সংগৃহীত ও রক্ষিত হইয়াছে। সময়ে সময়ে উল্কাবৃষ্টি হইয়া থাকে। তখন বোধ হয়, আকাশের নানা স্থান হইতে অসংখ্য উল্কা ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইতেছে। কিন্তু উল্কাপতন-পথ আকাশের দিকে বাড়াইয়া দিলে সে সব প্রায় একই বিন্দুতে মিলিত হয়। বস্তুতঃ যেমন রেলগাড়ীর লৌহপথ পরস্পর সমান্তরাল, অথচ দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন এক বিন্দু হইতে আসিয়াছে, উল্কাবৃষ্টির উল্কাকুল তেমন সমান্তর পথে ধাবিত হইয়া থাকে। জ্যোতিষিগণ অনুমান করেন, উল্কা-কুল গ্রহগণের ন্যায় নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতেছে। যখন পৃথিবী উল্কাকুলের কক্ষাপথে এবং উল্কাও পৃথিবীর কক্ষাপথে একদা আসিয়া পড়ে, তখন উল্কাবৃষ্টি হয় (২য় পট)। যদি নির্দ্দিষ্ট মার্গে নির্দ্দিষ্ট বেগে উল্কাকুল বিচরণ করে, তবে বৎসরের একই দিনে উল্কাবর্ষণ পুনঃপুনঃ ঘটিতে পারে। ২৬।২৭এ কার্ত্তিক এইরূপ এক উল্কাবৃষ্টির দিন। এই উল্কাকুল মঘা নক্ষত্র হইতে পড়িতে মনে হয়। সেইরূপ ১২।১৩ই অগ্রহায়ণ ভাদ্রপদা নক্ষত্র হইতে, এবং শ্রাবণ মাসে পুরুষনক্ষত্র (Perseus) হইতে আসিতে মনে হয়। যখন

উল্কাকুল দূরে দূরে থাকিয়া পথের সর্বত্র বিক্ষিপ্ত থাকে, তখন বৎসরের প্রতিমাসে কিছু না কিছু উল্কাপাত দেখা যাইতে পারে। পুরুষনক্ষত্রের উল্কা এইরূপ।

মঘা ও ভাদ্রপদার উল্কা প্রতিবর্ষে বর্ষে না। প্রায় তেত্রিশ বর্ষ অন্তর মঘার উল্কা, এবং তের বর্ষ অন্তর ভাদ্রপদার উল্কার বর্ষণ হয়। কোন কোন উল্কাকুলের গতি ও মার্গ জ্যোতিষিগণ গণনা করিয়াছেন। ভবিষ্যতে কবে কোন্ কুলের বর্ষণ হইবে, তাহাও গণিতের অধিকারে আসিয়াছে। এক এক কুল কেতুবিশেষের পথে ভ্রমণ করে। পুরুষনক্ষত্রের উল্কা ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের কেতুর পথে, মঘানক্ষত্রের উল্কা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের কেতুর পথে এবং ভাদ্রপদার উল্কা বায়েলার কেতুর পথে ভ্রমণ করিতেছে। একটা দুইটা উল্কাকুলের পথ এবং কেতুবিশেষের পথ অভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু অনেকের পথ অভিন্ন হইলে উল্কাকুল ও কেতুর সম্বন্ধ আকস্মিক বলিতে পারা যায় না। আধুনিক জ্যোতিষের এই আশ্চর্য্যজনক আবিষ্কারে কেতু ও উল্কার জ্ঞাতিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। শতাধিক উল্কাকুলের গতিপথ আলোচিত হইয়াছে। চারি পাঁচটার সঙ্গে সঙ্গে এক একটা কেতুও ধাবিত হইতে দেখা গিয়াছে। এই সকল কেতু শুধু চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, কেতু অপর কিছু নহে, উল্কাকুলের নিবিড় অংশ। এমনও হইতে পারে, এককালে যাহা কেতু ছিল, তাহাই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া উল্কারূপে পরিণত হইয়াছে।

এ বিষয়ের এক প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে। খ্রীঃ ১৮২৬ অব্দে বায়েলা নামক জনৈক অষ্ট্রীয়াবাসী দূরবীক্ষণে একটা কেতুর আবিষ্কার করেন। এই কেতুর সূর্য্য প্রদক্ষিণকাল প্রায় ৬॥০ বৎসর। ইহার পথ পৃথিবীর পথের এত নিকটে যে, সময়ে সময়ে উভয়ের ঠেকাঠেকি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল। খ্রীঃ ১৮৩২ অব্দে এই ঠেকাঠেকি ও ঠক্করের আশঙ্কায় ফরাসীদেশের জনসাধারণ ব্যাকুল হইয়াছিল। খ্রীঃ ১৮৩৯ অব্দে কেতু দেখার সুবিধা হয় নাই। খ্রীঃ ১৮৪৬ অব্দে একটার পরিবর্তে দুইটা দেখিতে পাওয়া যায়। এই যমজকেতু চারি মাস এক সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল (১ম পট)। প্রত্যেকের একটা করিয়া তারাও জন্মিল। আরও আশ্চর্য্য, যখন একটার তারা ম্লান হইত, তখন অপরটা উজ্জ্বল হইত। খ্রীঃ ১৮৫২ অব্দেও সেই অবস্থা। ইহার পর সে কেতু অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু খ্রীঃ ১৮৭২ অব্দের অগ্রহায়ণ মাসে

(২৭শে নভেম্বর) যখন পৃথিবী সেই পুরাতন বায়েলার কেতুর পথের ধার দিয়া যাইতেছিল, তখন প্রচুর উল্কাবৃষ্টি হইয়াছিল। খ্রীঃ ১৮৮৫ অব্দের আবার সেই দিনে সন্ধ্যার পর যে ঘন ঘন উল্কাপাত হইয়াছিল, তাহা অনেকের স্মরণ আছে। সে রাত্রে কত লোক যে উল্কাপাতে মৃত্যুর ভয়ে ঘরে ঢুকিয়াছিল, যাহারা সে সময়ে বাহিরে ছিল, তাহারাই জানে।

অনেকের বিশ্বাস, বায়েলার কেতু উল্কা ও পাংশুতে পরিণত হইয়াছে। যে অবশেষ আছে, তাহাও কালে বিলুপ্ত হইবে।

কেতুর শিখা বা পুচ্ছের বিচিত্র স্বভাব চিন্তা করিলেও কেতুকে স্থিরতনু বলিয়া বোধ হয় না। চর্ম্মচক্ষুতে দৃশ্য কেতুর যে রূপ দেখা যায়, দূরবীক্ষণে দৃশ্য কেতুর সেরূপ পাওয়া যায় না। দূরবীক্ষণে দৃশ্য কেতু দেখিতে যেন একখণ্ড ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘ। মাকড়সার ছোট জালে আলো পড়িলে দূর হইতে যেমন দেখায়, কেতু তেমন দেখায়। তখন মাঝে তারকাও থাকে না, কিন্তু মাঝখানটা একটু উজ্জ্বল দেখায়। হেলির কেতু আজিকালি (মাঘমাসের মাঝামাঝি) দূরবীক্ষণে এইরূপ দেখাইতেছে)। সূর্য্যের নিকটে কেতু যেমন আসিতে থাকে, সেই অস্পষ্ট বাষ্পকণাপুঞ্জের মধ্যভাগ উজ্জ্বল হইতে থাকে। ইহার পর সূর্য্যের দিকের শিরে তারকা জন্মে, এবং তারকা হইতে রশ্মি, কখনও বা প্রাবরণ বহির্গত হইতে থাকে। রশ্মি ও প্রাবরণ কখনও স্ফীত হয়, কখনও কুঞ্চিত হয়, এবং শেষে শিরের আকার পায়। ইতিমধ্যে তারকার পরিমাণ হ্রাস, কিন্তু দীপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার পর তারকা হইতে শিখা নির্গত হয়, যেন তারকা ও সূর্য্য উভয় দ্বারা শিখা যুগপৎ তাড়িত হইতে থাকে। তারকা কি বস্তু, কঠিন জড়পিণ্ড কি দ্রবাকার কণাপুঞ্জ, তাহা অদ্যাপি অজ্ঞাত। কিন্তু উহা যে সূর্য্যকিরণে বাষ্পীভূত হইতে থাকে, তাহাতে প্রায় সন্দেহ নাই।

লোকে মনে করে, পুচ্ছটা কেতুর নিত্য অঙ্গ। হাত পা আমাদের দেহের নিত্য অঙ্গ, কিন্তু কেতুর পুচ্ছ অস্থায়ী। কারণ, যখন সূর্য্যের নিকটে কেতু আসে, তখনই পুচ্ছ থাকে, এবং সে পুচ্ছ সূর্য্যের বামে যে দিকে দক্ষিণে সে দিকে থাকে না। ভীষণ বেগে বাম হইতে দক্ষিণে (কিম্বা দক্ষিণ হইতে বামে) কেতু চলিয়া যায়, পুচ্ছও সঙ্গে সঙ্গে এদিক হইতে ওদিকে যায়।

বাষ্পের পুচ্ছ, ধূমের পুচ্ছ এত বেগ সম্বরণ করিতে পারে না। সুতরাং যেমন ধাবমান রেলগাড়ী কিম্বা জাহাজের ধুঁআ, কেতুর পুচ্ছও তেমন বলিয়া অনুমান হয়। এইমাত্র যে ধূমপুঞ্জ দেখিলাম, পরক্ষণে তাহা দেখি না, অন্য ধূম দেখি। সূর্য্যের নিকট কেতু যত আসিতে থাকে, ধূমোদ্গার তত বাড়িতে থাকে, পুচ্ছ দীর্ঘ হইতে থাকে, যেন কেতুর তারকা উদ্বেয় দ্রব পদার্থ! কিন্তু সে ধূমমালা সূর্য্যের বিপরীত দিকেই থাকে কেন? কেজানে।

যদি কোন কেতু পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে আমাদের দশা কি হইবে? কে জানে। আজি পর্য্যন্ত সৌধমালাভার বহন করিয়া কলিকাতা নিশ্চল আছে, সুতরাং পরেও থাকিবে; এরূপ যুক্তি বালকে করে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের লয়প্রলয়, সৃষ্টি-স্থিতির বার্ত্তা কে জানে। কেতুর শির পৃথিবী বিদীর্ণ না করুক, কিম্বা পৃথিবী কেতুর শির নিজ দেহের আবরণ না করুক, কেতুর দীর্ঘ জটা পৃথিবীর ধূলিলুণ্ঠিত হইতে পারে। হয় ত পূর্ব্বে অনেকবার পৃথিবীকে নিমেষমাত্র আবরণ করিয়া বিশাল কেতুর পুচ্ছধূম চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কেহই সে ব্যাপার জানিতে পারে নাই। আগন্তুক হেলির কেতুর পুচ্ছ গত বারের মতন দীর্ঘ থাকিলে, পৃথিবীর অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। আগামী ৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে) পৃথিবীর কক্ষাক্ষেত্রে এবং পৃথিবী ও সূর্য্যের মাঝে কেতু আসিয়া পড়িবে। সে দিন উভয়ের মধ্যে এক কোটী তেতালিশ লক্ষ মাইল অন্তর থাকিবে। এই অন্তর কেতুর তারকার, পুচ্ছের অন্তর নহে। অতএব যদি পুচ্ছ ঐ অন্তর অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর অপর পারের আকাশে পুচ্ছপ্রান্ত ঠেকিবে। প্রাতে ৭৷৷৹টার সময় এই কেতু দ্বারা সূর্য্যগ্রহণ হইবে। হয় ত সূর্য্যবিম্ব ম্লান দেখাইতে পারে, হয় ত কিছুই লক্ষ্য হইবে না। ঘর্ষণে বা স্পর্শনে বা ভেদনে কি অনিষ্ট, কি লোমহর্ষণ ব্যাপার হইতে পারে, কিম্বা কি ইষ্ট, কি সৃষ্টিস্থিতির বিধান হইতে পারে, কি না পারে, তাহা ভবিতব্যই জানেন। অনাগতের অসাধারণের প্রতি মানব-মন সদা সন্দিগ্ধ; কিন্তু "বিপদি ধৈর্য্যম্"—বোধ হয় এই উপদেশপালন কর্তব্য।

বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের যে বিশাল ব্যাপার ক্ষুদ্র চিত্তে অনুভব করাও পীড়াকর, তাহার কাহিনী কে বলিয়া শেষ করিতে পারে? যাহা গণিতে মাপিতে কথায় কথায় 'লক্ষ লক্ষ' 'কোটী কোটী' সংখ্যা আবশ্যক হয়, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে?

কটক।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

পটব্যাখ্যা।

১ম পট।

১ম চিত্র—বায়েলার যমল কেতু ক, খ। দূরবীক্ষণ-দৃশ্য কেতুর আকারও এইরূপ। হেলির কেতুর বর্ত্তমান রূপও এই প্রকার। শাদা তুলা, বা শাদা মেঘ মনে করিলে ঠিক হইবে। যাঁহারা আকাশের নীহারিকা (nebula) দেখিয়াছেন, তাঁহারা কেতুর বর্ত্তমান রূপ নীহারিকার সহিত তুলনা করিতে পারেন। গত কএকদিনের মধ্যে দীপ্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। মধ্যভাগ উজ্জ্বলতর হইয়াছে, এবং বোধ হয় যেন তারকা জন্মিতেছে।

২য় চিত্র। গতবারে অর্থাৎ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হেলির কেতুর যে আকার দেখা গিয়াছিল।

৩য় চিত্র। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের কেতু।

৪র্থ চিত্র। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের কেতুর। তিনটা প্রাবরণ প্রথম প্রথম দেখা গিয়াছিল। রাহু অসুরের মুখের সাদৃশ্য আছে কি ?

৫ম চিত্র। গত ৭ই মাঘ হইতে সপ্তাহকাল যে কেতু দেখা গিয়াছিল। পট-কার শ্রীমান্ গোবিন্দচন্দ্র শূরদেব যেমন দেখিয়াছিলেন, তেমন আঁকিয়াছেন। প্রাচীন সংহিতার ভাষায় এই কেতু শূলাগ্র বোধ হইতেছে। লেখকের চর্ম্মচক্ষে এই আকার দৃশ্য হয় নাই।

২য় পট।

১ম চিত্র। মনের রথে চড়িয়া শূন্য হইতে সৌরজগৎ দেখিলে যেমন দেখায়, তাহার চিত্র। দর্শকের নিম্নে মধ্যস্থলে সূর্য্য। চিত্রে সূর্য্য এক বিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন। মধ্যে সূর্য্য। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া প্রথমে ক্ষুদ্র বুধ, তার পর শুক্র, তার পর পৃথিবী, তার পর মঙ্গল, তার পর বৃহস্পতি, তার পর শনির কক্ষাপথ। কক্ষাপথ প্রায় বৃত্ত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু পরস্পর দূরত্বের অনুপাত রাখা গিয়াছে। প্রতি কক্ষাপথে যে এক একটা ক্ষুদ্র বিম্ব আঁকা হইয়াছে, তাহা সেই কক্ষার গ্রহ। আগামী ১লা বৈশাখে এই সকল গ্রহ যেখানে যেখানে থাকিবেন, সেখানে সেখানে তাঁহাদিগকে স্থাপন করা গিয়াছে। শনির পর বরুণ (য়ুরেনস্) এবং তাঁহার পর পর্জন্য (নেপচুন) গ্রহ আছেন। কিন্তু পটে তাঁহাদের পক্ষাপথের স্থান কুলায় নাই। বরুণ-গ্রহের কক্ষাপথের কিয়দংশ দেখাইবার স্থান হইয়াছে। সূর্য্য হইতে শনি যত দূরে, তাহার দ্বিগুণ দূরে বরুণের এবং প্রায় তিনগুণ দূরে পর্জন্যের পথ।

বাম কোণ দিয়া যে দীর্ঘপ্রতিবৃত্তের কিঞ্চিৎ অংশ বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা হেলির কেতুর পথ। এই পথের নীচস্থান সূর্য্যের নিকট; উচ্চ স্থান বহু দূরে, পর্জন্য গ্রহকক্ষারও বাহিরে। নীচস্থান বর্দ্ধিত আকারে পটের নিম্নভাগে ২য় চিত্রে প্রদর্শিত হইল। ২য় চিত্রে পৃথিবীর স্থিতি ১লা মাঘ, ১লা ফাল্গুন, ১লা চৈত্র, ১লা বৈশাখ, ১লা জ্যৈষ্ঠ এবং কেতুর কক্ষাপথে ঐ ঐ দিবসের কেতুর স্থিতি প্রদর্শিত হইয়াছে। পৃথিবী ও কেতু রেখা দ্বারা যোগ করিয়া রেখা বাড়াইয়া দিলে রাশিচক্রের যেখানে ঠেকিবে, কেতু সেখানে দেখা যাইবে। আগামী ৭ই বৈশাখ (২০শে এপ্রিল) কেতু নীচস্থানে আসিবে। ৫ই জ্যৈষ্ঠ কেতু দ্বারা সূর্য্যগ্রহণ এবং ১৮।১৯ বৈশাখ কেতু দ্বারা শুক্রাচ্ছাদন ঘটিবে।

২য় পটের দক্ষিণ কোণ দিয়া যে বিন্দুময় প্রতিবৃত্তের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে, সে পথ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের কেতুর এবং কার্ত্তিক অগ্রহায়ণের উল্কা-কুলের। উভয় পথ প্রায় এক। এই প্রতিবৃত্তের উচ্চস্থান বরুণগ্রহ কক্ষার কিছু বাহিরে। হেলির কেতু এবং উল্কাকুল উভয়েই পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে যাইতেছে। শর-চিহ্ন দেখিলেই গ্রহগতিমুখ বোঝা যাইবে। সমস্তকে বেষ্টন করিয়া নক্ষত্রজগৎ সূর্য্য হইতে বহু বহু দূরে। ক্ষুদ্র পটে নক্ষত্র-গগনপট প্রবেশ করান দুঃসাধ্য। মেষ বৃষাদি দ্বাদশ রাশিভাগ সায়ন মনে করিতে হইবে। অর্থাৎ পাঁজীর রাশিতে ২২ অংশ যোগ করিলে যাহা হয়, তাহাই সায়ন রাশি। বলা বাহুল্য, সূর্য্য হইতে দেখিলে গ্রহকে আকাশের যে রাশিতে দেখা যাইবে, পৃথিবী হইতে দেখিলে, সেখানে দেখা যাইবে না। তা ছাড়া কক্ষায় যে গ্রহস্থান দেওয়া গিয়াছে, তাহাও সূক্ষ্ম নহে।

৩য় পট।

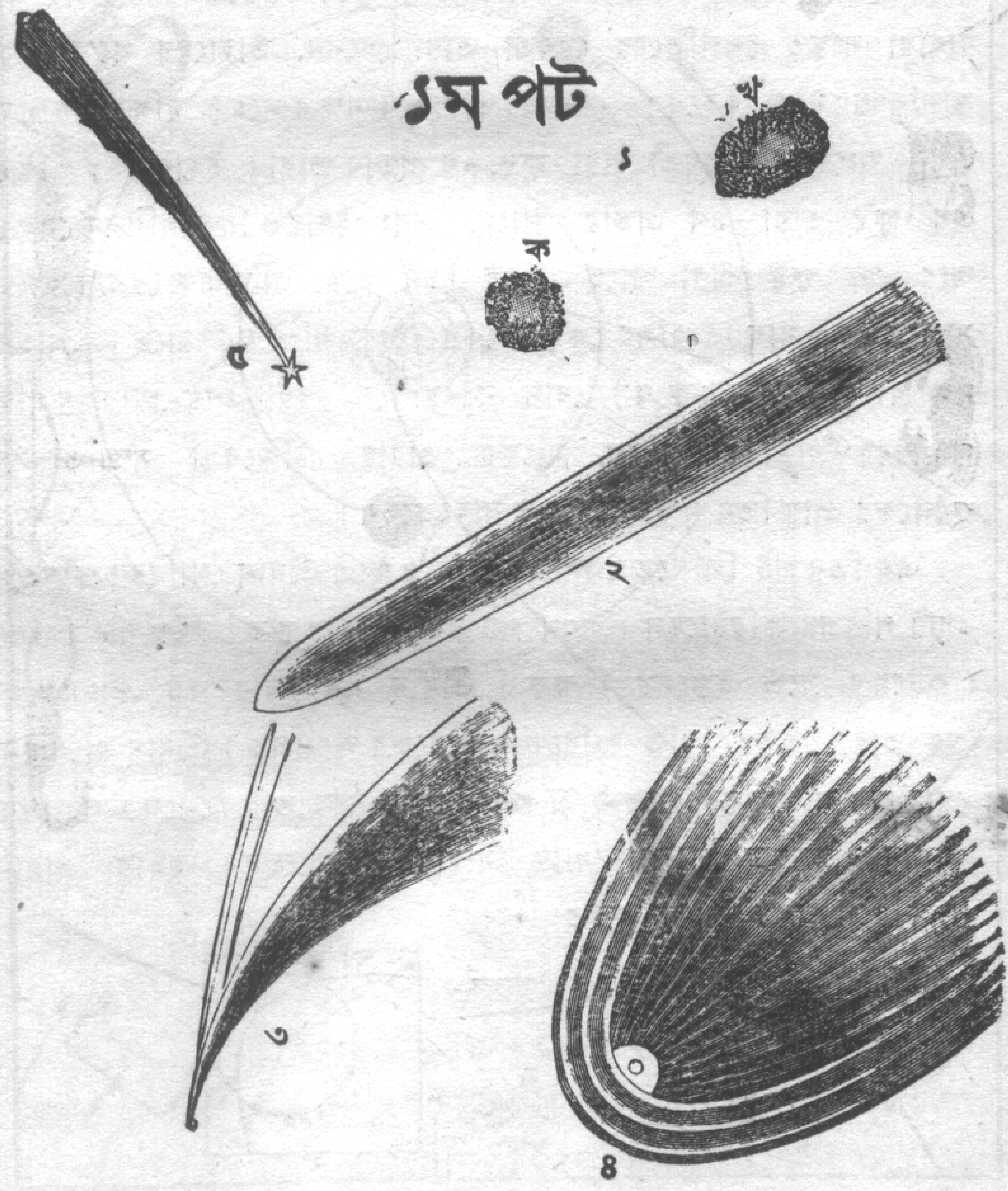
আমরা মাঘ মাস হইতে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত রবি শুক্র মঙ্গল বৃহস্পতি শনিকে নক্ষত্রের মধ্যে যে যে পথ দিয়া যাইতে দেখিব, তাহা এই পটে বিভিন্ন বর্ণের স্থূল রেখা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। শরচিহ্ন দেখিলে গ্রহগতিমুখ বোঝা যাইবে। পটের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে যে বিন্দুময় হ্রস্ব পথ আছে, তাহা মাঘ মাসের কেতুর পথ। হেলির কেতুর পথও বিন্দুময়; কিন্তু তাহা বিষুবের উত্তরে। দেখা যাইবে এই কেতু পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে

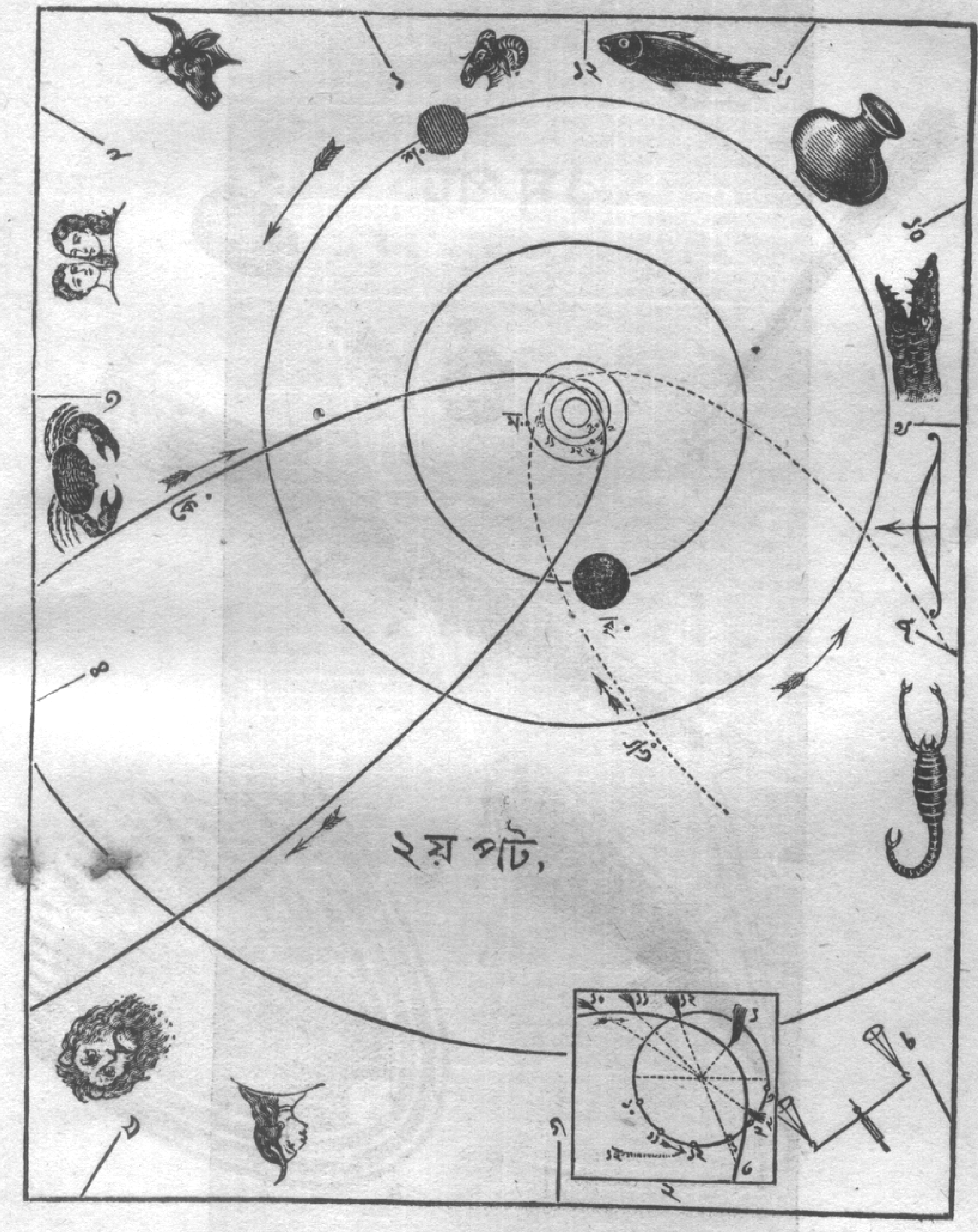
যাইবে। গ্রহ এবং কেতুপথে যে যে ভাগ করা গিয়াছে, সে সে ভাগ এক এক মাসের গতিপথ। মাঘ মাস ১০, ফাল্গুন ১১, চৈত্র ১২, বৈশাখ ১, জ্যৈষ্ঠ ২ এই সঙ্কেত বুঝিতে হইবে। ১৫ই মাঘ হেলির কেতু শনির ঠিক উত্তরে প্রায় ৫ অংশ দূরে ছিল। সেখান হইতে ক্রমশঃ পশ্চিমে যাইতেছে। গত কএক দিন হইতে দু-নলা ছোট দুরবীণেও কেতু দেখা যাইতেছে। কিন্তু আকাশের কোথায়, তাহা না জানিলে কেতুকে ধরিতে পারা যায় না। যাঁহারা সংস্কৃত জ্যোতিষের রেবতী তারা চেনেন, তাঁহাদের পক্ষে কেতুর স্থাননির্ণয় সহজ হইবে। রেবতী তারার (নক্ষত্র নহে) দক্ষিণে শনিগ্রহ এখন আছেন। রেবতী তারা ক্ষুদ্র, ৫ম প্রভার তারা। ইহার কিছু পশ্চিমে এক ক্ষুদ্র তারা—৪র্থ প্রভার—আছে, এবং ইহারও কিছু পশ্চিমে সেইরূপ আর এক ক্ষুদ্র তারা আছে। এই তিন তারা প্রায় এক রেখায় আছে। সম্প্রতি (২৯ মাঘ) হেলির কেতু মাঝের তারার পশ্চিমে গিয়াছে। অশ্বিনী-নক্ষত্রের দুই তারা (ক খ) যোগ করিয়া সে রেখা প্রায় চারিগুণ দক্ষিণ পূর্বদিকে বাড়াইয়া দিলে মাঝের তারায় ঠেকিবে। সম্প্রতি শনি সূর্য্যাস্তের প্রায় তিন ঘণ্টা পরে অস্ত যাইতেছেন।

এই তিন পট লিখিতে লেখকের ভক্ত ও ছাত্র শ্রীমান্ গোবিন্দচন্দ্র শূরদেব প্রচুর পরিশ্রম করিয়াছেন। ১ম পট সমস্ত তাঁহার কৃত। ২য় পট লিখিতে (কটকের সর্ভে ইস্কুলের শিক্ষক) শ্রীমান্ সনৎকুমার বসু, এবং ৩য় পটে গ্রহ তারা কেতুর স্থিতি করিতে (কলেজের অধ্যাপক) শ্রীমান্ রামেন্দ্রনাথ ঘোষ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। কএকটা অঙ্ক কষিতে (কলেজের অধ্যাপক) শ্রীমান্ বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাহায্য করিয়াছেন। ইহাঁরা সাহায্য না করিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ হইত। *

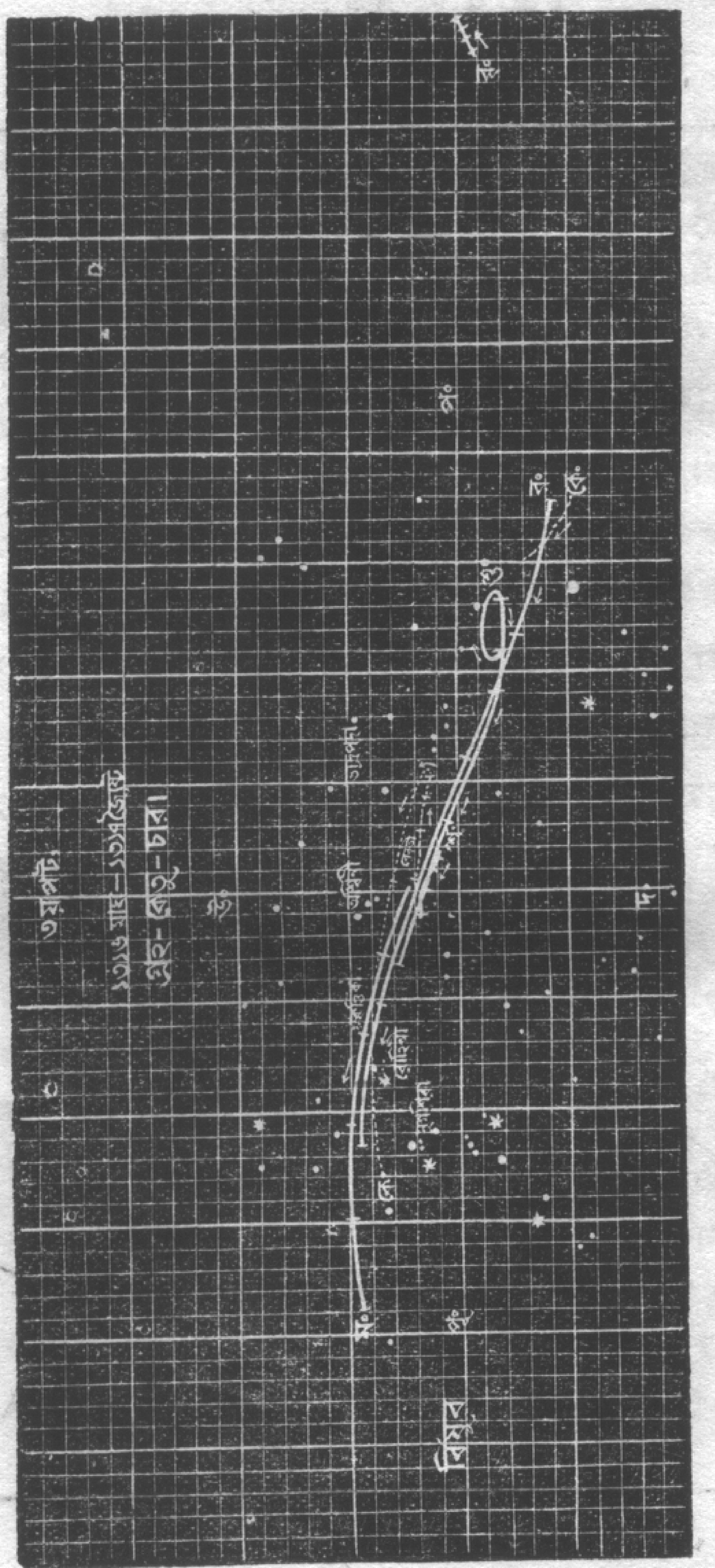
---

* ভাগলপুরের সাহিত্যসম্মিলন উপলক্ষে লিখিত।


১ম পট
খ
১
ক
২
৩
৪
৫



২য় পট,


৩য় পট।
গ্রহ-কেতু-চার।
বিষুব

সভাপতির অভিভাষণ।

——:o:——

[বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন।]

বিদ্বজ্জন ও বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ! অদ্য আমরা বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সম্মিলিত; অদ্য আমাদের পরম আনন্দের দিন; অদ্য এই মহাসভায় সজ্জনসমূহের সমাগম হইয়াছে। অদ্বিতীয় পরিব্রাজকাচার্য্য শঙ্করাংশ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।'

ক্ষণমাত্রের জন্যও কেবল সজ্জন-সহবাস দ্বারা ভবার্ণব উত্তীর্ণ হওয়া যায়। এই বিরাট সভার সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হইয়াই আমি কৃতার্থ হইয়াছি; পরন্তু পরমশুভাদৃষ্টবশতঃ আমি সভাপতিত্বেও বৃত হইয়াছি। আমাদের সম্মিলনের উদ্দেশ্য সুমহৎ—পরস্পরের সখ্যভাবসংবর্দ্ধন ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন। রাজনীতি বা রাজ্যশাসনপ্রণালীর সহিত আমাদের কোনও সম্বন্ধ নাই। রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলেও, ঘনঘটার ভীষণ শব্দের অনবরত প্রতিধ্বনি হইলেও, শান্তিবিরোধী ঘৃণিত কার্য্য দ্বারা মধ্যে মধ্যে ভারতবর্ষ কলুষিত হইলেও, আমাদের শান্তিময় কার্য্যে কোনও ব্যাঘাত নাই। সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনার্থ রাজার সাহায্য প্রার্থনীয় বটে, কিন্তু নীতিবিৎ যথার্থই বলিয়াছেন,—

'বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।'

বিদ্বান্ ও রাজা কখনই সমতুল্য নহেন। রাজা কেবল স্বদেশেই পূজ্য; বিদ্বান্ সর্ব্বত্রই পূজ্য।

দিগ্বিজয়ী সেকেন্দার (Alexander) জেঙ্গিজ, তাইমুরলঙ্গ, নেপোলিয়ন প্রভৃতি বিজেতা স্বাধীনতাহারী যুদ্ধবীরগণ যতই দুর্দ্ধর্ষ বা তেজস্বী থাকুন না কেন, ব্যাস, বাল্মীকি, হোমার ও সেক্সপেয়ার সকল সময়েই সর্ব্বদেশ-পূজিত।

এরূপ বিদ্বজ্জন-সমাগমে পরস্পরের প্রীতিবর্দ্ধনের বিশিষ্ট উপায় ও সকলের সহযোগে ভারতবর্ষের সাহিত্যের অবশ্যম্ভাবী অভ্যুদয়ের উপায় আমরা এই সভায় অনেকটা স্থির করিতে পারিব। আমাদের পরস্পরের বহুদিনের পরিচয় না থাকিলেও,

'সতাং হি সৌহার্দ্দাং সাপ্তপদীনমুচ্যতে।'
সাত কথাতেই সাধুগণের সৌহার্দ্দ্য হয়।

মধ্যে মধ্যে এরূপ সাহিত্য-সম্মিলন নিতান্ত আবশ্যক। উত্তর বঙ্গে দুইবার সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছে, এবং সে দিন গৌরীপুরেও একটি সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। বরোদার মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য-সম্মিলন অনেকেরই স্মরণ থাকিবে। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের শেষ কীর্ত্তি মহারাষ্ট্রীয় সাহিত্য-সম্মিলন। অকালে তাঁহার অন্তর্ধানে আমাদের যৎপরোনাস্তি মনোবেদনা হইয়াছে, এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উপায়বিধান এই বিরাট সভারই অন্যতম আলোচ্য। তিনি প্রকৃতই কর্ম্মবীর ও সাহিত্যবীর ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মৃত্যুতে সংস্কৃত সাহিত্যের একটি অদ্বিতীয় জ্যোতিষ্ক তিরোহিত হইয়াছে। বিদ্যোৎসাহী কাকিনার রাজা মহিমারঞ্জন রায়ের স্বর্গগমনেও বঙ্গসাহিত্যের অসীম ক্ষতি হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ভূতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক বিবরণে অদ্যকার সম্মিলনের ক্ষেত্র উচ্চস্থানের অধিকারী। গ্রাণাইটময় মন্দারগিরি ও কর্ণগড় এই প্রদেশের পুরাতনত্ব ঘোষণা করিতেছে। সুদূর অতীতকালে, যখন মহাসাগরের নীলাভ সলিলরাশি পুরাতন বিন্ধ্যগিরিশ্রেণীর প্রাচ্য বিভাগে রাজমহলপর্ব্বতসমূহের পাদদেশ অভিষিক্ত করিত, তখন অঙ্গদেশ বর্ত্তমান বঙ্গোপসাগরের উত্তরসীমা ছিল। ক্রমশঃ অব্‌তেজপ্রভাবে মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-মালার লীলাভূমি দক্ষিণাভিমুখ হওয়ায়, অঙ্গের সীমা বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান বঙ্গদেশের ব-দ্বীপ সহস্র নদ নদী সহ বরুণরাজ্য হইতে উত্থিত হইয়াছে। ক্রমশঃ অঙ্গদেশ হইতে আর্য্যবসতির দক্ষিণে ও পূর্ব্বে বিস্তার হইয়াছে। প্রথমে অনার্য্য জাতির বাসভূমি থাকিলেও ভারতবর্ষের সমস্ত

প্রাচ্য প্রদেশ অত্যল্পকালেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের বাসোপযোগী হইয়াছিল। আর্য্য-ক্ষত্রিয়রাজগণ সহজেই সজলা শ্যামলা শস্যপূর্ণা নবোত্থিতা উর্ব্বরা ভূমিতে রাজত্ব বিস্তার করিয়া আর্য্যসভ্যতা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। আর্য্যভাষা, আর্য্যরীতি, আর্য্যসাহিত্য ক্রমশঃ প্রাচ্য রাজ্যে বিকাশ পাইয়াছিল, এবং অনতিদীর্ঘকাল পরেই অজয় নদীর কূলে সংস্কৃত-সাহিত্যের অদ্বিতীয় কুসুমস্তবক "গীত-গোবিন্দ" রচিত হইয়াছিল।

অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ—এই তিনটি প্রদেশ অতীত আর্য্যভারতের প্রাচ্য জনপদ। এই প্রাচ্য জনপদই প্রাচ্য সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। এই প্রাচ্য জনপদে ধর্ম্ম, শাসন ও বাণিজ্যের গৌরব একদিন কেবল ভারতবর্ষ বলিয়া নহে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমস্ত জগতের সভ্য প্রদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। দিগ্‌বিজয়ী সেকেন্দারের সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ এই "প্রাচ্য" ভূভাগকেই একটি সাম্রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অঙ্গ অর্থাৎ বর্ত্তমান ভাগলপুর জেলা ও তৎসন্নিহিত সৌন্দর্য্যময় প্রদেশ এই প্রাচীন সাম্রাজ্যের শিরোভাগ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। চম্পানগরী বহুযুগ হইতে অঙ্গরাজ্যের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বিভিন্ন পুরাণ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস দানবীর হরিশ্চন্দ্রের প্রপৌত্র চম্প চম্পানগরীর প্রতিষ্ঠা করেন; সুতরাং অতি প্রাচীন কাল হইতেই এখানে আর্য্য প্রভাব বিকশিত হইয়াছিল। এখন যাহা ভাগলপুর সহর, তাহাই পূর্ব্বকালে চম্পা রাজধানীর সহরতলী ছিল; এখনও ইহার চারি দিকে কর্ণরাজ্যের অতীত কীর্ত্তি ধ্বস্ত-নিদর্শনমধ্যে ও লোকমুখে জাগরূক রহিয়াছে। যখন সভ্য-জগদ্‌বিখ্যাত প্রাচ্য ভারতের রাজধানী পাটলীপুত্রের পতন হয় নাই, তৎপূর্ব্ব হইতেও চম্পার প্রসিদ্ধি। কি ব্রাহ্মণ্য, কি জৈন, কি বৌদ্ধ, অতি পুরাতনকাল হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রভাব চম্পা রাজধানীতে দেদীপ্যমান ছিল। জৈন সম্প্রদায়ের তীর্থঙ্কর বা অবতার বাসপূজ্য স্বামী এই চম্পাতেই আবির্ভূত ও সিদ্ধ হইয়াছিলেন; শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীর উপদেশে একদিন চম্পা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল। তজ্জন্য জৈন সম্প্রদায়ের নিকট চম্পানগরী অতি পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া আজও পরিচিত। শাক্যবুদ্ধের অভ্যুদয়কালে চম্পা মগধাধিপ বিম্বিসারের অধিকারভুক্ত ছিল;—তাঁহার প্রিয় পুত্র অজাতশত্রু রাজপ্রতিনিধিরূপে চম্পার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাক্যসিংহ এখানে ঘরে ঘরে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান দেখিয়াছিলেন, এবং তিনি বহুবার এখানে

আসিয়া জনসাধারণকে বিমল উপদেশ প্রদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকটও এই স্থান একটি পবিত্র বৌদ্ধতীর্থ ও ছয়টি প্রধান বৌদ্ধ কেন্দ্রের একতম বলিয়া সমাদৃত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হুঅন্ন-চুঅঙ্গ এখানে উভয় বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিভা দেখিয়া গিয়াছিলেন। এখানে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় এক সময়ে পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বিরাজমান ছিলেন। সেই অতীত সুদিনের সময়েই এখানকার অধিবাসিগণ সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে আর্য্য-সভ্যতার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অপূর্ব্ব অতীত কীর্ত্তির নিদর্শন আজও চীনসমুদ্রতীরবর্ত্তী আনাম দেশে জাজ্জল্যমান;—আজও সেই স্থান অনংচম্পা বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বে অঙ্গবাসিগণ যে অসাধারণ স্থাপত্য ও ভাস্করবিদ্যার পরিচয় দিয়া গিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মাবলম্বী বংশধরগণ সুপ্রাচীন দেবস্থানে উৎকীর্ণ শিলাফলকে ভারতীয় সভ্যতা-বিস্তারের যে সকল ইতিহাস প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেও বিস্ময়বিমুগ্ধ হইতে হয়।

এক্ষণে বাঙ্গালার লেফটেনেণ্ট গভর্ণরের অধীন তিনটি প্রধান বিভাগ—বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা। তিনটি বিভাগের প্রচলিত ভাষার অনেক সাদৃশ্য থাকিলেও, পার্থক্যও আছে; তিনটি ভাষার নাম বাঙ্গালা, হিন্দী ও উড়িয়া। অদ্য আমরা বাঙ্গালা ও হিন্দীপ্রধান প্রদেশের সন্ধিস্থলে সমবেত হইয়াছি। ভাগলপুর হিন্দীপ্রধান দেশ হইলেও এখানে বাঙ্গালী অনেক; অনেকেরই মাতৃভাষা বঙ্গভাষা। বস্তুতঃ ভাগলপুরের কমিশনরের বিভাগে উভয় ভাষাই বিশিষ্টরূপে প্রচলিত; খাঁটী বাসিন্দাদিগের ভাষা মিশ্রিত।

আট শত বর্ষ পূর্ব্বে পূর্ণিয়া, উত্তর ভাগলপুর ও দ্বারভাঙ্গা বঙ্গের সেন-রাজদিগের শাসনাধীন ছিল, এবং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, তথায় বঙ্গলিপিও প্রচলিত ছিল। উপাধ্যায়গণ (ওঝাগণ) বঙ্গাক্ষর ব্যবহার করিতেন; এখনও সে ব্যবহারের সম্পূর্ণ লোপ হয় নাই। তাঁহাদের ভাষাও বঙ্গভাষা হইতে বিশেষ বিভিন্ন ছিল না। মৈথিল কবিশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপতি ঠাকুর চল্লিশ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গের দ্বার দ্বারভাঙ্গার রাজসভায় রাজকবি বিদ্যাপতি ঠাকুর তৎকাল-প্রচলিত মৈথিল ভাষায় বঙ্গাক্ষরে লিখিয়াছিলেন—

'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়
সেহো পিরিতি অনুরাগ বখানইত
তিলে তিলে নুতন হোয় ॥ ২ ॥
জনম অবধি হম রূপ নিহারল
নয়ন ন তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥ ৪ ॥
কত মধু যামিনির রভসে গমাওল
না বুঝল কৈসন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখল
তইও হিয়া জুড়ল না গেল ॥ ৬ ॥
কত বিদগধ জন রস অনুমগন
অনুভব কাহু না পেখ।
বিদ্যাপতি কহ প্রাণ জুড়াইত
লাখে না মিলল এক ॥' ৮ ॥

শ্রীরাধা বলিতেছেন,—"সখি, রস-অনুভবের কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কি করিতেছ? সেই প্রেমানুরাগের ব্যাখ্যা করিতে তিলে তিলে নূতন হয়। জন্মাবধি আমি সেই রূপ দেখিলাম, কিন্তু নয়নের তৃপ্তি হইল না। সেই মধুর বাণী কতই শ্রবণ করিলাম, কিন্তু তাঁহার কথা শ্রবণে লাগিয়া রহিল না। কত মধুযামিনী আনন্দে কাটাইলাম, কিন্তু কেলি কি, তাহা বুঝিলাম না; লক্ষ লক্ষ যুগ হৃদয়ে হৃদয় রাখিলাম, কিন্তু হৃদয় জুড়াইল না। কত বিদগ্ধ জন রসে অনুমগ্ন আছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও অনুভব দেখিতে পাই না। বিদ্যাপতি বলেন যে, প্রাণ জুড়াইতে লক্ষের মধ্যে একটি পাওয়া যায় না।"

কিয়ৎকাল পরেই সশিষ্য নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই অপূর্ব্ব রসাত্মক গীতি দ্বারা নবদ্বীপপ্রবাহিনী শুভ্রসলিলা ভাগীরথীলহরী ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে নীলাভ সাগরতরঙ্গ প্রতিধ্বনিত করিয়া বঙ্গবাসী ও উড়িষ্যাবাসীদিগকে উন্মত্ত করিয়াছিলেন। তখন বঙ্গবাসিগণ বুঝিতে পারেন নাই যে, সুকবি বিদ্যাপতি ঠাকুরের প্রেমাত্মক কাব্যরসপূর্ণ পদ সকল বঙ্গভাষায় রচিত নহে। তখনও বঙ্গবাসী ও উড়িষ্যাবাসিগণ, মৈথিল, বঙ্গ ও উড়িয়া ভাষার সবিশেষ পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা সহজেই পরস্পর পরস্পরের ভাষা

বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শতবর্ষ-মধ্যে প্রভেদজ্ঞান বলবৎ হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা অল্প সময়েই বিভিন্নভাষী, বিভিন্নজাতীয়, বিভিন্নসাহিত্যাবলম্বী বলিয়া আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছি। বহু শত বৎসর বঙ্গবাসীদিগের হৃদ্‌বোধ ছিল যে, বিদ্যাপতি ঠাকুর বঙ্গবাসী, চণ্ডীদাসের ন্যায় বাঙ্গালী ছিলেন। এমন কি, অনেকেরই বিশ্বাস ছিল যে, তিনি বীরভূমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভাগলপুর ও নিকটবর্ত্তী প্রদেশের দেশীয় লোকের চলিত ভাষা ঠিক হিন্দী নহে; উত্তর ভাগলপুরে অর্থাৎ মধুবন্ বিভাগে এককালে যে খাঁটী বঙ্গভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। ব্রিটিশ রাজ্যশাসনপ্রণালী অনুসারে বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এক শাসনের অন্তর্গত রহিল। পরস্পরের ভেদজ্ঞান তিরোহিত করিয়া, কয়েক শত বৎসরের পূর্ব্বের অবস্থা মনে করিয়া, আমাদের একতাজ্ঞানের পুনরুত্থানের সময় আসিয়াছে। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের সম্যক্ সাহিত্যিক উন্নতির জন্য এই একতা অত্যন্ত আবশ্যক।

ভাগলপুর ও তন্নিকটস্থ প্রদেশের চলিত ভাষা হইতে বঙ্গভাষা বিভিন্ন হওয়া নৈসর্গিক কারণে অবশ্যম্ভাবী। দেখিতে পাওয়া যায়, সামান্য এক গ্রামের ভাষা অনেক সময়ে নিকটবর্ত্তী গ্রামের ভাষা হইতে কিয়ৎপরিমাণে বিভিন্ন। এমন কি, এক গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরই ভাষায় কিছু কিছু পার্থক্য আছে। বস্তুতঃ প্রতি যোজন অন্তরেই চলিত ভাষার বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের ও কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ প্রদেশের ভাষার বিলক্ষণ বৈলক্ষণ্য আছে। মুদ্রিত পুস্তকেও সে বৈলক্ষণ্যের আভাস পাওয়া যায়। বীরভূমি ও বৈদ্যনাথের ভাষা ঠিক কলিকাতার বাঙ্গালা নহে; প্রভেদ অনেক। দূরতানিবন্ধন ভাগলপুরের ভাষার পার্থক্য আরও অধিক। তবে এ অঞ্চলে পাশ্চাত্য লোকের অধিক সমাগম থাকায়, অধুনা উর্দ্দু বা পারস্য ভাষার মিশ্রণ অধিক হইয়াছে। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে এরূপ ছিল না।

স্থানভেদে ও অন্য প্রদেশের ভাষার মিশ্রণে চলিত ভাষার ভেদ যে কিয়ৎ-পরিমাণে অপরিহার্য্য, তাহা বুঝিবার জন্য আয়াস আবশ্যক নহে। কলিকাতা হইতে তের ক্রোশ দূরে হুগলী জেলায় আমি জন্মগ্রহণ করি, এবং প্রথম শিক্ষা লাভ করি। খাঁটী কলিকাতার অনেক লোকই আমার অনেক কথায়

বিদ্রূপ করিতেন। তাঁহাদের নিকট আমি "রেঢ়ো" (রাঢ়ীয়) ছিলাম। "শয়ন করিলাম", "গমন করিলাম", "আহার করিলাম", এ সকল সাধু ভাষা, ঠিক চলিত ভাষা নহে; আমি আমার প্রদেশের চলিত ভাষা ব্যবহার করিয়া বলিতাম, "গেনু", "খেনু", "শুনু"। খাঁটী কলিকাতার লোকেরা "গেলুম", "খেলুম" ও "শুলুম" বলেন। গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর প্রভৃতি প্রদেশে লোকেরা "গেলাম", "খেলাম", "শুলাম" বলেন, এবং পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা "যাইলাম" "খাইলাম" প্রভৃতি বলেন। আমরা "তক্তপোষ" বলি, কলিকাতায় তাহাকেই "চৌকী" বলে; আমরা ছোট ছোট বসিবার কাষ্ঠাসনকে "চৌকী" বলি। পাশাপাশি জেলায় এরূপ শব্দের ও বিভক্তির প্রভেদ বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। খাঁটী বঙ্গদেশের অনেক স্থানের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের কথা আমাদেরই বুঝিতে কষ্ট হয়।

মহাভাগবত শ্রীকৃষ্ণদাস-কবিরাজগোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায় লিখিয়াছেন,—

'দণ্ডবৎ হৈয়া আমি পড়িনু পায়েতে।
নিজ পাদপদ্ম প্রভু দিলা মোর মাথে॥
উঠ উঠ বলি মোরে বলে বার বার।
উঠে তাঁর রূপ দেখি হৈনু চমৎকার॥'

বলা বাহুল্য, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ ও অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিই বর্দ্ধমান বিভাগের বাসিন্দা ছিলেন। মাণিক গাঙ্গুলী তাঁহার রচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গলেও বর্ত্তমান সাধুভাষায় অপ্রলিত অনেক শব্দ ও বিভক্তির ব্যবহার করিয়াছিলেন।

'তোমা লেগে সপ্তশালে ঝাঁপ দিয়াছিনু।
না দেখিলে তিলার্দ্ধেতে দহে মোর তনু॥'

এখন আমরা "লেগে", "মোর", "দিয়াছিনু" কথা ব্যবহার করিলে, গ্রাম্যতা-দোষে দোষী হইব। রাঢ়দেশীয় বর্দ্ধমান জেলা নিবাসী আমার মাতামহের গুরুবংশের প্রধান পুরুষ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও লিখিয়াছেন,—

'ভাই বন্ধু মাতা পিতা, ত্যজিয়া আইলাম এথা,
তোমারে করিনু আমি সার।'

এইরূপ বঙ্গের পুরাতন লেখকগণ অনেক কথা, অনেক প্রত্যয় ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, যাহা এখনও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত,

কিন্তু সাধু বা ভদ্রসমাজে তাহা ব্যবহৃত হয় না। ভাষা এক শ্রেণীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অপর শ্রেণীতে অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে; এক প্রদেশে পূর্ব্ব-প্রচলিত ভাষা সামান্য পরিবর্ত্তিত হইয়া এখনও চলিতেছে; নিকটবর্ত্তী প্রদেশে বিবিধ কারণবশতঃ ভাষার গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু তজ্জন্য কি দুইটি ভাষা পৃথক্ জ্ঞানে বিভিন্ন সাহিত্যের সৃষ্টির উদ্যোগ করিতে হইবে? তজ্জন্যই কি এক প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্যের প্রভেদ বিধান করিতে হইবে? একতা-জ্ঞান সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকারেই মঙ্গলকর।

কবিকঙ্কণ লিখিয়াছেন,—

'খুল্লনা চলিল যদি পুত্রের তলাসে।
আঁখি ঠারে লহনা সখীর পানে হাসে॥
আর শুনেছ খুল্লনা আছেন ভাল নাটে।
ঘরের পো ঘরে আছে চাহে গোলা হাটে।
যৌবন করয়াছে ডালি পো চাহিবার ব্যাজে॥'

তলাস, আঁখি, ঠার, পানে, নাটে, পো, চাহে, ব্যাজ, এ সকল কথার আর ভদ্রসমাজে ব্যবহার নাই; এমন কি, কলিকাতার ভদ্র বাঙ্গালীর বাটীর স্ত্রীলোকেরা এ সকল কথা বুঝিতে পারেন না। কিন্তু রাঢ়দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ইহাদের এখনও বেশ ব্যবহার আছে। ভাষার এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, উপরি-উক্ত কয়েক পঙ্‌ক্তির অর্থ অনেকেরই বুঝিতে এখন টীকার আবশ্যক হইবে।

গুণাকর রাজকবি ভারতচন্দ্র বর্দ্ধমান বিভাগে জন্মগ্রহণ করিয়া ও শিক্ষিত হইয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কৃষ্ণনগরের রাজসভায় গাহিয়াছিলেন,—

'কাণ কাটারিতে মোর কাণ হৈল কালা।
কেটা মোরে বুড়ি বলে এত বড় জ্বালা॥'
'কহ ওলো হীরা তোরে মোর কিরা।'

এখন কি এ ভাষা চলিতে পারে, এ ত বেশী দিনের কথা নয়! অনেকেই কাণকাটারি, মোর, কেটা, কিরা কথার অর্থ জানিবার জন্য অভিধানের সাহায্য লইতে বাধ্য হইবেন। বস্তুতঃ রাঢ়দেশের ও পূর্ব্ববঙ্গের চলিত ভাষায় এখনও সহস্র সহস্র শব্দ ব্যবহৃত আছে, যাহা আধুনিক বাঙ্গালা গ্রন্থে চলিত নাই। সে সকল শব্দ গ্রাম্য হইয়াছে। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ কটক

রেভেন্‌স কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায় এম্‌. এ. একখানি রাঢ়ীয় কোষ প্রস্তুত করিয়াছেন ; তাহাতে দ্বাদশ সহস্রের অধিক রাঢ়ীয় শব্দ আছে। উপস্থিত প্রতিনিধি-সভ্য স্নেহাস্পদ শ্রীযুত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও প্রচলিত গ্রাম্য শব্দের কোষ সঙ্কলন করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিতেছেন।

কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে আসাম গৌরীপুরে যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে বিশদরূপে দেখান হইয়াছে যে, আসামীভাষা প্রকৃতপ্রস্তাবে বাঙ্গালা। দেশভেদে সামান্য বিভিন্নতা থাকায় আসামদেশীয় ভাষাকে ভিন্ন ভাষা বলা যাইতে পারে না।

আমরা অনেকেই উড়িয়া অক্ষর পড়িতে পারি না ; বর্ণমালা এক হইলেও, লিপির বিভিন্নতা আছে। সাধারণ উড়িষ্যাবাসীদিগের ভাষা হইতে বাঙ্গালার কিছু কিছু বিভিন্নতাও আছে বটে, কিন্তু উড়িষ্যার কবি শ্রীযুত ফকিরমোহন সেনাপতি উড়িয়া ভাষায় লিখিয়াছেন,—

'ন হেলা হৃদয়ে মোর পুণ্যর সঞ্চার।
দগ্ধ হেউ অছি পাপানলে বারম্বার॥
শীতল করন্তু প্রভু করুণা জলরে।
জয় জয় দব জয় জগদীশ হরে॥'

(আমার হৃদয়ে পুণ্যের সঞ্চার হইল না ; আমি পাপানলে বারংবার দগ্ধ হইতেছি ; করুণাজলে আমার হৃদয় শীতল করুন ; জয় জয় জগদীশ হরে!)

বাঙ্গলাতে ও উড়িয়াতে প্রভেদ কোথায় ?

দেবনাগর অক্ষরে লিখিত থাকায় আমি কবিতাটি অতি সহজে পাঠ করিতে পারিয়াছি। উড়িয়া অক্ষরে লিখিত হইলে বোধ হয় পাঠ করাই হইত না। বস্তুতঃ উড়িষ্যার ভাষা বঙ্গবাসিগণ এবং উড়িষ্যাবাসিগণ বঙ্গভাষা বেশ বুঝিতে পারে। শ্রীবৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে পঠিত হয়, এবং অধিকাংশ লোকেই অতি সহজে বুঝিতে পারে। বঙ্গসাহিত্যই উড়িষ্যার সাহিত্য হওয়া উচিত ; পৃথক উৎকল সাহিত্য নাই বলিলেই হয়। পৃথক উৎকলসাহিত্যের স্বষ্টির উদ্যোগ অপরিণামদর্শিতামূলক। অনেকে বাঙ্গালা, হিন্দী ও উৎকল সাহিত্যের পার্থক্য অভিলষিত মনে করেন, কিন্তু তাহাতে ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের পরিপুষ্টির সম্পূর্ণ ক্ষতি হইবে।

আজ কাল হিন্দী ক্রমশঃ যেরূপ আকার ধারণ করিতেছে, ইহাতে যেরূপ সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে বোধ হয় অতি অল্প দিনেই হিন্দী ও বাঙ্গালাতে বিশেষ প্রভেদ থাকিবে না। লিপির বিভিন্নতা নিবন্ধন ভাষার বিভিন্নতা চক্ষে প্রতীয়মান হইতে পারে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে এবং এক লিপি ব্যবহৃত হইলে, ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের যে অলোকসামান্য পরিপুষ্ট হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বর্ত্তমান হিন্দী ও বঙ্গভাষাতে কেবলমাত্র কয়েকটি ছোট ছোট শব্দের ও বিভক্তির বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। এখন বিদ্বজ্জন ও বিদ্যোৎসাহিগণের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা অদূরদর্শিতা ত্যাগ করিয়া সহযোগে ভারতবর্ষের সাহিত্যের সম্যক্ পরিপুষ্টির জন্য সযত্ন হউন ; একতার জন্য সচেষ্ট হউন।

ভক্তিভাজন ভাবুকশ্রেষ্ঠ কবিশেখর তুলসীদাস গোস্বামী লিখিয়াছেন,—

> 'চিদানন্দ সুখধাম শিব বিগতমোহমদকাম। ৭
> বিচরহি মহী ধরা হৃদয় হরি সকল লোক অভিরাম॥'
> 'অহঙ্কারকী অগ্নিমে দহত সকল সংসার।
> তুলসী বাচে সন্ত জন কেবল শান্তি আধার॥'

(চিদানন্দ, সুখধাম, বিগতমোহমদকাম, সকললোক-অভিরাম মহাদেব হৃদয়ে হরিকে ধারণ করিয়া মহী বিচরণ করেন। অহঙ্কার রূপ অগ্নি সকল সংসারকে দহন করিতেছে; তুলসী বলেন, কেবল সাধু ব্যক্তিই শান্তির আধার।)

কোন্ শিক্ষিত বঙ্গবাসী তুলসীর হিন্দীও বেশ বুঝিতে না পারেন? তুলসীদাস ভারতবর্ষীয় কবিগণের অগ্রণী। কবীরের ও হরিশ্চন্দ্রের নামও ভারতবর্ষীয় সাহিত্য-সংসারে চিরস্মরণীয় থাকিবে।

কেবল বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা দেশে এইরূপ শব্দের ও বিভক্তির প্রভেদ কেন, সকল দেশেই এইরূপ ভাষার বিভিন্নতা। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ওয়েল্স এবং আয়ারলণ্ডেও এইরূপ ভাষার প্রভেদ আছে। কেন্যাডা প্রভৃতি ইংলণ্ডের উপনিবেশে ইংরাজী ভাষা রাষ্ট্রভাষা হইলেও চলিত ভাষায় অনেক প্রভেদ। দক্ষিণ ইংলণ্ড ও উত্তর ইংলণ্ডেও এইরূপ চলিত ভাষায় প্রভেদ। ক্ষুদ্র গ্রীক দেশেও আইয়োনিয়ান (Ionian), ডোরিয়ান (Dorian) প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষা ছিল। কিন্তু হোমার (Homer), পিণ্ডার (Pindar), ইস্কাইলস (Eschylus) প্রভৃতি সুকবি ও সুলেখকগণ সমগ্র গ্রীসের সাহিত্যিক ছিলেন। আমেরিকার Yankeeism প্রসিদ্ধ।

স্কটলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি বার্ণস্ (Burns) লিখিয়াছেন,—

'We sleekit cow'rin, tim'rous beastie,
O, what a panic's in thy breastie ;
Thou need na start awa sae hastie,
Wi, bickering brattle.
I wad be laith to rin an' chase thee,
Wi' murd' ring pattle.'
'The powers aboon will tent thee,
Misfortune sha' na steer thee ;
Thou'rt like themselves sae luvely,
That they ill ne'er let thee."

এই ত ভাষার প্রভেদ ; তত্রাপি স্কটলণ্ডের রাষ্ট্রভাষা ইংরাজী ; বার্ণস (Burns) তাঁহার দেশের ভাষা ব্যবহার করিয়াও ব্রিটেনের কবিকুলাগ্রগণ্য হইয়াছিলেন। স্কটলণ্ডের ও ওয়েলেসের রাষ্ট্রভাষা ইংরাজী ; ইংলণ্ডবাসী ও ওয়েলসবাসিগণ মনে করে না, ইংরাজী বিভিন্ন ভাষা।

বিহার প্রদেশের কিংবা উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশের ভাষার বঙ্গভাষা হইতে কিছু কিছু প্রভেদ থাকিলেও, সে ভেদনিবন্ধন সাহিত্যিক বা রাষ্ট্রভাষার বিভিন্নতা থাকা শ্রেয়স্কর নহে। পুরাকালে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে মাগধী, অর্দ্ধমাগধী, সৌরসেনী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত থাকিলেও, সংস্কৃত সর্ব্বত্র ভদ্রসমাজের ভাষা ছিল, সাহিত্যের ভাষা ছিল। প্রতীচ্য গান্ধারদেশ হইতে প্রাচ্য মণিপুর পর্য্যন্ত, পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ হিমমণ্ডিত নগাধিরাজের অধিত্যকা হইতে বিন্ধ্যগিরি-শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রদেশে সাধারণতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা চলিত থাকিলেও ঐ সকল ভাষার বিলক্ষণ সাদৃশ্য ছিল, এবং বিদ্বজ্জনের ব্যবহৃত সংস্কৃত ভাষা সকল প্রদেশকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিত। অতিবিস্তৃত ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভাষার কিছু কিছু পার্থক্য অপরিহার্য্য ; বাঙ্গালা, হিন্দী, নেপালী, পঞ্জাবী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্র, উড়িয়া প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষাসমূহের সাধারণ জনগণমধ্যে প্রচলন অপরিহার্য্য। কিন্তু আমাদের, বিশেষতঃ একরাজশাসনান্তর্গত বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যায় একটি রাষ্ট্র বা সাধারণ ভাষা আবশ্যক। আমরা একধর্ম্মাবলম্বী, এক রাজার শাসনাধীন, একজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সাধারণ লোকের

ব্যবহৃত ভাষার পার্থক্য থাকিলেও আমাদের একটি সর্ব্বজনসমাদৃত সাধুজন-ব্যবহৃত ভাষা আবশ্যক। যেমন ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে, স্কটলণ্ডের দক্ষিণে ও উত্তরে, আয়ার্লণ্ডে, ওয়েলসে ও উপনিবেশসমূহে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা চলিত থাকিলেও ইংরাজী সর্ব্বত্র প্রচলিত ও সাধুভাষা, আমাদেরও সেইরূপ একটি ভাষা আবশ্যক।

ইংরাজী আমাদের সাধারণ ভাষা হইতে পারে না। ইংরাজীশিক্ষা আমাদের সাহিত্যিক উন্নতির ব্যাঘাতের কারণ। ইউরোপীয় পাশ্চাত্য ভাষার সাহিত্য দ্বারা আমাদের অনেক উপকার হইয়াছে; সন্দেহ নাই; রাজসেবার জন্য ইংরাজী প্রয়োজনীয় হইতে পারে; কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন উপাদানের ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য কত কষ্ট, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। ভাষা শিখিতেই জীবনের মূল্যবান্ সময় অতিবাহিত করা অকর্ত্তব্য। বর্ত্তমান হিন্দী অনেকপরিমাণেই আমাদের রাষ্ট্রভাষার অভাব পূরণ করিতে পারে; হিন্দী সহজে শিক্ষা করা যায়, সুতরাং সহজেই আর্য্যাবর্ত্তের রাষ্ট্রভাষা হইতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রভাষা যথাসময়ে কি অবয়ব ধারণ করিবে, তাহা এখন বলা যায় না। শব্দোচ্চারণের নৈসর্গিক ভেদবশতঃ (phonetic decay), ভাষার ও শব্দের স্বভাবসিদ্ধ পুনর্গঠনকালে (Dialectic regeneration) অন্যান্য দেশীয় বৈজ্ঞানিক কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ক শব্দ, সংস্কৃত শব্দের অধিকপরিমাণে ব্যবহার দ্বারা রাষ্ট্রভাষা এক নূতন আকার ধারণ করিতে পারে। বাঙ্গালা ও হিন্দীর ভিত্তিমূলে সমস্ত ভারতবর্ষের বিদ্বজ্জন-ব্যবহার-যোগ্য নূতন আকারের রাষ্ট্রভাষা সর্ব্বজন-সমাদৃত হইতে পারে।

ভারতবর্ষে উত্তর বিভাগের ও পশ্চিম বোম্বাই ও গুজরাটের ভাষাসমূহ এক প্রকৃতির, এক ছাঁচের। প্রভেদ সামান্য। সকলগুলিই এক বলিলেও হয়। পার্থক্য যৎসামান্য। ইংলণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারতবর্ষে আগমনে গুজরাটের জনৈক কবি লিখিয়াছিলেন,—

'আও আও ভারতরাজ জোবানে
দই দর্শনসুখ এঁ জন্ম জন্মনে' পোবানে
জেম চন্দ্রোদয় জোই চকোর জিম্ম রাজেরে
জেম নবঘন আবর্ত্তা লখী মোরে বন নাচেরে
তেম ভারতবাসী জনোত বাগম চাহে জী
লখি মুখশশী রাজকুমার মুদিত মনমাহে জী।

(এস, এস, ভারতের যুবরাজ! দর্শনসুখ দান করিয়া জন্ম জন্ম দুঃখ হইতে মুক্ত হইব। যেরূপ চন্দ্রোদয়ে চকোর আনন্দিত হয়, যেরূপ নবঘনপ্রকাশে ময়ূর বনে নৃত্য করে, সেইরূপ ভারতবাসী আপনার আগমন প্রার্থনা করে। হে রাজকুমার! আপনার মুখশশী দেখিয়া মন বিকশিত হইবে।)

গুজরাটী ভাষা কি আমাদের বঙ্গভাষা হইতে বেশী পৃথক্? ইংলণ্ডের ও স্কটলণ্ডের ভাষায় ইহা অপেক্ষা অধিক পার্থক্য। কি জন্য আমরা গুজরাটী ও মহারাষ্ট্রীয় কাব্যসমূহকে আমাদের সাহিত্যের অঙ্গ বলিতে কুণ্ঠিত হইব? প্রভেদ কোথায়? কেবল লিপির প্রভেদ।

আমরা সহজেই ভারতবর্ষীয়, অন্ততঃ আর্য্য ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন ভাষার ও ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারি। গুরু নানকের অতি সুন্দর পঞ্জাবী ভাষায় বর্ণনাকে

'গগনময় থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে।
তারকামণ্ডল জনক মোতি।
ধূপ মলয়ানিল পবন চৌরি করে,
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতি।'

(গগন আরতির থালস্বরূপ, রবি ও চন্দ্র ইহার দীপক; তারকামণ্ডল মুক্তাস্বরূপ; সুগন্ধ মলয়ানিল ধূপস্বরূপ পবন; চামরস্বরূপ; এবং বনরাজি ও পুষ্পসমূহ জ্যোতিঃস্বরূপ।)

বঙ্গভাষার বর্ণনা হইতে বড় বিভিন্ন নহে।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষাও ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের ভাষাসমূহ হইতে অধিক বিভিন্ন নহে। নিম্নলিখিত পদেই বুঝা যাইবে,—

'চমৎকৃতিনিধান হী কৃতি তুঝী জগাচাপতে,
তুঝে চ জগদণ্ড, জেঁ অখিল চিত্ত আকর্ষতে।
সুরম্য ইতুকী জরী কৃতি তুঝী তরীতুঁ কিতী।
সুরম্য অসসী প্রভো খুটতসে মতিচী গতী।'

(হে জগৎপতে! তোমার ব্রহ্মাণ্ডরূপ কার্য্য অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। সেই ব্রহ্মাণ্ড অখিলচিত্ত আকর্ষণ করে। হে প্রভো, যদি তোমার কার্য্য এত সুরম্য, তবে তুমি কত সুরম্য, ইহা স্থির করিতে মানসিক প্রবৃত্তি কুণ্ঠিত হয়।)

সাহিত্যের সম্যক্ উন্নতির জন্য ভারতবর্ষের প্রত্যেক বিভাগের সাহিত্যের সম্যক্‌জ্ঞান আবশ্যক। আমরা অনেকে ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মানী প্রভৃতি বিদেশী সাহিত্যের অভ্যুদয়ের ইতিহাস জানি; তাহাদের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার-

দিগের রচনা মূলে অথবা অনুবাদে পাঠ করিয়া কৃতার্থমন্য হইতেছি। কিন্তু কয় জন মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটী সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন? কয় জন মহারাষ্ট্রী বা পঞ্জাবী বঙ্গের সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন? রাজপুতানার অদ্বিতীয় কবি চাঁদের মধুচক্রে প্রবেশ করিবার জন্য কয় জন চেষ্টা করিয়া থাকেন? তুকারাম বা দেলপৎরায়ের কাব্য-লহরীর সুমধুর ঝঙ্কার আমাদের কয় জনের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে? এমন কি, তুলসীদাসের সুপ্রসিদ্ধ রামায়ণ বা কবীরের ভক্তিপূর্ণ পদ আমরা কয় জন পড়িয়াছি? সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন মনে করি; এক ব্রিটিশশাসনান্তর্গত বলিয়া রাজনৈতিক সম্বন্ধ দেখিতে পাই। আমাদের পরস্পরের লিপির পার্থক্য আছে; কিন্তু আমি ভাষার বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাই না।

গত কার্ত্তিক মাসে বরদা রাজ্যে যে সাহিত্য-সম্মিলন হইয়াছিল, তাহাতে সর্ব্বসম্মতিমতে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, ভারতবর্ষে একলিপি নিতান্ত আবশ্যক। আমার ক্ষুদ্রচিত্তে কেবল লিপি কেন, ভারতবর্ষের সাহিত্যের উন্নতির জন্য এক রাষ্ট্রভাষাও আবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান কালের ন্যায় ভারতবর্ষীয় প্রদেশসমূহের সাহিত্যিক বিভিন্নতা ছিল না। ভিন্ন ভিন্ন রাজা থাকিলেও, সাহিত্যের বিভিন্নতা ছিল না। সংস্কৃত তখনকার রাষ্ট্রভাষা ছিল। সুষুপ্তপ্রায় কোমলহৃদয় বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের নির্ব্বাণকালে নিশীথ-সময়ের বীণাধ্বনিবৎ মধুরকোমলকান্ত-পদাবলী জয়দেবস্বরস্বতী অজয় নদীর কূলে ক্ষুদ্র কেন্দুবিল্ব গ্রামে গীত হইল; অনতিপরেই চিতোরের রাজসভায় সমর্সিরাজের সমক্ষে কবি চাঁদ কেন্দুবিল্ব কবির কাব্যের গুণঘোষণা করিলেন। আমাদের মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীন-চন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বা বঙ্কিমচন্দ্রের নামের এখন মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজপুতানা, বা পঞ্জাবে ঘোষণা নাই; এখন সেক্সপেয়ার (Shakespeare), মিল্টন (Milton), ওয়ার্ডসওয়ার্থ (Wordsworth), টেনিসন (Tennyson), হিউগো (Hugo) ও গেঠের (Geothe) আমরা অধিকতর পক্ষপাতী। মিস করেলী (Miss Correlli) একখানি উপন্যাস লিখিলে আমরা তাহা পাঠ করিবার জন্য ব্যস্ত হই; ভারতবর্ষের অন্য দেশে কি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, তাহার আমরা কিছুমাত্র সংবাদ রাখি না।

সাহিত্য, শিল্প ও কলাবিদ্যার অনুশীলনের তারতম্য অনুসারে মানব

জাতির সভ্যতার পরিমাণ পরিজ্ঞেয়। যুদ্ধবিগ্রহে পারদর্শিতা অনুসারে মানব জাতির তেজস্বিতা পরিমিত হইতে পারে; দেশলুণ্ঠন, অপর জাতির স্বাধীনতা অপহরণ প্রভৃতি কার্য্যকলাপ দ্বারা কোনও কোনও সভ্য জাতির সভ্যজাতিসমূহের মধ্যে পদোন্নতি হইতে পারে; কিন্তু ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি কবিগণ যেরূপ স্ব স্ব দেশের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন, অন্য কোনও উপায়ে সেরূপ হইতে পারিত না।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের সম্যক পরিপুষ্টির উপায় কি? একটি উপায়—এমন কি বিশিষ্ট উপায়—পাঠকসংখ্যাবৃদ্ধি। বৃটিশ সাম্রাজ্যের যে পরিমাণে আয়তনবৃদ্ধি হইতেছে, ইংরাজী পড়িবার লোকসংখ্যা ততই বর্দ্ধিত হইতেছে, ইংলণ্ডের সাহিত্যের ততই পরিপুষ্টি হইতেছে।

আমার জাগ্রতাবস্থার চিন্তা ও সুষুপ্তাবস্থার স্বপ্ন,—বঙ্গসাহিত্য, হিন্দী সাহিত্য, মহারাষ্ট্রীয়, তেলিগু, তামিল প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় বহু সাহিত্যের পরিবর্ত্তে, প্রাতঃসূর্য্যরশ্মিসমুজ্জ্বল সুতপ্তচামীকররাগরঞ্জিত অভ্রভেদী হিমাচল-শৃঙ্গমালার পাদদেশ হইতে তমালতালীবনরাজিনীলা লবণাম্বুরাশির বেলাভূমি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে, অতীতকালের বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ, দর্শন, মহাকাব্য, পুরাণ ও নাটকাদি সমন্বিত সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় নব্যভারতের এক অদ্বিতীয় আর্য্য সাহিত্যের প্রতিভায় সমস্ত জগৎ আলোকিত হউক। ভারতবর্ষের খণ্ডে খণ্ডে খণ্ড খণ্ড সাহিত্য যতই গৌরবান্বিত হউক না, সমবেত সাহিত্য যে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বিজ্ঞান ও কাব্যাদির উন্নতির জন্য আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। সে কালে কেবল কাব্য, নাটক, দর্শন, পুরাণ ও স্মৃতি প্রভৃতি ছিল; ইতিহাস ছিল না। এ কালে সাহিত্যের সীমাবৃদ্ধি হইয়াছে। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ক্রমশঃ সুবিস্তীর্ণ হইতেছে; বিজ্ঞানে আমরা বেশী মনোযোগ দিতে পারিতেছি না, সময় কম, অর্থ কম। ভাষার উন্নতি, কাব্যাদির উন্নতির জন্য যতটা মনোযোগ আবশ্যক, ততটাও ঘটিয়া উঠিতেছে না। প্যারিসের একাডেমী অফ লিটারেচার Academy of Literature যেরূপ কাজ করিয়া আসিতেছে, আমরা তাহার শতাংশও করিতেও সময় পাই না। নেপোলিয়ান (Napoleon) তাঁহার রাজত্বকালে একাডেমী অফ লিটরেচার (Academy of Literature) সংস্থাপনের ব্যবস্থা করিয়া ফরাসী ভাষার অসীম উপকার করেন। সেই সভার ছায়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গঠিত।

যাহাতে বঙ্গভাষার শুদ্ধি ও প্রসার হয়, যাহাতে লেখার প্রণালীর উন্নতি হয়, যাহাতে কুরুচির উচ্ছেদ ও সুরুচির সম্যক্ বিস্তার হয়, যাহাতে সত্বর আমাদের সাহিত্য সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, ইংরাজী, ফরাসী, জর্ম্মান প্রভৃতি সাহিত্যের ন্যায় উন্নতপদবী প্রাপ্ত হয়, তজ্জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যোগ আবশ্যক। যাহাতে ছাই পাঁশ পুস্তকের আদর না হয়, প্রকৃত রসাত্মক কাব্যের আদর হয়, ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, তাহার জন্য আমাদের সমধিক যত্ন ও প্রয়াস কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশের এসিয়াটিক সোসাইটীর ছায়া অবলম্বন করিয়া কেবল পুরাতত্ত্বের উদ্ধার করিবার চেষ্টা পরিষদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। অনেক সময়ে পরিষদকে রুক্ষ হইতে হইবে, অনেক সময় বিরাগভাজন হইতে হইবে। "সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"—এ কথা সাহিত্যসমালোচনায় প্রযোজ্য নহে। সুরুচি ও কুরুচির ভেদ করিতেই হইবে, এবং ভেদ দেখাইয়া প্রকাশ্যে আদর বা অনাদর করিতে হইবে। মহিমা ও সৌন্দর্য্যের আদর আছেই। বঙ্গীয় সমাজের সাহিত্যবিষয়ক রুচির উন্নতিবিধানের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত প্রীতি বা অপ্রীতির উপর লক্ষ্য রাখিলে চলিবে না। যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষে, এমন কি, সমগ্র ভূমণ্ডলে বঙ্গীয়সাহিত্যের আদর হয়; যাহাতে বঙ্গভাষার লালিত্য ও গৌরব জগদ্বিখ্যাত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বঙ্গে জ্যোতির্ম্ময় কাব্যরচয়িতার অভাব নাই; কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবিগণ যে জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা এখনও ভারতব্যাপী হয় নাই। বাইরণ বা ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থের ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে শিক্ষিতসমাজে যেরূপ আদর আছে, আমাদিগের অদ্বিতীয় কবিদিগের সেরূপ আদর নাই। কি উপায়ে এই সকল মহাত্মাদিগের গ্রন্থ সমগ্র ভারতবর্ষের গৃহে গৃহে প্রবেশ করিবে, তাহা চিন্তার বিষয়। কি উপায় অবলম্বন করিলে তুলসীদাস, কবীর, হরিশ্চন্দ্র, চাঁদ, দেলপৎরাও, তুকারাম প্রভৃতি আর্য্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কবি ও সুলেখকগণের গ্রন্থনিচয় আমাদের প্রত্যেক শিক্ষিত গৃহস্থের আদরের জিনিস হইবে, তাহা সাহিত্য-সম্মিলনে স্থির করা আবশ্যক।

সে দিন কলিকাতার চিৎপুর রোড দিয়া যাইতে যাইতে দেখি, অনেক স্থলে বৃহৎ অক্ষরে লেখা—"কুন্তলবিরাজিনী তৈল", "সুকেশিনী তৈল।" দেখিয়া মনে হইল যে, মহর্ষি পাণিনির এ সকল দেখিলে হৃৎকম্প হইত!

"Quintilian would have gasped and stared." এখনকার অনেক লেখকের ভাষায় এরূপ দোষ সহস্র সহস্র। যাহাদের লিঙ্গজ্ঞান নাই, সমাস-জ্ঞান নাই, ভাষার জ্ঞান নাই, রসজ্ঞান নাই, এরূপ লোকের রচিত কত শত গ্রন্থে বঙ্গসাহিত্য আবর্জ্জনাপূর্ণ হইতেছে; রুচির কদর্য্যতা অনুসারে পাঠক-সংখ্যার বৃদ্ধিও দেখিতেছি; বিশ্ববিদ্যালয়ও সেরূপ অনেক লেখককে আদর করিতেছে। এ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্যতার অবধারণ আবশ্যক। বঙ্কিমচন্দ্র বটতলাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন; এখন ভাল কাগজে, ভাল ছাপায়, কত অপাঠ্য পুস্তক মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আমি এ কথা বলি না যে, আমি নিজেই নির্দ্দোষ; আমিই হয় ত কত ভুল করিয়াছি। কিন্তু ভাষার ও রুচির সংশোধন নিতান্ত আবশ্যক। বটতলা বঙ্গভাষার অনেক উপকার করিয়াছে, শেষাশেষি অপকারও করিয়াছে; কিন্তু এখন অবটতলার উপর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আমাদের দেশে মেথিউ আর্ণল্ডের সদৃশ নিরপেক্ষ নির্ভীক সমালোচক নাই। জেফ্রিজ ওয়ার্ডস্‌য়ার্থের White Doe of Rylstone পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"This will not do." সময়ে সময়ে আমাদেরও সেই কথা বলিতে হইবে। অনেক সময়েই দেখিতে পাওয়া যায়, লঘু দ্রব্য নদীস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, এবং হয় ত তাহা চির-কাল মহাসাগরের তরঙ্গে ক্রীড়া করিবে; কিন্তু গুরু মূল্যবান দ্রব্য গুরুত্ব-নিবন্ধনই নদীগর্ভে নিপতিত হইয়া অনন্তকাল মানবের অদৃশ্য হইয়া থাকে। এরূপ যাহাতে না হয়, তাহাও দেখিতে হইবে।

ভারতবর্ষে ইতিহাস ছিল না; তৎপরিবর্ত্তে পুরাণাদি ছিল। ইতিহাস-পাঠ আবশ্যক কি না, তাহা আর বিচার্য্য নহে। আমরা স্থির করিয়াছি, ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব, সকলই সভ্যসমাজের সাহিত্যের বিশেষ প্রয়ো-জনীয় উপাদান। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ইতিহাস লিখিত হইতেছে। যদুনাথ, নিখিলনাথ, কালীপ্রসন্ন ও অক্ষয়কুমারের ন্যায় লেখকের সংখ্যা যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই মঙ্গল।

গণিত ও বিজ্ঞান আমাদের বড়ই আদরের বস্তু। ডাক্তার শ্রীযুত প্রফুল্ল-চন্দ্র রায় ও ডাক্তার শ্রীযুত জগদীশচন্দ্র বসু ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। স্বর্গীয় বাপুদেব শাস্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্‌সেলার ডাক্তার শ্রীযুত জষ্টিস আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গণিত শাস্ত্রে ভারতবর্ষের মুখ রাখিয়াছেন। বিজ্ঞানের আদর যতই বর্দ্ধিত হয়, ততই ভাল; আমার সম্পূর্ণ আশা, অনতি-

দূরবর্ত্তী কালেই প্রফুল্লচন্দ্র ও জগদীশচন্দ্রের উপযুক্ত শিষ্যসমূহ আর্য্যজগতের গৌরববৃদ্ধি করিবেন। প্রত্নতত্ত্বে রাজেন্দ্রলাল জগদ্বিখ্যাত ছিলেন। শরচ্চন্দ্র এখানেই আছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার লোক অনতিদূরবর্ত্তী কালে উদ্ভূত হইবেন, সন্দেহ নাই। ইউরোপ যাহা লিখিয়াছে তাহারই প্রতিধ্বনি করিব না। স্বয়ং চিন্তা করিবার ব্যক্তি আরও আবশ্যক।

সমবেত ভ্রাতৃগণ, কি বঙ্গবাসী, কি বিহারবাসী, কি উড়িষ্যাবাসী, কি আর্য্যভূমির অন্যপ্রদেশবাসী, আসুন, আমরা প্রীতিপূর্ণ ও উৎসাহ-বিস্ফারিত হৃদয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া এই সাহিত্য-সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ করি। পরস্পরের সখ্যবর্দ্ধন ও সাহিত্যের অভ্যুদয়ই আমাদের উদ্দেশ্য।

শ্রীসারদাচরণ মিত্র।

রমেশ-ভবন।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের সাদর আহ্বানে আমরা দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন কাশীম-বাজারে সমবেত হইয়াছিলাম, তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন আমাদের আশার ও আকাঙ্ক্ষার বস্তুমাত্র ছিল; সেই আশা পূর্ণ ও আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত হইবে কি না, তাহা আমরা কেহই জানিতাম না। আজ বাঙ্গলা দেশের পশ্চিম প্রান্ত হইতে যখন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র ও কামরূপকে ডাক পড়িয়াছে, আমরা সেই আহ্বান শুনিয়া এখানে সম্মিলিত হইয়াছি; এবং এই সাংবৎসরিক সম্মিলনের স্থায়িত্ব বিষয়ে আমাদের সংশয় কতকটা অপনোদিত দেখিয়া আনন্দ পাইতেছি। বাঙ্গালার সাহিত্য-সেবকগণ যাঁহারা আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা পরস্পর পরিচিত হইবেন, ভাব-বিনিময়ের ও চিন্তা-বিনিময়ের অবসর পাইবেন, এবং যাঁহারা এক পথের পথিক, তাঁহারা পরস্পর দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গন্তব্যপথে অগ্রসর হইবার পরামর্শ করিবেন, এই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্যের অন্তরালে আরও একটা গুরুতর ও গভীরতর অভিসন্ধি রহিয়াছে, সে কথাটা আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত। আমরা যে কেবল পরস্পর পরিচয় লাভ করিতে চাহি, এমন নহে; আমরা আমাদের বঙ্গভূমির সহিত পরিচিত হইতে চাহি। যাঁহার অঙ্কে আমাদের সূতিকাগৃহ ও যাঁহার ক্রোড়ে আমাদের শ্মশান, যাঁহাকে জননী বলিয়া ডাকিয়া আমরা প্রাণের তিয়াষ মিটাইতেছি, তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গভাবে আমরা পরিচিত হইতে চাহি। দুঃখের কথা সন্দেহ নাই, কিন্তু বস্তুতই কি বঙ্গভূমির সহিত আমাদের সম্যক

পরিচয় আছে? আমরা উৎকট শিক্ষাভিমানের গর্ব্ব করিয়া থাকি, কিন্তু বাঙ্গলার জলের ভিতর কোন্ রত্ন নিহিত আছে, বাঙ্গলার মাটীর অভ্যন্তরে কোন্ নিধি সঞ্চিত আছে, তাহা জানিবার জন্য পদে পদে আমাদিগকে রাজার জাতির মুখের দিকে তাকাইতে হয়। বাঙ্গালার হাটে কি বেচা কেনা হয় ও বাঙ্গালার ঘাটে বসিয়া কে কি তপ্তশ্বাস ফেলে, আমরা কয় জনে তাহার তত্ত্ব লই? আমার যে স্বজাতি আজ সমস্ত ভারতবর্ষকে উর্দ্ধমুখে আকর্ষণ করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে, সেই স্বজাতির মধ্যে কতটুকু বল আছে, কতটুকু দৌর্ব্বল্য আছে, সে বিষয়ে আমরা কতটুকু সংবাদ লইয়া থাকি? যে স্বজাতির সহিত অন্তরঙ্গভাবে, একাত্মভাবে পরিচয় ব্যতীত আমাদের জাতীয়তা বুদ্বুদের ন্যায় অলীক পদার্থে পরিণত হইবে, সেই স্বজাতির সম্বন্ধে, সেই স্বজাতির ঘরের কথা ও বাহিরের কথা সম্বন্ধে, আমরা কতটুকু সন্ধান রাখি? *

সন্ধান রাখি না, কিন্তু এখন হইতে সেই সন্ধান রাখিতে হইবে। আমার বিবেচনায় সেই সন্ধানের জন্যই আমরা দল বাঁধিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানের জন্য ভগীরথকে যেমন তপস্যা করিতে হইয়াছিল, আমাদের জাতীয়তার উৎস-সন্ধানের জন্য তেমনই কঠোর তপস্যার সময় আসিয়াছে; যুগান্তরের সঞ্চিত আবর্জ্জনা ও পাপপঙ্ক যদি ধুইয়া ফেলিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদিগকে এই তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে; বঙ্গদেশের শ্মশানক্ষেত্রে যে ভগ্নাস্থি ও দগ্ধ কঙ্কালের ভস্মরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে যদি পুনর্জীবন সঞ্চার করিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদিগকে ভগীরথের মত তপস্যা করিয়াই শঙ্করের জটাকলাপের অন্তরাল হইতে ভগবতী নবগঙ্গাকে আবিষ্কার করিয়া বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে ও বঙ্গবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে তাহার ধারাপ্রবাহ বহাইতে হইবে।

এই অভিসন্ধি লইয়া আমরা প্রাচীন অঙ্গদেশের রাজধানীর সমীপে আজ আমাদের শিবিরসন্নিবেশ করিয়াছি। পৌরাণিকী কিংবদন্তী অনুসারে প্রাচীন ঋষি দীর্ঘতমা যে দিন এই দেশে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই দিন অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ নামধেয় তাঁহার পুত্রগণ এই দেশে আর্য্যসভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিলেন। সে কোন্ কালের কথা ঠিক্ জানি না, কিন্তু অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ আজ পর্য্যন্ত সেই বীজ হইতে উৎপন্ন তরুচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া তাহার পুষ্পফল উপভোগ করিতেছে। এই অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সহিত অন্তরঙ্গভাব

পরিচিত হইবার জন্যই আমাদের এই অধ্যবসায়। আমরা বর্ষে বর্ষে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপস্থিত হইয়া সেখানকার জল ও মাটী, বন ও জঙ্গল, হাট ও ঘাট, সেখানকার তরু লতা, পশুপাখী, সকলেরই অনুসন্ধান করিতে চাহি; গ্রাম্য ও নাগরিক সকলের সহিত আলাপ করিয়া তাহারা কি খায়, কি পরে, তাহা জানিতে চাহি। সেখানকার জমীতে কি ফসল জন্মে, সেখানকার হাটে কি পণ্যদ্রব্যের বেচা কেনা হয়, গাছে কি ফল ফলে, পুকুরে কি মাছ থাকে, ডালে কোন্ পাখী ডাকে ও বনে কোন্ জন্তু বিচরণ করে, তাহার সন্ধান লইতে চাহি। সেখানকার কৃষকে কি গান গায়, পণ্ডিতে কোন্ শাস্ত্রের চর্চ্চা করে, পুরাঙ্গনা কোন্ ব্রতের অনুষ্ঠান করে, তাহা আমরা জানিতে চাহি। ভাঙ্গা বাড়ী দেখিলে আমরা তাহার ফটো তুলিব, উচু ডাঙ্গা দেখিলে তাহা খনন করিব, এবং সহস্রমুখী কিংবদন্তী উপকথা ও ইতিহাসকে এক সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া যে গ্রাম্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সংগ্রহ ও সঙ্কলন করিব। ঘাটে মাঠে যে শিলাখণ্ড বা তাম্রপত্র অস্পষ্ট অক্ষরে অতীত কালের ইতিবৃত্তের কোন ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বহন করিতেছে, তাহা আমরা কুড়াইয়া আনিব; তরুতলে যে দেবমূর্ত্তি ভগ্ননাস ও ভগ্নপদ হইয়া অযত্নে গড়াগড়ি যাইতেছে, তাহা তুলিয়া আনিব; আর গৃহস্থের ঘরে ঘরে যে ছেঁড়া তালপাতা চন্দনচর্চ্চিত হইয়া পুরুষানুক্রমে পূজাগ্রহণ করিতেছে, তাহা নকল করিয়া লইব। ইটের টুকরা বা কলসীর কাণা, ঘষা পয়সা বা ছেঁড়া কাগজ, যাহা সকলের অবজ্ঞাত, আমরা তাহার কিছুই অগ্রাহ্য করিব না। বৎসর বৎসর আমরা এই সকল উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আমাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে থাকিব, এবং আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে যাঁহাদের হাতে এই ভাণ্ডারের চাবি থাকিবে, তাঁহারাই বঙ্গমাতার পূজাকর্ম্মে পুরোহিত বলিয়া গণ্য হইবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন যখন কাশীমবাজারে আহূত হয়, সেই অধিবেশনের প্রথম দিনে আমি সেই সমবেত সাহিত্যসেবকগণের সম্মুখে এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম। পর দিন আমাদের পরম-সম্মান-ভাজন শ্রীযুত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বঙ্গের কেন্দ্রস্থলে এই উদ্দেশ্যের অনুকূল একটি সারস্বত-ভবনের প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। বঙ্গভাষার সাহায্যে বঙ্গের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের আলোচনায় যিনি আমাদের অগ্রণী,

উপযোগী হইয়াছিল; এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের আহ্বানকর্ত্তা মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র, যাঁহার অকৃত্রিম ভক্তিসংস্কৃত পুষ্পাঞ্জলিলাভে বঙ্গভারতী কখনও বঞ্চিত হন না, যাঁহার বদান্যতার অজস্র ধারাবর্ষণে বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্র উর্ব্বর হইতে চলিয়াছে, সর্ব্ববিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যাঁহার উপস্থিতি অদ্য আমাদের হৃদয়ে নূতন বল ও নূতন উৎসাহ সঞ্চার করিয়া দিতেছে, তিনি এই প্রস্তাবে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তার পর দুই বৎসর গত হইল, কিন্তু আমাদের সেই মানস-স্বপ্ন, বঙ্গের সেই সারস্বত-ভবন এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রতিষ্ঠিত হয় নাই বটে, কিন্তু সেই সারস্বত-ভবনে যে সকল উপকরণ সঞ্চিত হইবে, তাহার সংগ্রহ কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, এবং বিশেষতঃ সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুরস্থিত শাখা, সেই সংগ্রহকর্ম্মে যথাসাধ্য শক্তি নিয়োগ করিতেছেন; ভাগল-পুরের এই সাহিত্য-সম্মিলনের প্রদর্শনী-গৃহেও আপনারা সেই চেষ্টার ব্যাপকতার কতক পরিচয় পাইতেছেন। বঙ্গের নানা স্থানে অনেক লোক এই সঙ্কলন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

বহু বর্ষ অতীত হইতে চলিল, বঙ্গসাহিত্যের তদানীন্তন নেতা বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্গের সাহিত্যসেবীকে বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি, গতি ও স্থিতি বিষয়ে তথ্যনিরূপণের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মর্ত্ত্য দেহে দিব্য দৃষ্টি সংস্থিত ছিল; তিনি দৈবপ্রেরণায় বঙ্গের ভবিষ্যৎ নখদর্পণে দেখিতে পাইয়াছিলেন; স্বর্গে বসিয়াও তাঁহার অঙ্গুলিপ্রেরণায় তাঁহার স্বদেশবাসীকে তিনি অদ্যাপি গন্তব্য-পথে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবনির্ম্মিত মন্দিরে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের নির্ম্মাতাদিগের আলেখ্যসমূহের মধ্যভাগে সেই স্বর্গগত মহাপুরুষের যে পটচিত্র প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার অভ্যন্তর হইতে দিব্য জ্যোতির স্ফুরণ আমরা ভক্তের চক্ষুতে নিরীক্ষণ করি, এবং সেই দিব্য জ্যোতির প্রেরণায় আমরা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে কর্ত্তব্যসাধনে উদ্যত হইয়াছি। কোদালি হাতে ও বাজরা মাথায় আমরা মজুরি করিতে উপস্থিত হইয়াছি। ধাতু, পাথর ও মাটীর টুকরায় আমরা স্তূপনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছি; ছেঁড়া কাগজের ও পোকায় কাটা তালপাতার জঞ্জালে আমাদের মার্ব্বেল-মণ্ডিত কুঠরী যুগপৎ অস্পৃশ্য ও অভিগম্য হইয়া পড়িয়াছে; হিজিবিজি হস্তাক্ষরের দৌরাত্ম্যে আমাদের পরিষৎ-পত্রিকা সভ্যগণের ভয়প্রদ হইয়া উঠিয়াছে, এবং প্রত্নতত্ত্বের

বিভীষিকা আমাদের কাব্যকলাকুতূহলী বন্ধুগণের হৃদয়ে আতঙ্কসঞ্চারের উপক্রম করিয়াছে।

বিধাতা জগতের প্রতি নিরীক্ষণ করিবার জন্য আমাদিগকে চক্ষু দিয়াছেন; কিন্তু বাহিরের দিকে নিরীক্ষণ করিবার পূর্ব্বে আপনার দিকে নিরীক্ষণই করা আবশ্যক। সকল দর্শনের উচ্চে অবস্থিত আত্মদর্শন! আমাদের বাঙ্গালী জাতির এই আত্মদর্শনের সময় উপস্থিত। বাঙ্গালা দেশে কোথায় কি আছে, বাঙ্গালী জাতির কবে কি ছিল, ইহার প্রতি দৃষ্টিপাতই আমাদের এখন আত্মদর্শন। দেশে যে হাওয়া উঠিয়াছে, এই আত্মদর্শন তাহার অনুকূল। এমন একটি স্থান চাহি, যেখানে বসিয়া আমরা বাঙ্গলা দেশের অতীতের পর্য্যালোচনা করিব, বর্ত্তমানের প্রতি নিরীক্ষণ করিব, ভবিষ্যতের বিষয়ে ধ্যান করিব ও স্বপ্ন দেখিব। যে স্থানে বসিয়া এই কাজ করিতে হইবে, ইহাই সেই সঙ্কল্পিত সারস্বত ভবন; এই সরস্বতীমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ্মীদেবীর বরপুত্রগণের দ্বারদেশে যদি হত্যা দিতে হয়, তাহার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে; দ্বারবানের অর্দ্ধচন্দ্রের আশঙ্কা করিলে চলিবে না। গৃহে গৃহে মুষ্টিভিক্ষার জন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে হইবে। এই মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া আমরা সরস্বতী-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিব। দরিদ্র বঙ্গদেশ; এবং দরিদ্র দেশের সাহিত্যসেবী আমরা অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে না পারি, আপাততঃ একখানা ক্ষুদ্র কুটীর-নির্ম্মাণের উপাদানও সংগ্রহ করিতে পারিব। এবং এই কুটীরনির্ম্মাণের প্রস্তাব লইয়াই আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে আপনাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

ভাগলপুরে সমবেত সাহিত্য-সম্মিলনের সম্মুখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সবিনয়ে এই প্রার্থনা উপস্থিত করিতেছেন। কাশীমবাজার সম্মিলনে যে সঙ্কল্প হইয়াছিল, আপনারা সেই সঙ্কল্প-সমাধানে সাহায্য করুন। সাহিত্য-পরিষৎ ইচ্ছা করেন যে, সেই সঙ্কল্পিত সারস্বত-ভবন রমেশ-ভবন নামে বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠিত হউক। স্বর্গগত রমেশচন্দ্র দত্তের স্মৃতিনিদর্শন রূপে এই রমেশ-ভবনের ভিত্তি বাঙ্গালীর হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। বঙ্গীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরের প্রথম মাসে বঙ্গমাতার সুসন্তান রমেশচন্দ্র যে দিন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা করেন, সাহিত্য-পরিষদের

নূতন পরিচ্ছেদের সূচনার দিন মনে করিয়া শ্লাঘাবোধ করেন। দুরন্ত কাল রমেশচন্দ্রের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ও বাঙ্গলা সাহিত্যের ঐহিক সম্পর্ক অকালে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে; কিন্তু সাহিত্য-পরিষৎ বা বাঙ্গালা-সাহিত্যের স্মৃতি হইতে রমেশচন্দ্রের নাম কস্মিন্ কালেও লুপ্ত হইবে না। কেবল বাঙ্গালা সাহিত্য কেন, রমেশচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতার স্মরণ-নিদর্শনে বাঙ্গালী জাতি চিরদিন শ্রদ্ধাপ্রীতি অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবে। আমি সাহিত্য-পরিষদের আদেশক্রমে রমেশচন্দ্রের স্মৃতিবিষয়ে উদ্যোগী হইবার জন্য আপনাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। এই সারস্বত-ভবন অপেক্ষা যোগ্যতর স্মৃতিনিদর্শন আর কিছু হইতে পারে না। বাঙ্গালার সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ এই সভায় উপস্থিত আছেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকে এই প্রার্থনা জানাইতেছি। সাহিত্যচর্চ্চা হইতে রাষ্ট্রশাসন পর্য্যন্ত বিবিধ কার্য্যে যাঁহার শক্তি অব্যাহতভাবে প্রেরিত হইত, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য বাঙ্গালার সমুদয় রাষ্ট্রিকগণের নিকটও আমাদের প্রার্থনা জানাইতেছি। রমেশচন্দ্রের কর্ম্মক্ষেত্র কেবল বঙ্গভূমির সীমামধ্যে নিবদ্ধ ছিল না; তিনি কেবল বঙ্গের সুসন্তান ছিলেন না, তিনি সমগ্র ভারতের সুসন্তান ছিলেন। আমরা সেই রাষ্ট্রনীতিকুশল রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য ভারতবর্ষরূপ মহারাষ্ট্রের যাবতীয় অধিবাসীর নিকট প্রার্থী হইতেছি। আপনারা বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সমবেত বঙ্গদেশের সাহিত্য-সেবকগণ, বঙ্গদেশের পক্ষ হইতে এই প্রার্থনা সমস্ত ভারতবর্ষের সম্মুখে উপস্থিত করুন। রমেশচন্দ্রের ভারতব্যাপী বন্ধুগণ, যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহার সহায় ছিলেন, সমাজে তাঁহার সখা ছিলেন, গৃহে তাঁহার সুখদুঃখের ভাগী ছিলেন, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বঙ্গের সারস্বতভবন, বঙ্গের সারস্বত ভাণ্ডার, বঙ্গের জাতীয় চিত্রশালা, যেখানে প্রাচীন বঙ্গ আপনাকে উদ্ঘাটিত করিবে, যেখানে বর্ত্তমান বঙ্গ নিরীক্ষিত ও আলোচিত হইবে, যেখানে ভবিষ্যৎ বঙ্গ আশার ও আকাঙ্ক্ষার চিত্রে চিত্রিত হইবে, বঙ্গের ভারতী যেখানে পূজা পাইবেন, বঙ্গের লক্ষ্মী যেখানে আপন ঐশ্বর্য্য প্রকটিত করিবেন, সেই সরস্বতীভবন,—সেই রমাভবন, সেই রমেশভবন প্রতিষ্ঠার জন্য আপনাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি। অট্টালিকা-নির্ম্মাণ আমাদের অসাধ্য হয়, এখন কুটীর-নির্ম্মাণেই আমরা তৃপ্ত হইব। বঙ্গের সরস্বতী কুটীরমধ্যেই চিরকাল অর্চ্চনা পাইয়াছেন; বঙ্গলক্ষ্মী কুটীরসঞ্চিত শস্যসম্ভারের অভ্যন্তরেই বিরাজ করিতেছেন; বঙ্গসন্তান রমেশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য কুটীর-কল্পনাও অযুক্ত হইবে না। *

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

---

* ভাগলপুরে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে পঠিত।

লজ্জাবতী লতা।

১

অনুরাগে চেয়ো না, চেয়ো না ওর পানে ;
লজ্জাবতী লতা ও যে—সোহাগ না জানে।
ছুঁইলে শিহরে কায়, ফুল-ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়,
দিও না দিও না ব্যথা ও কোমল প্রাণে,
লজ্জাবতী লতা ও যে – সোহাগ না জানে !
ওই তরুটির আড়ে আঁধারেতে একধারে
আছে পড়ে, মূর্ত্তিমতী লজ্জাস্বরূপিণী,
সরলা লতিকাবালা কানন-নন্দিনী।

২

রাধালতা, তরু লতা, ঝুমুকা, অশোকলতা,
হাদে দেখ কত গর্ব্বে শোভিছে বাগানে,
লাল নীল মণি যেন জহুরী-দোকানে !
সুন্দরী অপরাজিতা, রূপসী মাধবী-লতা,
ধনীর দুহিতা সম শোভিছে উদ্যানে,
রূপ যেন ফেটে পড়ে ওদের বয়ানে !
কিন্তু লজ্জাবতী লতা, মূর্ত্তিমতী সরলতা,
নাহি বিলাসের লেশ, গর্ব্ব নাহি জানে,
থাকে পড়ে একধারে আনত-নয়ানে !
নাহিক ফুলের ঘটা নাহিক রূপের ছটা,
বাকল-বসন-পরা, যৌবনে যোগিনী,
তবু এ লাজুক মেয়ে অপূর্ব্ব মোহিনী !

৩

এইরূপ হেরিয়াছি কুলীন-কুমারী,—
নাহি ভূষা, নাহি সাজ, চলনে কথনে লাজ,

প্রফুল্ল নব যৌবন, তবুও ঝিয়ারি! *
পতির আসার আশা নাহি আর!—ভালবাসা
অর্পিয়াছে কায়মনে গোবিন্দ-চরণে!
হরি ধ্যান, হরি জ্ঞান, হরি মান-অপমান!
হরিনাম-মালা জপে বিরল-বিজনে,
মাথায় সিন্দুর ধরে, তাও শ্রীগোবিন্দে স্মরে',
অধরে সুহাসি খেলে হরির চুম্বনে!
শ্রীঅঙ্গে দুকূল পরে, তাও শ্রীগোবিন্দে স্মরে',
নিশিতে বাসর জাগে শ্রীহরির সনে!
এমন সুন্দর দৃশ্য, দেখেনি দেখেনি বিশ্ব,
মূর্তিমতী লজ্জাবতী লতিকা-রূপিণী,
গোবিন্দের প্রিয়বধূ অপূর্ব্ব মোহিনী!

৪

এইরূপ হেরিয়াছি বঙ্গকুলনারী,
নাহি ভূষা, নাহি সাজ, চলনে কথনে লাজ,
প্রফুল্ল নবযৌবন, তবুও কুমারী!
নাহি বিবাহের সাধ, যত প্রেম-সুখ-সাধ
অর্পিয়াছে প্রাণপণে শিবের চরণে!
শিবরাত্রি পূজারাতে ভোলানাথ শিবসাথে
গান্ধর্ব্ব বিবাহ সতী করেছে গোপনে!
মালার বদল হ'ল, হাসি' নববধূ দিল
সুন্দর হরের গলে ধুতুরার হার,
বর দিল জবাহার গলেতে কন্যার!
চন্দ্রশেখরের ইন্দু বধূর সিন্দুরবিন্দু
হইল রে, ধন্য ভাগ্য সরলা বালার!

---

* কুলীনকন্যাদিগের মধ্যে এমন দেখা গিয়াছে যে, নবপ্রসূত মাত্র সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইবামাত্র শিশুকন্যার শুভবিবাহ হইয়া গেল! যখন তাঁহার বয়স 'এক মাস' মাত্র, সেই একবার স্বামিমুখ সন্দর্শন করিলেন; তাহার পর, সারাজীবনের মধ্যে আর সে 'সুখ' ভাগ্যে ঘটিল না। অথচ তিনি পিত্রালয়ে 'ঝিয়ারি' থাকিয়া, চিরদিন হরিপাদপদ্ম সেবন করিয়া, সতীলক্ষ্মী হইয়া জীবন কাটাইলেন। আমি সেই বরণীয়া সাবিত্রীর শ্রীচরণে শত শত নমস্কার করি।—লেখক।

রসিক প্রেমিকবর প্রেমময় বিশ্বেশ্বর
আদরে বধূর মুখ করিলা চুম্বন,
অমনি হ'ল বালার মোহজাল অপসার—
শিবময় হেরে ধনী নিখিল ভুবন!
পিতা শিব, মাতা শিব, সোদর সোদরা শিব,
কি স্বজন পরজন—সবাই মহেশ,
ভোগতৃষ্ণা সমুদয় শিবত্বে পাইল লয়,
ধন্য দীক্ষা! প্রাণে নাহি আমিত্বের লেশ!
এমন লাজুক মেয়ে, শিবপানে থাকে চেয়ে
কথাটি না সরে মুখে, সরমে আকুল,
মুখ বুজি' কাজ করে, যাহা করে, শিব-বরে
সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় ভুবনে অতুল!
এ হেন সুন্দর দৃশ্য দেখেনি দেখেনি বিশ্ব—
মূর্ত্তিমতী লজ্জাবতী লতিকা-রূপিণী
শিবের ঘরণী অই অপূর্ব্ব মোহিনী!

৫

এইরূপ হেরিয়াছি আশ্রমের নারী, *
সদাই ঘোমটা সাজ, চলনে কথনে লাজ,
প্রফুল্ল নব যৌবন, তবুও কুমারী!
বিবাহের ইচ্ছা নাই, প্রাণপণে কন্যা তাই
অর্পিয়াছে আপনারে যিশুর চরণে!
প্রেমময় যিশু খৃষ্ট, কুমারীর দেব ইষ্ট;
নব-তপস্বিনী বালা নবীন জীবনে!
বিজন কক্ষ বিরলে, রজত-প্রদীপ জ্বলে
পবিত্র সুন্দর স্থলে, বেদিকা-উপরে!
জানু পাতি', যোড় হস্তে, ভগ্নকণ্ঠে ভয়ত্রস্তে,
ওই শোন কি মধুর আরাধনা করে!
"হে যিশু! কি কব আমি, তুমিই আমার স্বামী;
তব তরে ছাড়িয়াছি পিতা মাতা ভাই;

* The Roman Catholic nun in her convent.

তোমা ছাড়া কেহ নাই, তোমারেই স্বধু চাই,
তুমি বর, আমি বধূ, মেরীর দোহাই !
জ্বলিছে ধূপ কেশর, গন্ধে আমোদিত ঘর,
লুকায়ে লাজুক মেয়ে করে দেবপূজা !
মুক্ত-কণ্ঠে আরাধিছে, যুক্ত দুই ভুজা !
এ হেন সুন্দর দৃশ্য, দেখেনি দেখেনি বিশ্ব,
মূর্ত্তিমতী লজ্জাবতী লতিকা-রূপিণী,
যিশুর ঘরণী অই অপূর্ব্ব মোহিনী !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

বাঁদী।

১

তখন আমার বয়স ছ' বৎসর,—সব কথা ভালো মনে পড়ে না ! আমরা অনাথ দুটি ভাই বোন,—পিতৃব্যের গলগ্রহ হইয়াছিলাম। তবে আমাদিগের ভার অধিক দিন তাঁহাকে বহিতে হয় নাই ! ইনিসিয়ার মসজিদে দরবেশদিগের হস্তে আমার ভ্রাতা আলিকে ও সারকেসিয়ার বাজারে আমাকে বেশ ভালো দরেই বেচিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। নূতন মনিবের সহিত আমি কনস্তান্তিনোপ্‌লে আসিলাম।

নূতন মনিব এক বৃদ্ধা। আমার বয়সও যেমন বাড়িতে লাগিল, খরিদ্দারের দল আসিয়া বৃদ্ধাকে ততই অস্থির করিয়া তুলিতেছিল।

তখন একটু বয়স বাড়িয়াছিল। অনেক কথাই বুঝিতে পারিতাম। নদীর ধারে বা বাগানে বসিয়া দেখিতাম,—কত নৌকা বাহিয়া যাত্রী,—কত গান গাহিয়া পথিক চলিয়াছে ! কত দূর সীমাহীন কোন্ প্রান্তরে, তাহারা কত আনন্দের স্বাদ পাইবে। আমার চারি ধারে একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডী টানা ! উপরকার আকাশখানা যেন প্রকাণ্ড একটা ঢাকনির মধ্যে আমাকে বন্ধ রাখিয়াছে ; প্রতিদিনকার সেই একই কাজ, একই আহার, একই তিরস্কার। ইহারই মধ্য দিয়া আমার পৃথিবীর সুখ-দুঃখের গতিটুকু ! আঃ কি এ বিরাট অধীনতা ! আকাশ-বাতাস যেন চারিধার হইতে

চাপিয়া রাখিয়াছে! হায়, আমি এক জন বাঁদী মাত্র! দুঃখে প্রাণ ফাটিয়া যাইলেও মুখে হাসির দাগ টানিতে হইবে! এমনই বিধির নির্দ্দেশ! তার পর বাজারে, ফলমূলেরই মত, একদিন খরিদদারের নাক-কাণ মাপিয়া দর-যাচাই! অসহ্য!

বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর! পৃথিবীর চারিধারে যেন একটা রঙ্গীন আলোর আভাস পাইতেছিলাম! কি যেন একটা হারাণো স্বপ্নের কথা মাঝে মাঝে মনে হইত! মনিব আসিয়া ডাকিল, "পিয়ারা, ব'সে ভাবছ কি!"

ভাবিতেছিলাম অনেক কথা! কিন্তু তায় ফল কি! মনিব বলিলেন, "ইনি তোমার নূতন মনিব হলেন—নাচে, গানে, কথাবার্ত্তায় এঁকে সুখী করাই তোমার কাজ! বুঝিলে? ইনি লোক খুব ভাল!"

বেশ! এ' ত নূতন কথা নয়! তোমাদের সুখের জন্যই আমাদিগের জন্ম! নিজের কিছু নাই,—তোমাদেরই জন্য সব!

২

বৃদ্ধার কথা মিথ্যা নহে! নূতন মনিব আদিলি-হালুমের স্নেহ-যত্নের সীমা ছিল না। আজ কৃতজ্ঞতায় আমার ক্ষুদ্র হৃদয় পরিপূর্ণ!

খোদা বুঝি মুখ তুলিলেন! আমার সঙ্গিনী বাঁদীর দল গরীব গৃহস্থের ঘরে পড়িয়াছে—সারাদিন কাজকর্ম্মের মধ্যে থাকিয়া, তাহাদিগের অপরিষ্কৃত কুৎসিত ছেলেমেয়েগুলাকে বহিয়া, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিয়া, দারিদ্র্য ও অনশনের বেদনায় সারা হইয়া যাইতেছে; আর, আমি আদিলি হালুমের বিলাসঐশ্বর্য্যের মধ্যে আসিয়া, আজ, সর্ব্বপ্রকার আদর-যত্নের অধিকারিণী! কষ্ট ছিল একটি - সে কষ্ট মর্ম্মান্তিক! আদিলির ভ্রাতা মোরাদের মেজাজটা অতিরিক্ত রুক্ষ! তার নিষ্ঠুর ভৎসনা হইতে কোনও দিনই পরিত্রাণ পাইতাম না। সে ভৎসনায় এতখানি তীব্রতা থাকিত যে, পরগৃহবাসিনী, জন্ম-দুঃখিনী আমার পক্ষে চোখের জল ধরিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিত! কেন সে আমার প্রতি এত বিরূপ! সুন্দর, কিশোর মোরাদ— আমি কি অপরাধে অপরাধিনী! মোরাদের মুখের একটা মিষ্ট কথার জন্য আমার প্রাণটা তৃষিত থাকিত! একবার শুধু একটি মিষ্ট কথা! তবু মোরাদকে আমি মার্জ্জনা করিতাম—অবশ্য মনে-মনে! কোন দিন তার বিরুদ্ধে

তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছিল! পশ্চিমের বারান্দায় আমি দাঁড়াইয়াছিলাম। বড় বড় গাছগুলার গায়ে সিঁদুরে রঙ্গ মাখাইয়া সূর্য্য অনেক নীচে নদীর কোলে হেলিয়া পড়িতে ছিল।

পিছনে পদশব্দ শুনিলাম—আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আমি সহজেই বুঝিলাম, মোরাদ আসিয়াছে! হৃদয়ের স্পন্দনধ্বনি পাছে মোরাদ শুনিয়া ফেলে.—ভাবিয়া আমি সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িলাম।

সত্যই, মোরাদ! মোরাদ ডাকিল, "পিয়ারা!"

সে আমার হাত ধরিল! আমার কপালের কাছে রক্তটা যেন তালে তালে নাচিয়া উঠিল! মোরাদের পানে চাহিতেই আমার মুখ আপনিই নত হইল!

মোরাদ কহিল, "এখানে দাঁড়িয়ে কি করছ, পিয়ারা?"

"আজ বড় দেশের কথা মনে পড়ছে! সেখানে বাগানে বসে থাকতুম—সন্ধ্যাবেলায়, চারিধার রাঙ্গিয়ে, সূর্য্য ঠিক এমনই করেই অস্ত যেত!" আমার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিতেছিল!

"পিয়ারা! আমার পানে চেয়ে দেখ। তোমার চোখদুটির পিছনে যেন অনেকখানি জল লুকানো রয়েছে; কাঁদছ নাকি পিয়ারা?"

"না!"

"হাঁ! তোমার গলার স্বরটাও ভার-ভার যেন!"

"মনটা ভালো নেই!"

"তুমি জানো, পিয়ারা, আমার বিয়ে!"

আমার বুকটা ছঁাৎ করিয়া উঠিল! আমি কথা কহিতে পারিলাম না।

মোরাদ আবার কহিল, "তুমি ভাবছো, পিয়ারা, কত সে অসুখী হবে! আমার যে স্ত্রী হতে যাচ্ছে। একে, আমার এই রুক্ষ মেজাজ—"

"না, না," আমি বলিলাম, "কেন, সে অসুখী হবে! তাকে তুমি ভালোবাসবে, নিশ্চয়! আমাকে অত বক বলে কি, তাকেও বকবে?"

মোরাদ আমার হাত ছাড়িয়া দিল! আমার মাথা বুকের মধ্যে টানিয়া, মোরাদ কহিল, "তুমি ভাবো, আমি তোমাকে কেবলি বকি, ভালোবাসি না! না, পিয়ারা, তবে শোন, আমি ভালোবাসি—তোমাকে বড় ভালোবাসি—মানুষে যত ভালোবাসতে পারে! এত ভালবাসি, যে, তুমি অপরের হবে

বুঝিলে, তোমার বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পারি!" আনন্দে আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল! আজ আমার প্রথম মনে হইল, এ পৃথিবী এত সুন্দর! এ জগতে এত সুখ! আমি কহিলাম, "তবে কেন তুমি আমাকে বক, মোরাদ ?"

"কেন বকি! পিয়ারা, আমার তিরস্কারে তোমার চোখ ছল-ছল করে, মনে তুমি ব্যথা পাও,—কিন্তু আমি তাহার অধিক ব্যথা পাই। তোমাকে তিরস্কার করে আমার চোখেও জল আসে—তা কি তুমি জানো! তোমার চোখের জল আমার মত দুর্দ্দান্ত পশুকে আজ বশ করেছে! পিয়ারা, আজ হ'তে তুমি এ গৃহের বাঁদী নও—তুমি পিয়ারা হানুম—এ গৃহের গৃহিণী, আমার প্রেয়সী তুমি!"

বুকের মধ্যে টানিয়া, মোরাদ আমার কেশে চুম্বন করিল! আবেশে আমার চক্ষু মুদিয়া আসিল! তার পর মোরাদ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল! বারান্দায় দাঁড়াইয়া কম্পিতদেহে আমি ভাবিতেছিলাম এ কি স্বপ্ন! বাহিরে চাঁদের আলো ছড়াইয়া পড়িতেছিল! রূপালি জলে কে যেন সন্ধ্যার আঁধার ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছে!

৩

সেই আজন্মের বাঁদী আমি, আজ হানুম! পূর্ব্ব অভ্যাস একেবারে ছাড়িতে পারিতাম নাই। কখনও বা আদিলির পায়ের কাছে বসিয়া পড়িতাম, আদিলি হাত ধরিয়া পাশে বসাইত! আর, মোরাদের প্রেম! বিধাতার করুণাও বুঝি এত মধুর নয়!

বাঁদীর দল পাঙ্খা ঢুলায়, জুতার ধুলি ঝাড়িয়া দেয়—উঠিতে-ফিরিতে সেলাম করে! আদব কায়দার কোন ত্রুটী নাই। আহা, সেই বেচারী বাঁদীর দল—কেহ বা আমারই আজন্মের সঙ্গিনী। এক দিন তাহাদিগের সহিত মনিবের সুখের জন্য আমিও এমনই উদ্‌গ্রীব থাকিতাম! আর, আজ আমার সুখের জন্য তাহাদিগের এত আগ্রহ, এত যত্ন।

কিন্তু মোরাদের প্রেম লইয়াই আমি বিভোর! বাঁদীর সেবা বা বাঁদীর সুখ-দুঃখের বিষয় লইয়া বড় একটা ভাবিতাম না।

ঠিক এই সময় আদিলা বিবাহান্তে সেলোনিকায় স্বামীর গৃহে চলিয়া গেল। আমি আমার শ্রেষ্ঠ সুহৃদ হারাইলাম।

৪

মোরাদের প্রেম ক্রমেই গভীর হইতেছিল! আমার কোনও দুঃখ নাই! ইহার উপর যে দিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিল, সে দিন আমার সুখের পাত্র কাণায়-কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল! কিন্তু এই সময় একটি বেদনা প্রথম অনুভব করিলাম! সে আমার বাঁদী-সঙ্গিনীদিগের ঈর্ষ্যা।

আমি সহসা একদিন তাহাদিগের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ফেলিয়াছিলাম! আমিও আজন্ম বাঁদী—তাহাদিগের মতই পরগৃহচারিণী—খানিকটা রূপের জন্য আজ তাহাদিগের কর্ত্রী আমি, আর তাহারা আমারই বাঁদী! কথাটা এমনই ধরণের! কিন্তু সে কথায় কি আসিয়া যায়! আমার মোরাদ, চাঁদের কণার মত সুন্দর আমার এই শিশু, জগতে ইহাই আমার একমাত্র চিন্তা, একমাত্র সুখ! অপরের কথা ভাবিবার আমার অবসর ছিল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুর নিমন্ত্রণে মোরাদ বিকো সহরে গেল। শিশু পুত্রটিকে বুকে চাপিয়া আমি বিরহের দুঃখ ভুলিলাম।

রাত্রি প্রায় এগারোটা। হারেমের চারিধার নিস্তব্ধ! নিদ্রাস্পর্শে সকলে অচেতন।

সহসা দ্বার খুলিয়া এক বাঁদী আমার গৃহে প্রবেশ করিল। তার মুখ বিবর্ণ। সে কহিল, "আগুন, বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে।" তার পর সে হাসিল। কি সে উৎকট, তীব্র হাসি! পরে চকিতে সে বাহির হইতে আমার কক্ষের দ্বারে তালা লাগাইয়া অদৃশ্য হইল।

বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে, তার অর্থ, মৃত্যু ভীষণ নিষ্ঠুর মৃত্যু। সমস্ত অঙ্গ জ্বলিয়া যাইবে- অসহ্য, জ্বালাময় মৃত্যু! নিজের জন্য ভাবি না, কিন্তু এই শিশু—সে যে আমার সর্ব্বস্ব। বিছানায় শুইয়া ছোট হাত দুটি নাড়িয়া হাসিতেছে। এ সময়েও হাসি! আহা, বেচারী, নিতান্ত বেচারী। জানে না, কি বিপদে সে পড়িয়াছে, আর কি অসহায় অক্ষম আমি, তার মাতা, আজ সে বিপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিতে পারিব না।

জানালাটা খুলিয়া ফেলিলাম। বাহিরে অগ্নি! তার সহস্র শিখা লোহিত সর্পের ফণার মত লেলিহান হইয়া উঠিয়াছে। কি তীক্ষ্ণ! কি উজ্জ্বল! আজ, উহারই গ্রাসে, আমার হৃৎপিণ্ডটি ছিঁড়িয়া সমর্পণ করিতে হইবে।

আমি তাড়াতাড়ি বিছানার লেপ মশারি প্রভৃতির সহিত পুত্রটিকে

নীচে অনল-শিখা হু হু গর্জ্জিয়া উপরে উঠিতেছে। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত, কি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। ইহারই মধ্যে—উঃ, সমস্ত বিসর্জ্জন!

আমার জ্ঞান ছিল না। কি করিতে যাইতেছি, কিছু বুঝিতেছিলাম না। একটা অন্ধ দুর্জ্জেয় শক্তি আমাকে চালিত করিতেছিল। কেবলই এই শিশুর কথা মনে পড়িতেছিল, ! বারান্দা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলাম!

৫

জ্ঞান হইলে চাহিয়া দেখি, উন্মুক্ত প্রান্তর। একটা বৃক্ষতলে আমি শয়ন করিয়া আছি। আগুন নিভিয়া গিয়াছে। উষার আলো ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। এ কি মৃত্যুর পর নূতন জীবন, না, দুঃস্বপ্ন? শিয়রের কাছে বসিয়া কে? মোরাদ! মোরাদের মুখ বিবর্ণ! আমার পুত্র, আমার সর্ব্বস্ব কোথায় সে!

মোরাদ ডাকিল, "পিয়ারা!" তার কণ্ঠস্বর বিকৃত হইয়া গিয়াছে। অসহ্য দুঃখে তার মুখে-চোখে কালি পড়িয়াছে। আমি কহিলাম, "খোকা, কোথায়?"

"এই যে গাছের আড়ালে সে ঘুমাইতেছে—কোনও ভয় নাই, তার গায়ে এতটুকু আঁচ লাগে নাই, কিন্তু, পিয়ারা, আমাদের যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে।" মোরাদ কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি কহিলাম, "ও কি, কাঁদছো তুমি? তোমরা আছ, আমার ত কোনও দুঃখ, কোনও অভাব নাই। ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।"

মোরাদ কহিল, "সে কথা ঠিক। পিয়ারা, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব! এ বিপদে যে তোমাকে হারাই নাই, তাহাই আমার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা।"

আজ আমরা রিক্ত, নিঃস্ব সর্ব্ব-হারা। দাসদাসীরা পলাইয়াছে। মোরাদের বিশ্বাস, বাঁদীগুলা ঈর্ষ্যার জ্বালায়, আমাকে মারিবার জন্য গৃহে আগুন লাগাইয়া দিয়াছিল।

ছোট একটি কুটীরে আমরা থাকি। মোরাদ চাকুরী করে, তাহাতেই সংসার চলে। দাসী-বাঁদী নাই। ঘর-দ্বারের কাজ আমিই করি। রাঁধিয়া মোরাদকে খাওয়াই। একটি চুম্বনে আমার সমস্ত কর্ম্মের ক্লান্তি হরণ করিয়া মোরাদ চাকুরীতে বাহির হইয়া যায়; আমি গৃহে শিশুটিকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দিন কাটাইয়া দিই! সন্ধ্যার সময়, ঘর দ্বারের কাজ সারিয়া, তাকে বুকে লইয়া মোরাদের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকি।

মোরাদ মাঝে-মাঝে বলে,—তার কণ্ঠের স্বর বাধিয়া যায়—"তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে, পিয়ারা, এত খাটিলে বাঁচিবে কেন?"

আমার চোখে জল আসে। আমি ভাবি, আমার আবার কষ্ট কি? তার ত কখনও কাজ করা অভ্যাস ছিল না। আমি তার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া বলি, "আমার খাটুনি, প্রিয়তম, তার জন্য তুমি কেন দুঃখ কর? আমি ত তোমার বাঁদী।" *

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শিক্ষা-বিজ্ঞান।

আলোচনাপ্রণালী ও বিজ্ঞান।

কোনও বিষয়ে বিশেষরূপে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে নানা দিক্ হইতে তাহার আলোচনা করিতে হয়। বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন দিকের আলোচনা দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ সত্যের উপলব্ধি করা যায়, সেই সত্যগুলির মধ্যে পরস্পর ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিলেই আলোচ্য বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান জন্মে—অর্থাৎ "বিজ্ঞান" প্রস্তুত হয়।

মানবীয় বিজ্ঞানসমূহে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা-প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা।

বিশেষতঃ যে বিষয় জটিলতাপূর্ণ, যে বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে, এবং যাহা অন্যান্য বিষয়ের সহিত শৃঙ্খলীকৃত, সেই বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বিভিন্নরূপ আলোচনা-প্রণালীর বিশেষ প্রয়োজন। এক প্রণালীতে যে তথ্য অবগত হওয়া যায়, অন্য প্রণালীতে ঠিক সেই তথ্য অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর খণ্ড-সত্যসমূহের পরিবর্ত্তে সম্পূর্ণ সত্য আবিষ্কারের জন্য যত প্রকারের সম্ভব আলোচনা-প্রণালী অবলম্বন করা বিধেয়।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বিষয়সম্পত্তি, সাহিত্য, কলা প্রভৃতি যে সকল বস্তু মানব লইয়া গঠিত, যাহাতে মানবের চিত্তপ্রবৃত্তি এবং অন্তঃকরণের গূঢ় শক্তি সকল কার্য্য করিয়া থাকে, যে সকল বিষয়ের উন্নতি, অবনতি, পরিবর্ত্তন, অথবা ক্রমবিকাশ মানবের জীবন্ত বৃত্তিনিচয়ের কার্য্যের উপর নির্ভর করে, সেই সকল বিষয়ই অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বিশেষ ভাবে জটিল,

* একটি তুর্কী গল্পের ইংরাজী অনুবাদ হইতে সঙ্কলিত।

দুরূহ, এবং সমস্যাপূর্ণ। এ জন্য নির্জ্জীব পদার্থ, অথবা নিম্নস্তরের প্রাণিসমূহ, অথবা অচেতন কলকারখানা প্রভৃতি বিষয়ের সত্য আবিষ্কার করিতে বৈজ্ঞানিকের যেরূপ প্রণালী অবলম্বন করা উচিত, বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশাল মানবান্তঃকরণের নিগূঢ় ক্রিয়া ও প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করিবার জন্য ঠিক সেই প্রণালী অবলম্বনের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং স্বতন্ত্র উপায়ে সম্পূর্ণ নূতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ সত্য উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা উচিত। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সত্যের একীকরণে মানব বিষয়সমূহের জ্ঞান সম্পূর্ণতা ও প্রণালীবদ্ধতার দিকে অগ্রসর হইয়া "বিজ্ঞান"-পদবাচ্য হয়।

(ক) মানব-প্রকৃতি গতিশীল।

মানবীয় বিষয়সমূহের প্রধান বৈচিত্র্য এই যে, ইহারা অত্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল —সর্ব্বদা এক ভাবে থাকে না। মানব-প্রকৃতি গতিশীল, তাহার বৃত্তি সকল ক্রমেই বৈচিত্র্য লাভ করে। এ জন্য মানবের এবং মানবীয় অনুষ্ঠানসমূহের স্থিরতা নাই; প্রতিক্ষণেই ইহাদের এক একটি পুরাতনের স্থানে নূতনের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এক একটি "ইতিহাস" রচিত হইতেছে। এবং এই পরিবর্ত্তনশীলতার জন্য ইতিহাসেরও কখনই পুনরাবৃত্তি হয় না। মানবের দর্শন, মানবের আদর্শ, মানবের সাহিত্য, মানবের সমাজ নিরন্তর ভারকেন্দ্র পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নূতন স্থান অধিকার করে। সুতরাং জীবন্ত ও ধারাবাহিকরূপে চলন্ত এবং ঐতিহাসিক পারম্পর্য্য ও বিভিন্নতা বিশিষ্ট মানব সম্বন্ধে উপযুক্ত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তাহার কোনও এক অবস্থার আলোচনা করিলে উদ্দেশ্য সফল হয় না।

সুতরাং ঐতিহাসিক প্রণালীর প্রয়োজন।

কারণ, ইহাতে তাহার কেবলমাত্র বিশেষ এক ভারকেন্দ্রে অবস্থিত কার্য্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। বহমান স্রোতস্বতীর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে তাহার তীরে কোনও এক স্থানে দণ্ডায়মান হইলে চলে না; তাহার সহিত কূলে কূলে চলিতে হইবে, তাহার গতির অনুসারে স্বকীয় গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে। সেইরূপ অনন্তের দিকে ধাবমান, ক্রমশঃ অভিব্যক্তিপ্রাপ্ত ও বিবর্ত্তনশীল মানবজীবনের প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে কেবলমাত্র কোনও এক অধ্যায় বা স্তরের প্রকৃতি নিরীক্ষণ না করিয়া, ইহার বিভিন্ন অধ্যায়ের ও রূপান্তরসমূহের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণগুলির সহিত পরিচিত হইতে হইবে।

ধন-বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও সাহিত্যে ঐতিহাসিক প্রণালীর প্রয়োগ।

এ জন্য ঐতিহাসিক প্রণালীই মানবীয় বিজ্ঞানসমূহের প্রধান আলোচনা-প্রণালী। কোন্ যুগে কোন্ স্থানে কিরূপ অবস্থায় মানব কিরূপ ভাবে চিন্তা ও কর্ম্ম করিয়াছে, এই আলোচনাই মানব-বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার, ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপের প্রতিকৃতি মানসনেত্রে প্রতীয়মান হয় না, যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষের প্রতিষ্ঠানবৈচিত্র্য, ভাষাবৈচিত্র্য, আদর্শবৈচিত্র্য, রাষ্ট্রবৈচিত্র্য ও সমাজবৈচিত্র্যের উপলব্ধি হয় না, সেই জ্ঞান নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও ভ্রমাত্মক। সেই জ্ঞানের দ্বারা মানব সম্বন্ধে কোনও উপদেশ বা আদেশ প্রদান করা অসম্ভব। এইজন্য মানুষের বিষয়সম্পত্তিভোগ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রধানতঃ এই ভোগপ্রবৃত্তির ইতিহাস সংগ্রহ করা আবশ্যক। বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন স্থানে মানব নিজের সহিত বিশ্বের সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থির করিয়াছে বলিয়া ইহজগতের ভোগবাসনা এক এক অবস্থায় এক এক অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের অবতারণা করিয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র এক অবস্থার বিবরণের দ্বারা বৈষয়িক পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। ধর্ম্মভাব সম্বন্ধেও এই কথা। কোনও এক সমাজের বা এক অবস্থার বিবরণের দ্বারা ধর্ম্ম সম্বন্ধে শেষ সত্যের উপলব্ধি হয় না। সাহিত্য কাহাকে বলে, সাহিত্যের উৎকর্ষ কোন্ কোন্ উপাদানের উপর নির্ভর করে, সাহিত্যের সহিত সমাজচরিত্রের কি সম্বন্ধ, সাহিত্যের কোনও লক্ষ্য ও আদর্শ আছে কি না, এতৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও সাহিত্যের ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের বিবরণ সংগ্রহ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

(খ) মানবপ্রকৃতি স্থিতিশীলও বটে, সুতরাং দার্শনিক বিশ্লেষণ-প্রণালীরও প্রয়োজন; সমাজ-তত্ত্ব, ধন-বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও সাহিত্যের আলোচনায় এই প্রণালীর প্রয়োগ।

কিন্তু সজীব মানব এইরূপ গতিশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হইলেও তাহার মধ্যে কতকগুলি সামান্য ধর্ম্ম আছে। এই সাধারণ ধর্ম্মসমূহ সকল অবস্থায় ও সকল স্থানেই লক্ষিত হয়। ইহারা স্থিতিশীল, এবং সর্ব্বত্র সমান ভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং মানব-প্রকৃতি এক দিকে গতিশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ, অপর দিকে স্থির ও সামান্য ধর্ম্মবিশিষ্ট। এ জন্য সম্পূর্ণ মানববিজ্ঞান দুই প্রকারের আলোচনার উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ—(১) ইতিহাসের দ্বারা পরিবর্ত্তন ও বিভিন্নতা সমূহের বিবরণ-সংগ্রহ, (২) দর্শনের দ্বারা ঐক্য ও স্থিতির বিশ্লেষণ। এক

দিকে যেমন কেবলমাত্র এক অবস্থার আলোচনা করিলে মানবের পারম্পর্য্য ও ধারানুবাহিকতা হৃদয়ঙ্গম হয় না, তেমনই অপর দিকে বিশেষ এক ভারকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত, স্থিরভাবে দণ্ডায়মান বিশেষ এক অবস্থার আলোচনা না করিলে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয় না। মানব ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গঠন করিয়াছে বটে, কিন্তু মানব-চরিত্রের মধ্যে এমন কতকগুলি শক্তি আছে, যাহার দ্বারা তাহাকে সামাজিক জীব করিয়া তুলিয়াছে। মানবের কোনও এক অবস্থার বিশ্লেষণ করিলেই মানবের সহিত মানবের প্রয়োজন আছে কি না, নিঃসহায়রূপে মানব স্বকীয় সকল প্রকারের অভাব মোচন করিতে পারে কি না, এই সকল বিষয়ের তথ্য সম্যক্ আলোচিত হয়। এ জন্য সমাজপ্রকৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস-সংগ্রহ আবশ্যক হয় না। সেইরূপ কোনও এক অবস্থার আলোচনা করিলেই মানবের সাহিত্যের প্রয়োজন আছে কি না, সাহিত্যের উৎপত্তি কেন হইল, সাহিত্যে কোন্ কোন্ বৃত্তির বিকাশ হয়, এবং সাধারণতঃ সাহিত্যের সহিত মানব-চরিত্রের কি সম্বন্ধ, এতৎসম্বন্ধেও উপযুক্ত সত্যের উদ্ধার হয়। সেইরূপ, মানুষের মধ্যে যে ধর্ম্মভাব ও ভোগপ্রবৃত্তি আছে, তাহার বিশ্লেষণ করিলেই ধর্ম্ম ও ধন-সম্পত্তি সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান জন্মিতে পারে। মানব কেন দেব-দেবীর উপাসনা করে, কেন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করে, শাস্ত্রালোচনা করে, কি কারণে কোন না কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, এবং কি জন্য বিভিন্ন প্রকারের শিল্পের আয়োজন করে, তাহার বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান-সমূহের প্রয়োজন কি, এবং ইহাদের উৎপত্তি হয় কেন, এই সকল বিষয়ের জন্য ইতিহাস অনুসন্ধান না করিয়া কোনও এক ব্যক্তি বা সমাজের অন্তঃকরণ অনুসন্ধান করিলেই চলে।

শিক্ষা-বিজ্ঞানেও ঐ দুই প্রণালীরই প্রয়োজন আছে।

শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে এই দুই প্রকারেরই আলোচনাপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। শিক্ষা বিষয়টি কি, ইহার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না, এতৎসম্বন্ধে কোনও সাধারণ সূত্র প্রযোজ্য কি না, শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, শিক্ষার প্রভাবে মানব-প্রকৃতির কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় কি না, এবং কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে কিরূপ পরিবর্ত্তন হয়, ইত্যাদি শিক্ষাসম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্ন অন্যান্য মানবীয় বিষয়সমূহের ন্যায় ঐতিহাসিক প্রণালী ও দার্শনিক প্রণালীর দ্বারা আলোচিত হওয়া উচিত।

প্রথম বিভাগ—শিক্ষা-পদ্ধতি ; ঐতিহাসিক আলোচনা-প্রণালীর দ্বারা সমাজের সাধারণ সভ্যতার সহিত শিক্ষা-প্রথার সম্বন্ধনির্ণয়।

সুতরাং শিক্ষাবিজ্ঞান প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম বিভাগে দেশ, কাল ও অবস্থানুসারে মানব-সমাজের আদর্শের বিভিন্নতানুযায়ী যত প্রকারের শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলির বিবরণ থাকিবে। কোন্ সময়ে কোথায় সমাজে শিক্ষকদিগকে কিরূপ স্থান দেওয়া হইয়াছে, কিরূপ শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে, শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদিগের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ কোন্ নিয়মে স্থিরীকৃত হইয়াছে, ধর্ম্মজীবন, নৈতিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে কিরূপ উপযোগিতা-লাভের উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে। এই উপায়ে মানবসভ্যতার ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়, বিচিত্র আদর্শের বিকাশ, মানব-সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রকৃতি ও লক্ষণ আলোচিত হইবে। মিশর, গ্রীস, ভারত প্রভৃতি দেশের প্রাচীন সভ্যতাসমূহ, বিভিন্ন আদর্শে পরিচালিত মধ্যযুগের শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ ও বর্ত্তমান জগতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের মধ্যে যে আদর্শ, যে ভাব অন্তর্নিহিত আছে, এই শিক্ষার ইতিহাসে সেই ভিন্ন ভিন্ন সমাজপ্রকৃতি ও আদর্শসমূহের চিত্র প্রদান করা হইবে। কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতিসমূহ কালানুসারে পর্য্যায়ক্রমে আলোচিত না হইয়া, পৃথক্ পৃথক আদর্শ অনুসারে আলোচিত হইবে। এই উপায়ে মানব-সভ্যতার ক্রমিক বিকাশের সম্পূর্ণ বিবরণ প্রদান না করিয়া, কেবলমাত্র প্রধান প্রধান আদর্শ ও স্তরসমূহ বিবৃত করিবার চেষ্টা করা যাইবে।

দ্বিতীয় বিভাগ—শিক্ষাতত্ত্ব।

দার্শনিক বিশ্লেষণের দ্বারা শিক্ষার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য, উপকরণ ও মানব-জীবনের সহিত সম্বন্ধনির্ণয়।

দ্বিতীয় বিভাগে দার্শনিক প্রণালীতে শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে। শিক্ষা কাহাকে বলে, মানব-চরিত্রের উপর শিক্ষার কিরূপ প্রভাব, মানব-সমাজের কোনও এক আদর্শ-শিক্ষাপদ্ধতি আছে কি না, শিক্ষার কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত, এবং অবস্থাভেদে শিক্ষাপদ্ধতির কিরূপ পরিবর্ত্তন বিধেয়, এই সকল বিষয় বিচার করিয়া শিক্ষাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যাইবে। ঐতিহাসিক

দ্বারা তাহার যৌক্তিকতা প্রমাণিত হইবে। এবং এই বৈচিত্র্যের উপর নির্ভর করিয়া আমাদের দেশে বর্ত্তমান কালের উপযোগী কিরূপ স্বতন্ত্র শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োজন, তৎসম্বন্ধে আলোচনা থাকিবে।

শিক্ষার প্রকৃতি—বেষ্টনী ও মানবের পরস্পর আদানপ্রদানে জীবনের নৈসর্গিক পুষ্টি।

মানুষ কতকগুলি বৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। প্রকৃতির সাহায্যে এবং বেষ্টনী ও পারিপার্শ্বিক ভাব ও শক্তিসমূহের প্রভাবে সেই সকলের বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়। পারিবারিক, সামাজিক ও দেশের অন্যান্য শক্তির সংঘর্ষে তাহার কৈশোর যৌবনাদি অবস্থা স্বাভাবিক নিয়মে গঠিত হয়। সমাজের বিশেষ কোনও সাহায্য না থাকিলেও মানুষের মন ও শরীর আপনা-আপনিই বহির্জগৎ হইতে নিজের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট হইতে থাকে। এইরূপে ব্যক্তিত্ব-বিকাশই জীবিতাবস্থার লক্ষণ, এবং জীবনীশক্তির কার্য্য। এই জীবনীশক্তির পুষ্টিসাধন ও মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যবিকাশের সহায়তা করাই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য।

শিক্ষার উদ্দেশ্য—মানবের স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

অতএব যদি আমাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি-সাধনের জন্য কোনও ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই ব্যবস্থাকে এই স্বাভাবিক জীবনগঠনপ্রণালীরই সহায় হইতে হইবে। মানুষকে যদি শিক্ষাগারে প্রস্তুত করিতেই হয়, তবে তাহাকে তাহার সমাজের, ধর্ম্মের ও দেশের পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা ভাবিয়া তাহারই পক্ষে অতি সুসাধ্য ও সহজ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না করিলে নৈসর্গিক মনুষ্যত্ব-বিকাশের বিঘ্ন উৎপন্ন হয়, এবং তাহার ফলে বিকৃতস্বভাব অপ্রকৃতিস্থ লোকসমাজের সৃষ্টি হয়।

এই নৈসর্গিক বিকাশের লক্ষণ ;—

(ক) সমাজোপযোগিতা, (২) কালোপযোগিতা।

এই জন্যই দেশভেদে ও কালভেদে শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এক সমাজে এক সময়ে যাহা স্বাভাবিক ও সহজ, অন্য অবস্থায় তাহা অস্বাভাবিক ও ক্ষতিকর হইতে পারে। এক অবস্থার প্রতীকার অন্য অবস্থার ব্যাধির কারণ হয়। সময়ের পরিবর্ত্তনে সমাজের সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ; এই পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী না হইলে শিক্ষা-পদ্ধতি "সেকেলে" থাকিয়া যায়। এইরূপ শিক্ষায় বৃত্তি সকল বেশ সহজ

উপায়ে পারিপার্শ্বিক নৈতিক ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারে না। এবং এই জন্য ইহারা খর্ব্বতা ও পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধবিকশিত বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করে।

(৩) স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা।

বেষ্টনী হইতে নিজের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিয়া বিকাশ ও পুষ্টি লাভ করিতে হইলে স্বাধীনভাবে ইহার ব্যবহার করিবার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। স্বাধীনভাবে ক্ষেত্রকে ব্যবহার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত না হইলে নিজের উপযোগী উপকরণ-সংগ্রহ অসম্ভব হইয়া পড়ে। স্বীয় বিকাশ স্বকীয় চেষ্টা ও দায়িত্বের উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ, স্বীয় প্রবৃত্তির গতি অন্যের পক্ষে সহজবোধ্য নয়। এমন কি, অপর কোনও ব্যক্তি যদি কোনও ব্যবস্থা করিবার উপযুক্ত হয়, অথবা অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকে এই স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের সাহায্য গ্রহণ করিয়াই কার্য্য করিতে হইবে।

এই তিন লক্ষণ বিশিষ্ট স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব-বিকাশের শিক্ষাকে
সকল দেশে জাতীয় শিক্ষা বলে।

সুতরাং যে কোনও দেশে এবং যে কোনও যুগে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেই দেশ ও সেই যুগের শিক্ষাগুরুদিগকে তদ্দেশোপযোগী স্বাভাবিক, ও তৎকালোচিত "আধুনিক" শিক্ষাপ্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সেই সমাজের প্রকৃতি কি, কোথায় ইহার বিশেষত্ব, কোন্ কোন্ বিষয়ে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তৎকালের যুগধর্ম্ম কি, অর্থাৎ সেই যুগে পৃথিবীতে কোন্ কোন্ ভাব ও কর্ম্মসমূহ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং তাহার দ্বারা কিরূপ নূতন অবস্থাসংঘটন হইয়াছে ও হইবার সম্ভাবনা, এই সকল বিষয়ের আলোচনা না করিলে সকল শ্রমই পণ্ড হইয়া যায়। এইরূপ সমাজোপযোগী এবং "আধুনিক" শিক্ষাপদ্ধতিকেই স্বাভাবিক বা জাতীয় শিক্ষা বলা হয়। ইহার দ্বারাই সেই জা তর তৎকালোপযোগী জীবনবিকাশের সুবিধা হয়। এবং ইহাতে সমাজ স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির সহায়তা করে, এবং মানবসভ্যতার বিস্তৃতি ও বিকাশের উপযোগী হয়। সেই সময়ে পুরাতন প্রথা প্রচলিত অথবা স্থায়ী করিতে হইলে, জোর করিয়া এক অনৈসর্গিক ক্রিয়ায় অভিনয় করা হয়; অথচ পুরাতন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান না হইলে, বাস্তকার

উপর অট্টালিকা-নির্ম্মাণের ন্যায় প্রয়াস বিফল হইয়া যায়। এ জন্য তাহাদের সম্প্রদায়প্রবাহ, ধর্ম্মপ্রবাহ, কুলপ্রবাহ ও জ্ঞানপ্রবাহ, প্রত্যেকেই তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দৈনন্দিন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনপ্রবাহের সহিত যাহাতে মিলিত হইয়া তাহাদিগকে জাতিপ্রবাহের অঙ্গীভূত হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারে, শাস্ত্রকারদিগের প্রথমতঃ এরূপ ব্যবস্থা করিয়া পরে অন্যান্য দেশের মনুষ্যসমাজ এতদিনের কর্ম্ম ও চিন্তা দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সহিত সংযোগস্থাপন করা বিধেয়।

ভারতবর্ষে আধুনিক যুগের স্বাভাবিক শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য।

সমাজোপযোগিতা, স্বাধীনতা ও কালোপযোগিতা প্রকৃত স্বাভাবিক শিক্ষার প্রধান লক্ষণ। আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগে কোন্ শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বাভাবিক, স্বাধীন ও কালোপযোগী, অর্থাৎ আধুনিক, এই বিষয় আলোচনা করিয়া শিক্ষাবিজ্ঞানের দ্বিতীয় বিভাগ শিক্ষা-তত্ত্ব সম্পূর্ণ হইবে। বর্ত্তমান ভারতে কিরূপ স্বতন্ত্র শিক্ষা সময়োপযোগী, কিরূপ শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে জাতীয়, নৈতিক ও ধর্ম্মজীবন গঠনের সুবিধা হয়, ছাত্রাবস্থার সময়-বিভাগ, শিক্ষালয়-প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকের সহিত শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ কোন্ নিয়মে স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক, তাহার আলোচনা করা যাইবে।

বিজ্ঞানের দুই ভাগ : (১) জ্ঞানকাণ্ড—তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা ;

(২) কর্ম্মকাণ্ড—মানবের অভাবমোচনের জন্য প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের প্রয়োগ—

যে সকল বিদ্যাকে আমরা বিজ্ঞান বলিয়া থাকি, তাহাদের দুইটি দিক্ আছে। এক দিকে তাহারা নানাবিধ উপায়ে কোনও বিষয়ের আধুনিক অথবা প্রাচীন তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করিয়া ক্রমশঃ তৎসম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে, এবং সত্যের আবিষ্কার করে। অপর দিকে কেবলমাত্র জ্ঞানলাভ ও তত্ত্বপ্রতিষ্ঠায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া সেই জ্ঞান ও তত্ত্বকে ব্যবহার করিয়া মানুষের বিবিধ অভাবমোচনের সহায়তা করে। বিজ্ঞানের এক অংশ জ্ঞানকাণ্ড, অপর অংশ কর্ম্মকাণ্ড। উভয়ের মিলনে বিজ্ঞানের সমাপ্তি। এক দিকে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য সম্মুখে স্থাপন না করিয়া, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক প্রণালীর দ্বারা নিরপেক্ষভাবে ও সহিষ্ণুতার সহিত আলোচ্য বিষয়ের পরীক্ষা করিয়া সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করা ; অপর দিকে বিশেষ এক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য উপযুক্ত উপায়ের উদ্ভাবন করা—এই

দুইটীই বৈজ্ঞানিকের কার্য্য। ইহার মধ্যে শেষোক্তটী পূর্ব্বোক্তটির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ কোন বিষয়ের স্বরূপ ও প্রকৃতি অবগত না হইলে তাহাকে কোন লক্ষ্যের দিকে চালিত করা অসম্ভব।

ধন-বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের দুই দিক—(১) অর্থ ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে সাধারণ সূত্র আবিষ্কার (২) আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে সূত্রের প্রয়োগ;

ধনবিজ্ঞান এইরূপ একদিকে মানুষের ভোগপ্রবৃত্তির প্রকৃতি, ক্রমবিকাশ, রূপপরিবর্ত্তন এবং ইহা চরিতার্থ করিবার উপায় সমূহ নানাপ্রকারে আলোচনা করিয়া বিষয় সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে; অপর দিকে এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া, এই ধনসম্পত্তি সম্বন্ধীয় সাধারণ নিয়ম সমূহের সাহায্য গ্রহণ করিয়া দেশের বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধি সাধনের উপায় উদ্ভাবন করে। সেইরূপ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, উন্নতি অবনতি সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাষ্ট্র শাসনের প্রণালী আবিষ্কার করে, এবং ইহার দ্বারা রাষ্ট্রের কর্ম্মচারীদিগকে কর্ম্মে সাহায্য করে। শিক্ষা-বিজ্ঞানও প্রথমতঃ ইতিহাস এবং দর্শনের দ্বারা শিক্ষার উদ্দেশ্য, উপকরণ ও উপায় প্রভৃতি সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কার করে; এবং দ্বিতীয়তঃ এই সকল প্রতিষ্ঠিত সত্য অবলম্বন করিয়া প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালী আবিষ্কার করে। শিক্ষাতত্ত্ববিদেরা শিক্ষাপদ্ধতির বৈচিত্র্য এবং শিক্ষাপদ্ধতির সহিত সাধারণ সভ্যতার সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন না; তাঁহারা এমন কি, শিক্ষার প্রকৃতি, শিক্ষার উন্নতি অবনতির কারণ, অথবা শিক্ষার সহিত যুগধর্ম্মের সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া, অথবা দেশ ও কালভেদে শিক্ষাপদ্ধতি কিরূপ পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক এবং এজন্য কিরূপ ব্যবস্থা বিধেয়, তাহার বিবরণ প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন না; তাঁহাদিগকে উপরন্তু, অবস্থোচিত ব্যবস্থা করিতে হইলে শিক্ষার যে উপায় উদ্ভাবন করা উচিত, তাহাও স্থির করিয়া দিতে হয়। সুতরাং শিক্ষা-বিজ্ঞান তিন বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) শিক্ষা-পদ্ধতি, (২) শিক্ষা-তত্ত্ব, (৩) শিক্ষা-প্রণালী।

শিক্ষাবিজ্ঞানের কর্ম্মকাণ্ড ও তৃতীয় বিভাগ শিক্ষা-প্রণালী;

দ্বিতীয় বিভাগে অর্থাৎ শিক্ষাতত্ত্বে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে সাধারণভাবে যাহা বলা হইবে, এবং আমাদের দেশের বর্ত্তমান যুগোপযোগী শিক্ষাপদ্ধতির যে চিত্র প্রদান করা হইবে, তৃতীয় বিভাগে অর্থাৎ শিক্ষা-প্রণালীতে সেই বিষয়ের কর্ম্মকাণ্ড সন্নিবেশিত হইবে। আমাদের দেশের

উপযোগী যেরূপ আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানসিক ও শারীরিক শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করা হইবে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায় সমূহ বিবৃত হইবে। এই উপায় সমূহের মধ্যে যে অংশ সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতি, ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধ, শিক্ষালয় ও সমাজের সম্বন্ধ, এবং শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা বিষয়ক, তাহা শিক্ষাতত্ত্বের শেষাংশে আলোচিত হইবে বলিয়া তৃতীয় বিভাগে কেবল মাত্র শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের অধ্যাপনাপ্রণালীরই বিশদ বিবরণ দেওয়া যাইবে।

তিন বিভাগের প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রথম বিভাগে শিক্ষা জগতের বৈচিত্র্য প্রতিপন্ন করা যাইবে। দ্বিতীয় বিভাগে সমাজোপযোগিতা, সময়োপযোগিতা ও স্বাধীনতা—প্রধানতঃ এই তিন কারণেই যে যুগে যুগে দেশে দেশে শিক্ষার বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়, এবং এই তিন লক্ষণই যে স্বাভাবিক শিক্ষার প্রকৃত ভিত্তি—এই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা হইবে; এবং এই দেশের বর্ত্তমান কালোপযোগী প্রকৃত স্বাভাবিক শিক্ষার নূতনত্ব ও স্বাতন্ত্র্যের যৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইবে। তৃতীয় বিভাগে বিশেষ এক অধ্যাপনা-প্রণালীর বিবরণ প্রদান করা হইবে।

অধ্যাপনার নূতন প্রণালী

এতদিন আমাদের দেশে যে ভাবে ভাষা, দর্শন, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাপনা কার্য্য চলিতেছিল তাহার যথোচিত পরিবর্ত্তন করিয়া উন্নত শিক্ষা-প্রণালীর [illegible] এক কথায় বলিতে হইলে, যে প্রণালীতে শিক্ষার্থী শারীরিক ও মানসিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা লাভ করিয়া ক্রমশঃ পরিচিত বিষয় ও সত্য হইতে অপরিচিত ও অজ্ঞাত সত্যে উপনীত হইতে পারে—বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সত্য আবিষ্কারের পন্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, নিজের উদ্ভাবনী শক্তি ও বুদ্ধি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাইয়া স্বকীয় সৃষ্টি ও মৌলিক চিন্তার আনন্দ উপভোগ করিতে পারে, এবং যে প্রণালীতে আলোচ্য ও শিক্ষণীয় বিষয়ের ক্রমবিকাশ তাহার স্বকীয় ক্রমবিকাশের অনুরূপ হইতে পারে—এরূপ শিক্ষা-প্রণালীর ব্যাপক, সম্পূর্ণ ও সর্ব্বতোমুখী আলোচনা করা হইবে।

(ক) জ্ঞাত বিষয় ব্যবহার করিতে করিতে অজ্ঞাত বিষয়ের অধিকার প্রাপ্তি।

বৈজ্ঞানিকেরা এবং নানাবিধ সত্যের আবিষ্কারকেরা যে ভাবে ধীরে ধীরে অনেক ভ্রমসংশোধন করিতে করিতে অসম্পূর্ণ ও আংশিক সত্য এবং অসত্যের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়া, একটী দুইটী করিয়া খণ্ড-সত্য সংগ্রহের পর শেষে সম্পূর্ণ

সত্যের দুর্গ করতলগত করেন, ছাত্রকেও ঠিক সেই ভাবে আবিষ্কার করিতে করিতে, অজানা পথের ভিতর দিয়া, অনেক ব্যর্থ প্রয়াসের পর, সত্য লাভ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। অপর লোকেরা যে সকল সত্যের উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সেই সত্য সমূহ অবলম্বন করিয়া যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছেন, ছাত্রকে সেই সকল সত্য স্বীকার করাইয়া লওয়ান এবং পুস্তক সকল আবৃত্তি করান শিক্ষকের কর্ত্তব্য নহে। তাঁহাকে কেবল মাত্র ছাত্রের পথপ্রদর্শকের ন্যায় থাকিয়া তাহার সত্য আবিষ্কারের প্রয়াসে সহায় হইতে হইবে।

শিক্ষার্থী—আবিষ্কারক ;

তবে শিক্ষার্থী ছাত্র এবং প্রথম আবিষ্কারকের মধ্যে এই প্রভেদ—যে, প্রকৃত আবিষ্কারককে অসহায়ভাবে পৃথিবীর অজ্ঞ অবস্থায় একাকী পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, অন্ধকারে চলিতে যাইয়া অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। এজন্য বহু ব্যক্তির জীবনব্যাপী, নিঃস্বার্থ ও ফললাভে নিরাকাঙ্ক্ষ, কর্ম্মের ফলে জগতে এক একটী সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে ; এবং এই কারণে বহু জীবন নিরর্থক ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু ছাত্রকে এরূপ ব্যর্থযত্ন হইতে হইবে না। বহু জাতি ও বহু ব্যক্তির প্রয়াসপ্রসূত, জড়জগৎ ও চিজ্জগতের সত্যসমূহ তাহার নিকট বিজ্ঞানাকারে সঞ্চিত ও পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে। তাহার শিক্ষক এই ভাণ্ডারের অধিকারী হইয়া সর্ব্ববিদ্যা-রক্ষক ভাবে সর্ব্বদা তাহার সহায়তা করিতেছেন। যে যে পন্থা অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা সত্য সকল উদ্ভাবন করিয়াছেন সেই সকল উপায় এখন শিক্ষার্থীকে নূতন করিয়া উদ্ভাবন করিতে হইবে না। তাহার শিক্ষকের মনেই সেই উপায় গুলি সর্ব্বদা রহিয়াছে ; সুতরাং বহু যুগে পৃথিবী যাহা লাভ করিয়াছে ছাত্র এক জীবনেই এখন তাহা লাভ করিতে সক্ষম। ছাত্রের জীবন কোন কোন সুপণ্ডিতদিগের জীবনের ন্যায় নিরর্থক হইবার সম্ভাবনা নাই।

আলোচ্য বিষয়ে প্রবেশ লাভের জন্য রচিত গ্রন্থ পাঠের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই ;

শিক্ষার্থী আবিষ্কারক, কেবল মাত্র পাঠক নহে। গ্রন্থকারেরা যে ভাবে নিজ নিজ পুস্তক রচনা করিয়া তথ্য লিপিবদ্ধ করেন, শিক্ষার্থীকে ঠিক সেই ভাবে পুস্তক পাঠ অথবা বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে না। সাধারণতঃ যে প্রণালীতে পুস্তক রচিত হইয়া থাকে তাহাতে গ্রন্থকর্ত্তার প্রয়াসসমূহের

বিবরণ থাকে না। বহু গবেষণা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তিনি সেই সিদ্ধান্ত সমূহ অন্যান্য ব্যক্তির সিদ্ধান্তসমূহের সহিত মিলাইয়া এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তাঁহার পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করেন। ইহাতে পুস্তকের শ্রীবৃদ্ধি এবং সৌষ্ঠব সাধিত হয় বটে; কিন্তু শিক্ষার্থী সিদ্ধান্তগুলি পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না,—তাহার পক্ষে ফললাভ অপেক্ষা ফললাভের উপায় অধিক আবশ্যক। এজন্য অতি সুপণ্ডিত-রচিত পুস্তকও শিক্ষার্থীর উপযোগী নহে। বিবিধ কারণে রচিত গ্রন্থ সমূহের সার মর্ম্ম, রচনাকৌশল এবং লিখনপদ্ধতির সহিত ছাত্রের পরিচিত হওয়া উচিত বটে; কিন্তু কোন বিষয়ে ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য ছাত্রকে যদি পুস্তক পাঠ করিতেই হয় তাহা হইলে ছাত্রদিগের জন্য বিশেষভাবে পুস্তক রচনা করা উচিত। যে সকল পুস্তকের দ্বারা ছাত্র স্বকীয় উন্নতি অনুসারে স্বাধীনভাবে ক্রমশঃ কঠিনতর ও জটিলতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে বাধ্য হয়, যে সকল পুস্তকে সঙ্কেতমাত্র নির্দ্দিষ্ট হয়, উপায় ও পন্থা মাত্র বলিয়া দেওয়া হয়, এবং সকল কার্য্যই শিক্ষার্থীকে নিজে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সমাধা করিতে হয়, সেই সকল পুস্তকই শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদিগের পাঠ করা উচিত।

স্বাধীনভাবে চেষ্টা করিয়া সমস্যা সরল করিবার জন্য মস্তিষ্ক সঞ্চালন।

আবিষ্কারকের প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিলে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন চেষ্টা, মৌলিকতা ও অনুসন্ধিৎসা স্বভাবসিদ্ধ ~~হইয়া থাকে। এই উপায়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত~~ হইয়া মস্তিষ্কের সঞ্চালন করিলে মানসিক শক্তির বিকাশ ও পুষ্টি সাধিত হয়। অনুশীলনই শক্তির উপায় বলিয়া, কষ্ট ও সমস্যার ভিতর থাকিয়া ক্রমশঃ বিকাশলাভ করিলেই শক্তি সঞ্চিত হইতে পারে। এজন্য অপরের আবিষ্কৃত সত্যের দ্বারা মস্তিষ্কের প্রকোষ্ঠ গুলি পূর্ণ না করিয়া নিজে বিচার্য্য বিষয় গুলির জটিলতা ও দুরূহতা সরল করিবার চেষ্টা করাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

বহুবিধ বিশেষ বিশেষত্ব ভাব ও পদার্থ বিচারের পর সামান্য ধর্ম্ম ও সূত্র সমূহ লাভের প্রণালী অবলম্বন।

সত্য আবিষ্কার করিবার যে যে উপায় আছে তাহার মধ্যে যাহার দ্বারা শিক্ষার্থীকে বহুবিধ বিশেষ বিশেষ তথ্য ও ঘটনা আলোচনা করিতে হয় সেই প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতে হইবে। এইরূপ বিশেষ বিশেষ আলোচনার পর তথ্যসমূহের অনৈক্য ও পার্থক্যের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য অন্বেষণ করিতে হইবে। এই আলোচনা-প্রণালীকে "ইণ্ডাক্‌টিভ" বা

"আরোহ" পদ্ধতি বলে। ইহাতে জ্ঞান-প্রকৃত স্থির ভিত্তিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া বদ্ধমূল হইতে পারে। কারণ এই প্রণালীতে শিক্ষার্থী সর্ব্বদা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিয়া মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতে বাধ্য হয়, এবং বহু তথ্যের আলোচনায় রত থাকিয়া অনুসন্ধিৎসু এবং মৌলিক হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়।

এই প্রণালীতে শিক্ষালাভ করিতে হইলে শিক্ষার্থীকে জানা জিনিসের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে হইবে। অজানা বিষয় সমূহ একেবারে শিক্ষকের নিকট শুনিয়া আবৃত্তি করিতে হইবে না। ইহাতে বস্তুপরিচয় ও পদার্থবিচারের প্রাধান্য থাকিবে। অনেক গুলি তথ্যের বিশেষ বিশেষ আলোচনার পরে সূত্র সমূহ এবং সাধারণ নিয়ম সকল তাহাকে লাভ করিতে হইবে। সমীপস্থ, পরিচিত এবং বর্ত্তমান তথ্য ও পদার্থ সমূহ নিরীক্ষণ করিতে করিতে, ক্রমশঃ জ্ঞানের বৃদ্ধির সহিত কল্পনা শক্তির প্রয়োগ করিয়া দূরস্থ, অপরিচিত, অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভাব ও পদার্থ সমূহের ধারণা করিতে হইবে। স্থূল স্থূল সত্য সমূহের আলোচনা হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর সত্যের উদ্দেশ্যে উন্নীত হইতে হইবে।

এই প্রণালীতে শিক্ষালাভের ফল—শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের মূলভিত্তির
সহিত সাক্ষাৎ পরিচয়; সাহিত্যিক বিষয়ে প্রকৃত রসজ্ঞতা,
বৈজ্ঞানিক বিষয়ে প্রকৃত অনুসন্ধিৎসা,

* * * * *

ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, ধনবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি সাহিত্যিক বিদ্যা সমূহ যে প্রণালীতে আলোচিত হইবার কথা বলা হইল তাহাতে সেই সেই বিষয়ের মূলীভূত উপাদান সমূহের প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবে। প্রত্যেক শিক্ষণীয় বিষয়ের মৌলিক সত্যগুলি আয়ত্ত হইতে হইতে তত্তদ্বিষয়ে মনোবৃত্তি নিচয়ের অনুশীলন হইবে। ইহাতে প্রকৃত ভাব সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক শক্তি সমূহের বিকাশ আশা করা যায়। এই প্রণালীতে অধ্যাপনা কার্য্য চলিলে গণিতশাস্ত্র এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহে ও প্রকৃত জ্ঞান জন্মিয়া গণিতজ্ঞ এবং বিজ্ঞানানুসন্ধিৎসু হইবার সম্ভাবনা হয়। যে সকল বৃত্তি সঞ্চালনের দ্বারা গণিতে অধিকার প্রাপ্তি হয় এবং প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করিবার প্রবৃত্তি জাগরিত হয় আরোহপদ্ধতির আবিষ্কার প্রণালীতে সেই সকল বৃত্তি ও প্রবৃত্তির অনুশীলন হয়।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহের অধ্যাপনা—বাহ্যজগতের বৈচিত্র্য উপলব্ধি ঃ

* * * * *

মানববিজ্ঞান সমূহে শিক্ষালাভ করিতে হইলে যেমন মানুষের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপ্রণালী ও ভাবসমূহ, কর্ম্মের ও চরিত্রের আদর্শ সমূহ, জীবনের বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমূহ, বিচিত্র রীতিনীতি সমূহ এবং অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমূহের আলোচনা করিয়া মানবের মনোজগৎ, সামাজিকজগৎ ও রাষ্ট্র-জগৎ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াক্ষেত্রের সহিত পরিচিত হওয়া উচিত, তেমনি প্রাকৃতিক ও জড়বিজ্ঞান সমূহে শিক্ষালাভ করিতে হইলে প্রকৃতির ও জড়-জগতের বিভিন্ন শক্তিপুঞ্জ ও পদার্থ সমূহের সহিত পরিচিত হইয়া বাহ্যজগতের বিশালতা ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। অনলে ভূতলে, পর্ব্বতে জলে, ঋতুপরিবর্ত্তনে, লতায় পাতায়, জীবজন্তুতে যে যে শক্তির ক্রিয়া হইতেছে, যত প্রকারের বিচিত্র অভিনয় সংঘটিত হইতেছে, এই সকলের ফলে জগতে যত প্রকারের পরিবর্ত্তন ও বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে এবং এই সমুদয় ব্যবহার করিয়া মানব যত প্রকারের সুখভোগ করিতেছে, সেই সকল বিভিন্ন পদার্থ ও বিভিন্ন শক্তি সমূহের বিবরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রথমেই শ্রেণীবিভাগ এবং সাধারণ নিয়ম ও সূত্রগুলি আয়ত্ত করিতে হইবে না।

সাধারণ নিয়ম—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্যজগতের সহিত পরিচয় লাভ।

* * * * *

এইরূপে বৈচিত্র্যময় জগতের নিত্যনব বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর প্রতি মনোনিবেশ করাই বাহ্যবস্তু সমূহের স্বরূপ উপলব্ধি করিবার প্রধান সহায়। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই সকল পদার্থের যথার্থ জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। এবং এক এক ইন্দ্রিয়ের সহিত এক এক বস্তুর প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। এই উপায়ে পৃথিবীকে বিশেষরূপে চিনিতে হইবে। এইরূপ কুটুম্বিতা স্থাপিত হইয়া গেলে ইহার বিভিন্ন অভ্যাস ও ভাব গতিক সমূহ পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে। এবং ইহার ভিতরকার কথাগুলি ও অন্তর্নিহিত সত্যগুলি সহজে উদ্ধৃত হইবে। প্রকৃতির বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, হাবভাব, কার্য্যপ্রণালী ও বিকাশের লক্ষণ সমূহ অবগত হইলে প্রকৃতিকে প্রশ্ন করিবার শক্তিলাভ হইবে।

শিল্পশিক্ষা—কারখানায় কর্ম্ম করিয়া দ্রব্যগুণ বিচার করা এবং
দ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী সমূহ নিরীক্ষণ করা

* * * * *

এই প্রণালীতে ব্যবহারিক শিল্প সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে হইলে জগতের যাবতীয় ব্যবহার্য্য পদার্থ সমূহের প্রস্তুত করিবার প্রণালীর তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এই জন্য পুস্তক ব্যবহার না করিয়া অথবা সূত্র মুখস্থ না করিয়া কারখানাকেই পুস্তক, শিক্ষালয় ও শিক্ষক রূপে বিবেচনা করিতে হইবে। বিজ্ঞানাগার ও ল্যাবরেটরীতে কার্য্য করা এবং প্রকৃতিকে নিরীক্ষণ করা যেমন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সমূহের শিক্ষার প্রধান পন্থা, মানবের ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন নিরীক্ষণ করা যেমন মানববিজ্ঞান সমূহের শিক্ষালাভের উৎকৃষ্ট উপায়, তেমনি ওয়ার্কসপ ও কারখানায় বস্তু বিচার করা, দ্রব্য নির্ম্মাণে সহায়তা করা এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলোকন করাই শিল্পশিক্ষার প্রধান উপায়। সাধারণতঃ সূত্র ও ফর্ম্মুলা সমূহ পুস্তক হইতে আবৃত্তি করার পর শিক্ষার্থীরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটী এক্সপেরিমেণ্ট বা পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। এই নূতন প্রণালীতে পুস্তক ও সূত্র সমূহের স্থান গৌণ, ল্যাবরেটরী, বিজ্ঞানাগার, কারখানার স্থানই মুখ্য। পুস্তকের লিখিত সূত্র ও নিয়মগুলি ল্যোবরেটরীতে আসিয়া মিলাইয়া লইতে হইবে না। ল্যাবরেটরী প্রভৃতিতে কর্ম্ম করিয়া যে তথ্যে উপনীত হওয়া যায় তাহাই প্রকৃত সত্য বিবেচনা করিয়া পুস্তকাদির তথ্যের সহিত তুলনা করিতে হইবে।

বহুবিধ তথ্যের সংগ্রহ ও বিবরণ ইণ্ডাক্‌টিভ (আরোহ)
আবিষ্কার প্রণালীর প্রধান অঙ্গ।

* * * * *

আবিষ্কারের এইরূপ প্রণালীতে শিক্ষাদান করিতে হইলে শিক্ষার্থীর সম্মুখে বহুপ্রকারের এবং নানাশ্রেণীর যাবতীয় পদার্থ ও ভাব সমূহ, চিন্তা ও কর্ম্ম সমূহ, আন্দোলন ও পরিবর্ত্তন সমূহ আনয়ন করিতে হইবে। বহুদিক হইতে বিবিধ উপায়ে প্রত্যেকটীকে বিভিন্ন রকমের পরীক্ষা করিয়া নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতে হইবে। এইরূপে বহু তথ্য সংগৃহীত হইলে প্রত্যেক আলোচ্য বিষয়ের সাধারণ ধর্ম্ম সকল, শ্রেণী সমূহ, সাধারণ ক্রিয়া প্রণালী, কার্য্যকারণ সম্বন্ধ এবং পারম্পর্য্য সমূহের ইঙ্গিতে পাওয়া যাইবে। এই ইঙ্গিত সমূহ

শৃঙ্খলীকৃত ও প্রণালীবদ্ধ করিতে পারিলে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের ধারণা হইবে, এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য সমূহ প্রতীয়মান হইবে।

সম্পূর্ণ পুস্তকের বিভিন্ন বিভাগ ও খণ্ড সমূহ।

*   *   *   *

প্রথম বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্নখণ্ডে বিভক্ত হইবে—কথা গ্রীস, ভারত, মিসর ইত্যাদি, দ্বিতীয় বিভাগ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইবে। প্রথম খণ্ডে শিক্ষার প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও উপকরণ সম্বন্ধে সাধারণ কথা থাকিবে। এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আধুনিক ভারতের অবস্থাপযোগী নূতন শিক্ষার চিত্র প্রদান করা হইবে। তৃতীয় বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ানুসারে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইবে যথা ভাষা, সাহিত্য, রসায়ন, উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান, শিল্প-ইত্যাদি।

আশা—শীঘ্রই দেশে শিক্ষার আন্দোলন প্রাধান্যলাভ করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে কর্ম্মে প্রণোদিত করিবে।

*   *   *   *

আশা আছে শীঘ্রই উপযুক্ত, বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ শিক্ষা-বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা রূপ বিশাল ও দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিষয়ের গৌরব রক্ষা করিবেন। বর্ত্তমান সমাজের লক্ষণ গুলি দেখিয়া বেশ বুঝা যাইতেছে শীঘ্রই আমাদের চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীরগণ এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রই শিক্ষার আন্দোলনের স্তম্ভ স্বরূপ হইয়া দেশের মধ্যে বিবিধ শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠা করিবেন। লোকশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, জাতীয়শিক্ষা, শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি শিক্ষাক্ষেত্রের যাবতীয় কর্ম্ম সমূহই দেশের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিবে। শীঘ্রই বিদ্যাদান ও শিক্ষাবিস্তারই স্বদেশসেবা ও সমাজহিতের প্রধান অঙ্গ ও লক্ষণ হইয়া দেশের মধ্যে বর্ত্তমান সর্ব্ববিধ আন্দোলন সমূহকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিবে। শিক্ষার অন্দোলনই সকল আন্দোলন কে গ্রাস করিয়া ক্রমশঃ গভীরতর ও বিস্তৃততর হইতে থাকিবে। এবং কর্ম্মিগণ মনুষ্যত্ব বিকাশর সহায়কারী জ্ঞানমন্দির সমূহের প্রতিষ্ঠাকেই জীবনের ধর্ম্ম মনে করিবেন এবং এই কর্ম্মেই সম্পূর্ণ শক্তি ও সময় দান করিয়া সার্থকতা উপলব্ধি করিবেন। শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য দেশবাসীদিগের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে। শিক্ষাপ্রচারই সমীপবর্ত্তী ভবিষ্যতের নূতন সন্ন্যাস হইবে। শিক্ষকই নূতন সন্ন্যাসী হইবেন।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।